তৃতীয় খণ্ড : গীত ও নৃত্য

ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য এম. এ., পি-এইচ্. ডি.
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক

পরিবেশক
ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

ভারত-বন্ধু পরম লোক-জীবনরসিক

ডক্টর ভেরিয়ার এলউইন ডি. এস্-সি. (অক্সন্), এফ্. এন্. আই

মহোদয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে

বাংলার লোক-সাহিত্য

প্রথম খণ্ড : আলোচনা

দ্বিতীয় খণ্ড : ছড়া

তৃতীয় খণ্ড : গীত ও নৃত্য

চতুর্থ খণ্ড : কথা

পঞ্চম খণ্ড : ধাঁধা

Third Five Year Plan—Development of Modern Indian Languages. The popular price of the book has been possible through a subvention received from the Government.

নিবেদন

'বাংলার লোক-সাহিত্য, তৃতীয় খণ্ড : গীত ও নৃত্য' প্রকাশিত হইল। ইতিপূর্বে প্রকাশিত এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বাংলার লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা এবং দ্বিতীয় খণ্ডে বাংলা ছড়ার বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন বিষয়ক গীতি সম্পর্কে আলোচনা ও সংগ্রহ প্রকাশিত হইল। ইহার চতুর্থ খণ্ডের প্রকাশ আসন্ন হইয়াছে, তাহাতে লোক-কথার সংগ্রহ ও আলোচনা থাকিবে। পঞ্চম খণ্ডে ধাঁধার সংগ্রহ ও আলোচনা প্রকাশিত হইবে। অধিকাংশ লোক-সঙ্গীতের সঙ্গেই লোক-নৃত্যের সম্পর্ক আছে বলিয়া বাংলার লোক-নৃত্য বিষয়কও একটি সুদীর্ঘ অধ্যায় ইহাতে সংযোগ করা হইয়াছে। এই ভাবে বিষয়টি যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ করিয়া প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এ কথা সত্য, এই প্রকার বিস্তৃত একটি বিষয় এই পরিমিত পরিসরের মধ্যে ইহার যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করিয়া প্রকাশ পাইতে পারে না। তথাপি ইহা হইতেই বাংলার লোক-সঙ্গীতের বৈচিত্র্য এবং বিস্তার সম্পর্কে যে ধারণা হইবে, তাহাতেই ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে।

সমগ্র বাংলাদেশের ভিত্তিতে ইতিপূর্বে বাংলা লোক-সঙ্গীতের এত বৃহৎ কোন সংগ্রহ কিংবা আলোচনা কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'লোক-সাহিত্য' গ্রন্থে 'গ্রাম্য সাহিত্য' নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া তাহাতে কয়েকটি হরগৌরী এবং রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। তিনি ইহাদের সংগ্রহকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াও যে এই বিষয়ে বিশেষ সফলকাম হইতে পারেন নাই, সে কথাও উক্ত প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বহুকাল পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা', 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' 'গোপীচন্দ্রের গান' নামক যে সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা গীতিকা বা ballad-এর সংগ্রহ, গীতের সংগ্রহ নহে। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ লাভ করিয়া মুহম্মদ মুনসুরুদ্দীন 'হারামণি' নামক যে সংগ্রহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাও পূর্ববাংলার বিশেষ একটি অঞ্চল হইতে সংগৃহীত প্রধানতঃ সূফী সাধকদিগের ধর্মসঙ্গীত মাত্র। ইহাদিগকে যথাযথ লোক-সঙ্গীত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্বর্গত গুরুসদয়

দত্ত মহাশয় যে 'পটুয়া সঙ্গীত' নামক একখানি সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাও পশ্চিম বাংলার বিশেষ একটি অঞ্চলের বিশেষ এক শ্রেণীরই সঙ্গীত। এতদ্ব্যতীত বহুকাল হইতেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিচ্ছিন্নভাবে লোক-সঙ্গীতের কিছু কিছু আঞ্চলিক সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে বাংলাদেশের ভিত্তিতে লোক-সঙ্গীতের এত বৃহৎ সংগ্রহ ইহাই প্রথম। সুতরাং ইহার যে অসম্পূর্ণতাই থাকুক, এই বিষয়ের ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা।

বাঙ্গালীর সমৃদ্ধতম রস-সম্পদই তাহার সঙ্গীত। বাংলা সঙ্গীতের বিভিন্ন ধারা নানাদিকে যতই বিকাশ লাভ করুক না কেন, ইহার মর্মমূলে যে লোক-সঙ্গীতের প্রেরণা ও শক্তি রহিয়াছে, তাহা বিস্মৃত হইলে আমাদের সঙ্গীত-সাধনা জয়যুক্ত হইবে না। মাটি হইতে রস আকর্ষণ করিতে না পারিলে গাছ যেমন পরগাছা হয়, লোক-সঙ্গীতের প্রেরণাকে অস্বীকার করিয়া বাংলা সঙ্গীত তেমনই পরদেশী হইয়া পড়িতেছে। ইতিমধ্যেই বাংলার বহু প্রাচীন গীত-রীতি যে লুপ্ত হইয়াছে, তাহার ইহাই একমাত্র কারণ। অথচ নাগরিক জীবনে লোক-সঙ্গীতের প্রতি যাহাদের এই শ্রদ্ধাবোধটুকুও আছে, তাঁহারাও কেবলমাত্র যথাযথ উপকরণের অভাবে ইহার সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেছেন। আজ সহরের 'স্বরচিত' লোক-সঙ্গীত এবং সহুরে লেখকের 'রচিত' পল্লী-সঙ্গীত দেশের আকাশে বাতাসে আর্তনাদ করিতেছে। সেইজন্য লোক-সঙ্গীতের একটি অকৃত্রিম সংগ্রহের একান্ত আবশ্যক ছিল। বর্তমান সংগ্রহ এবং আলোচনাখানি সেই অভাব অনেকখানি পূর্ণ করিতে পারিবে বলিয়াই বিশ্বাস করি। সম্ভব হইলে ভবিষ্যতে ইহার বিস্তৃততম সঙ্কলন প্রকাশ করিবারও সুযোগ হইতে পারে।

বিগত প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ এই গ্রন্থের সংগ্রহকার্য চলিয়াছে। কিন্তু এই বিষয়ের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারিয়াছি যে, একক সংগ্রহ দ্বারা আশানুরূপ ফল লাভ করা যায় না। সমবেত ভাবে সংগ্রহের ভিতর দিয়া বাংলাদেশের মত এত সমৃদ্ধ একটি দেশের লোক-সাহিত্যের উপকরণ যথাযথ ভাবে সংগৃহীত হইতে পারে। সম্প্রতি এই বিষয়ে কয়েকটি যে সুযোগ পাওয়া গিয়াছিল, তাহার ফলেই আমার পক্ষে আশানুরূপ সংগ্রহ সম্ভব হইয়াছিল। প্রথমতঃ ১৯৬৪ সনে সোভিয়েত সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া আমি যে লেনিনগ্রাদ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার লোক-সংস্কৃতি সম্পর্কে কয়েকটি

বক্তৃতা দিতে গিয়াছিলাম, সেই সময় সোভিয়েত দেশের বৃহত্তম লোক-সংস্কৃতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পুস্কিন ইনষ্টিউটের সংগ্রহ ও গবেষণা কার্যের প্রণালী প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। তাহাতে এই কার্যে একটি বিধিবদ্ধ প্রণালী বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছি। তারপর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লোক-শ্রুতিবিৎ সদ্য পরলোকগত ডক্টর ভেরিয়ার এলউইনের সাহচর্য লাভ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র হইতে লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করিবার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা স্নাতকোত্তর বিভাগের লোক-সাহিত্য শাখার ছাত্রছাত্রীদিগকে সেই বিষয়ে শিক্ষাদান করিয়া তাহাদের সহায়তায় সেই পদ্ধতিতে সংগ্রহ কার্য পরিচালনা করিয়াছিলাম। তাহাতেই পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রচুর উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে।

এই সংগ্রহ এবং আলোচনা সকল দিয়া সম্পূর্ণ করিবার জন্য নিজের সংগ্রহ ব্যতীতও বিভিন্ন আঞ্চলিক এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় যে সংগ্রহ এ'যাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদেরও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। যেমন 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', 'রংপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা', 'বীরভূম পত্রিকা', 'প্রতিভা', (ঢাকা), 'সৌরভ' (মৈমনসিংহ), 'বিক্রমপুর পত্রিকা', 'অর্চনা', 'উপাসনা', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'মাসিক বসুমতী', 'মাসিক মোহম্মদী', 'বসুধারা' ইত্যাদি। মুর্শিদাবাদ জিলার সারগাছি বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে একটি সংগ্রহ-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার অধ্যক্ষ আমার ছাত্র শ্রীপ্রশান্তকুমার সেনগুপ্ত এম এ. মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের সহায়তায় প্রভূত উপকরণ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আমার ছাত্র অধুনা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন-সম্পদের সংরক্ষক (Conservator) শ্রীমান্ কৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী আমাদের সংগ্রহ-অভিযানে বন-বিভাগের সকল রকম সহায়তা দান করিয়া আমার কার্যের সাহায্য করিয়াছেন।

এই গ্রন্থ রচনা ও সঙ্কলনের কার্যে দীর্ঘ কাল যাবৎ যে আরও অসংখ্য কত ব্যক্তি আমাকে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নহে। তবে এই সম্পর্কে সদ্য পরলোকগত দুইজনের নাম গভীর বেদনার সঙ্গে স্মরণ করিতেছি, একজন ডক্টর ভেরিয়র এলউইন, আর একজন ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত। ডক্টর ভেরিয়র এলউইন প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে

লোক-সাহিত্য অনুশীলনের আধুনিকতম ধারাটির সঙ্গে আমাকে হাতে কলমে পরিচিত করাইয়াছিলেন, ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের একজনকেও আমার দীর্ঘ দিনের এই পরিশ্রমের ফল উপহার দিতে পারিলাম না।

আমার অগণিত ছাত্রছাত্রীই আমায় সংগ্রহ-কার্যের প্রধান সহায়ক। তাহাদের প্রত্যেকের নামোল্লেখ করা যেমন অসম্ভব, তেমনই নিষ্প্রয়োজন। তবে আমার স্নেহাস্পদা ছাত্রী শ্রীমতী জয়শ্রী চৌধুরী এম. এ'র নাম অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। আমার ছাত্র শ্রীমান্ দেবব্রত চক্রবর্তী এম. এ. লোক-সঙ্গীতের বাদ্যযন্ত্রগুলির রেখাচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। শ্রীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ও কয়েকটি চিত্র আঁকিয়াছেন। আমার ছাত্রছাত্রী ব্যতীতও যাঁহারা নিজেদের আগ্রহ বশতঃ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার সংগ্রহ কার্যে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমতী গোপাহেমাঙ্গী রায়, শ্রীমতী শিপ্রা দত্ত, শ্রীপ্রশান্তকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীনকুলচন্দ্র দত্ত, শ্রীপশুপতি মাহাতো ইঁহাদের নাম উল্লেখ করিতে পারি। বাংলার লোক-সঙ্গীতের অন্যতম সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দেব মহাশয়ের নিকট হইতেও এই বিষয়ে সাহায্য লাভ করিয়াছি।

এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য আমি পরম শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সুগভীর ঋণী। কবি-বন্ধু শ্রীসুধীর গুপ্ত মহাশয় আমাকে এই দুরূহ কার্যে সর্বদা আন্তরিক উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। মুদ্রণ কার্যের এবং শব্দসূচী প্রণয়ণের দুরূহ দায়িত্ব আমার স্নেহভাজন ছাত্র অধ্যাপক শ্রীসনৎকুমার মিত্র এম. এ. নিজের উপর গ্রহণ করিয়া আমার শ্রম বহুলাংশে লাঘব করিয়াছেন। আধুনিক ভারতীয় ভাষার উন্নতিকল্পে সরকারের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থ সাহায্য করিবার জন্য এই গ্রন্থের মূল্য এত সুলভ করা সম্ভব হইল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলা বিভাগ
রাস-পূর্ণিমা, ১৩৭২ সাল

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

কি যাহু বাংলা গানে,
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা

—অতুলপ্রসাদ

সূচিপত্র

বিষয়-সূচী

তৃতীয় অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

চিত্রসূচী

বাংলার লোক-সাহিত্য

তৃতীয় খণ্ড : গীত ও নৃত্য

ভূমিকা

এক

বাংলার লোক-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য

বাঙ্গালী চিরদিনই গীতি-প্রাণ জাতি। বাঙ্গালীর সাধনার সর্বাপেক্ষা সার্থক পরিচয়ই গীতি; জয়দেব হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙ্গালীর সাধনার সর্বোত্তম ফলই তাহার গীতি বা গীতি-কবিতা। বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ গীতি-কবি রূপেই জগদ্বরেণ্য হইয়াছেন। লিখিত কিংবা উচ্চতর সাহিত্য সাধনার ভিতর দিয়া বাংলার গীতি-কাব্য যে বিশ্বের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, ইহার সংস্কার বাঙ্গালী জাতির সর্বস্তরের সমাজকেই সমান ভাবে অধিকার করিয়াছিল। উচ্চতর শিক্ষিত সমাজ লিখিত সাহিত্য সাধনার ভিতর দিয়া ইহার যে শক্তি ও রূপের বৈচিত্র্য প্রকাশ করুক না কেন, নিরক্ষর সমাজের মধ্য দিয়াও ইহার গীতি-সংস্কার তেমনই সক্রিয় হইয়াছিল, তাহাই জাতির মৌখিক কিংবা লোক-সঙ্গীত ধারার মধ্য দিয়া যুগে যুগে উৎসারিত হইয়া আসিতেছে। এই লোক-সঙ্গীতের মধ্যেই বাঙ্গালীর উচ্চতর গীতি-কবিতা রচনার ধারা জন্মলাভ করিয়াছিল বলিয়াই আজ ইহার মধ্যে এই শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। সেইজন্য আধুনিক বাংলা গীতি-কবিতার মূল্য বিচার করিবার কালে নিরক্ষর সমাজের মধ্যে প্রচলিত লোক-সঙ্গীত ধারারও পরিচয় উদ্ধার করিবার প্রয়োজন হয়।

বাংলা ভাষার প্রথম নিদর্শন স্বরূপ যে চর্যা-গীতির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাও কয়েকটি গীতি। যদিও ইহাদের মধ্যে বিশেষ এক ধর্ম-সম্প্রদায়ের সাধন-ভজনের নিগূঢ় তত্ত্বকথার অবতারণা করা হইয়াছে, তথাপি ইহাদের বহিরঙ্গে যে একটি সহজ গীতির আবেদন প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই ইহাদের সর্বজনীন আকর্ষণের কারণ। তত্ত্বকথাও সরস গীতির মধ্য দিয়া পরিবেষণ করিবার নিপুণতা একমাত্র বাঙ্গালীরই আছে। অন্যান্য জাতির মধ্যে জীবন-জিজ্ঞাসা দর্শন শাস্ত্রের নীরস সূত্রের রূপ লাভ করে, বাঙ্গালীর মধ্যে তাহা অতি সহজেই কাব্য ও গীতি হইয়া উঠে। তাহার নিদর্শন বাংলার ধর্ম-সঙ্গীতের সর্বত্রই পাওয়া যায়। বৌদ্ধ গানগুলিও সহজ-সাধনা সম্পর্কিত কতকগুলি

গূঢ় তত্ত্বের নির্দেশ মাত্র ; কিন্তু বাঙ্গালী ভাবুকের জীবন-দৃষ্টি ও অধ্যাত্ম চিন্তার বিশেষত্বের গুণে ইহারা অতি সহজেই সঙ্গীত হইয়া উঠিয়াছে। গীতির মাধ্যমে চিরকালই বাঙ্গালী তাহার সকল চিন্তাধারাকে প্রকাশ করিয়াছে ; সুতরাং বাঙ্গালীর বিচিত্র লোক-গীতির পরিচয়েই বাঙ্গালী জাতির সামগ্রিক পরিচয় প্রকাশ পায়। ঐতিহাসিকগণ বাঙ্গালী জাতির পরিচয়কে বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদানের মধ্য দিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিয়া থাকেন, তাঁহাদের অনুসন্ধানের মধ্য দিয়া জাতির একটি সামগ্রিক পরিচয় কোন দিনই প্রকাশ পাইতে পারে নাই ; কিন্তু যে লোক-সঙ্গীতগুলির মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর ধ্যান-মানস একটি অখণ্ড পরিচয় লাভ করিয়াছে, তাহার ভিতর দিয়া জাতির একটি সামগ্রিক পরিচয়ের প্রকাশ কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না। চর্যাপদের একটি মাত্র সঙ্গীতের ভিতর দিয়া যেমন সমগ্র বাঙ্গালীর চিরকালীন অধ্যাত্ম-পরিচয়টি অখণ্ড হইয়া ধরা দিয়াছে, তেমনই একটি মাত্র বাউল গানের ভিতর দিয়া একটি সমগ্র জাতির অধ্যাত্ম-হৃদয় স্পন্দিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর লোক-সঙ্গীতগুলির ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর ভাব-জগতের যে অখণ্ডতার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আর কোথাও সম্ভব হয় নাই। সেইজন্য বাঙ্গালীর ভাব-সাধনার ক্রম পরিণতির সূত্র অনুসরণ করিবার জন্যও বাংলার লোক-সঙ্গীতগুলির অনুশীলন একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। কেবল মাত্র ভাব-সাধনা ও রসোপলব্ধির ক্ষেত্রেই নহে, নানা ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও বাংলার লোক-সঙ্গীত বাঙ্গালীর দৈনন্দিন সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের নানা দিক দিয়া অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া আছে। সুতরাং ইহার অনুশীলন ব্যতীত বাঙ্গালী সমাজের সামগ্রিক পরিচয় কোন দিক দিয়াই লাভ করা যাইতে পারে না।

লোক-সঙ্গীতের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহা মৌখিক রচিত হইয়া মৌখিক প্রচার লাভ করে, সমাজের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিলেও কোন দিনই ইহার, লিখিয়া রাখিবার সংস্কার গড়িয়া উঠে না। লিখিত হইবা মাত্রই সাহিত্য একটি বিশেষ অনমনীয় (rigid) রূপ লাভ করে ; কিন্তু যাহা কেবল মাত্র সমাজের স্মৃতিপথ অবলম্বন করিয়া মৌখিক প্রচার লাভ করে, তাহার মধ্যে কখনও একটি সুনির্দিষ্ট (rigid) রূপ গড়িয়া উঠিতে পারে না। প্রবহমাণতার মধ্য দিয়াই লোক-সঙ্গীতের প্রাণশক্তি রক্ষা পায়। নূতন নূতন যুগে উত্তীর্ণ হইয়া ইহার মধ্যে নূতন নূতন উপকরণ সংগৃহীত হয় এবং তাহার ফলেই ইহার কোন অংশেই

জীর্ণতা স্পর্শ করিতে পারে না। সেইজন্য যতদিন কোন সংহত সমাজ-জীবনের মধ্যে লোক-সঙ্গীতের কোনও সুনির্দিষ্ট রূপ প্রচারিত থাকে, ততদিনই ইহা নিজের শক্তিতেই আত্মরক্ষা করিতে পারে; তারপর সমাজ-জীবনের বিবর্তনের অনিবার্য ধারায় যখন ইহা অনাবশ্যক হইয়া পড়ে, তখন আপনা হইতেই তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়; কেহই ইচ্ছা করিলেও ইহাকে আর সমাজ-দেহে রক্ষা করিতে পারে না। এই ভাবেই পল্লী-সঙ্গীত অতি সহজেই পল্লীর সমাজ-জীবনের বিবর্তনের ধারার সঙ্গে যুক্ত হইয়া যায়; সমাজের প্রয়োজনেই ইহার যেমন বিকাশ, সমাজের প্রয়োজনেই তেমনই ইহার বিনাশ। কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিনাশ কদাচ সম্ভব হয় না; কারণ, যে ভাবেই হউক, সমাজ ইহার একটি নিজস্ব রূপ সর্বদাই রক্ষা করিয়া চলে; নাগরিক জীবনে তাহা নানা ভাবে বিপর্যস্ত হইলেও পল্লী-জীবনের সংস্কার তাহা হইতেও সম্পূর্ণ দূর হয় না। সুতরাং ইহার শক্তি ইহার মধ্যে যত ক্ষীণই হউক না কেন, তাহা কখনও সম্পূর্ণ বিনাশ পাইবার নহে। সেইজন্য নাগরিক জীবনের মধ্যে বাস করিয়াও আমরা লোক-সঙ্গীতের কথা বিস্মৃত হইতে পারি না; যে কোন ভাবে ইহার আস্বাদ গ্রহণ করিয়াও আমরা আনন্দ অনুভব করি। আধুনিক কালে নাগরিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত সমাজের মধ্যেও লোক-সঙ্গীতের প্রতি যে প্রীতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ইহাই কারণ। ইহা কেবল আমাদের দেশের পক্ষেই সত্য নহে, মার্কিন দেশের মত আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার প্রতিনিধিও লোক-সঙ্গীত অনুশীলনের জন্য সুগভীর প্রেরণা অনুভব করিয়া থাকে। অথচ গভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে মনে হয়, মার্কিন দেশ পল্লী-জীবনের সংস্কার হইতে বহুদিন হইল মুক্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রত্যেকের মধ্যেই পল্লীর সংহত সমাজ-জীবনের প্রেরণা যে কোন কালেই লুপ্ত হইতে পারে না, ইহা তাহারই প্রমাণ। বিশেষতঃ বাঙ্গালী জাতির সঙ্গীত-সংস্কার অত্যন্ত প্রাচীন, তদুপরি ইহা জাতীয় সংস্কারেরও পরিচয় লাভ করিয়াছে; অতএব সেই বাঙ্গালী জাতির মধ্য হইতে তাহার লোক-সঙ্গীতের প্রতি প্রেরণা কোন দিনই সম্পূর্ণ লুপ্ত হইতে পারে না— সাময়িক ভাবে বিপর্যস্ত হইতে পারে মাত্র। বাংলার লোক-সঙ্গীতের অনুশীলনের ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধের পুনর্জাগরণ যত সহজ, অন্য কোন বিষয়ের ভিতর তাহা তত সহজ নহে; কারণ, ইহার ভিতর দিয়া তাহার নিগূঢ় অন্তরের যোগ স্থাপিত হইয়াছিল।

লোক-সঙ্গীতের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, কোন দেশে কোন কালেই লোক-সঙ্গীত অনুশীলনের কোন বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা থাকে না। কি ভাবে ইহা রচনা করিতে হয়, কি ভাবে ইহাকে স্মৃতিপথে রক্ষা করিতে হয়, কিংবা কি ভাবে ইহার সুর ও তাল শিক্ষা লাভ করিতে হয়, তাহার সুনির্দিষ্ট প্রণালী নাই। যাহারা ইহা আয়ত্ত করে, স্বভাব-দত্ত ক্ষমতার গুণে কেবল মাত্র কানে শুনিয়াই তাহা আয়ত্ত করিয়া থাকে। লোক-সমাজের মধ্যে এই প্রণালীতেই ইহা চিরকাল ধরিয়া প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। সেইজন্য পল্লী-সমাজ হইতে যখন আমরা আজ এক নূতন সমাজ-জীবনের মধ্যে উত্তীর্ণ হইলাম, তখন ইহাকে রক্ষা করিবার কোন বহির্মুখী প্রণালীও অনুসরণ করিতে পারিলাম না। কিন্তু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত অনুশীলনের যে সুনির্দিষ্ট বিধি-ব্যবস্থা আছে, তাহা নূতন নূতন সমাজ-জীবনের মধ্য দিয়াও রক্ষা পাইয়া আসিতেছে; সেইজন্য কয়েক শতাব্দী ধরিয়াও উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের রূপ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত অনুশীলনের রীতি অনুসরণ করিয়া লোক-সঙ্গীতের অনুশীলন সম্ভব হয় না; কারণ, উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। তথাপি এই বিষয়ে অন্য কোন প্রণালীর সন্ধান কাহারও বিদিত নাই বলিয়া এই ক্ষেত্রেও সেই একই রীতি অনুসরণ করিবার প্রয়াস প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। কিন্তু সহজ ভাবে সমাজের মধ্য দিয়া ইহার যে অনুশীলন সম্ভব হইত, তাহার অভাবে ইহার বিষয়ে আজ যাহা হইতেছে, তাহা দ্বারা ইহার যথার্থ পরিচয় লাভ কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না।

এ' কথা সত্য যে, লোক-সঙ্গীত সমাজের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকেরই নিজস্ব রস-বস্তু। তথাপি একই সমাজের অন্তর্ভুক্ত নর-নারীর মধ্যে বয়সের মত জীবনের আচরণেও পার্থক্য আছে। সেই অনুসারে তাহাদের সঙ্গীতও পৃথক্ হইয়া থাকে। সেইজন্য দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কোন বিশেষ প্রকৃতির গীতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশেষ গোষ্ঠী অবলম্বন করিয়াই প্রকাশ পায়। যেমন, কতকগুলি লোক-সঙ্গীত নারী-সমাজের জীবনাচরণের সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত, তাহা পুরুষ কদাচ গান করে না; নারী-সমাজই ইহার রচয়িতা, ইহাই তাহার রক্ষক ও প্রতিপালক; তথাপি বৃহত্তর সমাজ-জীবনের পরিচয় ইহাদের ভিতর দিয়া প্রকাশ পায় বলিয়া পুরুষের সমাজও তাহার রস উপভোগ করিয়া থাকে—বিশেষতঃ ইহাদের মধ্যে যে জীবনের কথাই থাকে, সেই জীবন নারীর হইলেও সেই নারী একই সমাজের অন্তর্ভুক্ত, তাহার অতিরিক্ত কিছু নহে—তথাপি

ইহাদের মধ্যে যে বিশিষ্টতা আছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার যোগ্য। এই ভাবে দেখা যায়, মেয়েলী লোক-সঙ্গীত পুরুষ কদাচ গান করে না ; এমন কি, কুমারী মেয়েদিগের ব্রত-গীতিও বিবাহিতা মেয়েরা গান করে না, অনেক সময় ইহা তাহাদের নিষিদ্ধ (taboo) ; যাহাদের আজ বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহারা যখন অবিবাহিত ছিল, তখন ইহা স্বচ্ছন্দে গাহিয়াছে, কিন্তু বিবাহের পর ইহা তাহাদের নিষিদ্ধ হইয়াছে—সেই জন্য কেবল মাত্র কুমারী-সমাজের স্মৃতিপথ বাহিয়া তাহা আত্মরক্ষা করিয়া থাকে এবং সমাজের অনন্ত কুমারী জীবনের মধ্যে তাহা কদাচ নিরাশ্রিত হইয়া পড়িতে পারে না। তেমনই পটুয়ার গান পটুয়া ব্যতীত, কিংবা বেদের গান বেদে ব্যতীত আর কেহ গাহিবে না ; এই বিষয়ে কোন সামাজিক বিধি-নিষেধ (taboo) না থাকিলেও সমাজের মনে এই সংস্কার অত্যন্ত দৃঢ় যে, যথার্থ অধিকারী ব্যতীত অন্যের নিকট হইতে কোন বিষয় গ্রহণ করিতে নাই। এই ভাবে বাংলার লোক-সঙ্গীতের বিশেষ কোন কোন রূপ এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে। তাহার ফল এই হয় যে, পটুয়ার ব্যবসায় লুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পটুয়ার গানও সমাজ হইতে লুপ্ত হইয়া যায়, কিংবা বেদের গানের মধ্যে যে সর্বকালীন এবং সর্বজনীন আবেদনই থাকুক না কেন, ব্যবসায়ী বেদে ভিন্ন তাহা আর কাহারও পক্ষে পরিবেষণ করা সম্ভব হয় না। এই জন্যই বৃদ্ধ যত সুকণ্ঠই হউক না কেন, কদাচ প্রেম-সঙ্গীত গাহিবে না ; আধ্যাত্মিক সঙ্গীতই তাহার সেই বয়সের অবলম্বন হইবে মাত্র, হিন্দু বিধবাগণও কুমারী ও সধবাদিগের মত ঐহিক আকাঙ্ক্ষামূলক কোন গান গাহিবে না। এই ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী অবলম্বন করিয়া বিশেষ বিশেষ প্রকৃতির লোক-সঙ্গীত গীত হইলেও সাহিত্যের সর্বজনীন আবেদন হইতে ইহারা বঞ্চিত হয় না বলিয়া ইহারা গোষ্ঠীর হইয়াও সমগ্র সমাজের এবং সেই সূত্রেই ব্যষ্টিরও বলিয়া গৃহীত হয়। কারণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী লইয়াই সমাজ দেহ গঠিত হইয়া থাকে। প্রত্যেকটি গোষ্ঠীই সমগ্র সমাজ-দেহের শিরা কিংবা উপশিরার মত ; বিভিন্ন দিক হইতে রস-সংগ্রহ করিয়া ইহারা একই দেহের পুষ্টি সাধন করিতেছে। সেই সূত্রেই ইহারা বিচ্ছিন্ন হইয়াও পরস্পর এক অখণ্ড ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ।

একাগ্র সাধনা দ্বারা উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতে যেমন অধিকার লাভ করা যায়, লোক-সঙ্গীতে তেমন সম্ভব হয় না। অন্ততঃ পল্লী-সমাজে সুদীর্ঘ অনুশীলন দ্বারা

কেহই লোক-সঙ্গীতে দক্ষতা লাভ করে না। একাগ্র ব্যক্তি-প্রতিভা যাহা লোক-সঙ্গীতে অনুশীলন করিবার কিছু নাই। যাহার ভগবৎ-প্রদত্ত সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর এবং প্রখর স্মৃতি-শক্তি আছে, সে অতি সহজেই লোক-সঙ্গীত পরিবেষণ বিষয়ে সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। যাঁহার মধ্যে এই দুইটি বিষয়ের অভাব আছে, তিনি শত চেষ্টা করিয়াও এই বিষয়ে দক্ষতা লাভ করিতে পারেন না। ইহার কারণ, লোক-সঙ্গীতের মধ্যে সূক্ষ্ম অনুশীলনের বিষয় কিছু নাই। ইহার সুর-রূপ ঐতিহ্যের অনুসারী এবং অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও সহজবোধ্য, সুতরাং ইহা সহজেই আয়ত্ত করা সম্ভব। কিন্তু সহজাত উক্ত দুইটি গুণ না থাকিলে তাহা অন্যের নিকট আবেদন সৃষ্টি করিতে পারে না। সংহত সমাজ-জীবনের মধ্যে যাহারা বাস করে, তাহারা লোক-সঙ্গীতের গীত-রীতির সঙ্গে সকলেই পরিচিত। নাগরিক সমাজে ইহা আমাদের শিক্ষা করিবার প্রয়োজন হয়; কারণ, ইহার ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের এখানে কোন পরিচয় নাই; এমন কি, এই প্রকার শিক্ষা দ্বারা ইহা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করাও সকল সময় সম্ভব হয় না। প্রাদেশিক ভাষার বিশিষ্ট উচ্চারণ-রীতি দ্বারা লোক-সঙ্গীতের গীতি-সুর গঠিত হইয়া থাকে, স্বতন্ত্র অঞ্চলের অধিবাসীর পক্ষে বিশিষ্ট কোন প্রাদেশিক উচ্চারণ-রীতি সম্পূর্ণ অধিকার করা সকল সময় সম্ভব হয় না; সুদীর্ঘ অনুশীলন ও একাগ্র সাধনা দ্বারা তাহা আয়ত্ত করিতে হয়। নাগরিক সমাজ দেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক অধিবাসী লইয়াই গঠিত। সুতরাং নাগরিক সমাজে বাস করিয়াও প্রত্যেক অঞ্চলেরই পূর্বতন অধিবাসী যদি উপযুক্ত শিক্ষকের সান্নিধ্য লাভ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার নিজস্ব অঞ্চলের লোক-সঙ্গীতগুলি অনুশীলন করিতে পারেন, তবে তাহার ভিতর দিয়াই তাঁহার পল্লী-জীবনের একটি রস-সংস্কারের সঙ্গে যোগ অব্যাহত থাকিতে পারে। বর্তমান কালে 'গ্রামোদ্যোগ' 'গোষ্ঠী-পরিকল্পনা' 'আঞ্চলিক উন্নয়ন' (Block Development) ইত্যাদি নামে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় পল্লী-উন্নয়নের যে সকল পরিকল্পনা গৃহীত হইতেছে, তাহাদের মধ্যে পল্লী-সঙ্গীত অনুশীলনেরও একটি সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন। কারণ, বাংলার পল্লী-সঙ্গীত চিরকালই বাংলার পল্লী-জীবনের সংহতি রক্ষা করিয়াছে। যন্ত্রের শাসনে সমাজের বিকাশ হয় না, বরং বিনাশ হয়; কিন্তু হৃদয়ের শাসনে সমাজের বিকাশ হয়, পল্লী-সঙ্গীত পল্লীর হৃদয় হইতে উৎসারিত বলিয়া ইহা দ্বারাই বাংলার

সামাজিক জীবনের সকল বিষয়, যেমন ধর্ম, আচার, উৎসব প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। পল্লীর রূপের সঙ্গে ইহার পরিচয় অচ্ছেদ্য। সুতরাং যন্ত্রের সাহায্যে পল্লীর উন্নয়ন যে স্তরেই গিয়া পৌঁছাক, ইহার মধ্যে হৃদয়ের বন্ধন না থাকিলে তাহা শিথিল হইয়া পড়িবে, সমাজ-জীবন বিশিষ্ট রূপ লাভ করিতে পারিবে না। সুতরাং যান্ত্রিক উপকরণ দ্বারা পল্লী-জীবনকে আমরা যতই সমৃদ্ধ করি না কেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহার উপর হৃদয়ের শাসনকে স্বীকার করিয়া লইবার প্রয়োজনেই পল্লী-সঙ্গীতের অনুশীলন বর্তমান যুগেও একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

ভাব, তত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতার জগতে যেমন আমরা গুরুবাদ স্বীকার করি, রসোপলব্ধির জগতে তেমন গুরুবাদ স্বীকার করি না। রস সহজাত গুণ, গুরু-প্রদত্ত বিদ্যা নহে। পল্লীর অধিবাসী মাত্রই পল্লী-সঙ্গীতের রসিক; সেইজন্য লোক-সঙ্গীত গুরুপ্রদত্ত শিক্ষা ব্যতীতই সর্বজনীন হইয়া উঠিতে পারে।

যে জাতির সামাজিক জীবন যত বিচিত্র, তাহার লোক-সঙ্গীতও বিষয়ের দিক দিয়া তত বিচিত্র হইয়া থাকে। এই বিষয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাদেশের একটি পার্থক্য আছে; ইহার গুণেই বাঙ্গালীর লোক-সঙ্গীত বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া যেমন বিচিত্র, তেমনই রসের দিক দিয়াও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বাংলার লোক-সঙ্গীতের বৈচিত্র্য যেমন বিষয়গত, তেমনই ভাবগত। আলোচনার সুবিধার জন্য ইহাদিগকে কতকগুলি অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

বাংলার বিশেষ কতকগুলি লোক-সঙ্গীত দেশের বিশেষ কতকগুলি অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ—ইহাদিগকে আঞ্চলিক কিংবা regional সঙ্গীত বলা যায়। গীতি রূপে ইহাদের মধ্যে এক একটি শাশ্বত আবেদন প্রকাশ পাইলেও, বাংলার এক একটি আঞ্চলিক জীবন আশ্রয় করিয়াই এই শ্রেণীর সঙ্গীত বিকাশ লাভ করিয়াছে—অন্যান্য অঞ্চলে ইহারা প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পশ্চিম বঙ্গের পটুয়া, ভাদু, ঝুমুর; উত্তর বঙ্গের গম্ভীরা, জাগ, ভাওয়াইয়া; পূর্ব বঙ্গে জারি, সারি, ঘাটু, প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। সমস্ত বাংলাদেশ ব্যাপিয়া এই সকল সঙ্গীত প্রচার লাভ করিতে পারে নাই; অথচ এ'কথা সত্য, ইহাদের মধ্য দিয়া যে বিষয় পরিবেষণ করা হইয়া থাকে, সমগ্র বাঙ্গালীর উপরই তাহাদের আবেদন সার্থক হইবার যোগ্য। পটুয়ার গানের

ভিতর দিয়া ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত ও মঙ্গলকাব্যের বিশেষতঃ মনসা-মঙ্গলের কাহিনীই পরিবেষণ করা হইয়া থাকে। সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপিয়াই ইহাদের আবেদন প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যবস্থা বা প্রণালীর ভিতর দিয়া ইহা পরিবেষণ করা হইয়া থাকে, তাহার বিশিষ্টতার জন্য ইহা দেশের নির্দিষ্ট একটি অঞ্চল ব্যতীত প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। পটুয়ার গানের সঙ্গে পটচিত্রাঙ্কন ও ইহার ব্যবসায়ীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে; বিশেষ একটি ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়াই ইহা বিকাশ লাভ করিয়াছে; সেই ঐতিহ্য এই অঞ্চলের সমাজের মধ্যেই বিকাশ ও পুষ্টিলাভ করিয়াছিল, অন্য অঞ্চলে নানা ঐতিহাসিক কারণেই তাহা প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং এই সঙ্গীতও অন্যত্র প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। পশ্চিম বাংলার প্রান্তবর্তী বিশিষ্ট প্রকৃতি ইহার ভাদু-সঙ্গীতের জন্মদাত্রী, বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের প্রকৃতি বা নিজস্ব রূপ ইহা হইতে স্বতন্ত্র। সুতরাং ইহা অন্যত্র প্রচার লাভ করিতে পারিল না। অথচ এ' কথা সত্য যে, ইহার মধ্যে যে গার্হস্থ্য জীবন-রসের আবেদন আছে, তাহা বাঙ্গালীর জীবনে সর্বত্র সত্য। সেইজন্য এই বিষয়ক সঙ্গীতগুলি আঞ্চলিক হইয়াও সামগ্রিক বাঙ্গালী জাতির লোক-সঙ্গীত রূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। এই ভাবে উত্তর ও পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক লোক-সঙ্গীতের মধ্যে যে বহির্মুখী বিশিষ্টতাই প্রকাশ পাক না কেন, ইহাদের মধ্য দিয়া শাশ্বত বাঙ্গালীর নিত্য জীবনের যে প্রতিফলন দেখা যায়, তাহার গুণেই ইহা বাঙ্গালীর জাতীয় লোক-সঙ্গীত রূপে গৃহীত হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। Unity in diversity যে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক্, ইহাদের মধ্য দিয়াও বাঙ্গালীর জাতীয় সংস্কৃতিতে তাহারই পরিচয় প্রকাশ পায়। সেইজন্য একদিক দিয়া যেমন ইহারা আঞ্চলিক, অপর দিক দিয়া তেমনই সমগ্র বাংলার অখণ্ড লোক-সঙ্গীতের অবিভাজ্য অঙ্গ হইয়া আছে।

প্রেম-সঙ্গীত বাংলার লোক-সঙ্গীতের একটি প্রধান অংশ। এক দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, বাংলা লোক-সঙ্গীতের ইহাই সর্বাপেক্ষা ব্যাপক বিষয়। বাংলার প্রেম-সঙ্গীতের কয়েকটি প্রধান বিভাগ; যথা, প্রথমতঃ রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক। এই রাধা কিংবা কৃষ্ণ কেহই ভাগবত হইতে আসেন নাই, ইহারা বাংলারই পঙ্কশেষ পানা পুকুরের ধারে বাঙ্গালীর জীর্ণ কুটিরে জন্মলাভ করিয়াছেন। একটি প্রচলিত কথা এই যে, এদেশে 'কানু ছাড়া গীত নাই।'

অর্থাৎ এ' দেশের সঙ্গীত মাত্রই শ্রীকৃষ্ণের নামাঙ্কিত। ইহা প্রেম-সঙ্গীতের উপরই প্রযোজ্য। এ'কথা সত্য যে, বাংলার যে অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের কিছু প্রভাব স্থাপিত হইয়াছে, সেই অঞ্চলেই কেবল মাত্র রাধাকৃষ্ণের নাম প্রবেশ করিয়াছে, অন্যত্র তাহা হইতে পারে নাই। পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গই প্রধানতঃ বৈষ্ণব ধর্ম দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হইয়াছে; সেইজন্য এই দুই অঞ্চলের প্রেম-সঙ্গীতে রাধাকৃষ্ণের নাম যত শুনিতে পাওয়া যায়, অন্য কোন অঞ্চলে তাহা তত শুনিতে পাওয়া যায় না। উত্তর বঙ্গের প্রেম-সঙ্গীতে ভাওয়াইয়া গান প্রধানতঃ রাধাকৃষ্ণের সম্পর্ক হইতে মুক্ত। রাধাকৃষ্ণের নাম যে কোন সাম্প্রদায়িকতার সূত্রে বাংলার লোক-সঙ্গীতে প্রবেশ করে নাই, তাহার প্রধান প্রমাণ এই যে, মুসলমান কৃষক-সমাজে প্রচলিত লোক-সঙ্গীতের মধ্যেও নায়ক-নায়িকার নাম রূপে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। ইহার কারণ পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ইঁহারা ভাগবত পুরাণের পবিত্র ক্ষেত্র হইতে বাংলার লোক-সঙ্গীতে প্রবেশ করেন নাই; বরং বাংলার গৃহাঙ্গিনার ধূলি মলিন ক্ষেত্র হইতেই তাঁহাদের আবির্ভাব হইয়াছে। বাংলার লোক-সঙ্গীতে যেখানে স্বাধীন প্রেমের কথা আছে, সেখানে রাধাকৃষ্ণের নাম শুনিতে পাওয়া গেলেও দাম্পত্য জীবনের মধ্যেও যে প্রেমের অধিষ্ঠান আছে, সেখানে রাধাকৃষ্ণের পরিবর্তে রামসীতার নাম শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু রামসীতার প্রসঙ্গ বাঙ্গালীর হিন্দু জীবনকেই মাত্র আশ্রয় করিয়াছে, রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর মত সমাজের সকল স্তরে প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। সেইজন্য তাহা সর্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

হর-গৌরীর প্রসঙ্গও বাংলার লোক-সঙ্গীতের একটি ক্ষেত্র অধিকার করিয়া আছে সত্য, কিন্তু তাহার মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর চিরন্তন বাৎসল্য রসেরই বিকাশ হইয়াছে। আগমনী-বিজয়া সঙ্গীতই ইহার প্রধান বিষয়, ইহাও রামসীতা প্রসঙ্গের মত হিন্দু-সমাজের গার্হস্থ্য জীবনের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। সেইজন্য রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গের মত আর কোন প্রসঙ্গ সম্প্রদায় নির্বিশেষে এমন সর্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় নাই।

লৌকিক প্রেম-সঙ্গীতের মধ্যে বিরহ বা নৈরাশ্যের দিকটি যত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, ইহার মিলনের কথা তত জীবন্ত হইতে পারে নাই। প্রেম-সঙ্গীতে মিলনের চরিতার্থতা নাই; বরং তাহার পরিবর্তে বিচ্ছেদের বেদনা

অতলস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে। বাংলার লোক-সঙ্গীতের ইহা একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব।

বাংলার লোক-সঙ্গীতের আর একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে ব্যবহারিক সঙ্গীত বলিয়া উল্লেখ করা যায়। ইহাকে ইংরেজিতে (functional song) বলা হয়। ইহার সুনির্দিষ্ট কতকগুলি প্রয়োগ-ক্ষেত্র আছে, তাহা ব্যতীত ইহাদের ব্যবহার হয় না। বিবাহের গীত ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। পরিবারে বিবাহের অনুষ্ঠান ব্যতীত ইহা কদাচ গীত হয় না, কেবল মাত্র বিবাহ উপলক্ষেই ইহারা গীত হইয়া থাকে। সুদীর্ঘকালের মধ্যেও যদি বিবাহের অনুষ্ঠান না হয়, তথাপি কেবল মাত্র স্মৃতিচর্চার জন্যও ইহারা গীত হয় না। ইহাদের প্রয়োগ-ক্ষেত্র অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইলেও ইহারা বিশেষ বলিষ্ঠ রচনা। পারিবারিক ও দাম্পত্য-জীবনের বিচিত্র সুখ ও আশা ইহাদের ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইয়া থাকে। হিন্দু পরিবারের এই শ্রেণীর সঙ্গীতের সঙ্গে রামসীতার চিত্র প্রবেশ করিলেও মুসলমান পরিবারের অনুরূপ সঙ্গীত মানবিক জীবন রসে পরিপুষ্ট। নারী-সমাজ এই সঙ্গীতের প্রতিপালক, সেইজন্য সুনিবিড় গার্হস্থ্য জীবনের রসে ইহারা সমুজ্জ্বল।

আর এক শ্রেণীর বাংলার লোক-সঙ্গীতকে আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত বলা যায়, ইংরেজীতে ইহাদিগকে calendric song অথবা ritual song বলা হয়। ইহারা বৎসরের মধ্যে নির্দিষ্ট তারিখ কিংবা উপলক্ষ ব্যতীত কদাচ গীত হয় না। যেমন, গাজনের গান গাজনোৎসব ব্যতীত বৎসরের আর কোন সময় শুনিতে পাওয়া যাইবে না। অনেক আঞ্চলিক গীতিও আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত হইতে পারে, তবে আনুষ্ঠানিক গীতি যেমন বাংলার সর্বত্র প্রচলিত, আঞ্চলিক গীতি তেমন নহে, তাহা একই অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

কর্ম-সঙ্গীত বা work song-ও লোক-সঙ্গীতের একটি বিশেষ অংশ। পূর্ব বাংলার সারিগান বা নৌকা বাইচের গান ইহার বিশেষ নিদর্শন। এতদ্ব্যতীত, ধান কাটার গান, ধান ভানার গান, পাট কাটার গান ইত্যাদিও ইহারই অন্তর্ভুক্ত।

বাংলার লোক-সঙ্গীতের একটি প্রধান অংশ ধর্ম-সঙ্গীত। অনেকে ধর্মসঙ্গীতকে লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করেন না ; কারণ, ধর্ম বাংলার লোক-সমাজের উপর সর্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করিতে পারে না। এই

দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক বাস করে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মাচার বিভিন্ন ; সুতরাং একান্তভাবে একটি ধর্মের মতবাদ আশ্রয় করিয়া যে সঙ্গীত রচিত হয়, তাহা সামগ্রিক ভাবে লোক-সমাজের নিকট আবেদন সৃষ্টি করিতে ব্যর্থ হয়। সুতরাং ইহার মধ্যে যে আবেদন সৃষ্টি হয়, তাহা সম্প্রদায়গত বা Sectarian। ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব, নীতি কিংবা দর্শন সাহিত্য নহে। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, জীব-হিংসা পাপ ; সদা সত্য কথা কহিবে—ইহা সাহিত্য নহে, অথচ ধর্মের ভিতর দিয়া চিরকাল এই সকল বাণী প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। বাংলার পল্লীর সহজিয়া তত্ত্বের গান, নাথ ধর্মতত্ত্বের গান, দেহতত্ত্ব, বাউল, মুর্শীদ্যা, মারফতী, শ্যামাসঙ্গীত ইত্যাদি যে বাংলার লোক-সঙ্গীতের এক একটি বিরাট অংশ, ইহাদের মধ্য দিয়াও এক একটি তত্ত্বকথাই প্রচারিত হইতেছে ; কিন্তু বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাদের তত্ত্বকথাগুলি নীরস সূত্র কিংবা সংক্ষিপ্ত-সারের মত প্রকাশ পায় না—বিচিত্র রসমণ্ডিত হইয়া সঙ্গীতের আকারে পরিবেষিত হয়। ধর্মের তত্ত্ব কিংবা দর্শন জীবনকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশ পায়, সাহিত্যও জীবনেরই প্রকাশ ; সুতরাং যেখানে ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সূত্রের পথ পরিত্যাগ করিয়া রসাশ্রিত হইয়া সঙ্গীতের রূপে আত্মপ্রকাশ করে, সেখানে তাহা নিঃসন্দেহে সাহিত্য পদবাচ্য হইবার যোগ্য। হাজার বছরের পুরাণো বৌদ্ধগানগুলি যে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও সাধন-ভজনের কথাই আছে ; সেই সাধন-ভজনের নিগূঢ় রহস্য আজ ইহাদের মধ্য হইতে কিছুই উদ্ধার করা যায় না ; তথাপি ইহারা সরস সঙ্গীতের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল বলিয়া ইহাদের সাহিত্যিক আবেদন এই সুদীর্ঘ দিনের ব্যবধানেও কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বাংলার বাউল গানের ভিতরও যে সুগভীর তত্ত্ব এবং দর্শনের কথা আছে, তাহা বাদ দিলেও ইহার নৃত্য ও সঙ্গীত জাতিধর্ম নির্বিশেষে বাঙ্গালীর মনে যে রস-আবেদন সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়, তাহাতেই ইহার সাহিত্যিক পরিচয় প্রকাশ পায়। বাংলার বাউল, দেহতত্ত্ব, মুর্শীদ্যার গানে যে তত্ত্বকথাই থাকুক, তাহা বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের নিতান্ত পরিচিত গণ্ডীর মধ্য দিয়াই রূপায়িত হইয়া থাকে। সুতরাং বাউলের তত্ত্ব না বুঝিয়াও বাউলের সঙ্গীতের মধ্য হইতে রসাস্বাদন করিতে কোন অন্তরায় সৃষ্টি হয় না। বিশেষতঃ বাংলার ধর্মসঙ্গীতের ভিতর দিয়া যে তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহাও বাঙ্গালীর জীবন-চেতনা হইতে জাত। উচ্চতর

ধর্ম, যথা হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান ধর্ম—তাহাদের অন্তরালেও বাঙ্গালীর একটি নিজস্ব ধর্মবোধ আছে, এখানে প্রায় সকল বাঙ্গালীই একাকার হইয়া আছে; সেইসূত্রে ইহার ভিতর দিয়া বাঙ্গালী মাত্রই এক অখণ্ড ঐক্য অনুভব করিয়া থাকে। যে ধর্মচেতনা ভিত্তি করিয়া বাংলার পল্লীর ধর্ম-সঙ্গীতগুলি প্রধানতঃ রচিত হইয়াছে, তাহা বাংলাদেশের জলবায়ুতেই পুষ্টিলাভ করিয়াছে; সুতরাং এই সূত্রেই ইহা বাঙ্গালীর জাতীয় রসচেতনার সঙ্গে ঐক্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই গুণে বাংলার ধর্মসঙ্গীতগুলি যেমন জাতীয় চেতনার বাহন, তেমনি সাহিত্যিক মর্যাদা লাভেরও অধিকারী। ইহাদের রচনার মধ্য দিয়া তত্ত্বকথা কিংবা দার্শনিক চিন্তা প্রকাশ করিবার নীরস রীতি অনুসরণ করা হয় না; বাংলা সঙ্গীত রচনার যাহা বৈশিষ্ট্য, আনুপূর্বিক তাহাই ইহাদের রচনার ভিতর দিয়াও প্রকাশ পায়। কিন্তু একটি বিষয়ে সাধারণ লোক-সঙ্গীতের সঙ্গে ইহাদের পার্থক্য কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। ক্রমপরিবর্তনের ভিতর দিয়া বিকাশ লাভ করাই লোক-সঙ্গীতের ধর্ম। পরিবর্তনের ভিতর দিয়া ইহার প্রাণশক্তি রক্ষা পায়, কখনও ইহা নির্জীব হইয়া পড়িবার অবকাশ পায় না। বিশেষতঃ ইহাতে যুগোচিত পরিমার্জনা স্বীকৃত হয় বলিয়াই ইহা লোক-সমাজের নিকট কখনও প্রাচীন কিংবা অনুপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয় না। কিন্তু ধর্ম-সঙ্গীতগুলি লোক-সঙ্গীতের পরিবর্তনের এই নিয়ম কিছুতেই স্বীকার করে না। ইহাদের একটি আচারগত (ritual) মূল্য থাকে বলিয়া ইহাদিগকে কেহই পরিবর্তন করিতে পারে না। যে সকল ধর্ম-সঙ্গীতের কথা উপরে উল্লেখ করিলাম, তাহা প্রায় সকলই গুরুর নিকট হইতে শিষ্য শিক্ষা লাভ করে এবং কেবল মাত্র গুরুশিষ্য-পরম্পরায় অগ্রসর হইয়া থাকে। গুরুর শিক্ষা শিষ্য সতর্ক হইয়া রক্ষা করে, কাজেই তাহা পরিবর্তিত কিংবা বিকৃত করিতে পারে না। সুতরাং লিখিত সাহিত্যের মত তাহা অচিরেই অপরিবর্তনীয় (rigid) হইয়া যায়। সেইজন্য লোক-সঙ্গীত ক্রমবিকাশ লাভ করিলেও ধর্ম সঙ্গীত কদাচ ক্রমবিকাশ লাভ করে না, ইহার একটি অবিচল আদর্শ ভক্ত সম্প্রদায়ের নিকট স্থির হইয়া থাকে; ক্রমবিকাশ লাভ না করিবার ফলেই তাহা ক্রমে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। লোক-সঙ্গীত ক্রমবিকাশের ধারায় যুক্ত হইয়া লোক-সমাজের মধ্য দিয়া বিকাশ লাভ করিতে করিতে অগ্রসর হয়, তারপর পল্লীর সমাজ-ব্যবস্থা যখন শিথিল হইয়া যায়, তখনই তাহার বিনাশ অনিবার্য হইয়া উঠে। কিন্তু যতদিন

পল্লীসমাজের সংহতি বিনষ্ট না হয়, ততদিন লোক-সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ অব্যাহত থাকে।

যাহাই হউক, তথাপি এ' কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বাংলার ধর্ম-সঙ্গীত বাংলার লোক-মানসের (folk mind) একটি বিশেষ পরিচয় প্রকাশ করে। ইহা ক্রমপরিবর্তনের ধারার সঙ্গে যুক্ত না হইলেও ইহাদের বহিরঙ্গে যে রস-পরিচয় ব্যক্ত করে, তাহার মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর লোক-জীবনের সংস্কার অস্পষ্ট হইয়া থাকে না। সুতরাং ইহাদিগকে বাংলার নিজস্ব ধর্মীয় লোক-সঙ্গীত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়।

সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বন করিয়াও লোক-সঙ্গীত রচিত হইয়া থাকে, কিন্তু সাময়িক সাহিত্যের মত ইহাদের মূল্যও সাময়িক মাত্র। সেইজন্য ইহারা কতকটা আঞ্চলিক লোক-গীতির রূপ লাভ করে। কিন্তু আঞ্চলিক গীতির মধ্যে যে সাহিত্যগুণ প্রকাশ পায়, সাময়িক ঘটনামূলক গীতির মধ্যে সেই গুণ প্রায়ই থাকে না। সাময়িক ঘটনার স্মৃতি সমাজ-মানসে যতই অস্পষ্ট হইয়া যায়, তাহা অবলম্বন করিয়া রচিত সঙ্গীতগুলিও ততই অপ্রচলিত হইতে থাকে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত তাহাদের স্মৃতি স্পষ্ট হইয়া থাকে, ততদিন ইহাদের মত জনপ্রিয়তা আর কোন সঙ্গীতই লাভ করিতে পারে না।

দুই

বাংলার লোক-সঙ্গীতের বৈচিত্র্যের কারণ

অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলার লোক-সঙ্গীতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে যে পরিমাণ রূপ ও বিষয়গত বৈচিত্র্য দেখা যায়, অন্যত্র তাহা দেখা যায় না। সমগ্র হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলে লোক-সঙ্গীতে যে সকল বিষয় অবলম্বন করা হইয়াছে, বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চল আয়তনে তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে ব্যবহৃত বিষয়ের সংখ্যা তাহার তুলনায় অনেক বেশী। ইহার কতকগুলি নিগূঢ় কারণ আছে, তাহা এখানে উল্লেখ করিতে পারি।

প্রত্যেক দেশেরই জাতীয় চরিত্র যেমন তাহার নিজস্ব প্রাকৃতিক পরিবেষকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠে, তেমনই লোক-সঙ্গীতও প্রধানতঃ দেশের প্রত্যক্ষ প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াই বিকাশলাভ করে। বাংলা দেশের প্রকৃতি ইহার সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল ব্যাপিয়া যে এক, তাহা নহে,—ইহা কোথাও নদনদীবিধৌত, কোথাও অরণ্যাকীর্ণ, কোথাও নীরস প্রস্তরভূমি, কোথাও বা তরাই অঞ্চল। একই বাংলাভাষার মধ্য দিয়া এই জাতির মধ্যে যে ঐক্যই গড়িয়া উঠুক, এই বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেষের মধ্যবর্তী হইয়া ইহার জীবনাচরণে যে কোন অখণ্ড ঐক্য গড়িয়া উঠিতে পারে নাই, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অথচ সমগ্র হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলের কথাই যদি ধরি, তাহা হইলেও দেখিতে পাই যে, উত্তর ভারতের গঙ্গার সমগ্র উপত্যকাভূমি ব্যাপিয়া প্রকৃতির কোন বৈচিত্র্য নাই; সুতরাং জীবন যেমন সেখানে বৈচিত্র্যপূর্ণ হইয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই, তেমনই ইহার ধ্যান-ধারণা, চিন্তা ও কর্মের মধ্যেও বৈচিত্র্য সৃষ্টি হইতে পারে নাই। উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকার দক্ষিণ-ভাগ, যেখানে বিন্ধ্য পর্বতমালা ভারতবর্ষকে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছে, সেখানকার অধিবাসীদিগের জীবনাচরণের সঙ্গে ইহার উত্তর কিংবা দক্ষিণ ভাগের সমতলভূমির অধিবাসীর জীবনের যোগ নাই। সেইজন্য ইহাদের লোক-সংস্কৃতির ইতিহাস স্বতন্ত্র। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ছোটনাগপুরের মালভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া নর্মদা ও গোদাবরীর উপত্যকা ভূমি ব্যাপিয়া প্রকৃতির যে একটি অখণ্ড রূপ দেখা যায়, তাহা আশ্রয় করিয়াও এই অঞ্চলের অধিবাসীর মধ্যে যে লোক-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাও যে

বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ, তাহা বলিবার উপায় নাই। এমন কি, তাহা হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চল অপেক্ষাও বৈচিত্র্যহীন। ইহার কারণ, এই বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপিয়া প্রকৃতির একটিমাত্র বিশিষ্ট রূপ চোখে পড়িলেও তাহার মধ্যে বৈচিত্র্য চোখে পড়ে না। পর্বত এবং অরণ্যই ইহার রূপ, ইহার মধ্যে জীবন যত কঠিনই হউক, তাহাতে কোন বৈচিত্র্য নাই; ইহার জীবন-সংগ্রামের যে ধারা, তাহা সর্বত্রই এক। সেইজন্য ইহাতেও প্রধানতঃ অভিন্ন প্রকৃতির লোক-সাহিত্যই গড়িয়া উঠিয়াছে।

বাংলা দেশ প্রধানতঃ নদীমাতৃক দেশ হইলেও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের নদনদীগুলির প্রকৃতিতে পার্থক্য আছে। পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরীর যে রূপ, তিস্তা, করতোয়া, কংসাই কিংবা দামোদর, রূপনারায়ণ, ময়ুরাক্ষীর সেই রূপ নহে। ভাগীরথী, মধুমতী, ইছামতী, ভৈরব ইত্যাদির রূপও পূর্বোক্ত দুই শ্রেণীর নদনদী হইতে স্বতন্ত্র। সুতরাং নদনদীর সঙ্গে নানাভাবে সমাজের যে যোগ স্থাপিত হইয়া থাকে, তাহা বাংলা দেশের সর্বত্র অভিন্ন পরিচয় লাভ করিতে পারে নাই। সেই অনুসারেই এই সকল অঞ্চলে জীবনধারা যে ভাবে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার লোক-সাহিত্যও সেই ভাবেই বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে, এক অখণ্ড পরিচয় লাভ করিবার অবকাশ পায় নাই।

সমগ্র হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলে ভজন গানের এক ব্যতীত দুইটি সুর শুনিতে পাওয়া যায় না; এমন কি, সাঁওতাল পরগণা, ছোটনাগপুর হইতে আরম্ভ করিয়া নর্মদা-গোদাবরী উপত্যকা দিয়া পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সীমা পর্যন্ত সমগ্র আদিবাসী অঞ্চলে ঝুমুর গানেরও একই অভিন্ন সুর শুনিতে পাওয়া যায়। অথচ এই আদিবাসী অঞ্চলের সর্বত্রই ভাষা অভিন্ন নহে—এই বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপিয়া অষ্ট্রীক, দ্রাবিড় ও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার বিভিন্ন শাখা ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু তথাপি ইহাদের মধ্যে লোক-সঙ্গীতের সুরগত বৈচিত্র্য যেমন নাই, তেমনই বিষয়গত কোনে বৈচিত্র্যও দেখা যায় না। কিন্তু এক বাংলা দেশেরই পশ্চিম-উত্তর এবং পূর্বাঞ্চলের লোক-সঙ্গীতের বিষয় ও সুরের দিকে লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, ইহাদের মধ্যে একটি অখণ্ড ঐক্য গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোক-সঙ্গীতের মৌলিক ভিত্তি ঝুমুর, উত্তর বাংলার ভাওয়াইয়া, পূর্ববাংলার ভাটিয়ালি ও দক্ষিণ বাংলার সারি, ইহাদের প্রত্যেকেরই এমন এক একটি স্বাতন্ত্র্য আছে যে, তাহা দ্বারা ইহারা পরস্পর পরস্পর হইতে

বিচ্ছিন্ন। ইহাদের প্রত্যেকেরই বিশিষ্ট গুণগুলি এই সকল বিভিন্ন অঞ্চলের বিশিষ্ট প্রাকৃতিক পরিচয়কে আশ্রয় করিয়াই বিকাশ লাভ করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, যতদিন পর্যন্ত ইহাদের প্রাকৃতিক পরিচয় অপরিবর্তিত থাকিবে, ততদিন তাহাদের অন্তর্গত লোক-সাহিত্যেরও কোন পরিবর্তন সাধিত হইতে পারিবে না।

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃতিক পরিবেষের বিভিন্নতার কথা বাদ দিলেও ইহার আরও একটি বিষয়ে যে বৈচিত্র্য আছে, তাহার ফলেও এদেশের লোক-সাহিত্যে বিষয়গত বৈচিত্র্য সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার কথা এখানে উল্লেখ করিতে পারি। বাংলাদেশের প্রতিবেশী রূপে যে সকল বিভিন্ন ভাষাভাষী আদিম জাতি এখনও বাস করে, তাহারা মূলতঃ বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত, ইহাদের জীবনধারাও সেই অনুযায়ী পরস্পর স্বতন্ত্র। বাংলার চতুঃসীমান্তবর্তী লোক-সাহিত্যের উপর ইহাদের যে কেবল বাহ্য প্রভাবই অনুভব করা যায়, তাহাই নহে—অনেক সময় ইহার অন্তঃপ্রকৃতি ইহাদের জাতীয় জীবনের রসোপকরণ দ্বারাই গঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের বহু প্রদেশেই আদিবাসীর অস্তিত্ব আছে সত্য, কিন্তু তাহাদের সঙ্গে বাংলা দেশের প্রতিবেশী কিংবা অধিবাসী আদিবাসীদিগের একটি পার্থক্য এই যে, বাংলাদেশে ইহাদের জাতিগত সংখ্যাই যে কেবল অধিক, তাহাই নহে—বাংলা-ভাষা ও বাঙ্গালীর সংস্কৃতি দ্বারা ইহারা এখানে নিজেরাও প্রভাবিত হইয়াছে। ভারতীয় বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার আদিবাসীর সংখ্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আসামে এক ইন্দো-মোঙ্গলয়েড্ জাতি ভিন্ন অন্য কোন আদিম জাতি নাই। বিশেষতঃ ইহারা সেখানে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে সক্ষম হইয়াছে—অসমীয়া ভাষা কিংবা অসমীয়া সংস্কৃতি দ্বারা ইহারা আদৌ প্রভাবিত হয় নাই। বিভিন্ন জাতির জীবনধারা হইতে পরস্পর উপকরণ বিনিময় করিয়া যেমন জাতীয় সংস্কৃতি ও সংহতি গড়িয়া উঠে, আসামে তাহা হইবার সুযোগ হয় নাই। ইহাতে এক দিক দিয়া ইন্দো-মোঙ্গলয়েড্ জাতির কয়েকটি শাখা এবং অপর দিক দিয়া একটি প্রতিবেশী ইন্দো-ইউরোপীয়, জাতির সংস্কৃতির প্রভাবের ফলেই আধুনিককালে একটি সাংস্কৃতিক জীবন গড়িয়া উঠিবার প্রয়াস পাইতেছে। বিহারে ইন্দো-ইউরোপীয়, অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী বিভিন্ন জাতি বাস করা সত্ত্বেও ছোটনাগপুর পরগণা আশ্রয় করিয়া আদিবাসী-সমাজ একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক জীবন গড়িয়া তুলিয়াছে—উত্তর বিহারের হিন্দীভাষীদিগের সহিত

ইহার কোন যোগ নাই। উড়িষ্যাতেও যে সকল দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক ভাষাভাষী উপজাতি বাস করে, তাহাদের সঙ্গেও ওড়িয়া কিংবা অন্যান্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষীদিগের সাংস্কৃতিক যোগ নাই। যেখানে ভাষার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা পায়, সেখানে সাংস্কৃতিক যোগ গড়িয়া উঠিতে পারে না।

উপরে বাংলা দেশের যে তিনটি প্রতিবেশী প্রদেশের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহাদের সঙ্গে তুলনায় বাংলাদেশের ইতিহাস স্বতন্ত্র। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কিংবা ইহার কোন অংশে বাস করিয়াও আসাম, বিহার কিংবা উড়িষ্যার মত কোন জাতি নিজের ভাষা ও সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারে নাই। উক্ত তিনটি প্রদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভিন্ন ভাষা ও সাংস্কৃতিক জীবন যেমন অনেক সময়ই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া টিকিয়া আছে, বাংলা দেশে তাহা সম্ভব হয় নাই। ইহার অর্থ এই নহে যে, এ'দেশে কোনকালেই ভারতীয় আদিবাসীর কোন শাখারই অস্তিত্ব ছিল না; প্রকৃত কথা এই যে, অন্যান্য প্রদেশের মত ইহাতেও প্রাচীনতম কাল হইতেই মানবজাতির বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন দিক হইতে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে, তারপর ক্রমে ক্রমে তাহারা অন্যান্য প্রদেশের আদিবাসীর মত পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া না থাকিয়া বাঙ্গালীর একটি বৃহত্তর সমাজ-জীবনের মধ্যে একাকার হইয়া গিয়াছে। বাংলাদেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীর আকৃতি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বিশিষ্ট আদিম জাতির রক্তের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহারা আজ এমনভাবে এদেশের সঙ্গে মিশিয়া আছে যে, আপাতদৃষ্টিতে তাহাদের মধ্যে বিজাতীয়তা কিছুই অনুভব করা যায় না। বিভিন্ন, এমন কি, বিপরীতধর্মী সাংস্কৃতিক উপকরণের মধ্য দিয়া স্বাঙ্গীকরণের কাজ বাংলাদেশের সমতলভূমিতে যত সহজে সম্ভব হইয়াছে, ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে তাহা তত সহজে সম্ভব হয় নাই। ইহাদের প্রত্যেকটি অধুনাবিস্মৃত জাতির সাংস্কৃতিক উপকরণগুলিকে স্বাঙ্গীকরণ করিয়া বাংলার লোক-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া ইহার মধ্যে এত বৈচিত্র্য দেখা যায়। যদি স্বাঙ্গীকরণের পরিবর্তে কেবলমাত্র পরিবর্জনের নীতি গ্রহণ করা হইত, তাহা হইলে এদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে এত বৈচিত্র্য দেখা দিতে পারিত না।

বাংলার প্রতিবেশী রূপে যে সকল আদিবাসী এখনও বাস করে, তাহাদের মধ্যে যে জাতিগত বৈচিত্র্য দেখা যায়, ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশের মধ্য

ভাগেই হউক, কিংবা তাহার প্রতিবেশী রূপেই হউক, এত অধিক বিভিন্ন জাতির আদিবাসী বাস করিতে দেখা যায় না। এই সব বিভিন্ন প্রকৃতির আদিবাসী সমাজের এক কিংবা একাধিক অংশে বাঙ্গালীর সঙ্গে নানাভাবে যোগস্থাপন করিয়া বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনে যেমন নিজেদের কিছু কিছু উপকরণ উপহার দিয়াছে, তেমনই বাঙ্গালীর নিকট হইতেও বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহাদের নিজেদের সাংস্কৃতিক জীবনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে। বাংলার লোক-সাহিত্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হইবার ইহা একটি প্রধান কারণ। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি একটু স্পষ্ট করিয়া দেওয়া যাক্।

বাংলা দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে কয়েকটি উপজাতি বাংলা ভাষা গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালীর জীবন দ্বারা নানাভাবে যেমন প্রভাবিত হইয়াছে, তেমনই ইহাদের সাংস্কৃতিক উপকরণ দ্বারাও সেই অঞ্চলের বাঙ্গালী সমাজকে নানাভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুইটি উপজাতিই প্রধান, একটির নাম লোধা ও অপরটির নাম শবর। উড়িষ্যার যে বিভিন্ন উপজাতি এখনও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া বসবাস করে, ইহারা তাহাদেরই অংশ, নানা কারণে মূল শাখা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া বাঙ্গালী সমাজের প্রতিবেশী রূপে দীর্ঘকাল যাবৎ বাস করিবার ফলে বাঙ্গালী ও ইহাদের মধ্যে কালক্রমে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ঘটিয়াছে। ইহাদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক উপাদানের আদান-প্রদানের ফলে বাংলার এক আঞ্চলিক সংস্কৃতি পুষ্টিলাভ করিয়াছে। সুতরাং এই অঞ্চলের লোক-নৃত্য কিংবা লোক-সঙ্গীত যখন বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তখন তাহাতে কেবলমাত্র বাঙ্গালী জীবনের প্রভাবই অনুভব করা যায় না, একটি আদিবাসী জাতির মৌলিক উপকরণগুলিও তাহাতে স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই দুইটি উপজাতিই মূলতঃ কৃষিজীবী; বাঙ্গালীর সংস্কৃতি কৃষি-জীবনের উপরই ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে; সুতরাং একটি অভিন্ন সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবন অবলম্বন করিয়া এখানে একটি অভিন্ন প্রকৃতির সংহত সমাজ-জীবন গড়িয়া উঠিবার সুযোগ হইয়াছে। সমাজ-জীবনের এই সংহতির উপরই এখানে লোক-সঙ্গীত একটি বিশিষ্টরূপ লাভ করিতে পারিয়াছে।

কিন্তু এই অঞ্চলের ইতিহাস এখানেই শেষ হইয়া যায় নাই। আদিবাসী এবং বাঙ্গালী লোক-জীবনের মিলিত-রূপের উপর একদিন উড়িষ্যার হিন্দু-সংস্কৃতির প্রভাব এখানে বিস্তার লাভ করিবার সুযোগ হইয়াছিল। আদিবাসী এবং

বাঙ্গালীর এই মিশ্র একটি সমাজের উপর যখন উড়িষ্যা হইতে হিন্দু-সংস্কৃতির প্রভাব আসিয়া বিস্তৃতি লাভ করিল, তখন পূর্ববর্তী সমাজ-জীবনের মূল উৎপাটন করিয়া যে তাহা প্রতিষ্ঠা লাভ করিল, তাহা নহে; ইহার ভিত্তির উপরই তাহা আসিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। তাহার ফল এই হইল যে, এখানে সংস্কৃতির কতকগুলি বিভিন্ন উপকরণ একাকার হইয়া গেল। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপকরণের একীকরণের দ্বারা সংস্কৃতির শক্তি বৃদ্ধিই পায়, হ্রাস পায় না। মণিপুর ইহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। মণিপুরে একদিকে নাগাজাতির আদিম সংস্কৃতি এবং অপরদিকে ব্রহ্মদেশের সংস্কৃতি ও বাংলাদেশ হইতে আগত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সংস্কৃতি, ইহাদের সংমিশ্রণ হইয়াছে। এখানে কোন কিছুই পরিত্যক্ত হয় নাই। আদিম নাগাজাতির সংস্কৃতির ভিত্তির উপর ব্রহ্মদেশীয় রাজত্বকালে ব্রহ্মদেশীয় সংস্কৃতি যেমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তেমনই বাংলাদেশ হইতে শ্রীহট্ট-কাছাড়ের পথে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের যুগে বৈষ্ণব ধর্মের উপকরণ গিয়াও প্রভাব স্থাপন করিয়াছে। এই তিন বিভিন্ন প্রকৃতির সাংস্কৃতিক উপকরণের সংমিশ্রণের ভিতর দিয়াই মণিপুরী সমাজ-জীবনের বিকাশ হইয়াছে। সেইজন্য মণিপুরী নৃত্য, বাদ্য, সঙ্গীত ইত্যাদি ভারতীয় লোক-সংস্কৃতির বিশিষ্ট উপাদান হইতে পারিয়াছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের লোক-সংস্কৃতি যে এতখানি শক্তিলাভ করিতে পারে নাই, তাহার কারণ, আদিম নাগাজাতির মৌলিক জীবন-সংস্কারে যে প্রাণশক্তি (vitality) ছিল, উক্ত অঞ্চলের লোধা-শবর জাতির তাহা ছিল না; ইহাদের প্রকৃতিতে কোন পার্থক্য নাই। এই ভাবেই লোক-সংস্কৃতির পুষ্টি হইয়া থাকে, ইহার ব্যতিক্রম অর্থাৎ বিভিন্ন জাতির সঙ্গে সংমিশ্রণের অভাবে একান্ত আত্মকেন্দ্রিক জাতি সমূহের সংস্কৃতির বিনাশ অনিবার্য হইয়া উঠে।

উড়িষ্যার হিন্দু-সংস্কৃতির সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে বাংলার উক্ত দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের সামাজিক জীবনে যে বিভিন্ন লোক-সংস্কৃতির উপকরণ বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে চিত্রিত পট অন্যতম। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি মাত্র অংশে উদ্ভব এবং বিকাশ লাভ করা সত্বেও ইহার পটুয়া সঙ্গীত যেমন বাংলা লোক-সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট অঙ্গরূপে গণ্য হইয়াছে, তেমনই চিত্রিত পটও এদেশের লোক-শিল্পেরই একটি বিশিষ্ট নিদর্শনরূপে গণ্য হইয়া থাকে। ইহা পশ্চিম সীমান্ত-বাংলার বিভিন্ন অংশে প্রচার লাভ

করিয়াছে, পূর্ববঙ্গে ইহার একটি বিশিষ্ট রূপ প্রচলিত আছে। ইহার সঙ্গীতাংশ লোক-সাহিত্য এবং চিত্রাংশ লোক-শিল্প। ইহাতে পুরাণকে নিজস্ব আদর্শ অনুযায়ী ইচ্ছামত পুনর্গঠন করিবার যে অনাচার দেখা যায়, তাহা আদিম সমাজের প্রভাবজাত। দেবদেবীকে নিজস্ব গার্হস্থ্য জীবনের পরিবেষের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিবার যে প্রবৃত্তি ইহাতে আছে, তাহা বাঙ্গালীর জাতীয় ধর্মবোধজাত এবং কাহিনীর মৌলিক প্রেরণা উড়িষ্যার হিন্দুধর্মের প্রভাবজাত। তিনদিক হইতে ইহা প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও, ইহা এই অঞ্চলের একটি অখণ্ড রস-বস্তু রূপে পরিণতি লাভ করিবার পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি হইতে পারে নাই। বাঙ্গালীর লোক-সমাজের ইহা একটি চিরকালীন বৈশিষ্ট্য।

বাংলার পশ্চিম প্রান্তবর্তী আর একটি অঞ্চলের কথা এখানে উল্লেখ করা যাক। বীরভূম জেলার উত্তর পশ্চিম এবং পশ্চিম অঞ্চলে দুইটি সমৃদ্ধ আদিবাসী জাতির বাস, ইহারা গোড্ডা মহকুমার অন্তর্গত রাজমহল পাহাড়ের অধিবাসী সৌরিয়া পাহাড়িয়া জাতি ও সাঁওতাল পরগণার নিম্নভূমির অধিবাসী সাঁওতাল জাতি। সৌরিয়া পাহাড়িয়া জাতির ভাষা দ্রাবিড় এবং সাঁওতাল জাতির ভাষা অষ্ট্রীক্ জাতীয়। সৌরিয়া পাহাড়িয়াকে মালে বলা হয়। ইহারই একটি শাখা বাংলা ভাষা গ্রহণ করিয়া মাল পাহাড়িয়া বলিয়া পরিচিত। ইহারা মালে জাতিরই প্রতিবেশী। কিন্তু মাল নামক আর একটি বাংলা-ভাষাভাষী জাতি সাঁওতাল পরগণা ও বীরভূম জেলার সমতলভূমির অধিবাসী হইয়া কৃষিবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে। ইহারা যে দ্রাবিড়-ভাষী মালে জাতিরই বংশধর, বর্তমানে বাঙ্গালীর ভাষা এবং বাঙ্গালী কৃষকের জীবন-ধারা গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালী সমাজের মধ্যে একাকার হইয়া বাস করিতেছে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ইহারা এদেশের সমতলভূমির যখন অধিবাসী হইল, তখন তাহাদের পার্বত্য জীবনের সংস্কার সম্পূর্ণ বিসর্জন দিল না, বাংলার জীবনের সঙ্গে মিশিয়া ইহার মধ্যে তাহা সঞ্চারিত করিয়া দিল। ইহাদের প্রতিবেশী এবং বাংলার অধিবাসী সাঁওতাল জাতিও তাহাই করিল। ইহার ফলে বীরভূম জেলার সমতলভূমিতেও তিনটি সংস্কৃতির সংমিশ্রণ হইল— প্রথম বাঙ্গালীর জাতীয় সংস্কার, দ্বিতীয়তঃ দ্রাবিড় ভাষী পার্বত্য মালে জাতির সংস্কার এবং কৃষিজীবী অষ্ট্রীক-ভাষী সাঁওতাল জাতির সংস্কার। কারণ, সাঁওতাল জাতিও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে ক্রমে অগ্রসর হইয়া বীরভূম

জেলার মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে এবং বাংলা ভাষা গ্রহণ করিয়া সাধারণ বাঙ্গালী জীবনের সঙ্গে একাকার হইয়া বসবাস করিতেছে, ইহাদের মধ্যেও পরস্পর সাংস্কৃতিক আদান প্রদান হইয়াছে। এই তিনটি বিভিন্নমুখী সংস্কৃতির একত্র স্বাঙ্গীকরণের ফলেই বীরভূম জেলাতেও বাংলার লোক-সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট রূপ ধরা পড়িয়াছে। সাহিত্যে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, শিল্পকলায় ইহার বিচিত্র বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। স্বর্গত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় এই অঞ্চল হইতেই বাঙ্গালীর লোক-সংস্কৃতির সমৃদ্ধতম উপকরণের সন্ধান পাইয়াছিলেন। মনসার জাত, ঝুমুর, কীর্তন ও বাউলের গানে, রায়বেঁশে, ঢালী, ভাঁজো ও কাঠি নৃত্যে, মৃৎপট ও গৃহচিত্রশিল্পে, সেলাই এবং বুনানির কর্মে এই অঞ্চল বাংলার লোক-সংস্কৃতিতে এক বিস্ময়কর অধ্যায় সংযোজনা করিয়াছে। ইহা কেবল মাত্র জাতি বিশেষের দান নহে, তাহা হইলে ইহার মধ্যে এত বৈচিত্র্য প্রকাশ পাইত না, ইহা বিভিন্ন জাতির সমবেত দান বলিয়াই এত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে।

এইবার বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল হইতেও দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। পশ্চিম বাংলার বীরভূম জেলার মত উত্তর-পূর্ব বাংলার মৈমনসিংহ জেলাও লোক-সাহিত্যের দিক দিয়া বিশেষ সমৃদ্ধ; এমন কি, সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে এই বিষয়ে ইহাকেই যদি সমৃদ্ধতম অঞ্চল বলিয়া উল্লেখ করা যায়, তাহা হইলেও ভুল হইবে না। এই অঞ্চল হইতেই 'মৈমনসিংহ গীতিকা' 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামক লোক-সাহিত্যের এক বিশেষ সম্পদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; বাংলার একমাত্র উপকথা (animal tales) সংগ্রহ 'টুনটুনির বই' স্বর্গত উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী কর্তৃক এই অঞ্চল হইতেই সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া এই অঞ্চল হইতে যে কত লোক-সঙ্গীত, প্রবাদ, ছড়া ও পুরাকাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহার কারণ কি?

দেখা যায় যে, এই অঞ্চলেও আদিবাসীর সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙ্গালী সংস্কৃতির সংমিশ্রণ হইয়াছে। মৈমনসিংহ জেলার উত্তর ভাগে গারো পাহাড়ের উপর গারো নামক এক প্রবল মাতৃতান্ত্রিক ইন্দো-মোঙ্গলয়েড্ জাতির বাস। ইহাদের এক অংশ হাজং নাম গ্রহণ করিয়া মৈমনসিংহ জেলার উত্তর ভাগের সমতল ভূমিতে বসবাস করিতেছে; বাংলাভাষা এখন তাহাদের মাতৃভাষা; বাঙ্গালীর আচার যেমন তাহারা গ্রহণ করিয়াছে, তেমনই নিজেদের আচার-বিচার এবং

সাংস্কৃতিক উপকরণ দ্বারা বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিতেছে। এই অঞ্চলের সংলগ্ন পূর্বাঞ্চলে খাসিয়া ও জয়ন্তী পাহাড়। তাহাতেও খাসি নামক মাতৃতান্ত্রিক এক ইন্দো-মোঙ্গলয়েড্ জাতি বাস করে। তাহাদের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রভাবও এই অঞ্চলের সাধারণ জনসমাজের উপর বিস্তার লাভ করিয়াছিল। প্রাচীনকালে এই অঞ্চল আসামের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া ইহার সঙ্গে আসামের বিভিন্ন ইন্দো-মোঙ্গলয়েড্ জাতির সম্পর্ক যত নিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল, বাংলার কেন্দ্রীয় সংস্কৃতির যোগ তত নিবিড় হইয়া উঠিবার সুযোগ পায় নাই। বিশেষতঃ এই অঞ্চলের সাধারণ অধিবাসী মূলতঃ বোড়ো নামক ইন্দো-মোঙ্গলয়েড্ জাতির শাখা-ভুক্ত ছিল। ইহার উপর কালক্রমে যখন একদিক দিয়া হিন্দু-সংস্কৃতি এবং অপর দিক দিয়া মুসমলান-সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করিল, তখন এখানেও আদিম জাতির সংস্কৃতির সঙ্গে ইহাদের সাংস্কৃতিক উপকরণের সংমিশ্রণ হইল। এই সংমিশ্রণের মধ্য দিয়াই স্বাঙ্গীকরণও সহজ হইয়া আসিল। ফলে বাংলার লোক-সঙ্গীত এখানে এক বিচিত্র পরিণতি লাভ করিল। এই অঞ্চলের প্রকৃতির একটি বিশেষ রূপ আছে, ইহার লোক-সঙ্গীতের মধ্যে ইহার সেই বিশেষ রূপটি বিধৃত হইয়াছে। এই অঞ্চলের বিশিষ্ট লোক-সঙ্গীত জারি গান ও ঘাটু গান। উভয়েই নৃত্য-সম্বলিত সঙ্গীত। জারি নৃত্যের মধ্যে আসামের আদিবাসী নৃত্যের রূপটি ধরা পড়ে। মুসলমান সমাজের হাতে পড়িয়া জারি গান এখন মুসলমান ধর্মের কাহিনী-বিষয়ক সঙ্গীতে পরিণত হইলেও ইহাতে আসামের অন্যান্য ইন্দো-মোঙ্গলয়েড্ জাতির সামাজিক অনুষ্ঠানের পরিচয় অস্পষ্ট হইয়া নাই।

বাংলাদেশের দক্ষিণ ও পূর্ব-দক্ষিণ অংশে বিভিন্ন সময় সমুদ্রচারী বিভিন্ন জাতি যে বসতি স্থাপন করিয়াছে, তাহাদের লোক-সাহিত্যে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। চট্টগ্রাম নোয়াখালির সমুদ্রতীর কিংবা পদ্মা-মেঘনার উপত্যকার লোক-সঙ্গীতে ইহাদের প্রভাব আজও স্পষ্ট অনুভব করা যায়। ইহাদের প্রধান লোক-সঙ্গীত সারি গান, ইহা প্রধানতঃ নৌকা বাইচের সময় গাওয়া হয়। ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপের অধিবাসী নানা জাতির মধ্যে সমুদ্রে নৌকা বাইচের সময় যে সুর ও সঙ্গীত ব্যবহৃত হয়, তাহাদের সঙ্গে বাংলাদেশের এই অঞ্চলের নৌকা বাইচের গানে ও তাহার সুরে বিস্ময়কর ঐক্য দেখা যায়।

বাংলা দেশের পুর্বতম সীমান্তে ত্রিপুরা ও পার্বত্য ত্রিপুরা অঞ্চলে যে সকল জাতি বাস করে, তাহারা ইন্দো-মোঙ্গলয়েড্ জাতিভুক্ত হইলেও তাহাদের ভাষা প্রধানতঃ বাংলা। কোন কোন অঞ্চলে ইহারা দুইটি ভাষাই ব্যবহার করে—নিজেদের মাতৃভাষা এবং বাংলা ভাষা। বৈষ্ণব ধর্মের সূত্রে বাংলাভাষা ইহাদের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে রিয়াং নামক উপজাতির যে লোক-কথা সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, বাংলার বহু লোক-কথা তাহাদের মধ্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। সাংস্কৃতিক উপকরণ কখন কোন পথে কি ভাবে পরস্পরকে প্রভাবিত করে, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। সুতরাং, আজ যে জাতি আপাতদৃষ্টিতে আমাদের বিবেচনায় অপাংক্তেয় ও অস্পৃশ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহারাও যে একদিন এ'দেশের সাংস্কৃতিক জীবনের পরিপুষ্টিতে বিশেষ অংশ গ্রহণ করে নাই, তাহা বলিবার উপায় নাই। আজ বাংলার প্রতিবেশী অঞ্চলের অরণ্যে পর্বতে যাহারা আশ্রয় লইয়াছে, তাহারা একদিন বাংলার সমতল ভূমির অধিবাসী ছিল, তাহাদের একটি বৃহৎ অংশ এদেশের জন-সমাজের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে; ইহাদের মৌলিক জাতিগত পরিচয়ে বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য ছিল বলিয়াই বাংলার লোক-সঙ্গীতে আজ এই বৈচিত্র্য দেখা যায়।

তিন

লোক-সঙ্গীত ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীত

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে ইংরেজীতে classical সঙ্গীত বলা হয়; classical শব্দটির মধ্যে প্রাচীনতার অর্থ প্রকাশ পায়, অর্থাৎ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে প্রাচীন পদ্ধতির গান বলিয়া মনে করা হয়। লোক-সঙ্গীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার কোন অংশই প্রাচীন নহে, ইহা সর্বদাই আধুনিক। পরিবর্তনের ধর্ম স্বীকার করিয়া লইয়া ইহা ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়া চলে, প্রাচীন রূপ পরিত্যাগ করিয়া সর্বদাই ইহা যুগোপযোগী নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। সুতরাং লোক-সঙ্গীতে প্রাচীন বলিয়া কিছু নাই, তাহা সর্বদাই আধুনিক। ক্রম-পরিবর্তনের ধারায় ইহার ভাষায়, ভাবে কিংবা গঠনে কোন দিক দিয়াই প্রাচীনত্ব রক্ষা পায় না। পরিবর্তনের পথে কখনও ইহা অবনত (degenerated) হইয়া লুপ্ত হইয়া যায়, কখনও বা ইহা উন্নতির পথ ধরিয়া উৎকর্ষ লাভ করে; ইহা কোন অবস্থাতেই স্থির বা rigid হইয়া থাকে না। কিন্তু classical সঙ্গীত একটি অবিচল আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলে। যদিও এ' কথা সত্য যে, উত্তর ভারতের প্রাচীন পদ্ধতির গানের সঙ্গে তুলনায় দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন পদ্ধতির গান (classical song) অধিকতর রক্ষণশীল, উত্তর ভারতীয় রাগ সঙ্গীতে কিছু কিছু পরিবর্তন কোন কোন দিক হইতে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে, তথাপি একটি অবিচল আদর্শের অনুসরণই ইহার লক্ষ্য। লোক-সঙ্গীতের কদাচ তাহা নহে। রাগসঙ্গীতের মধ্যে যে কোন কোন সময় আদর্শচ্যুতি ঘটিয়া থাকে, তাহার প্রধান কারণ ইহার উপর লোক-সঙ্গীতের প্রভাব বলিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন। লোক-সঙ্গীতের সঙ্গে প্রাচীন পদ্ধতির গানের এখানেই মৌলিক পার্থক্য।

প্রাচীন পদ্ধতির গান শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বলিয়া পরিচিত; এই বিষয়টিও লক্ষ্য করিবার যোগ্য। যে শ্রেণীর সঙ্গীতের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট লিখিত শাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাই শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বলিয়া পরিচয় লাভ করিয়াছে। ইহা নির্দিষ্ট কতকগুলি রীতি বা নিয়ম মানিয়া চলে; কিন্তু লোক-সঙ্গীত অনুশীলনের জন্য কোন লিখিত কিংবা মৌখিক শাস্ত্র গড়িয়া উঠে নাই; ইহার গীত-রীতি জটিল নহে, যে সমাজের মধ্যে যে সঙ্গীত প্রচলিত আছে, সেই সমাজের মধ্যে ইহার

সম্পর্কিত একটি সংস্কার আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে, তাহা কোনদিন শিক্ষা লাভ করিবার প্রয়োজন করে না। সুতরাং ইহার সম্পর্কে শাস্ত্রীয় কথাটি ব্যবহার করিবার কোনদিক দিয়াই কোন উপায় নাই। সুতরাং লোক-সঙ্গীত যেমন প্রাচীন পদ্ধতির সঙ্গীত বা classical song নহে, তেমনি ইহা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতও নহে।

প্রাচীন পদ্ধতির সঙ্গীত বা classical সঙ্গীতকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতও বলা হয়। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শব্দটির মধ্যেই 'নিম্ন' স্তরের আর একটি গীত-রীতির ইঙ্গিত রহিয়াছে। অভিজাত সমাজ সাধারণ নিরক্ষর সমাজের মধ্যে প্রচলিত গীত-রীতিকে নিম্নস্তরের গীত-রীতি বলিয়া উল্লেখ করিবে, ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই; ইহাকেই আমরা লোক-সঙ্গীত বলিয়া থাকি। কিন্তু নীচের উপরই যেমন উচ্চের স্থান, তেমনই লোক-সঙ্গীতকে আশ্রয় করিয়াই যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিকাশ হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। লোক-সঙ্গীতই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ভিত্তি। যেমন লোক-সাহিত্যই উচ্চতর সাহিত্যের উৎস স্বরূপ, তেমনই লোক-সঙ্গীতই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অবলম্বন। লোক-সঙ্গীতের যে-কোন রাগরাগিণী বিশ্লেষণ করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

লোক-সঙ্গীত যেমন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ভিত্তি, তেমনই আবার কোন কোন সময় দেখা যায় যে, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কোন কোন রাগ-রাগিণী অধঃপতিত (degenerated) হইয়া লোক-সঙ্গীতে পরিণত হয়। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-সাধনার ক্ষেত্র হইতে সেই সকল রাগ-রাগিণী কালক্রমে সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গেলেও, লোক-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাহা আত্মরক্ষা করিয়া দীর্ঘতর কাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে। ইহার কারণ, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত কৃত্রিম, লোক-সঙ্গীত সহজাত। শাস্ত্রীয় শাসনের সুকঠিন বন্ধন ছিন্ন করিয়া কোন কোন উচ্চাঙ্গ গীত-রীতি অব্যবহার কিংবা অপব্যবহারের ফলে কোন কোন সময় ইহার সহজাত কিংবা স্বাভাবিক লোক-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে পুনরায় ফিরিয়া আসে। সেখানে স্বতঃস্ফূর্তির গুণে তাহার প্রাণধারা পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিশিষ্ট এক একটি পদ্ধতি কখনও একদিনে গড়িয়া উঠে নাই, বহু অনুশীলনের মধ্য দিয়া গিয়া শেষ পর্যন্ত একটি অবিচল আদর্শের মধ্যে তাহা স্থিরতা লাভ করে। ইহার অনুশীলনের ধারায় বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া লোক-সঙ্গীতের উপকরণ নানা ভাবে প্রবেশ করে। সঙ্গীত বিশেষজ্ঞগণ এ'কথা

সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, আমাদের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অধিকাংশ রাগরাগিণীই লোক-সঙ্গীতের সুরকে ভিত্তি করিয়া গঠিত হইয়াছে। এ' কথা কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন যে, লোক-সঙ্গীতে যে সকল বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের অনুকরণে সৃষ্ট হইয়াছে; আবার এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিপরীত একটি মতও প্রচলিত আছে। প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-শাস্ত্রবিদ্ শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় বলিয়াছেন, 'সন্দেহ করবারও অবকাশ আছে যে, তানপুরাটাই হয়ত পল্লীগায়কের একতারার একটা উচ্চাঙ্গ সংস্করণ। সরোদের সম্বন্ধেও কোন কোন বিশেষজ্ঞের মত এই যে, আফগানিস্তানের পল্লীবাসীরা রাবাব নামে যে যন্ত্রটা বাজায়, সেটা আমাদের দোতারার তুলনায় খুব বেশি উন্নত ধরণের যন্ত্র নয়, আর সরোদ হচ্ছে আফগানি রাবাবেরই উন্নত সংস্করণ।'

পল্লীর গায়কের অনাড়ম্বর বাদ্যযন্ত্রগুলিকে যেমন নানা দিক হইতে উন্নত করিয়া উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বাদ্যযন্ত্র সমূহ নির্মিত হইয়াছে, তেমনই পল্লীর গানের সুরের উপর নানা কারুকার্য করিয়া উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সুর সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন, কোন বিশেষ অঞ্চলের মেয়েদের সাদা মাঠের গানই ধ্রুপদের ভিত্তি। ইহার যুক্তি স্বরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে যে, 'অন্যান্য গীত-রীতির তুলনায় ধ্রুপদের চলনের মধ্যে বেশ সহজ সরল সুরের কাজই লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে আর তাল এবং ছন্দের বৈচিত্র্য আরোপ ক'রে এবং তা ছাড়া উচ্চাঙ্গ শিল্পসম্মত শৈলী প্রয়োগ ক'রে ধ্রুপদের অঙ্গসৌষ্ঠব বহু পরিমাণে বাড়ানো হয়েছে।' ধ্রুপদের মধ্যে বাহিরের দিক হইতে যে অতিরিক্ত সাজসজ্জা বাড়ানো হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিলে এখনও ইহার সহজ স্বাভাবিক সুর সকলের আকর্ষণীয় হইতে পারিবে বলিয়াও কেহ কেহ মনে করেন।

বাংলার কীর্তন আজ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-সাধনার অঙ্গীভূত হইয়া রাগ-সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে সত্য, তথাপি পল্লীগীতির সাধারণ সুরের স্তর হইতেই যে ইহার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করেন না। বাংলাদেশের বিশেষ একটি আঞ্চলিক পল্লীগীতিই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মাধ্যমে বিশেষভাবে অনুশীলন করা হইবার ফলে ইহা আজ রাগসঙ্গীতের পর্যায়ে উন্নীত হইলেও ইহার

লৌকিক একটি ধারা আজ পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন অংশের পল্লীঅঞ্চলে অব্যাহত আছে। তাহা লৌকিক কীর্তন বলিয়া অভিহিত করা যায়। লোক-সঙ্গীতের বিশেষ একটি রূপ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পরিণত হইবার পরও ইহার লৌকিক রূপটি সমাজের মধ্য হইতে লুপ্ত হইয়া যায় না, তাহা নিজস্ব ক্রমবিকাশের একটি ধারা নিজেই রচনা করিয়া লইয়া সমাজের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া থাকে। ক্রমে ইহাদের উভয়ের মধ্য দিয়া যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়, তাহার ফলে উভয়ের মধ্যে যে কোনদিন পরস্পর কোন সম্পর্ক ছিল, তাহা সাধারণ দৃষ্টিতে বুঝিতে পারা যায় না। কীর্তন রাগসঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত হইবার ফলে ইহার সম্পর্কে যে সুনির্দিষ্ট বিধি-নির্দেশ রচিত হইয়াছে, তাহার সমান্তরালবর্তী ইহার আর একটি লৌকিক ধারা আজ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকা সত্ত্বেও, এ' কথা সত্য তাহাও বহুলাংশে উচ্চাঙ্গ কীর্তন দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। কারণ, এখানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের একটি প্রভাবও সক্রিয় হইয়াছিল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কীর্তনের বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ—ঝাড়খণ্ডী কীর্তন, মণিপুরী কীর্তন ইত্যাদিও সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞদিগের সমাজে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

ভাটিয়ালী বাংলার লোক-সঙ্গীতের একটি মৌলিক সুর। ইহার কোন পর্যায়ের সুরের মধ্যে কেহ কেহ রাগসঙ্গীতের কিছু কিছু উপাদানের সন্ধান পাইয়াছেন। কঁসৌলি ঝিঁঝিট নামে রাগসঙ্গীতের যে একটি রাগের প্রচলন আছে, তাহা ভাটিয়ালীর সেই বিশেষ সুরটি অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছেন।

অপর পক্ষে রাগসঙ্গীত দ্বারাও যে বাংলার লোক-সঙ্গীত কিছু পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে, তাহার একটি বিশিষ্ট নিদর্শন বাংলার আগমনী গান বা মালশী গান। ইহা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত মালশ্রী রাগেরই একটি লৌকিক রূপ। পল্লীর গায়ক তাহার সাধারণ বাদ্যযন্ত্র লইয়া যখন এই গান গায়, তখন স্বভাবতঃ ইহার জটিল স্বর-পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে পারে না, তাহার নিজের দিক হইতে ইহাকে সে সহজ করিয়া লয়। কিন্তু তথাপি রাগসঙ্গীতের দুই-একটি উপকরণও তাহারা ব্যবহার করিয়া ইহাকে পূর্ণাঙ্গ পল্লীসঙ্গীত হইতে কতকটা স্বাতন্ত্র্য দান করিয়া থাকে।

বাংলাদেশে রাগসঙ্গীতের যে চর্চাই হোক না কেন, জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কেহই কোনদিনই পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ

করিয়া বিশুদ্ধ রাগসঙ্গীত চর্চারই পক্ষপাতী ছিলেন না। একথা সকলেই জানেন, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কেবলমাত্র মূলতঃ অপভ্রংশ ভাষাতেই রচিত হয় নাই, বরং ইহা যে সকল রাগরাগিণী দ্বারা গীত হইত, তাহা সর্বাংশেই বিশুদ্ধ রাগসঙ্গীত ছিল না ; এমন কি, সংস্কৃত শ্লোক রচনার যে বিশিষ্ট পদ্ধতি ছিল, তাহাকে অস্বীকার করিয়া ইহা আদ্যোপান্ত বাংলা সঙ্গীতের সুরে রচিত হইয়াছিল। চর্যাপদের মধ্যে বাঙ্গালীর সঙ্গীত-রচনার যে একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা প্রধানতঃ সে যুগের সমাজের বিশিষ্ট লৌকিক সুরের উপরই আশ্রয় স্থাপন করিয়াছিল। কালক্রমে তাহারই ধারা 'গীতগোবিন্দ' এবং ক্রমে বৈষ্ণব পদাবলী রচনার মধ্য দিয়াও অনুসরণ করা হইয়াছে। কীর্তনের মধ্য দিয়া সেই ধারা একদিকে বিকাশ লাভ করিয়া যেমন রাগসঙ্গীতের বিশিষ্ট একটি রূপ লাভ করিয়াছে, তেমনই আর একদিক দিয়া তাহার মূল লৌকিক ধারাটি অগ্রসর হইয়া গিয়া লৌকিক পদাবলীর আর একটি ধারা সৃষ্টি করিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথ যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতেরই অনুশীলন হইয়াছিল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের সুর-সংস্কার প্রথম হইতেই অবিমিশ্র উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের উপকরণেই সৃষ্টি হইতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনার মধ্যে যেমন বাল্যকাল হইতেই লোক-সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হইয়াছিল, তেমনই রবীন্দ্র-মানস বাঙ্গালীর নিজস্ব সুরকেও তাহার সঙ্গীত-সাধনার মধ্যে শৈশবকাল হইতেই গ্রহণ করিয়া লইয়াছিল। পরিণত জীবনে তাহার পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা গিয়াছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রকৃতপক্ষে একদিকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত আর একদিকে বাংলার লোক-সঙ্গীত উভয়ের প্রভাবের ফলে সৃষ্ট হইয়াছে। লোক-সঙ্গীতকে অবলম্বন করিয়াছিল বলিয়াই রবীন্দ্র-সঙ্গীত বাংলার জন-মানসে এত ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে।

বাংলা টপ্‌পা নামে যে শিল্প-সঙ্গীত এ' দেশে প্রচলিত আছে, তাহার সঙ্গে বাংলার পল্লীসঙ্গীত ভাটিয়ালীর সম্পর্ক কেহ কেহ অনুভব করিয়াছেন। টপ্‌পা মূলতঃ হিন্দুস্থানী গাড়োয়ানের গান ছিল, বাংলাদেশে আসিয়া ইহা এক বিশেষ শিল্পরূপ লাভ করিয়াছে। কিন্তু প্রধানতঃ যে উপকরণ অবলম্বন করিয়া ইহা বিশেষ কলাগত মর্যাদা লাভ করিয়াছে, তাহা বাংলার লোক-সঙ্গীত ভাটিয়ালী

হইতে আসিয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, বাংলার ভাটিয়ালী বাংলার লোক-সঙ্গীতের একটি মৌলিক সুর। ইহাকে অবলম্বন করিয়া বাংলার শিল্পসঙ্গীতে নানা রকম বৈচিত্র্য সৃষ্টি হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ ভাটিয়ালীর সুরে যেমন সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, তেমনই আবার ভাটিয়ালীকে ভিত্তি করিয়া নানা মিশ্র-রাগের সংযোগেও গীত রচনা করিয়াছেন ; এমন কি, ভাটিয়ালীকে অবলম্বন করিয়া বাংলার যে টপ্‌পা একটি শিল্পসম্মত রূপ লাভ করিয়াছিল, তাহাও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনার মধ্য দিয়া বিশেষ একটি রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

শিল্পসঙ্গীত তালের দিক দিয়া যেমন অত্যন্ত জটিল, লোক-সঙ্গীত সাধারণতঃ তাহা নহে। কিন্তু লোক-সঙ্গীতের যে সকল রীতি একটু ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে, তাহাদের উপর শিল্পসঙ্গীতের প্রভাব বশতঃ কোন কোন সময় জটিলতারও সৃষ্টি হইয়াছে। কীর্তন গান মূলতঃ লোক-সঙ্গীতের স্তর হইতে উদ্ভূত হইয়া পরে যে কি ভাবে শিল্প-সঙ্গীতের স্তরে উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তাহার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। কীর্তনের শিল্পসম্মত রূপ বাংলার লোক-সঙ্গীতকে নানাভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। তাহার ফলে লোক-সঙ্গীতের নিতান্ত সহজ সুর এবং তালের প্রকৃতি অনেক সময় জটিল রূপও ধারণ করিয়াছে। কিন্তু পল্লী-সঙ্গীতের চিরপরিবর্তনের ধারায় ইহার জটিল রূপ অধিককাল অবিচল হইয়া থাকিতে পারে না, ক্রমে তাহা সহজ হইয়া আসে।

সম্প্রতি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ব্যাপক বিস্তারের ফলে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, অনেক ক্ষেত্রে তাহা পল্লী অঞ্চলে গিয়া সহজ লোক-সঙ্গীতের সুরে পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ বাউলের ভাব অবলম্বন করিয়া পল্লীসঙ্গীতের সুরে যে মিশ্ররাগের সঙ্গীতগুলি রচনা করিয়াছেন, তাহা পল্লীর কোন কোন বাউল গায়ক সহজ পল্লীর বাউলের সুরে পরিবর্তিত করিয়া নিজেদের সুর-সাধনার মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত করিয়া লইয়াছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সঙ্গে বাংলার লোক-সঙ্গীতের কতকগুলি বিষয়ে মৌলিক ঐক্য আছে বলিয়া এই কাজ অতি সহজেই সম্ভব হইয়াছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যে সকল রাগ ও তালের সহিত রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্পর্কযুক্ত হইয়া আছে, তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই রবীন্দ্র-সঙ্গীত সহজ লোক-সঙ্গীতে পরিণতি লাভ করে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে কথার যে গুরুত্ব আছে, বাংলার পল্লীসঙ্গীতেও তাহাই আছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে সুর ও

তালের যে বৈচিত্র্যই দেখা যাক না কেন, তাহার যে অংশ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত হইতে আসিয়াছে, তাহা পল্লী অঞ্চলে আসিয়া পরিত্যক্ত হইয়া পল্লীর সহজ সুর ও তালে পরিবর্তিত হইয়া বাংলার পল্লীসঙ্গীতের মধ্যে একদিন স্বাঙ্গীকৃত হইয়া যাইবে ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। ধর্মীয় সঙ্গীতের মধ্যে এই প্রকার পরিবর্তন সহজে সম্ভব হইতে পারে না; সেইজন্য রামপ্রসাদের মালসী কিংবা বাউল সম্প্রদায়ের ফিকিরচাঁদি ইত্যাদির মধ্যে কোন আধুনিকীকরণ দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু রবীন্দ্র-সঙ্গীত বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আচার-সঙ্গীত নহে, ইহাদের আবেদন একান্ত মানবিক, সেই সূত্রেই ইহার স্বাধীন ক্রমবিকাশে কোন অন্তরায় সৃষ্টি হইতে পারিবে না।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীত কঠিন সাধনা দ্বারা অনুশীলন করিতে হয়, এই সাধনার শক্তি যুগে যুগে সমাজের পক্ষে অবিচল রাখা সম্ভব হয় না, অথচ ইহার রূপ পরিবর্তিত হইবারও উপায় থাকে না; সেইজন্য ইহা লুপ্ত হইয়া যায়। একদিন যে টপ্পা বাংলা দেশে এত জনপ্রিয় ছিল, তাহা আজ আর শুনিতে পাওয়া যায় না এমনি ভাবে বহু উচ্চাঙ্গ রাগিণী আজ বিদগ্ধ সমাজ হইতেও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; এমন কি, উচ্চাঙ্গ রাগ-কীর্তনও আজ অতি অল্পই শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু যে কীর্তন লৌকিক ধারা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে, তাহা আজও লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে নাই। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের জনপ্রিয়তার দিক হইতে উত্থান পতন আছে, কিন্তু লোক-সঙ্গীতের নিজস্ব ধারা অব্যাহত রাখিবার ক্ষমতা আছে।

চার

ধর্মসঙ্গীত ও লোক-সঙ্গীত

লোক-সঙ্গীতের সঙ্গে ধর্ম-সঙ্গীতের একটি প্রধান পার্থক্য এই যে, লোক-সঙ্গীত সুরে ও কথায় পরিবর্তনের ধারা স্বীকার করে; কিন্তু ধর্মসঙ্গীত তাহা স্বীকার করে না; তারপর লোক-সঙ্গীত জীবনাশ্রিত, ধর্মসঙ্গীত তত্ত্বাশ্রিত। সুতরাং লোক-সঙ্গীত সাহিত্য, কিন্তু ধর্ম-সঙ্গীত দর্শন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাংলাদেশের লৌকিক ধর্মের একটা বিশেষত্ব আছে, তাহা এই যে, ইহা কোন দিনই শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথে নিষ্ঠার সঙ্গে অগ্রসর হয় নাই। বাংলার জলবায়ুতে যে অধ্যাত্মচিন্তাই বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহা যেমন এক দিক দিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, তেমনই আবার তাহার অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় সংস্কার-সুলভ রসের অনুভূতি দেখা গিয়াছে। সেইজন্য বাঙ্গালীর ধর্মের মধ্যেও বাংলার জীবনেরই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার ধর্ম ও তাহার জীবন দুইটি স্বতন্ত্র হইয়া উঠে নাই। সুতরাং তাহাই যদি হয়, তবে বাঙ্গালীর যাহা ধর্ম, তাহা সাহিত্যের ক্ষেত্র হইতেও নির্বাসিত হইতে পারে না। তবে বাঙ্গালীর ধর্ম যে কি, তাহা বুঝিবার একটু আবশ্যক আছে; কারণ, তাহা বুঝিতে না পারিলে ধর্মীয় চিন্তার মধ্যে যে কি ভাবে সাহিত্যগুণ নিহিত থাকিতে পারে, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ ধর্মের যে সংজ্ঞা দিয়া থাকেন, তাহা এই যে, অলৌকিতায় বিশ্বাসের নামই ধর্ম। ঈশ্বর একটি অলৌকিক শক্তি, সেই সূত্রে ঈশ্বর-বিশ্বাসই ধর্ম। যাহারা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না—যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আদিম জাতি—তাহারাও অলৌকিকতায় বিশ্বাস করে, তাহারা মনে করে; পর্বতের প্রাণ আছে, এই বিশ্বাসে পর্বতকেই তাহারা উপাসনা করে; ইহার নামই ধর্ম। কিন্তু বাঙ্গালীর নিজস্ব ধর্মসাধনার মধ্যে অলৌকিকতায় বিশ্বাসকে যে একটি প্রধান স্থান দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা নহে। বাংলার নিজস্ব ধর্মমত অধিকাংশই প্রত্যক্ষ মানুষেরই মহিমার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে, আলৌকিক কোন শক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করে না। বাঙ্গালীর সামগ্রিক আধ্যাত্মিক আত্মা যেন চণ্ডীদাসের এই কথাটির মধ্য দিয়া প্রতিধ্বনিত হইয়াছে,—'শুন হে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

যদি তাহাই হয়, তবে বাঙ্গালীর জাতীয় ধর্মে প্রত্যক্ষ মানুষ যে স্থান অধিকার করিয়াছে, অপ্রত্যক্ষ ভগবান সেই স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। বাংলার সহজিয়া ধর্ম সহজ মানুষেরই ধর্ম ; তাহাতে স্বর্গ, নরক, পরলোক সম্পর্কে কোন দুর্ভাবনা প্রকাশ পায় না। বাংলার সহজিয়া সাধক বলিয়াছেন,

অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা।
মিছে লোঅ বন্ধাবএ অপণা ॥
অম্হে ন জানহু অচিন্ত্য যোই।
জাম মরণ ভব কইসন হোই ॥

মানুষ নিজেই পুনর্জন্ম ও নির্বাণের পরিকল্পনা করিয়া তাহার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা অচিন্ত্য যোগী, আমরা জানি না, জন্ম, মৃত্যু এবং পুনর্জন্ম কি ভাবে হয়।

এই সহজিয়া ধর্ম যুগে যুগে বাহিরের দিক হইতে নানা রূপ লাভ করিলেও ইহাই বাঙ্গালীর নিজস্ব ধর্ম। 'বৌদ্ধগান ও দোঁহা'র যুগ অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালী যখন জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র যুগে প্রবেশ করিল, তখনও কবি জয়দেব যে বিনা দ্বিধায় ভক্তের পদপল্লব ভগবানের শিরে ধারণ করাইলেন, তাহার অর্থই এই যে, সহজ সাধনার প্রেরণা বাঙ্গালীর আধ্যাত্ম মানসে ইতিপূর্বেই সুদৃঢ় শিকড় গাড়িয়া তুলিয়াছিল। চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' তাহাই পূর্ণতা লাভ করিয়াছে মাত্র।

তারপর চৈতন্য-ধর্মের কথাও যদি ধরা যায়, তথাপি দেখা যায় যে, ইহার আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণের যে অলৌকিক শক্তির কথাই ইহাতে প্রকাশ পাক না কেন, মানুষের মহিমাকে তাহাতে পদদলিত করা হয় নাই। পতিত মানুষের মধ্যেও ভগবত্তার সন্ধান করিয়া ইহাও মনুষ্যত্বের মহিমাই পরোক্ষে কীর্তন করিয়াছে, সেই মনুষ্যত্বের উপলব্ধির পথে অলৌকিক একটি শক্তি সহায়ক হইয়াছে মাত্র। সহজ সাধনার ইহা একটি যুগোচিত পরিমার্জনা মাত্র। বিশেষতঃ চৈতন্যদেব আচার ধর্মকে সর্বদাই অস্বীকার করিয়াছেন। শাস্ত্র-নির্দিষ্ট বর্ণাশ্রম ধর্মকেও তিনি স্বীকার করেন নাই। সেইজন্য হরিদাস এবং রূপ-সনাতনকে তিনি তাঁহার সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অধিকার দিয়াছিলেন, তাহা আর কাহাকেও দেন নাই। সেই সূত্রে চৈতন্যের ধর্ম মানবিকতারই ধর্ম। এই ধর্মবিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া যাহা রচিত হইয়াছে, তাহাও সাহিত্যের স্বাদ হইতে বঞ্চিত নহে।

তথাপি চৈতন্য-সাহিত্যের দুইটি দিক আছে, একটি ইহার শাস্ত্রীয় দিক, আর একটি ইহার লৌকিক দিক। শাস্ত্রীয় দিকটিতে ইহার অধ্যাত্মতত্ত্বের বিশেষ বিশ্লেষণ হইয়াছে, লৌকিক দিকটিতে জীবনের সঙ্গে ধর্মের সহজ সম্পর্কের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, ইহা কোন শাস্ত্রীয় শাসন স্বীকার করে নাই। সেই জীবন অবশ্য রাধাকৃষ্ণের নামাঙ্কিত, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও রাধাকৃষ্ণ সমাজেরই সাধারণ নরনারীর বা নায়ক-নায়িকার প্রতিনিধি; এমন কি, যে সহজিয়া সম্প্রদায় একান্ত ভাবে ধর্মভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহাদের পদাবলী রচনা করিয়াছে, তাহাদের মধ্যেও মানবিক অনুভূতির স্পর্শ লাভ করা গিয়াছে। এই গুণেই ইহা সহজেই সর্বত্র প্রচার লাভ করিতে পারিয়াছে। বাংলার পদাবলীর কৃষ্ণও যেমন ভাগবত কিংবা বিষ্ণুপুরাণ হইতে আগত চরিত্র নহেন, রাধা ত নহেনই, তেমনই বাংলার লৌকিক প্রেম-সঙ্গীতের নায়ক শ্রীকৃষ্ণও কোন পৌরাণিক অলৌকিক চরিত্র নহেন, তিনিও সাধারণ প্রেম-সঙ্গীতের নায়ক মাত্র, লৌকিক অনুভূতিই তাঁহার মধ্যে সক্রিয় বলিয়া অনুভূত হইবে। আধ্যাত্মিক অনুভূতির মধ্যে মানবিক গুণের অস্তিত্ব ছিল বলিয়াই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বন করিয়া বাংলা সাহিত্যের পুষ্টি হইয়াছে; বৈষ্ণব ধর্ম বাংলার পল্লীর সর্বত্র অগণিত প্রেম-সঙ্গীতের প্রেরণা দান করিয়াছে।

বাংলার আর একটি নিজস্ব ধর্ম নাথ-ধর্ম। ইহাতেও অলৌকিক শক্তির পরিবর্তে প্রত্যক্ষ যৌগিক ক্রিয়াকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। ইহার গীতিকা 'গোপীচন্দ্রের গান' কোন তত্ত্বাশ্রিত রচনা নহে, বরং নরনারীর প্রেমবিষয়াশ্রিত কাহিনী। ইহার চরিত্র মাত্রই প্রত্যক্ষ জগতের নরনারী, এমন কি, ইহার সিদ্ধপুরুষগণও মানবিক-গুণেরই অধীন। সেইজন্য এই সম্প্রদায় যাহা রচনা করিয়াছে, তাহাও দর্শন নহে, তাহা সঙ্গীত।

বাংলার বাউল সাধনাও আধ্যাত্মিক সাধনা, কিন্তু বাউল সাধনার মধ্যেও মনুষ্যত্বের একটি বিশেষ অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। সহজ সাধনা কিংবা চৈতন্য ধর্মের মূল কথা যাহা, বাউল সাধকের মূল কথাও তাহাই; জাতির একই অধ্যাত্ম-প্রেরণা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এইভাবে অগ্রসর হইয়া আসিয়া তান্ত্রিক সাধনার একটি স্বতন্ত্র ধারায় ক্রমে রামপ্রসাদ এবং রামকৃষ্ণেরও আবির্ভাব হইয়াছে। এমন কি, মধ্যযুগে বৈষ্ণব-সাহিত্যের সমান্তরালবর্তী শাক্ত-সাহিত্যের যে আর একটি ধারা ছিল, অর্থাৎ মঙ্গলকাব্যের

যারা, তাহা প্রত্যক্ষ মানুষের বাস্তব জীবনকে সর্বস্ব করিয়া লইয়াছিল ; সেইজন্ত তাহার ভিতর দিয়া যে সাহিত্য বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহাই সর্বাধিক মানবিকগুণ সমৃদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায়, ধর্মসঙ্গীত সাধারণভাবে লোক-সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত হইতে না পারিলেও যে ধর্মানুভূতির মধ্যে অলৌকিতাবোধের পরিবর্তে মানবিকতাবোধ প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে, তাহার সঙ্গীত সাহিত্য-গুণান্বিত হইবার যোগ্যতা আছে।

ভাবের বহিঃপ্রকাশের সার্থকতায় সঙ্গীতের সাহিত্যিক ধর্ম রক্ষা পায়। বাংলার ধর্মীয় সঙ্গীত নীরস সূত্রাকারে কিংবা তত্ত্বাকারে পরিবেষিত হয় নাই, ইহারা কাব্যের অলঙ্কার গ্রহণ করিয়াই রসপুষ্ট হইয়া থাকে। বাউলের সঙ্গীতে যে সকল অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়, তাহা কাব্যের অলঙ্কার ; সুতরাং বহিরঙ্গে তাহা কাব্যগুণ বিবর্জিত নহে।

পাঁচ

লোক-সঙ্গীত ও বাঙ্গালীর সঙ্গীত-সাধনা

লোক-সঙ্গীতের জন্য সাধনার প্রয়োজন না হইলেও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জন্য সাধনার আবশ্যক হয়। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাধনা আমাদের দেশে কবে হইতে আরম্ভ হইয়াছিল এবং তাহা বিভিন্ন যুগের মধ্য দিয়া আজ পর্যন্ত কি ভাবে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করিলে একটি বিষয় অতি সহজেই অনুভব করা যায় যে, যদিও প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন রাজসভায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাধনা স্বাভাবিক নিয়মেই হইয়া থাকিবে, তথাপি এ'কথা সত্য, তাহা কদাচ লোক-সঙ্গীতের প্রবাহকে স্তিমিত করিয়া দিতে পারে নাই। প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই দেখা যায়, লোক-সঙ্গীতই অনুশীলন করিবার ফলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পরিণত হইয়াছে, আবার তাহা অনুশীলনের অভাবে লোক-সঙ্গীতের পর্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে।

দশম একাদশ শতাব্দীতে রচিত বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন রূপে যে 'বৌদ্ধগান ও দোহা'র অন্তর্গত চর্যাপদগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কতকগুলি উচ্চাঙ্গ রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে। ইহা হইতেই কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতেই বাংলা দেশের সঙ্গীতে উচ্চাঙ্গ রাগরাগিণীর প্রবর্তন হইয়াছিল। কিন্তু এ'কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 'বৌদ্ধগান ও দোহা' দশম-একাদশ শতাব্দীর রচনা হইতে পারে, কিন্তু ইহার যে পুথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে এবং যাহাতে রাগ-রাগিণীগুলির উল্লেখ দেখা যায়, তাহা দশম-একাদশ শতাব্দীর নহে, তাহা আরও অনেক পরবর্তী কালের। সুতরাং আরও পরবর্তী কালে গিয়া এই সকল রাগরাগিণীর নাম ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করা কিছুই আশ্চর্য নহে। সাম্প্রতিক কালে বাউল গানের যেমন একটি নিজস্ব লৌকিক সুর আছে, চর্যাপদগুলি তেমনই ইহাদের নিজস্ব লৌকিক সুরেই গীত হইত, তারপর যখন এ'দেশে নানা উচ্চাঙ্গ রাগরাগিণীর প্রচলন হইয়াছে, তখনই ইহাদের মধ্যে নানা রাগরাগিণীর নাম গিয়া যুক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ চর্যাপদগুলির মধ্যে যে সকল রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে দেশীয় রাগরাগিণীর সংখ্যাই অধিক। মনে হয়, এই বিষয়ে ইহা নিজস্ব ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করিয়াছে। যেমন, চর্যাপদের রাগরাগিণীর মধ্যে বহু

সংখ্যক পদেই 'গৌড় রাগে' গেয় বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। এই 'গৌড় রাগ' তৎকালে প্রচলিত বাংলাদেশের লোক-সঙ্গীত ভিত্তিক যে বিশিষ্ট কোন রাগ ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পাল রাজদের সভায় সঙ্গীত এবং নৃত্যের চর্চা হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু তখন পর্যন্ত দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী রাজসভার ভাব স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই। সুতরাং রাজসভার সঙ্গীত-সংস্কারের মধ্য দিয়াও লোকায়ত সংস্কারই মার্জিতরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকিবে। পালরাজত্বের পরবর্তী কালে সেনরাজত্বের আমলে বিশেষতঃ লক্ষ্মণসেনদেবের রাজসভায় যে অভিজাত প্রকৃতির নৃত্যগীত প্রচলিত ছিল, তাহার বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় সত্য, তথাপি দেখা যায়, তাঁহার সভাকবি জয়দেব যে নৃত্যগীত সংবলিত গীতিকাব্য 'গীতগোবিন্দ' রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে দেশীয় রাগরাগিণী এক অতি প্রধান অংশ অধিকার করিয়াছে। দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা চর্যাগানের রাগরাগিণীরই উত্তরাধিকারী হইয়াছে। চর্যাগানে যেমন দেশীয় রাগরাগিণী, যথা, রাগ গউড়, দেশাখ্য বা দেশীয়, শাবরী বা পার্বত্য, বরাড়ি ('গীতগোবিন্দে' ইহাকে দেশীয় বরাডি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, সুতরাং ইহা দেশীয় সুর,) মালসী (আগমনী বিজয়া বা রামপ্রসাদী গানের সুর), বঙ্গালী বা পুর্ববঙ্গীয় সম্ভবতঃ ভাটিয়ালি ইত্যাদি সুরের উল্লেখ আছে, 'গীতগোবিন্দে'ও তেমনই গৌডরাগ, দেশীরাগ, দেশীবরাডী রাগ ইত্যাদি নাম উল্লেখিত হইয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'ও তাহারই ধারা অনুসরণ করিয়া নানা দেশীয় রাগরাগিণীর সর্বত্রই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যায়, লক্ষ্মণসেন দেবের রাজত্বকাল হইতে অভিজাত বাঙ্গালীর সঙ্গীত-সাধনায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একটি বিশেষ স্থান স্বীকৃত হইলেও বাঙ্গালীর লোক-সঙ্গীতের যে ধারা ইতিমধ্যেই এক বলিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়াছিল, তাহাও ইহার নিজস্ব গতিপথে একটি সমান্তরাল ধারা সৃষ্টি করিয়া অগ্রসর হইতেছিল। 'গীত-গোবিন্দে'র রচনাগত বৈশিষ্ট্য হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, রাজসভার মধ্যেও কেবলমাত্র উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতই নহে, লোক-সঙ্গীতেরও প্রভাব স্থাপিত হইয়াছিল।

মধ্যযুগের বাংলার সমাজে নাটগীত নামে যে এক শ্রেণীর গীত এবং নৃত্যযুক্ত লোক-নাট্যের প্রচলন ছিল, 'গীত-গোবিন্দ' এবং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' যে তাহারই পূর্বরূপ, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। শ্রীচৈতন্যদেব মধ্যযুগে যে কীর্তনগানের প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহা কিছুকাল পর্যন্ত ক্রমাগত অনুশীলনের

ফলে রাগসঙ্গীতের পর্যায়ে উঠিয়া গেলেও তাহা মূলতঃ লোক-সঙ্গীত ভিত্তিকই ছিল। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কালে কীর্তন গান নিতান্ত সহজ ও বৈচিত্র্যহীন ছিল, সুতরাং ইহার উদ্ভবের মধ্যে লোক-সঙ্গীতের ধর্মই সক্রিয় ছিল। সে যুগের নামকীর্তন 'গীত-গোবিন্দ' ও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র গীত-রীতির সহজ সংস্করণ ছিল, অর্থাৎ চৈতন্যদেব পূর্ববর্তী গায়নশৈলীকে আরও সহজ এবং সরল করিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। জনসাধারণের জন্য তিনি যে ধর্মের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহা জনসাধরণের ব্যবহৃত সুরেই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, অনাবশ্যক কোন জটিলতা সৃষ্টি করিয়া ইহাকে জনসাধারণের অধিকার হইতে দূরে সরাইয়া রাখিতে যান নাই। কিন্তু কীর্তনগান কালক্রমে জটিল হইতে জটিলতর হইয়া শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত হইল এবং চারিটি আঞ্চলিক ধারায় বিভক্ত হইয়া গেল। নামকীর্তন ক্রমে পদাবলী কীর্তন হইল, ক্রমে তাহা মহাজন পদাবলীর সীমায় আবদ্ধ হইয়া ইহার স্বতঃস্ফূর্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিয়া দিল, এইভাবেই ইহার ধারা লুপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের যে প্রেরণাটুকু এই পদ্ধতির সঙ্গীতের মধ্য দিয়া সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহাকে অবলম্বন করিয়া কীর্তন গান একটি লৌকিক ধারাও সৃষ্টি করিল এবং তাহা আর বিনাশপ্রাপ্ত হইল না, বাংলার লোক-সঙ্গীতের বৈচিত্র্যের মধ্যে ইহার প্রাণ-প্রবাহ রক্ষা পাইল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পুর্ব পর্যন্ত বাংলার সঙ্গীত কোন বৈঠকী রূপ (Claisscal Bengali) লাভ করিবার প্রমাণ পাওয়া যায় না। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগত কয়েকজন বৈষ্ণব সাধক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আদর্শ স্বরূপ সর্বপ্রথম বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে রস-কীর্তন বা লীলাকীর্তনের প্রবর্তন করেন। তখন হইতে কীর্তন গানের একটি ধারা সঙ্গীত-সাধকের উচ্চাঙ্গ সাধনার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। বাংলাদেশে সঙ্গীতশাস্ত্রের যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকটিই এই সময়ের পরবর্তী। সপ্তদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া কীর্তন গানের ব্যাপক অনুশীলন হইয়াছিল সত্য, কিন্তু ইহা এই শতাব্দীর সীমা অতিক্রম করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে উত্তীর্ণ হইবার পুর্বেই ইহার প্রাণধারা শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পদাবলীর এক নূতন রূপ আত্মপ্রকাশ করিল, তাহা শাক্ত পদাবলী নামে পরিচয় লাভ করিল। লোক-সঙ্গীতের যে ধারাটির মধ্যে আগমনী-বিজয়া গান রচিত হইয়াছিল, রামপ্রসাদ সেন সেই

ধারাটিকে অনুশীলন করিয়া একটি উচ্চতর রস-মর্যাদায় তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলার লোক-সঙ্গীতগুলিরই নানাভাবে অনুশীলন হইয়াছিল; কিন্তু কীর্তনের মত তাহাদের কোনটিই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে নাই; লোক-সঙ্গীতের স্তরে থাকিয়া জন-সাধারণের ক্ষেত্রে বিস্তার লাভ করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের বাংলা দেশে যে শ্রেণীর সঙ্গীত জনপ্রিয় ছিল, সে সম্পর্কে সমসাময়িক কবি জয়নারায়ণ ঘোষাল তাঁহার এক গ্রন্থে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধারযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন,

সঙ্কীর্তন নানা ভাঁতি অপূর্ব সুন্দর।
গড়াহাটি রাণীহাটি বিরহ মাথুর॥
অভিসার মিলনাদি গোষ্ঠের বিহার।
কবি পশ্‌তো তালফেরা শুনিতে মধুর॥
পাঁচালী অনেক ভাঁতি রামায়ণ সুর।
কথকতা তরজাতে সারিতে প্রচুর॥
ভবানী ভবের গান মালসী মাথুর।
গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী বিজয়াতে ভোর॥
বাইশ আখড়া ছাপ প্রেমে চুরচুর।
গোবিন্দমঙ্গল জারি গাইছে সুধীর॥
চৈতন্যচরিতামৃত প্রেমের অঙ্কুর।
শ্রবণে যাহার গান ভকত আতুর॥
কালীয় দমন রাস চণ্ডীযাত্রা ধীর।
রচিল চৈতন্যযাত্রা রসে পরিপুর॥
সাপড়িয়া বাদিয়ার ছাপের লহর।
বাঙ্গালার নবগান নূতন ঝুমুর॥

এই বর্ণনার মধ্যে কোন উচ্চাঙ্গ রাগসঙ্গীতের উল্লেখ নাই; অবশ্য গরাণহাটি ও রেণেটির কীর্তনের উল্লেখ আছে, তাহাও বাংলারই পদাবলী কীর্তন—উচ্চ অনুশীলনের ফলে ঐ পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে মাত্র। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কীর্তনেরই বিভিন্ন লৌকিক রূপের যেমন জনসাধারণের মধ্যে একদিকে ব্যাপক প্রচলন ছিল, তেমনই অন্যদিকে বাংলার পল্লী-সঙ্গীতেরও বিভিন্ন সুর

নূতন প্রতিষ্ঠিত নাগরিক জীবনের প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে নানাভাবে মার্জিত করিয়া ব্যবহৃত হইতেছিল। কলিকাতা মহানগরী প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে কলিকাতার যোগাযোগের ফলে ইহার সঙ্গীত-সাধনায় এক নূতন পর্বের সূচনা দেখা দিল। তখন হইতেই হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের নানা ঢঙ্ বাংলাদেশে প্রবর্তিত হইবার ফলে বাংলা গানেও তাহার প্রভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল।

সে যুগে বাংলা গানে হিন্দুস্থানী ঢঙের প্রথম প্রবর্তক রামনিধি গুপ্ত, তিনিই নিধুবাবু নামে পরিচিত। হিন্দুস্থানী টপ্পার তিনি এক বাংলা রূপায়ণ সাধিত করিয়া বাংলার সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যুগান্তর আনিলেন। হিন্দুস্থানী ঢং ইহাতে পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করিয়াও বাংলার লৌকিক সুরের ধর্ম ও মেজাজ ইহাতে তিনি আরোপ করিলেন, তাহাতে ইহা অনুশীলন-সাপেক্ষ এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রূপ গ্রহণ করিলেও, সে যুগের বাঙ্গালী রসিকের চিত্ত অতি সহজেই অধিকার করিয়া লইল। তারপর হইতেই ক্রমাগত হিন্দুস্থানী বিভিন্ন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বাংলাদেশে নানাভাবে প্রচার লাভ করিতে লাগিল। নিধুবাবুর টপ্পার মধ্যে বাংলা গানের যে রেশটুকু ছিল, হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মধ্য হইতে তাহা ক্রমে লুপ্ত হইয়া গেল। তাহার ফলে বাঙ্গালীর সঙ্গীত-সাধনা একটি নির্দিষ্ট অভিজাত শিল্পী সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িল। ইহার সুনির্দিষ্ট পথেই ইহার ধারা অগ্রসর হইয়া চলিয়া জনসাধারণের উপভোগের ক্ষেত্র হইতে দূরবর্তী হইয়া পড়িল। ইহার মধ্য দিয়াও বাংলার লোক-সঙ্গীত নানা লৌকিক ধারার ভিতর দিয়া নিজের পথ খুঁজিয়া লইল।

ছয়

লোক-সঙ্গীত ও লোক-নৃত্য

বাংলার লোক-সঙ্গীতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, একমাত্র ভাটিয়ালী সঙ্গীত বাদ দিলে ইহার প্রায় অধিকাংশেরই সঙ্গে নৃত্যও সংযুক্ত। বাঙ্গালী যেমন সঙ্গীত-প্রিয়, তেমনই নৃত্যপ্রিয় জাতি। এমন কি, জীবনের সাধন-ভজনের নিগূঢ় তত্ত্বকথাও বাঙ্গালী নৃত্য-সম্বলিত সঙ্গীতের ভিতর দিয়াই প্রকাশ করিয়াছে—বাউল সঙ্গীতই তাহার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। বাউলের সাধনার মধ্যে নৃত্য এবং সঙ্গীত একসঙ্গে যুক্ত হইয়া আছে—নৃত্য ব্যতীত বাউল সঙ্গীত সম্ভব নহে। নৃত্যের একটি প্রধান আকর্ষণ এই যে, ইহার ভিতর দিয়াই সঙ্গীতের নিগূঢ় ভাবটি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবার সুযোগ পায়। নৈর্ব্যক্তিক ভাবই সঙ্গীতের অবলম্বন; সুরই সঙ্গীতের প্রধান আকর্ষণ, কিন্তু সুরের মধ্যে সঙ্গীতের ভাবটি অনেক সময় অস্পষ্ট হইয়া যায় বলিয়া ইহা প্রায়শঃই ভাবের দিক দিয়া আবেদন সৃষ্টি করিতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু ইহার মধ্যে নৃত্য সংযুক্ত হইয়া থাকিলে দেহের প্রত্যক্ষ ভঙ্গির ভিতর দিয়া সঙ্গীতের ভাবটি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবার সুযোগ পায়। সেজন্য আদিম সমাজে সঙ্গীতের যখন প্রথম জন্ম হয়, তখন নৃত্যও তাহার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছিল; ক্রমে আমরা সভ্যতার পথে যতই অগ্রসর হইতেছি, সঙ্গীতকে ততই নৃত্যের সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতেছি। এখনও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসী সমাজে নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গীত যুক্ত রহিয়াছে; নৃত্যের প্রকৃতি বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন হইলেও সঙ্গীতের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক কোন দিন ছিন্ন হয় নাই। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও যে সকল আদিবাসী বাস করে, তাহাদের মধ্যেও নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গীত যুক্ত হইয়া আছে। কিন্তু সমাজ-সংস্কারের 'সদিচ্ছা'-নানাদিক দিয়া আমাদের মধ্যে যে ভাবে প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, ইহাদের মধ্য হইতেও এই অভ্যাস অদূর ভবিষ্যতে লুপ্ত হইয়া যাইবে। বাংলাদেশে ইতিপূর্বেই তাহা বহুলাংশে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাও ভবিষ্যতে লুপ্ত হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। সেদিন কোন্ সঙ্গীতের সঙ্গে কোন্ প্রকৃতির নৃত্য সংযুক্ত ছিল, সেই তথ্য গভীর গবেষণা দ্বারাও উদ্ধার করা সম্ভব হইবে না।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'নাট-গীত' নামে একটি কথার উল্লেখ আছে। বিবাহ প্রমুখ উৎসবাদি উপলক্ষে সমৃদ্ধ গৃহস্থ মাত্রের গৃহেই নাট-গীতের অনুষ্ঠান হইত। নাট-গীতের অর্থ নৃত্যগীত, অর্থাৎ নৃত্য-সম্বলিত বিশেষ কোন সঙ্গীতানুষ্ঠান। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যেই যে ইহার অনুষ্ঠান হইত, তাহা বুঝিতে পারা যায়; সুতরাং ইহা গ্রাম্য কিংবা নিতান্ত লৌকিক স্তরের লঘু নৃত্যগীতানুষ্ঠান ছিল না। কৃত্তিবাস তাঁহার অনূদিত রামায়ণে উল্লেখ করিয়াছেন যে, শিবদুর্গার বিবাহ উপলক্ষে হিমালয়ের গৃহে নাট-গীতের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, যেমন,

নাট গীত দেখি শুনি পরম কুতূহলে।
কেহো বেদ পড়ে কেহ পড়য়ে মঙ্গলে॥
নানা মঙ্গল নাট গীত হিমালয়ের ঘরে।
পরম আনন্দে লোক আপনা পাশরে॥

লোক-সাহিত্যের ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া যেমন মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনই লোক-নৃত্যের ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়াই যে মধ্যযুগে নাট-গীতের উদ্ভব হইয়াছিল, এ কথা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এই নাট-গীত শ্রেণীর রচনা। কেবল মাত্র তিনটি চরিত্রের গীতি-সংলাপের মধ্য দিয়া কাহিনীটি সমাপ্ত হইয়াছে। এই তিনটি চরিত্র যে সঙ্গীতের মাধ্যমে কাহিনীটি পরিবেষণ কালে নৃত্যেরও সহায়তা গ্রহণ করিত, তাহা অনুমান করিতে বেগ পাইতে হয় না। সেইজন্য কেহ কেহ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে কৃষ্ণধামালী শ্রেণীর রচনা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। ধামালী বাংলার এক শ্রেণীর লোক-নৃত্য। ইহার বিষয় পরে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইবে। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য-ভাগবত' গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, চৈতন্যদেব চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে তাঁহার পার্ষদদিগকে সঙ্গে লইয়া একবার কৃষ্ণলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। সেই অভিনয়ের বর্ণনাটি পাঠ করিলে দেখা যায়, ইহা নৃত্য-সম্বলিত গীতাভিনয় ছিল। অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' মধ্যে যে প্রণালীতে কৃষ্ণপ্রসঙ্গটি পরিবেষণ করা হইত, ইহাও তাহারই ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কারণ, তাহাতেও নৃত্যের কথা এবং নৃত্য-সম্বলিত গীতের কথা উল্লেখিত আছে। কিন্তু

তাহা সত্ত্বেও নৃত্যই যে সেই অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, তাহা বৃন্দাবন দাসের এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়।

একদিন প্রভু বলিলেন সভাস্থানে।
আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বিধানে॥
সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানেরে ডাকিয়া।
বলিলেন প্রভু, 'কাচ সজ্জা কর গিয়া॥'

নৃত্যের জন্য যে সাজ-সজ্জা গ্রহণ করা হয়, তাহাকেই মধ্যযুগে কাচ বলিত। আধুনিক বাংলায় কোন কোন অঞ্চলে কাচ শব্দে নৃত্যই বুঝায়, যেমন ঢাকা অঞ্চলে কালীর নাচকে কালীকাচ বলে। এইভাবে মহাপ্রভু তাঁহার প্রত্যেকটি পার্ষদকে নৃত্যের জন্য সজ্জা গ্রহণ করিবার আদেশ দিলেন এবং নিজেও রুক্মিণীর বেশ ধারণ করিয়া নৃত্যের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তারপর

জগত-জননী ভাবে নাচে বিশ্বম্ভর।
সময় উচিত গীত গায় অনুচর॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইহাও গীত-সম্বলিত নৃত্যাভিনয়। ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্র কিংবা অন্য কোনও সঙ্গীত-নাটক সম্পর্কিত প্রাচীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থে এই শ্রেণীর নৃত্য কিংবা সঙ্গীতের কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং ইহা যে লোক-নৃত্যের ধারা অনুসরণ করিয়াই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। আধুনিক কালে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে যে নৃত্যনাট্য শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে এবং রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলি যে আদর্শে রচিত হইয়াছে, চৈতন্যদেব অনুষ্ঠিত নৃত্যনাট্যের মধ্যে তাহারই প্রথম পরিচয় লাভ করা যায়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ এ দেশীয় প্রাচীন লোক-নৃত্যের ধারা অনুসরণ করিয়াই যে তাঁহার নৃত্যনাট্যগুলি রচনা করিয়াছেন, তাহা নহে; কিংবা শান্তিনিকেতনের কলাভবনে যে নৃত্যশিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার সঙ্গেও যে বাংলার মধ্যযুগের লোক-নৃত্যের কোন যোগ আছে, তাহাও নহে; তথাপি ইহাদের উভয়ের মধ্যে যে প্রকৃতিগত অভিন্নতা আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হয়। সুতরাং দেখা যায়, মধ্যযুগের সাহিত্যে উল্লেখিত নাট-গীত ইহারই অনুরূপ কোন নৃত্যানুষ্ঠান; নৃত্যের সঙ্গে তাহাতে সঙ্গীত সংযুক্ত ছিল বলিয়াই তাহা নাট-গীত বলিয়া পরিচিত ছিল। মধ্যযুগের বাংলার রস-সংস্কারের মধ্যে ইহার একটি বিশেষ স্থান ছিল। তাহারও ধারা বাংলার রস-চেতনার মধ্য দিয়া অব্যাহত ভাবে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে।

মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক জীবনে এই নৃত্য-সম্বলিত গীত যে কেবল মাত্র সমাজের উচ্চস্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা নহে ; বরং দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমাজের নিতান্ত সাধারণ স্তর পর্যন্ত তাহা বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ইহার প্রকৃতি অনুসরণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা সমাজের উচ্চতর স্তর হইতে নিম্নতর স্তরে বিস্তার লাভ করিবার পরিবর্তে বরং নিম্নতর স্তর হইতেই সমাজের উচ্চতর স্তরে গিয়া আরোহণ করিয়াছে। লোক-সংস্কৃতির পক্ষে ইহাই নিয়ম।

বৃন্দাবন দাস রচিত 'চৈতন্য-ভাগবত' গ্রন্থখানি মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একখানি অমূল্য তথ্যভাণ্ডার। ইহার অন্যত্র এই বিষয়ের যে পরিচয় আছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, সমাজের নিতান্ত সাধারণ স্তরেও নাট-গীত বা গীত-সম্বলিত নৃত্যের একটি বিশিষ্ট রূপের অস্তিত্ব ছিল। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন, একদিন এক শিবের গায়েন নবদ্বীপে মহাপ্রভুর গৃহে আসিয়া সঙ্গীতসহ নৃত্য করিতে লাগিল,

> একদিন আসি এক শিবের গায়ন।
> ডমরু বাজায়—গায় শিবের কথন ॥
> আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে।
> গাইয়া শিবের গীত বেড়ি নৃত্য করে ॥

ইহা যে নিতান্ত লৌকিক স্তরের নৃত্য, অর্থাৎ প্রকৃতই লোক-নৃত্য সেই বিষয়ে কোন সংশয় নাই। নাট-গীতের মধ্যে যে নৃত্যাঙ্গ প্রচলিত ছিল, তাহাও লোক-নৃত্যের স্তর হইতে উন্নীত হইলেও ব্যক্তিগত অনুশীলন দ্বারা তাহাকে নানাদিক দিয়া গ্রাম্যতামুক্ত ও পরিচ্ছন্ন করিয়া লওয়া সম্ভব। কিন্তু এখানে যে নৃত্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা বাংলার তদানীন্তন লোক-নৃত্যেরই একটি সাধারণ রূপ বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। ইহার মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, গায়েন নৃত্যের ভিতর দিয়া তাহার সঙ্গীতের ভাব ব্যক্ত করিতেছে। সুতরাং এখানেও নৃত্যর সঙ্গে সঙ্গীত সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে, পরস্পরের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ নাই। মধ্যযুগের সাহিত্যের বিভিন্ন অংশে আরও যে সকল নৃত্যের বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাদের প্রায় সর্বত্রই নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গীত সংযুক্ত রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, বিজয় গুপ্ত

রচিত মনসা-মঙ্গলে একটি প্রাচীন পদ্ধতির শিবনৃত্যের বর্ণনাতেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিব মুখে গীত গাহিয়া নৃত্য করিতেছেন,

শিবাই নাচেরে মুখেতে গীত গাহে।
হাততালি দিয়া কিঙ্করে গীত গাহে॥

বাংলার লোক-নৃত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এইযে, ইহাতে অনিবার্যভাবে সঙ্গীতও যুক্ত হইয়া আছে, সঙ্গীত ব্যতীত নৃত্যের রূপ কল্পনাতীত। এই বিষয়টি বিশদ্‌ভাবে বুঝাইয়া বলিবার একটি বিশেষ কারণ আছে। সাধারণতঃ প্রাচীন পদ্ধতির (classical) নৃত্যে সঙ্গীত গৌণ স্থান অধিকার করে মাত্র। যেখানে দুরূহ মুদ্রার বিন্যাস এবং কঠিন অঙ্গ সঞ্চালন লক্ষ্য থাকে, সেখানে সঙ্গীত নৃত্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হইতে পারে না। কোন কোন ক্ষেত্রে নৃত্যকারী ব্যতীত অন্য ব্যক্তি সেখানে সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা দ্বারা সেই সঙ্গীত নৃত্যের অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ অঙ্গীভূত (integrated) হইতে পারে না। নৃত্য এবং সঙ্গীত যদি একটি অখণ্ড রস-সৃষ্টি করিতে না পারে, তবে সেই ক্ষেত্রে নৃত্যের আবেদন যেমন ব্যর্থ হয়, সঙ্গীতের আবেদনও তেমনই ব্যর্থ হয়। বাংলার লোক-নৃত্যে এই ত্রুটি প্রায় নাই বলিলেই চলে। প্রাচীন পদ্ধতির নৃত্যে এই ত্রুটি প্রকাশ পায়।

এ কথাও কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, লোক-নৃত্য মাত্রেরই ইহা একটি বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তাহা সত্য নহে। আমাদেরই প্রতিবেশী রূপে যে সকল আদিবাসী বাস করে, তাহাদের নৃত্যের দিকে লক্ষ্য করিলে সর্বত্রই যে ইহার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা নহে। ইহাদের অনেক ক্ষেত্রেই নৃত্য মৌন অনুষ্ঠান মাত্র। কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে যেখানে সঙ্গীত প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে, তাহাতে যদি নৃত্য থাকে, তবে তাহাও কোন উল্লেখযোগ্য রূপ লাভ করিতে পারে না। সাধারণতঃ সাঁওতালি ঝুমুর নৃত্যের কথাই যদি ধরা যায়, তাহা হইলেও দেখা যায় যে, তাহাতে সঙ্গীত যুক্ত থাকে সত্য, কিন্তু নৃত্য সেখানে বৈচিত্র্যহীন; বাংলার লোক-নৃত্যের মত জটিল নৃত্য তাহা নহে, সেই নৃত্যের পদ-সঞ্চালন ব্যতীত অঙ্গের আর কোন অংশই সঞ্চালিত হয় না। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে নৃত্যের যে প্রধান গুণ, তাহা তাহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতে পারে না। উড়িষ্যা প্রদেশের কোরাপুট জিলার অধিবাসী বোণ্ডা জাতির মধ্যে যে নৃত্য প্রচলিত আছে, তাহা আনুপূর্বিক মৌন অনুষ্ঠান, কোন

সঙ্গীত তাহাতে গীত হয় না। তাহার ফলে সেই নৃত্যও নির্জীব ও প্রাণহীন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাংলাদেশে এমন বিশেষ কোন লোক-নৃত্য নাই, যাহাতে সঙ্গীতের সম্পর্ক নাই। সেইজন্যই বাংলার লোক-নৃত্য এত শক্তিশালী।

উপরের আলোচনা হইতে এ কথাও মনে করা ভুল হইবে যে, বাংলার লোক-নৃত্য সর্বত্রই সঙ্গীতের সঙ্গে সংযুক্ত—ইহার দুই একটি ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। ইহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম শ্রীহট্ট ও কাছাড় অঞ্চলের 'বউ নাচ'। ইহা অবগুণ্ঠনবতী নববধূর নৃত্য মাত্র, ইহার মধ্যে কোন সঙ্গীত ব্যবহৃত হয় না, ইহাতে বধূ নিজেও যেমন কোনও গীত গাহে না, তেমনই অন্য আর কেহ তাহার নৃত্যের পটভূমিকায় সঙ্গীত পরিবেষণ করে না। ইহা পূর্ণাঙ্গ মৌন নৃত্য। বধূর মুখ ইহাতে অবগুণ্ঠন দ্বারা আবৃত থাকে বলিয়া কেবল মাত্র তাহার পদ-সঞ্চালন ও হস্তাঙ্গুলির মুদ্রাবিন্যাসই ইহাতে দর্শকের লক্ষ্য থাকে। অন্যত্র যেমন সঙ্গীত নৃত্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকে, ইহাতে তাহা হয় না। ইহার মধ্য দিয়া নৃত্যকারিণীর একটি অতি কঠিন দায়িত্ব পালন করিতে হয়। যেখানে সঙ্গীত নৃত্যের সহচর হইয়া থাকে, সেখানে নৃত্যের ত্রুটি সঙ্গীত দ্বারা পূর্ণ হয় এবং সঙ্গীতের মধ্যেও কোন ত্রুটি থাকিলে তাহাও নৃত্য দ্বারা পূর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে কেবল মাত্র নৃত্যই লক্ষ্য, সেখানে নৃত্যের মধ্যে বিশেষ আকর্ষণীয় গুণ বিকাশ করিতে না পারিলে তাহা আবেদন সৃষ্টি করিতে ব্যর্থ হয়; কারণ, নৃত্য ও গীত পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক (complement)। যেখানে একের অভাব, সেখানে অন্যকে সেই অভাব পূর্ণ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। কাছাড়ের 'বউ নাচে' সঙ্গীতের অভাব কেবল মাত্র নৃত্য দ্বারাই পূর্ণ হইয়া থাকে। ইহা হইতেই সেই নৃত্য যে একদিন কত উচ্চাঙ্গের ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

পূর্ব বাংলা বিশেষতঃ ঢাকার কালীকাচের মধ্যে কেবল নৃত্যই আছে, তাহাতে কোন সঙ্গীত নাই; তাহাতে সঙ্গীতের কিছু মাত্র অবকাশও নাই। অথচ এই নৃত্য যে প্রাণহীন কিংবা নির্জীব, তাহা বলিবার উপায় নাই। নৃত্যকারীর কৃতিত্বের উপরই ইহা নির্ভর করে। কালীকাচের মধ্য দিয়া সাধারণতঃ কালীর বেশ ধারণকারী নৃত্যকারীর সঙ্গে অসুরের একটি যুদ্ধের অভিনয় হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে সঙ্গীতের অভাব এক দিক দিয়া নৃত্য-

কুশলতা এবং অপর দিক দিয়া ইহার অভিনয়ের মধ্য দিয়া পূর্ণ হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে সঙ্গীতের কোন অবকাশই সৃষ্টি হইবার সুযোগ পায় না। কালী লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া নৃত্যের মধ্য দিয়া খড়্গহস্তে অসুরের মুণ্ডচ্ছেদ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া থাকেন, তাঁহার নিজের পক্ষে সঙ্গীত যে অসাধ্য, তাহা কেবল মাত্র তাঁহার লোলজিহ্বার জন্য নহে; যুদ্ধের অভিনয়ের ভিতর দিয়া যে ভাবে তাঁহাকে দ্রুত অঙ্গ সঞ্চালন করিতে হয়, তাহার মধ্য দিয়াও তাঁহার নিজের সঙ্গীত-পরিবেষণের কোন অবকাশ থাকে না। এ কথা সকলেই বুঝিতে পারেন, যে-নৃত্যে নৃত্যকারীর পক্ষে প্রবলভাবে অঙ্গ সঞ্চালনের প্রয়োজন, অর্থাৎ প্রধানতঃ যাহা তাণ্ডব শ্রেণীর নৃত্য, তাহার মধ্যে নৃত্যকারীর নিজের সঙ্গীত পরিবেষণের অবকাশ থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে এই অবস্থায় পটভূমিকা হইতে সঙ্গীত পরিবেষণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু তাহারও বিশেষ পরিবেশ বা situation-এর প্রয়োজন। অথচ কালীকাচের মধ্যে কালী কিংবা অসুর যে বিষয় অবলম্বন করিয়া যে ভাবে নৃত্য করিয়া থাকে, তাহাতে পটভূমিকা হইতেও সঙ্গীত পরিবেষণের অবকাশ থাকে না। যুদ্ধের অভিনয়টিই এখানে সঙ্গীতের অভাব পূর্ণ করিয়া দেয়। যেখানে এই শ্রেণীর অবকাশ লাভ করা যায় না, সেখানে সঙ্গীতই নৃত্যের অবলম্বন হইয়া থাকে। তবে উপরে যে 'বউ নাচে'র কথা উল্লেখ করিলাম, তাহার মধ্যে কেবল মাত্র নৃত্য-দক্ষতার গুণেই সঙ্গীতের অভাব পূর্ণ হইয়া যায়।

এখানে আরও একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। অনেক সময় কোন কোন আচার-নৃত্যের (ritual dance) সঙ্গে সঙ্গীতের কোন সম্পর্ক থাকে না। অধিকাংশ আচার-নৃত্য ঐন্দ্রজালিক নৃত্য (magical dance) হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ঐন্দ্রজালিক নৃত্যের উদ্দেশ্য লোক-মনোরঞ্জন নহে, বরং অলৌকিক। অলৌকিকতার প্রতি বিশ্বাস হইতেই ঐন্দ্রজালিক নৃত্য এবং অন্যান্য ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। 'বউনাচ'ও মূলতঃ ঐন্দ্রজালিক মনোভাব হইতেই যদি উদ্ভূত হইয়া থাকে, তবে তাহার অনুষ্ঠানের মধ্যে সঙ্গীত সংযুক্ত না থাকিবারই কথা। সুতরাং ঐন্দ্রজালিক নৃত্যের ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে বলিয়াই সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গীত যুক্ত হইতে পারে নাই। নতুবা সাধারণ আনন্দ অনুষ্ঠান হিসাবে যদি ইহা জন্মলাভ করিত, তবে ইহার সঙ্গে সঙ্গীতের সম্পর্ক থাকিত। উপরে যে কালীকাচের কথা উল্লেখ

করিলাম, তাহার সঙ্গেও একটি অলৌকিকতারপ্রতি বিশ্বাস জড়িত হইয়া রহিয়াছে, ইহার আচারটি প্রধানতঃ ধর্মীয়, কেবলমাত্র কৌতুককর (secular) নহে। সেইজন্য ইহার সম্পর্ক হইতেও সঙ্গীত পরিত্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায়, যে সকল লোক-নৃত্যের উদ্ভবের মূলে কোন ঐন্দ্রজালিক লক্ষ্য কিংবা অলৌকিকতার প্রতি বিশ্বাস থাকে, তাহাই প্রধানতঃ সঙ্গীত বিবর্জিত হয়, নতুবা লোক-নৃত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার সঙ্গে সঙ্গীত যুক্ত থাকিবেই।

নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গীত যুক্ত থাকিবার অর্থ সর্বদাই ইহাই নহে যে, নৃত্যকারী কিংবা নৃত্যকারিণী নৃত্যকালীন স্বয়ং অর্থাৎ নিজ কণ্ঠেই সঙ্গীত পরিবেষণ করিবেন। বরং যে ক্ষেত্রে নৃত্যকারীকে নৃত্যকালীন নিজ কণ্ঠে স্বয়ং সঙ্গীত পরিবেষণ করিতে হয়, সে ক্ষেত্রে নৃত্য খুব উচ্চাঙ্গের হইতে পারে না। সেইজন্য একক নৃত্যের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই নৃত্যকারী স্বয়ং গীত পরিবেষণ করিতে পারে না, বরং নেপথ্য কিংবা পটভূমিকা হইতে অন্য গায়ক তাহার হইয়া সঙ্গীত পরিবেষণ করিয়া থাকে। ইহাও গীত-সংবলিত নৃত্য বলিয়াই গৃহীত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ দেখা যায়, একক নৃত্যের অনুষ্ঠানে নৃত্যকারী স্বয়ং গীত পরিবেষণের পরিবর্তে তাহার পক্ষে পটভূমিকা কিংবা নেপথ্য হইতে অন্য গায়ক গীত পরিবেষণ করিয়া থাকে। কারণ, একক নৃত্যে নৃত্যকারীর দায়িত্ব অনেক বেশি। সমগ্র জনতার দৃষ্টি কেবল মাত্র তাহার দেহের উপর ন্যস্ত থাকে। কিন্তু সারি-নৃত্যের ক্ষেত্রে প্রায় সর্বদাই নৃত্যকারী দলই নৃত্যকালীন নিজেরাই সঙ্গীত পরিবেষণ করিয়া থাকে। সারি-নৃত্যের সঙ্গীতটি গৌণ হইয়া পড়ে, সমবেত কণ্ঠে সঙ্গীতের মধ্যে গানের পদ অস্পষ্ট হইয়া কেবল মাত্র একটি সুরই জাগিয়া থাকে ; কিন্তু একক নৃত্যের ক্ষেত্রে নৃত্যকারীর প্রতিটি অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে তাহার গীতের প্রতিটি শব্দ দর্শক এবং শ্রোতা অনুসরণ করিবার সুযোগ পায়।

পূর্ব বাংলার ঘাটু-নৃত্য, একক নৃত্য ; কিন্তু ইহার সঙ্গে যে সঙ্গীত যুক্ত হইয়া থাকে, তাহার দুইটি সুস্পষ্ট বিভাগ। প্রথমতঃ সমবেত সঙ্গীত, দ্বিতীয়তঃ একক সঙ্গীত। কখনও ঘাটু বালকের মৌন নৃত্যের পটভূমিকায় সমবেত জনতা এক সঙ্গে গান গাহিয়া থাকে, তাহার ফলে গানের প্রকৃত যে কার্যকারিতা, তাহা অনুভব করিতে পারা যায় না ; কিন্তু ইহার দ্বিতীয় অংশে

অর্থাৎ ঘাটু বালক নৃত্যকালীন স্বয়ং যে একক সঙ্গীত পরিবেষণ করিয়া থাকে, তাহার একটি বিশেষ আবেদন প্রকাশ পায়। ইহা কাছাড়ের বউ নাচের মত মৌন নৃত্যও নহে, ঘাটু বালক একক-নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গেই ইহাতে নিজ কণ্ঠেই সঙ্গীত পরিবেষণ করিয়া থাকে। একক নৃত্য ও একক সঙ্গীত একসঙ্গে পরিবেষণের দৃষ্টান্ত বাংলার লোক-নৃত্যে খুব সুলভ নহে। ইহা একটি অত্যন্ত কষ্টসাধ্য অনুষ্ঠান; কিন্তু তথাপি কেবল মাত্র শিক্ষার গুণে ঘাটু নর্তক এই দুঃসাধ্য কার্যটিরও অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। উপরে যে বলিয়াছি, একক নৃত্যের মধ্যে নৃত্যকারীর সঙ্গীতের সম্পর্ক প্রায় নাই, ঘাটু নৃত্য তাহার একটি দুর্লভ ব্যতিক্রম। ইহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বলিলেও চলে।

কোন কোন আদিবাসী সমাজের মধ্যে একই সঙ্গীতের সহায়তায় একক নৃত্য এবং সারি-নৃত্য একসঙ্গেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উড়িষ্যার দক্ষিণ সীমায় প্রবাহিত মুচুকুন্দ নদের উপত্যকায় নৃত্যগীত-কুশল গদবা নামক যে অষ্ট্রিক ভাষাভাষী জাতি বাস করে, তাহাদের মধ্যে যখন যুবতী নারীরা অর্ধ-বৃত্তাকারে সঙ্গীত সহকারে সমবেত-নৃত্য করিয়া থাকে, তখন তাহাদের সম্মুখেই 'রসিক' একতারা বাজাইয়া গান গাহিতে গাহিতে নৃত্য করিয়া থাকে; 'রসিকে'র নৃত্য একক নৃত্য, সে যুবতীদের সঙ্গে মিলিতভাবে নৃত্য করে না সত্য, কিন্তু মিলিত কণ্ঠে তাহাদের সঙ্গীতের সঙ্গে যোগ দেয়। রসিকের একক নৃত্য, তাহার একতারা বাদ্য এবং যুবতীদিগের সমবেত নৃত্যগীত ইত্যাদি সকলে মিলিয়া একটি অখণ্ড আনন্দরস-মণ্ডল রচনা করে। বাংলার লোক-নৃত্যে ইহার অনুরূপ অনুষ্ঠান এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে পশ্চিম বাংলার ভাদু-নৃত্যে কোন কোন অঞ্চলে এখনও ভাদু-গান গাহিয়া নিম্নশ্রেণীর কুমারী মেয়েরা ঢাকের তালে তালে নৃত্য করিয়া থাকে; কিন্তু ঢাকের বাদ্যকর সেই নৃত্য কিংবা সঙ্গীতে যোগ দেয় না। কোন সময় নৃত্যে যোগদান করিলেও সঙ্গীতে যোগদান করিতে কখনও দেখিতে পাওয়া যায় না। ঢাক যন্ত্রটির আয়তনও এই কার্যের অনুকূল বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

পশ্চিম বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল পুরুলিয়া জিলায় যে ছো-নাচ প্রচলিত আছে, তাহার সঙ্গে এখন আর সঙ্গীত যুক্ত থাকিতে শুনিতে পাওয়া যায় না। ইহা ছো-নাচের অধঃপতনেরই পরিচায়ক। এ কথা সত্য যে, ছো-নাচে নৃত্যকারীরা মুখোস ব্যবহার কয়িয়া থাকে; সেইজন্য তাহাদের পক্ষে সঙ্গীত

কার্যত অসম্ভব। কিন্তু সেইজন্য পটভূমিকা হইতে তাহাদের পক্ষ হইয়া সঙ্গীত পরিবেষণে কোন বাধা থাকিবার কথা ছিল না। ছো-নাচের মধ্য দিয়া কতকগুলি পৌরাণিক কাহিনী ব্যক্ত হইয়া থাকে, কেবলমাত্র নৃত্য দ্বারা তাহা কিছুতেই প্রকাশ করা সম্ভব হইতে পারে না, প্রকৃত পক্ষে হয়ও না। সেইজন্য মনে হয়, ছো-নাচের প্রাচীনতর যুগে ইহার সঙ্গে সঙ্গীতও পরিবেষিত হইত। কিন্তু বর্তমানে ঢাক নামক বাদ্যযন্ত্র কণ্ঠসঙ্গীতের সেই স্থানটি গ্রহণ করিয়াছে। আট-দশখানি ঢাকের শব্দ যখন সেই নৃত্যকালীন চারি দিগন্ত উচ্চকিত করিতে থাকে, তখন কণ্ঠসঙ্গীতের কথা কাহারও মনে উদয় হইবার অবকাশই পায় না। ঢাকের বাদ্যে কণ্ঠসঙ্গীতের অভাব পূর্ণ হইতে পারে না, অথচ মুখোস ব্যবহার করিবার ফলে এই শ্রেণীর নৃত্যেও কোন উৎকর্ষ প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। একদিকে মুখোসের ব্যবহার, অপর দিকে ঢাকবাদ্যের অসঙ্গত অধিকার ছো-নৃত্যে কণ্ঠসঙ্গীত প্রয়োগের অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার ফলে এই নৃত্য ক্রমেই বৈশিষ্ট্য বর্জিত হইয়া পড়িতেছে। বাংলার যে লোক-নৃত্যে ঢাক (drum) অসঙ্গতভাবে নিজের অধিকার স্থাপন করিয়াছে, তাহার মধ্যে কণ্ঠসঙ্গীতের প্রয়োগ অপ্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু যাহাতে ঢোল—বাংলার ঢোলই হোক, কিংবা বিহারী ঢোলকই হোক,—ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাতে কণ্ঠসঙ্গীতের প্রয়োগ সর্বত্রই প্রচলিত আছে। এমন কি, ঢোলের সঙ্গে কাঁসীর বাদ্য সংযুক্ত হইয়াও সঙ্গীতের সুরকে নীরব করিয়া দিতে পারে নাই। কিন্তু ঢাকের শব্দের সমুখে কণ্ঠসঙ্গীত সম্পূর্ণ নীরব হইয়া গিয়াছে। কণ্ঠসঙ্গীতের উৎকর্ষ হ্রাস পাইবার ফলেই যে নৃত্যের সঙ্গে ঢাকের বাদ্য আসিয়া যুক্ত হইয়াছে, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না।

সাত

লোক-সঙ্গীতের বিভাগ

সুরের দিক দিয়া বাংলা লোক-সঙ্গীতের দুইটি প্রধান বিভাগ—প্রথমতঃ সারি ও দ্বিতীয়তঃ ভাটিয়ালি। সে সুরে তাল আছে, তাহাই সারি; যাহাতে তাল নাই, তাহাই ভাটিয়ালি। তাহা ছাড়াও এমন অনেক সুর আছে, যাহাতে তাল মুখ্য না হইয়া গৌণ স্থান অধিকার করে, তাহা আপাতদৃষ্টিতে তালহীন ভাটিয়ালি বলিয়া মনে হইলেও, সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করিলে তাহাতে তালের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। সারি এবং ভাটিয়ালির মিশ্র সুরও আছে। কিন্তু মূলতঃ এই দুই শ্রেণীর সুরের উপর নির্ভর করিয়াই বাংলার লোক-সঙ্গীত গীত হয়। বিষয়-বস্তুর দিক হইতে বিচার করিলে ইহার বিভাগের সংখ্যা স্বভাবতই আরও বাড়িয়া যায়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সকল বিষয়েরই যে সুস্পষ্ট বিভাগ করা সম্ভব হয়, তাহাও নহে; যেমন, কতকগুলি সঙ্গীতের মধ্যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে, অর্থাৎ ইহারা বিশেষ নৈসর্গিক এবং সামাজিক কারণে দেশের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। অবশ্য তাহা সত্ত্বেও এ কথা সত্য নহে যে, বাংলা দেশের অন্যান্য অঞ্চলে তাহাদের আদৌ সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। প্রকৃত কথা এই যে, সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল ব্যাপিয়াই সঙ্গীতের দিক হইতে একটি অখণ্ড ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া এক অঞ্চলের যাহা প্রধান বৈশিষ্ট্য, তাহা অন্যান্য অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবেও গিয়া প্রচার লাভ করিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করিতে পারা যায় যে, যদিও বুঝিতে পারা যায়, বাংলাদেশের বিশেষ একটি অঞ্চলেই বিশেষ ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক কারণে পট আঁকিবার এবং পট দেখাইবার রীতির উদ্ভব হইয়াছিল, তথাপি তাহা সমগ্র বাংলাদেশেই কালক্রমে বিস্তার লাভ করিয়াছে। প্রত্যেক অঞ্চলই ইহার বিষয়-বস্তুর মধ্যে নিজস্ব আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য দান করিয়া লইয়া সেই বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে ইহার জনপ্রিয়তা রক্ষা করিতে সাহায্য করিয়াছে। সেইজন্য পশ্চিম বাংলায় রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত যেমন ইহার প্রধানতঃ অবলম্বন হইয়া থাকে, পূর্ববঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে মুসলমান ধর্মপ্রচারকদিগের ধর্মপ্রচারের অলৌকিক বৃত্তান্ত চিত্রিত করা হয়, তাহা গাজীর পট নামে পরিচিত। শুধু তাহাই নহে, পূর্ববাংলার হিন্দুসমাজের

মধ্যে রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের কাহিনী প্রচলিত আছে। সুতরাং যাহা আঞ্চলিক, তাহা বিশেষ কোন অঞ্চলেরই যে সম্পূর্ণ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, অন্যত্র তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না, তাহা নহে। এক এক অঞ্চলে তাহা প্রাধান্য লাভ করে এই পর্যন্ত বলিতে পারা যায়।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এমন কতকগুলি বিষয়ও আছে, যাহা এক একটি বিশেষ অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাহার দুইটি কারণ, প্রথমতঃ নৈসর্গিক, দ্বিতীয়ত জাতিতত্ত্বমূলক (ethnic)। বাংলার জনগোষ্ঠী মৌলিক যে সকল জাতির উপাদানে গঠিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যে একটি অখণ্ড ঐক্য ছিল না, তাহা সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন। পশ্চিম বাংলায় নিষাদ (Austro-Asiatic) ও দ্রাবিড়ভাষী জাতির প্রভাব দেখা যায়; কিন্তু পূর্ববাংলায় কিরাত (Indo-Mongoloid) জাতির প্রভাব দেখা যায়। ইহার উপর সমাজের উপরিস্তরে আর্যভাষী জাতির প্রভাবও ছিল। তারপর পাঠান, রাজপুত, তুর্কী, মঘ, পর্তুগীজ ইহাদের রক্ত বাঙ্গালীর ধমনীর মধ্যে একাকার হইয়া গিয়াছে। বাংলাদেশ নৃতত্ত্বের অনুশীলনের দিক হইতে ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয়; কারণ, ইহাতে যত বিচিত্র জাতির রক্তের একত্র সংমিশ্রণ হইয়াছে, ভারতের দুই একটি অঞ্চল ব্যতীত এমন আর কোথাও হয় নাই। সেইজন্য বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবন, ভাষা এবং ধর্মের মাধ্যমে বাহির হইতে যতই অভিন্ন সূত্রে আবদ্ধ হইবার প্রয়াস পাক্ না কেন, অন্তরের দিক হইতে ইহার মধ্যে এক একটি বিরোধ বা বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাই কোন কোন অঞ্চলের লৌকিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের মধ্য দিয়া অভিব্যক্তি লাভ করে। সেইভাবে এক একটি অঞ্চলের মধ্য দিয়া ইহার লোক-সঙ্গীত, কেবলমাত্র বিষয়-বস্তুই নহে, ইহার আঙ্গিকের মধ্য দিয়াও এক একটি বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে। সুতরাং লোক-সঙ্গীতের একটি আঞ্চলিক বিভাগও নির্দেশ করিবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সর্বদাই বিষয়-বস্তুর দিক হইতেই যে এই বিভাগের আবশ্যক তাহা নহে, সুর কিংবা আঙ্গিকের দিক হইতেও এই বিভাগের আবশ্যক হয়। কারণ, হিমালয়ের তরাই অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গার মোহনা এবং আর একদিকে পূর্ববাংলার জলাভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া করিয়া পশ্চিম সীমান্ত-বাংলার প্রস্তর ভূমি সর্বত্র বাংলার প্রাকৃতিক রূপ অভিন্ন নহে; ইহার এই বিচিত্র নৈসর্গিক রূপ ইহার লোক-সঙ্গীতের গীত-রীতির মধ্যেও

বৈচিত্র্য দান করিয়াছে। সুতরাং এই জন্যও লোক-সঙ্গীতের আঞ্চলিক বিভাগগুলি নির্দেশ করিবার প্রয়োজন হয়।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একটি ত্রুটি থাকিয়া যায়। বাংলার লোক-সঙ্গীতের একটি প্রধান বিষয় প্রেম। সুতরাং প্রেম-বিষয়ক লোক-সঙ্গীত লইয়া যদি একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ের পরিকল্পনা করা যায়, তাহা হইলেও দেখা যাইবে যে, অনেক আঞ্চলিক সঙ্গীতকেও ইহার অন্তর্ভুক্ত করিবার আবশ্যক হয়। কারণ, বহু আঞ্চলিক লোক-সঙ্গীতই প্রেমবিষয় অবলম্বন করিয়া লিখিত। কিন্তু প্রেমবিষয়ক যে সকল সঙ্গীত অন্যান্য দিক হইতে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন, তাহাদিগকেও আঞ্চলিক সঙ্গীতের পর্যায়ে নির্দেশ করা ভিন্ন উপায় নাই। তথাপি বিশেষ কোন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য হইতে মুক্ত প্রেম-সঙ্গীতও যাহা আছে, তাহাদের জন্য প্রেম-সঙ্গীতের একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়েরও আবশ্যক। নতুবা কেবলমাত্র আঞ্চলিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়াই প্রেম-সঙ্গীতের সম্যক্ পরিচয় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। অতএব আলোচনার সুবিধার জন্য সাধারণ ভাবে লোক-সঙ্গীতের কতকগুলি বিভাগ নির্দেশ করা সম্ভব হইলেও, এ কথা সত্য, কোন সুনির্দিষ্ট একটি বিভাগের মধ্য দিয়া লোক-সঙ্গীতের কোন একটি বিষয়ের সম্যক্ পরিচয় প্রকাশ করা সম্ভব নহে।

আঞ্চলিক বিভাগের পর বাংলার লোক-সঙ্গীতের যে আর একটি বিভাগের উল্লেখ করা যায়, তাহাকে ব্যবহারিক লোক-সঙ্গীত বলিয়া উল্লেখ করা যায়। ইংরেজিতে ইহাকে functional song বলা হয়। পারিবারিক জীবনের বিশেষ ব্যবহারের মধ্যেই ইহাদের স্থান, ইহাদের স্বাধীন কোন ক্ষেত্র নাই। যেমন বিবাহের গান। বিবাহের অনুষ্ঠান ব্যতীত সামাজিক কিংবা পারিবারিক অন্যান্য কোন ক্ষেত্রেই ইহাদের ব্যবহার নাই। ইহাদের মধ্যে প্রেম-সঙ্গীত আছে, এ'কথা সত্য ; কিন্তু এই প্রেম-সঙ্গীতগুলি বিবাহের বাসরেই গীত হয়, অন্যত্র গীত হয় না ; সেইজন্য প্রেম-বিষয়ক সঙ্গীত হওয়া সত্ত্বেও ইহাদিগকে ব্যবহারিক বা functional song-এর অন্তর্ভুক্ত করিবার আবশ্যক হয়। এ'কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিবাহ-সঙ্গীতের একটি আচারগত (ritual) মূল্য আছে। বিবাহানুষ্ঠানের সঙ্গে পরিবারিক জীবনের কল্যাণ, নববিবাহিত দম্পতির ভবিষ্যৎ সন্তান-লাভের শুভ-কামনা সবই জড়িত হইয়া থাকে। সুতরাং বিবাহের গান, বিবাহেরই বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের গান,

একদিক দিয়া ইহারা সাধারণতঃ পরিবর্তনের ধারাকেও স্বীকার করে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করিতে পারা যায় যে, বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলের সাঁওতাল জাতি বর্তমানে দো-ভাষী, অর্থাৎ তাহারা বাংলা এবং সাঁওতালী উভয় ভাষাই ব্যবহার করিয়া থাকে, সেই সূত্রে তাহাদের মধ্যে প্রচলিত সঙ্গীতগুলিও দুই ভাষাতেই গীত হইয়া থাকে। কিন্তু দেখা যায়, সাধারণ প্রেম-সঙ্গীত গাহিবার সময় তাহারা বাংলা ভাষাতেই তাহা গাহিয়া থাকে, কিন্তু বিবাহানুষ্ঠানে যে প্রেম-সঙ্গীত গাহে, তাহা এখনও সাঁওতালী ভাষায় গাহিয়া থাকে, ইহাদের ভাষার মধ্যে তাহারা পরিবর্তন স্বীকার করিয়া লয় নাই। বিবাহের গান এক হিসাবে আচার-সঙ্গীত বা ritual song ; আচার সঙ্গীত মাত্রই রক্ষণশীল, সহজে তাহা পরিবর্তিত হয় না। সেইজন্য বিবাহ এবং অনুরূপ সামাজিক আচার উপলক্ষে যে সকল গান ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া উপায় নাই।

বিবাহ-সঙ্গীতের আচার সঙ্গীতগুলি বাংলার দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যেমন, হিন্দু সমাজের বিবাহের গান এবং মুসলমান সমাজের বিবাহের গান। এতদ্ব্যতীত বাংলার সীমান্তবর্তী যে সকল আদিবাসী অঞ্চল বাংলা ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাদের বিবাহ এবং অন্যান্য সামাজিক কিংবা পারিবারিক আচারের গান সমূহের মধ্যেও পরস্পর পার্থক্য আছে। কারণ, এই সকল সমাজে গানই বিবাহের প্রধান আচার, পুরোহিতের মন্ত্র তাহাতে কোন স্থান লাভ করিতে পারে না। সেইজন্য এই সকল সমাজে বিবাহের গানে বৈচিত্র্যের অন্ত নাই। সুতরাং এই শ্রেণীর গানকেও স্বতন্ত্র অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিবার আবশ্যক হয়।

বাংলার প্রত্যেক লৌকিক ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানেই সঙ্গীত একটি প্রধান অংশ অধিকার করিয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ উৎসবানুষ্ঠানের সঙ্গেই ইহাদের সম্পর্ক বলিয়া ইহাদিগকে আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত বলা যায়। ব্যবহারিক সঙ্গীতের সঙ্গে যেমন পারিবারিক অনুষ্ঠানের সম্পর্ক, তেমনই আনুষ্ঠানিক সঙ্গীতের সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের সম্পর্ক। কিন্তু ইহাদের প্রচলন বিশেষ এক একটি অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ গাজনের গান গাজন ব্যতীত শুনিতে পাওয়া যাইবে না। ইহারাও আচারমূলক। সঙ্গীতের মধ্য দিয়াই বিশেষ বিশেষ আচার পালন করা হয়। অবশ্য এই সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে

অনেক আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য লাভ করে। তথাপি সমগ্র বঙ্গভাষী অঞ্চলের মধ্য দিয়া যে এক অখণ্ড সাংস্কৃতিক ঐক্যও গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহারা তাহারও ধারক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, পশ্চিমে পুরুলিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বে কাছাড় জিলা পর্যন্ত বঙ্গভাষী অঞ্চলের প্রকৃতির মধ্যে যে পার্থক্যই প্রকাশ পাক না কেন, এই বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপিয়া চৈত্র সংক্রান্তির দিন যে গাজন অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে, তাহার বিভিন্ন আচারের মধ্য দিয়াও মৌলিক বিষয়ে এক অখণ্ড ঐক্য রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু আনুষ্ঠানিক সঙ্গীতগুলি বিভিন্ন ধর্মীয় এবং সামাজিক আচার উপলক্ষ করিয়াই রচিত হইয়াছে বলিয়া ইহারাই সর্বাধিক সাহিত্যগুণ বিবর্জিত। সেইজন্যও আচারানুষ্ঠানের ক্ষেত্র ব্যতীত ইহারা প্রচার লাভ করিতে পারে না।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, প্রেম লোক-সঙ্গীতের একটি প্রধান বিষয়। প্রত্যেক জাতির মধ্যেই ইহাকে অবলম্বন করিয়াই সর্বাধিক সংখ্যক সঙ্গীত রচিত হইয়া থাকে। বাংলাদেশেও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় না। বাংলাদেশের প্রেম-সঙ্গীতের একটি প্রধান অংশে নায়ক-নায়িকা রূপে রাধাকৃষ্ণের নাম প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রেম-সঙ্গীতের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ইহা দ্বারা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কারণ, রাধাকৃষ্ণ ইহাতে ভাগবত কিংবা বিষ্ণুপুরাণ হইতে আগত চরিত্র নহে, বরং তাহার পরিবর্তে সাধারণ নরনারীর জীবন হইতেই আগত। সুতরাং রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক প্রেম-সঙ্গীত এবং সাধারণ প্রেম-সঙ্গীতে পার্থক্য নির্দেশ করিয়া পরস্পর স্বতন্ত্র কোন অধ্যায় রচনার আবশ্যকতা নাই। রাঢ় এবং পূর্ববঙ্গে বৈষ্ণব প্রাধান্য অত্যন্ত ব্যাপক হইয়াছিল বলিয়া সেখানকার প্রেম-সঙ্গীতে রাধাকৃষ্ণের নাম যত ব্যাপক ভাবে প্রবেশ করিয়াছে, উত্তরবঙ্গের সাধারণ জনসমাজের মধ্যে তাহা তত ব্যাপক হইতে পারে নাই বলিয়া সেখানকার লোক-সঙ্গীতে তাহার ব্যাপক প্রভাব দেখা যায় না। কিন্তু যেখানেই তাহা প্রবেশ করুক না কেন, তাহাতে কোথাও সাধারণ লোক-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য পরিত্যক্ত হয় নাই।

ইংরেজি work song-এর মত বাংলার লোক-সঙ্গীতকেও কর্মসঙ্গীত নামে একটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়। এই শ্রেণীর সঙ্গীত যেমন কর্মের সঙ্গে সংযুক্ত, তেমনই নৃত্যের সঙ্গেও সংযুক্ত। নৃত্যও কর্মেরই তুল্য। সুতরাং নৃত্যসম্বলিত সঙ্গীতকেও ইহার মধ্যেই আলোচনা করা আবশ্যক। লোক-সঙ্গীত নানাভাবে

নৃত্যের সঙ্গে সংযুক্ত ; অনেক ক্ষেত্রে নৃত্য লুপ্ত হইয়া গিয়া সঙ্গীত অন্য প্রকার কর্মের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া যায়। এ দেশেও নৃত্যের ক্রমঅপ্রচলনের মধ্য দিয়া নৃত্য সম্বলিত সঙ্গীত সাধারণ কর্মের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। নৃত্য সম্বলিত সঙ্গীতকেও কর্মসঙ্গীতের মধ্যে আলোচনা করা যাইবে।

ধর্ম-সঙ্গীতের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। যে ধর্মচেতনা লোক-জীবন হইতে উৎসারিত হইয়া বাঙ্গালীর জীবন নানাদিক দিয়া প্রভাবিত করিতেছে, তাহা ভিত্তি করিয়া রচিত বাংলা গান স্বভাবতঃই বাংলার লোক-সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করিতে হয় ; তবে এ'কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, একান্ত যাহা ধর্মের তত্ত্বাশ্রয়ী, যাহার সঙ্গে বহির্মুখী মানব-জীবনের কোন সম্পর্ক নাই, তাহা যথার্থ লোক-সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।

লোক-সঙ্গীতের উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ হইতে এ'কথা যেন কেহই মনে না করেন যে, সকল শ্রেণীর সঙ্গীতই ইহার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিয়াছে। এমন বহু সঙ্গীত আছে, যাহাদিগকে বিশেষ কোন শ্রেণীভুক্ত করা যায় না, কেবলমাত্র আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য সাধারণভাবে উপরে একটি শ্রেণীবিভাগ নির্দেশ করা হইল। বিবিধ নামেও একটি বিভাগ করা যাইত, কিন্তু তাহার বিষয়-বস্তু এত বিভিন্নমুখী যে, তাহা দ্বারা একটি বিভাগের মধ্যে একটি অখণ্ড রস কিছুতেই সৃষ্টি হইতে পারে না ; সুতরাং বিবিধ নামক বিভাগটি পরিত্যাগ করাই প্রয়োজন মনে করিলাম। তবে প্রত্যেক অধ্যায়েরই শেষে সেই অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়ের প্রায় অনুরূপ অন্যান্য বিষয়েরই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহাতে বিবিধ অধ্যায়ের বিভিন্নমুখী বিষয়-বস্তুর পরিবর্তে কতকটা অভিন্ন প্রকৃতির বিষয়-বস্তুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যাইতে পারিবে।

প্রথম অধ্যায়

আঞ্চলিক সঙ্গীত

পূর্বেই বলিয়াছি যে, কতকগুলি লোক-সঙ্গীতের মধ্যে বাংলার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য এত স্পষ্ট ভাব প্রকাশ পাইয়াছে যে, তাহা প্রধানতঃ এইজন্যই বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে সমানভাবে প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। এমন কি, বিষয়-বস্তু কিংবা মৌলিক ভাবের (idea) মধ্যে কোন আঞ্চলিক বিশেষত্ব না থাকিলেও ইহাদের ভাষায় এবং অন্যান্য পরিবেষণ রীতিতে এমন এক একটি বিশেষত্ব প্রকাশ পাইয়াছে যে, তাহা সেইজন্য অন্যান্য অঞ্চলে প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। এই শ্রেণীর গানের মধ্যে প্রথমেই পটুয়ার গানের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের পরিচিত কাহিনী অবলম্বন করিয়া পটুয়ার গান রচিত হইয়া থাকে ; রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের কাহিনী সাধারণভাবে বাঙ্গালীর নিকট পরিচিত হইলেও বিশেষ একটি রীতি অবলম্বন করিয়া যে গীতিকাহিনীগুলি পরিবেষণ করা হয়, সেই রীতিটি বাংলার সর্বত্র পরিচিত নহে। প্রথমতঃ অঙ্কিত চিত্রপটের সঙ্গে কাহিনীগুলি সংযুক্ত, চিত্রপট ব্যতীত ইহাদের কোন অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। বিশেষ ঐতিহাসিক এবং সামাজিক কারণে বাংলাদেশের বিশেষ একটি অঞ্চলে বিশেষ প্রকৃতির চিত্রপট অঙ্কন এবং তাহার প্রদর্শনীর প্রচলন হইয়াছিল ; এই বিশেষ অবস্থা বাংলাদেশের অন্যত্র ছিল না বলিয়া অন্যত্র অনুরূপ চিত্রপট অঙ্কিত হইবার রীতি প্রচলিত হইতে পারে নাই ; সেইজন্য অন্যত্র অনুরূপ পটুয়ার গান রচিত হয় নাই। সুতরাং পটুয়ার গানকে আঞ্চলিক লোক-সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত করিবার প্রয়োজন হয়। এইভাবে আরও অন্যান্য লোক-সঙ্গীত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে রচিত হইয়া নিজস্ব অঞ্চলেই প্রচলিত হইয়াছিল। অন্যত্র বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই।

লোক-সঙ্গীতের দিক হইতে বাংলাদেশকে প্রধানতঃ চারিটি অঞ্চলে ভাগ করা যায় ; যেমন রাঢ়, পশ্চিম বঙ্গ, উত্তর বঙ্গ, উত্তর-পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম জিলা লইয়া রাঢ় অঞ্চল ; হুগলী, হাওড়া, চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ জিলা লইয়া পশ্চিম বঙ্গ

অঞ্চল; মালদহ, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, রংপুর লইয়া উত্তরবঙ্গ অঞ্চল; পূর্ব মৈমনসিংহ, পশ্চিম শ্রীহট্ট, উত্তর ত্রিপুরা লইয়া উত্তর-পূর্ব এবং নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম লইয়া দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল গঠিত হইয়াছে। যে অঞ্চলকে পশ্চিম বঙ্গ অঞ্চল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, অর্থাৎ ভাগীরথীর দুই তীরবর্তী অঞ্চল—তাহা এক দিক হইতে রাঢ়, অপর দিক হইতে উত্তর বঙ্গ এবং আর এক দিক হইতে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ কর্তৃক প্রভাবিত হইবার ফলে ইহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সর্বত্র খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। সেইজন্য হুগলী-হাওড়ায় রাঢ়ের প্রভাব, মুর্শিদাবাদে বর্ধমান ও মালদহের প্রভাব এবং যশোহর খুলনায় দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অনুভূত হইবে।

যে সকল অঞ্চলের একটি প্রাচীন ঐতিহ্য আছে, তাহাতেই লোক-সংস্কৃতির নানা বিচিত্র উপকরণ বিকাশ লাভ করিতে পারে। প্রাধনতঃ দুইটি কারণ লোক-সংস্কৃতির পরিপুষ্টির সহায়ক; প্রথমতঃ বিভিন্ন জাতির সাংস্কৃতিক উপকরণের একত্র সংমিশ্রণ এবং দ্বিতীয়তঃ প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। কোন অঞ্চলে যদি একটি উচ্চ সাংস্কৃতিক জীবন কোনদিন গড়িয়া উঠিয়া ক্রমে লুপ্ত হইয়া যায়, তবে তাহা জনসাধারণের মধ্যে আশ্রয় লইয়া লোক-সংস্কৃতির রূপে কিছুকাল আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। উড়িষ্যার মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ দেবদেবী ও লতাপাতার মূর্তি-গুলির মধ্যে দেবদেবী লুপ্ত হইয়া গিয়া কেবলমাত্র লতাপাতার অভিপ্রায় (motif) গুলি সাধারণ গৃহস্থবধূর আলপনার রূপে আজিও আত্মরক্ষা করিতেছে। উচ্চতর সংস্কৃতি অধঃপতিত (degenerated) হইয়া এইভাবে অনেক ক্ষেত্রেই লোক-সংস্কৃতির রূপ লাভ করে, সুতরাং যে অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যত প্রাচীন, সেই অঞ্চলে লোক-সংস্কৃতির বিচিত্র রূপ নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে। উড়িষ্যার লোক-সংস্কৃতির সমৃদ্ধি এবং বৈচিত্র্য উপরোক্ত দুইটি দিক হইতেই আসিয়াছে। প্রথমতঃ ইহাতে হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে আদিম জাতির সংস্কৃতির মিলন হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ হিন্দু সংস্কৃতি অধঃপতিত হইয়া লোক-সংস্কৃতির স্তরে বিস্তার লাভ করিয়াছে। বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে ইহার যে সকল অঞ্চলের মধ্যে দেখা যায় যে, বিশেষ এক একটি ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতেই যেমন লোক-সংস্কৃতির বিবিধ উপকরণের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটে, তেমনই যেখানে বিভিন্ন জাতির সঙ্গে নানাভাবে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ হইয়াছে, সেখানেও তাহার অস্তিত্ব অনুভব

করা যায়। এইভাবেই জাতির সংস্কৃতির মধ্যে এক একটি আঞ্চলিক বিশেষত্বও গড়িয়া উঠিয়াছে।

বাংলার লোক-সংস্কৃতির রূপ বাংলার প্রান্তিক অঞ্চলগুলিতে যত নিখুঁত ভাবে আজও আত্মরক্ষা করিয়া আছে, অন্য কোন অঞ্চলে তাহা তেমন নাই। সুতরাং বাংলার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি হইতেই বাংলার লোক-সঙ্গীতের আঞ্চলিক রূপগুলির সন্ধান করা যাইবে।

এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। আঞ্চলিক অর্থে এ কথা যেন মনে না হয় যে, ইহাদের প্রত্যেকটি সঙ্গীতই একই অঞ্চলের সম্পূর্ণ নিজস্ব; ইহা কতক সত্য হইলেও পূর্ণ সত্য নহে। অনেক সময় দেখা যায়, রাঢ় অঞ্চলের পটুয়ার গান পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গেও প্রচারিত হইয়াছে, তবে সেখানে গিয়া তাহাদের বিষয়ের মধ্যে কিছু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। রামায়ণ ভাগবতের সাধারণ বিষয় ব্যতীত প্রত্যেক স্থলেই কিছু কিছু আঞ্চলিক বিষয় যে ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সে বিষয়ে প্রত্যেক অঞ্চলেরই স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু রামায়ণ, ভাগবত, গৌরাঙ্গলীলা প্রভৃতির বিষয় এক অঞ্চলের সীমানা অতিক্রম করিয়া অন্য অঞ্চলেও বিস্তার লাভ করিয়াছে। তবে পরিবেষণের ভঙ্গির মধ্যে সেখানেও প্রত্যেক অঞ্চলেরই স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পাইয়াছে।

বাংলাদেশে সাধারণভাবে 'কানু ছাড়া গীত নাই'—এ'কথা সত্য, সাধারণতঃ রাধাকৃষ্ণ এবং গৌরাঙ্গলীলা অবলম্বন করিয়া যে সকল সঙ্গীত রচিত হয়, তাহা সকল অঞ্চলেই সমান আবেদন সৃষ্টি করিতে পারে। সেইজন্যং ইহারা গঠনের দিক দিয়া আঞ্চলিক হইয়াও ভাবের দিক দিয়া সর্বজনীন হইয়া উঠে।

এক

পটুয়ার গান

বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল হইতে যদি দেশের প্রধানতঃ প্রান্তিক অঞ্চলগুলি পরিক্রমণ করিতে আরম্ভ করা যায়, তবে সেই অঞ্চলে যে বিশেষ প্রকৃতির এক শ্রেণীর সঙ্গীতের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, তাহাই পটুয়ার গান। একদিন মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অর্থাৎ প্রধানতঃ তমলুক অঞ্চলেই ইহার ব্যাপক প্রচলন ছিল। প্রথমতঃ তাম্রলিপ্ত বা প্রাচীন তমলুকের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও দ্বিতীয়তঃ উড়িষ্যার সঙ্গে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক মিলন-ক্ষেত্র বলিয়া এই অঞ্চলেই ইহার প্রথম উদ্ভব ও বিকাশ হইয়া থাকিবে। আজিও তমলুকের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে পটুয়া নামক এক শ্রেণীর সম্প্রদায় পট আঁকিয়া গৃহস্থের বাড়ীতে বাড়ীতে সঙ্গীতসহ তাহার প্রদর্শনী করিয়া থাকে। কিন্তু এই অঞ্চলে ইহা আজ প্রায় বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে, বরং বাংলার লোক-সঙ্গীতের রাঢ় অঞ্চল বলিয়া যাহাকে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার অন্যত্র বিশেষতঃ বীরভূম অঞ্চলে ইহার প্রভাব এখন পর্যন্ত কতকটা সক্রিয় আছে।

লোক-সঙ্গীতের অন্যান্য বিষয়ের মত পটে আঁকিবার বিষয়-বস্তু যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। এই অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাববশতঃ ইহাতে বৈষ্ণব বা ভাগবত প্রসঙ্গ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তারপর রামায়ণ কাহিনীও বৈষ্ণবভাবে অনুপ্রাণিত বলিয়া তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। লৌকিক বিষয়ের মধ্যে মনসা-মঙ্গলের কাহিনীও কতকটা স্থান অধিকার করিয়াছে।

কৃষ্ণ-বিষয়ক পটগুলির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপ কদাচ প্রকাশ পায় না; 'এমন কি, সাত্ত্বিক মাধুর্য রূপও যে প্রকাশ পায়, তাহাও নহে—বরং তাহাদের পরিবর্তে তাঁহার নিতান্ত লৌকিক রূপটিই প্রকাশ পাইয়া থাকে। নিম্নোদ্ধৃত পটখানিই তাহার প্রমাণ।

১

কৃষ্ণলালা

কানিয়া কদম্বমূলে নাগরিয়া থানা
বনফুল গাঁথিয়ে কৃষ্ণের গলে বনমালা।

হাত বাঁকা পায় বাঁকা বাঁকা মাজাখানি,
চরণের নূপুর বাঁকা চূড়ার টান্থনি।
চূড়া বাঁধে নানা ছাঁদে অলকা দুলালী
তাও দেখে ভোলে ব্রজের ষোল শ রমণী।
তার ধারে ধারে নাম লিখেছে রাধা বিনোদিনী
চার কড়ার বাঁশী নয় ঠাকুর পিতলের ছোঁয়ানি।
কোন কোন গোপী বলে, বাঁশ বাঁশিয়া নয় তরল বাঁশের ডগা
ডাকে নাম ধরে বাঁশী সদাই রাধা রাধা।
সেই বাঁশী দিবানিশি করে অপমান
সেই বাঁশীতে ভোলায় সকল ব্রজ-গোপীগণ।
পাড়ে বসন রেখে তবে জলখেলা করে,
গোপীর বসন লয়ে কানাই সেদিন ডালে বন্ধন করে।
জলখেলা করতে গোপী পার পানে চায়,
শুকান বস্ত্রখানি দেখিতে না পায়।
ঝড় নাই ঝঙ্কার নাই বস্ত্র কেবা লয়,
নন্দের বেটা চিকণ কালা গোপীর বসন ধ'রে লয়।
কে নিলে বস্ত্র সকল গোপীগণ কৈঁকায়।
বলে চল চল যাব আমরা কংস রাজার ঠাঁই,
কৃষ্ণের অভিতাপে আর জাতি কুল নাই।
কৃষ্ণ বলে বারে বারে তোমরা দিওনা কংসের তুলনা,
আমি শিশুকালে বধেছি কংসের ভগিনী পুতনা।
বলে, পুরুষ বট শ্যাম নাগর সব তোমার সাজে
আমরা যদি পুরুষ হতাম মরে যেতাম লাজে।
পরের নারীর বসন লয়ে কেবা ডালে বাঁধে।
জলখেলা সাঙ্গ হল, সকল গোপী গৃহে চলে যায়।
তখন সাজ সাজ বলে বড়াই নগরে দিল সাড়া
বড়াই বুড়ীর বাত্রায় সাজিল গোপের পাড়া।
কে কে যাবি গোপী সকল তোমরা মথুরার হাটে চল
তখন রাধে বালে ওগো দধির ভার লবে কে ?

বলে নন্দের বেটা চিকণ কালা ওকে দধির ভার লয়ে দাও
শুভ সুবর্ণার বাঁকখানি বেল্ল পাটের শিকে
কৃষ্ণের কাঁধে ভার দিয়ে গো লয়ে চলিল রাধিকে।
আমাদের যেথায় না বিকাবে দধি সেথায় নিয়ে যাব,
মনের সহিত তোমায় নগরে ঘুরাব।
কৃষ্ণ বলছে আমরা তো বইনা ভার জগতেরি সার।
রাধা প্রেমের জন্য তাইতে কাঁধে বইছি ভার।
তখন দধি দুগ্ধ ছানা মাখন লয়ে চলিল
দানখণ্ডে গিয়ে তখন উপস্থিত হইল।
শীঘ্রগতি পার কর কানাই তুমি বেলাপানে চেয়ে
দহি দুগ্ধর সময় যাচ্ছে বয়ে। •
দুগ্ধের লব পণ পণ নবনীর লব বুড়ি,
কড়া কমতি হলে আমি মারব চোঙ্গার বাড়ি।
বড়াই বলে কাজে নাই কানাইয়া কৃষ্ণ তোমার ভাঙ্গা লা
ডরাইছে গোপের নারী কপালে মারে ঘা।
কৃষ্ণ বলে ভাঙ্গা লয় টুটা লয় ভক্তি-ভাবের তরী
হস্তী ঘোড়া পার করেছি ওগো শ্রীরাধা কত ভারী।
সব সখীকে পার করিতে লিব আনা আনা
শ্রীরাধাকে পার করিতে লিব কানের সোনা।
সোনা লাও শাড়ী লাও সকল দিতে পারি
তবু তো দুকুল যমুনার জলে হেঁটে যেতে নারি।
এই ঘাটের নৌকাখানি ওঘাটে লাগাল
মথুরায় গমনে সকল গোপী চলিল।
মথুরাতে গিয়ে গোপী করে বেচা কেনা,
দ্বারে বাজ্‌ছে নহবতখানা প্রেম কাঙ্গালী যেতে মানা।
ডাকিলে উত্তর মেলে না বুঝি বিষয় গেল
এইখানে সকল খেলা সাঙ্গ হয়ে গেল।

—বীরভূম

শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের মধ্যে যে ঐশ্বর্যগুণের অস্তিত্ব ছিল, তাহা এদেশে *শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের প্রভাব বশতঃ সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গিয়া* উভয়ের মধ্যে আর কোন পার্থক্য অবশিষ্ট রহিল না। তবে শ্রীকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ যেমন রস-প্রধান, রামকাহিনী তেমন নহে; তাহার মধ্যে একদিকে কাহিনী এবং আর একদিকে পারিবারিক কর্তব্যবোধ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; সেইজন্য ইহার রচনা অনেকটা সংযত।

রাম-জন্মের পূর্ব হইতে সীতার সঙ্গে রামের বনবাস পর্যন্ত মূল ঘটনাগুলি নিম্নোদ্ধৃত পটের মধ্য দিয়া সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

২

রামলীলা

রাম রাম পিভু রাম কমললোচন
দিব্যাদলে শ্যাম রাম জানকীই জীবন।
রথের উপরি রঘুনাথ কিঞ্চিৎ ভূমিস্তলে
হৃদয় পেসন্ন নাম, মধুর বাক্য বলে।
বামে সীতা বসিবে ডাইনে লক্ষ্মণ
রত্ন সিংহাসনে বসে প্রভু নারায়ণ।
যাহার নাম লইলে খণ্ডিবে দেহের পাপ।
পুরাণে ছিলেন বাল্মীক মনি জানিবেন আপনি।
ছিরাম জন্মিবে প্রভু জানিছে আপনি
পিতা হবে দশরথ অজির নন্দন।
রামের কথা কিবা কব বাখান
যাহার গুণে বনের বন্দী পাষাণ ভাসে জলে।
শিকার করিতে রাজা করিলেন সাজন
সিন্ধুমনির স্থপবনে রাজা দিল দরশন।
সিন্ধুমনিকে বাণ মারে স্থরয নদীর কোলে
রাম নামের ধন্যি ক'রে সিন্ধু জলেতে পড়িল।
রাম নামের ধন্যি রাজা কর্ণেতে শুনিল
হাতের ধেনুক বাণ রাজা ভূমিস্তে রাখিল।
পাতালি কোলে কোরে আসি সিন্ধুমনির নিকটে আসিল।

নেপুরের উহুঝুনু প্রভু শুনিতে পাইল।
এসো এসো বলে সিন্ধু বলে সম্ভাষণ করিল।
এক নিবেদন করি গো, মনি মহাশয়
তোমার সিন্ধু মারা গেছে সুরয নদীর কুলে।
আরে কি কার্য করিলি রাজা কি কার্য করিলি
আমার অন্ধের নড়ি রাজা তু কেন ভাঙ্গিলি।
আমি যেমন পুত্রশোক পাইলাম আচম্বিতে
এমনি পুত্রশোক রাজা পাবি অযোধ্যানগরে।
অপুত্রবর ছিল রাজার পুত্রবর হইল
সহস্তি সহস্তি করে নাচিতে লাগিল।
মিথিলা নগরে আসি যজ্ঞ আরম্ভিল
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি এসে যজ্ঞ পুর্ণ দিল
যজ্ঞ থেকে দুইটী তরু জুটিল।
মিথিলা, কৈকয়, কৌশল্যা, বাঁটিয়া খাইল
রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন চার ভাই জন্মিল।
কত বাদ্য বাজনা বাজিতে লাগিল।
আনন্দেতে দশরথ পুত্র লয়ে কোলে
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেন বদনকমলে।
রামলক্ষ্মণের কথা বিশ্বামিত্র শুনিতে পাইল
শ্রীরাম সইতে প্রভু যাত্রা করিল।
রামলক্ষ্মণ চাইতে দশরথ,
রামলক্ষ্মণ লুকায়ে থুয়ে ভরতশত্রুঘ্ন দিল।
ভরতশত্রুঘ্ন লইয়া প্রভু যাত্রা করিল
তেমাথা রাস্তায় এসে বাত্রা শুধাইল।
ছ'দিনের পথে যাবে না ছ'মাসের পথে যাবে ?
ছ'দিনের পথে প্রভু কিবা ভয় আছে ?
তাড়কা রাক্ষস বধে হে পরাণে।
তাড়কার নাম যখন ভরতশত্রুঘ্ন শুনিল
ডরে ডরে কম্পমান কাঁপিতে লাগিল।

বিশ্বামিত্র মনি তখন অভিশম্প করিল
অযোধ্যানগরে মনির শাঁপেতে অগ্নিবৃষ্টি হল।
রামলক্ষ্মণ তাহা জানিতে পারিল
বিশ্বামিত্র মনি পুনরায় আসি রামলক্ষ্মণে লইল
আচম্বিতে মেঘবৃষ্টি হয়ে অগ্নিনির্বাণ হইল।
তেমাথার রাস্তায় এসে বাত্রা শুধায়
ছ'দিনের পথে যাবে না বাপু ছ'মাসের পথে যাবে ?
ছ'দিনের পথে প্রভু কিবা ভয় আছে ?
তাড়কা রাক্ষস বধে হে পরাণে।
তাড়কা বধিতে রাম চলিল বনেতে
তাড়কার সঙ্গে যুদ্ধ হইল বহুতর।
তরুণীর ঘাটেতে রামচন্দ্র খেয়ায় পার হইল
কাষ্ঠের তরুণী রামের রেনু ঠেকাইতে স্বর্ণময় হইল।
পঞ্চবটীর বনে এসে রাম দিল দরশন
তাড়কা রাক্ষস বধিল পরাণে।
পড়ল বিটী তাড়কা শব্দ গেল দূর
এমত প্রকারে মরে দাতার শত্তুর।
শ্বেত কাগ বধে রাম বধে উদরগিরি
কুল ছেড়ে বিবাহ হচ্ছে জানকী সুন্দরী।
হরের ধেনুক ভেঙ্গে রামসীতা পেলেন দান
বিয়ে কোরে রাম দোলায় চড়ে যান।
ঘরের দুয়ারে অক্ষর দেখিবারে পায়
চৌদ্দ বৎসর রামের বনবাস।
পিতার সত্য পালিতে রাম চলিল বনবাস।
রাজপোষাকে ত্যাগ করিল রাম
জটা বাকল পরিধান।

—বীরভূম

অনেক সময় রামায়ণের একটি মাত্র ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়াও পটচিত্র অঙ্কিত হইয়া থাকে। পটুয়া অতি সতর্কতার সঙ্গে রামায়ণের বিস্তৃত কাহিনী হইতে

সর্বজনীন আবেদন-ভিত্তিক এক একটি বৃত্তান্ত সন্ধান করিয়া লয়। কেবলমাত্র সিন্ধুমুনি বধের বৃত্তান্তটি অবলম্বন করিয়া নিম্নোদ্ধৃত পটচিত্রটি অঙ্কিত হইতে দেখা যায়।

৩

সিন্ধুমুনি বধ

রজ রাজার পুত্র রাজা নামে দশরথ
শোভা করে বসে রাজা যত প্রজাগণ।
অপত্রিকা বলে রাজা দেশে নাহি রহিব
আজ হতে অযোধ্যা মোরা পরিত্যাগ করিব।
রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট পায়
গিন্নীর পাপে গৃহস্থ নষ্ট লক্ষ্মী উড়ে যায়।
নারদ মুনি বলে, কথা শুন মহাশয়,
শনিকে জিনিতে পারলে রথশয্যা হয়।
নারদের কথা রাজা কর্ণেতে শুনিল
শনিকে জিনিবার জন্য রথ সাজাইল।
জামা জোড়া নিল ঘোড়া পায়েতে পামরী
গলাতে তুলসীর মালা বিনন্দে লগুরী।
শনি রাজা বসে আছেন ধর্ম সিংহাসনে
শনিরি রিষ্টিতে রথ ওড়ে স্বর্গ পানে।
রথ রথী সারথি ঘোড়া উড়িতে লাগিল
কোথায় ছিল জটায় পক্ষ, রাজ ধরে নামাইল।
আপনার গলের পুষ্পমালা রাজা জটায়ুর গলে দিল
জনমে জনমে রাজা মত্যতা পাতাইল।
আমার মিতে জটা তোমার আমি মিতে
ওগো বিপদে সম্পদে যেন মনে রেখো মিতে।
বনে থাকি বনের পশু রাজা মত্যতার কিবা জানি
আমার সঙ্গে মত্যতা রাজা পাতায়েছ আপনি।
এইখানে থাক মত্য রথ আগুলিয়া
আজ মৃগ শিকার করে আনি বনল কাননে।

বত একাদশী করেছিল বনের অন্ধক ব্রাহ্মণ।
পারণের জল আনরে বাপ গুণের সিন্ধুমনি।
নিত্য নিত্য যাই সরোবরের ঘাটে
আজতো যাব না, পিতা, কি আছে কপালে।
কাল গেছে, বাপ, একাদশী আজ ব্রাহ্মণ ভোজন
শিগির করে জল আন, বাপ, করিব পারণ।
ওই কথা শুনে সিন্ধু কমুণ্ডল লিল হাতে
কাঁদিতে কাঁদিতে জল আনিতে যায় সরোবরের ঘাটে।
সরোবরে জল পোরে আনন্দিত মনে
জলের ভুকভুকি রাজা কর্ণেতে শুনিল।
বনের মৃগয়া হরিণ বলে বাণেতে বধিল।
কে মেলি ব্রহ্মাস্ত্র বাণ আমার দেহ গেল জ্বলে।
মাতাপিতা কাঁদচে আমার ওগো বনেরি ভিতরে;
কাল গেছে ব্রত একাদশী আজ ব্রাহ্মণ ভুজন
শিগির করে জল লয়ে যাও করবে পারণ।
এই কথা বলে সিন্ধু প্রাণ পরিত্যাগ করিল
সরোবরের ঘাটে সিন্ধু ভাসিতে লাগিল।
সিন্ধুকের কথা শুনে রাজা ওগো ঘোড়া হতে নামিল
আজ মরা সিন্ধুকে রাজা কোলেতে করিল।
স্ত্রী হত্যা ব্রাহ্মণ হত্যা করিলাম সুরাপান
চার পাপের পাপী হলাম মুখে আনে রাম নাম।
মরা সিন্ধুক কোলে কোরে রাজা বেড়ায় বনে বনে
খিদাতে তৃষ্ণাতে মুনিরা ওগো ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
মুনির ডাক যখন রাজা কর্ণেতে শুনিল
মরা সিন্ধুক কোলে কোরে মুনির দ্বারে গেল।
পাতার মচমচি মুনি কর্ণেতে শুনিল।
কে এলি বাপ সিন্ধুক এলি বলরে বচন
মা বলিয়ে ডাকরে বাপ জুড়াক রে জীবন।
তোমার পুত্র নয় মুনি করি নিবেদন

না জানাতে বধ করেছি তোমার নন্দন।
কি বেরোইল মহারাজা তোমার কি বেরোইল মুখে
আকাশ পাতাল ভেঙ্গে পড়ে অন্ধক মুনির বুকে।
হায় হায় বলে অন্ধকিনী কপালে মারছে ঘা
কোথায় গেলি গুণের সিন্ধুক একবার মা বলে যা।
পাঁচ নয় ছয় নয় আমার একা সিন্ধুক মণি
কি অপরাধ করেছিল জানলে ডণ্ড দিতাম আমি।
একা সিন্ধুক মেলি না রাজা মেলি রে তিন জন
রাজার যদি না আছিল পুত্তুর পুত্তুর বর পেলি।
অপুত্র মহারাজা ওগো পুত্তুর বর পেল
মরা সিন্ধুক কোলে কোরে নাচিতে লাগিল।
চার পুত্র পাবি রাজা রামকে দিবি বন
খাট পালঙ্গ পেরে সেদিন আমার মতন তেজিবি জীবন।
রাম না জন্মাইতে ছিল যাট হাজার বৎসর
বাল্মীক মুনি ছিল পুঁথি পেয়ে ব্রহ্মার বর।
ব্রাহ্মণ শাপে অন্ধক মুনি দশরথকে দিল
সিন্ধু সিন্ধু বলে প্রাণ পরিত্যাগ করিল।
তিনজনের সৎকার্য একস্তে করিল
নিম কাষ্ঠ দিয়ে চিতা সাজাইতে লাগিল।
চুয়া চন্দন ঘৃত ঢালিতে লাগিল
তিনজনের সৎকার্য করে রাজা অযোধ্যাকে গেল
রামচন্দ্র জনম লোকে বলে মুনিগণ যজ্ঞ আরম্ভিল।

শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরামচন্দ্রের স্থান ক্রমে বাংলা দেশে গৌরাঙ্গদেব অধিকার করিয়া লইতে লাগিলেন। সেই সূত্রেই ক্রমে গৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক পটেরও প্রবর্তন হইল। তবে গৌরাঙ্গলীলার মধ্যে বৈরাগ্যের কথাই বেশি, ইহাতে বাস্তব জীবনের কথা বিশেষ কিছু নাই ; তবে গৌরাঙ্গের গৃহত্যাগ প্রসঙ্গের মধ্যে যে সকরুণ মানবিক আবেদন আছে, তাহা সর্বজনীন অনুভূতির বিষয় হয় বলিয়া সাধারণতঃ পটচিত্রের বিষয় হইয়া থাকে। নিম্নোদ্ধৃত পটটি তাহার প্রমাণ।

৪

গৌরাঙ্গলীলা

নবদ্বীপ অবতারে নিতাই গৌর দেখুন নাচিতে
দিনে দিনে দুগ্ধ খায় নিমাই দোলেন মায়ের কোলে।
দিন ক্ষণ করে দিল পণ্ডিত পাঠশালে।
পড়রে বাপ প্রাণের নিমাই কৃষ্ণ গুণমণি
পড়তে না পারে নিমাই পণ্ডিত খেলেন ছড়ির বাড়ি।
সদাই পড়ছে নিমাই দেখুন গৌর-গুণমণি।
ক্রোধ হয়ে গদাধর পণ্ডিত তবে নিমাইকে মারিল। .
কাঁদিতে কাঁদিতে নিমাই চন্দনতলা গেল।
চন্দনতলায় নিমাই দেখুন ষড়্‌ভুজ মূর্তি দেখাইতে লাগিল
রামরূপে ধেনুকধারী কৃষ্ণরূপে আসি অচৈতন্যরূপে নবীন সন্ন্যাসী।
ডোর নিলে, কৌপীন নিলে নিমাই করঙ্গ নিল হাতে
চলিল গো শচীর দুলাল পাতকী তরাতে।
পড়ে রইল খাট-পালঙ্গ বাঁধ বন্ধন বালা
নিমাই বিনে তোলা রইল কেশরীর মালা।
খাট পালঙ্গ পেড়ে দেখুন শচীমাতা সুখে নিদ্রা যায়
যমের ভগ্নী কালনিদ্রা শচীমাতাকে নিদ্রাতে চাপায়।
এক ডাক দুই ডাক নিমাই তৃতীয় ডাক দিল
তৃতীয় ডাক দিয়ে নিমাই সন্ন্যাস ধর্মে গেল।
কেশবী ভারতী এসে কিবা মন্ত্র দিল
সেইদিন হইতে প্রাণের নিমাই উদাসীন হইল।
রাত্রি প্রভাত হইল কোকিলে করে রা
শয়নে মন্দিরে ছিলেন শচীমাতা ঝেড়ে তোলেন গা।
কেন জনম নিলিরে বাপ নিমবৃক্ষ মূলে
হয়ে যদি মরিতি না করিতাম কোলে।
কাল তোরে দিলাম বিয়া কুলীনের ঝি
ঘরে বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া তার উপায় হবে কি ?
বিষ্ণুপ্রিয়া শচীমাতা দেখুন কাঁদিতে লাগিল।

দেখ রে নদীয়ার লোক বাড়ীর বাহির হ'য়ে
নিমাই গেছেন সন্ন্যাস ধর্মে কেউ রাখ বলে ক'য়ে।
কেউ বলে প্রাণের নিমাই গাঙ্গে ডুবে মল
কেউ বলে প্রাণের নিমাই সন্ন্যাস ধর্মে গেল।
মধুপুর মধুপুর বলে দেখুন নিমাই যেতে যে লাগিল
মধুপুরের মধু দেখুন নাপিতকে ডাকিতে লাগিল।
কাটোয়ার ঘাটে প্রভু মস্তক মুড়াইল।
রঘুনাথ ভট্টদাস মুকুন্দ মুরারি মুখে বলেন হরি
ভাবে পড়ে খাটদাস খেছেন গড়াগড়ি।
বড় ঘর বড় দুয়ার বড় কর আশা
সকল দ্রব্য রইবে পড়ে গঙ্গার তীরে বাসা।

—বীরভূম

বাঙ্গালী হিন্দু নরনারী গরুকে ভগবতী বলিয়া পূজা করে। কুমারীরা গোকল ব্রত করে, পুরুষেরাও নানাভাবে ইহাকে ভক্তি দেখাইয়া থাকে। গো বাঙ্গালী গৃহস্থের পরম সম্পদ। ইহার মাহাত্ম্য-কীর্তন করিয়াও পট অঙ্কিত হয়। রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ নিরপেক্ষ ইহার কাহিনী একান্তভাবে লৌকিক। কোন কোন সময় মুসলমান ফকিরগণও এই গান গাহিয়া পট দেখাইয়া থাকে, সেইজন্য ইহা গাজীর গান নামেও পরিচিত।

৫

গো-মাহাত্ম্য

গরু নাড় গরু চাড় গরু বড় ধন
যার ঘরে গরু নাই তার বৃথাই জীবন।
গরুর সেবা করেছিলেন প্রভু নারায়ণ
ইন্দ্র রাজা দেবগণ বসিয়া আকনে
কপিলার পৃষ্ঠে কথা কহেন সেখানে।
কপিলা ডাকিয়া তবে বলিছে বচন
তোমায় যেতে হবে মা রবনী মণ্ডল।
আমি তো যাব না মা রবনী মণ্ডলে
আমার মহিমা নরলোকে কিবা জানে।

গোদানড়ী দেবে মা নারিব বহিতে
দুচক্ষে ঠুলি দিয়ে ঘুরাবে বক্র
বিনা অপরাধে বিধি লাগাবেন চক্র।
মনে মনে জনে জনে বোঝা চাপাইবেন পৃষ্ঠে
চলতে না পারিলে পাঁচুনি মারয়ে পিঠে।
দুটি পা ছন্দন করে দুগ্ধ নেবে ঝেঁকে
আমার দুধের বালকরা বেড়াব সব কেঁদে।
আমি তো যাব না মা রবনী মণ্ডলে
তুমি যদি না যাও মা রবনী মণ্ডলে
নরলোক পবিত্র হইবে গো কেমনে।
তোমার দুগ্ধ ছেঁকে লয়ে দেবগণের সেবা হবে।
এই কথা কপিলা কর্ণেতে শুনিল।
নির্মল ব্রাহ্মণের ঘরে অধিষ্ঠান হইল
কপিলাকে দেখে ব্রাহ্মণ ভাবিতে লাগিল।
মুরারি ঘোষ বনে সেদিন মনে পড়ে গেল।
বাবা মুরারি ঘোষ আজ থেকে গরুর সেবা কর বাপু তুমি
গরুর সেবা করলে পরে ভাগ্য হবে ম'রে
গঙ্গাস্নানের ফল কিছু দুয়ারে বসে পাবে।
সাত দিন সাত বৌএর পালিত করে ছিল
প্রথম পালিতে মাতার বড় বৌএর হল।
পরিধান করিতে দিল বউকে দিব্য পাটের শাড়ি
গোহাল কাড়িতে দিল সুবর্ণার ঝুড়ি।
রুনুঝুনু শব্দে গোয়ালে দিলেন পা
খিঁচ-গোবর দেখে বউ কপালে মারে ঘা।
বউ বলে নিগরুর ঘরে যদি মোর বিবাহ হইত
তবে কেন সোনার শঙ্খয় গোবর লাগিত।
সুবুদ্ধি বউ ছিল কুবুদ্ধি ধরিল
উলটা ঝাঁটার বাড়ি গরুকে মারিল।
ঝাঁটার বাড়িতে গরুর পাঁজর ভেঙ্গে গেল

পঞ্চমাসের গর্ভ সেদিন খসিয়া পড়িল।
কাঁদিতে কাঁদিতে গরু অন্য পালে গেল
অন্য পালে গেল গরু ঘুরে নাইক এল।
চালের বাতা ধরে বউ নাচিতে লাগিল
ভাল হল শ্বশুরবাড়ীর পাল ঘুচে গেল।
আজ থেকে গোয়াল কাড়া জঞ্জাল ঘুচিল।
দই-দুগ্ধ বিচিয়া আসিছেন নীলবতী
তার কাছে বিদায় মাগিছেন ভগবতী।
বলে তোমার বড় বৌ আনবরনা বড়
মেরেছে ঝাঁটার বাড়ি ভেঙ্গেছে পাঁজর।
পান খায় পিকি ফেলে গোহালের ভিতর।
রাত্র প্রভাত হলে পরে দেয় না ছড় ঝাঁটি
সন্ধ্যে লাগিলে পরে দেখায় না বাতি।
বাড়া ভাত মৎস্য রাঁধা গোহালে বসে খায়
রক্ত পিনাসি মাতার গরুর নাকে হয়।
ভাদ্র মাসের দিনে যে জন গোয়ালে মাটি দেয়
ডাংরা পিল্‌ই হয়ে তাহার গরু মরে যায়।
রবিবারের দিনে যে জন মৎস্য ভেজে খায়
উকুন এঁটুলি মাতার গরুর গায়ে হয়।
শনি-মঙ্গল বারের দিন গোবর বিলায়
দিনে দিনে গেরস্থালী মেটিয়ে যায়।
এই সকল পালন যদি পালিতে না পায়
তবে গিয়ে নবলক্ষ্মীর পাল ঘুরে যায়।
তোমার সাক্ষাতে বউকে নর-বলি দেব।
নাপিত ডাকিয়ে বৌএর মস্তক মুড়াইল
জিহ্বা কাটিয়া বউএর কলার পাতে থুইল।
হাতের দশটি আঙ্গুল লয়ে পলিতা পাকাইল
হেঁটোর মালুইচাকি লয়ে প্রদীপ গড়িল।
মস্তকের খাপুরি লয়ে ধুপসী করিল

ধূপ-ধুনা দিয়ে কপিলা ঘরে নিল।
একলক্ষ ছিল গাভী সওয়া লক্ষ হইল
বছর বছর পাল বাড়িতে লাগিল।
আদ্যাশক্তি ভগবতী আছেন যার ঘরে
গোহালে পরমসুখে তার যম কাঁপে ডরে।
শিবনিন্দা করো না শিবের করো সেবা
শিব দিতে পারে ইন্দ্রপদ ধনে করে রাজা

—বীরভূম

রাঢ় অঞ্চল হইতে পট আঁকিবার রীতি যখন বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে বিস্তার লাভ করিয়াছে, তখন ইহা অনেক ক্ষেত্রেই রাঢ়ের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারে নাই। এমন কি, রাঢ় দেশেও পট আঁকিবার একটি বলিষ্ঠ আদর্শ যখন ক্রমে শিথিল হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন ইহাতে নানা আদর্শবিচ্যুতি দেখা দিয়াছিল। সেই সময় এক শ্রেণীর পট রাঢ় দেশেও অঙ্কিত হইয়াছিল। তাহা বিশেষ কোন একটি বিষয়-বস্তুর পরিবর্তে বিভিন্ন বিষয়-বস্তু লইয়া অঙ্কিত হইত। তাহাকে পঞ্চকল্যাণী পট বলিত। পূর্ব বাংলার কোন কোন অঞ্চলে এই শ্রেণীর পঞ্চকল্যাণী পটেরই প্রদর্শনী হইত, একই কোন বিষয় আনুপূর্বিক তাহাতে স্থান পাইত না। দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে আর এক শ্রেণীর পট গাজীর পট নামে পরিচিত হইল। মুসলমান ধর্মপ্রচারক ও ধর্মযোদ্ধাকে গাজী বলিত। তাঁহার অলৌকিক শক্তির নানা কল্পিত কাহিনী বর্ণনা করিয়া গাজীর পট অঙ্কিত হইত। তাঁহার অলৌকিক শক্তির মধ্যে একটি শক্তি ছিল তাঁহার সুন্দর বনের ব্যাঘ্রকে দমন করিবার শক্তি। সুতরাং তাঁহাকে ব্যাঘ্রারূঢ় করিয়া ব্যাঘ্রকুলকে দমন করিবার বৃত্তান্ত লইয়াও পট চিত্রিত হইত। পূর্ব বাংলার পঞ্চকল্যাণী পটে রামায়ণ-ভাগবত-গৌরাঙ্গ-লীলা প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে গাজী সাহেবের ব্যাঘ্রদমনের চিত্রও প্রদর্শিত হইত। নিম্নোদ্ধৃত পদটি পূর্ব বাংলার পঞ্চকল্যাণী পটের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন।

পঞ্চকল্যাণী

নম মহেশ্বর দিগম্বর ঈশান শঙ্কর।
শিবশম্ভু শূলপাণি হর দিগম্বর ॥
গিয়ে কুচনীপাড়া—
গিয়ে কুচনীপাড়া ভাঙ ধুতুরা শিবশম্ভু খায়।
তানপুরা বাজাইয়া শিবে কুচুনী ভুলায় ॥
এই যে নন্দী বেটা—
এই যে নন্দী বেটা শিরে জটা উল্টে আঁখি চায়।
ভৃঙ্গী বেটার ভঙ্গী দেখ্যা যমরাজা পলায় ॥
দেখ, ভুবন মোহন—
দেখ, ভুবন মোহন, ভুবন ভুলান পাকা দালান বাড়ী।
শাল তাল তমাল পিয়াল বৃক্ষ সারি সারি ॥
দেখ ভঙ্গী বাঁকা—
দেখ ভঙ্গী বাঁকা রাখাল সখা কদম্ব তলায়।
বাজাইয়া মোহন বেণু গোপীর মন ভুলায় ॥
দেখ কুট্না বুড়ী—
দেখ কুট্না বুড়ী যুক্তি করে কুমন্ত্রণা দিয়া।
শ্যামের সঙ্গে গুপ্ত প্রণয় দিয়াছে ঘটাইয়া ॥
দেখ কাল ননদী—
দেখ কাল ননদী সদায় বাদী মজায় গণ্ডগোলে।
বলে, দাদা, তোমার রাধা গিয়াছে জঙ্গলে ॥
দেখ এই প্রেমেতে—
দেখ এই প্রেমেতে সেই ব্রজেতে লাগল লেনাদেনা।
ঋণ শুধিতে গৌড়ে এলেন ব্রজের কেলে সোনা ॥
দেখ গৌরনিতাই—
দেখ গৌরনিতাই তারা দুই ভাই নাচে প্রেমতরঙ্গে।
বাহু তুল্যা ভক্ত কত নাচে সঙ্গে সঙ্গে ॥

দেখ জগাই মাধাই—
দেখ জগাই মাধাই তারা দুই ভাই পাতকী পাষণ্ড ॥
অত্যাচার করে কত রাজ্য লণ্ডভণ্ড ॥
তখন হরিনাম—
হরিনাম গান গাইয়া নিতাই আইল পথে।
কান্দা তুল্যা মার্‌ল মাধাই নিতাইচান্দের মাথে ॥
দেখ দরদর—
দেখ দরদর রক্ত পড়ে বলে হরিবোল।
দুই হাত বাড়াইয়া দিল মাধবেরে কোল ॥
তখন নাম দিয়া—
নাম দিয়া গুণ গাইয়া উদ্ধারে পাতকী।
এমন দয়াল ত্রিভুবনে কোথা নাহি দেখি ॥
দেখ রঘুবংশে—
দেখ রঘুবংশে চারি অংশে জন্মে নারায়ণ।
পিতৃসত্য পালন কর্‌তে গিয়াছিলেন বন ॥
সেথায় দৈবযোগে—
সেথায় দৈবযোগে রাবণ সঙ্গে বিবাদ ঘটিল।
স্বর্ণমৃগ হইয়া মারীচ রামের মন ভুলাইল ॥
হরিণ মারিবারে—
হরিণ মারিবারে যান ধেয়ে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
শূন্য গৃহ পাইয়া সীতা হরিল রাবণ ॥
তখন রথে তুলি—
তখন রথে তুলি শূন্য পরি লঙ্কাপানে যায়।
পথে পাইয়া জটাই পক্ষী সম্মুখে দাঁড়ায় ॥
বলে নারীচোরা—
বলে নারীচোরা কপাল-পোড়া পড্‌লি আমার হাতে।
পাপীর মুণ্ড খণ্ড খণ্ড করব ভালমতে ॥
তখন ঘোর রণ—
তখন ঘোর রণ দুইজন হইল শূন্যেতে।

ঠেলাঠেলি ধাকাধাক্কি হইল কতমতে ॥
তখন পক্ষী বলে—
তখন পক্ষী বলে আজি মোর বৃদ্ধ বয়স হইল।
রাবণের বাণে পক্ষী চৈতন্য হারাইল ॥
দেখ মহাসতী—
দেখ মহাসতী সাবিত্রী যে পতি সত্যবান্।
অল্প বয়সে জংলায় এসে হারাইল প্রাণ।
তখন ঘোর বনে—
তখন ঘোর বনে যম সনে মহাতর্ক হইল।
সঁতী নারীর পতি যম ফিরাইয়া দিল ॥
দেখ সতীনারীর—
দেখ সতীনারীর পতি যেমন আশমানের চুড়া।
অসৎ নারীর পতি যেমন ভাঙ্গা নায়ের গোড়া ॥
এ যে ঘোর কলিকাল—
এ যে ঘোর কলিকাল মাতাল বৈতাল হইয়াছে প্রবল।
ধরম করম লজ্জা সরম হইয়াছে বিফল ॥
নিদান কালে কেউ কারো নয় দেখরে মন চাইয়া।
তরবে যদি ভবনদী হরিগুণ গাইয়া ॥

—মৈমনসিংহ

পূর্ব বাংলার কোন কোন পঞ্চকল্যাণী পটের শেষাংশে গাজীর পটের কিয়দংশ দেখান হয়। ইহাতে ব্যাঘ্রের উপর আসন গাজী সাহেবের চিত্র দেখা যায়। তাহাকে দেখিয়া নানা আকৃতির বাঘ যে লেজ গুটাইয়া পলাইয়া যাইতেছে, তাহাও চিত্রিত করিয়া দেখান হয়। পশ্চিম বাংলার পঞ্চকল্যাণী পটে গাজীর বিষয় কিছু থাকে না। তবে সাহেব পট বা সাঁওতাল পটে সাহেবদিগের কিংবা সাঁওতালদিগের কিছু স্থানীয় বৃত্তান্ত স্বাধীন ভাবে প্রকাশ করা হয়।

দুই

ভাদু গান

ভাদু গান রাঢ় অঞ্চলের বর্ষাকালীন সঙ্গীত ; ইহা প্রধানতঃ কুমারীদিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেও বিবাহিতা নারীরাও ইহাতে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। ভাদ্র মাস ব্যাপিয়া এই সঙ্গীত গীত হয় বলিয়াই ইহার নাম ভাদু গান। ক্রমে ইহার সঙ্গে মানভূমের অন্তর্গত কাশীপুর রাজের একটি পারিবারিক কাহিনী মিশ্রিত হইয়া ইহাকে একটি স্মৃতিপূজার রূপ দিয়াছে ; কিন্তু এই কাহিনী ইহার সঙ্গে যুক্ত হইবার পূর্ব হইতেই এই সঙ্গীত এই অঞ্চলে ব্যাপক প্রচলিত ছিল ; নতুবা একটি মাত্র পারিবারিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া ইহা মানভূম, বাঁকুড়া পশ্চিম বর্ধমান এবং সুদূর বীরভূম পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিতে পারিত না। বিশেষতঃ ভাদু গান কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষের স্মৃতি-সঙ্গীত নহে, ইহার মধ্যে পারিবারিক ও ব্যক্তি-জীবনের সকল সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাই প্রধানতঃ শুনিতে পাওয়া যায় ; ইহা এই অঞ্চলের কুমারী-জীবনের গান, তাহাদের জীবন-স্বপ্ন ইহার ভিতর দিয়া রূপায়িত হইয়া উঠে। ভাদ্রের ভরা বর্ষার প্রকৃতিকে একটি কুমারী নারীরূপের মধ্য দিয়া ধ্যান করিয়া তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া বাস্তব জীবনের নানা কাহিনী ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়। সেইজন্য ইহার মধ্যে ধর্মের কথা যেমন নাই, ব্যক্তিবিশেষের জীবন-কথাও প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই ; ইহার মধ্যে যাহা আছে, তাহা কুমারী-জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা, জীবন সম্পর্কে তাহাদের অপরিণত অভিজ্ঞতার কথা ; কঠিনতর বাস্তব জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্বে তাহার সম্পর্কিত তাহাদের আশার কথা। সুতরাং ইহা প্রত্যক্ষ ও বাস্তব জীবনের কথায় সরস, অশরীরী কোন আত্মার অলোক-প্রশস্তিবাচন মাত্র নহে, তাহা হইলে ইহা এত জীবন্ত হইতে পারিত না।

উপরোক্ত অঞ্চলের সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর সমাজের মধ্যেই ভাদু গানের সর্বাপেক্ষা বেশি প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং আর্যেতর সমাজের মধ্যেই ইহার উদ্ভব, কিন্তু হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার প্রভাব হইতে ইহা মুক্ত হইতে না পারিয়া ক্রমে কাশীপুর রাজপরিবারের কাহিনী এবং তাহার সঙ্গে ইহার একটি প্রতিমা নির্মাণের রীতি যুক্ত হইয়াছে। রাজপরিবারের কাহিনী যেমন অবাস্তর, প্রতিমাটিও তেমনই বিশেষত্বহীন।

এই অঞ্চলের আদিবাসীদিগের মধ্যে বর্ষাকাল একটি অ
উৎসবের কাল। কারণ, গ্রীষ্ম এখানে অত্যন্ত প্রখররূপে আত্মপ্রক
সেইজন্য গ্রীষ্মের পর বর্ষা পরম অভিনন্দনযোগ্য হইয়া হইয়া উঠে। বর্ষা
করম উৎসব তাহাদের মধ্যে প্রধান; ইহাও ভাদ্র মাসেই অনুষ্ঠিত হয়; তার
জিতিয়া, বিঁধা, ঈদ—আদিবাসীর এই সকল উৎসবও এই সময়ই হইয়া থাকে।
ভাদুপূজা আদিবাসীর করম উৎসবেরই একটি হিন্দু সংস্করণ। হিন্দুর পৌত্তলিকতা
ইহার উপর নিজের অধিকার স্থাপন করিয়া ইহাকে আদিবাসীর করম উৎসব
হইতে স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে।

ভাদ্র মাসের প্রথম দিন হইতে শেষ দিন পর্যন্ত প্রতি রাত্রে পরিবারের
কুমারী মেয়েরা সমবেত হইয়া এই গান গাহিয়া থাকে, একটি সামান্য মৃৎ-
প্রতিমার সম্মুখে পূজার অকিঞ্চিৎকর উপকরণ থাকে। প্রথমেই ভাদুর আগমনী
গান শুনিতে পাওয়া যায়—

১

আঁখ বাড়িতে ঢাক বাজিছে ঐ আসিছে ভাদুধন
দেখ্ দেখিরে ব্রজের বালা কতদূরে বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনের বন্ধু তুমি বৃন্দাবনে বাস কর
কেবা তোমার মাতাপিতা কার বা তুমি আশা কর।
কার ঘরে গিয়েছিলে, মা, কে করেছে সেবা গো।
হাতে মায়ের রক্ত চন্দন গলে জবার মালা গো। —বাঁকুড়া

কানু ছাড়া গীত নাই, বৃন্দাবন ছাড়া দেশ নাই; বাঙ্গালীর জীবনে বৈষ্ণব
যে কত সুদূর-বিস্তারী হইয়াছিল, সমাজের নিম্নতম স্তরে অনুসন্ধান
ও তাহা জানিতে পারা যায়। তাই ভাদু ব্রজধাম হইতে বাঙ্গালীর গৃহে
ছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার মাতাপিতার সন্ধান জানিতে পারা
সুতরাং এই ব্রজধাম ভাগবতের কিংবা বৈষ্ণব পদাবলীর ব্রজলোক
তাহার পরিবর্তে প্রবাসের যে কোন স্থান হইতে পারে।
যন প্রবাস হইতে আগতা বহুদিনের প্রত্যাশিতা কোন আত্মীয়া।
মাত্র তাহাকে পথের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করা হইল।

২

ওগো, ভাদুমণি, শুন বলি তুমি,
কেমন করে এলে পথে কোন কষ্ট হ'ল কি।
এস বোস আসনে আগে কুশল বল শুনি,
তার পরেতে মুখ হাত ধুয়ে
তাড়াতাড়ি খাবার খেয়ে
সাজা গুজা করবে চল এখনি।
সবাই আসবে দেখতে তোমায় কত রকম খাবার হাতে নিয়ে
কত রকম গান শোনাবে সুরে সুরে ঘাড় লাড়িয়ে॥
সারা রাত গান শুনিয়ে নানারকম খাবার দিয়ে মন ভুলিয়ে
সকাল হলেই দেবে বিদায় তোমাকে॥ —বাঁকুড়া

এইবার যেন সেই পরম আত্মীয়ার সম্বর্ধনার আয়োজনের কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

ফুলের মাঝে কেমন সাজে চরণ দু'খানি,
আজ মনের সাধে পুজব, ভাদু, আয়লো সজনী।
আয় চারুবালা, আয় চঞ্চলা, আয়লো সবে সঙ্গিনী,
পথে যেতে যেতে মালা গেঁথে, করবো ফুলের আমদানী॥
সারাদিন খেলা খেলি নাই, ভাদু, কেবলই মালাটি গেঁথেছি
পর ফুলহার, ভাদু লো আমার, তোমারই জন্য গেঁথেছি॥

আয়লো সজনী, সাজালো সজনী দাসী হয়ে পদতলে রই,
বাসি ফুলের মালা, লও চিকনকালা ভাদুধন কুঞ্জে এল কই।
এস ভাদুমণি চরণ দু'খানি পুজিব তোমায় সাদরে
তব রূপখানি ভুবনমোহিনী আলো করে কত আঁধারে।
সারাদিন ঘুরি কত ফুল তুলি এনেছি সাজি ভরিয়া
তোমার লাগিয়া বছর ধরিয়া আশা করি কত আমরা।

সারা বৎসর ভাদুর জন্য সকলে পথ চাহিয়া বসিয়াছিল, এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়া তাহার সঙ্গে সকলের আত্মীয়তার ভাবটি যেন নিবিড়তর হইয়া উঠিল।

ভাদুকে লইয়া তাহাদের কত স্বপ্ন—

৫

বদন ভরিয়ে একবার হরি বল মন
ভাদুর সঙ্গে যাব মোরা, এরোপ্লেনে রথ দেখিতে,
ঐ পথেতে কোলকাতাতে দেখে আসব মদনমোহন।
ফুল সাবানে মাথা ঘস্যেঁ, জবাকুসুম মেখে কেশে।
হেস্যেঁ হেস্যেঁ ঘরে আসেন আমার ভাদুধন,
বদন ভরিয়া একবার হরি বল মন। —বাঁকুড়া

কিন্তু পূজার আসনে বসাইয়াও ভাদুকে কুমারীরা কোন দিক হইতেই নিজেদের নিকট হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে পারে নাই, তাহাকে লইয়া তাহাদের কোন আধ্যাত্মিক স্বপ্ন গড়িয়া উঠে নাই। তাহাকে সিংহাসন হইতে মাটির আসনে নামাইয়া লইয়া নিজেদেরই গার্হস্থ্য জীবনের সুখদুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করে—

মাগো, আমি ফুল পাতাব ফুলকে আমি কি দিব,
পয়সা লিব বাজার যাব, ফুলকে ফুলেল তেল দিব।
মাগো আমি কাপড় লিব ধারে ধারে ধাকৃচি ফুল,
শ্বশুর ঘরের লোকে বলে, গেল বউএর জাতি কুল।
আমরা মায়ের তিনটি বিটি তিনটি সোনার মাদলী,
মা বাপের দুলালী আমরা, ভাই-ভাজের চোখের বালি
গাঁয়ে গল সরু শাঁখা বেছে পরতে পেলাম না,
হাত বাড়িয়ে কি করলাম, রাতে ঘুম আর হল্য না
বাঁধের আড়ে দেখে এলাম ছোট ছোট মালপোয়া,
আর বছরে বেঁচে থাকলে আনব ভাদু মেড় দেওয়া

বাঁধের আড়ে ঢাক বাজিছে ঐ আসিছে ভাদুধন,
দেখ্ দেখিরে, মুক্তকেশী, কেমন সাজে সিংহাসন।
ভাদুর বাবা বাঁধ দিয়েছে ভাদুর মনে লাগে না,
আড়ে দাঁড়াইয়ে দেখ, ভাদু, লাল জবা বই ফোটে না।
চল্ ভাদু চল্ খেল্‌তে যাব রাণীগঞ্জের বড়তলা,
ঐ পথে দেখিয়ে আনব কয়লা খাদের জলতোলা।
কয়লা খাদের জল শুকাল মিছরি বাঁধের আগাম হ'ল
আমার ভাদুর পায়ে আছে হাজার টাকার জোড়া মল। —বাঁকুড়া

কুমারী-জীবন হইতেই যে তাহারা শাশুড়ী-ননদীর বিভীষিকা দেখিতে আরম্ভ করে, ভাদুগানের মধ্য দিয়া তাহাও প্রকাশ পায়।

৭

হলুদ বনের ভাদু তুমি হলুদ কেন মাখ না,
শাশুড়ী ননদের ঘরে, হলুদ মাখা সাজে না।
কলঙ্গাতে চাবি ছিল, হলুদ বল্যে মেখেছি,
ও শাশুড়ী, গাল দিও না পাশা খেল্‌তে বসেছি। —ঐ

সাধারণ ঘরের মেয়েদের মত ভাদুর উল্কি পরিবার সাধ হইয়াছে; এই সাধ ভাদুর সাধ নয় কুমারীর নিজেরই মনের সাধ। নিজের সাধ মতই আমরা দেবতাকে সাজাই, নতুবা দেবতার কোন কামনাই নাই। মানুষের বাসনাতেই দেবতার সাধ—

এলরে রাজ নারী ছলে বসরে সিংহাসনে
আমার ভাদু উল্কি নিবেন, লেখগা বাসক ডালে।
পায়ে আলতা কুলি দাদা কি কর্যে মা পিরাব[১]
শ্বশুর ঘরের জোড়া পাল্কী আগনায়[২] এসে দাঁড়াল। —ঐ

১ পিরাব—অর্থে পরাইব। রাঢ় অঞ্চলের ভাষা। ২ আগনা—অর্থে আঙ্গিনা।

ভাদুকে সম্মুখে রাখিয়া কুমারীদিগের মনের আগল যেন আপনা হইতে খুলিয়া যায়—

৯

আয় সারদা, আয় বরদা, কুলিতে বাধ বাঁধাব
কুলির জলে সিনান করে ঝরকায় চুল শুকাব।
আয় সারদা, আয় বরদা, পাড়রে দুটা বিছানা
মাসে দুটা একাদশী কেও করে কেও করে না। —বাঁকুড়া

ভাদুর আগমনীর আনন্দানুষ্ঠানের মধ্যেও কুমারীর হৃদয়ে একাদশীর আশঙ্কা মধ্যে মধ্যে উঁকি দিয়া যায়, ইহা তাহারই প্রমাণ। চারিদিকে একাদশীর নিষ্ঠুরতার রূপ যখন তাহারা দেখিতে পায়, তখন নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবনেও ইহার আশঙ্কার কথা কিছুতেই তাহারা ভুলিয়া থাকিতে পারে না।

গার্হস্থ্য জীবনে দেবর ও বধূর আচার-আচরণ এইভাবে লক্ষ্য গোচর হইয়া থাকে—

১০

বাড়ীর নীচে নীল বুনেছি, নীলের শুঁটি ধরে না,
ঘরে আছে লক্ষ্মণ দেওর, নীল কাপড় বই পরে না।
বাড়ীর নীচে দুধের পুকুর তরুলতা ঘিরেছে,
নারবে যদি বউ ঘাটাতে, বেটার বিয়া দাও কিস্‌কে। —ঐ

দেবর সৌখীন, নীল কাপড় ব্যতীত পরেন না, পুত্রবধুকে ঘাটাইতে হইলেও বিশেষ ক্ষমতার আবশ্যক ; এই শক্তি যাহার নাই পুত্রের বিবাহ দেওয়া তাহার কর্তব্য নহে। গার্হস্থ্য জীবনে শ্বশুর কিংবা শাশুড়ীকে বেশ শক্ত হইয়া বধূর সঙ্গে আচরণ করিবার আবশ্যক হয়।

এ'বার জামাতার কথা। জামাতাকে প্রসন্ন রাখা চিরকালই বড় কঠিন—

১১

বাড়ীর নীচে নারকেল গাছটি ঘটি ভরো্য জল দিব,
তিনটি নারকেল ধরলে পরে ডাকে চিঠি পাঠাব।

চিঠি পাঠাই ঘোড়া পাঠাই তবু জামাই আসে না,
জামাই আদর বড় আদর তিন দিন বই থাকে না।
আর তিনদিন থাক জামাই খেতে দিব পাকা ধান,
বস্‌তে দিব শীতল পাটি নীলমণিকে করব দান। —বাঁকুড়া

পারিবারিক জীবনে মায়ের তুল্য আর কেহ নাই। ভাদু উৎসবের দিনে যে মাতৃহীনা, তাহার মায়ের কথা সহজেই স্মরণ হয়।

১২

মাথা ঘস্তে রহিলাম বস্তে আর আমাদের কে আছে।
মা রহিল তেপান্তরে প্রাণ জুড়াব কার কাছে। —ঐ

ভাদু গানের মধ্য দিয়া জীবনের কত কথা যে এলোমেলো হইয়া প্রকাশ পায়, তাহা হিসাব করিয়া বলা যায় না। শরতের আকাশে যেমন মেঘের টুকরা এলোমেলো হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তেমনই কুমারী-হৃদয়ের নানা স্বপ্ন এলোমেলো হইয়া একবার উদয় হয়, আর একবার মিলাইয়া যায়। এই স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তব চেতনাও অনেক সময় এক হইয়া যায়। গানের পর গান মুখে মুখে রচিত হয়, গানের বিষয়-বস্তুগুলি কোন নিয়ম কিংবা শৃঙ্খলা অনুযায়ী মনের মধ্যে উদয় হয় না ; কতকগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন চিত্রের মত হাল্কা হাওয়ায় পর পর যেন সাম্‌নের দিক দিয়া উড়িয়া যায়। গানগুলির মধ্যে গান অপেক্ষা ছড়ার ধর্মই অধিক প্রকাশ পায়—

১৩

বড় বাঁধের ওপারেতে তরুলতা ঘিরেছো,
কোন্ গাঁয়েরই পাপী বামন ডাল ভেঙ্গে ফুল তুল্যেছে।
ডাল ভেঙ্গেছে ফুল তুল্যেছে তার বুনেছে খঞ্জরী
এ খঞ্জরী কে বাজাবে কাশীপুরে কার বাড়ী।
কাশীপুরের একটি মিঠাই ভেঙ্গে করব একথালা
এ মিঠাই দিবার লয়, মা, সঙ্গতীদের মনভোলা। —ঐ

ভাদ্র মাসের অতিথি ভাদু, সুতরাং পথ চলিতে তাহার ঢাকাই শাড়ী না ভজিয়া উপায় নাই—

১৪

চল, ভাদু, চল্ লো ঝম্‌ঝমায়ে চল,
ভিজালো তোর ঢাকাই শাড়ী পায়ে জোড়া মল।
(মিলন সজনী)
পথ ছাড়হে গিরিধারী, পথে তোমার কী আছে,
আমরা যাব ভাদুর মহল, নিমন্ত্রণ এসেছে।
(মিলন সজনী) —বাঁকুড়া

মনের কথার সঙ্গে অনেক সময় বাহিরের কথাও একাকার হইয়া যায়। বাংলার পারিবারিক জীবনে দেবরের সঙ্গে ভ্রাতৃবধূর যে সম্পর্ক, তাহা কেবলমাত্র আত্মীয়তার সম্পর্ক নহে, রস-রসিকতার একটু মধুর সম্পর্ক আছে। কুমারী হৃদয়েই তাহার চেতনা সঞ্চারিত হয়—

১৫

ওহে প্রাণের দেবর লইও গো খবর ভুলো নাগো শিশু দু'জনে,
তোমারে সঁপিয়া দিনু মোর হিয়া রেখো গো তাদের যতনে।
বল্ দেখি শুক্‌সারী তুইত কুঞ্জের দ্বারে ছিলি,
কোন্ পথে লুকাল আমার ননীচোরা বনমালী। —ঐ

ভাদু গানের যে কোন বিষয় যে কোন স্থানে আরম্ভ হইয়া যে কোন ভাবে যে কোন স্থানে শেষ হইতে পারে, ভাদু গানের কোথাও ভূমিকা নাই, কোন নির্দিষ্ট স্থানে উপসংহারও নাই; উপরি-উদ্ধৃত সঙ্গীতটি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দেবরকে কাহার আত্মীয়ার নিকট সম্প্রদান করা হইল, তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিবার পুর্বেই খণ্ডিতা রাধিকার কথা আসিয়া পড়িল। আপাতদৃষ্টিতে এই দুইটি চিত্রে কোন যোগ নাই; কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে যেমন একটি চিত্রের সঙ্গে আর একটি চিত্র অসংলগ্ন হইয়া প্রকাশ পায়, তেমনই কুমারী-হৃদয়গড়া ভাদুগানের স্বপ্নের মধ্যেও কার্যকারণের সম্পর্কবিহীন নানা ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

ভাদু গানে মধ্যে মধ্যে রূপকও ব্যবহৃত হয়—

১৬

কাশীপুরে দেখ্যে এলাম, সোনার থালায় বাঘ বসে,
এ বাঘে তো মানুষ খায় না রূপ দেখাতে এস্যেছে। —বাঁকুড়া

কেন যে ভাদুকে মানুষ-না-খাওয়া বাঘের রূপের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে, তাহার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, ভাদুগান ভাবের দিক দিয়া অনেকটা ছড়ার মত; সেইজন্য ইহার কারণ সন্ধান করা বৃথা।

ভাদু রাঢ়ের বাগ্দী, বাউরী মেয়েদের মত মাঠে কৃষিকর্মেও সাহায্য করে—

১৭

বাঁধের নীচে জমি নীলাম কাদাতে হাল লাগে না,
আমার ভাদু শিশু ছেলে জল বাগাতে জানে না। —ঐ

এখানে কাদাতে কথাটি লক্ষ্য করিবার মত। রামাই পণ্ডিতের 'শূন্য পুরাণে' পাওয়া যায়, 'পুখরি কাদাএ লইব ভুমখানি।' এখানেও সেই শব্দটির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে,—'কাদাতে হাল লাগে না।' ইহার অর্থ এই যে বাঁধের নীচের মাটি এত নরম যে, চাষ করিবার সময় বিনা হালেই তাহা কাদা হইয়া যায়।

ভাদু কৃষিকার্যে সহায়ক হইলেও কি ভাবে যে ক্ষেতে জল আট্‌কাইতে হয় তাহা সে জানে না, এতই শিশু।

পূর্বেই বলিয়াছি, ছড়ার মতই ভাদু গান অসংলগ্ন চিত্রে পরিপূর্ণ—

১৮

জল দিলে লড়ে না গাড়ী গো একি কলের মিস্ত্রী,
জলকে যাব জলকে যাব গো যে ঘাটে সরা বালি;
সরু শাঁখা মাজতে লারী গো গুমুরে কান্দ্যে মরি। —ঐ

১৯

চন্দ্রকলির মালা দিলে, না দিলে বকুল,
ফুলের সাথে হৃদয় দিতে হয় না যেন ভুল। —ঐ

২০

জ্যোৎস্না রাতে চুল শুখাতে একলা বসে রই,
একি জ্বালা, দাঁড়িয়ে কালা ঘোমটা নিতে হয়। —ঐ

জ্যোৎস্না রাতে যে চুল শুকাইবার জন্য একলা বসিয়া থাকে, সে যে চোখের সাম্‌নে 'কালা'কে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিবে, তাহাতে তাহার জ্বালার কিছু নাই; ঘোম্‌টা নিতে হয় বলিলেও ঘোম্‌টা নেওয়া হয় না। ইহাতে ভাদুর প্রতি ভক্তির কথা নাই, নিজের মনের জ্বালার কথাই প্রকাশ পায়।

২১

আয় ললিতে চাবকি হাতে বিড়াল যাচ্ছ্যে গলিতে,
কৃষ্ণ ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন কাঁচা দুধের সর খেত্যে। —বাঁকুড়া

২২

এ বন কাটি ও বন কাটি, কাটি বনের ধ্বজা গো
ঘোড়ার পিঠে ঘুঙুর বাজে চম্‌কে উঠে রাজা গো। —ঐ

ভাদু শিশু; আগে দেখিয়াছি, সে কৃষিকর্ম করিতে গেলেও ক্ষেতে জল আটকাইতে জানে না। এইবার দেখা যাইতেছে, সে রাঁধাবাড়াতেও খুব দক্ষ নহে—

২৩

আঁদড়ে পাদাড়ে ঝিঙ্গে এই ঝিঙ্গে তুই ধরিস্‌ না,
আমার ভাদু পিণ্ডি জেলে ঝিঙ্গে রাঁধতে জানে না। —ঐ

গানের সঙ্গে নৃত্যের কথা এখানে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। ভাদু গানের সঙ্গে নৃত্যও কোন কোন স্থানে দেখা যায়—

২৪

মাদল বাজা আমার এগুতে
আমি নেচে যাব কাশীপুরের কুলিতে
মাদলট বাজাবিত বাজাইলে
ও মাদল্যা আমাদেরি বটে। —ঐ

ভাদুর গায়িকারা তপ-তপস্যাকে কি ভাবে ব্যঙ্গ করিতেছে তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়—

২৫

ধনরতন চাইনে কিছু নাইক প্রয়োজন,
তপ-জপেতে যায় মম দিন তপস্বি ব্রাহ্মণ। —ঐ

যাহা চাই না, তাহাই চাই; যাহা চাই তাহাই প্রকৃত চাই না—

কুমারীদিগের তপস্বিনী হইবার প্রবৃত্তি আন্তরিক হইলে তাহারা ভাদুর গান গাহিত না, অন্য পথে চলিত।

এইবার ভাদুর বিবাহের পরিকল্পনার মধ্য দিয়া নিজেদেরই বিবাহের সুখস্বপ্নের কথা শুনিতে পাই—

২৬

সাধের ভাদুর বিয়ে!
পাড়া গিয়ে গিয়ে ডেকে আন ন'জন মেয়ে;
সাধের ভাদুর বিয়ে!
চিক পেড়্যে বোম্বাই শাড়ী লো এঁটে পরলো কোমরে,
পথে যেতে রোদের আভায় যেন লো ঝলমল করে।
সঙ্গেতে ইংরেজি বাজনা লো বাজলো মধুর স্বরে,
আমরা হেলে দুলে সবাই মিলে আসি লো বাজার ফিরে,
সাধের ভাদুর বিয়ে। —বাঁকুড়া

বোম্বাই শাড়ীর চাকচিক্য বাংলার পল্লী-বালিকার মন হরণ করিয়াছে; ইহা হইতে জাতীয় দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? তারপর দেশীয় ঢাক, ঢোল, ছাড়িয়া ইংরাজী ব্যাণ্ডবাদ্যের আব্দারেরই বা অর্থ কি? জিনিস যত দূরের, তত তাহার মূল্য; হাতের কাছের জিনিস চিরদিনই অনাদৃত। পল্লীবাংলার ইহাতে দোষ কি?

নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটিতে বিবাহাচারের বর্ণনা আরও বিস্তৃত—

২৭

বলি ও সরলা, ভাদুর বিয়ে, সরল মনে সাজালো বরণ ডালা
কাঁঠাল পাতা তুলে আন্‌লো সাজালো সন্দেশ থালা।
আলপনা দিয়ে কর, পরিষ্কার ছাঁদনাতলা
পাড়ায় যত এয়ো আছে, ডেকে আন এইবেলা।
কি মনের সাধে ভাদুর বিয়ে করে ফেল এই বেলা
চল শ্যাম সায়রে ভাদুর বিয়ে জলসয়ে আনিবারে;
চিক্ পিড়্যে বোম্বাই শাড়ী লো এঁটে পর কোমরে
রাস্তায় যেতে রৌদ্রের আভায় যেন লো ঝলমল করে।
সাধের ভাদুর বিয়ে। —ঐ

তিন

টুসু গান

টুসু রাঢ় অঞ্চলের লৌকিক শস্যোৎসব (harvest festival)। যখন অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে ধান্য পাকিয়া উঠে ও প্রতিগৃহ নূতন শস্যে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, তখনই এই উৎসব আরম্ভ হয়। পশ্চিম বাংলায় ইহা মেয়েলী তুষ-তুষলী ব্রত নামে পরিচিত। এই ব্রত কুমারী সধবা বিধবা সকলেই করিতে পারে। পৌষের প্রথম দিন হইতে আরম্ভ করিয়া মাঘের প্রথম দিন পর্যন্ত এই উৎসবের সময়। আবার কোনও কোনও অঞ্চলে অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির দিন হইতে আরম্ভ করিয়া পৌষ মাসের সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত এই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয়। বাঁকুড়ার পশ্চিম অংশ এবং পুরুলিয়া জেলায় এই উৎসবকে বলা হয় টুসু।

এইভাবে টুসুর পূজা করা হয়। ছোট মাটির সরায় তুঁষ ভরা থাকে। তাহার গায়ে একটি নারীর মুখ অঙ্কিত থাকে। মাটির সরাটি ফুল দিয়া সাজানো হয়, তাহাতে টুসুকে নানা মিষ্ট দ্রব্যের নৈবেদ্য সাজাইয়া দেওয়া হয়। তিনদিন মাটির সরাটি পুজা করিবার পর মকর সংক্রান্তির দিন তাহা নদীর জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। মেয়েরা মাটির সরাটি মাথায় করিয়া নদীর তীর পর্যন্ত লইয়া যায়। টুসু পুজার কতকগুলি নিয়ম ও আচার আছে। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জিলায়ও এই পুজা ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কোনও কোনও স্থানে টুসু পূজার নিয়ম এইরূপ :

প্রথম দিনে স্ত্রীলোকেরা মলিন বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিয়া থাকে ও পুরুষেরা মাছের সন্ধানে বাহির হয়। মাছ খাওয়া সেই দিনের একটি অবশ্য করণীয় নিয়ম বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। তারপর স্ত্রীলোকেরা চাউল দিয়া পুলি প্রস্তুত করিতে থাকে। একটি নূতন মাটির সরা কিনিয়া তাহার বহির্ভাগে চাউলের গুঁড়া জল দ্বারা মাখিয়া তাহার প্রলেপ লাগান হয়। তারপর তাহা দ্বারা উনুনে জল গরম করা হয়। এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় 'বাউরি বাঁধা', 'বাউরি বাঁধা' না হইলে কোনও স্ত্রীলোক পুলি প্রস্তুতে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকেরা ছড়া বলিয়া থাকে। যথা—

লবান্নর ধান ভানল্যাম দিনখেন কর‍্যে,
তার গুচ্ছেক কুড়া রাখল্যাম তুষাল মায়ের তরে।

তুষাল গো রাই
আমরা ছবড়ি পিঠা খাই লো।
ছবড়ি লো শোবড়ি তুষু পূজতে যাই
আলো তিল ছাঁই,
বাটিতে কর‍্যে সাজাঁই দিব খাও টুসালু মাই।

কোন কোন অঞ্চলে টুসু উৎসবের পূর্বে মেয়েরা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া অর্থ সংগ্রহ করে। এই অর্থ দ্বারা টুসুর উৎসবের ব্যয় নির্বাহ হয়। কোনও অঞ্চলে সরার পরিবর্তে একটি মৃৎপুত্তলিকাকে থালির উপর সাজাইয়া তাহার পূজা করিয়া থাকে। এই পুত্তলিকাটিকেই টুসু বলিয়া অভিহিত করা হয়। উৎসবের তিনদিন পরে এই পুত্তলিকাটিকে নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়।

বাউরি বাঁধার সময় নিম্নলিখিত রূপ ছড়া আবৃত্তি করা হইয়া থাকে। যথা—

টুসালু মায়ের সঙ্গে চেয়্যে লিব বর
ধনে পুত্রে ভরুক ঘর গো।
ভরল রে ভরল ই পৌষমাস
আরো ভরবেক গো উ পৌষমাস
পৌষ মাসে পৌষালু মাঘ মাসে পিঠা
দামুদর সিন্যাতে মাথা হল্যো চিঠা।
মা খণ্ডন বাপ খণ্ডন ভুঁই ধরে ধরে কথা,
মাথার কাপড় ঘুঁচাই দাও দুইটি কান বুঁচা।
বত্রিশ গাইয়ের ঘি কলসী সরু চালের ভাত
খুঁজে গুঁজে খাও টুসু সেই পৌষ মাস।

কোথাও আবার পূজার প্রণালী নিম্নলিখিত রূপ,—গোবরের সঙ্গে তুষ মিশাইয়া কতকগুলি নাড়ু পাকাইতে হয়। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সংখ্যক নাড়ু দুর্বা দিয়া পূজা করিবার পর তাহা একটি মাটির মালসায় তুলিয়া রাখিতে হয়। তারপর মকর সংক্রান্তির দিন নাড়ু শুদ্ধ মালসাগুলি মেয়েরা হাতে বা মাথায় লইয়া গিয়া কোনও পুকুর কিংবা নদীর জলে ভাসাইয়া দেয়। ইহার সহিত গান করিতে থাকে। যথা—

আদা চিটা গুড়ের মিঠা
তা দিয়েঁ দিয়েঁ খা টুসালুর মাইগো, ছবড়ি লাড়ুর পিঠা

ছবড়ি লাড়ু দুধের লাড়ু আর গ'টা চার
কাটা ভরতি ঘি গুড় দিব খা, টুসালুর মাই গো,
খা, টুসালুর মা।

বিভিন্ন অঞ্চলে টুসুর বিভিন্ন রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। মানভূম জিলার সংলগ্ন বাঁকুড়া জিলায় তাহার নাম তুষু এবং সেখানে তাহার এই রূপ দেখা যায়ঃ দগ্ধ মৃত্তিকার সরার উপর চতুর্দিকে মৃৎ প্রদীপ সজ্জিত থাকে। সরার গর্ভে ধান্যের তুষ দেওয়া। তদুপরি নানাবিধ পুষ্পের মাল্য, কড়ি ও গুঞ্জার হার দিয়া সরাটি সজ্জিত হয়। পূজার সময় প্রদীপগুলি জ্বালিয়া দেওয়া হয়। মানভূম জিলার বিভিন্ন অঞ্চলে টুসুর এই বিভিন্ন রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন— ১। ছোট কুণ্ডলাকার একটি গর্ত ২। একটি মাত্র সরা ৩। প্রদীপ বসানো একটি সরা, প্রদীপের সংখ্যা বিজোড়। ৪। একটি বাঁশের ছোট ডালা ৫। মাটির প্রতিমা ৬। চোলে। প্রথম চারিটির ভিতরে সর্বদা বিজোড় সংখ্যক গোবরের ও পিটুলির গুটি রাখা হয়। রঙ্গিন কাগজ ও সোলা কঞ্চি ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত দুই ফুট বা ততোধিক উচ্চ একটি মন্দিরাকৃতি বস্তুর নাম চোলে।

কোনও কোনও অঞ্চলে প্রতিমা-নির্মাণের প্রথা প্রচলিত আছে। মূর্তিটি বাহনহীনা সাভরণা, গভীর হলুদ রং, উচ্চতা অনধিক এক হাত। ইহার উপর ভাদু প্রতিমার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

মানভূম জিলার টুসুগানের সুর প্রায় ভাদু গানেরই অনুরূপ। পূজার প্রক্রিয়ার মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকিলেও ভাদুগান ও টুসুগানে বাহিরের দিক হইতে বিশেষ কোন পার্থক্য অনুভব করিতে পারা যায় না। ভাদু গানের অবলম্বন কুমারী-হৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু টুসুগানে সমগ্র সমাজেরই চিত্র প্রতিফলিত হইয়া থাকে। পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি আন্দোলনে সমসাময়িক বহু রাজনৈতিক সমস্যার কথা টুসুগানের সুরে প্রকাশ করা হইয়াছে। যথা—

জাগলো সাড়া ভারতের মনে
(টুসুর) জয় হবে সবাই জানে।
টুসুর বাণী উঠছে ধ্বনি
শুনগো তোরা স্বকানে।
বাংলা ভাষায় রাজ্য গঠন
তাঁহারি বিজয় গানে।

দিয়েছি মা স্থায়ের লড়াই তোমার অভয় ভাষণে
মিলন রাখী বেঁধে দে মা ভারতের জনগণে
নানা জাতি বনফুলে পুজবো মা তোর চরণে।
সোনার বাংলা শস্তে ভরা
(আমরা) রইব কি মা পিছনে।
সবার সমান হবো মোরা
তুমি ভুলোনা অভাজনে।

বাংলাদেশের টুসুর ন্যায় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও অনুরূপ উৎসব প্রচলিত আছে। উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, দিল্লী, পেপসু এবং পাঞ্জাবের কোন কোন জেলায় টেসু নামক একপ্রকার লোকসঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার সহিত টুসুগানের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু উভয়ের নামের মধ্যে যে ঐক্য দেখা যায়, তাহা লক্ষণীয়। ছোটনাগপুর অঞ্চলের আদিবাসী ওঁরাও জাতির ভিতর টুসুর ন্যায় একটি উৎসব প্রচলিত আছে। টুসুর সহিত তাহার কিছু কিছু মিল দেখা যায়। ওঁরাওদের বৎসর আরম্ভ হয় ইংরাজী নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে। এই সময় ফসল কাটার উৎসব হয়। এই সময় হইতে সুরু করিয়া ইংরাজী মার্চ মাসের ফাগু উৎসব পর্যন্ত ওঁরাওদের আনন্দের দিন। এই সময় শস্তে গোলা পূর্ণ হয় ও সেই সময় ওঁরাওদের একটি উৎসব হয় তাহার নাম 'কোহা বেঞ্জা'। এই উৎসব পৃথিবীর সহিত সূর্যদেবের বিবাহ, অন্যদিকে মৃতের সহিত জীবিতের বিবাহ রূপ একটি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান না হওয়া পর্যন্ত সমাজের কোন বিবাহানুষ্ঠান হইতে পারে না। যতদিন না ফসল কাটা শেষ হয়, ততদিন গ্রামের মৃতদেহগুলি দাহ করা হয় না। তাহা গ্রামস্থ মশানে প্রোথিত থাকে। সমস্ত ধান গোলাজাত হইবার পর সেই মৃতদেহগুলি মশান হইতে তুলিয়া দাহ করা হয়, তাহার পর অস্থি সংগ্রহ করা হয়।

স্ত্রী ও পুরুষেরা তৈল মাখিয়া গান গাহিতে গাহিতে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে নদীতে অস্থিগুলি বিসর্জন দেয়। টুসুর সহিত এই অনুষ্ঠানগুলির মিল নাই। ইহার পরের অনুষ্ঠানগুলির মিল আছে। যেমন টুসুর ন্যায় ওঁরাও উৎসবেও চাউল সিদ্ধ করিয়া মৃতের আহারের জন্য রাখিয়া দেয় হয়। 'কোহা বেঞ্জা' অনুষ্ঠানের পর 'হরবরি' বা অস্থিগুলি প্রোথিত করিবার অনুষ্ঠান হয়। তাহার

পর সমাজের বিবাহানুষ্ঠান হয়। ইহার সহিত যে নৃত্যানুষ্ঠান হয় তাহায় নাম 'যাত্রুর' নাচ। স্ত্রীলোকেরা পরস্পরে হাত ধরাধরি করিয়া নাচিতে থাকে; তাহাদের সহিত যুবকেরা মাদল বাজাইয়া ঐ নৃত্যে যোগ দেয়। যুবক ও যুবতীরা একসঙ্গে গানে যোগ দেয়। ছোটনাগপুরের বীরহোড় জাতির ভিতর টুসুর ন্যায় উৎসব চলিত আছে। তাহার নাম 'নয়াজোম'। নূতন ধান্য ভক্ষণকে বলা হয় 'নয়াজোম'। উৎসবের নামও 'নয়াজোম'। উৎসবের আর এক নাম 'সোসোবোঙ্গা'। সোসোগাছের ডাল পুঁতিয়া পুরুষেরা মাঠ হইতে ফিরিয়া আসে। স্ত্রীলোকেরা গোময়জল দ্বারা অঙ্গন পরিষ্কার করে। তাহার পর সেখানে ধান্য দ্বারা চাউল প্রস্তুত করিয়া তাহা দ্বারা চিঁড়া প্রস্তুত করে। একটি পাত্রে দুধ, চিঁড়া, সোসো গাছের পাতা, গুড়, ঘি লইয়া পাতার পাত্রে রাখা হয়। তাহার পর একজন পুরুষ চিঁড়া ও সোসোপত্রের উপর দুগ্ধ অর্পণ করে, তাহার সহিত প্রার্থনা করে—'সিঙ্গবোঙ্গা তুমি এই দুগ্ধ চিঁড়া প্রভৃতি লইয়া আমাকে ও আমার সংসারকে নীরোগ রাখ।' তাহার পর সকলে চিঁড়া ভক্ষণ করে ও সুরা পান করে। একটি পর্দা টাঙ্গাইয়া তাহার নীচে উৎসর্গীকৃত বস্তুগুলি রাখা হয়। অপরাহ্নে অন্ন প্রস্তুত ও কুক্কুট মাংস রান্না করা হয়; তার পর তাহা বিতরণ করা হয়।

মুণ্ডা জাতির ভিতর টুসুর সমতুল্য একটি উৎসব প্রচলিত আছে, তাহার নাম 'মাগে পরব'। ইহা পৌষ মাসের পূর্ণিমার দিন অনুষ্ঠিত হয়। টুসুর ন্যায় ইহাতেও গৃহস্থ সকলে উপবাস করিয়া থাকে এবং গৃহদেবতার নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে যাহাতে গৃহের সুখ শান্তি বজায় থাকে। তার পর গৃহস্থ নিজে ও তাহার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলে চিঁড়া ও চাউলের অন্ন গুড় আহার করে। সম্পন্ন গৃহস্থ হইলে তাহার সহিত দধি ও দুগ্ধ পরিবেষিত হয়। গৃহভৃত্যদিগকে কার্য হইতে ছুটি দেওয়া হয় এবং নূতন ভৃত্য নিয়োজিত হয়। গৃহের কর্তা অথবা গৃহিণী এক ফোঁটা তৈল ভৃত্যের মাথায় দেওয়ার পর গৃহকর্তা অথবা কর্ত্রী নিজ অঙ্গে তৈল মর্দন করেন। ইহার পর একপাত্র চাউল ও চারিটি পয়সা ভৃত্য (ধনগর)-কে দেওয়া হয়। এই ভাবে ভৃত্য নিয়োগ কার্য সমাধা হয়।

টুসু গান একটি উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হইলেও টুসুর ভিতর দিয়া জীবনের সুখদুঃখ, দৈনন্দিন জীবন-সমস্যা সমস্তই প্রকাশ পায়।

প্রতি দিন যাহা ঘটিতেছে তাহাও টুসুকে নিবেদন করা হইতেছে। যেমন—

চল টুসু চল জল আনিগা হীরা কচার জোড় ধারে,
শাল পাতে আর ভাত খাব না সতীন বড় গাল মারে।

অথবা

সাধের টুসু এসো
আলস আঘন মাস ফুরায়ে গেল।
টুসুর আগমন শুনে
আনন্দে সব মাতিল
ঘরে ঘরে ছেলেমেয়ে পূজিতে বসিল।

অথবা

এই মনের বাসনা
টুসু মাকে জলে দিব না
দেখতে লেগবো টাটার কারখানা॥
আয় কে যাবি আয়
আমার কোলের টুসু জলে যায়।

বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া হইতে সংগৃহীত গানগুলির মধ্যে টুসুকে একটি মানবী রূপে পাওয়া যায়। তাহার নানারূপ। সাধারণভাবে তাহার রূপ একটি গৃহস্থ বধূর রূপ। টুসুগানে তাহার রূপই প্রতিফলিত হইয়াছে।

মাটি জম্যে পাটি পাড়ল্যম বাপের ঘর যাব বল্যে,
গুণের দেবর কাঁদতে বসল করবরী ডাল ধর্যে।
কাঁন্দ না কাঁন্দ না দেবর আষাঢ় মাসের তিন দিনে
তোমার ভাইকে বলে দিবে ইংরেজী সড়প দিতে।

ইহা একটি প্রতিদিনের গার্হস্থ্য চিত্র। ইহার সহিত টুসুর দেবী-মহিমার কোনও সম্পর্ক নাই। আবার কখনও বলা হইয়াছে—

নডিহাটি সখের গাঁটি দিনে রাতে খোল বাজে,
শ্বশুরঘর যাবার বেলা দিনে রাতে মনে পড়ে।

প্রাত্যহিক জীবনের সুখদুঃখ হাসিকান্নায় ভরা এই টুসুগানের মধ্যে গ্রাম্য অনাড়ম্বর জীবনের সরলতা এমনভাবে মাখানো আছে যে, তাহা যে কোন

দরদী পাঠকের হৃদয় স্পর্শ না করিয়া পারে না। বিষয়ের দিক দিয়া গানগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে সাজাইতে পারা যায়।

প্রথমেই এই প্রকার টুসুর আগমনী গান শুনিতে পাওয়া যায়—

১

বাগান দিয়ে ঢোল বাজিছে টুসু নাকি আসিছে—
বাইরাও না গো, রঙ্গদেবী, সিংহাসনে সাজিছে।
টুসু নাকি ডুবিল গো জলে—
টুসুকে ছাঁকিবো গো মাহা জলে।
টুসু নাকি ডুবিল গো জলে…॥

—বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

গত বৎসর মকর সংক্রান্তির দিন টুসু ভাসান পরবে টুসুকে জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল; এইবার নূতন বৎসরের পরবের দিন তাহাকে জল হইতে ছাঁকিয়া তোলা হইবে।

তারপর টুসুর রূপ বর্ণনা শুনিতে পাওয়া যায়,

২

অচিরে পাচীরে পদ্ম লাল পদ্ম বই ফুটে না,
টুসুর হাতে জোড়া পদ্ম, ভোমরা বই বসে না।
ভোমরা এল মাতাখাতা রসিক বলে ফুল পাতা,
এমন দেখে ফুল পাতালি চলে গেলি কলকাতা।
বল টুসু মণি, তোকে কে দিল গো দুয়ানি;
কাঁচি কাটা ডবল পয়সা জলে দিলে হয় দু'টা—
এমন দেখে ভাব করলি ধরিল শালুক ফুল ফোটা। —ঐ

পল্লী-বালিকা আভরণ-পরিধানের সাধ টুসুর উপর দিয়াই মিটাইয়া লয়।

৩

নাকে নোলক কানে কান পাশা
টুসু করে না কারে আশা। —বাঁকুড়া

টুসুর রং কালো বলিয়া কেহ অবহেলা করিও না, বিষ্ণুপুর হইতে কাঁচা হলুদ কিনিয়া আনিয়া তাহার গায়ে বাঁটিয়া দিব, তাহার কালো অঙ্গ গৌর হইয়া উঠিবে।

৪

কে বলে রে কে বলে রে, আমার টুসু কালো রে,
বিষ্টুপরী হলুদ এনে, গা করিব আলো রে। —বাঁকুড়া

টুসুর সোনার অঙ্গে ধূলি মাখা—

৫

কে দিলে রে কে দিলে রে সোনার অঙ্গেতে ধূলা,
আমার টুসু জগৎ ঘুরে এই জগতের মন ভোলায়।
টুসুর পরবে তোদের ধান ভেনে দেই পুরুষে॥

—বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

টুসুকে সামনে লইয়া নারীহৃদয়ের নানা এলোমেলো চিন্তার রাশি কেমন যেন জট পাকাইয়া যায়—

এখন মাথা বাঁধব পরিপাটি তাতে দিব বেল কুঁড়ি।
বোম্বাইতে পার্শ্বেলেতে আনব যুগল চুড়ি।
মন বাঁধা দিয়ে সই আমি বিদায় হই—॥
কটকে গড়াব গয়না ঢাকাতে চট করাব।
কোলকাতাতে রঙ করায়ে টুসুধনকে সাজাব।
মন বাঁধা দিয়ে····· ···॥
দিল্লী হতে আনব লাড্ডু বারাণসীর হালুয়া।
বর্ধমানের মিহিদানা বাগবাজারের পান্তুয়া।
মন বাঁধা দিয়ে·········॥
আমার টুসু কাশী যাবে সঙ্গে চাকর ছয়জনা।
কালী মাটি দিয়ে ফিরবে দেখে টাটার কারখানা।
বাঁশপুরে তামা গলাই মাটি গড়াব আমদানী।
বন ছিল নগর বসাল কেপ্‌ কল আর কম্পানী।
মন বাঁধা দিয়ে········ ॥
মইলিশালের সরু চিঁড়া বৈদ্যনাথের বসা দই,
বলেছিলে সই পাতাব রাজার ছেলে আইল কই।
মন বাঁধা দিয়ে··············· ॥ —ঐ

টুসুর দেহখানি এমনি সরু যে পথ চলিতে গেলে তাহার বিনা বাতাসেই গা দুলিতে থাকে—

৭

এক সড়পে, দুই সড়পে তিন সড়পে লোক চলে।
আমার টুসু এমনি চলে বিন বাতাসে গা দোলে॥

—বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর

৮

লুলুক করে উলুক ঝুলুককোন পদ্দারে গড়েছে,
অমনি পদ্দার মুলুক গড়ে,নাকে বড় সাজেছে।
নাকে মুলুক কানে কানপাশা
ছিলছে মাথার খোপা। —ঐ

৯

পরকুলদ হয় ফুল ফুটেছেকেউ তুলিতে নারিছে,
আমার টুসুর এমনি ছাতি জোড়া নৌকা ছাড়িছে।
আমরা ফুল তুলেছি এক গলা জলে,
ও ফুল দিব টুসুর গলে॥ —ঐ

১০

টুসুরি দুয়ারে ফুলেরি বাগান চিরতা চিরতা পাতা
ডালও ভাঙ্গিব ফুলও তুলিব টুসুরও রাখিব কথা।
এস টুসুমণি, তুমি আদরিণী কি চাও আমারে বল না
ঐ যে হিমানী পাউডার, মুখে কেন তুমি মাখ না॥ —বাঁকুড়া

১১

ওগো চঞ্চলা, ওগো চারুবালা, আয়লো সবে সঙ্গিনী
পথে যেতে যেতে, মালা গেঁথে গেঁথে, করবো ফুলের আমদানী
ফুলেরি আয়না, ফুলেরি চিরুণী, ফুলেরি টুসুর মশারি॥ —ঐ

কুমারী হৃদয়ের প্রচ্ছন্নকামনা টুসুর নামে অনেক সময় ব্যক্ত হয়—

১২

ও রজনী, ও সজনী, ভাত গোটা চাল খা
টাকার মোট থলি নিয়ে পোদ্দার পাড়া যা

পোদ্দার ভায়া পোদ্দার ভায়া ঘরে আছ হে
আমার টুসুর বিয়া হবে, গয়না চাই হে।
গহনা তো দিলে রে ভাই, বহু যতনে
আরো কিছু না দিলে, সাজবেক কেমনে হে সাজবেক কেমনে।— বাঁকুড়া

১৩

একলা ঘরে টুসুর মন কেমন করে
যেন শোল মাছে উফাল মারে ॥ —ঐ

সরল গ্রাম্য উপমাটি এখানে লক্ষ্য করিবার যোগ্য।

টুসু প্রতিমাকে সাজাইবার ব্যাপার লইয়া প্রতিবেশীদিগের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা হয়, টুসু গানে তাহারও পরিচয় প্রকাশ পায়।

১৪

তোমার টুসু যতই সাজাও
চোখগুলি পিয়াজ ভাজা,
তোমরা যতই সাজাও
আলি বলে তাই দেখা হ'লো
তোমার কাপড়ের পাড় ভাল,
তোমাদের পাড়ায় যাব না গো সই,
তোমাদের ডোমরা চোখে কাজল কই।
—বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

১৫

আমার টুসু মুড়ি ভাজে চুড়ি ঝল্‌মল্ করে লো,
উয়ার টুসু অভিমানী আঁচল পেতে মাগে লো,
আর বুড়া চলতে নারে পথরে,
চাপায়ে দেব টেক্‌সী মোটরে। —ঐ

১৬

আমার টুসু মুড়ি ভাজে চুড়ি ঝম্ ঝম্ করে গো,
তোদের টুসু ছোঁচরা মাগী আঁচল পেতে মাগে গো,
ছি ছি লাজ লাগে না, তোদের খাঁদা নাকে
মুলুক দোলা সাজে না। —ঐ

পৌষ মাসে যখন টুসু উৎসব হয়, তখন কদম গাছের কথা মনে হইবার কথা নহে ; তথাপি ভাদু উৎসবের বর্ষা প্রকৃতির চিত্রটি কেমন জানি চোখে লাগিয়া থাকে। তারপর শিশু গাছের ফুলের পরিকল্পনাটির মধ্য দিয়া ইহার চিত্ররূপ রমণীয় হইয়া উঠে।

বাঁধের আডায় কদম গাছটি চারধারে ডাল মেলেছে,
শিশু ডালে ফুল ফুটেছে কত ভ্রমর বসেছে।
বস্‌বি ভ্রমর লাল জবা ফুলে—সে তো মৈরীবাবুর বাগানে।
বস্‌বি ভ্রমর লাল জবা ফুলে ॥ —বাঁশপাহাডী (মেদিনীপুর)

মৈরীবাবু অর্থে মুহুরীবাবু, একদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের স্পর্শ, আর, একদিকে বাস্তব জীবনের রূঢতার অনুভূতি গীতিটিকে কোমলে এবং কঠিনে মিশাইয়াছে।

টুসু গানে অনেক সময় রূপকের ব্যবহার হইয়া থাকে।

১৮

চাঁদ খুঁজ চাঁদমালা, দিনে চাঁদ কুথায়,
রাত হল্যে চাঁদ ধর্যে দিব বাঁশিটি বাজায়। —বাঁকুডা

টুসু উৎসব কোন শাস্ত্রীয় কিংবা ধর্মীয় অনুষ্ঠান নহে বলিয়াই ইহার সঙ্গীতে গার্হস্থ্য জীবনের কথা নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনে জামাতার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে, সেইজন্য টুসু গানে তাহার বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

১৯

বাডী নামোয় খয়ের গাছটি কাটিয়া করিব সওয়ারী।
সওয়ারীতে চাপি যাব ইচ্ছাপুর বাপের বাডী।
ইচ্ছাপুরে মিচ্ছা কথা বেগনাপুরের কেহারী,
ভাল করে বুনবি তাঁতী জামাই-বিটির জোড় ধুতি।
—বাঁশপাহাডী (মেদিনীপুর)

টুসু গান ছড়া এবং গানের মধ্যবর্তী রচনা, সেইজন্য ছড়ার ধর্ম ইহাতে অনেকখানি প্রকাশ পায়। এই ধর্ম কেবল মাত্র ইহার বহিরঙ্গ গঠনে নহে ভাবের অসংলগ্নতার মধ্যেও গোপন থাকে না। তাই এখানকার গানগুলি ছড়ায় এবং গানে মিশানো এক অভিনব রচনা।

২০

বাড়ীর নামোয় নারকেল গাছটি ঘটি ভরে জল দিব,
একটি নারকেল ধরলে পরে, ডাকে চিঠি পাঠাব।
চিঠি পাঠাই, ঘোড়া পাঠাই, তবু জামাই আসে না,
জামাই আদর, বড আদর, তিন দিন বই আর থাকে না।
আরও তিন দিন থাকো, জামাই, খেতে দিব পাকা পান,
বসতে দিব শীতলপাটি, নীলমণিকে করব দান। —বাঁকুড়া

গানটি ভাদু উৎসব উপলক্ষেও শুনিতে পাওয়া যায়। নিম্নোদ্ধৃত টুসু গানটিতে কালো জামাইয়ের প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যাইবে। এই প্রকার কালো জামাইয়ের প্রশংসা আরও অনেক গানে শুনিতে পাওয়া যায়—

২১

টুসুর মাগো, টুসুর মাগো, টুসুর বিয়া দাও এসে,
আইবডাতে জাঁতি হাতে লাতি কোলে লাও এসে।
লাতি বলে হাতি লিব, কোথায় হাতি পাব গো,
ওই যে আসছে রাজার ব্যাটা জোড়া হাতি লিব গো।
আসুক আসুক রাজার ব্যাটা, বসুক সিংহাসনে গো,
চরণ দুটি ধুয়ে দিব কালো মেঘের জলে গো॥
কালো করে ঝিকিমিকি, পদ্ম করে আলো গো,
হোক না আমার কালো জামাই বাঁশী বাজায় ভাল গো॥
—বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর

নাতি কোলে লইবার প্রলোভন দেখাইয়া টুসুর মাকে টুসুর বিবাহ দিবা জন্য অনুরোধ করা হইতেছে। নাতিও বড উচ্চাভিলাষী হইল, সে কথ বলিতে শিখিবামাত্র জোড়া হাতি চাহিয়া বসিল। রাজপুত্র জোড়া হাি করিয়া আসিয়া সিংহাসনে বসিল, কালো মেঘের জলে তাহার পা দুইটি ধুইয় গেল। কালো মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের আলো ঝিকিমিকি করিতে লাগিল জামাইটি কালো হইলে কি হইবে, তাহার গুণের সীমা নাই।

নিরক্ষর গ্রাম্য কবির রচনায় চিত্রগুলি অনুপম।

২২

জোড় তলাতে জামাই এলো উঠ, টুসু, টপ্ করে,
হলুদ তেল ডগমগ দাও, মা, বিদায় দাও টপ্ করে।
পায়ে আল্‌তা, কুলি কাদা তায় এসেছে নিতে গো,
হেরাইল সিঁদুরের খাঁড়ি মন সরে না যেতে গো।
বাবা বলে বিদায় বিদায়, মায়ের ছাতি ফাইটে যায়,
ভাইয়ে বলে শিশু বুইন গো পাছে রাস্তায় কেঁদে যায়।
ও ভাই আমার অমূল্য রতন,
তোকে দেখিলে রে জুড়ায় জীবন ॥

—বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

পিতৃগৃহ হইতে কন্যাকে পতিগৃহে লইয়া যাইবার জন্য জামাই আসিয়াছে। কন্যা অশ্রুজলে মায়ের নিকট বিদায় চাহিতেছে। পথে কাদা, পায়ের আলতা ধুইয়া যাইবার দোহাই দিয়া কন্যা যেন কি বলিতে চাহিতেছে। তারপর সিঁদুরের খাঁড়ি হারাইয়া গিয়াছে, তাহাও বালিকা-বধূর পতিগৃহে যাত্রার পক্ষে শুভসূচক নহে। তথাপি বাবা বিদায় দিতেছেন, মায়ের বুক ফাটিয়া যাইতেছে। শিশু ভগ্নীটির জন্য ভাইয়েরও মন কেমন করিতেছে। ভগ্নীরও জীবন জুড়ানো অমূল্য রতন ভাইটির দিকে চাহিয়া পতিগৃহের পথে পা উঠিতেছে না। এই গার্হস্থ্য চিত্রটির মধ্যে পরিবারিক জীবনের যে মাধুর্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার তুলনা কোথায় পাওয়া যাইবে?

সতীনের প্রতি বিদ্বেষের কথাও টুসুগানে গোপন থাকে না—

২৩

পিঁয়াজ কেটে রসুন লাগাব,তোদের বাবুগিরি ঘোচাব।
আইল সতীন মারবি নাকি, তোর মার খেয়ে ঘর যাব।
পিঁয়াজ কেটে রসুন লাগাব ॥ —ঐ

২৪

ও তুই খাইস্ না বনের শালপাতে,
মরণ আছে সতীনের হাতে।
এক সরপে, দুই সরপে তিন সরপে লোক চলে।
টুসু আমার মধ্যে চলে বিন্ বাতাসে গা দোলে ॥ —পুরুলিয়া

অনেক সময় ছড়ার একটি অংশ যেমন আর একটি অংশের সঙ্গে অসংলগ্ন ভাবে জুড়িয়া যায়, এই সকল মৌখিক রচিত সঙ্গীতেরও এক একটি অংশ অন্য একটি সঙ্গীতের অংশের সঙ্গে জুড়িয়া যায়। উপরি-উদ্ধৃত সঙ্গীতটিতে তাহাই হইয়াছে। অনেক সময় ভাদুগানে এবং টুসুগানে এই প্রকার একাকার হইয়া যায়।

অনেক সময় সঙ্গীতের মধ্য দিয়া উত্তর-প্রত্যুত্তরও শুনিতে পাওয়া যায়। সতীন বিষয়ক একটি উত্তর প্রত্যুত্তরমূলক টুসুগান এই প্রকার—

২৫

আয়লো সতীন মারবি নাকি
তোর মাইর খেয়ে যাব,
তোর দুয়ারে বেচা[১] গাইড়ে
তোকে বলিদান দিবো।
উত্তর—ও তোর একটা বলে কি হলো
তোর মু'টা খুঁজাতে ছিল,
আর বলিস্ না—গা জ্বলে গেল।
প্রত্যুত্তর—তোর গা জ্বালার ঔষধ দিব
তোর দুয়ারে ডাক্তার বইসাবো। —ঐ

সতীন যে জনমের বাদী তাহা এমন জ্বালাময়ী ভাষায় আর কোথায় শুনিতে পাওয়া গিয়াছে? প্রত্যক্ষ জীবনের তিক্ততম অভিজ্ঞতার ভিতর হইতেই এই বিদ্বেষের জন্ম বলিয়া ইহার ভাষা এমন অগ্নিবর্ষী—

২৬

এক গাডী কাঠ দু-গাডী কাঠ কাঠে আগুন লাগাবো,
যখন আগুন হুদ্‌হুদাবে সতীনকে ঠেলে দিব।
সতীন আমার জনমের বাদী।
শাঁকা পরবো লো আদাবাদী।
সতীন আমার জনমের বাদী॥ —বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

১ যূপকাষ্ঠ

ভাসুর সম্পর্কেও বধূর যে কি মনোভাব, তাহাও টুসু গানের মধ্য দিয়া গোপন থাকে না—

২৭

বিষ্ণুপুরে দেখে এলুম শালগাছে বেল ধরেছে,
চললো, বেল পাড়তে যাব।
যখন বাগাল বাঁশী ফোঁকে তখন আমরা হেঁসেলে,
কি ক'রে বেরোব বাগাল হ্যাংলা ভাসুর দুয়ারে॥

—বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

হ্যাংলা ভাসুর দুয়ারে বসিয়া আছে, বধূর ঘরের বাহির হইবার উপায় কি?

২৮

মাছ বনালাম চাকা চাকা মাছের কাঁটা সিজ মা—
ভাসুর হয়ে জিগির করে লজ্জাতে প্রাণ বাঁচে না!
ও ভালবাসা,
তুমি চলে গেলে চাঁইবাসা। —ঐ

ভ্রাতৃবধূ সম্পর্কে ভাসুরের অহেতুক কৌতূহল প্রোষিতভর্তৃকা বধূকে প্রবাসী স্বামীর কথা আরও অনেক বেশী করিয়া স্মরণ করাইয়া দেয়। স্বামী বিদেশে চলিয়া গেলে ভাসুরই যে কেবল ভ্রাতৃবধূ সম্পর্কে অকারণ কৌতূহলী হইয়া উঠে, তাহাই নহে, বাড়ীর মধ্যে দেবরও যেন জমাদার হইয়া উঠে।

২৯

বাড়ী নাময় ছোলা বুনলাম ছোলা ধরে চমৎকার,
কোলের পুরুষ বিদেশ গেছে ছোট দেবর জমাদার।
ধন্য কলি ধন্য মানবাজার॥
ও কলি যুগের বউ হয়েছে দানাদার,
ধন্য কলি ধন্য মানবাজার॥
বাঁকুড়াতে দেখে আইলাম টিনে টিনে কেরোসিন,
কাঠালিতে দেখেছি আমি ভাসুর মারা বউ আছে॥ —ঐ

বাংলার আগমনী গানে জননীর প্রতি কন্যার যে অভিমানের অভিব্যক্তি

হইয়া থাকে, তাহা যে টুসু গানের মত লোক-সঙ্গীতের সুর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত গান হইতে অনুভব করা যায়—

৩০

এত বড় পোষ-পরবে রাখলি মা পরের ঘরে,
পরের মা কি বেদন জানে অন্তরে যারে মারে।
পর-পীরিতি জলন্ত আগুন ॥
যেমন জলছে লো তুঁষের আগুন
পর-পীরিতি জলন্ত আগুন··· ॥ —ঐ

৩১

এতো এতো পরব গেল
মায়ে বাপে নিতে না আইল,
ঠো ভাঙ্গা আঠারি পরব
আমি বাবা চাইরা যাব, চাইরা যাব। —পুরুলিয়া

পৌষ পরবে 'পরের ঘরে' থাকিবার মত দুর্ভাগ্য বালিকা-বধূর আর কিছু নাই। উৎসবের দিনেই প্রিয়জনের জন্য মন কেমন করে। বালিকা পতিগৃহে আসিয়া পিতৃগৃহের সুখস্মৃতির মধ্যে নিজের প্রিয়জনের পরিচিত মুখ সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে; পতিগৃহকে এখনও পরের ঘর বলিয়া মনে হইতেছে।

৩২

মাগো মাগো, বিয়া দিলে বড় নদীর সে পারে,
এতো বড়ো পৌষ পরবে রাখলি, মা, পরের ঘরে।
মাগো, আমার মন কেমন করে।
যেমন তাতা কড়ায় খই ফোটে ॥
মায়ে দিল মাথা বেঁধে দেগো, মাসী, ফুল গুঁজে,
বিদায় দে, মা, সংসারের কাজে।
আমি থাক্‌ব না, মা, তোর ঘরে ॥ —বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

৩৩

কাল দেখে নামলাম জলে জল আইল মা এক গলা,
এ প্রাণনাথ ছাঁকিয়া তুল রং দেখিবার যায় বেলা।
বারণ করি ও কাল সোনা, তোরা রাইয়ের কুঞ্জে যাইও না। —ঐ

৩৪

মাথা ঘষে রইলাম বসে আর আমাদের কে আছে ?
মা রইলো দূরান দেশে প্রাণ জুড়াব কার কাছে ?
যুঁই জবা ফুলে—
টুসুর মাথা বাঁধব গো জবাফুলে ॥ —বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

৩৫

এত বড় পৌষ পরবে রাখলি, মা, শ্বশুর ঘরে,
ওমা, পরের মা কি বেদন বোঝে অন্তর ঝুরে মরে ॥
এমন মন বলে,
উড়ে যায়ে বই সবে মায়ের কোলে ॥ —পুরুলিয়া)

৩৬

এত বড় পৌষ পরবে রাখলি মা পরের ঘরে,
মাগো, আমার মন কেমন করে।
পরের মা কি বেদন জানে অন্তরে জ্বালায়ে মারে—
উপর পাড়ার টুসু তুমি, নামো পাড়ায় যেয়ো না,
মাঝ কুলিতে সতীন আছে পান দিলে পান খেও না।
—বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর

মনে হয়, উপরি-উদ্ধৃত সঙ্গীতের শেষাংশটি অন্য কোন টুসুগানের একটি অংশ, কোন ভাবে ইহাতে জুড়িয়া গিয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত টুসু গানটিতে যেন রবীন্দ্রনাথের 'বধূ' কবিতাটির বেদনার্ত ভাবটি অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে—

৩৭

মাথা ঘসে রইলাম বসে আর আমাদের কে আছে—
মা বাপ আছে দূর দেশে প্রাণ জুড়াব কার কাছে।
বল গো আমার মা কোথায় আছে,
আমি প্রাণ জুড়াব কার কাছে।
ধিকি ধিকি প্রাণ কেঁদে ওঠে
বল গো আমার মা কোথায় আছে ॥ —ঐ

মা ছাড়া বালিকার প্রাণ জুড়াইবার আর কে আছে। পতিগৃহের অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে বালিকা-বধূ কেবল মাত্র মায়ের মুখখানি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, শৈশবের মাতৃস্নেহের স্মৃতি তাহার মনকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে।

৩৮

মাথা ঘষে রইলাম বসে কাল চিতল পাথরে,
মা বাপ আছে দূরান দেশে প্রাণ জুড়াব কার কাছে।
ঝিকিমিকি প্রাণ কেমন করে॥ —ঐ

প্রাণ যে কেমন করে, তাহা বুঝাইয়া বলিবার নহে ; বালিকা তাহা ভাষায় বুঝাইতে পারে না, গ্রাম্যকবিও তাহা তাহার সঙ্গীতের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিবার ভাষা খুঁজিয়া পায় না। ঝিকিমিকি এই শব্দটি দিয়াই প্রাণের সেই সময়ের অবস্থাটুকু বুঝাইতে চাহে। ভাষার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করিতে যাহারা সর্বদা উৎসুক, তাহারা বালিকাকে শব্দের অপপ্রয়োগের জন্য অভিসম্পাত করিবেন।

৩৯

বাপের ঘরের কাপড়খানি ধারে ধারে ধাধ্‌কি ফুল।
শ্বশুরকুলের লোকে বলে গেলরে তোর জাতিকুল॥ —ঐ

ননদ জা ইহারাও পারিবারিক জীবনে নানাভাবে বধূর জীবনের বিড়ম্বনা সৃষ্টি করে। টুসুগানে তাহাদের কথাও বাদ যায় না।

৪০

টুসু যায় না জলে ও জল আনবো গো বাসক ডালে,
টুসু যায় না জলে।
আমার টুসু জলকে যায়, মা, যে ঘাটে সরবালি,
এবার টুসুর বিহা দিব যার ঘরে সোনার থালি।
রং— আঙ্গিনাতে রুনঝুনি খাড়া
দাদা, দেখবি বৌয়ের মুখ নাড়া।
ননদ পেল সরু শাঁখা
বড় বৌয়ের মুখ বাঁকা,
হালের হাসো বিকরে, দাদা,
বড় বৌকে দে শাঁখা॥ —পুরুলিয়া

ননদ সরু শাঁখা পাইয়াছে বলিয়া বড় বৌয়ের যে মুখ ভার হইবে, তাহা সংসারের অনিয়ম নহে ; কিন্তু হালের হাঁসো নামক প্রয়োজনীয় সরঞ্জামটি বিক্রয় করিয়া যে বড় বৌকে শাঁখা কিনিয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা কে সমর্থন করিবে ? তবে বৌয়ের মুখভার হইবার মত পারিবারিক দুর্ঘটনা আর কিছুই নাই ; সুতরাং তাহার প্রতিকারের জন্য হালের হাঁসুয়া ত তুচ্ছ জিনিস।

মামা-মামীর কথাও টুসু গানে নানাভাবে শুনিতে পাওয়া যায়—

৪১

মামী-ভাগ্‌নী জলকে গেছে মামীর কলসী ডুবে নাই,
যা গো ভাগ্‌নী বলে দিবি তোর মামার ঘর আর করব না।
ওলো ভাগের ঘর যে না তাকে করবো পুঁটী মাছ চেনা,
ওলো ভাগের ঘর আর করব না ॥ —বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

৪২

বাড়ী দিকে পথ রাখিছি মামীর মা আসিবেক বলে,
মামীর মাকে খাতি দিব—কুলি পাকা মিঠাই বলে।
জল দেখে প্রাণ খিদা লেগেছে, তোর গাঁইটে বাঁধা কি আছে।
জল দেখে প্রাণ খিদা লেগেছে ॥ —ঐ

শ্বশুর-শাশুড়ীর কথা শুনিতে পাওয়া যাওয়া ত আরও স্বাভাবিক—

৪৩

রাজা গেল রেল-সড়কে রাণী কাঁদে ডাল ধরে,
আর কেঁদ না, পাটের রাণী, রাজা কি আর ঘর ফিরে।
পোস্ত কাঁদে গোল আলুর তরে,
আমার মন কাঁদে শ্বশুর ঘরে ;
পোস্ত কাঁদে গোল আলুর তরে। —ঐ

টুসুগান গার্হস্থ্য জীবনের গান, এই গানের নায়িকা সদ্য পিতৃগৃহ হইতে আগত বালিকা-বধূ। যাহারা এই গান গাহে, ইহা তাহাদেরই বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-জাত ; সেইজন্য ইহার মত আন্তরিক আর কিছু নাই। ইহা নারীর মনের পুরুষোচিত কৃত্রিম জীবন-কথা নহে, ইহা নারী কর্তৃক নারী জীবনের আন্তরিক স্বীকারোক্তি। জীবনের রস ইহাতে যেমন

তেমনই নির্মল। একটি কথাও এখানে অতিরঞ্জন দ্বারা কৃত্রিম হইয়া উঠিতে পারে নাই—

৪৪

ই চালে পুঁই উ চালে পুঁই পুঁইয়ের খাব মেচুরি,
আর যাব না শ্বশুর বাড়ী ধইরে মারে শাশুড়ী। —ঐ

এখানে বধূ জীবনের যন্ত্রণার আন্তরিক ও সহজ সরল অভিব্যক্তি দেখা যায়।

ভাজের কথাও টুসু গানে শুনা যায়—

৪৫

টুসুর চালে লাউ ধরেছে লাউ তুলেছে রাখালে,
আজ তো রাখাল ধরা যাবে ছোটরাণীর মহলে।
ভাজ আমার অতি সুন্দরী, যেমন ইঁচল মাছের ফুল বড়ি।
পোষ মাসের আসকে পিঠে—
দে না, দিদি, এক থালা চির চিরি খাড়া,
মামী, করলি গো দুয়ার ছাড়া,
ও তুই পানে কেন চুণ দিলি,
এত দিনের ভালবাসা আজকে কেন জবাব দিলি। —ঐ

৪৬

ও বড় বউ রাগ কেনে, দাদা দিবে আজ শাড়ী কিনে।
বড় দাদা বাক্স খুলে আন্‌ছে গো টাকা গুণে।
টাওনায় আছে ফর্দি শাড়ী, তোমায় দিবে আজ কিনে।
বছর দিনের বড় পরব, দাদার আছে গো সবাই মনে,
দশ টাকা দামের শাড়ী লিলি, কান ফুল দিলি কই কানে॥
আস্‌ছে বছর কান ফুল লিবি, টাকা রাখবি গোপনে।
শাউড়ি ননদ জানতে পালে, গাল দেবে তোরে দুই জনে॥ —ঐ

বউকে দশটাকা দামের একখানি শাড়ী কিনিয়া দিলেও যে শাশুড়ী ননদীর হাতে নিস্তার নাই, তাহা কেবল গ্রাম্য জীবনের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ব্যক্তিই নহে, আধুনিক সভ্যসমাজের অধিবাসীরাও জানেন। সুতরাং জীবনের শাশ্বত বৃত্তি

অবলম্বন করিয়াই এই সকল সঙ্গীত রচিত হইয়াছে বলিয়া ইহাদের মূল্যও চিরন্তন।

ফুল পাতানো বা সখীত্ব পাতানো এই অঞ্চলের সামাজিক জীবনের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। তাহার কথাও টুসুগানে শুনিতে পাওয়া যায়—

৪৭

মাগো, মাগো, ফুল পাতাব ফুলকে আমার কি দিব।
বাজার যাব পয়সা পাব ফুলকে ফুলাম তেল দিব,
ফুলাম তেল গন্ধ ছুটাব,
তোকে পেছু পেছু ছুঁটোয়াব। —বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

প্রেম-বিষয়ও টুসুগানে একটি প্রধান অংশ অধিকার করিয়া আছে। তাহার দুই একটি নিদর্শন মাত্র এখানে উদ্ধৃত করা যায়—

৪৮

আমার টুসু মান করেছে—মানে গেছে সারা রাত,
খোল টুসু মানের কপাট, আস্‌ছে তোমার প্রাণনাথ।
বেলা বারোটা বাজি গেল, তেলের বাটি-সাবান কই এল। —ঐ

৪৯

ঘী দিয়ে ভাজিলাম কালা তবু তিতা গেল না,
কালা ফুলে দেখা পাইলে ধরব কোহা ছাড়ব না।
ভাব্‌রি বনে কে বাজায় বাঁশী
আমি ফুল সাবানে গা ঘসি,
ভাব্‌রি বনে কে বাজায় বাঁশী॥ —ঐ

৫০

টুসুর চালে লাউ ধরিছে হচ্ছে মা, কুলি কুলি,
হাত বাড়িয়ে তুলতে গেলে দেব জোড়া পানের খিলি।
জোড়া জোড়া পানের খিলি জাঁতি কাটা সুপারি,
অনেক দিনের ভালবাসা আজ কেনে জবাব দিলি। —ঐ

৫১

পান বানালো প্রাণ-সজনী, পানে কেনে চুণ দিলি।
তোর মনে আমার মনে লিখে দিব দোয়াত-কলমে॥ —ঐ

৫২

সোত কইরেছি এক গলা জলে,
তোকে ছাইড়ব না জীবন গেলে। —বাঁকুড়া

৫৩

কেমন তোদের মা-বাপ, দিদি, কেমন তোদের হিয়ে,
অত বড় ধুমড়ো মাগী না দিয়েছে বিয়ে।
ভাল আমার মা বাপ, দিদি, ভাল আমার হিয়ে,
তোমার মতন নাগর পেলে দিত আমার বিয়ে। —ঐ

মৈমনসিংহ-গীতিকার 'মহুয়া' পালায় প্রায় অনুরূপ একটি সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়। তাহার ভাষা এই প্রকার—

'কঠিন তোমার মাতাপিতা কঠিন তোমার হিয়া,
এমন যৌবন কালে না করাইল বিয়া।'
'কঠিন আমার মাতাপিতা কঠিন আমার হিয়া,
তোমার মতন নারী পাইলে আমি করি বিয়া।'

বাঁকুড়া ও মৈমনসিংহের মধ্যে স্থানগত ব্যবধানের কথা চিন্তা করিলে এই ঐক্য বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইবে। তবে ১৯২৩ সন হইতে 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' প্রথম মুদ্রিত হইয়া বহুল প্রচারলাভ করিতেছে, ইহা তাহার প্রভাবের ফল হওয়া স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতে পারে।

৫৪

বাঁকুড়ার সরু চাদর উলে গেলে ধরব না।
যার সঙ্গে বিচ্ছেদের কথা প্রাণ গেলেও রা কাড়ব না।
রংকনি ফুলে মালা গাঁথব গো—
সবাই মিলে গাঁথব গো ॥ —ঐ

৫৫

মেঘ করেছে মেঘচি মেঘচি চুল শুকাবার দায় হলো—
নারকেল গাছে ডগ মেলেছে, পাশে লো চুল গুমিছে।
মাথা বাঁধা ডোর গেল চুরি—
আমরা লাজের কথা বলবো কি,
মাথা বাঁধার ডোর গেল চুরি। —ঐ

মাথা বাঁধা ডোর চুরি যাইবার মধ্যে এত লজ্জার যে কি কথা আছে, তাহা সহসা বুঝিতে পারা যায় না ; কিন্তু একটু গভীর ভাবে বিচার করিলে বুঝিতে পারা যাইবে, ইহাতে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অনুভূতি-সাপেক্ষ মাত্র, বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ নহে।

৫৬

একলা ঘরে মন কেমন করে,
যেমন শোল মাছে উফাল মারে—
একটি ঘরের দুটি দুয়ার
জলকে গেলে যায় চুরি
হে শ্বশুর মিনতি করি দুয়ারে দাও জলহরি। —পুরুলিয়া

বৈষ্ণব কবির 'শূন্য মন্দির মোর'-এর ভাবটিই গ্রাম্য কবির 'একলা ঘরে মন কেমন করে' এই ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে, তারপর 'যেমন শোল মাছে উফাল মারে' এই চিত্রটি যে কি, তাহা যে চোখে না দেখিয়াছে, তাহাকে কি ভাবে বুঝান যাইবে ? আর চোখে কয়জনই বা তাহা দেখিয়াছে ?

৫৭

বড় বাঁধে উঠি ডুবি যমুনা বাঁধে কে তুমি,
সাহ্ড়া গাছে ডাল মেলেছে হরতকি তলায় আমি।
একগলা গলসি বাঁধে জল আছে।
তোদের পায়ের তলায় মল আছে,
মল আছে লো, মল আছে।
গলসি বাঁধে জল আছে॥

—বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

৫৮

ভালবাসা বলেছিল, পৌষ মাসে কাপড় দিব,
পৌষ ফুরাইল মাঘ পড়িল ভালবাসায় কই দিল ?
আর ভালবাসার আশা করব না,
কাপড় দিলেও কাপড় পরব না। —ঐ

ভালবাসার আশা কি একখানি মাত্র কাপড় কিনিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলেই ছাড়িয়া দেওয়া যায় ? তবে 'ভালবাসা'র জন্য যে আমরা সর্বস্ব

ত্যাগ করিবার কথা শুনি, তাহার অর্থ কি? সুতরাং এই ভালবাসা প্রকৃত ভালবাসাই নহে, তামাসা মাত্র!

৫৯

আয়না চাই না, চিরুণ চাই না, চাইছি বঁধু তোমারে,
তুমি যখন চাক্‌রী যাবে মনে রেখ আমারে।
বাঁশীটি তো বারণ শোনে না,
কত ছল করে যায় যমুনা॥ —ঐ

৬০

টুসুগানে রামায়ণের এবং ভাগবতের কাহিনীও শুনিতে পাওয়া যায়;

বনে চলি, বনে চলি বনে চলা দায় হইল,
ফুটিল লব-কুশের কাঁটা কোন বনে হারাইল।
ভিক্ষা দাও মা, দাও মা সীতা,
চারটি ভিক্ষা দাও, মা; সীতা নন্দিনী—
ভিক্ষা দিতে লারব আমি আসুক রামগুণমণি।
রাম নাকি হে বনে যাবে, হাতে লাউয়ের গণ্ডীবান,
চোদ্দ বৎসর বনে যাবে চাইয়া লও মায়ের পানে॥ —ঐ

রামায়ণের কাহিনীর উল্লেখ থাকিলেও তাহার ঘটনার কোন পরম্পরা ইহাতে থাকে না; এলোমেলো হইয়া চিত্রগুলি চোখের সামনে দিয়া যেন উড়িয়া যায়। সেইজন্য সীতা-হরণের পর রাম-বনবাস যাত্রার কথা ইহাতে আসিয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত গানটিতেও সীতার অগ্নিপরীক্ষার পর সীতাহরণের কাহিনী এবং সর্বশেষে রামের বনগমন প্রসঙ্গ আসিয়াছে। তবে অশোক বনে বন্দিনী সীতার পাশা খেলার চিত্রটিই এখানে সর্বাপেক্ষা 'চিত্তাকর্ষক' হইয়াছে।

৬১

কাঠ চালাব ভারি ভারি কাঠে আগুন লাগাবো,
যখন আগুন পয়গল হবে সীতাকে ঠেসে দেব।
রাম কাঁদে বনে, সীতা হরে নিল রাবণে,
ও রামের মা, ও রামের মা, দেখ্‌তো রামের দুখদশা;
বস্ত্র বিনে গাছের বাকল তেল বিনে মাথায় জটা,
অশোক বনে পাতার কুড়া সীতা পাশা খেলেছে।

যোগীর বেশে রাবণ এসে সীতা হরে নিয়েছে।
রাম নাকি রে বনে যাবে হাতে নেবে গণ্ডীবান,
চৌদ্দ বৎসর বনে যাবে চাইয়ে লেরে মায়ের পানে।
রাম কাঁদে বনে। —ঐ

৬২

ঠায় ফাগুনে রইলাম বসে আর আমাদের কে আছে ,
মা রইল দূরান দেশে প্রাণ জুড়াব কার কাছে।
কোথায় কিষ্ট জীবন, কৃষ্ণ একবার দেখা গো,
আমি ভাই বনে লইয়া রাখালগণে
এই রকম গোষ্ঠে যাই।
কোথায় কিষ্ট জীবন কৃষ্ণ একবার দেখা গো ॥ —ঐ

৬৩

মায়ে ডাকে আয় রে গোপাল, হইল রে অনেক বেলা,
রাখাল বেশে ধূলায় খেলা শুকাইল দুধের গলা,
মাগো আমার মন কেমন করে,
যেমন শোল মাছে উফাল মারে। —ঐ

টুসুগানগুলি সর্বদাই যে আকারে ক্ষুদ্র হয়, তাহা নহে , সাধারণতঃ দেখা যায় যে, পুরাণ-বিষয়ক সঙ্গীতগুলি আকারে দীর্ঘও হইয়া থাকে। একটি নিদর্শন এই—

৬৪

আচম্বিতা মূর্ছাগত ধূলায় পড়্যে অচেতন,
মা বল্যে ডাকে নাই কৃষ্ণ, ইকি দেখি বিবরণ।
দেখ্ আস্তে রোহিণী দিদি গোপালের গো কি হল্য,
বিনা মেঘে শিলাবৃষ্টি বজ্রপাত কেনে হল্য।
রোহিণী আসিয়া বলে তোর গোপালের কি হল্য,
বিনা মেঘে শিলাবৃষ্টি বজ্রপাত কেনে হল্য।
উঠরে বাপ চেতন কর, খাওরে ক্ষীর-নবনী,
তুমার জন্যে এই গোকুলে কাঁদিছে রাইরমণী।
উঠরে বাপ চেতন কর, ওরে আমার নীলরতন,

শ্রীদাম, সুদাম, সুবল সঙ্গে যাবেন কি গোচারণ।
উঠরে বাপ চেতন কর, ওরে ও কালোসোনা,
তুমার জন্যে এই যমুনায় কাঁদিছে কত জনা।
উঠরে বাপ চেতন কর, খাওরে ক্ষীর-নবনী,
মুখে বাজাও মোহন বাঁশি উজানে বয় যমুনা।
রোহিণী আসিয়া বলে, তোর গোপালের জ্বর হল্য,
ডাকিয়ে বৈদ্যকে এনে শীঘ্র কর্যে দেখালো।
এবর্যে কৃষ্ণের জ্বর হয়্যেছে, পড়ে আছে এক পাশে,
নড়ে নাই, চড়ে নাই কৃষ্ণ, মা বলে নাই কাল হত্যে।
অদ্য এল বৈদ্য রূপে, কৃষ্ণ ধনকে বাঁচাতে,
অমূল্য ধন দিবে বৈদ্য, যদি কৃষ্ণের প্রাণ বাঁচে।
কুথা হত্যে এল্যে বৈদ্য, কুথায় তোমার বসতি,
কেবা তোমার পিতা বটে কে বটে মাতা সতী।
পিতার নামগো নন্দ বৈদ্য মাতার নাম যশোমতী,
গোপাল বৈদ্য নামটি আমার নন্দালয়ে বসতি।
পরিচয় লিবে কি মা পরিচয়ের প্রয়োজন কি।
গোপাল যদি বাঁচে তোমার আমি বৈদ্য আস্যেছি।
কে আছে মা বেজে সতী ডাক মা শীঘ্র গতি
সতীর জলে ওষুধ বেঁটে বাঁচাব কালোশশী।
কুটিলা জটিলা বলে আমরা দুজন হই সতী
অহংকারে মত্ত হয়ে কাঁখে করে কলসী।
আঠারো ছিদ্র বারি দেখে লাগে বুকে ভয়
আয়ান দাদা বস্যে আছে দেখে পাছে গোসা কয়।
আমরা জলে যাব নাগো, আমরা জলে যাব না,
আয়ান দাদা বস্যে আছেন, দেখে করবেন গঞ্জনা।
ঘড়ি নাড়ো ঘড়ি চাড়ো খড়িতে দিয়েছ মন
রাধা নামে উঠ্‌ল খড়ি ডাক মা ও এখন।
রাধিকার বাড়ীতে গেলেন গেলেন দূতী দুজনা
চলগো রাধে শীঘ্র কর্যে বাঁচবে কালোসোনা।

ওরে দূতী, কি শুনালি, কি শুনালি শ্রবণে,
কেমন আছেন প্রাণগোবিন্দ দেখে আসি নয়নে।
রাধিকারি গমন শুনে মূর্ছাগত হইল,
ধূলাতে ধূসর কৃষ্ণ মৃত্যু সমান হইল।
কে আলি, মা গৈরী আলি, বোস গো কৃষ্ণের পাশেতে,
আঁধার ঘরেব মাণিক আমার হেলাতে হারাই পাছে।
কে আলি মা রাধে আলি, আলি তো সেই রুক্মিণী,
তুই যদি মা জল এনে দিস্ বাঁচবে আমার নীলমণি।
দাও দেখি মা পাটেব শাড়ী দাও দেখি ছিদ্র বাবি,
যমুনার জল আনতে যাব, কাঁদিছেন রাইকিশোরী।
কুথায় আছ প্রাণগোবিন্দ, জন্মের দেখা হইল,
যদি জল আনতে লারি যমুনাতে প্রাণ দিব।
কুথায় আছ প্রাণ গোবিন্দ দাও কলসী ডুবায়্যে,
যদি জল না ডুবাই দিবে, যমুনাতে প্রাণ দিব।
কদম গাছে ছিলেন কৃষ্ণ, কদমেরি ডাল ধর‍্যে
বিনতি করিয়্যেঁ ঝারি ডুবাইয়ে দিল কলসী।
লাও দেখি মা রাধা ঝারি,
ভর্তি কি মা আছে ঝারি।
কলসীর জল নিয়্যে ওষুধ বাটিব।
ওষুধ বাটিয়া কৃষ্ণ বদনেতে দিল
পালঙ্কেতে উঠে কৃষ্ণ মা বল্যে ডাকিল। —বাঁকুড়া

৬৫

এখন তোমার ভাগ্য ভালো বসেছ রাজ-সিংহাসনে,
এখন মনে পইড়বো কেনে যখন চরাতে ধেনু বনে বনে। —পুরুলিয়া

৬৬

গাছে গাছে বাঁদর বুলে, বাঁদরের কি পা দুলে,
রামসীতাকে বনে দিয়ে বসে আছে গাছ তলে। —ঐ

৬৭

ও রামের মা ও রামের মা দেখগো রামের দুক্-দশা।
বস্তর বিনে গাছের বাকল্ তেল বিনে মাথায় জটা।
ও রাম জটাধারী, বনে গেলে কেমনে ধৈয্য ধরি।

—বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

৬৮

টুসু নাকি দখিন যাবে ক্ষিধা পাইলে খাবে কি ?
আনো টুসুর গায়ের গামছা, রামের মিঠাই বেঁধে দি।
বড় বনে লতাপাতা, ছোট বনে শালপাতা,
কোন বনে হারাইলে টুসু, সোনায় বাঁধা লাল ছাতা।
রাম ছাড়িছে যজ্ঞের ঘোড়া তপোবনের আগালে,
লব কুশে ধইরেছে ঘোড়া সীতা বলে দাও ছাড়ি।
রাম কাঁদে বনে,
সীতা হরে নিল রাবণে ॥ —ঐ

উদ্ধৃত গানটির মধ্যে কয়েকটি বিভিন্ন গান আসিয়া একত্র মিশিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

সমসাময়িক বিষয়বস্তু লইয়াও টুসুগান রচিত হইয়া থাকে, আধুনিক সমাজের বিবাহ-সঙ্কট লইয়া নিম্নোদ্ধৃত গানটি রচিত হইয়াছে—

৬৯

বিটি বিকা হইল বিষম দায়, সেতো বরকে ঘড়ি-সাইকেল চায় ;
পণের চলন ছিল আগে কুলীন ব্রাহ্মণ মধ্যে ভাই,
এখন কিন্তু পনের চলন জাতিভেদে চলছে নাই।
বিটি বিকা হইল বিষম দায়······॥
যতোই ধনী হোক না মেয়ে বরকে কিছু কবুল চাই,
পাত্র এসে পাত্রী দেখবে 'ফাদার-উইডো' ফুল সবাই।
বিটি বিকা হইল বিষম দায়······॥

বর্তমানের শিক্ষা ধারার এই প্রগতি চলছে ভাই,
আই-এ কিংবা বি-এ বরের মটর সাইকেল অগ্রিম চাই।
সমাজ যাইছে অধঃপাতে নায়কদের তো দৃষ্টি নাই,
যুগের কোন নাই করি দোষ দোষী সমাজ ব্যবস্থাই।
বিটি বিকা হইল বিষম দায়……॥ —বাঁকুড়া

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর লক্ষ্য করিয়া নিম্নোদ্ধৃত টুসুগানটি রচিত—

৭০

প্যাট চলে না ট্যাক্সোর হড়বড়ি,
দেশে বাস করা ভাই ঝকমারি,
পঞ্চাইতির জন্ম হোল মে-জুনের মাঝামাঝি।
পেটের খেকে পাড় পড়ে না দিতেছে সাগর পাড়ি।
প্যাট চলে না ট্যাক্সোর হড়বড়ি…॥
আসল নামে হল নাকি ব্লকের চাবিকাঠি,
পঞ্চাইতের নাই কোন দোষ সাজাইছে চৌকিদারী,
ভীষ্ম বধের উপায় যেমন সামনে রেখে শিখণ্ডী।
পঞ্চায়েতকে খাড়া করে কর বাঁধিবার পলিসি,
সাইকেল ঢেকি গোগাড়ী।
প্যাট চলে না ট্যাক্সোর হড়বড়ি…॥
ধানের উপর কর বসাবে দোকান দালান বাড়ী,
সেলাই কলের কর বসাবে বাদ যাবে না জোলাতাঁতী।
প্যাট চলে না ট্যাক্সোর হড়বড়ি…॥
কুমার কামার ডাক্তার কবিরাজ বাদ যাবে না তেলী মুচি।
প্যাট চলে না ট্যাক্সোর হড়বড়ি…॥

৭১

উপরে পাটা, তলে পাটা, তার উপরে দারোগা,
হে দারোগা পথ ছেড়ে দাও, টুসু যাবেন কোলকাতা।
কোলকাতা যে গেছিলে টুসু, কি কি সন্দেশ এনেছ,
এড়া বেড়া জিলপীখানা ফুলাম তেলে ছেঁক্যেছে। —ঐ

বিভিন্ন শিল্প-নগরীর সঙ্গে বাঙ্গালীর পল্লীজীবন আজ অর্থনৈতিক সূত্রে নানাভাবে জড়িত হইতেছে। সেই সূত্রে ইহাদের কথাও আজ বাংলার লোক-সঙ্গীতে শোনা যায়। টাটানগরের কথা টুসুগানে এইভাবে প্রকাশ পাইয়াছে—

৭২

আমার টুসু বল্লে কিবা, পা পাড়াব কি বলে,
সিলিক শাড়ী সায়া না হলে।
সখি সখি বলে ডাকি, দাঁড়া গো সঙ্গে যাব,
এক খিলি পান দু'জনে খাব।
ই জাঙ্গালে উ জাঙ্গালে পিয়াল প্যাকেছে,
আর, লুধার মাকে বিয়ে কত্তে শিয়াল খ্যাপেছে।
এ পারেতে লণ্ঠন বাতি
ও পারেতে বিজলী বাতি
ছল করেছে টাটা নগরী।
টাটা যাব আনব আটা
বানাই দিব পরটা, টুসু পরবে।
ছল করেছে টাটানগরী॥ —বাঁকুড়া

টুসুর আগমনীর মত টুসুর বিদায়ের গানও শুনিতে পাওয়া যায়।

৭৩

আইল রে গুণগুণা মাছি দখিণ কুলের হাওয়াতে,
উড়াইল সোণার পাল্কী নিয়া গেল টুসুকে।

৭৪

প্রথম দল :—

তোদের ঘরে টুসু ছিল করিল আনাগোনা
এবার টুসু চলে গেলে করবি লো দুয়ার মানা।
ঝরণা শাড়ী সামিজ না হলে॥

ও তুই পরবি রে কেমন করে,
ঝরণা শাড়ী সামিজ না হলে।
তেঁতুল তলে আতা রাখি, আমরা লো পুড়ে মরি।
পেঁকা সতীন চলে গেল, চলনে সাবাস করি,
ঝরণা শাড়ী কে বলে ভালো, ময়লা লেগে হয় কালো॥

দ্বিতীয় দল :

বাড়ী নামোয় ভেলা গাছটি কত ভেলা ধরেছে,
ঐ মাগীরা গান জানে না কত কলা করেছে।
আল্‌তা পরা চাল্‌তা বকুলে,
আমরা দেখে আইলাম পরকুলে।

—বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

৭৫

বাণ এল্য, বর্ষা এল্য, ভেসে এল্য, বাঁশ পাতা,
বাঁশ পাতাটি তুল্যে দেখি, আমার টুসুর নাম লেখা।
বাণ এল্য, বর্ষা এল্য, ভেসে এল্য, বাঁশ পাতা
বাঁশ পাতাটি তুল্যে দেখি, উয়ার টুসুর নাম কাটা, —বাঁকুড়া

৭৬

মকর পরবে,
তোরা রা কাড়িস্ না কিসের গরবে। —পুরুলিয়া

৭৭

ও তুই ডুবলি জলে উঠলি না ঘাম সরোবরে টুসু জলে যায়,
জোড় তলাতে জামাই এলো ওঠ টুসু সট করে।
হলুদ তেলে টগ্‌মগ্‌ দে বাবা বিটি বিদায়,
ঘাম সরোবরে টুসু জলে যায়। —বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

৭৮

নিমতলাকে গেছিল টুসু নিমতলা কি জল টঁ্যাকে,
ভাল করে ধর গো ছাতা সোনার আঙ্‌ট জল পাছে।
সোণার আঙ্‌ট দিব জড় করে,
তোকে মারিব পায়ের মল খুলে
সোণার আঙট দিব জড় করে॥ —ঐ

৭৯

তিনটি টুসু জলকে যায় কোন টুসুটি ভাল লো,
মধ্যের টুসু ছলকদারী, জলে আঁখি ঠারে লো। —ঐ

৮০

এতদিন রাখিলাম মাকে, মা বলে আর ডাকলে না।
যাওয়ার সময় রগড় লিলে, মা না গেলে যাব না।
ও রাম জটাধারী, বনে গেলে কেমনে ধৈয্য ধরি॥ —ঐ

৮১

শালুক লাড়ার ঘর তুলেছি করে এঁকে বেঁকে লো।
কাল এনেছি পরের বিটি পাছে ডুবে মরে লো।
ফোরদি শাড়ী সামিজ না হলে,
তোরা চলবি গো কেমন করে॥ —ঐ

৮২

এতদিন রাখিলাম মাকে কুচি কপাট ঠেলে গো,
আর রাখিতে পারলাম না মাকে মকর আইল বাদী গো।— ঐ

টুসুগানের ভিতর দিয়া আরও কত বিষয় যে এলোমেলো হইয়া প্রকাশ পায় তাহার সংখ্যা করা যায় না।

৮৩

আমার টুসু মুড়ি ভাজে চুড়ি ঝন্ ঝন্ করে গো,
কোন বিড়ালী ধূলি দিলি গায়ের বরণ কালো গো।
কে বলে গো, কে বলে গো, আমার টুসু কালো গো,
মেদিনীপুরের হলুদ এনে গা করিব আলো গো।

ঝিঙা ফুল টুসু তুমি মাথা দেব বকুল করা,
ভালো করে চলবে টুসু তোমার পুরুষ দোজবরা।
দোজবরের গুণ না হলে টুসু ধন ঘর করিছ কি করে।
কলকাতাতে দেখে আইলাম কার বা কত চুল আছে,
চুলের কথা বলব কি মা পিঠ ভেঙে চুল পড়েছে।
পুরুলিয়ায় দেখে আইলাম ডালা ডালা দুধবালা,
কোন দুধবালা নিবে টুসু খুলে গলার চাঁদমালা।
চাঁদ মালা চাঁদ চাদরে গাঁথা, যেমন পুঁটি মাছের হার গাঁথা।

বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

৮৪

তোদের পাড়ায় বস্‌তে গেলাম বস বলে কেউ বল্লিস্ না,
উচ্চ পীড়া ময়দা মেলা পরবে রা কাডলি না,
ওলো মকর পরবে।
তোদের গুঁড়ি[১] কুটে দেয় মরদে।
ওলো মকর পরবে ॥ —ঐ

৮৫

টুসুর চালে লাউ ধরেছে লাউ তুলেছে বাগালে।
এব্‌রে বাগাল ধরা যাবে সাঁজী লালের মহালে।
সাঁঝি লালে মাঝি লালে নামে ডঙ্কা ফিরেছে। —বাঁকুড়া

৮৬

দাঁতে মিশি চোখে কাজল মুখ দেখিতে পাইলাম না,
আয়না দিতে বায়না দিলাম কভু আয়না পেলাম না।
তেলের বাটী সাবান কই এল,
বেলা বারটা বাজি গেল। —বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

১ গুঁড়ি=ঢেঁকিতে গুঁড়া করা চাল।

৮৭

আজারে বাজারে যাব মাছ বাজারে দাঁড়াব,
যারে দেখব পাকা দাড়ি ভেলায় তুলে গাবাব।
বল টুসুমণি, তোকে কে দিল গো দুয়ানি॥ —ঐ

গানের পরিবর্তে মধ্যে মধ্যে দুই একটি টুসুর ছড়াও শুনিতে পাওয়া যায়—

৮৮

টুসালু গো রাই, টুসালু গো ভাই,
তোমার দৌলতে আমরা ছবড়ি পিঠা খাইলো।
ছবড়ি লো লবড়ি, গাঙ্ সিনানে যাই
গাঙের জলে রাঁধি বাড়ি মকরের জল খাই।
চার মাস বর্ষা পোখার না যাই
হাতে পো, কাঁখে পো
পৃথিবী জুড়ালো, চোখে পড়ল রো রো
চোখে পড়ল রো॥

একদিনের পূজার ফুল যেমন পরের দিন বাসি হইয়া যায়, তেমনই এক বৎসরের টুসু গান পরের বৎসরই অপ্রচলিত হইয়া যায়, নূতন নূতন গান রচনা করিয়া নূতন বৎসরে টুসুর উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়। এই অঞ্চলের নারীজীবনের মধ্য দিয়া ইহার ধারা অনন্ত প্রবাহে বহিয়া যায়

চার

জাওয়া গান

বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল প্রধানতঃ পুরুলিয়া জিলার পশ্চিমাংশে যেখানে কুর্মালি উপভাষা প্রচলিত, সেখানে বর্ষাকালীন একটি শস্যোৎসবের নাম জাওয়া পরব। ইহা শস্যের জন্মোৎসব। ইহা ভাদু উৎসবের সমসাময়িক উৎসব; কিন্তু ভাদু উৎসবের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। ভাদু শস্যোৎসব নহে, কেবলমাত্র বর্ষাকালীন কুমারীদিগের আনন্দোৎসব ; কিন্তু জাওয়া সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, ইহার প্রধান লক্ষ্য শস্যের নব অঙ্কুরোদ্গম (অথবা ceremony of germination)। টুসু উৎসব যেমন পুরুলিয়ার শস্যোৎসব, অর্থাৎ ফসল কাটিয়া ঘরে লইয়া আসিবার পর (post-harvest) অনুষ্ঠিত হয়, জাওয়া তাহার পরিবর্তে শস্যরোপণের সময় ভাদ্র মাসে অনুষ্ঠিত হয়। ভাদু ও টুসু পুরুলিয়া ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রচলিত ; কিন্তু জাওয়া একান্ত ভাবে পুরুলিয়া জিলার পশ্চিমাংশেই সীমাবদ্ধ, ইহা পুরুলিয়া জিলার প্রকৃতিগত। জাওয়া ভাদ্রমাসের একাদশীর পনর দিন আগে আরম্ভ হইয়া একাদশীর দিন সম্পূর্ণ হয়। সুতরাং ইহা পনর-ষোল দিনের অনুষ্ঠান, কিন্তু ভাদু ও টুসু এক মাস ব্যাপী অনুষ্ঠান। জাওয়ায় নৃত্য একটি প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়া থাকে ; কিন্তু ভাদু ও টুসুতে নৃত্য গৌণ স্থান অধিকার করে মাত্র, নৃত্যের অনুষ্ঠান না হইলেও ভাদু-টুসুর অঙ্গহানি হয় না ; কিন্তু নৃত্য জাওয়ার অপরিহায অঙ্গ। জাওয়া শস্যের জন্মোৎসব বলিয়া ইহাকে জাতানুষ্ঠান বা জাওয়া পরব বলা হয়। ইহার পদ্ধতি এই প্রকার :

পল্লীর মেয়েরা প্রত্যেকে এক একটি ডালায় বালি রাখিয়া তাহাতে নানা প্রকার শস্যের বীজ রোপণ করে, প্রতিদিন জল সিঞ্চন করিয়া বীজগুলি তাহাতেই মুকুলিত করে। তারপর গৃহস্থের বাড়ীতে বাড়ীতে ডালাগুলি মাথায় করিয়া লইয়া গিয়া গৃহের আঙ্গিনায় নামাইয়া রাখে। তাহাই ঘিরিয়া তাহাদের নৃত্যগীত চলিতে থাকে। এইভাবে গ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতেই তাহারা উপস্থিত হইয়া নৃত্যসহকারে সঙ্গীত পরিবেষণ করিয়া থাকে। তাহাই জাওয়া বা শস্যের বাৎসরিক জন্মোৎসব বলিয়া পরিচিত।

জাওয়া গানের মধ্য দিয়া কোন শস্যের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না, বরং তাহার পরিবর্তে নারীজীবনের নানা ব্যবহারিক সুখদুঃখের কথাই ব্যক্ত হয়। তবে প্রধানতঃ ইহাদের মধ্যে শ্বশুর গৃহের নিন্দা, পিতৃগৃহের প্রশংসা এবং মাতাপিতা ও ভাইভগিনীদের গুণ-কীর্তন থাকে। শ্বশুর-গৃহের নিন্দা অর্থে শ্বশুর, শাশুড়ী, ভাসুর, দেবর, ননদ প্রত্যেকের উপরই কটাক্ষপাত করা হইয়া থাকে। এমন কি, টুসু ও ভাদু গান অপেক্ষাও জাওয়া গান জীবনের কথায় সরস, সেইজন্য ইহার কাব্যগুণ অধিক।

পুরুলিয়া জিলার পশ্চিম অংশে যেখানে কুর্মি মাহাতোদিগেব ঘন বসতি, সেই অঞ্চলেই এই গানের প্রচলন সর্বাধিক দেখিতে পাওয়া যায়, ক্রমে পুর্ব অংশে ইহাব প্রভাব ক্ষীণতর হইয়া বাঁকুড়া জিলার পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত আসিয়া ইহা একেবাবে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ভাদ্র মাসের প্রথম হইতেই এই উৎসব আরম্ভ হয়। একাদশীর পনের দিন আগে প্রধানতঃ মাহাতো পরিবাবের বিবাহিতা, অবিবাহিতা এবং বয়স্কা মেয়েরা একটি ডালায় বালি লইয়া তাহাতে বীজ রোপণ করে, প্রত্যহ জল সিঞ্চন করিয়া তাহাতে অঙ্কুর উদ্গম করে। বীজেব মধ্যে ধান এবং নানা প্রকার কলাই বীজই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়, কোন প্রকাব শাকসব্জীর বীজ রোপণ করিতে দেখা যায় না। বীজগুলি অঙ্কুরিত হইলে প্রত্যেকেই এক একটি ডালা মাথায় করিয়া লইয়া সমবেত ভাবে পল্লীর এক একজন গৃহস্থের আঙ্গিনায় প্রবেশ করে। সেখানে মাথা হইতে ডালিগুলি নামাইয়া রাখিয়া তাহা ঘিবিয়া বৃত্তাকারে নৃত্য আরম্ভ কবে। নাচের তালে একত্রিত ভাবে দশ বারোজন মেয়ে হাত ধরাধরি করিয়া—বাম হাতে অপরের বাম হাত এবং ডান হাতে অপরের কোমব জড়াইয়া ধরিয়া ডান পা একবার করিয়া সাম্‌নে ও পিছনে এবং বাম পা তাহার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া একবার সম্মুখে ও একবার পিছনে অগ্রসর হয়। তাহার তালে তালে গান গাহিয়া থাকে, যেমন—

ছুটু মুটু গড্যাটি কমলপাতের খেরারে,
ডুবিলে না ডুবে ভাই কাঁখেরি গরয়া।

'কাঁখেরি গরয়া' কথাটি বার বার গাওয়া হইয়া নৃত্য ক্রমশঃ দ্রুততালে পরিবর্তিত হয়। যে কথাগুলি বার বার আবৃত্তি করা হয়, তাহাকে বলা হয় গানের রঙ, প্রচলিত অর্থে ইহাকেই ধুয়া বলে। এই নৃত্য আবার পার্শ্বের

দিকে, আবার কখনও সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইয়া চলে। তাহার সহিত ধুয়াটি বার বার গাওয়া হয়। কখনও একটি মেয়ে সমগ্র গানটি গায়, অন্যেরা ধুয়াটি গাহিতে থাকে। যেমন—

তুমি যাবে পরদেশ আমি যাব সঙ্গে,
রাঁধিব বেগুন ভাত পরশিব রঙ্গে।

'রাঁধিব বেগুন ভাত, পরশিব রঙ্গে'—কথাটি বার বার গাওয়া হইতে থাকে। এইটি গানের রং বা ধুয়া।

জাওয়া গানের সুর মিষ্ট। তাল দ্রুত। সুর ক্রমশঃ চড়ার দিকে চলিতে থাকে। আরম্ভের সময় সুর ততটা চড়া থাকে না। গান শেষ হইবার সময় তাহার তাল এত দ্রুত হয় যে, কথা প্রায় বোঝা যায় না নৃত্যের পদক্ষেপও খুব দ্রুত তালে চলিতে থাকে। একমাত্র যাহাদের অভ্যাস আছে, তাহারাই এইভাবে নাচিতে পারে।

সামাজিক কারণে এই নৃত্য বিলোপের পথে চলিয়াছে; কেবল গানই অনেকক্ষেত্রে গাওয়া হইয়া থাকে। ক্রমশঃ পূর্বাঞ্চলের দিকে সরিয়া গেলে গানে বাংলা শব্দ বেশি ও পশ্চিমাঞ্চলের দিকে হিন্দী শব্দ বেশি দেখা যায়। হাজারীবাগের সীমায় হিন্দী শব্দের আধিক্য দেখা যায়। ঝালদা প্রভৃতির কাছে কুর্মালী ভাষায় গান বাঁধা হয়। অন্য দিকে যত পুর্বে যাওয়া যায়, ততই বাংলা ভাষা অবিমিশ্র শুনিতে পাওয়া যায়। অনেক সময় একই গান দুই জায়গায় দুই রকম ভাষায় গাওয়া হয়।

প্রথমেই জাওয়া পাতানোর গান শুনিতে পাওয়া যাইবে।

১

নাম' কুলির ছানারা জাওয়া পাতাল,
বড় পাতের ডাল পায়ে ছাতাই গেল;
আমাদের কুলির ছানারা জাওয়া পাতাল,
আমলা মেথির বাস পেয়ে লহকে বাড়িল॥ —পুরুলিয়া

কুলি শব্দের অর্থ গ্রাম্য পথ, অর্থাৎ পথের নীচের দিককার মেয়েরা যে জাওয়া পাতাইল, তাহা বড ডালির সুযোগ পাইয়া নূতন পাতায় পরিপুর্ণ হইয়া গেল, আমাদের পথের মেয়েরা যে জাওয়া পাতিল, তাহা আমলকি ও মেথির গন্ধ পাইয়া লকলক্ করিয়া বাড়িয়া গেল।

প্রকৃত জাওয়া পাতানোর বিষয় লইয়া এই প্রকার গান খুব বেশি শুনিতে যায় না ; দুই একটি মাত্র গানে গাছ ও পাতার কথা কথা আছে—

২

সাইরের আইড়ে নীলকণ্ঠের গাছ,
তাই পাত করে লহু লহু। —পুরুলিয়া

৩

শাল তলার বালি আলো জাওয়া পাতাং লো
এমনি জাওয়া লগ্ন হবে, বাঁশ পাতাটার পারা লো। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে জাওয়া নাচের কথা শুনিতে পাওয়া যায়—

৪

কারো কারো নীলশাড়ী আঁচলেতে জরি,
মুখে বলে হরি হরি বদন ভরি।
হাতেতে ময়ূর পাখা, দয়া কর হরি
মুখে বলে হরি হরি বদন ভরি।
নাচে জাওয়া ঘুরি ফিরি—বদন ভরি
মুখে বলে হরি হরি বদন ভরি। —ঐ

পূর্বেই বলিয়াছি যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শস্যরোপণ কিংবা জাওয়া উৎসবের সঙ্গে সম্পর্কহীন গানই ইহার বিষয়। জীবনের নানা বিষয় লইয়াই ইহাতে গান শুনিতে পাওয়া যায়, যেমন, নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে গামছার চটক দেখিয়া ভানুমতীর ভুলিবার কথা আছে—

৫

বিরি[১] বাড়ী জতহিতে[২] রাঙ্গামাটি উঠি গেল,
বাবু ভায়া গামছা গাবায়,
গামছারি চটক দেইখে মইজে[৩] গেল ভানুমতী
কুলির[৪] মাছে লহর শালে[৫] যায়। —ঐ

১ বিরি—কলাই, ২ জতহিতে—কর্ষণে, ৩ মইজে—মজে, ৪ কুলি—গাঁয়ের রাস্তা, ৫ লহর শালে—যেখানে হাসিঠাট্টা চলে।

নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে জবা ফুল কোন রূপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকিতে পারে—

৬

মাহাত ঘরের[১] দুয়ারে, জবা ফুলের গাছ লো
কাইল দেখেছি জবা ফুলটি আইজো মনে পড়ে লো। —পুরুলিয়া

৬

বড় ঘরের দুয়ারে জোড়া ময়ূর ঘুরে লো,
কাল দেখেছি বেল ফুলটি আজ মনে পড়ে লো। —ঐ

কুরচি ফুল থোকায় থোকায় ফুটিবার সঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতে উল্লেখিত পরবর্তী ঘটনাটির কোন যোগ নাই ; সুতরাং এখানে জাওয়া গানটি ছড়ার ধর্ম লাভ করিয়াছে। আমরা পূর্বেও দেখিয়াছি, টুসু এবং ভাদু গানও সহজে এই ভাবে ছড়ার ধর্ম লাভ করিয়া থাকে।

৭

কুরচি ফুল, কুরচি ফুল ফোটে গাবে গাবে[২] লো,
মনসুদাকে খাল্যেক বনের বাঘে। —ঐ

মনুদার অপঘাত মৃত্যুর জন্য কেহ দুঃখ প্রকাশ করিল না, কিন্তু বাঘমুণ্ডি পাহাড়ে যে একটি অসহায় ছেলে কাঁদিতেছে, তাহার জন্য সকলের সমবেদনার অন্ত নাই—

৮

বাঘমুণ্ডির পাহাড়ে কোন্ ছেইলাটা কাঁদে রে,
আইস ছেইলা কোলে লিব, বড় মায়া লাগে রে। —ঐ

৯

ভেড়রা কাঠের ঢেকি বলি পরামাণিকদের ঘরে লো,
জল দিয়ে ঘোল মহে বড় মাহতিদের ঘর লো। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত গানটির মধ্যে একটু সুকোমল প্রেম ভাবের স্পর্শ আছে—

১০

তাল তলাতে তাল তলাতে কে করেছে পথ রে,
ইহ বটে বঁধুয়া লোক লো। —ঐ

১ মাহাত ঘর—প্রধানের ঘর। ২ গাবে গাবে—থোকায় থোকায়।

১১

বাদাড় কোলে, বাদাড় কোলে, জোনপক্ষী জলে লো,
আমরা বলি বেড়া শশায় ভালে লো।

১২

দক্ষিণ বাইদে বুনিলাম সরগুজালো,
পাতে শিগগীর শিগগীর ফলে বেহুলা।

কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, জাওয়া গানের প্রধানতঃ গার্হস্থ্য জীবন সম্পর্কিত বিষয়ই অবলম্বন হইয়া থাকে। তাহার দুইটি প্রধান ভাগ, একটি নারীর পিতৃগৃহ সম্পর্কিত, আর একটি শ্বশুর গৃহ সম্পর্কিত—পিতৃগৃহের প্রশংসা এবং পতিগৃহের নিন্দা করা নারী-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ধর্ম, জাওয়া গানের মধ্য দিয়া ইহারই স্বাভাবিক অভিব্যক্তি দেখা যায়। পিতৃগৃহ সম্পর্কিত গানের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা মাতাপিতাকে প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া রচিত হইবার পরিবর্তে দাদা বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অবলম্বন করিয়াই রচিত হয়। পিতৃগৃহের সংসার অচিরকাল মধ্যে বৃদ্ধ মাতাপিতার অধিকারচ্যুত হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অধিকারভুক্ত হয়, সেইজন্য তাহার অনুগ্রহের উপরই বিবাহিত কিংবা অবিবাহিতা ভগিনীকে নির্ভর করিতে হয়, সেইজন্য দাদার প্রশংসায় ভগিনীরা পঞ্চমুখ। জাওয়া গান প্রকৃতপক্ষে ভগিনীর ভ্রাতৃ-মাহাত্ম্য কীর্তন। তাহার কিছু নিদর্শন নিম্নে উল্লেখ করা যায়। পৃথিবীতে দাদার সমান কেহ নাই, ইহাই নিম্নোদ্ধৃত গানটির বক্তব্য—

১৩

পুরথী মজরল ডালাকে সলান,
ওগো কেহ নাহি দাদাকে সমান,
দাদা মুখে সাজল পাকল পান
ওগো সঁইয়ার মুখে ভেডরাকি পাত।
কেমন কেমন করয়ে পাকলি পান
খসর মসর করয়ে ভেডারিকা পাত। —পুরুলিয়া

১৪

ই ঘর কাদা, উ ঘর কাদা, মাঝখানেতে আদা লো,
আদার বাসে ভাত খায় না, বড় ঘরের দাদা লো। —ঐ

দাদার কুশল সংবাদের জন্য ভগিনীর নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে সুগভীর কাতরতা প্রকাশ পাইয়াছে—

১৫

আইস্‌লো কাওয়া, উড়লো কাওয়া, বইস্‌লো কামাব শালে লো ,
সত্যি করে বল্‌বি কাওয়া দাদা কেমন আছে লো ॥

১৬

বড ঘরের বড দাদার পিঠে পড়ে চুল লো
মচড়াই বাঁধেছি ঝুঁটি রেশ গেঁদা ফুল লো। —পুরুলিয়া

১৭

বড ঘরের বড দাদার পিঠ ভর্তি চুল গো,
বিনা তেলে বাঁধে খোঁপা যেমন গেঁদা ফুল গো। —ঐ

দাদার গুণগান করিলেও দাদার বৌয়ের সম্পর্কে মনোভাবে কোন নূতনত্ব দেখা যায় না—

১৮

শুন দাদা শুনগো, তোর বহুর গুণ গো,
বাসি ভাত নেগা হাতে বাইটে দিল নুন গো। —ঐ

১৯

ই বাড়ীর ঝিঙ্গা লতাটি উ বাড়ীতে আছে লো,
দাদার বহু নেমনী[১] ঝিঙ্গা নাহি খায় লো।

ভাদ্র মাসেব সীমান্ত বাংলার ইন্দ উৎসব সম্পর্কে নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

২০

বাড়ীর নামোয় বেশ চলে ডুনিয়া সবল
ধুঙ্গা উঠে সিঁদুর বরণ
তাল তলাতে তাল তলাতে কে করেছে পথ গো,
ইত বটে ইন্দেখা লগ গো
ইন্দ দেখতে গেলি দাদা, ইন্দের বড রাগ গো।
ডেগে ডেগে পঞ্চ ডেগে উঠে রাজার ইন্দ্ গো। —ঐ

১ নেমনী—ঢঙ্।

২১

বাড়ীর নামোয় সইয়া কুলের কাঁটা
আচম্বিতে দাদা গইড়েছে কাঁটা,
বসে বসে দাদা লে ভেলাতাতা
কাড়া রে না কাড়া দাদা সেইয়া কুলের কাঁটা॥ —পুরুলিয়া

ভগ্নীটি পিতৃগৃহ হইতে পুনরায় পতিগৃহ যাত্রাকালে দাদা ও ভাইয়ের দাক্ষিণ্যের কথা স্মরণ করিতেছে—

২২

কোন্ পরবে ভাইরে আনলে লেগলে
কোন্ পরবে ভাইরে, কর রে বিদায়,
কোন্ পরবে ভাইরে করবে বিদায়,
করম পরবে ভাইরে আনলে লেগলেরে,
জিতিয়া পরবে ভাইবে করলে বিদায়,
কিয়া খাওয়াইলে ভাইরে কিয়া পবাইলে।
কিয়া দিয়ে করলে বিদায়।
ভাত খাওয়ালি বহিন লুগুয়া পরালি,
ডালা দিয়ে করলি বিদায়।
সব সব খাওয়ালে দাদা না খাওয়ালে গিমারে,
আর কি আসিব দাদা পুরুল্যাবি সীমানে।

পিতৃগৃহে আসিয়া বালিকা-কন্যাটি সকল সাধ মিটাইয়াছে। করম উৎসবের সময় পিতৃগৃহে আসিয়াছিল, জিতিয়া উৎসবের পর বিদায় লইয়া যাইতেছে। বিদায় লইবার দিন ভাইকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, ভাই, তুমি আমাকে কি খাওয়াইলে, কি পবাইলে, আজ কি হাতে দিয়া বিদায় করিতেছ? ভাইটি বলিতেছে, ওগো বোন, তোমাকে ভাত খাওয়াইয়াছি, লুগুয়া বা দেশী শাড়ী পরাইয়াছি, আজ ডালা দিয়া তোমাকে বিদায় দিতেছি। অভিমানের সুরে ভগিনী বলিল, সকল জিনিসই তুমি আমাকে খাওয়াইলে, ভাই, কিন্তু গিমা শাক খাওয়াইলে না, আর কবে আমি এই পুরুলিয়ার সীমানায় আসিব।

আজ পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া যাইবার দিনে গিমা শাক না খাইবার বেদনাটুকু যেন বালিকার বুকের মধ্যে সূঁচ হইয়া বিঁধিয়া রহিল।

পিতৃগৃহে আসিয়া ঝিঙ্গা খাইতে পারিল না বলিয়া নিয়োদ্ধৃত সঙ্গীতে বালিকা-কন্যা দুঃখ করিতেছে—

২৩

সব ফল খাওয়ালি, দাদা, না খাওয়ালি ঝিঙ্গারে,
আর কি দেখিব তোর পুরুল্যার সীমারে।

পল্লীর বালিকারা পিতৃগৃহে কোন উচ্চ সাধ লইয়া আসে না, মাতাপিতার কাছ হইতে হাজার টাকার গহনা আদায় করিবার পরিবর্তে কেহ গিমা শাক, কেহ বা ঝিঙ্গা খাইবার সাধ লইয়া আসে, এই সাধটুকু পুরণ না হইলেই ব্যথার অন্ত থাকে না।

২৪

বাইদে বহালে[১] মাছ, আর দিদির ঘরে লিতেই লাচ,
দাদাগো বেসাতি[২] নাই বহু নাই ঘরে।

২৫

বাঁশবনে উপজিল বাঁশ 'করিল্'[৩] হে, জবি ক্ষেতে[৪] উপজিল ধান,
মায়ের কোলে জনম নিল ভাই বহিন্ হে 'হুপাড়িয়া'[৫] দুধ করে পান।

২৬

কুলির পথে যাইস্ না, দাদা, বাড়ীর নামোয়[৬] যাবি লো,
ঢেল্‌কা জাঁকা[৭] পাইসা আছে, জিলিপি কিনে খাবি লো।

২৭

তেলী ঘরের তেল, দাদা, ধানের ভিতর চাল রে,
বিনা পিঠায় কেশরী বিদায় লো। —পুরুলিয়া

২৮

বাদ ধান কাটিলি দাদা, বহাল ধানের গাছিরে,
খাপরা বসা ঘর, দাদা, শুধায় রাখিলে রে। —ঐ

১ বাইদ বহাল—উচ্চ-নীচ ধানের ক্ষেত। ২ বেসাতি—অন্নের ব্যঞ্জন।
৩ করিল্—কচি বাঁশের গাঁট। ৪ জবি ক্ষেত—পঙ্কিল ক্ষেত্রে। ৫ হুপাড়িয়া—উপুড় হইয়া।
৬ বাড়ী নামো—খিড়কির পথ। ৭ ঢেল্‌কা জাঁকা—ইঁট চাপা।

পূর্বেই বলিয়াছি, জাওয়া গান, ভগিনীর দাদা-মাহাত্ম্য কীর্তন। ইহার কারণ সম্পর্কে নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সত্য।

২৯

বড় দাদার ঘর কন্না, বড় দাদার সব লো,
বড় দাদার কামিল দেখা পাট লো। —ঐ

অনেক সময় দাদার মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য দাদার বউকেও প্রশংসা করিতে হয়, নতুবা ভাজের রূপের প্রশংসা কোন্ ননদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়? এখানে বলা হইতেছে, মেজদাদার বউ রূপের ডালি। পরোক্ষে ইহাও দাদারই প্রশংসা। বাংলা ছড়াতেও মামার মনস্তুষ্টির জন্য মামীর এই প্রকার প্রশংসা শুনা যায়—

তেঁতুল পাতা তুলসী,
আমার মামী উর্বশী।

৩০

মরিচেরি তলে তলে সরু সরু বালি লো,
'মাইত'[১] দাদা বউ আন্যেছে যেমন রূপের ডালি লো।

৩১

আখবাড়ীতে[২] আখবাড়ীতে কি সরবর করে লো,
ছোট দাদার বড় দাদার টাঙ্গি ঝল্‌মল করে লো। —ঐ

৩২

তালতলাতে তালতলাতে কে করেছে পথ লো
ইহ বটে ইঁদ[৩] দেখা লোক,
ইঁদ দেখতে গেলি দাদা, ইঁদের বড় রাগ[৪] লো
ডেগে ডেগে[৫] পঞ্চ ডেগে উঠে রাজার ইঁদ লো। —ঐ

৩৩

একদিনকার হলৈদ বাটা তিনদিন করে বাসিলো,
মাই বাপকে বলে দিবি বড় সুখে আছিলো। —ঐ

১ মাইত—মেজ। ২ আখবাড়ী—আখ খেত। ৩ ইঁদ—ইন্দ্রপূজা।
৪ রাগ—জন সমাগম। ৫ ডেগে ডেগে—ধাপে ধাপে।

৩৪

আমার বাপের ঘর চাকা নদীর ধার লো
দু' কূল ভরিল বানে যাওয়া হইল ভার লো। —ঐ

৩৫

বাপের ঘরে দিলা শাড়ি ধারে ধাইরকা ফুল গো
শ্বশুর ঘরে বলে বহুর গেল জাতি কুল গো ॥ —ঐ

পিত্রালয় নদীর পরপার হইলেই বালিকা-কন্যার যত দুঃখ; যখন তখন যাওয়ার আশা করা যায় না। একটি আদিবাসীর বাংলা ঝুমুরে যেমন শুনা যায়,—

নদীর ও পার মোর শ্বশুর বাড়ী,
আসা যাওয়া মোর বারণ হৈল। —ঐ

জাওয়া গানেও তেমনই শুনা যায়—

৩৬

আমার বাপের ঘর চাকা নদীর পার লো
দু কুলে বহিল বান যাওয়া হৈল ভার লো। —ঐ

৩৭

বার বছর ধনী নইহারে গোঁয়াল
সইয়ার মুড়ে জট ফুটে গেল।
আন ধনী অতি রূপের কাঁকয়া
আন ধনী সরিষার কা তেল,
হাড়কায় আছে ধনী অতিরূপের কাঁকয়া
ভাঁড়য়ায় আছে ধনী সরিষার কা তেল
এক ঝাড়ন ঝাড়ল, দুই ঝাড়ন ঝাডল
তিন ঝাড়ল পাল্যম ঝরাফুল। —ঐ

বালিকা-কন্যার পিতৃগৃহ ছাড়িয়া যাইবার সময় সকলের মনেই বেদনা প্রকাশ পায়। পায়রা শব্দটি বালিকা-কন্যার রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হয়—

৩৮

ঘরের চালে পুষিলি পায়রা দুধু ভাতু দিয়ে রে,
সময়ে পালাল্য পায়রা আমায় ফাঁকি দিয়ে রে। —ঐ

৩৯

তেঁতুল ধান মেল্লাম পায়রা থদবদ করলো,
আসুক কাকা বল্যে দিব কাকী খেলা করে লো। —ঐ

৪০

ঝালিদা শহরে ভাল ভাল লোক গো
কঁড়চে কঁড়চে গুয়া পান।
ঢেলকাই বসিলে পায়রা চেলকার সমান
সোনাই রূপায় বাঁধায় দিব, রাজার দালান।
ঝুমকা ঝুরিরে পায়রা কাজল-লতা—কিক দোকান বসে॥ —ঐ

৪১

ছোটিলি পুষিলি পায়রা দুধু ভাতু দিয়ে রে
সময়ে পালালি পায়রা মনে দুখু দিয়ে রে।
পালালি পালালি পায়রা কত দূর পালালি রে
লাগ লিচ রে পায়রা, ঝালিদা শহরে রে॥ —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত গানটির মধ্যে বালিকা-কন্যার শ্বশুরবাড়ীতে যাইবার অনিচ্ছাটুকু অপূর্ব কৌশলে ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে ননদের সঙ্গে ভাজের সম্পর্ক বিষয়েও একটি বাস্তব ইঙ্গিত রহিয়াছে।

৪২

তেঁতুল পাতে তেঁতুল পাতে ননদী ঘুমায় গো,
উঠ ননদ, খাও ননদ, যাও শ্বশুর বাড়ী গো।
'শ্বশুরের সঙ্গে হাম নাহি যাব গো,
পাটি বহিতে বেলা যায়।'
তেঁতুল পাতে তেঁতুল পাতে ননদী ঘুমায় গো,
উঠ ননদ, খাও ননদ, যাও শ্বশুর বাড়ী গো।
'শাশুড়ীর সঙ্গে হাম নাহি যাই গো,
মুট বহিতে বেলা যায়।'
তেঁতুল পাতে তেঁতুল পাতে ননদী ঘুমায় গো,
উঠ ননদ, খাও ননদ, যাও শ্বশুর বাড়ী গো।

'ভাসুরের সঙ্গে হাম নাহি যাই গো,
ঘম্‌টা টানিতে বেলা যায়।'
তেঁতুল পাতে......
'জা'এর সঙ্গে হামি নাহি যাই গো,
ঝগ্‌ড়া লাগিতে বেলা যায়।'
তেঁতুল পাতে......
দেওরের সঙ্গে হামি নাহি যাই গো,
হাসিতে খেলিতে বেলা যায়।'
তেঁতুল পাতে......
কুঁওরের সঙ্গে হাম নাহি যাই গো,
পায়না সলকাতে বেলা যায়। —ঝাড়গ্রাম (মেদিনীপুর)

শ্বশুর, শাওড়ী ননদ ভাসুর দেওরের সঙ্গে বধূর যে কি সম্পর্ক তাহা অতি :সহজ ভাষায় এখানে ব্যক্ত করা হইয়াছে। শ্বশুর বাড়ী যাত্রার সময় তেঁতুল পাতার উপর ননদের নিদ্রার চিত্রটি বড়ই মনোরম।

ভাদু, টুসু, জাওয়া তিন শ্রেণীর গানই বিদায়ের কথা দিয়া শেষ হয়। ভাদু ও টুসুর বিদায়ের মধ্যে বেদনা যতই আন্তরিক হউক, তথাপি ইহারা গৃহস্থ জীবনের প্রত্যক্ষ সম্পর্কে আবদ্ধ নহেন, ইহাদের বিদায়, বাঙ্গালী গৃহের বিজয়া দশমীর মত, কিন্তু জাওয়া গানে বিদায়ের বেদনা আরও প্রত্যক্ষ, কারণ, ইহা প্রত্যক্ষ কন্যা-সন্তানের পতিগৃহে বিদায়, ইহার অনুভূতি আরও বাস্তব।

পাঁচ

ঝুমুর

এই পর্যন্ত যে সকল আঞ্চলিক সঙ্গীত লইয়া আলোচনা করা হইল, তাহাদের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের মধ্যে একমাত্র পটুয়ার গান ব্যতীত, আর সকলই স্ত্রী-সমাজের রচনা। ভাদু গান, টুসু গান ইহাদের প্রত্যেকটিই যে কেবলমাত্র একই অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাহা নহে—ইহারা যাহাদের রচনা তাহারা সকলেই স্ত্রীজাতিভুক্ত। এমন কি, প্রায় একই বয়স্ক নারী ইহাদের রচনা করিয়া থাকে, সেইজন্য ইহাদের মধ্য দিয়া যে সুখ-দুঃখের অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার মধ্যেও বিশেষ বৈচিত্র্য নাই। কুমারী এবং সদ্যবিবাহিতা কন্যা ও বধূগণ প্রধানতঃ এই সকল সঙ্গীতের রচয়িত্রী এবং পৃষ্ঠপোষক, সেইজন্য তাহাদেরই জীবনের সুখদুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার কথা ইহাদের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং ভাদু গানের প্রতিধ্বনি কখনও কখনও টুসুগানের মধ্যেও যেমন শুনিতে পাওয়া যায়, তেমনই জাওয়া গানের মধ্যেও অনেক সময় টুসু ও ভাদু গানের কথা এবং সুর শুনিতে পাওয়া যায় পটুয়ার গান যে এই তিন শ্রেণীর গান হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির রচনা, তাহার প্রধান কারণ এই যে, ইহা পুরুষের রচনা। পুরুষের জীবন-চর্চা ও নারীর জীবন-চর্চা এক নহে। পুরুষ অনেক সময় অপ্রত্যক্ষ আদর্শের সন্ধান করিয়া থাকে, কিন্তু নারীর নিকট প্রত্যক্ষ জীবনের যে মূল্য, তাহার সঙ্গে আর কাহারও তুলনা হইতে পারে না। সেই জন্য পটুয়ার গান একই অঞ্চলের সঙ্গীত হওয়া সত্ত্বেও ইহার সঙ্গে এই অঞ্চলের অন্যান্য সঙ্গীতের এত সুদূর পার্থক্য অনুভূত হয়।

এই অঞ্চলে আর এক প্রকৃতির লোক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে, তাহাও পুরুষের রচনা, সুতরাং ভাদু-টুসু-জাওয়া হইতে ইহাদের প্রকৃতিও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহা এই অঞ্চলে ঝুমুর বলিয়া পরিচিত। ইহার সম্পর্কে নানা কারণেই একটু বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক।

ছোটনাগপুর হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র মধ্যভারত ব্যাপিয়া গুজরাটের

সীমান্ত পর্যন্ত যে আদিবাসী বসতি-সীমা (aboriginal belt) অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, তাহার সর্বত্র যে আদিবাসী সঙ্গীত (tribal song) প্রচলিত আছে, তাহা সাধারণ ভাবে ঝুমুর নামে পরিচিত। এই বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপিয়া প্রাকৃতিক পরিবেশে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, সুগভীর অরণ্যাকীর্ণ পর্বত ও নীরস প্রস্তর-ভূমিই এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। কৃষিকার্য এখানে অত্যন্ত দুরূহ। কৃপণা প্রকৃতি তাঁহার শস্য-সম্পদ এখানে কঠিন পাষাণ-বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। একদিন এখানে পশু-শিকারে জীবিকা নির্বাহ হইত, কিন্তু ক্রমে তাহাও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়া জীবন-যাত্রা কঠিনতর করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং যে প্রাকৃতিক পরিবেশ সাংস্কৃতিক জীবনের পরিপোষক, এই বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপিয়া তাহার অভিন্নতা হেতু এই অঞ্চলে প্রায় এক অভিন্ন সাংস্কৃতিক জীবন গঠিত হইয়াছে। অথচ এই বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যে স্বভাবতঃই ভাষাগত পার্থক্য আছে। ইহার একটি প্রধান অংশ অষ্ট্রিক শ্রেণীর ভাষা ব্যবহাব করিলেও দ্রাবিড় ও ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষাভাষী অধিবাসীরও ইহাতে অভাব নাই। এমন কি, একই গ্রামে পরস্পর প্রতিবেশী রূপে অনেক ক্ষেত্রে দুইটি সম্পূর্ণ ভাষাও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশ-জাত জীবনাচরণেব ঐক্য নিবন্ধন ইহাদের মধ্যে এক অখণ্ড সা স্কৃতিক ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে। ঝুমুর তাহারই অন্যতম উপকরণ মাত্র। বিভিন্ন ভাষায় অথচ একই সুরে এই বিস্তৃত অঞ্চলের সর্বত্রই ঝুমুর গান শুনিতে পাওয়া যায়।

এই বিস্তৃত অঞ্চলের পূর্বতম সীমান্ত পশ্চিম বাংলার পশ্চিম সীমান্তের মধ্যে আসিয়া মিশিয়া গিয়াছে। এই সীমান্ত অঞ্চলে যে আদিবাসী বাস করে, তাহারা প্রধানতঃ সাঁওতাল বলিয়া পরিচিত। এই সাঁওতাল জাতিও সমগ্র মধ্যভারতের আদিবাসী সংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ। সেই সূত্রেই তাহাদের সঙ্গীতও ঝুমুর। ক্রমে বাংলা ভাষার সান্নিধ্যে আসিয়া আদিবাসীর ঝুমুর বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত হইতে আবম্ভ করিয়াছে, কিন্তু প্রথম অবস্থায় ভাষার পরিবর্তন হইলেও সুর এবং অন্যান্য আঙ্গিকের দিক হইতে তাহার কোন পরিবতন হয় নাই, ক্রমে বাঙ্গালীর বিশিষ্ট লোক-সঙ্গীত এবং উচ্চতর সঙ্গীতের প্রভাব তাহার উপর বিস্তার লাভ করিবার ফলে তাহার রূপ, সুর এবং ভাব পরিবর্তিত হইয়াছে। বর্তমান আলোচনার মধ্যে এই অঞ্চলের ঝুমুরের সেই ক্রমপরিবর্তনের ধারাটি লক্ষ্য করা যাইবে।

আদিবাসী সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত ঝুমুরের মৌলিক রূপটি ছিল এই প্রকার—

১

চেতারাচ নাতারাচ আঁকু মন রূপ কোয়ালাং
তুমার মামারে চাড়ি নিয়া মমরে তুলাং
হাকু মমলাং তুলা হাটিং কুয়ালাং। —মাতকুণ্ডি (পুরুলিয়া)

প্রিয় ও প্রিয়া বাগাল মহিষ চরাইতেছিল। তাহারা মামা ভাগিনী। ভাগিনী বলিল—চল, মাছ ধরি। উপর ও নীচুর মাছ দুই-ই ধরিবার ঔষধ দিব। তুমি ও আমি পাল্লা দিয়া ওজন করিয়া মাছ ভাগ করিব।

সাধারণতঃ আদিবাসীর ঝুমুর তিন পদ দ্বারা গঠিত হইত। প্রথম পদটিতে সুর স্বাভাবিক ভাবে অগ্রসর হইয়া আসিয়া দ্বিতীয় পদটিতে তাহা সামান্য একটু চড়া হইত, তারপর তৃতীয় পদে তাহা খাদে নামিয়া আসিত। এই সঙ্গীতের সঙ্গে মাদলের বাদ্য ও বাঁশীর সুর সংযুক্ত হইত ; যে মাদল বাজাইত, সে একক এবং যাহারা গীত গাহিত, তাহারা সমবেত ভাবে অর্ধবৃত্তাকারে পরস্পর হাত ধরাধরি ও কটি বেষ্টন করিয়া নির্দিষ্ট পদক্ষেপে একবার সম্মুখের দিকে আগাইয়া আসিত, আর একবার পিছনের দিকে যাইত। ইহাই ইহার নৃত্যরূপ।

২

কুলকুলিতে পারায়ার আবিতং কান
পরোয়া বল এন্দো কিয়াড় রচাতে।
পরোয়ায় ফরোকায় এন্দো পরোয়া টঙ্গিসেত॥ —ঐ

আকাশে পায়রা উড়িতেছে—তাহা ধনীর ঘরের খোপে গিয়াই বাসা বাঁধিবে। 'বনের পায়রা' এখানে প্রতীক বা symbol হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। সমস্ত সম্পদ ধনীরাই ভোগ করে ; ইহাই ইহার মূল বক্তব্য।

আদিবাসীর সঙ্গীতে প্রায়ই রূপক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখানে পায়রা রূপক হিসাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

নিম্নোদ্ধৃত ঝুমুরটি শিকারের গান। আদিবাসীরা যখন গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া শিকারে বাহির হয়, তখন কতকগুলি বিশেষ প্রকৃতির ঝুমুর ব্যবহার করে, ইহা তাহাদেরই অন্যতম। তবে শিকারের গানে যে শিকারের কথাই থাকিবে, তাহা নহে, কেবলমাত্র গাহিবার সময় বিশেষ একটি ভঙ্গি ব্যবহৃত হয়, তবে তাহাও ইহার মৌলিক ভিত্তি অতিক্রম করিয়া যায় না।

৩

আজকিয়া ছেদয়া এই মার কো,
বাগি টুকিরে তাঁবেম লডিতে ঘঁটাম।
হবে শিকারিয়া টাঙ্গি এপে। —ঐ

চিঁড়া গামছায় বাঁধা আছে—আর পাঁচলোকে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

এই প্রকার নিরন্ধ্র সাঁওতালী ভাষার রচনার উপর বাংলা ভাষার প্রভাব বশতঃ এই সকল সঙ্গীতে একটি দুইটি করিয়া বাংলা শব্দ ক্রমে প্রবেশ করিতে লাগিল। কিন্তু ইহার মৌলিক সুর কিংবা গীত-রীতির মধ্যে কোন ব্যতিক্রম দেখা দিল না।

৪

আদিবাসীকো মেনকেরা
দিকুপাড়া বামনচালা
লজি অপমান শরম বরম
দিকু পাড়া যাব না। —অযোধ্যা (পুরুলিয়া)

ইহার তাৎপর্য এই যে, দিকু অর্থাৎ যাহারা আদিবাসী নহে অর্থাৎ এখানে বাঙ্গালী তাহারা সভা করিয়াছে। আমাদের ত লজ্জা অপমান বলিয়া কিছু নাই! আমাদের সেই সভায় যাওয়া উচিত নহে, আমরা সেই সভায় যাইব না।

সাঁওতাল আদিবাসীরা ক্রমশঃই বাঙ্গালা ভাষার প্রভাব অনুভব করিতে গিয়া ক্রমে দ্বি ভাষী (bi-lingual) জাতিতে পরিণত হইল, তাহাদের সঙ্গীতের মধ্য দিয়াও ইহার প্রভাব দেখা দিল। সেইজন্য বাংলা ও সাঁওতালী ভাষায় রচিত মিশ্র ভাষার সঙ্গীত এই অঞ্চলে অজস্র রচিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা তখনও সাঁওতাল সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, বাংলা ভাষার প্রভাব

যখন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তখনই বাঙ্গালীর সমাজেও ইহা নিজের প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

৫

না যদি আসে তেরা,
মরে মাহাতো চকা-নে ডাকে
তুঙ্গিরে পারে পাঁচিরে যে
হাপে শিকারিয়া টাঙ্গি এ। —মাঝিডি (পুরুলিয়া)

ইহার মূল অর্থ : পাঁচদিন লগম হয়। তোমরা অপেক্ষা করিও, আমরাও শিকারে যাইব।

ইহাও স্থানীয় আদিবাসীর শিকার পরবের একটি গান। ইহার মধ্যেও শিকারের কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে।

নিম্নলিখিত সঙ্গীতটির মধ্যে সাঁওতালী শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার বাঙ্গালী-পাঠকের নিকট ইহাকে দুর্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছে।

৬

শালপাতা লিগির লিগির পলাশ পাতা ডাঁশা,
শ্বশুর গো থাঁচি তো ভাঁয়ে লে তাতা। —কাঁকড়ামুড়া (ঐ)

নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটির মধ্যে তিনটি ভাষাই ব্যবহৃত হইতেছে, হিন্দী, বাংলা ও সাঁওতালী ; ইহার কারণ, যে অঞ্চল হইতে এই গানটি সংগৃহীত হইয়াছে, সেখানে হিন্দী ভাষারও প্রভাব আছে।

৭

ভাদর মাসের গুদার জুনা তোরা একা খেলিরে
হামি, খেয়ে লি, আমার নাগরকে ভুলালি রে
হামি, খেয়ে লি। —ঐ

মিশ্র ভাষায় রচিত ঝুমুরগুলির ভিতর দিয়া ক্রমে বাংলা ঝুমুরের রূপ যে কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহা বিশেষ ভাবে এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

৮

হোট মোট গা করে মাত করি একরা,
ঘুমাবে ঘুমাবে শুনি বড়রে জমক রে
ঘুটং দা তাং, দা তাং তাং। —অযোধ্যা (ঐ)

৯

দর হর ঘর বানালে,
আচিল পাচিল পীড়া দিলে,
বড় পীড়া দিলে,
পাঁচি রে তো দিব চুম
দুয়ারে দিব গুয়া ডাল ॥ —সাহেবডিহি (ঐ)

১০

একা বালা সরসতী গুরুকের নাম ধরি,
গুরু কোন গুরু পাকে ডলা,
গুরু মানে সরসতী পাকে ডালা। —ঐ

১১

হিহি রেরে আও জনম,
পিপিড়িরে আও মরণ,
বাসা বুধা গো আয় চাইলা জনম। —ঐ

ক্রমে দেখিতে পাইতেছি যে, সাঁওতালী শব্দগুলি সম্পূর্ণই দূর হইয়া গিয়া আরও অধিক সংখ্যক বাংলা শব্দ ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

১২

এত বড় রাত বাবু এত বড় দিন গো,
কাঁহা গো বাবু করলো বিহাঁন। —ঐ

পুরুলিয়া জিলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলের সংগ্রহ বলিয়া দেখা যায়, দুই একটি হিন্দী শব্দও ইহাদের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে। তবে বাংলাই হউক কিংবা হিন্দীই হউক কাহারও উপর পরিপূর্ণ অধিকার জন্মিবার অভাবে এখনও কোন ভাষাই পরিচ্ছন্ন রূপে ব্যবহৃত হইতে পারিতেছে না।

১৩

ঘরেতে রনে বনে গোহালে তো অবলা ধন,
দুলার বিটি যদি হইত,
দুলার বিটিকেও ধন দিত রে। —অযোধ্যা (ঐ)

মেয়েকেও সম্পত্তির অংশ দেওয়ার কথা এখানে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে।

১৪

আগুয়ে গো বলেছিলি সুন্দর মায়া করিব,
বাঁশ বান্দা ছোঁডা রে,
কালো শিশু মায়া রাখিল কোলে। —সাহেবডিহি (ঐ)

প্রত্যেক সঙ্গীতানুষ্ঠান আরম্ভ করিবার পুর্বেই যেমন বন্দনা গাহিবার প্রয়োজন আছে, সাঁওতালী ঝুমুর গাহিবার সময়ও তাহা লক্ষ্য করা যায়। নিম্নোদ্ধৃত বন্দনা গীতিটির মধ্যে সাঁওতালী ভাষার দুই একটি শব্দ এখনও ব্যবহৃত হইতেছে, দেখা যায়।

১৫

পুরুবা বন্দনা কিবি পছিমে বন্দনা কিরি,
এ কোড়া বন্দনা গীতা,
গাওলাং সরসতী পাকে-ডলা। —ঐ

১৬

একা পুত বাহা লোক বড ধানী মান রে
দিনে দিনে ফুটে পরদ ফুল। —ঐ

১৭

বড ঘরের বড বিটি লাছা লাছা চুল,
বিনা তেলের খোঁপা বাঁধা যেমন জীউর ফুল। —মাতকুণ্ডি (ঐ)

অর্থাৎ ধনীজনের বধূকন্যা তৈলচিক্কন দীর্ঘ চুল। গরীব ঘরের মেয়েদের চুলে তেল পড়ে না—জীউর ফুলের মত রুক্ষ খোঁপা।

আদিবাসীর ঝুমুর গানে কোন আধ্যাত্মিক চিন্তা কিংবা কোন পারত্রিক কল্যাণের স্বপ্ন প্রবেশ করিতে পারে নাই, অবিমিশ্র সাঁওতালী ভাষা কিংবা বাংলা ভাষা যে ভাষাতেই রচিত হউক, তাহা প্রত্যক্ষ জীবনের নানা বাস্তব কথায় সরস।

১৮

মায়ে বাপে জনম দিল বিয়া দিল নদীর উপারে,
এমন আমার বাপ, তেমন আমার ভাইয়ারে
রাই খোমন কাঁদে একে লোর পড়ে॥ —অযোধ্যা (ঐ)

ইহার একটি পাঠান্তর এই প্রকার :

মায়ে বাপে মোর জনম দিল,
দশে মিলি মোরে বিহা দিল।
নদীপারে মোর শ্বশুর বাড়ী,
আসা যাওয়া মোর বারণ হইল।
আগুতে মন যায় পেছুতে বেঙ্,
আঁখির লোর পড়ে মনে মনে ॥ —তোপচাঁচি (ধানবাদ)

দূরে বিবাহ দেওয়া বালিকা-কন্যার নিকট চির-অভিশাপ। বাঙ্গালী ঘরের বালিকা-কন্যাও অভিমান করিয়া পিতাকে শুনাইতে ছাড়ে না,

এত টাকা নিলে, বাবা, দূরে দিলে বিয়া।

১৯

দাঁড় হারায়র লিকিলিকি বিষ্টি বাড়িল,
যাকেরে দিবে বারোশ' টাকারে,
তাকে দিও আসল বিটি ॥ —সাহেবডিহি (ঐ)

২০

তুমি ভগবান উপরে আমি ভগবান তলে,
দেশেরে ভগবান ভালক ছাইলা রে
আমি ভগবান কোলে লিবার সাধ রে ॥

ইহাদের বাংলা রচনার একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, যেখানেই সাঁওতাল পল্লীকবি মনোমত বাংলা শব্দটি জুগাইতে পারে নাই, সেখানেই সে নির্বিচারে তাহার নিজস্ব ভাষার শব্দটি ব্যবহার করিয়া তাহার বাংলা ভাষা-জ্ঞানের অভাব পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। এই সকল গান সাঁওতাল সমাজেই প্রচলিত ছিল বলিয়া তাহাদের নিকট শব্দের অর্থগুলি দুর্বোধ্য হইতে পারিত না।

২১

বাইগান (বেয়ান) বাড়ীর ছেলে কাঁদিছে ধূলায় লুটুপুটু,
এস ছেলে কোল লিব খেতে দিব সরু ধানের চিড়ে রে। —ঐ

২২

মায় লবে লবে লুপা লবে, বাবা লবে লব্বে টাকা লবে।
ভাইয়া যে লবিল শিরায় বরদা রে
আমি হি জুড়াব জনম জনম রে ॥ —ঐ

২৩

হাতী যে বাঁধিব জোড় তলে,
ঘোড়া যে বাঁধিব খিজুর তলে।
লী-লা-লা-লা······ —ঐ

২৪

ছাইলা বড় দুখে মানুষে জনম হে
ছাইলা নাচিতে দিও রে
ছাইলা খেলিতে দিও রে
ছাইলা বড় দুখে রে ভাই, মানুষে জনম ॥ —ঐ

পুত্রের জন্ম বড় দুঃখের, পুত্রকে খেলাধূলা করিতে দিও, তাহাকে নাচিতে হাসিতে দিও, পুত্রের জন্ম বড় দুঃখের, অর্থাৎ পুত্র বড় দুঃখের ফল, বহু দুঃখ ভোগ করিয়া পুত্র লাভ করিতে হয়, সুতরাং তাহাকে অনাদর করিও না।

২৫

ক্ষেতে তো সবাই মাছ ধরে গো,
দাঁইড়ে তো সবাই পাথুড় মারে
দাদারে লিলি বিছি চেঁড়ে দাদা মা মারো রে ॥ —ঐ

সাঁওতালী ঝুমুর গানের মধ্য দিয়া জীবনের নানা তুচ্ছ কথাই আমরা শুনিতে অভ্যস্ত ; কিন্তু মধ্যে মধ্যে এক আধটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ও কিভাবে যেন ইহাতে আসিয়া পড়ে।

২৬

যখন রাণী রাজা ছিল,
তখন রাণী শাঁখা চুড়ি,
রাজা হে মরিল,
রাণী শাঁখা খুলি দে। —ঐ

যখন রাজা জীবিত ছিল, তখন রাণী শাঁখা চুড়ি পরিত, এখন রাজা মরিয়া গিয়াছে, রাণীর হাতের শাঁখা চুড়ি খুলিয়া দাও।

রাজা ও রাণী এখানে কোন রূপক অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকিতে পারে, কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, আদিবাসীর গানে প্রায়ই রূপক ব্যবহৃত হয়।

২৭

কলিকাতার টিকিত গাড়ী বদ্দমান দাঁড়াইল,
ও কাল্যে বাছারে টিকিতে মা বড ভয় লাগে। —ঐ

২৮

বাচুরে তো জল খাইয়া গেল,
খাইয়া গেল,
বাগালে তো হাঁক দিয়া গেল
কারি গাহিও হিও কারি গাইবো,
কোরালি যায়। —ঐ

২৯

মায়ের নাহি নয়ানে বাপের নাহি রে,
আপন বুধে নয়ান বেড়িয়ে পুরিলে হি। —ঐ

৩০

সিলি সড়কেরে নালে রে
কলকাতা দলানেরে নালি
দলা নিপুরে এমন স্থন্দর কারি গো। —ঐ

৩১

আগুই আগুই রেলগাড়ী তার পিছু টিকিতের গাড়ী
রেলগাড়ী নিগা ভাঙ্গিল রে, সাহেবের টাকা গেল গেল। —ঐ

৩২

ইদেশে মুলুকে বেটাছেলে হিল দিদি,
হাতে নাই বালা, গলায় নাই মালা,
নীল শাড়ী-ধুতি পরিল। —ঐ

৩৩

তিরি বিহু হিত নাই গোঙ্গা বিহু জল নাই,
হে ঠাকুর তুমি জান হে। —ঐ

মায়ের সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদের কথা স্মরণ করিয়া নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে কন্যা ব্যথিত হইতেছে। ইতিপূর্বে আমরা ভাদু, টুসু, জাওয়া গানে যে কথা শুনিয়াছি, এখন তাহাই সাঁওতালী ঝুমুরেও শুনিতে পাইতেছি—ভাব-রসের দিক দিয়া ইহাদের পরস্পরের সঙ্গে অন্তর্মুখী সম্পর্ক আছে। কারণ, একই মানুষ একই পরিবেশের মধ্যে তাহা রচনা করিয়াছে।

৩৪

মা হইয়া এমন কথা বইল না,
আমি আইও ঘরে রইবো না।
মায় এমন ধন নাই, মায় এমন কথা বইলো না গো
আমি মায় ঘরে রইব না। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত ঝুমুরটি রচনার সরলতায় এবং ভাবদৃষ্টির পরিচ্ছন্নতার গুণে একটি আদর্শ রচনা—

৩৫

হাতের ফুল হাতেরে মলিন রে
গোছার ফুল গোহারে মলিন
শিশু বালক কোলেরে মলিন রে। —মাঝিডি (ঐ)

হাতের ফুল হাতে মলিন হইয়া যায়, গুচ্ছের ফুল গুচ্ছেতেই মলিন হয়, শিশু-বালক সর্বদা কোলে কোলে থাকিলেও তেমনই মলিন হইয়া যায়।

শিশুর জীবন ও তাহার আনন্দ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট বিশ্বাস হইতে সার্থক উপমায় সমৃদ্ধ এই গীত-রচনাটি সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার যোগ্য।

নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটির মধ্যে দাম্পত্য জীবনে নারীও পুরুষের পরস্পর অভিলাসের কথা ব্যক্ত হইয়াছে।

৩৬

নাকের নথ কাণের সোনা,
দিবে চর জগন্নাথ তবে হামি ঘর করিব।

অসে, ধনে দুধে পুতে ঘর যদি ভরিব গ ধানে
তবে আমি দিব আভরণ।
লিলাক্ লো, লিলাক্ লো, মার্‌রে মার্‌রে মার্‌রে। —ঐ

নারী বলিল, যদি নাকের নথ এবং কানের সোনা কিনিয়া দাও, তবে আমি তোমার ঘর করিব , পুরুষ বলিল, যদি পুত্র এবং ধনে তুমি আমার সংসার ভরিয়া দিতে পার, তবে আমি তোমাকে আভরণ দিব। বিলাসিনী নারীর মধ্য হইতে এখানে কল্যাণী নারীর রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মা কন্যাকে স্নেহ বন্ধনে নিজের গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহেন, কিন্তু যুবতী কন্যার নিকট মাতৃস্নেহের বন্ধন কোন আকর্ষণ সৃষ্টি করিতে পারে না, সহজ ভাষায় এই ভাবটি নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতে ব্যক্ত হইয়াছে—

৩৭

মা গো মা, এমন কথা বলো না,
মা গো মা, এমন কথা সইব না,
মা গো মা, পুরুষ নিয়ে বাইরে যাব,
মা গো মা, না রইব ঘরে,
মা গো মা বাহিরন যাব॥ —সাহেবডিহি (ঐ)

কিন্তু পুরুষেব সঙ্গে বাহির হইয়া গেলে কি হইবে, সেখানেও কি নিরবচ্ছিন্ন শান্তি আছে?

৩৮

শাশুড়ি ননদিন বড ভাই গাল দেয়,
আপনার কিরি ভাই রা করে না॥ —ঐ

৩৯

বাডী আছে সিমুল গাছ আগে ফুটি ফুল,
দেখিতে সুন্দর ফুল বাস নাই ফুল॥ —সাহেবডিহি (ঐ

বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রীরাধিকার বর্ষা-অভিসারের চিত্রটি নিম্নোদ্ধৃত ঝুমুর গানটিতে স্মরণ করাইয়া দেয়—

৪০

জোছনা আঁধকু রাতে বিজলী চমকে
যার সঙ্গে যার ভাব জাগে

মরিলে কি ছুটেরে—
এত রাত কিসে। —অযোধ্যা (ঐ)

৪১

লাল শালুকের ফুল, ফুটে আধা রাতে,
যার সঙ্গে যার ভাব থাকে মরিলে কি ছুটে, বন্ধু!
এত রাত কিসে—।
এত রাতে আলে, বন্ধু, বস হে পালঙ্কে,
চরণ জলে পা ধুয়াব মুছাই, বন্ধু, কেশে। —ঐ

৪২

কাজল নয়নে বেড়ি মরি মরি যাবি কুলনে,
পরব—নারীর বেশ ভূষণে। —ঐ

এ পর্যন্ত যে সকল ঝুমুর গান উদ্ধৃত করা হইল, তাহাতে দেখা গেল, জীবনের নানা কথা বিচিত্র ভাবে ইহাদের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে; আদিবাসী জীবনই ইহার ভিত্তি।

আদিবাসীর ঝুমুর সর্বত্রই সহজ জীবনের অনাডম্বর স্বরূপটি প্রকাশ করিয়া থাকে। একটি ওরাওঁ ঝুমুর এই প্রকার—

'Give him water, mother
Give him water,
The flirting boy
Dances the Jhumur all the night
And thirsty he comes.'

রাধাকৃষ্ণের চিত্রের সঙ্গে ইহাদের পার্থক্য খুব সুদূর নহে।

কিন্তু হিন্দুসমাজের প্রভাব যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই ইহাদের মধ্যে বহিরাগত চিত্ররূপও আসিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল। ক্রমে ইহার সুনির্মল জীবন-আকাশে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলার চিত্ররূপ ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে কানু ও কদম গাছের চিত্র আসিয়া প্রবেশ করিল—

৪৩

আইসো, কানু, বইসো কড়্চিরো পাত কানু কোদম তলে,
গাইনি মাগে দিব ধনি কানু কোদম তলে॥ —ঐ

নিম্নে 'শ্যাম' কথাটিও ব্যবহৃত হইতে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। এইবার বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে, কেবল মাত্র ভাষাই নহে, বাঙ্গালীর বিশিষ্ট সংস্কৃতিকে আশ্রয় করিয়া যে রাধাকৃষ্ণ-লীলা কাহিনী একদিন গীতি-কবিতায় রচিত হইয়াছিল, এই আদিবাসীর সহজ সঙ্গীতগুলির মধ্যে আসিয়া তাহার প্রভাব পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু এখানে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে কদম গাছটিও এই অঞ্চলের আদিবাসীর জীবনে অপরিচিত নহে। ভাদ্র মাসে ইহাদের মধ্যে যে করম গাছের উৎসব হয়, তাহা কদম গাছেরই উৎসব। করম গাছকে পাহাড়িয়া কদম গাছ বলা যায়।

৪৪

লালশাড়ী লিব না, শ্যাম, নীল শাড়ী লিব,
ঘরে না থাকিব শ্যাম, বাইরাকে যাব।

নিম্নে রাধাকৃষ্ণলীলাব 'পারখণ্ডে'র একটি চিত্রও যেন কি ভাবে আসিয়া ইহাতে প্রবেশ করিয়াছে।

৪৫

সব লোককে পার করব, আনা আনা কড়ি লিব,
রাধিকে যো পার করিব
মিলব কানের সোনা। —মাঝিড়ি (ঐ)

কিন্তু একটি বিষয় এখনও লক্ষ্য করা যায় যে, রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর ইঙ্গিত এইভাবে সর্বপ্রথম প্রবেশ করিবার যুগেও মৌলিক আদিবাসী ঝুমুরের বহিরঙ্গগত রূপ কিছুমাত্র পরিবর্তিত হয় নাই , সেই পরিবর্তন পরবর্তী কাল হইতে ক্রমে সাধিত হইতে আরম্ভ করিবে।

এইবার রাখাল নায়কের পরিধানের পীতবসন এবং মুখের বাঁশীর কথাও শুনিতে পাওয়া যাইতেছে—

৪৬

বাগাইলারে বাগাইলা,
কোমের গুঁজা বাঁশিয়া,
হলুদ গাবা ধুতিয়া,
বাগাইলা, কভু না শুনাইলা তোর বাঁশিয়া।
—কাঁকড়ামুড়া (ঐ)

হে রাখাল, তোমার কোমরে বাঁশি গুঁজা, হলুদ ছোপানো ধুতি পরিধানে, তুমি কখনও তোমার বাঁশি আমাকে বাজাইয়া শুনাইলে না।

এই গানের ভিতর দিয়াই অনুভব করা যাইবে, এইবার ইহার উপর রাধাকৃষ্ণের চিত্রটি আসিয়া নিজের অধিকার স্থাপন করিয়া লইতে আর বিশেষ দেরী নাই।

কিন্তু এইখানে একটি বিষয় বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। রাধাকৃষ্ণের লীলাচিত্রটি ইহার উপর বাহির হইতে আনিয়া আরোপ করা হইয়াছে, কিংবা এই চিত্রগুলিই রাধাকৃষ্ণের চিত্রের জন্মদান করিয়াছে। শেষোক্ত ধারণাটির পক্ষেই যুক্তি অধিকতর বলবান। সে'কথা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি।

এইবার গোকুলনগরেব কথাও আসিয়া পড়িল।

৪৭

বাধের আড়ে যাছ বঁধু গোকুল নগর হে,
আনে দিয়ো বঁধুর হাতের বাছা চুড়িরে।
চুড়ি দিলে বধু—কিবা মোক দিলে
ঘর যাইতে আমার মন নাহি সরে হে।
ঘব যাইতে—হায গো, ঘর যাইতে মন নাহি সরে হে।

—অযোধ্যা (ঐ)

নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতে প্রেমিককে যে 'নাগর' অর্থাৎ নগরের অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ করা হইতেছে, তাহা হইতেই অনুভব করা যাইবে যে, ইহার মধ্য হইতে পল্লীর জীবনের স্পর্শ ক্রমে দূর হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে।

৪৮

সকালে বিকালে তুলোর বিছানা,
কি দোষে নাগর এল না।
সে কি যাদু জানে—সে কি মন মানে গো
ইসারাতে চুরি করে পরাণে।
ওগো তারে কি পাসরা যায়,
দিবানিশি আমার জাগিছে হিয়ায়। —ঐ

ক্রমে গানগুলির আকারও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যাহা মূলতঃ মাত্র তিনটি

পদ দ্বারা গঠিত হইত, তাহা এখন আদিবাসী সমাজের রচনার সীমানা অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালী-গীতিকারদিগের হাতে পড়িয়া রচনা এবং ভাব উভয়ের বিষয়েই জটিল হইতে জটিলতর হইতে লাগিল। রচনাও সেই অনুযায়ী দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইতে লাগিল। ভাবের দিক হইতে বাড়িবার কোন উপায় ছিল না বলিয়া কেবলমাত্র বহিরঙ্গে অলঙ্কারে এবং বর্ণনায় ভারাক্রান্ত হইতে লাগিল। এমন কি, রাধা কথাটিও ইহার মধ্যে আসিয়া পড়িল। ইহা হইতে স্পষ্টতই বুঝিতে পারা গেল, ঝুমুর রচনা এখন কেবলমাত্র আদিবাসীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল না, বাংলার পল্লীকবিও তাহার রচনার ভার লইল—

৪৯

চাঁদের মালারে গেঁথেছি পাঁজরে
চাঁপার ফুল কোথা পাবে গো রাধে।
বেলা থাকি থাকি গেলা চন্দ্রমুখী—
বেলা অবসানে আলে গো রাধে—
এতক্ষণ কোথা ছিলে গো রাধে? —ঐ

৫০

শুনলো, সখি, সপনে নিরখি
আমার সে প্রাণবঁধু আসিয়ে।
(আমার) না সার যে স্বরে পরশ সে করে।
গেল ঈসত ঈসত হাসিয়ে,
ও সখি বড় স্থখে ছিলাম ঘুমায়ে।
দিল মদনা মোক জাগায়ে॥ —মানবাজার (ঐ)

৫১

রাসমণ্ডল ঘেরিয়া রস রাস ভেস ভরিয়া
ও যে টল টল ঢল ঢল,
নব নব ভাব গোর গোর নবীন নাগরী রাসে ধরাধরি
নাচিছেন নব নাগর—হায় মরি মরি।
হায় সঙ্কট তবু ভুরু ভঙ্গ চরণ চমকে চারি অঙ্গ
সিঞ্চিত কাল কঙ্কণ কিঙ্কিনী, নাচিছে নব নাগর॥
—অযোধ্যা (ঐ)

সুস্পষ্ট অর্থবোধ হইতে যে প্রত্যেকটি শব্দ এখানে ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা নহে—অনেক সময় কোন শব্দ সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা ও অস্পষ্ট অর্থবোধ হইতেও অনেক পদ রচিত হইয়াছে।

৫২

মেঘ আঁধারি রাতি বিজলী চমকে হে শ্যাম,
যার সঙ্গে যার ভাব গো তাকে মারিলে কি ছুটে
বঁধু এত রাগ কিসে ?
ভাল কালে আইলে বঁধু, বইসো সে পালঙ্কে,
(বঁধু) বইসো গো পালঙ্কে।
হে শ্যাম, পা ধুয়াব নয়ন জলে
মুছাইব কেশে, বঁধু এত বাগ কিসে ? —কাঁটাদি (ঐ)

৫৩

হায় বোমের (ব্রহ্মের) বজনী সাজরে গোপিনী ,
পঞ্চম স্বরে তুলিয়ে টান মধুর গোপিনী করও গান
বাজরে মোর দুঙ্গা (মৃদঙ্গা) ভালরে মাল
উছলিত প্রেম সাগর নাচিছে নব নাগর। —অযোধ্যা (ঐ)

এই বার শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাব কথাও শুনিতে পাওয়া যাইতেছে—

৫৪

লচ্‌না করে যাইগো জলে শ্যাম দাঁড়িয়ে কদমতলে,
তেরচা নয়ন কত ভাল।
নয়নশরে বিন্‌ছে প্রাণ আমাব ঐ কাল নাগরে,
দিবানিশি প্রাণ কাঁদে আমার ওই কালিয়ার তবে।
ওগো মরি ওগো হায়, পাছে কি পরাণ যায়,
আমি রইতে নারি ঘরে।
পীরিতি কাঁটা বিষম ল্যাটা আমার অঙ্গ গেল জ্বলে,
দিবানিশি প্রাণ কাঁদে, আমার ওই কালিয়ার তরে ॥
—বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

নিম্নোদ্ধৃত পদের মত কোন পদই বৈষ্ণব পদাবলীর বিপ্রলব্ধা রাধিকার পরিকল্পনার প্রেরণা দিয়া থাকিবে।

৫৫

ডেকে ডেকে কেন ঘুম ভাঙাইলে পরের বঁধুয়া।
তুমি যাও তোমার ভালোবাসার কাছে,
সে আছে মরমে মরিয়া॥
সরল জানিয়ে জীবন-যৌবন সঁপেছিলাম তোমায় যাচিয়া,
অবলায় মজালে শেষ দাগা দিলে নিষ্ঠুর বঁধুয়া কালিয়া।
রতন লোভেতে ডুবিলাম সাগরে ফণি বিষে মলেম জ্বলিয়া,
সুধা পিব বলে ধরিলাম চাঁদেরে সে দিল গরল ঢালিয়া॥ —ঐ

৫৬

শুন গো, রাই, বলি তোরে তোর সঙ্গে পিরিতি করে
আমার এই তো হল ঘটনা।
পরাহিয়ে ফুলের মালা দেখ প্রেম যাতনা দিও না,
গুণমণি চাঁদ বদনি আমায় ভুলে থেক না।
নব নব তরী ভাসে সব গেল তোরি দোষে,
সে ত' আমার যাওয়া হল না॥ —ঐ

৫৭

কিবা তোমার মাদল বাজে বাঁশী বাজে,
রাধে তোমাব নাচে জোডা।
রামকানাই মাদল বাজে, কিষ্ট ঠাকুর বাঁশী বাজে
তেগে তিং তিং, দাতে রে তা ধা, দা তে রে তানা॥
—মাঝিডি (পুরুলিয়া)

এখানে রাধাকৃষ্ণ আদিবাসী নাটক-নাটিকারই রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৫৮

বহু দিনের পর দেখা, ভাল আছ কি তাই বলনা,
আমার আস্‌তে আস্‌তে হল্য দেরি,
নাগর আমায় কিছু বোল্যনা।

ভাল আছ, কেমন আছ কি, তাই বল না।
বন পুড়ে সই, সবাই দেখে মনের আগুণ কজন দেখে
থাকে থাকে ধিকে ধিকে—জ্বল্‌ছে আগুণ তুষের পারা
আমি মইল্যে পোড়াস্‌ না গো তোরা॥ —ঐ

ইহার দুইটি পদের সঙ্গে 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে'র এই দুইটি পদের তুলনা করা যাইতে পারে, যেমন—

বন পুড়ে আগ বডাই জগজনে দেখী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পনী॥

এই অঞ্চলের আর বহু সঙ্গীতের মধ্যে 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে'র বহু পদ আজিও ছড়াইয়া আছে।

৫৯

শ্যামের বাঁশী দিবানিশি, ওগো ডাকে নাম ধরি,
আকুল হইল প্রাণ গৃহে রইতে নারি জ্বালা দিত বড ভারী।
রে বাঁশী কাল হইল॥
গুরুজন, পরাপর ওগো উপায় না হেরি
আকুল হইল প্রাণ গৃহে রইতে নারি,
রে বাঁশী কাল হইল॥
হায় আমার কি হইল, কি করি কি করি বল,
তিলেক না ছাড়ে দ্বার ননন্দী প্রহরী
গেলে যে কুল যায়॥
রে বাঁশী কাল হইল॥

নিম্নোদ্ধৃত পদটিতে খণ্ডিতা শ্রীরাধিকার রূপটি সহজ লৌকিক ভাষায় অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে—

৬০

তুমা হেরো্য, শ্যাম, অঙ্গ জ্বলে, কেন হে জ্বালাত্যে এলে
ছি ছি তোমার লাজ লাগে না, বাসি ফুলে কি মধু মিলে।
শুকায়ে কমল মধু, কমল পড়ে আছে শুধু,
এখন চন্দ্রাবলীর বেশী মধু, উড়ে বোস গা সেই ফুলে।

গত নিশিতে কার কুঞ্জে কোন্ ফুলেতে মজেছিল্যে
এখন দাস্ত ভাবে মন রাখিতে প্রভাতে এস্যে দেখা দিলে।
এখন ফিরে যাও রে, সময় হয়েছে হে অসময়,
ক্ষুধার সময় বহে গেলে, সুধা দিলে কি ক্ষুধা মিলে॥ —বাঁকুড়া

৬১

পিরীতি হল্যো শূল,
এমন জানলে কালার সাথে কে পাতাত্য ফুল।
বর্ণ ছিল চাঁপার কলি, ভেবে বর্ণ হল্য কালি
বসিলে উঠিতে লারি হাত্যে ধর্যে তুল্‌গো।
হায় ঝিঙ্গা ফুল॥
এলায়ে পিরীতের বেণী, যেন কাল ভুজঙ্গিনী
বঁধু আমার যত্ন করে বেঁধে দিত চুল।
একে তোমার ভাঙ্গাতরী, চাপ্‌তে হবে সাহস করি
মাঝ দরিয়ায় ডুবায় তরী বুঝি গেল কুল। —ঐ

এখানে ললিতা বিশাখা সখীর পরিবর্তে সখীর নাম ঝিঙ্গাফুল। লৌকিক রস-সংস্কারের মধ্যেই এখানে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৬২

পার যদি পাব করে দাও গরজ কর কেনে।
একে তুমার ভাঙ্গাতরী ও তায়, চাপ্‌তে হবে সাহস করি,
এবার মাঝ দরিয়ায় ডুবায় তরি বুঝি মার প্রাণে।
সঙ্গে আছে রাজার মেয়ে, না করি পার কড়ি দিয়েঁ্য,
ঐ ফুলের বদন, যায় শুকিয়ে মাঝি তুমার কথা শুনে॥ —ঐ

৬৩

পূরব পছিম তবে বলে সোনার মাদুলী,
অমৃতি বলে খাওয়ালে কোন ধন।
মজালে রাগিণী কোন ধনী তুমি বিষ খাওয়ালে।
তবে চাঁদের এমনি ছেড়ী বেণী মাথে লই গো মানী,
বরণের রুপা মোর কিমিতে বিষ দিলে তুমি,
কিসে বিষ খাওয়াইলে।

তবে মনের জোরে বেশী গালে এবে পুদনা দেখাইলে,
কিসে ধনী তুমি বিষ খাওয়াইলে ॥ —অযোধ্যা (পুরুলিয়া)

৬৪

রাম নাম বোল্যনা—
কচি কদম খেয়্যো না, শুধাল্যে রাধিকা নাম বোল্যনা,
নিবানো আগুন জ্বেলো না।
শালবনে শুয়া পোকা, সেটা বটে ছিলার কাকা
দেখা পেলে বইল্যে দিয়ো পিয়াকে কি দোষে ছেড়েছে আমাকে।
হাতে হাতে পান দিতে, দেখেছিল পাড়ার লোকে,
চুণ দিতে দেখ্যেছে ভাসুরে।
ছ্যতি লো, আজ আমাদের কী আছে কপালে ॥
আজ রেত্যে বড জল সবাঁই বলে চল্ চল্,
চাল পোলই, হাতে টুনা ধরালি
অতি বেগে ঘর ঘুরালি ॥
বেহায়া পুরুষ হত্য, ছাতার আড্যে নিয়ে যেত,
কিনে দিত সন্দেশ মিঠাই,
পাহাড়ে পর্বতে ঘর তাই লো সাঙ্গালা বর
বর দেখে কন্যা বেয়াকুল, শাশুড়ী জামাইয়ে গ্যাদাফুল।

আদিবাসী ঝুমুরের যে সহজ সরল এবং সংক্ষিপ্ত রূপটি প্রথম নির্দেশ করিয়াছিলাম, তাহাই ক্রমাগত বাঙ্গালী রস-সংস্কারের প্রভাব বশতঃ রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর সান্নিধ্য লাভ করিয়া যে কি ভাবে বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গে জটিল হইতে জটিলতর রূপ লইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা উপরি-উদ্ধৃত ঝুমুর গান কয়টি হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। কিন্তু এখানেই ইহার শেষ হয় নাই। ইহাদের উপর ক্রমে মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলী রচনার বহির্মুখী একটি প্রভাবও অচিরেই কার্যকর হইয়া উঠিল। তবে এই প্রভাব কেবলমাত্র ঝুমুরের বহিরঙ্গেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা ইহার অন্তরঙ্গ কোন দিক দিয়াই স্পর্শ করিতে পারে নাই। মহাজন পদাবলীর মধ্যে যে সুগভীর আধ্যাত্মিক ভাব এবং ভক্তির স্পর্শ ছিল, ঝুমুর গানগুলি তাহা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। অথচ ভক্তিরস কিংবা অধ্যাত্মচেতনার

কথা বাদ দিলে বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর কোন অর্থই হয় না। সুতরাং ইহা বৈষ্ণব পদাবলীর যথার্থ উত্তরাধিকার নহে, কারণ, উত্তরাধিকার সম্পূর্ণ হইতে হইলে ইহার ভাব এবং রূপ উভয়েরই উত্তরাধিকারের কথা আসে, কিন্তু ইহাতে ভাবের দিক দিয়া কোন উত্তরাধিকার স্থাপিত হইতে পারে নাই, এমন কি, রূপ ও আঙ্গিকের দিক হইতেও বৈষ্ণব পদাবলীতে যে ব্রজবুলি ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাতে তাহা ব্যবহৃত হয় নাই, অথচ আদিবাসী ঝুমুরের সহজ বাংলা ভাষাও ব্যবহৃত হয় নাই। বরং তাহার পরিবর্তে অলঙ্কার-সমৃদ্ধ বাংলা গীতিভাষার বিশিষ্ট একটি রূপ ইহাতে ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই পর্যন্ত যে ঝুমুর গানগুলি আমরা আলোচনা করিয়াছি, তাহাদের শেষ ভাগে দেখা গিয়াছে যে, রচনার দিক দিয়া ইহাদের লৌকিক বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ন না হইলেও ব্যক্তির রস ও শিল্পচেতনার স্পর্শ ইহাদের এখানে সেখানে মুদ্রিত হইয়াছে, অর্থাৎ ইহাদিগকে অনুসরণ করিলে বুঝিতে পারা যায়, ইহারা সামগ্রিক ভাবে লোক-মানস হইতে সৃষ্টি হইবার পরিবর্তে ইহারা রচনা কর্মের দিক দিয়া কোন কোন সময় যেন ব্যক্তি-মানসের সৃষ্টি। এই ধারাই অনুসরণ করিয়া আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই দেখা গেল, ইহাদের মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর অনুরূপ প্রত্যেকটি পদে রচয়িতার পরিচয় জ্ঞাপক এক একটি ভণিতা বা কবির নামও আসিয়া যুক্ত হইতেছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ইহা লোক-সঙ্গীতের সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। লোক-সঙ্গীত ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে গোষ্ঠী-চেতনা মুদ্রিত হইয়া থাকে বলিয়া ইহা ব্যক্তিবিশেষের নামে সমাজে প্রচার লাভ করিতে পারে না। কিন্তু ইহাদের সম্পর্কে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। যে সকল ঝুমুর গানের মধ্যে পরবর্তী কালে ব্যক্তিবিশেষের ভণিতাও যুক্ত হইয়াছে, তাহাও লোক-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য বিবর্জিত হয় নাই, কারণ, এই অঞ্চলের লৌকিক রস-চেতনার উপর ভিত্তি করিয়াই ইহারা রচিত হইয়াছে; সেইজন্য এই অঞ্চল ব্যতীত অন্যত্র এই শ্রেণীর সঙ্গীত প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ যে গীত-রীতি ইহাদের মধ্যে ব্যবহৃত হয়, তাহা প্রাচীন (calssical) বৈষ্ণব পদাবলীর গীত-রীতি নহে, এই অঞ্চলেরই লৌকিক গীত-রীতি। রাধাকৃষ্ণের নাম ইহাদের সঙ্গে সংযুক্ত বলিয়াই ইহাদিগকে পদাবলী বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায় না, ইহাদিগকে লৌকিক পদাবলী বলা যাইত, কিন্তু সেইভাবে ইহাদিগকে উল্লেখ করা হয় না, ইহাদের

সম্পর্কে লৌকিক নামটি অর্থাৎ ঝুমুর এই নামটি বিসর্জিত হয় নাই। ভণিতার ব্যবহার অবান্তর মাত্র, ইহা দ্বারা বিশেষ কোন সঙ্গীতের সাম্প্রদায়িক কিংবা গোষ্ঠীগত পরিচয় বুঝায় না, ইহা এই অঞ্চলেরই গানের সাধারণ বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু এ' কথা সত্য, আদিবাসী ঝুমুর যেমন বাস্তব জীবন ভিত্তিক স্বাধীন গীত-রচনা ছিল, ইহাতে তাহার পরিবর্তে রাধাকৃষ্ণলীলার সুনির্দিষ্ট কাহিনীটি প্রবেশ করিয়া ইহার স্বাধীন জীবনবোধ বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী যে একটি বিশেষ ধারা অনুসরণ করিয়াছে, ইহাও সেই ধারাকেই বাহ্যতঃ স্বীকার করিয়া লইয়াই সঙ্গীতগুলি রচনা করিয়াছে। তাহার ফলেই ঝুমুরের ক্রম-বিকাশের ধারা এই পথে আসিয়া রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তবে আদিবাসীর জীবন হইতে ঝুমুরের যে স্বাধীন রূপ একদিন বিকাশলাভ করিয়াছিল, তাহা একটি নিজস্ব ধারা সৃষ্টি করিয়াও যে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিল, তাহার ক্রমবিকাশ কেহই রোধ করিতে পারে নাই। কেবলমাত্র যে ধারাটি হিন্দু সমাজ দ্বারা প্রভাবিত হইবার ফলে রাধাকৃষ্ণের লীলা কুঞ্জে আসিয়া আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে তাহারই ক্রমবিকাশের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং ভণিতার জন্য ইহাদের বিনাশের কোন আশঙ্কা নাই, যদি ইহাদেব বিলুপ্তি ঘটে তবে কেবলমাত্র রাধাকৃষ্ণ কাহিনী ও অলঙ্কারিত ভাষার কৃত্রিমতার জন্যই ইহাদের বিলুপ্তির আশঙ্কা করা যায়। কারণ, পুর্বেই বলিয়াছি যে একান্ত আঞ্চলিক ঐতিহ্যের উপরই ইহাদের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা উপেক্ষা করিয়া একান্ত ব্যক্তিরস-চেতনার উপর ইহাদের জন্ম হয় নাই। সেইজন্য কেবলমাত্র ভণিতার জন্যই ইহাদের লোক-সঙ্গীতের যে গুণ, তাহা বিনষ্ট হইতে পারে নাই। তবে এ'কথা সত্য, আদিবাসী ঝুমুরের যে সংক্ষিপ্ততা এবং ভাষার দিক দিয়া নিরলঙ্কারতা দেখা যায়, তাহা বহু পূর্বেই বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনের সম্পর্কে আসিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, ভণিতাযুক্ত ঝুমুর গানই আকারে দীর্ঘতম, অর্থাৎ ক্রমবিকাশের এই সর্বশেষ ধাপে আকারের দিক দিয়া ইহারা দীর্ঘতম রূপ লাভ করিয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত নিদর্শনগুলিই ইহার প্রমাণ।

আধুনিক ঝুমুর গানে যাহার ভণিতা সবাধিক ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার নাম ভবপ্রীতা, তিনি দেওঘর বৈদ্যনাথ শিব মন্দিরের প্রধান পাণ্ডা; পুর্ণ নাম ভবপ্রীতা ওঝা। কিন্তু অধিকাংশ ভণিতাতেই তিনি ভবপিতা বলিয়া উল্লেখিত

হইয়াছেন। তিনি অদ্যাপি জীবিত, তাঁহার কয়েকটি ঝুমুর গানের বই মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার রচিত গানগুলি বাংলা দেশের একমাত্র এই অঞ্চল ব্যতীত আর কোথাও প্রচার লাভ করিতে পারে নাই, একমাত্র এই অঞ্চলই ইহাকে স্বীকার করিয়া লইয়া ইহার নিজস্ব সংস্কৃতির মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত করিয়া লইয়াছিল। সেইজন্য ভাবে এবং রূপে ইহাকে এই অঞ্চলেরই লোক-সঙ্গীত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

এই শ্রেণীর ভণিতাযুক্ত ঝুমুর কিছু কিছু মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও নিরক্ষর সমাজের মধ্যে ইহাদের মৌখিকই সর্বাধিক প্রচার হইয়াছে। এই মৌখিক প্রচারের ফলে ইহাদের মধ্যে লোক-সঙ্গীতের যাহা সাধারণ বৈশিষ্ট্য তাহাও সহজে বিকাশলাভ করিয়াছে। অর্থাৎ ইহারা individual এর রচনা হওয়া সত্ত্বেও পরে ইহারা communally recreated হইয়াই সমাজে প্রচারলাভ করিয়াছে। সুতরাং ইহাদিগকে লোক-সঙ্গীত বলিয়াই গ্রহণ করা সঙ্গত। তবে ভাষার অনাবশ্যক অলঙ্করণ এবং ভাবেব বৈচিত্র্যহীনতা ইহাদেব স্বাধীন বিকাশের যে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার ফলে ইহাদের মধ্যে লোক-সঙ্গীতের অন্যান্য কিছু কিছু গুণ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

নিম্নে ভণিতাযুক্ত যে ঝুমুব গান উদ্ধৃত করা গেল, তাহা রাঢ় অঞ্চলের চারিটি জিলা পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম ইহাদের মধ্যেই প্রচলিত আছে, বীরভূমে গানগুলি কীর্তনেব সুর দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে, অন্যত্রও কীর্তনের সুর দ্বারা প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও লৌকিক সুরের প্রাধান্য রক্ষিত হইয়াছে। নিম্নে কতকগুলি ভণিতাযুক্ত ঝুমুর উদ্ধৃত করা হইল। এখানে উল্লেখযোগ্য, ইহাদের প্রত্যেকটিই নিরক্ষর গায়কদিগের নিকট হইতে মৌখিক সংগৃহীত, যে অঞ্চল হইতে ইহাবা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদেব নাম পার্শ্বে উল্লেখিত হইল।

১

প্রভাতের কালে গেছিলাম জলে
অপরূপ হেরি কদম্ব মূলে,
সেদিন হতে মন হ'ল উচাটন
পরাণ রাখা বুঝি দায় হ'ল।
যাও জল লিতে তারে বল ॥

আমার অন্তরে কেন জ্বালা দিল।
যাও জল লিতে তারে বল ॥
তবে সে কাল বরণ হেরি না কখন
কাল হেরে আমার কাল হ'ল ॥
কুটীল ও জুটীল সদাতে জ্বালা কলঙ্কিনী ব্রজের নাম হল।
আমার অন্তরে কেন জ্বালা দিল।
সব নারীর বেদন জানে না যে জন,
তার সঙ্গে প্রেম করা নয় ভাল
রাখিয়া কিমতি কি জানে পিরীতি নারী সে অবলা যাতে পাই।
তবে ওই বাঁশী তারে ভুলাইতে পারে রজনী কিবা যায় গো
ভবপিতা বলে মোহরি বাণী না পাইতে আমি পায় গো।
—অযোধ্যা (পুরুলিয়া)

মোরে চোর বল কি জঞ্জাল—
সিঁদ কাঠি নয় রূপসী, করেতে মোহন বাঁশী,
ঐ যে রাধা নামে সাধা সদা কাল গো।
পূজেছিলাম ভগবতী, তুমাবি প্রসাদে দূতী।
তাই সিঁদুর মাখা ভাল গো।
করিতে দেবী পূজন, করি কমল চয়ন,
কাঁটা দাগ হৃদয়ে বিশাল ,
দ্বিজ ভবপ্রীতা ভণে, খেলি হৃদি বৃন্দাবনে,
রাধার সনে ত্রিভঙ্গ রাখাল গো ॥ —বাঁকুড়া

রাখো মোরে বিনোদিনী, তুমার ধরি দুটি রাঙ্গা পায় রে
তব প্রেম আশা করি, রাখালের বেশ ধরি,
আমি রয়েছি হেথায় রে।
দেখ করে বাঁশী, থাকি দিবানিশি তোমারি গুণ গাইরে

যদি মোরে না হেরিবে, অধরেতে না ধরিবে,
ঝাঁপ দিব যমুনায় রে।
ভবপ্রীতা ভণে ঐ চরণ বিনে সকলি অনুপায় রে ॥ —বাঁকুড়া

৪

যেমন হ্রদে হলাহল, যেমতি আকুল মাতি মীনগণ
যুবতি জীবন তেমনি উঠিল মাতিয়া।
ও সেই বিনা কালিয়ারে দেখিয়া
ধরম করম ভরম শরম
সাশিল সেই বাঁশিয়া অধম
দগধল সেই দহিতেছে প্রেম আঁখিয়া।
পরশ লাগিয়া তরসে উরস
বিনাশ্যাম ধন রস লাগিয়া
পিতা সুত যার রথ ধ্বজে যায়
সেই সদা প্রাণ দহে গো আমার নিকটে না হেরি তায়।
তিলেক বিলম্ব প্রাণে নাহি সয়
শ্যাম অদর্শনে মরিয়া নিশ্চয়ই মনে হয় যাই উড়িয়া,
ভবপ্রীতার মতি সচঞ্চল অতি মাধব দর্শন লাগিয়া। —বাঁকুড়া

ভবপ্রীতার এই ভণিতা সত্ত্বেও ইহার মধ্যে যে ভক্তির ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নহে। বৈষ্ণব পদাবলীর অনুসরণ করিয়া এই ভাবে ভণিতা ব্যবহার করা একটা মাত্র রীতিতে তখন পযবসিত হইয়াছিল।

৫

বৃন্দাবনে বাঁশী বাজিল সঘনে গো নব বৃন্দাবনে।
রাধা রাধা নাম ধরে', বাজে বাঁশী প্রেমভরে,
ফুলশরে হিয়া বিঁধিল মদনে।
আমায় কী করিবে কুললাজে, যদি পাই রসরাজে
একবার হৃদি মাঝে ধরিব আদরে,
এবার ধরিব যতনে,
ভাবে দ্বিজ ভবপ্রীতা কহে রাধা প্রেমভীতা, সঙ্গে চল ও ললিতা,
ভবপ্রীতা পাবে সে নীলরতনে ॥ —বাঁকুড়া

৬

আঁখি ঠারি ভাঙ্গল না মান, ভাঙ্গল না মৃদু হাসিতে,
মোহন তানে বাজায় বাঁশী নারিলে মান নাশিতে।
আমরা শুনে মরি হাসিতে,
বাঁশীতে যা হবার নয় তা হবে কি তা কাশীতে।
সঙ্গে যেতে পারি তুমার যদি রাখ সেবা দাসীতে।
এবার ভবপ্রীতায় রাখো হরি সংসার অনল-রাশিতে। —বাঁকুড়া

৭

যাওহে ফিরে, সে সুখ মন্দিরে,
আমরা ললনা, জানিনা ছলনা, দিওনা যাতনা,
অবলা কামিনীরে।
তুমারি বিহনে, ভাসিছে আঁখিনীরে,
বাধা অভিমানে
যাও হে মানে মানে
ভবপ্রীতা ভণে, শ্যাম, ভয় কি সখিরে
যাওহে ফিরে, সে সুখ মন্দিরে॥ —বাঁকুড়া

নিম্নোদ্ধৃত পদটিতে যে সকল লৌকিক উপমা ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহাতেই বৈষ্ণবী ভক্তির নিবিড়তা লাঘব হইয়াছে, এই সকল ঝুমুর গানে বৈষ্ণব পদাবলীর সুকঠিন আদর্শ লৌকিক স্তরে অবনমিত হইয়াছে। তাহার ফলে বৈষ্ণব পদাবলীর ধারা লুপ্ত হইয়া গেলেও লোকায়ত সমাজে ইহাদের অস্তিত্ব বিপর্যস্ত হইতে পারে নাই।

৮

এই না কদমের কলি, মিছে কর ভালাভালি,
কচি কদম, জালি কদম, কচিতে হাত দিওনা।
বঁধু ছুঁও না এখন।
পশকলে কদম, যার যত মন, করব্যনা বারণ।
আমার শাশুড়ী ননদ ঘরে আছে,
দুয়ারে ভাসুর আছে, আঙ্গিনায় কুটিলা,
গুমরি গুমরি মরি কিছু না দেখি উপায়।

পায়ে পড়ি বিনয় করি বাজায়োনা শ্যামের বাঁশরী বলি হে তুমায়।
যদি বাঁশী না বাজায়ো কলঙ্ক হয়্যে যায়।
এই না কদমের কলি, মিছে কর ভালাভালি,
সজন রসিক যারা, কচিতে হাত দেয় না তারা,
ভবপ্রীতা ভণে ধনী চলিলা ত্বরায়। —বাঁকুড়া

৯

একদিন নারায়ণ প্রেমেতে আকুল মন, শ্রীমতির বদন নিরখি,
আদরে বসায় কোলে চিবুক ধরিয়ে বলে কোনো কথায় ছলছল আঁখি।
বিধুমুখী বিমুখ হয়ো না প্রাণ সখি॥
আমি ভব খেলা খেলিবারে জন্ম নিলাম এ সংসারে
অপরের ধার নাহি রাখি,
ওগো একমাত্র তুমি মোর ধরেছি হৃদয়-পিঞ্জর
রেখেছিলাম যেমন পোষা পাখি।
আমি কেন অকারণ বনে করি বিচরণ
রাধাকে পাইবার জন্য বৃন্দাবনে অবতীর্ণ
রাখালের বেশ ধরে থাকি।
তব নামে বাঁশি সাধা বাঁশি বলে রাধা রাধা
চূড়া পরে থাকি,
বিধুমুখী, বিমুখ হয়ো না প্রাণসখি॥
শ্রীদামের অভিশাপ মনে লাগে মনস্তাপ
আর কতদিন আছে গো বাকি,
কেঁদে কেঁদে কহে রাই ভবপ্রিতা আনন্দে গাই,
হরিপদরজঃ অঙ্গে মাখি। —বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

ভবপ্রীতা ওঝা ব্যতীতও অসংখ্য কবির ভণিতাযুক্ত সহস্র সহস্র পদ এই অঞ্চলের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে। মাঠে ঘাটে উৎসবে পার্বণে নিরক্ষর গায়কেরা এই সকল পদ বৎসরের যে কোন সময়ই গাহিয়া থাকে। কোন ভক্ত বৈষ্ণবের কণ্ঠে শ্রীপাটে আখড়ায় যে এই সকল গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে, সাধারণ কৃষক, গৃহস্থ, ব্যবসায়ী নর্তকী ইহারাই এই সকল গান গাহিয়া থাকে।

সাধারণতঃ ব্যবসায়ী নর্তকী ব্যতীত অন্য কোন গৃহস্থ রমণী এই সকল গান গাহে না, পুরুষেরাই এই শ্রেণীর গানের পৃষ্ঠপোষক।

ভবপ্রীতা ব্যতীত আরও কয়েকজন কবির ভণিতাযুক্ত পদ এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। নিম্নোদ্ধৃত পদটিতে দীন নরোত্তমা নামক একজন কবির ভণিতা দেখা যায়।

১০

হায় বিধি কি করিলে
জনম জনম কাঁদালে কোল দিলে বুকেতে আমার
কোল দিলে বুকেতে আমার—ধনিরে আমার।
হায় রে, মরি হায় রে হায়॥
চিরদিন রইব বলে ওগো সত্য করাইলে
নিজে তুমি গো করিলে অঙ্গীকার,
ধনিরে না হলে আমার।
বল তুমি কেমনে
দিবানিশি কালের বনে সে কি মনে, না পড়ে তোমার।
ধনিরে না হলে আমার॥
দীন নরোত্তমা বলে একি তুমার,
কি কারণে ত্যাজিলে গো—কর পরিমাণ
ধনিরে না হইলে আমার॥ —অযোধ্যা (পুরুলিয়া)

১১

শুন হে লম্পট নিষ্ঠুর শ্যাম
নিতান্ত কি মোর হলি বাম।
কে জানে বঁধু হবি এমন,
জানিলে কি মজিতেম প্রেমে তোমার সঙ্গে।
ভালবাসা দিয়ে আপন করিলে
এখন মারিলে গলেতে ছুরি।
কে জানে বঁধু হবে এমন,
নরোত্তমা বলে দুখের কাহিনী
নাহি রোচে মোর ভোজন-পানি। —ঐ

১২

শুন কাল সোনা লম্পটের এই গোরা রাধে,
বাঁশীর স্বরেতে হারাস না কুল
সামাল গো ধনি হ'স না বাউল।
শুন গো ললিতে বলিছে রাজস্থতে রাধে,
যমুনারই কুলে যাস্ নে তুই,
সামলি গো ধনি হ'স না বাউল।
নরোত্তমা ভণে থাক্‌বি গো সাবধানে রাধে ॥ —ঐ

১৩

নারীর দুরন্ত মতি, আর মনোমত পেলে পতি,
কোথাকে না যায়গো রীতি নারীর থাকিতে জীবন।
নারী না হয় আপন, কত করিলে যতন, নারী না হয় আপন।
নারী বলে কুলবালা, তারা জানে কত লীলাছলা,
নারীর অন্ত পায় না যেন নিজে নারায়ণ।
সিন্ধু উপসিন্ধু ছিল, তারা ভাই এ ভাই এ বাদ সাধিল,
নারীর জন্যেতে তারা ত্যেজিল জীবন,
নারী না হয় আপন।
দ্বিজ নরোত্তমা বলে, ভুলনা কেউ মায়া জালে,
ইকুল উকুল দুইকুল যাবে শেষে হারাবে জীবন। —বাঁকুড়া

১৪

ব্রজের জীবনধন গোপিকা মন রজতন,
এস হে মদনমোহন, দয়া কর মোরে রে।
হৃদয় মাঝারে শ্যামকে বাখিব আদরে হে,
দিয়ে বনফুলমালা—যতনে সাজাবে কালা।
ঘুচাইব মন জ্বালা, দুঃখ যাবে দূরে হে,
দিবানিশি নিরখিব, আর না তোমায় ছাড়িব,
থাক্ থাক্ প্রাণ বল্লভ বাঁধা প্রেম ডোরে হে।
দিয়ে তুলসীচন্দন, পূজব যুগল চরণ
নরোত্তমার এই নিবেদন জানাব তোমারে হে ॥ —পুরুলিয়া

নিম্নে দ্বিজ টিমা নামক একজন কবির ভণিতাযুক্ত কয়েকটি ঝুমুর উদ্ধৃত করা হইতেছে। দ্বিজ টিমার পূর্ণ নাম কিংবা কোন পরিচয় জানিতে পারি নাই, ইহা তাহার ছদ্ম নাম হইতে পারে। তাহার গানগুলি একটু বৈরাগ্যের সুরে বাঁধা।

১৫

যখন ডালিমে দেই মুকুল, সুগন্ধে ছুটে অলিকুল,
প্রস্ফুটিত হলে ফুল, অলি বসে মধুপানে,
নব নবীনে যৈবনে,
প্রবোধিলে প্রবোধ না মানে॥
যখন ডালিম ফুলের ডালি
তখন উড়্যে গেল অলি
হইলে ডাঁসা মনের আশা
পাকলে খায় রসিক জনে।
(নব নবীনে যৈবনে প্রবোধিলে)।
কচি ডালিম রসে ভরা
ডাসা ডালিম বসে ভরা
পাকলে ডালিম মধু ভরা
সবে খায় আড়াই দিনে।
ধন যৌবন আড়াই দিন, নাবা জন্মে পরাধীনে
দ্বিজ টিমা বলে পড়্যেছে জালে।
বল বাঁচবে কেমনে নব নবীনে॥ —পুরুলিয়া

১৬

যার আমি কবি ভরসা পেতেছিলাম ভালবাসা গো,
সে মিটাই নাই মনেব আশা
আশায় নৈরাশা তুমার
ভাই রে, দেখ নারে মন কে বা কার।
আকারে নৈরাকার দুদিন আলোসে আঁধার।
কেবলমাত্র আসা যাওয়া দু'দিনের পথ চাওয়া
মলয় পবন মিশে যাওয়া, যেমন জ্যোৎস্না অন্ধকার।

রং—ভাইরে দেখনরে মন কেবা কার।
ধন যৌবন আডাই দিন
দুচোখ মেলে সংসার চিন্
রবে না এমন চিরদিন গৌরব তুমার।
দ্বিজ টিমা বলে, পড়েছি ঘোর মায়াজালে,
ওহে প্রভু কৃপা করে তুমি তরাহ আমায়।
ভাইরে দেখনারে মন কেবা কার,
আকারে নৈরাকার মন, আলোসে আঁধার। —ঐ

১৭

না বুঝে করিলাম কাজ না ভাবিলাম আগে,
দেখে সরল প্রেম করিলাম কতই না সুযোগে।
ও শেল রইল যুগে যুগে।
আমি নারী কেঁদে মরি তুমারি বিরহে,
সরল গরল ভাবি কিবা অনুরাগে।
ও শেল রইল যুগে যুগে।
দুজনে করত প্রেম চিরদিনের সঙ্গে,
শুনে বাঁশী হলাম দোষী তোমারে যে লেগে,
ও শেল রইল যুগে যুগে।
কবে মিলাবে হরি অভাগার ভাগ্যে,
দ্বিজ টিমার আশা ঐ চরণ মাগে,
ও শেল রইল যুগে যুগে। —ঐ

১৮

বিনোদসিংহ নামক একজন কবির ভণিতাযুক্তও বহু পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

তুমি আমার অপরাধ ভাঙিল তুমার গো।
অবলারি মন রাখে মুখের কথায় পিয়াস লাগে মোকে।
তবে আমার অভাগিনী ঘুমুটা না দেয় গো;
শত ছলে মন রাখে, মন আশা ছাড়ি গো,

গরম পিয়াস লাগায় মোকে
ভুলিতে না পারি গো তুমারে।
বিনোন্দ সিংহ বলে, ঝুমুরি বনাই বলে,
কত প্রাণে মারিল আমারে, ভুলিতে না পারি তুমারে।

—অযোধ্যা (ঐ)

১৯

অবলার প্রাণে যেমন বধে গো ভুলিতে না পারি তুমারে।
তুমি আমার গুণমণি
তুমি আমাব সোহাগিনী
তুমি আমার কর্ণেতে কুণ্ডল গো।
ভুলিতে না পাবি তুমাবে॥
তবে লোকের বাদী লোকে বলে,
গতর চলে কথা বলে—ট্যের। সীতা,
মাগিল বনকে বাসে ভুলিতে না পারি।
তবু তুমায় না পারি জানাতে॥
বিনোন্দ সিংহ বলে ঝুমুরি বনাইব বলে,
শত ছলে ডুবালে ধন আমারে।
ভুলিতে না পারি তুমারে॥

—ঐ

বিনোদ সিংহের পদগুলির অর্থ সর্বদা খুব স্পষ্ট নহে, ইহাব কারণ, সম্ভবতঃ তিনি বাঙ্গালী নহেন, বাংলা ঝুমুবের অনুকরণে পদগুলি রচনা করিয়াছেন, অনুকরণ করিবার ফলেই ভাব সুস্পষ্ট এবং শব্দ ব্যবহার নির্ভুল হইতে পারে নাই। এই কথা পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলেব অনেক কবি সম্পর্কেই বলা যায়। তারপর নিরক্ষর গায়কদিগের মুখ হইতে গানগুলি সংগৃহীত হইবার ফলে অনেক সময় তাহারাও ইহাদের নির্ভুল অর্থ নির্দেশ দিতে পারে নাই।

২০

শুন হে কাল শশী,
কি জন্যে বাজাও বাঁশী বে—অবলারে,
আমায় দিতে এলে জ্বালারে—অবলারে,
ওরে মরি হায় হায় রে—অবলারে,

তুমার প্রেমে হব সুখী
তুমার হয়েছি দাসী—অবলারে,
আমায় দিতে এলে জ্বালা
তোমার দ্বিগুণ জলে
তোমার হয়েছি বামে—অবলারে,
বিনোন্দিয়া সঙ্গে মেলে
আমার জীবন যায় গো। —ঐ

২১

কোন হো বলে কে, পাকল বাঁশরে,
কোন হো ছোকরা ধেনুকাব যে,
নন্দন বনে কে
পাকল বাঁশরে
শিশু ছোকরা ধেনুকাব যে।
নন্দন বনকে
পাকল বাঁশবে
শিশু ছোকরা ধেনুকার যে
বিনোন্দ সিংহ বলে ঝুমুব বনাইলো গো।
শিশু ছোকরা ধেনুকার যে ॥ —অযোধ্যা (ঐ)

২২

কালিয়া বরণ জিনি নবঘন দাঁড়িয়ে কদম্ব তলায়
ঐ শুন কত রঙ্গে বংশী বাজায়।
কটিতে পীত ধড়া, শিরে মোহন চূড়া
গলে দোলে বন ফুলের হার।
কাঁখে কলসি করি যাই মোরা ধীরি ধীরি
বিনদিয়া দরশন পায় গো ॥ —ঐ

২৩

রজনী হৈল ভোর কোকিলা করত সোর
শবদে উঠিল রাই কিশোরী
ডাকে বৃন্দে নাম ধরি—

সুচিত্রা চম্পক লতা শুনোলো মরম কথা
ডেকে আন ললিতা সুন্দরী।
দীন বিনোদিয়া বলে চলো যাব দধি ছলে
ভেটিবারে শ্রীকৃষ্ণ মুরারি। —ঐ

আরও কয়েকজন বিভিন্ন কবির পদ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

২৪

রাই রূপ হেরি সুবল অঙ্গে নীলাম্বর গো,
কঙ্ক পঙ্কজ ভুজ পরে, ঢলু ঢলু প্রেম করে—।
পায়েতে নূপুরো শোভে সুমধুর স্বর গো,
ব্রজগোপীর চরণ সুন্দর,—
আকাশেতে চাঁদ শোভে পা নিয়ে শেয়াল গো
গৌরাঙ্গিয়া রহল দাঁড়ায়ে। —অযোধ্যা (ঐ)

২৫

যার অঙ্গের বসন, পরশে হরষ মন দরশনে নয়ন জুড়ায়,
বল তারে কি পাওয়া যায়,
রং—দিবানিশি জাগিছে হিয়ায়॥
লোকে বলে ভুল' তারে
হায়, আমি কি ভুলিব তারে
সে ভুলে তো ক্ষতি নাহি তার—
বল কি হবে পরের কথায়।
রং—দিবানিশি জাগিছে হিয়ায়॥
যাহার অভাব তিলে, সহিতে পারিকি ভুলে
প্রতি অর্থে সন্তাপ বাড়ায়,
মনে হয় ডুবি দরিয়ায়॥
রং—দিবানিশি জাগিছে হিয়ায়।
যে তারে ভুলিতে কহে সেজন সুহৃদ নহে,
সে চাহে নাশিতে মোর কায়।
রামকৃষ্ণ হেন জনে না চায়।
দিবানিশি জাগিছে হিয়ায়॥ —ঐ

২৬

আমি যাই রে যমুনার জলে
দেখা হলো কদল তলে
মবি ওগো আমার সেই চিকণ কালা।
একুল ওকুল ওই কালা চাঁদ ভব কুলের ভেলা,
গৃহে আমার মন মানে না বিনে কদম তলা॥
শিরে শিখিপুচ্ছ চডা তায় সভে গুঞ্জ বেডা,
ওগো সখি তাই কি বামে হেলা।
বঙ্কিম নয়ন শরে আমার মরণে বিঁধিলা॥
হানিয়া কটাক্ষ বাণ নিল আমার কুলমান
আমি কি করি অবলা।
মজাইল অবলার মন পরাইল ফুল মালা॥
ভণে বামা অতি দীনে আমাব কি হবে গো কুলমানে
আমি পাই যদি সেই কালা।
আমার একুল ওকূলের কালাচাঁদ ভব কূলের ভেলা॥
—বাঁশপাহাডী (মেদিনীপুর)

২৭

শুন গো বৃন্দে বলি তোরে যে জ্বালা দিয়েছে মোরে
ছেডে গেছে আমাব সেই কমল আঁখি।
এ'দুখ আমি বলব কারে আমি নিবারিয়ে থাকি।
প্রেম কবে দুখ দিবে বলে
আমি জানি না গো সখি॥
একে নারী কুলবালা, তাথে যৌবন জ্বালা,
বড খেদ আমাৰ উঠে থাকি থাকি।
বিধাতা করেছে যেমন পিঞ্জৰার পাখী॥
দারুণ বিরহানলে দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
তিলেক নিবারণ হয় না সখি।
তুঁষের অনল যেমন আমার জ্বলে ধিকি ধিকি॥

ভণে বামা অতিদীনে, আগে তে জানিলে মনে,
অমন প্রেম আর কে করতো রে সখি।
পরাইয়ে প্রেম ফুলের মালা কালা দিয়ে গেল ফাঁকি ॥ —ঐ

২৮

বাঁকা কেন বাঁকা ভাবে দাঁড়ালি তুই বল্ হে,
আমার ঘুচাও ব্যথা কও না কথা,
আমার পরাণ বিকল হে।
আমি শুনিয়ে তোর বাঁশী
কুলনাশি তাই ছুটে আসি
আমি কাঁদব কত দিবানিশি পরাণ বিকল হে।
বাঁকারে তোর সকল বাঁকা বাঁকা স্বভাব অঙ্গ বাঁকা
চাউনি বাঁকা চলন বাঁকা কথায় কথায় ছল হে।
আমি বল্যে কয়্যে রাই রাজাকে, বাঁকা সোজা করব তোকে
গোরা পাগলের যা ভাগ্যে থাকে, দেখ্‌ব হে চঞ্চল হে ॥ —বাঁকুড়া

২৯

না হলে গোপী অনুগা কে পায় নন্দ নন্দনে,
থাকতে বিধি গুণনিধি কে পেয়েছে কোন্‌খানে
গোপী অনুগত বিনে পায় কি ব্রজেন্দ্র নন্দনে,
আশ্রয় নিলে ঐ চরণে মিল্‌বে শ্যাম নবঘনে।
তিনি কান্তা কান্ত আমি
আমি দাসী সে মোর স্বামী,
যে হয় গোপী অনুগামী সে পায় নন্দ নন্দনে ॥
মনমথের মনোমত নবীন মদন সাক্ষাত
বৃন্দাবন প্রেম অপ্রাকৃত প্রাকৃত নাই সেখানে।
সেথা নাই ঐশ্বর্যের গন্ধ, মাধুর্য পুর নিত্যানন্দ
রত্নাসনে প্রাণ গোবিন্দ, পাগল অন্ধ হেরে নে ॥ —বাঁকুড়া

৩০

মনের হরিষে কুঞ্জ করিলাম সাজন।
প্রাণনাথ বিনে সখি রে কুঞ্জ গেল অকারণ ॥

হায় রে দারুণ বিধি কি দুখ ঘটালি,
সুখের বাসনা নিশি পুরাতে না দিলি।
সারা নিশি গত হল চেয়ে দেখগো ললিতে ভানুর উদয়।
দেখ গো বৃন্দে দূতী আমার নাগর কুঞ্জে এল,
কালাকে দেখিয়ে অনল আমার দ্বিগুণ জ্বলে গেল ॥
শ্যামের অঙ্গ হেরি বিবর্ণ
বসন ভূষণ ছিন্ন ভিন্ন নখাঘাত আছে বক্ষ পবে।
অরুণ উদয় আঁখি মলিন বসন দেখি
আজ নিশি ছিলে কার কুঞ্জেতে।
শুধাও দেখি বৃন্দে দূতী
নাগব আমার কাৰ কুঞ্জে ছিল।
বসন খুলিয়ে ফেল চক্ষু পরিপূর্ণ জল
কেঁদে কমলিনী বলে,
সারা নিশি গত করি, প্রভাতে আইলে হরি,
জ্বালা দিতে বমণী মণ্ডলে।
কালো জল না খাইব কালো বসন না পরিব কালা চাঁদের মুখ না হেরিব
কাল সখী যত আছ এ'সনা আমাব কাছ কালো বরণ আর হেরব না নয়নে
চরণ বলে কালায় তেজ্য দিয়ে গৃহে কি ধন নিয়ে থাকবি গো রাই বল ॥
—বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুৰ)

৩১

সখিরা ডাকিয়ে রাইয়ে এই কথা তোবে শুধাইয়ে,
কালবরণ না হেরিব যদি তবে কাজল পর কেন,
রইতে নার গরব কর ॥
ধনি মান কর গো কেন ?
গুমরে গুমরে মর মনেব কথা বলতে নার,
চাঁচর কেশ বইছে মদন বানে।
পরম ঈশ্বর হরিকে ধরালি চরণে।
রইতে নার গবব কর……॥

হীন চরণের বাণী শুন গো রাই কমলিনী
শ্যামকে এবার আমি খুঁজব বনে বনে।
শ্যামের সঙ্গে দেখা পেলে ধরবি চরণে।
রইতে নার গবব কর ॥ —ঐ

৩২

কেমনে যাইব জলে গো সখি কেমনে যাইব জলে।
কালিয়া কুটির করে কত ছল দাঁড়ায়ে যমুনার কুলে সখি
কেমনে যাইব জলে ॥
নাম ধরে সদা বাজায় গো বাঁশী
বাঁশীর স্বরেতে নাম নিল আকুষি সখি গৃহ কর্ম যায় ভুলি
ননদের গঞ্জনা সহিতে পারি না, কান্দিতে বসি রান্নাশালে।
কেমনে যাইব জলে ॥
আহা কালিয়া করে কত ছল দাঁড়ায়ে যমুনার কুলে সখি,
কেমনে যাইব জলে।
দুযোধন বলে যমুনার তলে আচল ধরিয়ে টানে সখি।
কেমনে যাইব জলে। —অযোধ্যা (পুরুলিয়া)

৩৩

পথ মাঝে নট সাজে সখি দাঁড়ায়ে বা কে গো।
কে কে কালো পাবা বাঁশী ধবা কে গো।
মুখ ভরা হাসিটি গলে মালা দোলে গো।
লে লে তুলে লে
সখি পরানে দোলে গো,
সখি পরানে দোলে গো,
ভনে গঙ্গাধর বলে লাজে কি আছে গো।
ছি ছি লাজে মরি আঁখি ঠারিছে গো ॥ —ঐ

৩৪

ধরি ধরি মোর নাম বাজে বাঁশী অবিরাম
বল সখি, রা দিব কি না দিব, প্রাণসখি।

উম্বরেতে সরে জল, নিভিল জ্বালা অনল
বল বল রাঁধিব কি কাঁদিব, প্রাণসখি।
ভণে দীন গঙ্গাধরে, বাঁশরী পাগল করে সখি গো
বল বল কাঁদিব না সাধিব, প্রাণসখি। —ঐ

৩৫

এতো যদি ছিল মনে আগে না বলিলে কেনে হে,
যা যথা যাবে কিন্তুক্ বঁধু পরে মজো না রে ,
যাতনা দিওনা জ্বালা সইতে পারি না ॥
দুখ দিলি সই হৃদয় মাঝে সইতে নারি এ জীবনে গো।
হেন রাজেনের বাণী, পিরীতি শিখালে ধনী গো।
যা যথা যাবে কিন্তুক পরে মজো না রে,
সইতে পারি না ॥ —ঐ

৩৬

প্রিয় আসিবে বলে চলে গেল কেন নাগর গো আমার না আইল।
ও যে মনের আগুন জলছে দ্বিগুণ কার কাছে নিভাই ॥
প্রেম শরে গো যেমন দহিছে হিয়া ফুল শরে গো যেমন বিধিছে হিয়া।
ও ললিতা ও বিশাখা
শুন গো তোরা একটি কথা
আমার শ্যামকে আনিতে তোরা যাগো মথুর্যা।
যে কথাটি বলবি গোপনে মথুরাতে গো যেমন কেউ না জানে।
আমার শ্যামকে লুকায়েছ কুটিল কুবুজা।
থাকি থাকি পড়ে মনে রইতে নারি গো যেমন বৃন্দাবনে।
যেমন বলরাম ভণে বৃন্দাবনে কাঁদাস না রাধা। —ঐ

৩৭

যবে হরি মথুরা পুরি গেল দুখ দহে তনু তাপিত হে,
সব সুখে গেলায় দূরে।
এস বিরহিণী শ্যাম সোহাগিনী
গুণি গুণি তনু ছাড়ে গো।
আজ মোর না নাগর মনে পড়ে ॥

হেরল সজনি বচন যার
কুঞ্জে কি নাগর আসিবে আর মঙ্গল নটবরে।
তবে তার আমে বামে জিটাও গোঠেল
উরুত বসিয়ে বাঁধিতাম কেশ।
নিশা পাপিনীর তরে,
গাহত রঘুনাথ নাটনীর প্রতি চাহত ধারে রে।

—অযোধ্যা (ঐ)

৩৮

ও চাঁদ গৌর নিতাই যেচে যেচে যায়, নাম লিবি কে আয়।
এমন দয়াল আর দেখি নাই কলি জীবের তরে রে,
নিতাই বলেন হরিবোল, কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিনামুল্যে এ নাম নিয়ে যারে॥
জগাই মাধাই যারা অশেষ পাপ ভরা কলসী কানা মারে রে
বলেন মারলি ত মার হরি বল একবার সকল জ্বালা দূরে যাবে রে॥
ভাবে গদ গদ পড়েন ঢুলিয়া নয়নেতে ধারা বহে রে
ক্ষেপা বলে হায় নাম নিলি নাই বিফলেতে জন্ম গেল রে॥ —পুরুলিয়া

৩৯

শুন বলি বাঁকা শ্যাম বিধির মতে পতি বাম হে,
নলীন তেজিয়ে ভ্রমর কিংশুক মজে দহে।
রায়ের এখন বাঁশীর ফুলে মধু ফুরায়েছে।
চিরদিন যায় না সমান
বেদপুরাণে আছে প্রমাণ হে।
কর্ম অনুসারে ফল বিধির বিধান রয়েছে,
বঁধু হে···আর কি সেদিন আছে।
শুভদিন ছিল যখন
রাধার কণ্ঠে মাণিক ছিল তখন
ফেলিয়ে বিপদে কুঞ্জের চাদের
কালো মাণিক ডুবেছে।
বঁধু আর কি সেদিন আছে।

কালো মাণিক আনিবারে
রায় পাঠালো মধুপুরে
মিলে কি না মিলে মাণিক
পামর যাহা ভাবিছে। —অযোধ্যা (ঐ)

৪০

এক গাছে ছয় ফুল কোন ফুলেতে যায় গো,
কোন যে তিতা, কোন যে মিঠা, পদ্ম ফুলে বঁধু ভরা রে।
ইহার অন্ত না মিলে তপ্ত পদ্ম ফুলে মধু ভরা রে ॥
অনন্ত বলেন মায়া, অন্তে না মিলে কায়া,
সকালে বলে গো কোকিল,
নাম ধরে রাধা শুন হে বনমালী
একথাটি তরে বলি।

৪১

তোমার লাজ নাই হে খেঁয়োছ লাজের মাথা হে,
যাও নাগর নিশি ছিলে যথা।
সারা নিশি ভেয়্যে ভেয়্যে নয়ন গেল ভেল্যে ভেল্যে
কোথা নিশি করিয়ে শেষ কেন এলে হেথা।
মন ভাঙ্গিলে ভাঙ্গে কাঁসা, ফুরাল্য চাতকীর আশা
খসিলে কি জোড়ে বৃক্ষের পাতা। (যাও নাগর)
ছিন্ন ভিন্ন অঙ্গেরি বেশ,
আহামরি সেজ্যেছে বেশ
কোথায় নিশি করিয়ে শেষ, এসেছ হে হেথা।
যাও নাগর, নিশি ছিলে যথা
ঘনু বলে ঐ চরণ বিনে জনম গেল বৃথা।
যাও নাগর নিশি ছিলে যথা। —বাঁকুড়া

৪২

কোথায় হে নিঠুর কালিয়া কেন রইলে মোরে ভুলিয়া।
আসিব বলে আশা দিয়ে গেল যে আশাতে রইলাম বসিয়া,
চাতকিনীর মত হেরিয়াছি পথ দিবস রজনী কাঁদিয়া ॥

নারীর জনম বৃথাই জীবন দুখ সুখ সিন্ধ বাঁধিয়া,
একে অভাগিনী পডি বিরহিণী পাষাণ হল্যো যেত গলিয়া॥
বিধু হাতে দিয়ে ওহে প্রাণ বঁধু কত ছলে প্রেম করিয়া
ছুটু হায় বলে এমনি করিয়া দিলে তুষের আগুন জ্বালিয়া॥

—নিমডি (সিংভূম)

৪৩

ঘরেতে ঘর করে রে মন আজি কোন ছুতারে গেল গড়ে,
আমি দেখিনা এ সংসারে॥
এম্নি ছুতারের অনুমান ঘরে রাখিছে টান,
স্বর্গ মর্ত ছিলিবে ভুবন ঐ ঘরে একটি গিরা
ধরা আছে তে তালার উপরে রে মন॥
যার আছে বত্রিশ কোঠা বিষয় কে রেখেছে আটা,
মন কপাট দুয়ারে ঐ ঘরে কুলুপ দিয়া শূন্যে গেছে চুরি॥
হেন বিরূপায় গায় এমন কভু দেখি না ভাই,
ভাবত ভিতরে।
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম ঘরের একই দিকে ছাঁচা॥

—বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

৪৪

যাইযে যমুনার জলে
গেছিলাম মাধবী তলে,
ও ফুল তুলিবারে চায় রে।
কৃষ্ণকাল ভুজাঙ্গিনী আমার দংশিল হিয়ায় রে।
কাল বিষে জরজর তনু পাছে প্রাণ যায় রে॥
শোন গো বৃন্দে সহচরী, যদি না মিলাবে হরি
আমি রইলেছি সবায় রে।
না মিলাইলে দশম দশা আমার ঘটিবে হিয়ায় রে।
বৈরজ মন্ত্রেতে ঝাডি তায় আবার বিষ দ্বিগুণ বাডে
আমি কি করি উপায় রে।
বাঁশির স্বরে চালান করে ও বিষ দ্বিগুণ করে তায় রে।

যে সাপে দংশন করে সেই সাপে চোষণ করে
হলা হলি মিটে যায় রে।
অধীন চৈতনায় ভণে, আমার প্রাণ বাঁচা দায় রে। —ঐ

৪৫

শোন রে স্থবল বলিরে বাণী,
কদম্ব তলাতে গেছিলাম আমি, বেলা অবসান কালে রে।
এক ব্রজের নারী কক্ষেতে গাগরী তার সনে হইল দেখা রে।
কে বটে ঐ ধ্বনি, স্থবল সখা ব'লে দেনা আমারে॥
চাঁচর চিকুর বেঁধেছে বেণী, তায় দিয়ে কত চাঁপার কলি
ঝুড়ি ঝুম্ব পিঠে পড়ে রে।
তার রূপের সীমা কি দিব উপমা
যেমন মেঘেতে বিজ্জলি খেলে রে।
পায়েতে নূপুর মধুর সাড়া,
যেন কুঞ্জে করে কোটিতে বেড়া, নাসাতে বেসর দুলে রে।
আদার আতুর ঝিরি ঝিমঙ্কুর ভুরু ভুজঙ্গিনী ভাল রে।
শোন রে স্থবল বলি রে,
সাধ কিঞ্চিৎ বিলম্ব সহে না আমার দহে দেহ প্রেমানলে রে।
যদি মোরে চাও আনিয়ে মিলাও
হারাধন কাতারে বলে রে। —বাঁশপাহাড়ী (ঐ)

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ব্যাপিয়া যেভাবে রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া পশ্চিম ও পুর্ববাংলার নাগরিক সমাজের পৃষ্ঠপোষকতায় কবিওয়ালার সঙ্গীত রচিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল, সেই সময় হইতেই একই বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া একই ভঙ্গিতে বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ঝুমুর গান রচিত হইয়াছে। তবে কবিওয়ালার গান বিশেষ এক একটি ব্যবসায়ী কবিওয়ালার গানের সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিয়া কেবলমাত্র তাহাদের দ্বারাই প্রচারিত হইত, তাহা কদাচ লোক-সঙ্গীতের পর্যায়ে নামিয়া আসিতে পারে নাই, কিন্তু তাহার পরিবর্তে উহারা যেভাবেই রচিত হউক নিরক্ষর সমাজের মধ্যেও মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া লোক-সঙ্গীতের স্তরে নামিয়া আসিয়াছিল।

৪৬

শুন গো বৃন্দে, কই আমার প্রাণ গোবিন্দে
গোবিন্দ বিহনে প্রাণে মরি।
গত সারা নিশি, এল না গো কালশশী
আমি আর ধৈর্য ধরিতে নারি গো
আমার কই এল লম্পট হরি
তিলে না দেখিলে প্রাণে মরি গো।
ভাবি মনে মনে শ্যাম বঁধুয়ার সনে
সুখেতে বঞ্চিব এ শর্বরী।
জ্বালিয়ে মোমের বাতি গাঁথিয়ে মালতি
শ্যামের গলে দিব মনে করি।
কোকিলার কুহুস্বরে বিঁধিছে অন্তরে
ঝঙ্কারে ভ্রমরা ভ্রমরী।
অস্ত শশধর উদয় দিবাকর দেখ সখি পুর্বদিকে হেরি।
আসিবার আশে মনের হরিষে
আমোদিত কুঞ্জে বিহারী।
হইল অসময় আমার কই এল রসময়
তাই বানেশ্বর আছে পথ হেরি।

৪৭

অগ্রে বাঁশি মধ্যে ধেনু, ধন্য রে জনম বেণু,
মুলে জন্মিল কুমণ্ডল রে।
ও বাঁশি, মহিমা বুঝিতে নারি তোর রে॥
জগৎ মোহিলে হরি, তাথে মজাইলে প্যারী
তুমি বাঁশি আমার মনচোর রে।
পুর্বে পশুপতির হাতে, ত্রেতা যুগে রঘুনাথে
নিব্বংশে বধিল লঙ্কেশ্বর রে।
হেন সতুদাসে বলে বহু ত ভাবিতাম বনে
তুমি বাঁশি রাধার মনচোর রে।

নিম্নোক্ত ঝুমুর গানটি একজন মহিলা কবি ননীবালা কর্তৃক রচিত বলিয়া মনে হইতেছে—

৪৮

শ্বেত সরোজে রহ পড়ে কে কামিনী বীণা করে
ও ত্রিভঙ্গ রূপধারী হরি পিয়ারে।
ও শ্রীকৃষ্ণের মনমোহিনী ও ত্রিভঙ্গ রূপধারিণী॥
কপালে সিন্দুরের বিন্দু, মুখখানি সরোজ ইন্দু
কণ্ঠ কোকিল ভাষিণী,
মৃদু স্বরে রে দেব ঋষি তারা বন্দিনী।
ও ত্রিভঙ্গ রূপধারিণী॥
গলায় গজ মুক্তা হার কোটি চন্দ্র শোভা তার
শিরে মণিভূষণ,
ইশারাতে রে দেব ঋষি তারা বন্দিনী।
ও ত্রিভঙ্গ রূপধারিণী॥
রাম রম্ভা জিনি ভুরু ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু
পায়ে বাজে পঞ্জনি।
মুনিবালা রে মাগে রাঙা চরণ দু'খানি॥

—অযোধ্যা (পুরুলিয়া)

৪৯

ওহে নয়নের কাজল বয়ানে লেগেছে,
বদন নলিন মলিন হয়েছে। (২)
সিঁন্দুরের বিন্দু ললাটে শোভিলে
দ্বিজাঘাত কেবা করিল হে॥
আমি একি হেরি কালা
তোমারি ছিন্ন বনমালা,
হেরে হৃদে জ্বালা জ্বালিছে হে।
ঢুলু ঢুল আঁখি কেন কমল আঁখি,
হরি কি হর সাজিল হে।

একি নিরঞ্জন ঘাতকের চিহ্ন
শ্রীবৎস লাটন কে দিল হে,
মোদের শুনিতে বাসনা
হে পীতবসনা নীল বসন কোথায় পাইলে হে।
নখাঘাতে ক্ষত বক্ষস্থল তব
ধূসরে মলিন শ্রীঅঙ্গ মাধব,
দাস জ্যোতি বলে হেরি তাম্বুলের দাগ
সংযোগের বিয়োগ বাড়িল হে।
—বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

৫০

আছ সব ঘটে, কপটে, ত্রিকূটে অতি নিকটে
চোখে চাইনা তাই পাইনা তুমি মানসপটে।
ঘরের মানুষ পর করেছি, পরকে আপন ভেবেছি,
তাই তোমারে হারায়েছি, পুনঃ ফিরবে কি ঘটে ?
নিত্যদাস আজ তোমায় ভুলে পড়লাম রে মায়া জালে
এমনি ফাঁদ, সে ছাঁদ কি খুলে সেই পিছল ঘাটে।
নিত্যদাস আজ তোমায় ভুলে পড়লাম রে মায়াজালে। —বাঁকুড়া

এই গানটির মধ্যে গ্রাম্য কবির অনুপ্রাস রচনার পারিপাট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু এখানে অনুপ্রাস রচনা গ্রাম্য কবির পাণ্ডিত্যের ফল নহে বরং একদিক দিয়া যেমন কোন লিখিত সঙ্গীতের অনুকরণ, অন্যদিকে তেমন সহজ রসবোধের ফল বলিয়া মনে করাই সঙ্গত।

৫১

ওরে চম্পকের হার পরাইলি কেনে (সুবল)
মালা গেঁথে অন্য ফুলে কেন ভাই না দিলে গলে !
চাঁপা ফুলে হিয়া, জ্বলে যাতনা হয় প্রাণে
সুবল পরাইলি কেনে।
চম্পক বরণী রাধা উদয় হ'ল মনে ॥
বিনা প্রাণাধিকা সঙ্গ, জীবন লীলা হ'ল সাঙ্গ,
থর থর কাঁপে অঙ্গ অনঙ্গেরি বাণে।

উহু মরি মরি, ধৈরয ধরিতে নারি
তাহার বিচ্ছেদানলে।
বাঁচারে আমাকে রাধিকা দিয়ে এখন জুড়াবে অর্পিত হিয়ে
কিশোরী মিলন হলে।
দাস পীতাম্বর বাঁধছে নিরস্তব কালের কবল তরিবারে। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটি নীলকণ্ঠ নামক কোন কবির রচিত। কবি নিজের নামের অর্থের সঙ্গে সঙ্গীতের ভাবটিকে সহজভাবে জুড়িয়া দিয়াছেন। রাধা-কৃষ্ণ এই চিত্রটির মধ্যে গৌণ স্থান অধিকার করিয়া ইহাকে একটি সার্থক প্রেম-সঙ্গীতের রূপ দিয়াছে।

৫২

তবে কেন পরের জন্য প্রাণ কাঁদিছে—
পরকে আপন করব বল্যে দিয়েছিলাম হৃদয় খুলে,
হৃদ্ পিঞ্জরের পুষা পাখী, আমায় দিছে ফাঁকি
যাচ্ছ্যারে কালিয়াব বিষে উপরে মাখন মালিষে,
নীলকণ্ঠ বলে বাঁচবে কিসে, মগজে বিষ উঠ্যেছে। —ঐ

৫৩

রাধার প্রেম সায়ার, তাতে কে ডুব্যেছে,
পদ্মেরি ভিতর গন্ধেরি জনম তাহাব ভিতর মধু
তাহার ভিতর গভীর গম্ভীব উপরে শেওলা দল,
তাতে কে ডুব্যেছে।
পাকাআম্র ফল রসে টলমল চপাআঁটি তার কথা,
প্রেমের আস্বাদন পেয়েছে যে জন ভুলিতে কি পারে সে রাধা।
ঐ প্রেমের গাড়ু গলায় বাঁধা রয়,
হেন সন্তদাসে কয় প্রেমিক যে হয়,
সেই যে বেদনা জানে গো সেই সে মরম জানে গো॥ —বাঁকুড়া

৫৪

পাঁজর ঝাঁঝর হল, আঁখি জল ফুরাইল,
বুকভরা দুখ দিল, কি দোষে কালিয়া।

যে জরে পরাণ জরে, বাঁচিব কিসের জোরে,
শ্যাম যদি বাম হল্যো, বিরহে জালিয়া।
এবে কি উপায় বল, জরা হতে মরা ভালো
দীন উদয় ক্ষীণ হল্যো, নিরাশে গলিয়া॥ —বাঁকুড়া

৫৫

আমি কান থাকিতে হল্যাম কালা না শুনিলাম কালার বাঁশী,
নয়ন থাকিতে হল্যাম আঁধা না দেখিলাম কালোশশী।
রসনায় শ্রী নামসুধা, না সেবিলাম তিল আধা
বদন ভরি হল্যোনা মোর, হরি হরি হরি বলা।
ভবে এসে গৃহবাসে বন্দী হল্যাম মায়াপাশে,
ভাবলি নাকি হবে শেষে হেলাতে হারালি ভেলা।
হিংসা নিন্দা ভেদ ত্যজি আরোহী সত্য পথে,
কুসঙ্গ পরিহরি, চল সাধু বাক্য মতে।
দূরিতে চাও ত্রিতাপ জালা, শ্রীগুরু চরণ ধূলা
মেখে অঙ্গে গোরা পাগলা, চিন্তে সদা বনমালা।
আনন্দ বাজারে নিরানন্দ মনে, কাঁদেন বসুমতী কাতর বচনে।
সর্বস্থানে শোক বহ্নি জলে' উঠে জ্ঞানহীন নীলকণ্ঠ ভণে। —বাঁকুড়া

রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলার কাহিনীর সঙ্গে কোন কোন সময় বৈরাগ্যের সুরও মিশিয়া যায়—

৫৬

ভূষা কুটিতে নর, বিধ রলো হরিহর
অন্তকালে পন্থ ভুলি গেল,
ও হেরে নবজন্ম বিধি কাহে দেল।
মিলিল বাঘিনী সঙ্গে, সাপিনী দংশিল অঙ্গে,
বিষে সংসার ঘেরি লেল।
মাতাপিতা দূরে গেল্, দাসী প্যারী ভেল্
প্রভু সে কপট চিত ভেল।
দাস ব্রজরামে ভণে, হরির নাম সুধা বিনে
সংসারে মিছাই আল গেল। —পুরুলিয়া

পাগলার ভণিতায় অনেক ঝুমুর গান পাওয়া যায়, তাহাদের একটি এইরূপ—

৫৭

কে বটে কালিন্দী তটে কপট লম্পট কালা
আমার হরে' নিল মণ প্রাণ,
আমার চিরদিনের ঘুচ্‌ল জ্বালা।
আমি কী কুক্ষণে যমুনা গেলাম এক হয়ে আনিতে জল,
আঁখি ভরি' ঢেউ নিরিখি বিন্দুতে নীল কমল।
আমি তুলিতে নাবি কলসী, অকুল সায়বে ভাসি
আমার কুল হল্যোগো ভস্মরাশি আমি কেবল হল্যাম সারা।
আমার গৃহে বাদী ননদিনী, আমায মন্দ বলে অবিরত ,
আমার গঞ্জনায না যায় প্রাণ আমি হয়ে আছি জড়ীভূত।
এ ছার কুলে কালি দিযে, আমি কবে সেবিব বনমালী গিয়ে,
কবে যুগল নিরখিযে হবে পাগলা প্রেমে ভোরা॥ —বাঁকুড়া

নিম্নোদ্ধৃত গানটির কৃষ্ণদাস নামক কবির ভণিতা পাওয়া যায়—

৫৮

কহ কহ সখি প্রেম সিন্ধু-নদী তাহার কেমন জল গো,
তাহারো যে জল অতি সে গম্ভীর উপরে শেওলার দল গো।
হায় গো যে জন তায মজেছে রাধা প্রেম সাগরের মাঝে গো॥
জলের ভিতবে পদ্মেরই জনম পদ্মেরই ভিতরে স্থধা গো,
তার আস্বাদন পাইয়াছে যে জন মিটে গেছে ও তার আশা গো।
হায় গো, যে জন তায় মজেছে॥ —ঐ
এক্ক অম্ব ফল, রসে টল মল, ছাল আঁটি তার কষা গো॥
হায় গো যে জন তায় মজেছে
রাধা প্রেম সাগরের মাঝে গো,
কৃষ্টদাসে কয় লাখে লোক মিলে,
শুনে প্রাণে লাগে ধাঁধা গো।
বিনয় করি হবি, পাগুবাইতে নারি
গুরু পদে মন বাঁধা গো। —বাঁশপাহাড়ী (ঐ)

৫৯

শুন হে নাগর কালা, দিলি হে দারুণ জ্বালা,
জ্বালা দিলে ও ধন জলন্ত আগুন
কি বলব বঁধুআর গুণ ॥
কিসে নিবে ধন, প্রেমেরই আগুন
আঁজর ঝাঁমর হ'ল শুকিয়ে গেল নতুন যৌবন।
কি বলব বঁধুআর গুণ ॥
প্রেমেতে মত হয়ে জাতি-কুল সকলি গেল,
আর গেল ধন্ নতুন যৌবন।
হেন ভৈরবী বলে, পড়ি পররে চরণ তলে
একে আমায় দিলে, অভয় জীবন ॥

—অযোধ্যা (পুরুলিয়া)

এক প্রবল আর্যেতর সমাজের উপর আকস্মিকভাবে এই অঞ্চলে মধ্যযুগের বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব আসিয়া নিজের অধিকার স্থাপন করিয়াছিল। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ বীর হাম্বির বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পর হইতেই রাজ্যের প্রজাবর্গের উপর বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বিস্তারলাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মল্লরাজগণ এই অঞ্চলের প্রায় সর্বত্র বৈষ্ণব মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে সহায়তা করিতে লাগিলেন। মন্দিরে যে সকল রস ও লীলাকীর্তন হইত, স্থানীয় লোক-সঙ্গীতের উপর তাহাদের প্রভাব অনিবার্য হইয়া উঠিল। তাহার ফলেই রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক ঝুমুর গানের প্রেরণা এই সমাজের সর্বত্র বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

রাধাকৃষ্ণপ্রসঙ্গ ব্যতীতও ক্রমে নানা পৌরাণিক বিষয় লইয়াই এই শ্রেণীর ঝুমুর রচিত হইতে আরম্ভ করিল। বিষয় অনুযায়ীই ইহাদের নামকরণও হয়, যেমন কৃষ্ণলীলা ঝুমুর, রামলীলা ঝুমুর ইত্যাদি। মহাভারতের যে সকল অংশে কৃষ্ণোপাখ্যান প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, প্রধানতঃ ইহার সেই সকল অংশ লইয়াই ঝুমুর গান রচিত হয়, তাহাও কৃষ্ণলীলা ঝুমুর বলিয়াই পরিচিত। যে সকল ঝুমুর গানে কাহিনী প্রাধান্য লাভ করে, তাহা পাঁচালীর স্থরে গাওয়া হয়, যে সকল ঝুমুর ভাব-প্রধান রচনা তাহা লৌকিক স্থরে গাওয়া হয়, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে

কীর্তনাঙ্গ সুর তাহাতে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং বিষয় অনুযায়ী ইহাদের সুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে এ কথা সত্য লৌকিক সুরেব সীমা অতিক্রম করিয়া তাহা কদাচ রাগ সঙ্গীতের স্তরে পৌছাইতে পাবে।

ঝুমুবের বৃত্তান্ত এখানেই শেষ হয নাই। উপরে যে সকল ঝুমুর গানের উল্লেখ কবা গেল, তাহা ব্যতীতও আবও কযেক শ্রেণীর ঝুমুব এই অঞ্চলে প্রচলিত আছে, তাহাদেব অধিকাংশেব সঙ্গেই নৃত্য সংযুক্ত আছে, নৃত্যের নাম অনুসারেই সেই সকল ঝুমুরেব নাম হইযা থাকে, যেমন দাঁড়শালী ঝুমুৰ পাতানাচেব ঝুমুর, খেমটি নাচের ঝুমুব, কাঠি নাচের ঝুমুর, ছো-নাচের ঝুমুর, ভাদুরিয়া ঝুমুর ইত্যাদি। তাহাদেবও কিছু কিছু নিদর্শন নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

দাঁড়শালিয়া

প্রথমেই দাঁড়শালিযা ঝুমুবেব কথা উল্লেখ কবা যায। দাঁড়শাল এক প্রকাব নাচ, ইহা মূলতঃ এই অঞ্চলেব আদিবাসীবই নাচ ছিল, ক্রমে হিন্দুভাবাপন্ন জাতিও তাহা গ্রহণ কবিযাছে। কবম এবং অন্যান্য উৎসবে এই নৃত্যের অনুষ্ঠান হয। ইহা বর্তমানে প্রধানতঃ পুরুষদেবই নাচ। বিশেষ কোন উৎসবের সঙ্গে ইহাব সম্পর্ক নাই। মাদল এবং ধামসা বাদ্যের সঙ্গে যে কোন দিন অবসর সময়ে এই নৃত্য হয, ইহাব গানগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। আদিবাসী সঙ্গীতেব মৌলিকরূপ ইহাতে বিসর্জিত হয নাই। নিদর্শনগুলিই তাহাব প্রমাণ।

১

সাঁতাব দিছ ভবজলে,
দেখ দহেব মাছ না পডে ডাঙ্গালে। — পুরুলিযা

নিম্নের গানটিতে নদীযা শব্দেব অর্থ নদী, নবদ্বীপ নহে। গানগুলিব মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মেব কোন প্রভাব নাই।

২

সখিরে, কেমনে নদীয়ায় পাব হব,
ঝাঁপ দিয়ে ডুবিযে মরিব।
নদীতে পডিল বান, পার কর ভগবান
ভব নদী নামে পার হব।

যে করিবে নদী পার—তারে দিব গলার হার
আধা প্রাণ তাহারে সঁপিব। —ঐ

৩

বাড়ীর নামোয় যাত্যে যাত্যে টুরী বেঙ্গে টেকল,
ভাগছিল বলে ধনী ধর্মটুকু বাঁচল। —ঐ

৪

তল পাইয়া নাট খেল উপর পাইয়া লোক রে নাইরে—
ঝুমুর ঝুমুর যায় ভারনি ঘাট রে, হে নাইরে—
নৌকা যো যায় ভারানি ঘাট ॥ —সাহেবডিহি (অযোধ্যা)

৫

(ই) মু ধুইতে যাঁয়ে ছিলি পাথর বুইলে (ভুলে) বুইসে ছিলি,
(ই) কারছিম সামাইলো রাম লক্ষ্মণ ডুবিলো ॥ —ঐ

রাম-লক্ষ্মণ মুখ ধুতে গিয়া পাথর মনে করিয়া কচ্ছপের উপর বসিল। কিন্তু কচ্ছপ ডুবিয়া গেল, রাম-লক্ষ্মণও ডুবিয়া গেল।

অন্যপাঠ, মু ধুইতে যাইয়া ছিলি, পাথর বলে বসেছিলি,
কাচ্ছিম ছিল রামে লক্ষ্মণে ডুবিল ॥ —ঐ

৬

মাঝকুলিয়া কডা চট ভাই, একা যাইও না।
হাতে পুঁটি কানে কলম (ছোট ভাই)
একা যাইও না ॥ —মাতকুণ্ডি (পুরুলিয়া)

৭

ছোট মোটে ডুবিন বিটি, মোটে আইসে ন দাঁডা,
ভাবি হে মন জুড়ে,
ঘরে ঘরে লুগা আগে বুনি দে।
ভাবি হে মন জুড়ে ॥ —সাহেবডিহি (পুরুলিয়া)

৮

হিহিডি পিপিডি চাহিরে চান্না, ন'তে য়ূয়ূ চম্পা।
বা দোল বাবাকের দেশ। —ঐ

এই অঞ্চলের অধিবাসীরা ইহাকে বলে পার্শী ভাষা।

পিলচু হারাম পিলচু বুড়ী
বার পারিস হাঁটিয়া লেয়ার ক ॥ —ঐ

১০

ভাই ভাই ছোট ভাই ভাই, ভাই বড ভাই।
ভাই আমার মিছারে নদীতে পডিল সর্বনাশ ॥ —ঐ

১১

ডাল কাটিয়ে সীতা করিব ছাঁহিরে গো
চল সীতা ধীরে ধীরে।
লডিতে না পারে সীতা চলিতে না পাবে
চল সীতা ধীবে ধীবে। —ঐ

১২

কোচা আছে নিমগাছ বাডিল লিক্‌লিক্
স্ববগেব বাসাতে ভাঙ্গিল ডালবে।
পুরবেব বাসাতে ভাঙ্গিল ডালারে ॥ —ঐ

১৩

কোচা আছে নিমগাছ বাডিয়াছে চাঁপা গাছ।
কোথা যাই পেঁড়া কুঁড়ি, ডাল মেশা ফুল গুঁজিলে ॥ —ঐ

কোন কোন সময় কৃষ্ণলীলা বিষয়ক ঝুমুর গানের প্রভাবও ইহাদের উপর অনুভব করা যায। যেমন,

১৪

আইল বসন্ত কোথায় প্রাণ কান্ত, অভাগিনী নিতান্ত ভাবিয়া,
প্রেমেরই অঙ্কুর হতেছিল, মন কেন বিধি দিলে ভাঙ্গিয়া। —ঐ

১৫

পথ মাঝে নট সাজে, সখি দাঁড়াই যে বা কে গো,
কে কে কালোপারা বাঁশী ধরা কে গো,
মুখ ভরা হাসিটি গলে মালা দোলে গো।
তুলে কে পরাণে দোলে গো, সখী পরাণে দোলে গো। —ঐ

অনেক সময় অস্ফুট অধ্যাত্ম চিন্তাও ইহাদের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়।

১৬

এ জনমে এই হইল,
আর জনমে কিবা হোয় মনে দেখো ভাবিয়া হে,
দিনে দিন দিন সময় চলিল, মনে দেখো ভাবিয়া হে।
ও—ভাবিয়া হে! —ঐ

১৭

কোথা যাবো কোথা যাই মরণ কেন হইল না,
কপালে কলঙ্ক হইল জলে যে গো ধুঁয়াই গেলো না। —ঐ

কপালের চন্দন তিলক জলে ধুইয়া যায়, কিন্তু কলঙ্কতিলক জলে ধুইতে পারে না। সহজ ভাষায় একটি গভীর সত্য এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। তারপর মদ্যপানেরও নিন্দা শুনিতে পাওয়া যায়—

১৮

আঁধোবে নিন্দারে নয়ন সুঁয়োনা (ছুঁয়ো না)
চেকা মদের বাউল বুঝো না।
শুঁড়ি ঘর যাইও না, চেকা মদ খাইও না,
চেকা মদের বাউল বঝো না॥ —ঐ

১৯

কোচা আছে নিমগাছ বাড়িয়াছে সিঁজ (বেলা)।
শিথিল ঝিঁজরে দাদা কবিবেক যতন॥

ছো-নাচের ঝুমুর

বাংলার সুপরিচিত মুখোস নৃত্যের নাম ছো-নাচ, ইহা পুরুলিয়া ও তাহার সংলগ্ন অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত আছে। সাধারণ মুখোস-নাচের সঙ্গে পুরুলিয়ার ছো-নাচের কতকগুলি মৌলিক বিষয়ে পার্থক্য আছে; সুতরাং সাধারণভাবে মুখোস-নাচ সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা, তাহা ছো-নাচ সম্পর্কে প্রযোজ্য নহে। বর্তমান আলোচনা হইতে তাহাই দেখা যাইবে।

কিন্তু তাহার পূর্বে আর একটি বিষয় লইয়া আলোচনা করা প্রয়োজন। অনেকে মনে করেন যে, ছো-নাচ সেরাইকেলারই একটি বিশিষ্ট নৃত্যরূপ, অনেকের এমনও বিশ্বাস আছে যে, ইহা উড়িষ্যার লোক-সংস্কৃতিরই একটি বিশিষ্ট অঙ্গ।

কিন্তু প্রকৃত কথা হইতেছে, ছো-নাচ পুরুলিয়ার লোক-জীবন হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহাতেই পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে এবং পুরুলিয়া জিলার যে অংশ সিংভূম জিলার সঙ্গে সংলগ্ন সেই অঞ্চলেও ইহার বিস্তার দেখা যায়। সেরাইকেলা একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য ছিল, ইহার অধিবাসী প্রধানতঃ ওড়িয়া-ভাষী, কিন্তু সেরাইকেলার রাজা বিহার প্রদেশের মধ্যে নিজের রাজ্যকে অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া তাহা বর্তমানে বিহার প্রদেশেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পুরুলিয়া হইতে বাংলা ভাষা এবং বাংলার লোক-সংস্কৃতি সেরাইকেলায় গিয়া প্রবেশ করিবার ফলে ইহার কিছু সংখ্যক অধিবাসী বাংলা ভাষাভাষী। সেরাইকেলার লোক-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলার লোক-সংস্কৃতির প্রভাব অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, সেরাইকেলায় ভাদুগান প্রচলিত আছে, এই ভাদুগান যে বাংলা দেশ, বিশেষতঃ পুরুলিয়া অঞ্চল হইতেই সেরাইকেলায় গিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দেখা যায়, অনেক সময় ওডিয়াভাষীরাও বাংলা ভাদুগানকে ওডিয়ায় অনুবাদ করিয়া লইয়া গাহিয়া থাকে। এমন কি, সেরাইকেলায় উপজাতির মধ্যে যে সাপের মন্ত্র প্রচলিত আছে, তাহাও বাংলা ভাষায় রচিত। সেরাইকেলার উপজাতি সাধারণতঃ হো (Ho) নামে পরিচিত, তাহাদের ভাষা অষ্ট্রিক ভাষার শ্রেণীভুক্ত , কিন্তু তথাপি তাহারা যে সাপের মন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে, বাংলার লোক-সংস্কৃতির প্রভাব বশতঃ তাহা বাংলা ভাষাতেই তাহারা ব্যবহার করে। এই বাংলা মন্ত্রগুলির অর্থ তাহারা অনেক সময়ই বুঝিয়া উঠিতে পারে না, তথাপি না বুঝিয়াই ইহা তাহারা মুখস্থ করে এবং প্রয়োজন মত সর্পচিকিৎসায় ব্যবহার কবিয়া থাকে। সুতরাং দেখা যায়, বাঙ্গালীর লোক-সংস্কৃতিই সেরাইকেলার সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করিয়াছে, সেরাইকেলার সংস্কৃতির এমন কোন পরিচয় ছিল না, যাহা বাঙ্গালীর সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করিয়াছে বলিয়া মনে হইতে পাবে। সুতরাং ছো-নাচ সম্পর্কেও ইহার ব্যতিক্রম হইবার কিছু কথা নাই।

তারপর যাহারা ছো-নাচ উডিষ্যার লোক-সংস্কৃতির দান বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের এই মতবাদের বিরুদ্ধে একটি কথা এখানে উল্লেখ করা যায় যে, যদি ছো-নাচ উড়িষ্যার লোক-সংস্কৃতিরই দান হইবে, তবে ইহা কেবল মাত্র সেরাইকেলায় প্রচলিত না থাকিয়া সমগ্র উডিষ্যাতেই ব্যাপকভাবে প্রচলিত

থাকিবার কথা ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যদিও দেখা যায় যে, সেরাইকেলার নিতান্ত সংলগ্ন কোন অঞ্চলে ছো-নাচের কিছু কিছু প্রচলন আছে, তথাপি উড়িষ্যার বৃহত্তর লোক-সমাজের মধ্যে ইহার কোন স্থান নাই। সুতরাং ছো-নাচ সেরাইকেলারও যেমন নিজস্ব সংস্কৃতির রূপ কিছু নহে, তেমনই উড়িষ্যারও লোক-জীবন হইতে উদ্ভূত নহে। ইহার উদ্ভবের ক্ষেত্র অন্যত্র সন্ধান করিতে হইবে।

পুরুলিয়া জিলার উত্তর পশ্চিম সীমান্তে বাগমণ্ডি বা বাঘমুণ্ডি নামক একটি গ্রাম আছে, ইহা প্রধানতঃ পার্বত্য ও অরণ্য অঞ্চল, সেখান হইতেই অযোধ্যার পাহাড় শ্রেণী ও তাহার নিবিড় শালবনের সূচনা হইয়াছে। বাগমণ্ডিতে একটি থানা ও ডাকঘর আছে। এককালে ইহা বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল, তাহার কিছু কিছু পরিচয় এখনও পাওয়া যায়। বাগমণ্ডি গ্রামের অনতিদূরে চোরদা নামক গ্রামেই ছো-নাচের মুখোস নির্মাতাদের বাস। ইহারা যখন ছো-নাচের সময় আসে, তখন গ্রাম ত্যাগ করিয়া পুরুলিয়া সহরে তাহাদের নির্মিত মুখোস বিক্রয় করিবার জন্য আসে। তারপর বৎসরের মধ্যে ছো-নাচের নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেলে, তাহারা স্বগ্রামে ফিরিয়া গিয়া চাষবাসে মনঃ-সংযোগ করে। চৈত্র-সংক্রান্তির পূর্বদিন হইতে আরম্ভ করিয়া 'রোহণ' বা বৎসরের প্রথম বীজধান বপনের (সাধারণতঃ ১৩ই জ্যৈষ্ঠ) পূর্ব পর্যন্ত এই নাচের সময় (season)। ইহার পর চাষের কাজ আরম্ভ হয়, তখন হইতে বৎসরের অবশিষ্ট সময় কৃষকের পক্ষে নৃত্য-গীতের একটা বিশেষ অবসর থাকে না। সুতরাং এই সময়টুকুর মধ্যেই চোরদা গ্রামের মুখোস নির্মাণের ব্যবসায় চলিয়া থাকে। এই সময়ের মধ্যেই তাহাদের কেহ কেহ গ্রাম ত্যাগ করিয়া জিলার প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র পুরুলিয়া সহরে আসিয়া ব্যবসায় করিয়া থাকে। চোরদা গ্রামের অধিবাসীদিগের নির্মিত মুখোসই সেরাইকেলা পর্যন্ত বিক্রয় হয়; সেরাইকেলার নিজস্ব মুখোস নির্মাতা কেহ নাই। সাম্প্রতিক কালে চোরদা গ্রামেরই দুই একজন ব্যবসায়ী সেরাইকেলাতে গিয়াও মুখোস নির্মাণ করিয়া ব্যবসায় করিয়া থাকে। কি ভাবে কখন যে বাগমণ্ডির নিকটবর্তী চোরদা গ্রামে এই মুখোস নির্মাণের ব্যবসায় গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা আজ বলিবার উপায় নাই; কিন্তু বুঝিতে পারা যায় যে, পুরুলিয়া জিলার এই বিশেষ গ্রামটি কেন্দ্র করিয়াই ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে বাংলার

লোক-শিল্পের এই অভিনব পরিচয়টি প্রকাশ পাইয়াছিল। সেরাইকেলার স্বাধীন হিন্দুরাজেরা ইহার উৎসাহ দান করিয়া ইহাকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন, এ কথা সত্য হইলেও ইহা যে সেরাইকেলাতেই উদ্ভব ও বিকাশ লাভ করিয়াছিল, একথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। পুরুলিয়ার জন-জীবনের সঙ্গে যাঁহাদের কিছুমাত্রও পরিচয় আছে, তাঁহারাও এ কথা কিছুতেই স্বীকার করিবেন না। পুরুলিয়া জিলা দীর্ঘকাল বাংলা দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া ইহার সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয়ও বাঙ্গালী জনসাধারণের নিকট অস্পষ্ট হইয়া আছে, কিন্তু আজ ইহার বঙ্গভূক্তির পর ইহার বিচিত্র লোক-জীবনের পরিচয় উদ্ধার করিয়া ইহার সঙ্গে বৃহত্তর বাংলার সংস্কৃতির যোগ গভীরভাবে অনুভব করিবার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং পুরুলিয়ার ছো-নাচ বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনেরই একটি বিশিষ্ট অঙ্গ, ইহা বাংলা দেশের নিকট অভাবনীয় কিংবা অপরিচিত কোন রসবস্তু নহে।

এই সম্পর্কে আরও একটি যুক্তির অবতারণা করা যাইতে পারে। ছো-নাচে যে সকল বিষয় নৃত্যের মধ্য দিয়া রূপায়িত হইয়া থাকে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেও বুঝিতে পারা যাইবে, ইহারা বাংলার জাতীয় সংস্কৃতিরই এক একটি অখণ্ড অঙ্গ, বাংলা দেশের বাহিরে ইহাদের প্রচলন থাকিবার কথা নহে। ছো-নাচের প্রধান বিষয় রামায়ণ। এই রামায়ণ বাল্মীকির রামায়ণ নহে, বরং কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং লৌকিক রামায়ণ। বাংলা দেশের জনশ্রুতিতে রাম-লক্ষ্মণ সীতা সম্পর্কে রামায়ণ বহির্ভূত যে সকল কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহাও ছো-নাচের মধ্য দিয়া নৃত্যরূপদান করা হয়। এই সম্পর্ক শিব-রামের যুদ্ধের বিবরণটি উল্লেখযোগ্য। ছো-নাচের ইহা একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। এই বিষয় লইয়া বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে বহু কাহিনীকাব্য (narrative poem) রচিত হইয়াছে। বিষয়টি বাল্মীকির রামায়ণে যেমন উল্লেখ নাই, তেমনই কৃত্তিবাসী রামায়ণেও উল্লেখ নাই, অথচ এই বিষয় লইয়া মধ্যযুগে কয়েকখানি বাংলা কাব্য রচিত হইয়াছিল। ইহাদের একটির রচয়িতা শঙ্কর কবিচন্দ্র, তিনি বাঁকুড়া জিলার অধিবাসী ছিলেন। সুতরাং বাঙ্গালীর জনশ্রুতি:ত এই কাহিনীর একটি রূপ বর্তমান ছিল, ছো-নাচে তাহাই রূপায়িত করা হইয়া থাকে; অতএব ইহা বাঙ্গালীরই সংস্কার, অন্য কোন প্রদেশের অধিবাসীর সংস্কার নহে। সুতরাং ছো-নাচ বাঙ্গালীর রস-সংস্কারেরই নৃত্যরূপায়ণ, অন্য কোন জাতির

রস-সংস্কারের রূপায়ণ নহে। মূল রামায়ণের প্রচলিত বিশ্বাসকে অতিক্রম করিয়াও বাঙ্গালী নিজের জাতির জন্য নূতন রামায়ণ রচনা করিয়াছিল বলিয়াই ইহা জাতীয় কাব্য রূপে গৃহীত হইয়াছে, অন্ধভাবে বাল্মীকিকে অনুবাদ করিলে তাহা কদাচ বাঙ্গালী জাতির কাব্য হইতে পারিত না, ছো-নাচের মধ্য দিয়াও যে রামায়ণ-কাহিনী ব্যক্ত হয়, তাহা বাঙ্গালীরই রামায়ণ, বাল্মীকির রামায়ণ নহে। শিব-রামের যুদ্ধ বৃত্তান্ত তাহার অন্যতম নিদর্শন মাত্র। সুতরাং ইহা বাঙ্গালীরই বিশিষ্ট অধ্যাত্ম-চেতনা, অন্য কাহারও নিকট এই বিষয়ে তাহার ঋণ নাই—ইহা এই জাতির মৌলিক প্রেরণা হইতেই আগত।

এখানে আরও একটি কথা বলা আবশ্যক হইয়াছে। পুরুলিয়া দীর্ঘকাল বিহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত থাকিবার জন্য কেহ কেহ এ কথাও মনে করিয়াছেন যে, ছো-নাচের উপর বিহার বা হিন্দী সংস্কৃতির প্রভাব বর্তমান আছে। দুই একটি হিন্দী পত্রিকায় এই মত প্রকাশ করা হইয়াছে। উপরে ছো-নাচের প্রচার ও প্রচলন সম্পর্কে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে অতি সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই মতবাদ কত অযৌক্তিক। ইহা আর বিস্তৃত করিয়া আলোচনা করিবার আবশ্যক করে না। পুরুলিয়ার যে অঞ্চলে ছো-নাচ প্রচলিত, তাহা সম্পূর্ণ বাংলা ভাষাভাষী, হিন্দী কিংবা আদিবাসী ভাষাভাষী নহে, হিন্দী সংস্কৃতির কোন প্রভাব তাহার উপব বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। বিহারের অন্য কোথাও ছো-নাচ কিংবা ইহার অনুরূপ কোন নৃত্যানুষ্ঠান প্রচলিত নাই, সুতরাং ইহার মধ্যে কোন দিক হইতেই বিহারের কোন প্রভাব কার্যকর হইবার কথা নহে। নৃত্যের নাম 'ছো' দেখিয়া ইহাকে বিহারী 'ছট্ পরবে'র সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মনে করিবারও কোন কারণ নাই। কারণ, ছট্ পরব অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে অনুষ্ঠেয় সূর্যপূজা মাত্র, ইহার মধ্যে আনুষ্ঠানিক কোন নৃত্য সংযুক্ত নাই, কিন্তু ছো-নাচ চৈত্র-সংক্রান্তির পূর্বদিন হইতে আরম্ভ করিয়া 'রোহণে'র পূর্বদিন পযন্ত অনুষ্ঠেয় ধর্ম-নিরপেক্ষ (Secular) আনন্দানুষ্ঠান মাত্র। সুতরাং এই বিষয় সম্পর্কে যাঁহাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, তাঁহারা কেহ এ কথা বলিবেন না যে, ছট্ পরবের সঙ্গে ছো-নাচের কোন সম্পর্ক আছে, কেবল মাত্র যাঁহাদের প্রত্যক্ষ কোন পরিচয় নাই, তাঁহারাই ইহাদের নামের মধ্যে উচ্চারণত সামান্য ঐক্য লক্ষ্য করিয়া ইহাদের পবস্পরের মধ্যে সম্পর্কের সন্ধান করিয়াছেন। বিশেষতঃ প্রত্যেক ছো-নাচের পূর্বেই একটি ঝুমুর গানের মধ্য

দিয়া নৃত্যের বিষয়টি ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া হয়, এই ঝুমুর গান সর্বত্রই বাংলা, হিন্দী কিংবা কোন আদিবাসীর ভাষায় রচিত নহে। সুতরাং ইহার সঙ্গেও বাংলা এবং বাঙ্গালী ভিন্ন অন্য কোন ভাষা কিংবা জাতির সম্পর্ক নাই।

এখানে পুরুলিয়া জিলার আদিবাসী সমাজের সঙ্গে ছো-নাচের কি সম্পর্ক, তাহাও জানিবার প্রয়োজন আছে। কারণ, পুরুলিয়ার আদিবাসী অধিবাসীর সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নহে। সেইজন্য এ কথা মনে হওয়া অসম্ভব নহে যে, হয়ত পুরুলিয়ার আদিবাসীর সঙ্গে ছো-নাচের সম্পর্ক থাকিতে পারে। কিন্তু মূলতঃ ছো-নাচ যাহা হইতেই উদ্ভূত হউক না কেন, বর্তমানে ইহার সঙ্গে আদিবাসী সমাজের কোন সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায় না। পুরুলিয়ার আদিবাসী সমাজে যে নৃত্য প্রচলিত আছে, তাহা প্রধানতঃ নারীর নৃত্য, কোন কোন ক্ষেত্রে স্ত্রী পুরুষের মিশ্র নৃত্য, পুরুষ তাহাতে প্রধানতঃ 'রসিক' কিংবা মাদল বাদকের অভিনয় করিয়া থাকে। সুতরাং ছোটনাগপুরের আদিবাসী সমাজের সর্বত্র যে ঝুমুর কিংবা অন্যান্য নৃত্য প্রচলিত আছে, পুরুলিয়ার আদিবাসী সমাজেও তাহার ব্যতিক্রম কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। উক্ত অঞ্চলের আদিবাসী সমাজে মুখোস-নৃত্য কিংবা ছো-নৃত্যের কোন রূপেরই প্রচলন নাই, সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে এ কথা মনে হয় না যে, ছো-নাচের সঙ্গে আদিবাসী সমাজের নৃত্যের কোনও সংস্রব আছে। কিন্তু ছো-নৃত্যের সঙ্গে যে ঝুমুর সঙ্গীত প্রচলিত আছে, তাহা আদিবাসী সমাজের প্রভাব-জাত। তাহা সত্ত্বেও আদিবাসী ঝুমুরের রূপকে সেখানে সম্পূর্ণ নিজস্ব রস-চেতনায় জারিত করিয়াই ছো-নাচের মধ্যে গৃহীত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহার প্রভাবও খুব প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হইতে পারে না। বরং দেখিতে পাওয়া যায়, ছো-নাচের মধ্যে যে ঝুমুর গান প্রচলিত আছে, তাহা আদিবাসী সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কারণ, পুরুলিয়ার আদিবাসী মাত্রই দো-ভাষী—তাহারা তাহাদের নিজস্ব ভাষা যেমন ব্যবহার করিয়া থাকে, তেমনই বাংলা ভাষাও বলিতে পারে। তাহাদের সাংস্কৃতিক জীবনে নিজস্ব ভাষায় যেমন তাহারা ঝুমুর ও অন্যান্য গান গাহিয়া থাকে, তেমনই বাংলা ভাষায়ও তাহারা বিবিধ শ্রেণীর গান গাহিয়া থাকে। সুতরাং ছো-নাচে প্রচলিত বাংলা ঝুমুরের প্রভাব তাহাদের উপর গিয়া কিছু কিছু

পড়িয়াছে, কিন্তু তাহাদের দিক হইতে কোন প্রভাব আসিয়া ছো-নাচের ঝুমুরের উপর পড়িয়াছে, তাহা মনে করা যায় না।

পুরুলিয়ার আদিবাসীদিগের মধ্যে আরও যে সকল গান প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে সহরুল, শিকারী, দাঁড়শালী, মাঝি, করম, জাওয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য, ইহাদের কোন কোন গানের মধ্যে নৃত্যও সংযুক্ত আছে—কিন্তু তাহার রূপ স্বতন্ত্র। সুতরাং ইহাদের মধ্যে ছো-নাচের কোন রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। আদিবাসী সমাজ নিজেদের মধ্যে কিংবা অন্য কাহারও সঙ্গে ছো-নাচের অনুষ্ঠান করে না। কোন কোন সময় কৌতুক ও রঙ্গ করিবার জন্য তাহার অনুকরণ করে মাত্র। সুতরাং ছো-নাচের সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে আদিবাসী সমাজের কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হইতে পারে না।

তবে এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বর্তমানে ছো-নাচের যে রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি, পূর্বে তাহার এই রূপ ছিল না, ক্রমে ক্রমে হিন্দু প্রভাবের বশবর্তী হইবার ফলে হিন্দুর রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের কাহিনী ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, এ কথা সত্য। পুরুলিয়ার সাধারণ জনসমাজে ছো-নাচের বর্তমানে যে প্রভাব ও প্রতিপত্তি দেখা যায়, তাহা হইতে অনুমান করা যায় যে, এ দেশের সমাজ-জীবনে ইহার সংস্কার বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে; সেইজন্যই সমাজের মধ্যে ইহা এত দৃঢ়মূল হইয়াছে। হিন্দু প্রভাবের পূর্ববর্তী কালে ইহার মধ্যে যে মুখোশের ব্যবহার ছিল না, তাহাও অনুমান করিতে পারা যায়, কারণ, এখনও ইহার অন্তর্ভুক্ত কোন কোন নৃত্যরূপ মুখোস ব্যতীতই পরিবেষিত হইয়া থাকে। এমন কি, কোন কোন গ্রামে ছো-নাচের এমনও দল আছে, যেখানে মুখোস আদৌ ব্যবহার করা হয় না। সুতরাং ইহার যখন উদ্ভব হয়, তখন ইহাতে মুখোস ব্যবহৃত হইত বলিয়া মনে হয় না, ক্রমে হিন্দু-প্রভাবের ফলে ইহাতে হিন্দু দেবদেবী ও নানা পৌরাণিক চরিত্রের মুখোস ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

সুতরাং মনে হইতেছে, ছো-নাচের আদিরূপ পুরুলিয়া আদিবাসী সমাজের মধ্যে প্রথম ধরা দিলেও কালক্রমে নানাদিক হইতে ইহার উপর যে বহিঃপ্রভাব স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে এখন আর ইহাকে আদিবাসী সমাজের সঙ্গে কোন দিক দিয়াই সম্পর্কযুক্ত মনে হয় না। ইহার অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রধানতঃ পুরুলিয়ার কুর্মি মাহাতো সম্প্রদায়ই প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। কুর্মি মাহাতো

সম্প্রদায়ের সামাজিক জীবনের ক্রমবিকাশের ধারায় ছো-নাচের ক্রমবিকাশের ইতিহাস জড়িত হইয়া আছে। এ কথা মনে হয়, পুরুলিয়ার আদিম সমাজ-জীবনের ক্রমবিকাশের পথে কোন সময় ইহাতে হিন্দুপ্রভাব আসিয়া যুক্ত হইবার ফলেই ইহার মধ্যে দেবদেবী ও রামায়ণ-মহাভারত চরিত্রের মুখোসের ব্যবহার আসিয়া যুক্ত হইয়াছে, নতুবা ইহার মধ্যে মূলতঃ মুখোসের ব্যবহার ছিল না। পুরুলিয়ার কুর্মি-মাহাতো সম্প্রদায়ের মধ্যেই এমন অনেক লোক-নৃত্য এখনও প্রচলিত আছে, যাহা ছো-নাচ নহে, কিংবা মুখোসের সঙ্গে যাহাদের আদৌ কোন সম্পর্ক নাই। ইহাদের মধ্যে নাটুয়ার নাচ একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নৃত্য ; ইহা পুরুষেরই নৃত্য এবং মনে হয় আদিম সমাজ-জীবনের গোষ্ঠীসংগ্রামের যুগে এই নৃত্য যুদ্ধ-নৃত্যরূপেই ব্যবহৃত হইত। ইহার কিছু কিছু রূপ ছো-নৃত্যের মধ্যে গিয়াও প্রবেশ করিয়াছে। তবে বর্তমান কালে ছো-নাচের যে বিশেষ পরিচয় প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহাতে দেখা যায়, মুখোসের ব্যবহার ইহার মধ্যে প্রায় অপরিহায হইয়া পড়িয়াছে। অনেক সময় কোন কোন গ্রামের অধিবাসীর আর্থিক অসঙ্গতির জন্য ইহাতে মুখোসের ব্যবহার দেখা না গেলেও প্রধানতঃ দেখা যায় যে, মুখোস ব্যতীত ছো-নাচের অনুষ্ঠান প্রায় অসম্ভব। পুরুলিয়া জিলার প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই, বিশেষতঃ পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের প্রত্যেক গ্রামেই এক একটি করিয়া ছো-নাচের দল থাকে, ইহারা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া মুখোস কিনে এবং বৎসরের মধ্যে মাত্র এক মাসের কিছুদিন বেশি সময় প্রায় প্রতি রাত্রেই এই নৃত্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ইহা গ্রামবাসীর এক একটি সামগ্রিক অনুষ্ঠান, ব্যক্তিবিশেষের একক অনুষ্ঠান নহে—ইহাতে গ্রামের সকল লোকই সমানভাবে যোগদান করিয়া থাকে, তবে এই নৃত্যে নারীর কোন স্থান নাই। নারীর মুখোস পরিয়া পুরুষই নারীর অংশ অভিনয় করে। পূর্বের আলোচনার ভিতর দিয়া এ কথা বলিয়াছি যে, সামাজিক কারণে নারী যখন প্রকাশ্য নৃত্যে পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে যোগদান করিতে পারে না, অথচ সমাজের মধ্য হইতে নৃত্যের প্রেরণা দূর হইয়া যায় না, তখনই পুরুষকে নারী সাজিয়া নারীর অংশে নৃত্য করিতে হয়। ছো-নৃত্যের মধ্যেও এই অবস্থাই হইয়াছিল। মনে হয়, পুরুলিয়ায় হিন্দুধর্ম বিস্তারের যুগে কোন হিন্দুভাবাপন্ন সামন্তরাজের প্রভাবের ফলে ছো-নাচে নারীর অধিকার ল- হইয়াছিল, প্রধানতঃ তখন হইতেই নারীর মুখোস ধারণ করিয়া পুরুষেরাই নৃত্য হয়

অংশে নৃত্য করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। সুতরাং ছো-নাচের বর্তমান যে রূপই আমরা প্রত্যক্ষ করি না কেন, ইহার যখন প্রথম উদ্ভব হয়, তখন তাহার এই রূপ ছিল না—হয়ত তখন এই নৃত্য আরও বাস্তব, জীবন্ত ও শক্তিশালী ছিল, কারণ, নারীও তখন এই নৃত্যে অংশ গ্রহণ করিয়া ইহাকে একটি বাস্তবরূপ দিবার প্রয়াস পাইত, মুখোসের যে ব্যবধান বর্তমানে সৃষ্টি হইয়াছে, তখন তাহা ইহার মধ্যে বর্তমান ছিল না।

বাংলার সাধারণ মুখোস নৃত্যের সঙ্গে পুরুলিয়ার বর্তমান ছো-নাচের পার্থক্যের কথা লইয়া এই আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছিলাম, সুতরাং এখন সে কথায় ফিরিয়া আসা যাক। বাংলার সাধারণ মুখোস-নৃত্যের মধ্যে বিশেষ ভাবে মালদহের গম্ভীরা নাচ এবং বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত গাজনে শিবদুর্গা ও ভূতপ্রেত রাক্ষস-রাক্ষসীর নাচ এবং পূর্ববাংলা বিশেষতঃ ঢাকার কালীকাচ (ঢাকার কালীনাচকে কালীকাচ বলে, চৈতন্যভাগবতেও নৃত্যকে কাচ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কাচ শব্দের অর্থ নৃত্য কিংবা অভিনয়ের জন্য সজ্জা গ্রহণ) উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে ছো-নাচ ব্যতীত আর সকল নাচই লৌকিক ধর্মের আচারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, ধর্মাচার ব্যতীত ইহাদের স্বাধীন পরিচয় নাই। মালদহের গম্ভীরা ও পুরুলিয়ার ছো-নাচ প্রধানতঃ একই সময়ে অর্থাৎ চৈত্র-সংক্রান্তির একদিন পূর্ব হইতে সমগ্র বৈশাখ মাস ও জ্যৈষ্ঠ মাসের কিছুদিন পর্যন্ত চলিয়া থাকে, রোহিণ বা বীজ বপন আরম্ভ হইলেই সেই বৎসরের জন্য তাহা বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু তথাপি গম্ভীরা নাচের লক্ষ্য শিব, শিবের একটি ঘট আসরে স্থাপন করিয়া গম্ভীরা নৃত্যের অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে, শিবকে সম্বোধন করিয়াই সঙ্গীত এবং নৃত্য পরিকল্পিত হয়। ছো-নাচও ধর্ম-নিরপেক্ষ আনন্দানুষ্ঠান (Secular) নহে, শিব দেবতাই ইহারও লক্ষ্য শিবের গাজনের সময়ই ইহার মূল অনুষ্ঠান হয়, দেবতার লীলাই নৃত্যের ভিতর দিয়া অভিনীত হয়, তবে এখন আর ইহা ধর্মানুষ্ঠান নহে, ভক্তির ভাব যে তাহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পায় তাহাও নহে—নিতান্ত সহজ আনন্দানুষ্ঠান ব্যতীত ইহা এখন আর কিছুই নহে। সেইজন্য ইহার প্রভাব যত ব্যাপক ও শক্তিশালী অন্যান্য মুখোস নৃত্যের তত নহে। মুখোসের নির্মাণ-কৌশল ও শিল্পকলার দিক দিয়া বিচার করিলেও বাংলার অন্যান্য মুখোসের তুলনায় কুমি মাহা মুখোসই সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে।

একদিন ঝুমুর গান ব্যতীত ছো-নাচ একেবারেই সম্ভব ছিল না। আজ অনেক ক্ষেত্রেই ইহার সঙ্গীতাংশ পরিত্যক্ত হইয়া কেবলমাত্র নৃত্যাংশই রক্ষিত হইতেছে। তথাপি সুদূর পল্লী অঞ্চলে এখনও নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে কিংবা নৃত্যের পটভূমিকায় যে সঙ্গীতগুলি ব্যবহৃত হয়, তাহাদের কিছু কিছু নিদর্শন এখানে উল্লেখ করা গেল। এখানে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ছো-নৃত্যের মধ্যে যে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহার মধ্যে সঙ্গীতের বিশেষ একটা অবকাশ থাকে না। কারণ, প্রায় প্রত্যেকটি ছো-নাচের অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্ততঃ চারি পাঁচটি ধামসা ও তৎসঙ্গে কয়েকটি শানাই বাজিয়া থাকে। ইহাদের দ্বারা নৃত্যের তাল রক্ষা হয়, ইহাদের উচ্চরব ভেদ করিয়া মনুষ্য কণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীত শ্রুত হইতে পারে না, সুতরাং তাহার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকৃত হয় না। সঙ্গীত এখানে নিতান্ত গৌণ হইয়া যায়, তথাপি ইহা ব্যবহার এককালে ছিল, এখনও আছে।

প্রথমেই গণেশের আবির্ভাব হইবে, তাহার নৃত্যের তালে তালে সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যাইত।

১

সিন্দুর ভূষিত অঙ্গ মূষিক বাহন
প্রথমে বন্দনা করি গণেশ চরণ।
রং—নম নারায়ণ নম নম গণেশদেব হরগৌরীর নন্দন ॥ —পুরুলিয়া

২

জানকীর স্বয়ম্বর শুনি রাজগণ,
দলে দলে চলিলেন জনক ভবন ॥ —ঐ

নৃত্যের মধ্য দিয়া এক একটি দৃশ্য পরিবেশনের পটভূমিকায় ধামসা ও শানাইয়ের সুর ভেদ করিয়া একটি মাত্র মনুষ্যকণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীত অস্পষ্ট ভাবে শুনিতে পাওয়া যায়। দুইটি করিয়া পদ বারবার ঘুরিয়া ফিরিয়া একজন গায়ক উচ্চকণ্ঠে গাহিতে থাকে। পটভূমিকায় নৃত্য চলিতে থাকে।

৩

পিতৃসত্য পালিবারে শ্রীরাম লক্ষ্মণ,
চতুর্দশবর্ষ বনে করেন গমন ॥ —ঐ

কোন কোন লৌকিক দৃশ্য যখন নৃত্যের মধ্য দিয়া অভিনীত হয়

তখন যে গান গাওয়া হয়, তাহার সঙ্গে রামায়ণ কাহিনীর কোন যোগ থাকে না।

৪

বনে ফুটে বনশিমূল ফুল
ওগো গাঁ করে আলো।
আহা ঝি-ছেইলার মিছাই জনম
পরের ঘর করে আলো।

—বেলপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

৫

একটি বঁকে ফুল ফুটেছে অহো নীল কাল সাদা।
হায় হায়, কোন ফুলে শ্রীকৃষ্ণ আছে কোন ফুলে রাধা॥ —ঐ

৬

যমুনাতে ফুল ফুটেছে লাল কালো সাদা,
কোন ফুলেতে কৃষ্ণ আছে কোন ফুলে রাধা।

—বাঁশপাহাড়ী

৭

পুরুলাতে দেখে আইল অহো গামছা বাঁধা দই।
কাল খেয়েছ ঘিয়ের মেঠাই—পয়সা দিচ্ছ কই। —ঐ

৮

আগেতে শ্রীরামচন্দ্র পশ্চাতে মহাবীর।
তিনজনে সঙ্গে চলে পুরীর বাহির। —ঐ

৯

হত্তুকি হিরাকোষে আমি বসে বসে দাঁত গাবাব,
ও রঙ খঁসে ত গেছে
আয়নায় দেখিলে কান্না পাবে গো॥ —ঐ

১০

ছজনের মন রাখি—এই ছ জনা।
মন কিন্তু পেলাম না,
তুমি ধন আমার হলে না। —ঐ

১১

হাটের মাঝে নিমতলে
আঁখিঠারে কথা বলে।
এই কথাটি রাখব না গোপনে,
এই কথাটি বলে দেব শ্রীবৃন্দাবনে। —ঐ

১২

বনে ফুটে বনতিলা ফুল বন করে আলো আলারে,
ঝি ছানা মিছাই জনম পরের ঘর আলা। —ঐ

আমরা পূর্বেও দেখিয়াছি, গানের সকল বিষয়ের মধ্যেই—তাহা রামায়ণ বিষয়ই হউক, কিংবা ভাগবতের বিষয়ই হউক, অতর্কিতে ঘরের কথাও আসিয়া যায়। ঘরের কথা ইহাদের মধ্যে আছে বলিয়াই তাহা সর্বসাধারণের নিকট সহজেই আকর্ষণীয় হইয়া উঠে।

১৩

মাঠে মাঠে ঘুঁইট্যা কুড়া সেও বরং ভাল।
শ্বশুর ঘরের হাঁড়ি মেজে গা হইল কাল।

১৪

আসরে যারে তামুক খাবে বসবে বাকলে,
তামুক খাওয়ার ছলনা করে চাইবে নয়ানে। —ঐ

১৫

বাস্তা ছাড় বাস্তা ছাড় আসছে রাম কলি,
মায়ের গলে বিড়াল দড়ি, বউএর কাঁকে কড়ি —ঐ

১৬

কেন আশা না দিয়ে না আইল শ্যামরায
বিফলে যামিনী যায়,
কোকিলা কুহরে শেল সম বুকে।
কেন আশা দিয়ে না আইল শ্যামরায
আমার বিফলে যামিনী যায়।

বঁধু না আইল আশা না মিটিল
ধৈরয ধরা নাহি যায়।
কেন আশা দিয়ে না আইল শ্যামরায়॥
নিশি পোহাইল বঁধু না আইল,
আশা না মিটিল ধৈরয ধরা নাহি যায়। —ঐ

১৭

লতাপাতা সব শুকালো
ডালের কোকিল রবায় (ডাকে) না।
সাজো ভাই তুটি সঙ্গীগণ
আমার গোষ্ঠে যাবার বেলা হল। —ঐ

১৮

শিমূল ফুলে নাই হে মধু গন্ধ মিলে না,
এমনি পরভু করেছি নীলে ভমর বসে না।
চল সখী চল সঙ্গে যাব—
নিরালাতে (নিরবধি) প্রেম করিব,
গামছায় বেঁধে এনে দিব চিনি আর চিড়া,
ও তুই ভাবিস না গো, ধনি, আমার কিরা। —ঐ

১৯

মুখের ভাব মুখে রাখবি, আড় নয়নে কথা বলবি গো,
ও তোর কথা ভেবে ভেবে আমি হলাম আধ মরা।
ও তুই কাঁদিস না গো ধনি, আমার কিরা,
পরঙ্ক আগুনে পুড়িয়ে মরি,
আর আয় গরল খেয়ে মরি গো,
গামছায় বেঁধে এনে দিব চিনি আর চিঁড়া। —ঐ

২০

হেউঁচি ফুল বিনপুর থানা
মারি সাবাসা নাম না জানা
যারি সাবাসার খবর শুনে এসেছি ভাই এসেছি,
এখানে নাই শিবের আরতি। —ঐ

২১

শাক চিকা কালি মাটি, জগৎকে করেছে খাঁটি,
বায়েন বাজায় চলেন ধীরে ধীরে,
ওস্তাদে না চেন কেউ বুঝিতে না পারে। —ঐ

২২

যেদিনে বিধিল নয়ানের বাণ,
সেই দিন হতে আমার কাঁদিছে পরাণ। —ঐ

২৩

কুলির মাঝে খেল করে গো
গায়ে ঝিটে দেই মা ধুলো,
বারণ কর মা আপনি ডুলাল
কুলির মাঝে যেন না করে জঞ্জাল। —ঐ

২৪

সকালে ঘুমালেন বাবু উঠলেন বৈকালে,
ভাল করে নাচবেন বাবু আসরের মাঝে। —ঐ

২৫

সিন্দুরের বিন্দু ফোটা মুষিক বাহন,
মুষি দেখ্যা আনন্দিত দশরথ রাজন। —ঐ

প্রত্যেক দৃশ্যেই নৃত্যের বিষয়টি বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিয়া প্রত্যেক নৃত্য আরম্ভ হইবার পূর্ব মুহূর্তে যে ঝুমুর সঙ্গীত পরিবেশণ করা হইয়া থাকে, তাহা সাধারণতঃ রচনার দিক দিয়া দীর্ঘ হয়। কিন্তু প্রকৃত নৃত্যকালীন যে ঝুমুর গাওয়া হয়, তাহাতে ডুইটি পদের অধিক থাকে না। ছো-নাচের একটি দীর্ঘ ঝুমুর এই প্রকার—

২৬

গোকুলেতে যত গোপিনী ছিল,
একে একে সব কলঙ্কিনী নিল।
কেউ না আনতে পারে বাবি,
লজ্জা রাখ মোর গিরিধারী।
লজ্জা রাখ মোর বংশীধারী॥

আমি যদি বারি না আনিতে পারি,
হাসিবে ব্রজের নারী—লজ্জা রাখ মোর গিরিধারী।
লজ্জা রাখ মোর বংশীধারী॥
আমায় হে কালিয়া জলে পাঠাইয়া
নিশ্চিন্তে থেক না হরি,
রাবণে সংহারি সীতাকে উদ্ধারি
ফিরিলেন অযোধ্যা পুরী।
লজ্জা রাখ মোর গিরিধারী।
লজ্জা রাখ মোর বংশীধারী॥ —ঐ

খেম্‌টি ঝুমুর

এই অঞ্চলে এক শ্রেণীর নৃত্য-গীত ব্যবসায়িনী আছে, তাহাদিগকে নাচনী বা খেম্‌টি বলা হয়। নাচ্‌নীরা নৃত্যকালীন নিজেরা কিংবা তাহাদের পৃষ্ঠপোষক রসিকেরা যে গান গাহিয়া থাকে, তাহাকে নাচ্‌নী নাচের ঝুমুর বা খেমটি নাচের ঝুমুর বলিয়া উল্লেখ করা হয়। নাচনীদিগের ব্যবসায় সংক্রান্ত বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে পাওয়া যাইবে।

নাচ্‌নী নাচের ব্যবসায়ের মধ্যে শালীনতার যে অভাবই থাকুক না কেন, ইহার গীতগুলি রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয় অবলম্বন করিয়াই রচিত হইয়াছে। প্রেমের স্বর্গীয় মহিমা কদাচিৎ ক্ষুণ্ণ হইতে দেখা যায় না। সুতরাং প্রেম-সঙ্গীত রূপে ইহাদের বিশেষ মূল্য প্রকাশ পায়। নাচ্‌নী নাচের ঝুমুরের কয়েকটি নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

১

শুনগো বিন্দে, দিবানিশি প্রাণ কাঁদে গো,
আমি থাকিতে না পারি ধৈর্য ধরিয়া।
গো বৃন্দে, এখনও না এল কালিয়া॥ —পুরুলিয়া

২

শুনগো, সহচরি, আনগো গরল খেয়ে মরিগো,
আজি এ জীবন রাখিব কার লাগিয়া।
গো বৃন্দে এখনও না এল কালিয়া॥ —ঐ

শুনহে মদনমোহন, শ্রীদামের আশা কর পুরণ গো।
আমার জ্বালায় গেল অঙ্গ জ্বলিয়া।
গো বৃন্দে এখন না এল কালিয়া॥ —বাঙ্গামেট্যা (পুরুলিয়া)

৪

তোমার রূপের মাধুরী ভুলিতে না পারি আমি গো,
খনে খনে মনে পড়ে তোর মধুর স্বর গো,
খুলে কথা গোচবে বল॥ —ঐ

৫

প্রেম কি সহজে হয আগাম দিগাম ভেবে কয় গো,
ভেবে দেখ মন, ছিটা দুধে না বসে আর সর গো॥
খুলে কথা গোচবে বল॥
ধনি বলগো খুলে কথা গোপনে বল॥ —ঐ

খেমটি নাচের ঝুমুর যদিও নৃত্যের সঙ্গে সংযুক্ত, তথাপি ইহা তালপ্রধান সঙ্গীত নহে, বরং ভাব-প্রধান সঙ্গীত—বিরহ এবং বিচ্ছেদের ভাবই প্রধানতঃ ইহাতে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

আগে মোরে দিযে আশা এখন কেন নৈরাশ গো,
এই মিনতি করি আমি না রাখি আর পরগো।
খুলে কথা গোচবে বল ধনি বলগো।
খুলে কথা গোপনে বল॥ —ঐ

৭

যাও হে, আসিতে বল বল ঝাট করি,
শ্যাম বিনা উপবাসী—আমরা আছি দিনচারী।
কুলে রইতে নারি গো।
চিতে না মানে শ্যাম ভারী॥
দুঃখিনীর দুঃখনীরে বিদেশীরা ভাঙে হাঁড়ি গো,
পর পুরুষের রূপ হেরি আমরা পাসরিতে নারি গো,

কুলে রইতে নারি গো—
শ্যাম বিনা উপবাসী—আমরা আছি দিনচারী ॥
হেন দ্বিজ টিমা ভণে আমায় এ করালে, হরি,
বড় আশায় শেল দিলে অবলায় হলাম রাঢ়ী।
কুলে রইতে নারি গো—॥ —কাঁটাদি (ঐ)

অনেক সময় ঊনবিংশতি শতাব্দীর কবিওয়ালার গানের ভাষাও যেন খেমটি নাচের গানের মধ্য দিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। এই গানগুলি এই অঞ্চলের কবিওয়ালার গানের অভাব পূর্ণ করিয়াছিল।

৮

কুঞ্জেতে আসিবে হরি কুঞ্জ সাজাও সহচরী,
বাসর সাজাব নানা ফুলেতে ও ললিতে,
চল চল যাব ফুল তুলিতে ॥
ফুলের বিছানা করি, ফুলের বালিশ করি
আলস ভাঙিব শ্যামের কোলেতে।
ওগো ললিতে চল চল যাব ফুল তুলিতে ॥
—বেলপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

৯

তোমারে যে ভালবাসি আমি অন্তরে অন্তরে
তুমি যে চলিয়া গেলে আমারে ছাড়িয়ে—বন্ধু কি বলিব তোরে ;
নিশিভরে স্বপ্নেতে আমি দেখিছি তোমারে।
চমকি উঠিয়া আমি না দেখি তোমারে,
বন্ধু, কি বলিব তোমারে। —ঐ

১০

গাঁথিব ফুলেরই মালা, যতনে সাজাব কালা,
আমি ঘুচাইব মনের জ্বালা, দুঃখ যাবে দূরে।
বন্ধু, হৃদয় মাঝারে শ্যামকে রাখিব আদরে।
না আইল নন্দলালা কেমনে মিটাব জ্বালা
থাক থাক প্রাণবল্লভ বাঁধা প্রেম-ডোরে হৃদয় মন্দিরে।
শ্যামকে রাখিব আদরে। —ঐ

১১

তোমা বিনা বিধুমুখী চারিদিক শূন্য হে,
প্রাণে বিরহ জ্বালা হে।
রাখ রাখ মোরে, বিনোদিনী
তোমার ধরি দুটি পায়।
ফুলশর হান হিয়া পরে মন জ্বরে মদনাই।
রাখ রাখ মোরে বিনোদিনী
তোমার ধরি দুটি পায়॥ —ঐ

১২

দেখ শিখি শিখা, কৃষ্ণের নাম লেখা, আমি ধরেছি চূড়ায়।
তুমি যদি না হেরিবে, হৃদয়েতে ধরিবে
ঝাঁপ দিব যমুনায় রে। —ঐ

১৩

উচ্চস্বরে বাজে বাঁশী শ্রীরাধার নাম ধার
বাঁশীর স্বরে মরিল বনের হরিণা।
নব নব নবরঙ্গিণী ব্রজের গোপিনী কি খেনে জন্মিল বাঁশী,
বাঁশী করে সর্বনাশী॥
এমনি পিরিতের ধারা কুলায় যেমন ক্ষেপার পারা,
ছাড়া জাল শরে বিন্ধা হরিণী।
মথুরা বাসিনা গো রঙ্গ পিরিতি করা হইল দায়,
না শুনিলে গুরুজনার বচন, মরি —অযোধ্যা (পুরুলিয়া)

উপরোক্ত ঝুমুরটি নৃত্যকালীন গাহিবার পরিবর্তে বৈঠকী গান রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহাকে নাচনী বৈঠকী ঝুমুর বলে।

পাতা নাচের ঝুমুর

এই অঞ্চলের আর এক শ্রেণীর নৃত্যের নাম পাতা নাচ। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই ইহাতে মিলিত ভাবে অংশ গ্রহণ করে। এই অনুষ্ঠানের মধ্য হইতেই একদিন আদিবাসীর সমাজ-জীবনের সখা কিংবা সখীত্ব পাতানো হইত, অর্থাৎ স্বামি-স্ত্রী নির্বাচন করা হইত বলিয়া ইহাকে পাতা নাচ বলে। করম উৎসব

উপলক্ষে পাতাশুদ্ধ একটি ডালকে কেন্দ্র করিয়া নৃত্য হয় বলিয়াও ইহার নাম পাতা নাচ হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। তবে কেবলমাত্র করম উৎসব উপলক্ষেই যে এই গান হয়, তাহা নহে—অন্যান্য উৎসবেও পাতা নাচের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। আদিবাসীর সমাজ হইতেই ইহা হিন্দুভাবাপন্ন সমাজে ক্রমে বিস্তার লাভ করিয়াছে। এই নৃত্য উপলক্ষে যে গান শুনা যায়, তাহার তাহার কয়েকটি নিদর্শন এখানে উল্লেখ করা যায়। ইহাকে মাদল নাচের গান কিংবা পাতা নাচাড়ীও বলে।

১

মোহনপুরে ঠেকাঠেকি কি করে কুড়াব একা।
টিকটিকি ননদ পালাল খোঁচার মোহন খোঁচে শুকাল।
—বেলপাহাড়ী (ঐ)

২

ছানা কাঁদে মাই মাই, মুড়ি দিল মানে নাই।
থাম বাছা দু'পহরে রাঁধি, তোব বাপেব গাল সইতে নারি।—ঐ

সকল গানের মধ্যেই যেমন জীবনেব ঘর-কন্নার সুখদুঃখের কথা ব্যক্ত হইয়াছে, ইহাতেও তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

৩

ছানা কাঁদে অরল-গবল দুয়ারে গুলেছি গোবর।
টিক্‌টিকি দেখে ছানা কাঁদে,
দিদি লো, দু'পয়সার মিঠাই এনে দিব। —ঐ

৪

কারা ধরার শুঁয়া পোকা,
ওইটাই বটে চেইলার কাকা।
ওইটাই বটে আমাদেরই দাদা। —ঐ

পল্লীকবির পরিকল্পনায় অনেক সময় ভাগবত ও রামায়ণ একাকার হইয়া যায়, সেই সূত্রে ব্রজবাসী ও অযোধ্যাবাসীর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না—

৫

ও তোরা দেখ বেজোবাসী,
এমন সুন্দর রামকে কে করল সন্ন্যাসী। —ঐ

৬

পাতালেতে ছিলেন কালী
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ নিয়ে আসি।
হনুমানের যুক্তি শুনে দিল মহাবলী
ও মা ও মা কালী। —ঐ

৭

এতটুকু নাচনেটি নাচতে জানে না,
হাত বাড়ায় পইসা মাগে লজ্জা লাগে না। —ঐ

পৌরাণিক নামগুলিকে সর্বদাই এখানকার নিরক্ষর সমাজ নিজেদের মত করিয়া উচ্চারণ করে এবং এই উচ্চারণ বোধের উপরই তাহার সঙ্গীতের ছন্দ রচিত হইয়াছে।

৮

দ্রুপদী বলেন বাণী, শুন শুন, নীলমণি
এই চিন্তা করি আমি
'সভা মধ্যে যাব—সৈরিন্ধ্রী নাম নিব।
দাসী হব সুধিষ্ঠির
না ছুব অষ্টাভাত, না দিব চরণে হাত
প্রতিজ্ঞা এই যে আমার।

—ঐ

গৌরাঙ্গ বিহনে প্রাণে মার,
কোথা হে গৌর হরি।
আসিয়ে নদীয়া পুরে সকল পাপী উদ্ধারিয়ে,
গৌরাঙ্গ বিহনে প্রাণে মরি।
এস হে গৌরাঙ্গ হরি।

১০

হরি নামের গুণগান জানেন পশুপতি,
না লাগে ধান কড়ি না লাগে শকতি রে।
হরিনামের গুণগান জানেন পশুপতি।

ও ঝিরা না ধর কলি।
বড় হলে গলে দিব ছুরি
ও ঝিরা না ধর কলি। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত গানটির মধ্যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র বংশীখণ্ডের সুরটি অবিকল শুনিতে পাওয়া যায়—

১১

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে নবঘন মেঘ ডাকে
বিজুলী চমকি লাগে ডর।
চল যাব ঘর।
কদম তলায় নিশি হ'লো ভোর।
একডা কদমের তলে, কৃষ্ণ ঘুমালো কোলে,
বাঁশীটিতো নিয়ে গেল চোরে।
না জানি শ্যাম ঘুমের ঘোরে। —ঐ

১২

বাগমোড়ির পাহাড়ে নানা রঙের ফুল ফুটে,
দিদি গো, দাড়ায়ে তুলিতে মন করে।
খোপা ভরি পরিব, আঁচল ভরি তুলিব
দিদি গো, আর গুচ্ছাক ডাল ভাঙ্গিব।

—বেলপাহাড়ী (ঐ)

১৩

এতটুকু কুয়াটি পাতাল ভেদী পাশিয়া হো
গৌরী শ্যামলী পানি বহি গেলি।
রাজার ব্যাটা পানি মাগে গো। —ঐ

১৪

এতটুকু হুকাটি ফুকর ফুকর ডাক দিছে,
ও সাধের হুকমারে জনম জনম তুমি না ছাড় বাড়ী। —ঐ

১৫

গেছলাম গোপিনীর পাড়া খুলে নিল পীতধড়া,
কত আদর করিয়া ডাকে আদরিণী, চুড়ায় ধরিয়ে টানাটানি। —ঐ

১৬

কোন রসিক মরি গেইল রে,
উপরে গিধিনী উড়িল রে।
গিধিনী বসিল বে—
গিধিনী চড়িয়া পবত , কোন রসিক মরি গেলি,
গিধিনী চড়িয়া পর্বত। —ঐ

১৭

বাগমৌড়িব পাহাড়ে সিসের ধুলা উড়ে বে,
বাজাব বেটা ভাবরি বাটা ঘোড়া ছুটাছে রে। —ঐ

১৮

বাগমৌড়িৰ পাহাড়ে লম্বা লম্বা বেলবে,
খাইলে বেল মিলায যায বুকে লাগে শেলবে॥ —ঐ

১৯

শাল গাছে শাল পংড়া কদম গাছে কলিবে,
মাদাব গাছে লাল গামছা চটক দেখে মৰিবে। —ঐ

২০

চিলকিব গড়ে হাতির উপবে রাজা ঘুবে গো,
চিলকিব গড়ে যখন উঠে ইন্দকি, তখন ভাবে বিদকি।
চিলকি উড়ে, হাতির উপবে বাজা ঘুবে।
যখন আসে ফুলঝরি, তখন আমি গোববরি,
চিলকিব গড়ে হাতির উপব রাজা ঘুবে।
যখন ফুটে গাছটি, তখন কানে হাতটি।
চিলকিব গড়ে হাতিব উপবে বাজা ঘুবে। —ঐ

ভাদুরিয়া ঝুমুর

পুবে এই অঞ্চলে ভাদ্র মাসে ভরা বষাব প্রকৃতিকে বন্দনা করিযা যে নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান হইত, তাহাকে ভাদুৰিযা বলিত, এই উপলক্ষে নৃত্যেব সঙ্গে যে সঙ্গীত ব্যবহৃত হইত, তাহা ভাদুরিয়া ঝুমুর রূপে পরিচিত ছিল। বিশেষ প্রকৃতির নৃত্যেব সঙ্গেই এই ঝুমুর গানগুলি সম্পর্কিত। বর্তমানে ভাদ্র মাসের

প্রকৃতি-বর্ণনা ব্যতিরেকেও ভাতুরিয়া ঝুমুর রচিত হয় ; কিন্তু একদিন ইহাদের মধ্যে বর্ষাপ্রকৃতির রূপ বর্ণনা ব্যতীত আর কিছু শুনিতে পাওয়া যাইত না। ইহারা এই অঞ্চলের ভাদু গান। ভাতুরিয়া ঝুমুরের কয়েকটি নিদর্শন এখানে উল্লেখ করা যায়।

১

ছাঁটিও পড়ব তারটিও মারব
বাঁসাটি বানে ভাসাব, ভাইরে ধুতিয়া। —পুরুলিয়া

২

খাওয়ালি দাওয়ালি পীরিতে মজালি
কিছুদিনে বঁধু আমারে কাঁদালি। —ঐ

৩

থালা গেল বাটি গেল, তাও আমরা পারি গো,
মাথা বাঁধা মোর ডুরি গেল সেই ভাবনায় মরি গো। —ঐ

নারী-প্রকৃতির চিরন্তন একটি পরিচয় ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ঘরের থালা-বাসন হারাইয়া গেল, সেইজন্য তাহার কোন ক্ষোভ নাই, কিন্তু তাহার প্রসাধন করিবার ক্ষুদ্র একটি উপকরণ মাথা বাঁধিবার ডুরিটি যে হারাইল, তাহার বেদনা তাহার বুকে সূঁচ হইয়া ফুটিয়া রহিল।

৪

ভাদর মাসে পিয়া পর দেশে
বলে দিও হে যেন নাগর আসে।
না দেখি হাটে, না দেখি বাটে
গুণমণিরে মন ভাঙ্গিল কিসে॥ —ঐ

৫

দেগো মাতা দেগো পিতা দেগো পদধূলি
রাম যাবে বনবাস কাঁধে নিয়ে ঝুলি।
মাতা দেগো দেগো ভিখ্, যাব দূর দেশে
কোন্ বনে কাঠ কাটি, কোন্ বনে জড করি।
কোন্ বনেরই দাদা জুডন পীরিতি।
ফুটল গরয়া ফুল টুটল পীরিতি॥ —বাঁকুড়া

করম নাচের ঝুমুর

এই অঞ্চলে ভাদ্র মাসে অনুষ্ঠিত আর একটি শস্যোৎসবের নাম করম পূজা বা করম উৎসব। অন্যান্য উৎসবের মতই নৃত্য-গীত ইহারও অঙ্গ। ভাদ্র মাসে এই উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই সময় আউশ ধানের নবান্ন উৎসব এবং আমন ধান রোপণের শেষ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়, তখনই করম উৎসবের সময়। করম উৎসবে আনুষ্ঠানিক ভাবে করম রাজা ও করম রাণীর বিবাহ দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, করম রাজা সূর্য এবং করম রাণী পৃথিবী বা ধরিত্রীরই প্রতীক্। প্রত্যেক জাতির শস্যোৎসবেই সূর্য এবং পৃথিবীর প্রতীকের আনুষ্ঠানিক বিবাহ-সম্পন্ন হইয়া থাকে। এখানেও তাহাই হয়। করম বা পাহাড়ী কদম্ব বৃক্ষের একটি শাখা মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিয়া তাহা ঘিরিয়াই নৃত্য গীত চলিতে থাকে। মূলতঃ আদিবাসী সমাজেই এই অনুষ্ঠানের উৎপত্তি হইয়াছিল, বর্তমানে সেই অঞ্চলের বর্ণহিন্দুগণও ইহা পালন করিয়া থাকেন। ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের একাদশী তিথিতে ইহার অনুষ্ঠান হয়। একটি গাছের ডাল মাটিতে পুঁতিয়া রাখা হয় বলিয়া ইহাকে ডালগাড়াও বলে। ইহার নৃত্য স্ত্রীপুরুষের মিশ্রনৃত্য এবং সঙ্গীতের মধ্য দিয়াও অন্যান্য অনুরূপ সঙ্গীতের মতই সাধারণ জীবনের সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কয়েকটি নিদর্শন দেওয়া যায়—

আকাশেতে চাঁদ নাই আছে দুটি তারা হে
বঁধুর মন চঞ্চল ছাড়ি যাবার পালা হে। —বাঁশপাহাড়ী

তালপাতা কুঁড়ে ঘর জল পড়ে ঝর ঝর,
যেমন বিটি তেমনি জামাই হোল না, মরিলে তো খবর পাব না॥
—ঐ

কাল কাল বলো না কালো জলে চ'লো না।
ও কালো ভমরা নিশীথে ফুলবনে যাইযো না॥ —ঐ

তুমি আমার কেবা ছিলে আমায় বিকে টাকা নিলে,
পাকা খাতায় লেখাইলে সাত পুরুষের নাম।
হে কালিয়া শ্যাম—
ফাঁকি দিয়ে পালালে আসাম॥ ঐ

এই অঞ্চলের সাধারণ লোক জীবিকার সন্ধানে আসামের চা-বাগানে কুলি হইয়া যায়, এখানে তাহার কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে।

ঘরের বাদী ননদী টঁ্যাড়ের[১] বাদী পর গো—
যমুনা ঘাটের বাদী শ্যাম-নটবর গো॥ —ঐ

৬

বল হাসি হাসি পথ আসি রাধার নিকট বসি—
'ওগো বিনন্দিনী' বলে রাই, ব্রজপুরে যাই —
মিলাব নন্দেরি কানাই ব্রজপুরে যাই।—

বল কুমারীকা খোল্ ময়না
বল মুচিরিকা ঝুড়ি বান্দি
মুচি ভাই রসিকা
সংসার জুড়াইল গো॥ ঐ

ইহাতে মাদল প্রস্তুতকারক মুচির প্রশংসা শুনিতে পাওয়া গেল

৮

বল নেহের তানাম্ পিড়ি পিড়ি
তিগুণ মে জা আনা কুড়ি
মেতেলাং সেনা জোকা জুড়ি,
না কুড়ি বান্ত তামা মুড়ি॥[২] —ঐ

ইহার অর্থ :—স্ত্রী মাঠে মাঠে পলাইতেছে, স্বামী বলিতেছে, দাঁড়া, সঙ্গে-সঙ্গে যাব, আমি ছাড়া তোর আর কি আছে।

১ মাঠের। ২ মুণ্ডা ভাষা।

সোনারো সোনারো মুন্দাব মালা মাঝে গাঁথি
সোনার কাঠি মুন্দার মালা মাঝে গাঁথি
কানে খাপ নাকে লোলক দোলিছে, রাণীকে কেমন সাজেছে॥ —ঐ

১০

গাডা গীতিল কদম যুবা হেন দে হাগা ছতিয়া কাণা
জুগিচা বাগে গুতু তানা অকরে না প্রভু তুবা কাণা॥

অর্থ: নদীর বালিতে কদমগাছের তলায় কালো ভাই ধুতি পরিয়া বসিয়া আছে। (তার স্ত্রী) যুঁই ফুলেব মালা গাঁথিয়াছে, আর বলিতেছে, আমার প্রভু কোথায় ব'সে।

১১

কুলি মাথে এগো কাকী মাঝে কুলি এক৷ডা
শুনিতে গো বড বে জমক।
কোলে আছে কচি ছা নিয়ে যাবে ভগবান,
এমন স্নন্দব গায় হলুদ বরণ॥ —ঐ

১২

শিখালোম শিখালোম্ পডালোম পডালোম
কারিরে ভোমবা কেবি বাতি,
যুগ যুগ টলামায় শিখানো না যায়॥ —অযোধ্যা পুরুলিযা)

১৩

চন্দন হ কাঠে ফিবি বাঁ আ-আঙ্গে চলালে হো
নিশি উদল করি ধাঁ আবি হো।
তাঁহারে তা-নানা এলো না —না না না বে॥ —ঐ

১৪

হাঁড়ি মোর ভাঙ্গাইতে বিডিমোয় সামুদে বহাইল,
কাহে গো ধনি ডু'ধাবে বিকাই গেল
তাঁহাবে হে তানা না … —ঐ

রাধা বলিতেছে, তুধ বিকাইতে গিয়াছে, তাহাতে হাঁড়ি ভাসিয়া বিঁডাটি সমুদ্রে ভাসিয়া গেল।

১৫

তাঁহা রেঁ হে এনা ...
ই এক মুণ্ডে কাটিবে হ্ লক্ষ্মণ
দশ মণ্ডে আজিকে জড়াই হো।
খিদির খিদির কাটিবে হে লক্ষ্মণ
রাবণাকের মণ্ডে হো,
আইরে এ বিবি—বিন্দাবে বন ॥ —ঐ

ইহাব অর্থ: রাম লক্ষ্মণকে বলিতেছে যে, বাবণেব এক-মাথা কাটিলে দশ মাথা আছে। অতএব দশ মাথাই কুটো কুটো কবিয়া কাটিয়া দাও।

১৬

তাঁহাবে হে তানানা এনা
গিধিনি গো গিধিনি ভাল সখি দাই আহো
শিমলিনী গাছে ভালা বঁদা ভালা কবে কিনা ওগো মায়
ওগো মালিনী গো
ভালা সখি দাইযা হো ॥ —ঐ

১৭

ঝিঙ্গা ফুল ফুটে বাবা ফুটে লদবদ গো
পঁহচল নযহবকো লোক গো,
নয়হবকো লোক দেখি খোঁপা ঝলমল কবে গো
শ্বশুব বাড়ীব লোক দেখি নযনায ধাবা বহে গো। —ঐ

নাইয়র বা জ্ঞাতিগৃহে লইয়া যাইবাব লোক দেখিলে খোঁপা ঝলমল করে, কিন্তু শ্বশুব বাড়ীতে লইযা যাইবাব লোক দেখিলে কান্না পায।

১৮

যেহ ঘাটে বাবা ভাই সিনান কবে গো
সেই ঘাটে জোড়া ঢাক বাজে।
সঁয়া সিনান কবে গো
সেই ঘাটে জোড়া কুকুর ভুকে। —ঐ

১৯

ভাদর মাসে দেউরা না সাহিছ চাকুরী গো,
ভিজি সাত লাল পাগড়ী।
ঘরে সে আছে দেউরা সরু চাউলেব পুড়া গো
আর আছে কলাই দাইল বেসাতী। —ঐ

২০

বাপেব ঘবের ধাবে ধাবে কিসেব বলদ গো,
কড়চি কড়চি গুয়া পান গো।
পান খাওযালি ভাইবে দাঁত গাবাসে হে বে
তরি সিঁআব সিঁথলি সাজালে। —ঐ

ঝুমুব গানেব বিবরণ এখানেই শেষ হইল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একথা স্বীকার না কবিয়া উপায নাই যে, এই অঞ্চলেব বাংলা ও আদিবাসীর ঝুমুরে যে বৈচিত্র্য আছে, এই আলোচনা দ্বারা তাহা সম্যক্ পবিস্ফুট হইল না। কারণ, ঝুমুরেব বৈচিত্র্যেব সংখ্যা নির্দেশ করা কঠিন। ঝুমুব এই অঞ্চলেব সাধারণ লোকেব সাংস্কৃতিক জীবনেব প্রাণস্বরূপ, ইহাকে কেন্দ্র করিযা ইহাব সমগ্র আনুষ্ঠানিক জীবন নিযন্ত্রিত হয।

ছয়

সাখী গান

সাখী গান সাধারণতঃ তরজার মত। মনসা পুজার ঘটের জল আনিতে যাওয়ার সময় দুইটি দলের মধ্যে এক পক্ষ অপর পক্ষকে প্রশ্ন করে। উত্তর দানে সক্ষম হইলে তবেই অপর দল ঘটের জল লইয়া যাওয়ার অনুমতি পায়।

ইহা এই অঞ্চলের সাপের ওঝাদের মধ্যে প্রচলিত ঝাঁপান অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ। গুণী বা ওঝাদিগকে লইয়া ঝাঁপানের শোভাযাত্রা যখন গ্রামের পথ দিয়া অগ্রসর হয়, তখন পথিপার্শ্বস্থিত ওঝার আর একটি দল, মনসা ও সর্পচিকিৎসা-বিষয়ক কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, অন্যদল তাহার জবাব দিয়া পথে অগ্রসর হয়।

১

প্রশ্ন— কোথা হতে এলে ভাই কোথায় তোমার থিতি,
কোথায় পাইলে সুন্দর মরতি,
কেবা তোমার আদি গুরু কেবা তোমার মাতা!

উত্তর— স্বর্গ হতে এলাম ভাই মর্ত্যে আমার থিতি।
পিতার শরীরে আমার হইল উৎপত্তি॥
মাতার শরীরে দুই হস্ত পা।
ব্রহ্মা আমার আদিগুরু গৌরী আমার মা॥
এই সাখীর উত্তর বলে দিলাম আমি।
ঘরে গিয়ে পুরাণ খুলে বিচার কর তুমি॥
লক্ষ্মীকান্ত চরণে আমার অসংখ্য প্রণাম॥
বাজুক বিষম ঢাক চলুক ঝাঁপান॥

—বেলপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

২

প্রশ্ন— শুন শুন গুণিগণ করি নিবেদন।
অকস্মাৎ এক কথা হইল স্মরণ॥
কেবা যাও তুমি ভাই বারি লইয়া।
এক কথা জিজ্ঞাসিব যাও হে বলিয়া॥

পিতা মুখে শুনিযাছি অপূর্ব কাহিনী।
কি হইতে মনসাব এক চক্ষু কাণী ॥
ইহাব উত্তব যদি না বলিতে পাব।
হবি-হব শব্দে তোমবা সাখী গাইতে নাব ॥

উত্তর— শুন শুন গুণিজন কবি নিবেদন।
যে সাখী কহিলাম উত্তব কব হে শ্রবণ ॥
পদ্মপাতে জলপান পদ্মাব কুমাবী।
অ-যোনি-সম্ভবা তিনি শিবেব নন্দিনী ॥
একদিন বিশ্বনাথ ভাবিল অন্তবে।
মনসাকে লযে যান আদব কবে ॥
মনসাকে দেখে দেবী কোপ কবিলেন।
ত্রিশূল আঘাতে চক্ষু ফোটাইলেন ॥
সেই হইতে মনসাব বাম চক্ষু কাণী।
সাখীব উত্তব বলে দিলাম আমি।
ঘবে গিযে নিযে পুবাণ খুলে বিচাব কব তুমি ॥ —ঐ

৩

একদিন কংস বাজা সভাতে বসিল
দূত গিযে কৃষ্ণচন্দ্র ধবিযে আনিল
কংস বাজা বলে কৃষ্ণ শুন মন দিযা
কালিদহ হইতে আন কমল তুলিযা।
তাহাব উপবে হবি ছাডেন সিংহনাদ
সে শুনে কালি নাগে পডেছে প্রমাদ।
মুখ বিস্তাবিযে কালি ধাইল সত্ববে
শ্রীনন্দেব নন্দন কৃষ্ণকে পুবিল উদবে।
বলবাম বলে দাদা বদ্ধ কেন হও ?
তোমাব সেবক গরুড তাবে স্মবণ কব।
বলবামেব বাক্যে কৃষ্ণেব হইল চেতন
গরুড গরুড বলি কৃষ্ণ কবিল স্মবণ

কুশল দ্বীপের মধ্যে গরুড়ের আসন টলিল,
আসন টলিতে গরুড় ধেয়ানে জানিল।
ধেয়ান যে জানিল গরুড় সর্ববিবরণ
কালিদে কালি নাগ গিলছে নারায়ণ
এক পক্ষ করে গরুড় কালিদ বান্ধিল
আর এক পক্ষ করে গরুড় কালিদ ছিচিল
সাত তাল জল গরুড় করিলে ছেচনি
কর্ণ পাতে শুনে গরুড় নাগের সংশনি
এক ক্ষুদ্র সাপিনী গিয়ে কালিনাগে কয়
কোথা হতে মহাবীর গরুড় এলো কালিদে।
গিলেছিলে কৃষ্ণচন্দ্রে উগাড়িয়া দিল
বিনয় করিয়া কালিনী ধরলো তার পায়
হর বিষ চাও ফিরে ভাই বিষের নাম গাই
চাইতে চুড়ার পানে আর বিষ নাই। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত গান দুইটি বিষ ঝাড়ার মন্ত্র, তথাপি ইহাতে একটু কাব্যের স্পর্শ আছে-

চিনি চিনি করে বিষ ক্যাহা যাও তুমি।
ফটিক বরণ বিষ পান করি আমি।
জঙ্গ বিজঙ্গ ভাই পলা ছিল বাজী
বত্রিশ দন্তের খালেন সাপা বিষ করিলাম পান।
ধুলায় তো লিটিপিটি সরু বিষের জ্বালা
ভবান কাটিয়ে উড়িয়ে পালা।
না চলে মেদিনী কম্পে বিষের তলা ভরা
নাম নাম বৃষ্টি ঘামুক গরর।
কুথা চণ্ডী বিষহরি বাঁশিবৃক্ষ মূলে
একবার এখানে আসিও।
সন্তানে না দেখিয়া ভাই আসে তাই আসে গুরুর সন্ধানে
আকাশে নাচিছে নাগিনী যত মনসার ভাসনে

জরৎকারু ছিলেন জানিয়ে মহিম মণ্ডলে
অস্তাদে বাঁধিয়ে ফেলে সাগরের জলে
কুজ্ঞান বিজ্ঞান কাটি করে খানি খানি
ভয়ে সাপাধাপা বলে করে আগুয়ান
মাতা কুজবুড়ি ধীবে ধীবে আসে
বেহুলা কান্দে নিজের চক্ষের জলে ভাসে
আয় আট আয় হবি বিষহবিব ঝি,
গরুড় মনসাব চুই তোবে সিদ্ধি কামাক্ষ্যার
শীঘ্র আয় শীঘ্র আয়। —ঐ

বিষ হবি বিষ হবি সাপিনী ডাকিনী করে ডর
গাছ পাথব উড়াইযা লাগা বাধা চলাফেবা না সয়,
সাপা হারাইয়া বোজা থাকে হেট মাস
বলে বুড়ি চোব হইযা থাক সাথে।
ছত্রিশ কোটি দামেব মন্ত করে ভব যদি
হয় মিথ্যা, হয়ে তো যাবেন বসাতল
কাব আজ্ঞা দিবি কামাখ্যাব আজ্ঞায়। —ঐ

৫

প্রশ্ন— কোথা হতে আসে ভাই হাতে শিঙ্গা লাঠি,
কোন গুরুকা শিষ্য তুমি কোন গুরুকা লাতি।
উত্তর— দক্ষিণ হতে আসি ভাই হাতে শিঙ্গা লাঠি,
শিব হোয়ে কোমল লোচন কা লাতি। —ঐ

প্রশ্ন— পশ্চিম হতে আস ভাই পুবে চলে যাও,
কাহাব মন্দিরে তুমি ভিক্ষা করে খাও।
কোথায় তোমাব ঘর দবজা কোথায় তোমার বাড়ী,
কিবা তোমার নিজ নাম কিবা তোমার জাতি।
চলিয়া সবাব মাঝে বাখছে গেয়াতি।

সাখীর উত্তর যদি না বলিতে পার,
হরি হর শব্দে তোমরা সাখী গাইতে নার।

উত্তর— শুন শুন গুণিগণ করি নিবেদন,
যে সাখী কহিনু উত্তর করহে শ্রবণ।
পশ্চিম হতে আসি ভাই পূবে চলে যাই,
শিবের মন্দিরে আসি ভিক্ষা করে খাই।
এগ্রাম সেগ্রাম বলি গণ্ডাপালে বাসা,
কেবল মাত্র মোর মনসা ভরসা।
নিজ নাম ঘনশ্যাম শুন সর্বজনে,
পিতার নাম রাধানাথ কহিনু এক্ষণে।
শিক্ষাগুরু লক্ষীকান্ত কহিনু এখন,
তাহার চরণ বন্দি সবার ভিতর।
মাহাতো মোর জাতি বলিয়া সবার মাঝে রাখিনু খেয়াতি।
সাখীর উত্তর বলে দিলাম আমি
ঘরে গিয়ে পুরাণ খুলে বিচার কর তুমি
মা মনসার চরণে অসংখ্য প্রণাম।
বাজুক বিষম ঢাক চলুক ঝাঁপান॥ —ঐ

পূর্বেই বলিয়াছি, সাখীগান প্রবে ঝাঁপান বা সর্পবিদ্যা-বিশারদদিগের বার্ষিক সম্মিলন উপলক্ষেই গীত হইত। গুণী বা ওঝাদিগকে লইয়া তাহাদের শিষ্যগণ যে শোভাযাত্রা করিত, তাহা গ্রামের পথে কিছুদূর অগ্রসর হইলে অন্য এক সম্প্রদায়ের শিষ্য তাহাদিগকে সঙ্গীতের ভিতর দিয়া প্রশ্ন করিত, সঙ্গীতের ভিতর দিয়াই তাহায় জবাব দেওয়া হইত। ঝাঁপান উপলক্ষে যে সকল অন্যান্য সঙ্গীত গীত হয়, তাহা প্রধানতঃ সাহিত্য-গুণবিবর্জিত। উত্তর প্রত্যুত্তর ব্যতীতও সাখীগান কিছু কিছু শোনা যায়—

৮

সীতার সনে রঘুনাথ পঞ্চবটীর বনে,
জানকীর সহিত রাম বসিলেন একাসনে।
খেলিছেন রাম পাশাসারি।
হেনকালে রাইক্কস মেয়ে এল সেইখানে।

নাম তার সূর্পণখা চাউনি বাঁকা কানে মদন কড়ি,
কঁচি (কুচি) করে পরে আছে কমলা পাড়ের শাড়ি।
দেখায় যেন মেঘের মালা নীল কিনারা,
তায় দিয়েছে কোঁচা লম্বা হয়ে পড়ল মাগীব বাম কদলের মোচা
মাগীর ঠম ঠমকা আড়ে ঘোমটা আড নয়নে চায়,
বুকেব উপব পীব পয়দা মুক্তা বেডা তায়।
তিনি যেন তিলোত্তমা সত্যভামা উর্বশী মেনকা,
মেয়ে রূপে নবরূপে হলেন সূর্পণখা।
এলেন রামেব কাছে মধুব ভাষে জোড কবি হাত,
একটি নিবেদন শুনহে ওহে রঘুনাথ,
আমি তায় অল্পকালে ব্রতছলে ছাড়িযে বসতি,
দেশে দেশে খুঁজে পাইনা মনেব মত পতি।
ইহা যদি মনে লাগে তাহাব আগে কি কবিতে পাবে।
খেলিব রসেব খেলা হযে একত্রিত,
থাকিব নীলকমলে চাপাব এনে,
সীতাব সনে প্রযোজন নাই তোমায আমায জোড।
ঐ কথা শুন্যে দৌড়ে গিযে ধবল লক্ষ্মণ সূর্পণখাব জটে—
গোটা দুই পাক দিয়ে ভূমে ফেলে টুটে নাক কান।
নাক ভেষ্টা নাকে শোভা টুটে গেল কান।
উঠেছে গুপ্তাচুডী ভেডা দৌড়ি যেন উদাম সাডী,
জানকী হাসিযে বলে কি হল লো বাঁড়ী
আহা কেনে বা আইলাম মান হাবাইলাম পঞ্চবটীর বনে —

৯

প্রশ্ন— কুথা হোতে এলেন তুমি কুথায় তোমাব স্থিতি
কাহার দুয়ারে তুমি করেছেন বসতি।
কাহার দুয়ারে তুমি বাড়ী কবেছ আশা।
কোন কুলে জন্ম তোমাব কোন গ্রামে বাসা।
উত্তব— উত্তর থেকে এলাম আমি দক্ষিণে চলে যাই,
শিবেব দুয়াবে গিয়ে ভিক্ষা মেগে খাই।

ধর্মের দুয়ারে আমি বাড়ী করেছি বাসা,
শূদ্র কুলে জন্ম আমাব নিজ কুলে বাসা।

১০

সাকী শুন সাকী নাথ গোকুলেরই কথা,
পঞ্চ অবতাবে কৃষ্ণেব জন্ম হলো কোথা।
জন্ম হলো এথা সেথা দৈবকীর ঘবে,
বাসুদেব তুলে নিল গোকুল নগবে।
গোকুল নগবেব লোক বলে হবি হবি।
পুষ্প দেখে ঝাঁপ দিলেন মুকুন্দ মুবাবি।
বিসজল ছিল ভাই অমৃত জল হ'লো।
তা দেখিযে গরুড বীবকে স্মবণ কবিল।
দেখ দেখ গরুড বীব দেখ দুটি আখি।
এখনি ধবেছি সখো, নাহি মানে সাকী॥
এলেন সুপতি ভাই বেলেব সে পাতা।
তা দিযে পড়াইব কজ্ঞানেব মাথা।

১১

পঞ্চবটীর বনে বাম বান্ধি কুডাখানি।
কাল হইয়ে এলো বামকে সোনার হবিণী।
ঐ মৃগ দেখতে পালায জানকী নন্দিনী।
ঐ মৃগ ধবে দাও হে বাম বঘুমণি।
ধবিতে নাবীব মৃগ, মেরে জিব আমি।
দুর্জয় গণ্ডীব বাঁধ লয়ে বাম চলিলেন শিকার
আগে আগে যায মৃগ পশ্চাতে শ্রীবাম।
নাচিতে নাচিতে মৃগ গেল দূব বন।
গাছের আড়ে থেকে থেকে মৃগ খেলেন বাণ
বাণ খেয়ে ডাকে মৃগ কোথারে লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বলে কান্দে লাগিল।
সেই বাক্য শুনতে পেলেন জনক নন্দিনী।
সঙ্কটে পড়িয়ে বাম হে ডাকেন লক্ষ্মণ।

শুন শুন সীতা বলি গো তোমায়।

ত্রিভুবনে বীর নাই গো, রাম আইসে জিনে।

কে জানে কে জানে, প্রভু, তোমাদের মহিমা।

কটুবাক্য শুনে লক্ষ্মণ কর্ণে দিলেন হাত।

রামকুণ্ডু বলে লক্ষ্মণ দুয়ার দিলেন আঁক।

এই অঙ্ক যদি সীতা তুমি হও গো পার।

কখনো না দোষ দিবে লক্ষ্মণ তোমার।

রাম মন্ত্র শুনে বিষ তুই যদি থাকিবা গায়

রাম মন্ত্র শুনে তুই উড়ে যা।

ওং ভাইরে,

রাম গরল লক্ষ্মণ গরল গরল হনুমান

পশ্চাতে ঢলিয়া পড়েন মন্ত্রী জাম্ববান।

শুন বিনোদিনী—

শ্রীরাম স্মরণে বিষকে কইবা এলাম পাণি।

শেষের পদ কয়টি পড়িলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে ইহা ঝাঁপ বৈদ্য ও ওঝাদিগের ব্যবহৃত সর্পমন্ত্র, কিন্তু তথাপি রামায়ণ কাহিনীর রস ইহাতে ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ইহা হইতে দেখা যায়, সর্পমন্ত্রের মধ্যে গিয়াও রামায়ণের কাহিনী প্রবেশ করিয়াছিল।

সাত

বাঁধনা পরবের গান

রাঢ় অঞ্চলের পশ্চিম সীমান্তবর্তী স্থানে কার্ত্তিকী অমাবস্যা তিথিতে যে গো-পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহা বাঁধনা পরব বলিয়া পরিচিত। ইহাতে অনুষ্ঠানিক ভাবে গো-পূজা উদযাপন করিয়া নৃত্য, সঙ্গীত ও বাদ্য সহযোগে নানাভাবে গো-মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের একটি প্রধান অঙ্গ গরু বা মহিষ নাচানো। শক্ত খুঁটিতে একটি বলিষ্ঠ মহিষ কিংবা ষাঁড়কে বাঁধিয়া তাহাকে কাঠি দিয়া খুঁচাইয়া তাহাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তোলাই ইহার উদ্দেশ্য। পূর্বে এইভাবে অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিতে ইহাকে শেষ পর্যন্ত হত্যা করা হইত। বর্তমানে কেবলমাত্র লাঠি দিয়া খুঁচাইয়াই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই উপলক্ষ্যে ইহাকে ঘিরিয়া যে নৃত্যগীত চলিতে থাকে, তাহাতেই বাঁধনা পরবের গান প্রধানতঃ শুনিতে পাওয়া যায়। এই উপলক্ষে কাঁড়া বা মহিষের জন্মকথা কীর্তন করা হয়—

১

শিকড় ভুইয়ে[১]রে কাঁড়া তোরি জনমরে।
সাত ভুঁইয়ে[২] লিল্হে গৃহবাস ॥
গোলায় ভাছি পালরে গুলিনে[৩] পুষিরে
বাগালে তো ডাকে ভোমরা[৪] নাম রে ওহিরে।

এই উপলক্ষে কোন কোন অঞ্চলে একটি নীতি-কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহাতে দেখা যাইবে, ইহাকে কপিলা-মঙ্গল গান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'কপিলা-মঙ্গল' নামক যে কয়খানি পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। কারণ, মধ্যযুগের 'কপিলা-মঙ্গল' কাব্যে যে কাহিনী বর্ণিত আছে, তাহাতে দেখা যায় যে, তাহা ভাগবতের কাহিনী বর্ণিত ব্রহ্মা কর্তৃক কপিলা গাভী হরণের বৃত্তান্ত লইয়াই প্রধানতঃ রচিত। তাহা ব্যতীতও পুরাণে

১ পশ্চিম দেশ, ২ সাত রকম দেশ (মেদিনীপুর সপ্তভূমের অন্তর্গত) ৩ মালিক, ৪ আদরার্থক নাম।

কপিলা গাভা সম্পর্কে যে সকল কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, 'কপিলা-মঙ্গল' তাহাদের কোন কোনটির অনুবাদ মাত্র। কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত কাহিনীটি লৌকিক স্তর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

প্রথমে বন্দনা করি গণেশ চরণ। তারপরে বন্দিব নাবায়ণ।
তারপরে বন্দনা করি, গাঁয়ের গরাম হরি, যত দেব প্রণামি চরণে॥
তারপরে বন্দনা করি লক্ষ্মী-সরস্বতী, তাবপরে বন্দিব ভগবতী।
তারপরে বন্দনা করি হরপার্বতী, যত দেব প্রণমি চরণে॥
তারপরে বন্দনা করি গোরোয়া গোঁসায়, তারপবে বন্দিব দশ ভাই।
বন্দনা সমাপ্ত করি, সবে মিলে বল হবি, হরি হলেন ভবের কাণ্ডারী॥

গাইতে বাসনা মোর কপিলা মঙ্গল গান, সবে মিলে কর কৃপা দান।
অজ্ঞান আমি অবলা, দেহ মোরে চরণ ধূলা, গাইব কিছু কপিলা-মঙ্গল গান।
শুন শুন সর্বজন, করি আমি নিবেদন এই মূর্খের মুখে কিছু করহ শ্রবণ।
আমি অতি মূঢ় মতি, না জানি ভকতি স্তুতি, দোষ-ত্রুটি করিবে মার্জন।
নাবালক কালে কানুর মাও মবি ছাড়িল, পুষেছিল শিরোমণি গাই।
আশ্বিন বাহির হতে কার্তিক সামালো সেইদিনে গাই ধনি হারালো॥
হায় হায় বিধি, হায় হায় বিধাতা, কি বিধি কি ঘটিল কপালে,
তখন কানুভালা আঁধারে উঠিল চলি গেল গাই ধনি পাঁজনে।
গোটা পৃথিবী কানু খুঁজাখুঁজাইতে রে কোন দিকে পাঁজ না মিলে॥
তখন কানু বাড়ী ফিরে এলো, গোয়াল দুয়ারে দাঁড়িয়ে কাঁদিতে লাগিল,
দুই নয়ন বানে ভাসাইযা গেল।
তখন কানু ভালা নিজ পরিবারকে বলিতে লাগিল—
দিহ ন'গ গামছায় কেন বাঁধি,
আমি যাব গাই ধনি পাঁজনে, কোনখানে জলটুকু খাব।
তখন কানুকেরই পরিবাব বলিতে লাগিল, কিয়া আমি গামছায় বাঁধিব।
চারিকোণ ঝাট দিলাম, ঘরে নাই লক্ষ্মী, কিয়া আমি গামছায় বাঁধিব।
তখন কানু কাঁদিতে লাগিল, কি বিধি, কি ঘটিল কপালে।
তখন যে কানুভালা বলিতে লাগিল, শোনো বাছা গোরোয়া ঠাকুর।

আমার গাই ঠাকুর পাঁজি যদি আনি দিও রক্তে তো ছাপর খেলাব।
তখন গোরোয়া ঠাকুর বামুন বেশ নিল, চলি গেল কানুকে দুয়ারে।
দিয়ো যে দিয়ো কানু একমুঠা ভিক্ যেতে হবে দোসরা দুয়ারে॥
তখন যে কানুভালা বলিতে লাগিল, কিয়া ঠাকুর তোমায় ভিক্ দিব।
চারিকোণ ঝাট দিলাম ঘরে নাই লক্ষ্মী কিয়া দিয়া করিব বিদায়॥
তখন যে কানুভালা কাঁদিতে লাগিল, কি বিধি কি ঘটিল কপালে।
হায় হায় ঠাকুর, আজ এই বিধি লিখিল কপালে।
তখন যে ঠাকুর ভালা বলিতে লাগিল কেন কানু কাঁদয়ে বিকিলাও।
কিয়া যে দুঃখ্ কানু, কিয়া তোর বিপদ ঝট্‌বেগে বলনা মোরে কথা।
নাবালক কালে ঠাকুর মা মোর মরিল পুষেছিলাম শিরোমণি গাই।
আশ্বিন বাহিব হতে কার্তিক সামালো সেই দিনে গাই ধনি মোর হারায়।
হায় হায় বিধি ঠাকুর, হায় হায় বিধাতা কি বিধি কি ঘটিল কপালে॥
তখন যে ঠাকুর ভালা কানুরে বোধ দিল, নাহি কানু কাঁদরে বিকলাও।
তখন যে ঠাকুর ভালা, পাঁজি পুঁথি আওডাল দেখে সে কানুকেরই গাই।
নাই যে কাঁদ কানু, নাই বিকলাও, তোবি গাইতো আছে বৃন্দাবনে।
খাইছে বাঘামারি ঘাস।
তখন যে কানু ভালা, ঠাকুরের পায়ে ধরি বলিছে,
বামুন নাই ঠাকুর, বৈষ্ণব নাহি তুমি ঠাকুব গোরোয়া গোঁসাই।
আইস যে বৈস ঠাকুর গোয়াল দুয়ারে পাঁজি আন আমারই গাই।
তখন কানু ভালা বলিতে লাগিল যাও নাগো কুঁড়া মাগি আন॥
ঠাকুরের সঙ্গে আমি গাই পাঁজনে যাব কোনখানে জলটুকু খাব।
তখন কানুকেরই পরিবার বলিতে লাগিল, আজ আমি কার দুয়ারে যাব॥
পাডার লোক ঘোল মাগিতে এলে নাহি কভু দিই চোকা ঘোল।
তখন কানুকেরই পরিবার লজ্জার মাথা খেল, চলিলেন মণ্ডল দুয়ারে॥
দিহ যে দিহ তোমরা পাট্‌রা কুঁডা বুডা আমাদেব গাই পাঁজনে যাবে।
কোনখানে জলটুকু খাবে॥
তখন মণ্ডল বলিতে লাগিল, তুমি যে গো বড লোকের বিটি,
পাড়ার লোক ঘোল মাগিতে গেলে নাই কভু দিও চোকা ঘোল।
আজ কেন কুঁড়া মাগ?

তখন কানুকেরই পরিবার চট্‌পট্‌ বাড়ী ফিরে এল,
কোথাও যে কুঁড়া নাহি মিলে,
তখন কানুকেরই পরিবার কাঁদিতে লাগিল।
দুই নয়ন বানে ভাসি গেল॥
তখন ঠাকুর আঁধারে উঠিল, কানুও ত পিছু পিছু গেল।
একক্রোশ গেল, দুই ক্রোশ গেল, তিন ক্রোশে কানু থকিত
হয়ে পড়িল।
তখন যে কানুভালা বলিতে লাগিল, কৈ ঠাকুর, কোথায় আমার গাই,
তখন ঠাকুর বেউরা মূলে দাঁড়ায়ে আঙ্গুল বাড়ায়ে দেখাইয়া দিল,
ঐ যে কানু ঠিকই তোরই গাই, আশি ক্রোশ করিছে বাথান।
তখন যে কানু ভালা, বলিতে লাগিল, যাও ঠাকুর গাই ফিরিয়ে আন।
নইলে দিয়ো যে দিয়ো ঠাকুর আমার গলায় পা।
আমিও যাব, জন্মের মত, গাই আমার যাক্ বৃন্দাবনে।
তখন ঠাকুর মাছি বেশ নিল, রুনুঝুনু উড়িল, বসিল শিরোমণির পিঠে।
আর বলে, ফিরো মা ধব্‌লি, ফিরো মা শ্যামলী।
ফিরি চল আপনাকে ঘরে।
তখন গাই সবে বলিতে লাগিল, যে পথে এলে ঠাকুর
সেই পথে ফিরে যাও।
আমরা তো ঘর না ফিরিব।
তখন ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিল, কিয়া তোদের দুঃখ গো বিপদ?
কিয়া যে দুঃখ তোদের, কিয়া যে বিপদ, ঝাট্‌বেগে
বল না মোরে কথা।
তখন শিরোমণি গাই বলিতে লাগিল, শুন ঠাকুর আমাদের বিপদ।
আমাদের গুলিনের বড়ই অহংকার, টুট্‌কা বাড়নে মারে ঝাঁটা।
তখন গাই সবে বলিতে লাগিল, শুন ঠাকুর, আমাদের বিপদ।
আমাদের গুলিন্ দুনিয়ার অজ্জরা, চারিধার ঝাঁটালো
কভু নাই ঝাঁটা ধোল,
সেই ঝাঁটা গুজে আমাদের ছাঁচায়—
সেই দেখে আমরা বেরিয়ে এলাম॥

তখন ঠাকুর বলিতে লাগিল, শুন শিরোমণি আমারই বচন।
তোমাদের গুলিন দোস্‌রা আনিবে, চল তোমরা বাড়ী ফিরে চল॥
তখন গাই সবে বলিতে লাগিল, শুন ঠাকুর আমাদের বচন।
আমাদের জন্য কেন তাদের জোড় ভাঙ্গি দেব॥
ওরাই থাকুক্ দুই জনে, আমরা থাকিব বৃন্দাবনে।
তখন ঠাকুর বলিতে লাগিল, শুন বাছা, কপিলা গাই,
আজিকার মত বাছা আমার কথা রাখ, চল বাছা ঘর ঘুরি চল।
তোদেরই গলাগুলিন কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে লরে গোয়াল ভাসায়ে দিছে॥
তখন শিরোমণি গাই, বলিতে লাগিল আমরা যে বাড়ী ফিরে যাব।
আমারই গৃহাকে বত্রিশা জানাইয়া দিও॥
আশি ক্রোশ গোয়াল বানিয়ে রাখ্‌বে আমরা তো বাড়ী ফিরে যাব।
তখন ঠাকুর বলিতে লাগিল, কিয়া করি গোয়াল বনাব।
চারি কোণ ছাঁট দিলা ঘরে নাই লক্ষ্মী কিয়া দিয়া গোয়াল বনাবে।
তখন শিরোমণি গাই বলিতে লাগিল, শুন ঠাকুর, আমারই বচন।
গঙ্গা গোয়ালে ঠাকুর, দক্ষিণের কোণে একই গইরা টাকা
পোঁতা আছে।
সেই দিয়া যেন কাঠাড় তলেও বাঁধে॥
আশ্বিন বেরুল, কার্তিক সামালো অমাবস্যা লাগবে, সেই দিনে
গাই বাড়ী ফিরে আস্‌ছে।
এক ক্রোশ এলো, দুই ক্রোশ এলো, তিনই ক্রোশে বুলাকে বাথানে।
তখন গাই সবে বলিতে লাগিল, শুন ঠাকুর, আমাদের বচন।
ঝট্‌বেগে ঠাকুর গণি গাঁথি লিহ্, আমরা তো যাব বৃন্দাবনে॥
তখন কানুভালা গলায় কাপড় নিল, পড়িল শিরোমণির পায়ে।
দিহ্‌ যে দিহ্‌ শিরোমণি আমার গলায় পা,
আমিও যাব জন্মের মত তোমরাও যাবে বৃন্দাবন।
তখন গাই সবে ঘর দিকে ফিরিল, চলি যায় আপন ঘরে।
একে একে গাই সবে ঘর দিকে সামাল শিরোমণি চাল ঝাঁকি দিল,
তখন কানুকেরই পরিবার বাথান দি বেরল, কেন ব্যেধা মড়ার গরু
আজ আমার চাল ঝাঁকি দিল।

তখন গাই সবে ঘুরিয়া পড়িল, আমরা তো চলিলাম বৃন্দাবনে।
আমাদের গুলিনের যায় না অহংকার, ওরাই থাকুক দু'জনে,
আমরা চলিলাম বৃন্দাবনে।
তখন কান্থু আবার গলায় কাপড় নিল, পড়িল শিরোমণির পায়ে॥
দেহ শিরোমণি আমার গলায় পা।
আমিও তো যাই জন্মের মত, তোমরাও যাও বৃন্দাবন॥
তখন গাই সবে ঘর দিকে সামাল শিরোমণি আঙ্গিনায় দাঁড়াল,
আঙ্গিনা দাঁড়ায়ে কাঁদিতে লাগিল, তিন ফোঁটা লর পড়ি গেল,
বলে ইহ বটে মাজমিকা পুতা॥

পর্বত হইতে নামিল, কপিলা নামিল, নামিল, গঙ্গা কিনারে।
চরিয়ে বাধিয়ে পাণি পিয়াইতে গেল গঙ্গা তারে বাধা দিল॥
তখন গঙ্গা বলিতে লাগিল, হঁ্যা, হঁ্যা রে কপিলা,
পাণিও না কর জুঁঠা তোরি কপিলা নাই জাতিকুল।
তখন কপিলা বলিতে লাগিল, শুন গঙ্গা, আমারই বচন।
তুমি গঙ্গা, আমি যে কপিলা, তোমায় আমায় কিসের বিবাদ।
তখন গঙ্গা বলিতে লাগিল, শুন কপিলা আমারই বচন।
তোরই যে গয়লা কপিলা দুধ দুহিলে, ছাঁদিয়ে বাঁধিয়ে, তোরি
কপিলা নাহি জাতিকুল।
তখন কপিলা বলিতে লাগিল, শুন গঙ্গা আমারই বচন।
তোরই যে উপর গঙ্গা পইড়া নৌকা চালায় তোরই কিসে জাতিকুল॥
তখন কপিলা গাই বলিতে লাগিল, আমারই পুতা গঙ্গা
আগুরহালে ঘুরে,
শিলা সিঁদুর পরে, আমার দুধে সিনায় মহাদেব।
তোরই গঙ্গা কিসে জাতিকুল॥
তখন কপিলা গাই:বলিতে লাগিল, শুন গঙ্গা, তুই কানওড়াই,
তোরই উপর গঙ্গা দুনিয়ার অজ্জরা ভাসে আমার গুয়ে পৃথিবী সত্য,
আগে মাড়িব, পিছে খাইব, তোরই গঙ্গা নাহি জাতি কুল॥

৪

প্রশ্ন— সব গীত গাহ্‌য়ে গুরু গীত গাহ্‌না।
তোরই গীত গেল গঙ্গাপার।
ঝুমুঝুমু উডয়ে ডানামেলি বসয়ে তাহাকেরা নাম ধরি দিও।
উত্তর— সবগীত গাহ বলি, গুরু গাহ্‌না,
তোরই গীত মধুর লাগে।
ঝুমুঝুমু উডয়ে ডানা মেলি বসয়ে
তাহাকেরা নাম মহাজাল।
প্রশ্ন— সবগীত গাহয়ে গুরু গীত গাহ্‌না,
তোরই গীত গেল গঙ্গা পার।
কপিলা মঙ্গল গান কব তাহার বৃত্তান্ত বল, কোন দিনে কপিলার জন্ম।
উত্তর— সব গীত গাহ বলি, গুরু গাহ না,
তোরই গীত মধুর লাগে,
কপিলা মঙ্গল গান করি তাহাব বৃত্তান্ত বলি,
কপিলাব জনম বুধবাবে ॥[১]

বাধনা পরব উপলক্ষে কার্তিক মাসে অমাবস্যার রাত্রে কালী পূজার দিন জাগা গান গাওয়া হয। ইহা গরুকে জাগানোর গান। গরু জাগানোর পরের দিনই গরুর উৎসব বাঁধনা।

১

প্রশ্ন— কোনো পিঠে অকুলা বকুলা
কোনো পিঠে মাহুত
কোনো পিঠে দলপত্তিরাজ
ছোটই বডই করে পেলাম।
উত্তর— কাডার (মহিষের) অবুলা বকুলা
হাতীৰ পিঠে চাপে মাহুত
ঘোডার পিঠে দলপতি রাজ
রাজাকে সবাই কবে সেলাম। —বেলপাহাডী (মেদিনীপুর)

ঝাড়গ্রাম মহকুমাব এড়গোদা গাম হইতে শ্রীশ্বেতাংশুশেখব মাহাতোর সাহায্যে সংগৃহীত

২

প্রশ্ন— কে'ও মরিলে কাঞ্চাকুঁওর
কে'ও মরিলে রেটুঅর
কে'ও মরিলে জোড় বাহু টুটই
কে'ও মরিলে গৃহশূন্য।

উত্তর— বাপ মরিলে কাঞ্চাকুঁওর
মা'ও মরিলে টুঅর
ভাই মরিলে জোড় বাঁহি (বাহু) টুটাই
বউ ঝি মরিলে গৃহশূন্য।

—ঐ

বিহার প্রদেশে আহির জাতির মধ্যে যে গো-পূজার অনুষ্ঠান হয়, তাহাও এই কার্তিক মাসেই অনুষ্ঠিত হয় এবং গরুকে নাচানো তাহারও একটি প্রধান অঙ্গ। সেই উপলক্ষেও যে নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান হয়, তাহাও পশ্চিম সীমান্ত বাংলারই অনুরূপ। একটি গানের ইংরেজি অনুবাদ এই প্রকার :

Who commanded the Dashara ?
Who decreed the five days ?
Who commanded Sohrai
And the dance of the cows ?
Raja Dasrath commanded the Dashara
Ram decreed the five days
Krishna commanded Sohrai
And the dance of the cows.

(W. G. Archer, *The Vertical Man*, Londan, 1957, P. 26)

আট

বিবিধ গীত ও নৃত্য

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঝাড়গ্রাম মহকুমার বেলপাহাড়ী গ্রাম হইতে সংগৃহীত সাংবৎসরিক গীত ও নৃত্যের একটি বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল, ইহা হইতে এই অঞ্চলের এই বিষয়ক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে।

বৈশাখ মাসে এই অঞ্চলের নারীসমাজে 'তুলসী' গাছ এবং 'দড়ি' গাছকে কেন্দ্র করিয়া এক সুন্দর মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান গড়িয়া উঠে। বৈশাখ মাসের প্রতিদিন সকালে মেয়েরা তুলসী গাছে জল ঢালে, সেই সঙ্গে ফুল দিয়া মুখে আবৃত্তি করে—

তুলসী তুলসী মাধব লতা,
ও তুলসী, তোমার পায়ে ঠুকি মাথা।

আবার এই সময়ে অনেকে 'দড়ি' গাছকে ভক্তিভরে পুজা নিবেদন করে। 'দড়ি' গাছের গোড়ায় সকালে মেয়েরা জল ঢালে, আর বলে—

ঢালে গঙ্গা পাতে বিষ্টু
জটে বসন্তি মহেশ্বর
দড়ি বিক্ষে জল দাও
ওগো দড়ি ব্রাহ্মণী নমস্তে।

এই দড়ি গাছ সম্বন্ধে একটি প্রবাদও প্রচলিত আছে। কোন মুনির শাপভ্রষ্টা পত্নী এই দড়ি গাছ।

দড়ি গাছ সম্পর্কে এখানে দুই একটি কথা বলা দরকার। বাবুই ঘাস নামক লম্বা ঘাসের মত এক প্রকার তৃণ দ্বারা এই অঞ্চলে দড়ি তৈয়ারী হয়, এই দড়ি বিক্রয় করিয়া এই অঞ্চলের সাধারণ লোকের জীবিকা নির্বাহ হয়। এই ঘাসের দড়ি প্রতি হাটে বিক্রয় হয়। সেইজন্য এই অঞ্চলের অর্থ নৈতিক জীবনের নানা সূত্রে ইহা জড়িত। সুতরাং ইহা লৌকিক দেবতায় পরিণত হইয়াছে।

বৈশাখ যায়, জ্যৈষ্ঠের প্রথম কৃষ্ণপক্ষে 'রহিণ' পুজার প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। এই 'রহিণ' পুজা এই অঞ্চলের মনসা পুজারই নামান্তর মাত্র। জ্যৈষ্ঠের

প্রথম তের দিন ধরিয়া এই পুজা চলে। সন্ধ্যা বেলা এই পুজা হয়। পুজার উপাচার ফল, ফুল, মিষ্টান্ন ইত্যাদি, কিন্তু পুজার একটি বিশেষ পদ্ধতি লক্ষণীয়— পুজার স্থানে একটা থালায় আগুন (টিকে) দেওয়া হয়, আর তাহাতে প্রচুর ধূনা দেওয়া হয়। ধূপব (পুরোহিত) আসিয়া প্রথমে ঐ আগুনের থালাটি শুষিয়া লইবে এবং এক নিঃশ্বাসে আগুন নিভাইয়া দিবে। তারপর মনসা-মঙ্গলের কথা বলা হয়।

আষাঢ মাসে এখানে একটি বিশেষ পূজাব প্রচলন আছে। তাহা বডো পাহাড পূজা, কানাইশহরে একটি নির্দিষ্ট পাহাডকে কেন্দ্র করিয়া এই পুজার আয়োজন হয়। বডো পাহাড এখানে অতীব জাগ্রত দেবতা। ইহা সাঁওতাল জাতির মুরাঙ্ বুরো।

আষাঢ মাসে বডো পাহাডের কোলে মেলা বসে, নানা আমোদ-প্রমোদের আয়োজন হয়, আৰ সেই আনন্দ আয়োজনকে ছাপিয়ে উঠে ভক্তের আকুল প্রার্থনা —'হেই বডো বাবা, দয়া করো'। যাহার যেমন সাধ্য সেখানে পুজা দেয়। কোন পুরোহিত কর্তৃক সেই পূজা হয় না। ব্যক্তিগত ভক্তিই নিবেদিত হয়। প্রচলিত একটি বিশ্বাসে জানা যায়, সন্তান কামনায়, কোন কাজের সফলতা কামনায়, সাংসারিক ও সামাজিক মঙ্গল কামনায় মানত করিয়া সেইখানে লোকে দডি বা সুতা বাঁধিয়া আসে। এমন কি, দূরদেশে যাত্রার প্রাক্কালেও বডো পাহাডের শুভ আশীর্বাদ-আশায় ছুটিয়া যায়।

আষাঢ়েৰ শেষে শ্রাবণ মাসে হয় 'মনসার ডাক', এই সময় শ্রাবণ-সংক্রান্তিতে মনসার পুজা হয়—সাধাৰণ ভাবে কোথাও ঘটে, আবার কোথাও মূর্তিতে।

ভাদ্রের সংক্রান্তিতে বিশ্বকর্মা পুজা হয়, ইহা কেবল ব্যবসায়ী এবং কর্মকার শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই পুজায় তাহারা বিশ্বকর্মার মূর্তি তৈরী করে না, তাঁত কিংবা যন্ত্রের পুজা করে।

আশ্বিন মাসের দুর্গা পুজার কোন প্রভাব এখানে নাই। বিজয়া দশমী দিন ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে 'ভৈৰব' পুজা। ভৈরব পুজার বিশেষ অঙ্গ কাঠি-নাচ। কাঠি নাচে মেয়েদের কোন অংশ নাই। পুরুষরাই গীত সহযোগে এই নৃত্য প্রদর্শন করে। কাঠি-নাচ সর্বভাৰতীয় লোক-নৃত্য, গুজৰাটে ইহাকে রাস নৃত্য বলে, ইহাৰ সঙ্গে আদিবাসী সমাজের কোন সম্পর্ক

নাই। কাঠি-নাচের গানগুলি 'পালা' নামে পরিচিত; গানগুলি কৃষ্ণবিষয়ক এবং রামসীতা-বিষয়ক হয়। ভৈরব মূর্তির সামনে এই নৃত্য প্রদর্শিত হয়; কয়েকটি গানের নমুনা দেওয়া যায়—

১

একদিন কৃষ্ণচন্দ্র বিদুরেরই পাশে,
মুখে বস্ত্র দিয়ে বলী দুর্যোধন হাসে।
বিদুর আস, বিদুর আস, বিদুর আস ঘরে,
তিন দিনের উপবাস তোমার মন্দিরে,
কুড়িয়া ভিতরে বিদুর উঁকি দিয়া চায়,
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম দেখিবারে পায়,
কুড়িয়া ভিতরে বিদুর কাঁথায় শুইয়েছিল,
সেই কাঁথা লইয়া প্রভু আসন যোগাইল।
বসিতে আসন দিয়া ভাবেন মনে মনে,
কি খাওয়াব নইয়া (নয়া) খাওয়া নারায়ণে।
এই বোল বলিয়ে বিদুর চতুরপানে চায়,
বাড়ির দক্ষিণে কলা দেখিবারে পায়।
এক ফেনি কলা এনে কৃষ্ণ সম্বোধিল,
তা দেখে বিদুব ভকত কাঁদিতে লাগিল।
না কাইন্দ না কাইন্দ, বিদুর, ভকত বট তুমি।
তোমাব ভকতি দেখি কলা খেলাম আমি।
বিদুবের খুদ মুষ্টি তরঙ্গেরই জল,
হস্ত পেতে ল্যান প্রভু ভকত বৎসল।

২

গোরা গুণে প্রাণ কান্দে কি বুদ্ধি করিব।
সে হেন গুণের গোরা কোথা গেলে পাব ॥
কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম কে দিবে যাচিয়া ॥
উঠি বসি করি কত পোহাইব রাতি।
না যায় নিলাজ প্রাণ কঠিন নারীজাতি ॥

এত দুঃখে প্রাণ রহে এত বড় লাজ।
বাসদেবের মাথে কেন না পড়িল বাজ॥ —বেলপাহাড়ী

৬

উপর ডালে কারিকুরি, মাগো, নামোর ডালে বাসা,
ধরব ধরব মনে করি, মাগো, মনে রইল আশা।
রাত হল অবশেষ যাতি হবেক লঙ্কাদেশ—
বঁধু হে, ভাঙ্গো তুমি গায়ের আলেস। —ঐ

কার্তিক মাসে এখানে 'গড়য়া' নামে একটি উৎসব হয, এই উৎসবটি একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য উৎসব। শেষ রাত্রে এই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়। বাজনা লইয়া ধাঙ্গড়েরা পাড়ার সকলকে জাগাইযা দেয়। ইহার পূজা গোয়ালে অনুষ্ঠিত হয়। পূজার উপকরণ ঘিয়ের সাতটি পিঠা এবং শালুক ফুল। শালুক ফুলে পরিচ্ছন্ন গোযালটি সজ্জিত করিযা ঘিয়ের সাতটি পিঠা দিযা পূজা হয়। ভোর হওয়ার পূর্বেই এই পূজা শেষ হয়। অগ্রহায়ণ মাসে এখানে লক্ষ্মী পূজা হয, ইহার মধ্যে এমন কিছু অসাধারণত্ব নাই। পৌষ মাসে অনুষ্ঠিত হয় টুসু। এই পূজাতে টুসুর গান হয। টুসুর উল্লেখ ছাড়াও কেবল রাধাকৃষ্ণ এবং রামসীতা অবলম্বন করিয়া টুসু গান গীত হয। তাহা ছাড়াও পিঠা করিবার রীতিও আছে। মাঘ মাসে এখানে ধর্ম রাজ্যের সইন পূজা অনুষ্ঠিত হয। ইহা এখানে স্ত্রী-পুরুষ জাতিধর্ম-নির্বিশেষে করিযা থাকে। ফাল্গুন মাসে শিব-চতুর্দশী পূজা হয। ঘরে ঘরে এই পূজা হিন্দু মেয়েরা করে। চৈত্র মাসে গাজনও এখানে একটি সর্বজনীন পূজা বা উৎসব। গাজনের সময় এখানে বিভিন্ন ধরণের গানও গীত হয। গানগুলিতে শিবকে অতিক্রম করিয়া ব্যক্তিগত জীবনের কথায পরিণত হয। সাধারণের মধ্যে দুর্গাপূজার এখানে কোন প্রভাব নাই।

ইহা ছাড়াও এখানে একটি বিশেষ পূজা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহা বৃক্ষ পূজা। বট বা অশ্বত্থ গাছের গোড়ায সিঁদুর দিযা একটি ত্রিশূল আর তিনটি ফোঁটা আঁকা হয়, তিনটি ফোঁটা ত্রিনয়নের প্রতীক্।

এই পূজা প্রতি অমাবস্যায হয়। এই পূজার দেবী কালী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কালীপূজা হইলেও ইহার উপচার তুলসী ও জল। আর কোথাও

কালীপূজায় তুলসীর ব্যবহার অন্তাবধি দেখা যায় নাই। আর কার্তিক মাসের অমাবস্থায় এইখানেই রক্ষাচণ্ডীতলায় কালীমূর্তি তৈরী করিয়া পূজা করা হয়। তখন তুলসী পাতা উৎসর্গ করা হয় না। তখন সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত পাঠা বলি হয়।

চড়কের কয়েকটি গান নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

চৈত পরবের ছাতু কুড়া চালে শুকাইল,
গুণের দে'ওর মেরেছিল আজও দুখাল।

—বেলপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

২

সোজা কাঁটা বাঁকা কইরে পিঠে ফুড়াইছি,
লোক লজ্জায় কাঁদতে নারি ঘুরাও ঘুরাও বলি। —ঐ

বাঁকা কাটা সোজা করে পিঠে দিল ফুঁড়ে,
লোকলজ্জায় কাঁদতে নারি
ধনি, ঘুরাও ঘুরাও বলি। —ঐ

ইহার মধ্যেও ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের কথা অনেক সময় আসিয়া পড়ে;

৪

এত এত টাকা দিলি, মা গো, দিলি বুড়া বরে।
লোক শুধালে বলব মাগো ওটা আমার ঠাকুরদাদা বটে।—ঐ

নদীর ধারের কাশী
আমরা দেখা করে আসি।
জাম ফুলকে বলে দিবিগো
আমরা বড় সুখে আছি। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে একটু আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ আছে, হংস বলিতে সাধারণতঃ আত্মা বুঝায়।

৮

উপর ডালে কারি কুরি
নামো ডালে বাসা,
উড়ে গেল হংসরাজ গো
পড়ে রইল বাসা।
চাইর কুণে চার বাসা কবে গৌরী
মনে রইলো আশা। —ঐ

রাঁড়ীর গোবিন্দা ভক্কা ফুড়াইছে,
জানবি গোবিন্দা কাল সকালে।

এই অঞ্চলে আশ্বিন মাসে জিতা পুজা হয়, ইহার ঠাকুরের নাম জীতবাহন হয়ত জীমূতবাহনের অপভ্রংশ। মানুষের মঙ্গল কামনার জন্য এই পুজা করা হয়। সাধারণতঃ ঘরে কোন অমঙ্গল হইলে এই পুজা হয়। জিতা পুজার সময় রাত্রি জাগিতে হয়। এই সময় সাধারণতঃ নিম্নপ্রকার গান গাহিয়া রাত্রি জাগা হয়।

মাঝ পুকুরে শালুক ফুল রাতে কেন ফোটে,
যার সঙ্গে যার গোপন পিরীত সেই ত মজা লোটে।

৯

আম গাছে আম নাই ফাবড় কেন মার হে,
তোমার দেশে আমি নাই আঁখি কেন ঠার হে।

১০

আম ফলে থোঁকা থোঁকা কি করে কুড়াব একা,
টিকুটিকি দেখেই ননদ পালাল, খঁচের মহুল খঁচেই শুকাইল

১১

খেজুর তলের মাটি আইড় কোলের গাছি,
নেবু তলে ঘুমায় নন্দস্থ ঠাকুরঝি

১২

ধল ভূঁইএর ধল রাজা জোড়া কাড়া করে পূজা,
সাত ভূঁইএর নাবালক বাজা, পবব কবেছে অতি মজা।

এই অঞ্চলেব নৃত্য সম্বলিত অন্যান্য সঙ্গীতও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানকার নৃত্যকে দুইটি ভাগে ভাগ কবা যায। যেমন, ধর্মকেন্দ্রিক এবং সমাজ-জীবন কেন্দ্রিক। ধর্ম-কেন্দ্রিক বলিতে বলা চলে পাতা নাচ, কাঠিনাচ, করম নাচ, গরু নাচ। অপব দিকে সামাজিক নাচ বলিতে ভুয়াং, ছো নাচ ও খেমটা নাচ। এই নাচগুলিকে কেন্দ্র কবিযা নানা সঙ্গীত বচিত হইযা থাকে।

প্রথম পাতানাচ, এই নাচটি সম্বন্ধে স্থানীয লোকদেব মধ্যে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত দেখা যায। যাহাই হউক, অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস অনুযায়ী বলা চলে ইহা সাধাবণতঃ আশ্বিন মাসে ইন্দ্ পূজা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এই পূজা উপলক্ষে একটি শাল গাছকে তুলিযা লইযা গৃহেব আঙ্গিনায রাখা হয়। তোলা গাছটিকে তখন বলা হয আদাগাছ। এই গাছটি শালু কাপড এবং ফুল দিয়া সাজাইযা দেওযা হয। তাবপব তাহাব উপব একটি কাঠ দেওয়া হয়। তারপরই স্বরু হয ইহাকে ঘিবিযা পল্লীবাসী মেয়ে এবং শিশুদের গীত সহকারে নৃত্য। এই নৃত্যে মেযেবা আহ্বান জানাইলেই কেবল পুরুষবা অংশ গ্রহণ করার অধিকাবী হয। এই নাচটির উদ্দেশ্য বৃষ্টির প্রার্থনা। ইন্দ্র এই নাচ গানে আকৃষ্ট হইযা নাকি নামিযা আসেন ধূলিব ধবণীতে, আব তাঁহাব সেই আগমনের আশীর্বাদ স্বরূপ অবিশ্রান্ত ধারায নামিযা আসে বৃষ্টি। দেশ হয ফলবতী। সাতদিন গাছটি থাকে। এই গাছেব উপব রক্ষিত কাঠটি যে দিকে হেলিয়া পড়ে, সাধাবণের বিশ্বাস সেই দিকেই ইন্দ্রেব করুণা বর্ষিত হয। আনন্দ মুখর নরনারী মাদলেব তালে তালে নাচে, তাহাদেব কণ্ঠে গান শোনা যায—

ফল গাছে শূযা পোকা
ওটাই বটে ছেলেব কাকা ইত্যাদি।

কাঠিনাচও ভৈবব পূজাকে কেন্দ্র কবিযা গড়ে ওঠে। কাঠিনাচের বাজনা মাদল।

তার পরে উল্লেখযোগ্য ধর্মীয নাচ হইল কবম নাচ। ইহার সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত দেখা যায়। কাহারও কাহারও মতে করম ও গরম নাচ একই; আবার কাহারও মতে বিভিন্ন। কবম নাচ করম পূজা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

ইহার বাজনা মাদল ও ধাম্‌সা। ভাদ্র মাসে এই পূজা হয়। কয়েকটি গান নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

ইহা আদিবাসীদের মধ্যেও প্রচলিত বলিয়া আদিবাসী ও বাংলা মিশ্র ভাষাতেও করম নাচের গান শুনিতে পাওয়া যায়। যেমন—

১

আখাড়া ছুলালে বাবু বসিকা কৰমে চড়ালে বাড়ী দু।
হেট কুলহি হেট বেট কাশি ফুলের সঙ্গে হো।
গামছা ত দেহবে বিছাই।
উপব কুলহি মাদল বাজে ক্ষণে হুঁ নাই লাগ বে।
হেট কুলহি কবতাল বাজে কালে হুঁ নাই শুনি।

কথা ভালা পাওযালাং কবমাকা ডারি হো,
মিবজু বলে পাওযালাং কবমাকা ডারি হো।
কিমা তেজ বধালাং কবমাকা ডাবি বো
হাড়িয়া মদে বধালাং দেশা ভবি লো
কাটা দুধে বধাল্য কবমাকা ডাবি হো,
টাগি কাটি আনাল্য দেশা ভরিলো—বে হো।
কিনা ভালা শুনি নিদ্রা নাহি আওযায,
সং ভাইত উঠে চলিল।

নিম্নোদ্ধৃত গানটি বন্দনা-গান—

৩

পুজা লেবে পূজার বাবা পূজার মজা থানে,
আছে ত পূজায় পুজার মজা থানে।
তার পিছ পূজায় মহাধামে।
তাঁহারে হা না না না না তাঁহারে তো না না রে
তাহা বে তা না না নারে।
আখাড়া বন্দন করি হরি চলে ধীবে ধীবে
সদওপি মাল ধরি দেখিতে অতি রে সুন্দর

উত্তরে বন্দন করি যাদু শ্রী জল
তার মাঝে পুতা করমে গাড়ায়
দক্ষিণ বন্দন করি যাদু শ্রীজগন্নাথ।
পাতালে বন্দন করি হে বাবা বৈদ্যনাথ
স্বরগে বন্দনা করি ঈশ্বর চন্দ্রনাথ
তার মাঝে পুতা করমে গাড়ায়
পুবে বন্দন করি গঙ্গারি চরণ।
পাতালে বন্দন করি দেবী জগন্নাথ
তার মাঝে পুতা করমে গাড়াই
পশ্চিমে বন্দন করি হে বাবা বৈদ্যনাথ,
তাহার মাঝে পুতা করমে গাড়াই। —বেলপাহাড়ী

৪

তাহারেতে না না তারনা তাহারে তারে নারে
তাহারেতা না না না না রে।
অরুণার বনে কার বাঁশি শুনে আমারিয় অঙ্গ জলে যায় এই রে,
অরুণার বনে যে রামের বাঁশি হে বাজে।

তাহারে তা না না ত্রানা তাহাতে না না রে
তাহারেতা না না ত্রানা নারে
তাহাতে তারে নারে—
কি কাঠের কপাট, দাদা, কি লেখা লেখারে
রাম লক্ষণ গেলায় বনবাস এহরে।
একুল কাঠের কপাট, দাদা, বিবিরা লেখারে
রাম লক্ষণ গেলা বনবাস এহরে।

(চড়াং)

তাহারে তা নানা ত্রানা তাহারে তা নানারে
তাহারে তারে নারে—২
বিবিয়া ধাতা প্রভু কালিয়ে কলঙ্ক
রাম লক্ষণ গেলা বনবাস এহিরাম শ্রীবিন্দার ধন

তাহারে তারে নারে তাহারে তা নাহা নানারে
তাহারে তারে নারে।
হুড়দক মেনা আরো হুড়দক মেন
বাবা হাণ্ডি পাউরা এ্যু তেগেক তোহেল বোহেল
এনা বাং আস আয়ো বাং আগো বাবা
সোহাগ তেজে কুরমু ঠাকুর লে তোহেল বোহেলে॥

ভক্তজনের 'আমার করম ভাইয়ের ধরম' ধ্বনিতে নৃত্যস্থল মুখরিত হয়। আনন্দ বিহ্বল নরনারী একত্রে মাদল ও ধাম্‌সার তালে তালে নাচিয়া নাচিয়া গায়—

পুজা লেরে পুজার বাবা
পুজার মহাথানে
আজে তো পুজার পুজার মহাথানে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য নাচ গরু-নাচ। কার্তিক-অমাবস্যার বৈকালে বলদগুলিকে গ্রামের বাহিরে পাঠাইয়া দিয়া গরুগুলিকে স্নান করাইয়া সুন্দর করিয়া সাজাইয়া রাখা হয়। তাহাদের আহারাদির সেদিন যত্নের আতিশয্য লক্ষ্য করা যায়। খাওয়ান হইলে একটি আস্ত গরুর ছাল লইয়া দূর পাহাড় হইতে একদল লোক নামিয়া আসে। সেটি লইয়া আসিয়া গরুর মাথায় পরাইয়া দিয়া গরুকে ঘিরিয়া মণ্ডপ আনন্দ বিহ্বল পুরুষেরা মাদলের তালে তালে নাচ ও গান সুরু করে। গ্রামটি মুখর হইয়া উঠে গানে—

অইরে কেহ বা চরে ভাল চমকি চমকিরে
কেহবা চরেরে ভালা পাডার গুররে
কেহবা চরে ভালা গাছ গাছড়রে
কেহ বা চরে বৃন্দাবনেরে।

টুসুনাচ ও পৌষ পার্বণকে কেন্দ্র করিয়াও নাচ অনুষ্ঠিত হয়।

ইহার পরই বলিতে হয় সামাজিক নাচ, খেমটা নাচের কথা। সামাজিক নাচের মধ্যে ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে কোন সময় ইহা হইয়া থাকে। এই গানের সহায়—ঢুলি, তবলা, হারমোনি, করতাল, বাঁশি, মাদল। যে কোন আনন্দ-অনুষ্ঠানেই এই নাচ হইতে পারে। সারি বাঁধিয়া মেয়েরা

খুব সুন্দর করিয়া নিজেদের সাজাইয়া কখন একক কখনও দলবদ্ধ ভাবে নৃত্য করে। নৃত্যের তালে তালে গায়—

যখন তুমি বাজাও বাঁশী কদম্ব তলাতে হে শ্যাম।
কলসীর জল ঢেলে দিয়ে যাই যমুনাতে
বঁধু ভুলনা আমাকে।
কুলি কুলি আসে বঁধু হাতে বাঁশি নিয়া
বাঁশির ঝলক পেয়ে তোমায় দেখিবার
বঁধু ভুলনা আমাকে।
আমাদের পীরিতি দেখে মরে পাড়ার লোক।
যে যা বলে বলুক লোক—ছাড়ব না তোমাকে বঁধু
ভুলনা বঁধু আমাকে।

ইহার পরেই ছো-নাচ উল্লেখযোগ্য। ছো নাচটিও বিশেষ সামাজিক উৎসবে অনুষ্ঠিত হয়।

ভুয়াং নাচও ইহাদের একটি বিশেষ উৎসব। এই নাচটি ঢোলের ঢিমে তালে অতি ধীর লয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এই নাচটি সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। তাহা এই যে, এখানে তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীরা রামের মিত্রপক্ষ এবং সাঁওতালরা—রাবণের সৈন্যসামন্তের বংশধর। রামায়ণের বিখ্যাত রাম-রাবণের যুদ্ধটি এখানেই সংঘটিত হয়। এই নাচটি বিজয়া দশমীর দিন অনুষ্ঠিত হয়। এই যুদ্ধে রামের জয় হইয়াছিল সেইজন্য আর্য সম্প্রদায়ের কাঠি নাচে সেদিন আনন্দের প্রকাশ ঘটে। আর রাবণের পরাজয়ের দ্যোতক স্বরূপ অনুষ্ঠিত হয় দুঃখের গান ও ভুয়াং নাচ। একটি লাউয়ের সঙ্গে একটি বাঁশ বসান থাকে, তাহাতে থাকে একটি সূতা বাঁধা—সূতাটি আঙ্গুল দিয়া সেতারের মত টানিলে লাউয়ের মুখে সংযোজিত কাঠিতে একটি গম্ভীর শব্দের সৃষ্টি করে। আর সেই গম্ভীর সুরের তালে তালে দুঃখের অভিব্যক্তি প্রকাশক ভুয়াং নাচ তথাকথিত রাবণের বংশধরেরা নাচিয়া চলে।

নয়

গম্ভীরা গান

এইবার আমরা বাংলার লোক-সঙ্গীতের যে দ্বিতীয় আঞ্চলিক বিভাগের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাব সীমানার মধ্যে প্রবেশ করিব। ভৌগোলিক দিক দিয়া সেই অঞ্চলকে সাধারণতঃ উত্তব বঙ্গ অঞ্চল বলিয়া উল্লেখ করা যায়। ইহা প্রধানতঃ মালদহ, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, রঙপুর, রাজসাহী ও পাবনা-বগুড়া জিলা লইয়া গঠিত। এই অঞ্চলের উত্তরাংশ প্রধানতঃ কোচ জাতি দ্বারা অধ্যুষিত। কোচ জাতি ভাবতেব এক অতিপ্রাচীন আদিবাসী; রাঢ় অঞ্চলের যে আদিবাসী সমাজ ক্রমে হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াছে, তাহার সঙ্গে কোচ জাতির মৌলিক পার্থক্য আছে, রাঢ় দেশীয় আদিম অধিবাসী প্রধানতঃ আদি-অস্ত্রাল (Proto-Australoid) গোষ্ঠীভুক্ত, কিন্তু উত্তর বঙ্গের আদিম অধিবাসী ইন্দো-মোঙ্গলয়েড্ গোষ্ঠীভুক্ত। ইন্দো-মোঙ্গলয়েড্ অন্যান্য জাতির মত পীতবর্ণ নহে, বরং কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মূলতঃ তাহারা যে পীত জাতিরই বংশধব তাহা অস্বীকাব করিবাব উপায নাই।

আদিবাসীর দিক দিযা মৌলিক পার্থক্যেব জন্য রাঢ় ও উত্তর বঙ্গের লোক-সংস্কৃতিব মধ্যেও স্বভাবতঃই পার্থক্য সৃষ্টি হইতে দেখা যায়। উভয় অঞ্চলের লোক-সঙ্গীতেব মধ্য দিযাও এই পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

উত্তর বঙ্গেব লোক-সঙ্গীতেব মধ্যে প্রথমেই দেখা যায় যে, মালদহ অঞ্চলে এক বিশিষ্ট প্রকৃতিব সঙ্গীত ব্যাপক প্রচলিত আছে, তাহা গম্ভীরা গান বলিয়া পরিচিত। ইহা মালদহ ব্যতীত আব কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না। জলপাইগুড়ি জেলায় গমীরা নামে এক শ্রেণীব লোক-সঙ্গীত আছে, তাহার প্রকৃতি স্বতন্ত্র, গম্ভীরা গানের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। অবশ্য নাম-সামঞ্জস্যের জন্য অনেক সময এমন ভুল হইয়া থাকে।

গম্ভীরা গান আঞ্চলিক সঙ্গীত হইলেও ইহা বিশেষ একটি অনুষ্ঠানেব সঙ্গে সংযুক্ত। সেই অনুষ্ঠান শিবের গাজন, ইহা এই অঞ্চলে আদ্যের গম্ভীরা বলিয়া পরিচিত। আদ্য বা শিবের গম্ভীরা উপলক্ষে যে গান হয়, তাহাও গম্ভীরা গান। গম্ভীরার অনুষ্ঠান উপলক্ষে মুখোস নৃত্যও হইয়া থাকে, তাহাও গম্ভীরা নৃত্য বলিয়া পরিচিত।

চৈত্র সংক্রান্তির অন্ততঃ পাঁচদিন আগে হইতেই এই উৎসবের সূচনা হয়, এবং এই পাঁচ দিন ধরিয়াই যে আচার পালন করা হইয়া থাকে, তাহাতে নানা আচার-মূলক সঙ্গীত গীত হয়। ইহার মধ্যেও মানত করিয়া সন্ন্যাসী হওয়ার রীতি প্রচলিত আছে এবং সন্ন্যাসীরাই আচার-সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু এই আচারানুষ্ঠানের বাহিরেও সাধারণ লোক সমবেত হইয়া এক লৌকিক সঙ্গীতানুষ্ঠান পালন করে। তাহাতে একটি গানের আসরে শিবের ঘট স্থাপন করিয়া শিবকে উদ্দেশ্য করিয়াই নানা গীত রচনা করা হইয়া থাকে। গানগুলি সকলই সাময়িক ঘটনামূলক। প্রধানতঃ সঙ্গীতের মধ্য দিয়া ইহা বর্ষবিবরণী পর্যালোচনা মাত্র। চৈত্র সংক্রান্তির দিন বৎসরের ঘটনাবলীর একটা হিসাব নিকাশ লওয়া হয়, তাহাতে প্রধানতঃ সমাজের অভাব-অভিযোগের কথাই বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। গানগুলি কেবলমাত্র সাময়িক ঘটনার মধ্য সীমাবদ্ধ থাকে বলিয়া ইহাদের সাহিত্যগুণ বিশেষ কিছুই থাকে না। ইহাদের মধ্যে কোন ভাব-গভীরতা নাই; রচনার পারিপাট্য নাই, কোনদিক দিয়াই কোন কবিত্বেরও স্পর্শ নাই। আধুনিক কালে ইহাদের মধ্য সমসাময়িক রাজনৈতিক চিন্তা গিয়াও প্রবেশ করিয়াছে।

এই গানের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেকটি গানই শিবঠাকুরকে উদ্দেশ্য করিয়া রচিত হইয়া থাকে। সংসারের সকল সুখদুঃখ অভাব-অভিযোগের কারণই শিব, তাহার নিকট এই সকল বিষয়ে অভিযোগ জানাইয়া প্রতিকারের প্রার্থনা করাই গম্ভীরা গানের মুল উদ্দেশ্য। শিব ঘটে অধিষ্ঠান করিয়া নির্বিকারভাবে এই সকল অভিযোগ, এমন কি, অনেক সময় তিরস্কারও শুনিয়া যান। ইহাদের মধ্য দিয়া ভক্তের সঙ্গে ভগবানের কোন সুদূর পার্থক্য রচিত হয় না।

মালদহ ব্যতীত আর কোথাও গম্ভীরা গান পাওয়া যায় না বলিয়া প্রত্যেকটি গানের পার্শ্বে ইহার সংগ্রহস্থলের কথা উল্লেখ করা হইল না শুধু সংগ্রহকাল নির্দেশ করা হইল। সকল গানই মালদহে সংগৃহীত বুঝিতে হইবে।

১

শিব, মনের কথা দু'টা বলিব
এনে জড় জগতে, ঘুরাও নানা পথে,
কোথা গেলে দেখা পাইব।

পড়ে শুনে শিখি শুধু তুমি বিশ্বেশ্বর,
বচন আউড়াতে আমরা হয়েছি খুব দড় ,
ভুলে গেছি তব পূজা, তাই আমরা পাচ্ছি সাজা,
দুঃখের কথা কারে কহিব।
ধরমের সার গেছে কাল-স্রোতে ভেসে
সংস্কার রয়েছে এ পোড়া দেশে
বল পুনঃ কিসে ধর্ম ফিরে আসে,
সেই উপায় আমরা শিখিব।
নিজ নিজ স্বার্থ হ'ল ধর্ম কর্ম
এই কি, শিব, তোমার সনাতন ধর্ম,
বুঝে দশের মর্ম করিব যে কর্ম
খাঁটি কর্ম এবার হইব।
ত্যাগী বেশে তুমি এসে এই গম্ভীরায়,
মন সাধে পুজি মোরা ভাই বোনে সবায়,
হায়, একি হ'ল দায়, নিজে ত্যাগী হ'তে নাহি চায়,
এ ছলনা আমরা ছাড়িব।
বৃথা নাহি পুজিব পত্র-পুষ্প-ফলে
বিবেক ফুল মাখিয়ে ভক্তি-গঙ্গাজলে,
শরৎ দাসে বলে দিব পদে তুলে,
জনম সফল আমরা করিব। —(১৯১৫)

নিম্নোদ্ধৃত গানটিও শিবকেই লক্ষ্য করিয়া রচিত হইয়াছে, ইহা গম্ভীরা গানের বন্দনা-ভাগের একটি অংশ।

২

আমায় সঙ্গে করে, হাতে ধরে, ঘরে নিয়ে যাও হে।
তোমার আহ্বান ধ্বনি, শুনেও না শুনি (আমায়) ঘেরিয়ে দাঁড়াও হে॥
বাসনার আশাবাণী, মরীচিকার মত টানি আগুনে পোড়াও হে,
তুমি শীতল করে দগ্ধ মর্ম-যন্ত্রণা ঘুচাও হে॥
নাহি চিনি আত্মপরে, উচ্চ শির গর্বভরে, অমঙ্গলে ধায় হে ,—
আমার মাথাটি ধরে, নত করে, তোমার চরণতলে নাও হে॥

উদ্‌ভ্রান্ত নয়ন দুটী, করে মিছে ছুটাছুটি, দেখিতে না পায় হে ;—
আমায় ঘেরিয়াছে মোহ-আঁধারে আলো জ্বেলে দাও হে ॥
যতই তোমারে খুঁজি, ততই হারাই পুঁজি, সময় যে যায় হে ,
আমার সম্মুখে এসে, হেসে হেসে গন্তব্য দেখাও হে ॥
বিশ্বময় হও তুমি, তোমারই ত ছেলে আমি, বলে দাও উপায় হে ,
গোপালেরে কোলে তুলে মুখ পানে চাও হে ॥ —(১৯১৫)

৩

বুড়াটা আস্ত বাম্বা মাথায় লাম্বা[১] আনেছে ত্মাখ সাঁপহে ।
(মাথায়) জটায় কুকরী, জুয়ান ছুকরী বস্থা উটা কে হে ॥
(মাথাৎ) ছ'রঙ্গের সাঁপ দেখচি ছটা, কাম ক্রোধাদি রিপু কটা,
ত্যাগ জরিড গুণে বুডাটা, কেঁচার লাথান[২] কল্লে হে' (সাঁপকে) ।
গায়ে দেখছি গুদরী গুদরা[৩], পরনে এক বাঘেব চামডা,
মজা লুটছে ভূত প্যারত্‌বা হামরা কি কেও নই হে ॥
চেহারাটা ঠিক পুর্ণিমার চাঁদ, ধরেছে দুনিয়া ভুলা ফাঁদ,
ভক্তি-মাটীর বাঁধলে রে বাঁধ পারে যাওয়া যায় হে ॥ —(১৯১৪)

৪

ভালো বেশ ভালত মজা
এ কেমন তোমার পূজা ।
করলি ভ্যাকম এক রকম
ঠিক যেন ভ্যাক ভাকুম বাজা,
এ কেমন তোমাব পূজা ।
মুলুকাসানে আছ আসানে
শ্মশানে হয়্যা মশানের রাজা
এ কেমন তোমাব পূজা ॥
(ভোলাহে) আবার পইব্যা কপ্‌নি
আছ আপ্‌নি
ঢুল্যা ঢুল্যা খাচ্ছ গাঁজা
এ কেমন তোমাব পূজা ।

১ ল্যাম্বা=বোঝাই করিয়া ; ২ লথন=মত , ৩ গুদবী গুদবা=ছেঁড়া কাপড় ।

(আবার) কুচনি পাড়ায় বেড়াও ঘুর‍্যা
কখনও বা দামড়ায় চড্যা (শিব)
টানে টানে পর‍্যা দো-টানে
চটানে পর‍্যা ঢুলকাই জুজ্যা,
বসন বাঘছাল মড়াব খাপটা
ভূষণ অলোদ, গহ্মা ভ্যাপটা (শিব)।
দেখ্ দেখ্ বাইদার ব্যাটা,
গণশাব বাপটা।
ঠিক যেন কোন গুণী বোঝা,
এ কেমন তোমার পুজা। —(১৯৪০)

অনাবৃষ্টিই কৃষক-জীবনে চরম দুর্ভাগ্য, অনাবৃষ্টির জন্য কৃষকেরা গম্ভীরা গানের মধ্য দিয়া এখানে শিবকেই দায়ী করিয়া থাকে। যদিও বৃষ্টিব দেবতা কোন কোন ক্ষেত্রে সূর্য, এখানে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, শিবই এই অঞ্চলের সকল প্রকাব সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের দুর্ভাগ্যের একমাত্র কারণ।

৫

শিব, তোমাব লীলাখেলা কব অবসান,
বুঝি বাঁচে না আব জান।
অনাবৃষ্টি কব্যা সৃষ্টি
মাটি কবলা নষ্ট হে,
দৃষ্টি থাকতে কষ্টি কইব্যা
দেখছ না কি কষ্ট হে,
মিষ্ট কথায তুষ্ট কইব্যা
শিষ্ট লোকেব ইষ্ট মাইব্যা,
করিলা মোদেব গুষ্টি ছাড়া।
শুন বলি পষ্ট কব্যা,
তাবপবে ম্যালেৰিয়ায
হইলাম হালা কাণ,
বঝি বাঁচে না আর জান।

অন্নদা মা ভিক্ষা তোমার
করবে না কি দান হে,
সময় কালে না হয়্যা জল
অসময়ে ফলল কুফল।
(ও সব) মুগুরী কলাই গেল ডুব্যা
ক্ষেতেব ফসল ম'ল,
আম গ্যাল আম ছালা গ্যাল
ক্যামনে ধরি গান
বুঝি বাঁচে না আর জান। —ঐ

৬

এবাব কি খাবা, হে বাবা, পুযাল চাবাও বইস্যা।
কোন মুলুকের বন্যা এলো মোর বাবা হে—
মোর বান্ধী হে।
কোন্ দোখ্না বাতাস আইস্যা হে পুযাল চাবাও বইস্যা।
আমের গাছের ডাণ্টা খাড়ু ভাদই ধানের আশা ছাড
ভাতিয়ার বিল হাতিয়ায় নিলে মোব বাবা হে
মোর বান্ধী হে।
কোন দোখ্না বাতাস আইস্যা হে পুযাল চাবাও বইস্যা। —ঐ

শিব কি করিব হে এবার বাঁচাবে না প্রাণ,
টাকা স্যারের চাউল হয়্যা লাইগ্যা গ্যাল টান।
বাঁচবে না আর প্রাণ॥
আমাদের দ্যাশের আম্র ফলটি সেও হ'ল মাটি
পলু-পুশা পাছি দিসা দর হল খাঁটি হে,
দর হল কুড়ি পচিশ পলু-পুসা লাগ্ছে যে দিস,
এ ক্যামন হ'ল দ্যাশেব ধারা, বল, বাঁচব ক্যামনে মো
কৃষকেরা ভাবছে বইস্যা উপায় কিবা করিহে,
ধান কলাই হল না ভাই হল না জল ঝরি হে।

জল বিনা সব মইল গরু বকরী এ কি হোল বিষম জ্বালা।
ক্যামনে বাঁচবে ছেইলা পিলা।
গরীবেরা ভাবছে বইস্যা উপায় কিবা করি হে,
এক সের চাউল হয়্যা না খাইয়্যা সব মরি হে।
ভুট মোটর ঘোড়ার খানা দর হোল যে মাখন ছানা
এ কষ্টে পয়দা গেল মরে রাজ্য চলবে ক্যামন করে,
দিনে দিনে হ'ল কঠিন ক্যামনে পাব ত্রাণ,
শিব, কি করিব হে এবার বাঁচবে না আর প্রাণ। —(১৯৪২)

নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উল্লেখ আছে, এমন কি, চার্চিল এবং এটিলির নাম পর্যন্ত শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। যুদ্ধের সময় ইহাদের নাম নিরক্ষর সমাজের মধ্যেও ব্যাপক প্রচারিত হইয়াছিল।

৮

বাপরে বাপ, জান বাঁচাল হল দায়,
শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি,
নলখাগড়ার প্রাণ যায়।
জান বাঁচান হল দায়।
ধন্য বৃটিশ রাজের চাল,
ও সে করলে নাজেহাল,
শ্যাষে মাথায় ঘাঁয় পাগল হয়্যা
উড়া জাহাজে হাওয়া খায়,
বাপরে বাপ, জান বাঁচান হল দায়।
চার্চিল ছদ্মেরই বেশে
(ও সে) অট্টালিকাতে বসে
চপ কাটলেট চুষে
এটালিকে ফের কেটলী বানাইয়্যা
সেই জলেতে চাহা খায়, বাপরে। —ঐ

৯

আজ ভাল মানুষির দিন গিয়াছে, ওহে পশুপতি,
তিন চোখে কি দ্যাখতে পাওনা মোদের কি দুর্গতি।

জাল জালিয়াতি বিশ্ব জুড়্যা
ব্লাক মার্কেট বাজার ভইর‍্যা
গাড়ী চালায় বাড়ী হাঁকায় জ্বালায় বিজলী বাতি ॥
বিদ্যা বুদ্ধি ধর্ম সেবা রসাতলে গেল ডুব্যা,
হিংসা বিবাদ দলাদলি হায়রে কি দুর্মতি ॥
ন্যাংটা হয়্যা প্যাংটো মুখে মরলো যে সব গরীব লোক,
তাইতো মোরা ন্যাংটা ভোলার কাছে জানাই নতি ॥

—(১৯৪৬)

১০

শিব, সামলাবে তোর বুড়ো এঁড়ে
তাড়িযে মাবে টিসরে।
তোর কাঁধে ঝোলে ভিক্ষের ঝুলি,
গলায ভরা বিষ রে॥
কোঁচেরা সব সল্লা করে,
(তোর) এঁড়ে দিবে খোঁযাড়ে ওরে,
তখন বাড়ি বাড়ি মাগন করে, জরিমানা দিস রে !!

১১

তুমি হ'যে চাষী কাশীবাসী কেন কাশীশ্বর
কর্মক্ষেত্র এ ব্রহ্মাণ্ড ক্ষেত্র তব হর।
মন আত্মা দুই বলদে বেঁধে
কর্ম জুযাল চাপিযে কাঁধে
মায়াবজ্জু নাশায ছেঁদে কতই বা আর তাড়?
সুখ দুঃখ দুই শক্ত জোতা
সেই জুযালে আছে যোতা
আশা লাঠির দিচ্ছ গুঁতা ওহে দিগম্বর। —ঐ

১২

স্ববাজ যদি পাই হে ভোলা,
খাদ্যে দিমু মানিকের কলা,
নইলে আইঠ্যার কলা বিচি আলা। —ঐ

পূর্বেই বলিয়াছি, গানগুলি সম্পূর্ণ ই কবিত্ব বিবর্জিত, সুতরাং সাহিত্যগুণ ইহাদের কিছু মাত্র নাই। তথাপি আঞ্চলিক সঙ্গীতের বিশেষ নিদর্শনরূপে আরও কয়েকটি গান উদ্ধৃত হইল।

৭৩

(তুমি) কেন উদাসী, কাশীবাসী, ওহে কাশীশ্বর।
দুনিয়াটা যায় রসাতল, রক্ষা কর, হর ॥
কামার কুমার ছুতার চাষা
ছাডলো তারা জাত-ব্যবসা
চাকরী লয়ে বাবু হয়ে ভাবছে কত বড।
গাঁয়ের মাটিশিল্প হল মাটি,
বাংলাব মাটি আছে খাঁটি
কৃষি-শিল্পে শিখাও মোদের
(তুমি) দেশকে তুলে ধব ॥
চাষ উন্নতি করতে হলে
চলবে না পুরাণা চালে
দেশ বিদেশেব নতুন নিয়ম
আমদানী সব কর ॥
রং তামাসা টুকীর গানে
দেবতা পালায় উলুবনে
শিখাও মোদেব ভক্তি মন্ত্র
পূজা, গঙ্গাধর।
(দেখো) কনের বাপেব ঘাডে ঝুলি
বরেব বাপের লম্বা বুলি।
পণ প্রথাটা উঠিয়ে দিয়া সমাজ রক্ষা কর ॥
ডোম মেথর আর হাডি মুচি
তারাই বন্ধু তারই শুচি
মঠ মন্দিরের দুয়ার খুল্যা সবার সমান কর ॥ —ঐ

অনাবৃষ্টির জন্য মালদহের সুপ্রসিদ্ধ ফজ্‌লি আম প্রায়ই বিনষ্ট হয়, ইহা এই

অঞ্চলের অধিবাসীর অর্থনৈতিক জীবনে দুর্ভাগ্যের সূচনা করে; সুতরাং তাহার কথা গম্ভীরা গানে কদাচ বাদ যায় না।

১৪

শিবহে, এবার জীবন বাঁচানো বুঝি হল ভার,
উনিশশো সাতান্ন সনে কি যে আছে তোমার মনে,
(সারা) ভারতব্যাপী পড়েছে আজ হাহাকার ॥
অনাবৃষ্টি হেতু আজ শস্যহীনা বসুধা,
কেমনে মিটাবে তুমি বিশ্বগ্রাসী এ ক্ষুধা,
দৈন্যতা উঠছে বেড়ে, নগ্নরূপে এ সংসারে
(তুমি) রক্ষা কর নইলে হবে সংহার ॥
মালদায় এবার হলোনা আম, অভাব আর অনটন,
লোকের মনে অশান্তির ছাপ জাগিতেছে অনুক্ষণ ॥
দিন যাবে কেমনে তবে আকাশ পাতাল ভাবছে সবে,
মান সম্মান রক্ষা করা যাবে না আর ॥
ওহে, শিব সুন্দর, করি তোমায় প্রণিপাত,
তোমার সৃষ্টি এ সংসারে কেন কর বজ্রাঘাত।
ছেড়ে দিয়ে রুদ্রনৃত্য, হও হে তুমি শান্ত চিত্ত
সত্য পথে চালাও মোদের পুনর্বার ॥ —(১৯৫৭)

১৫

তোমার এরূপ হতবুদ্ধি দেব মাথায় গজাল কেন,
বোধ হয় সিদ্ধির গুড়া ছেড়ে বিদেশী সুরা করেছ পান।
ইন্দ্র রাজার বজ্রকের সুর সাহেবের দিলা করে
তাই হে টেলিগ্রাফের তারে পাই মোরা প্রমাণ ॥
চন্দ্রদেব দেখি নাইটে, জব্দ হইল ইলেট্রিক লাইটে,
বেঁধেছ বেশ আঠ-কাঠে, নাই পরিত্রাণ ॥
ত্রেতাযুগে পাই হে প্রমাণ,
বাল্মীকি দেয় কুশে প্রাণ।
তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কলের কাজ, আমেরিকা প্রধান।

দেবদেবাদি শূন্য পথে চেপে বেড়াতেন হে রথে,
সেই বিদ্যাটি এরোপ্লেনেতে করেছো যোগদান ॥
পবন বাধ্য জাহাজের পালে, বরুণ বাধ্য ষ্টিমার বেলে,
বিলাতে হৈমন্ নদীর কুলে বিশ্বকর্মায় ধুন
ঋক, যজু, অথর্ব সাম এসব বেদের রাখলো নাম,
(এখন) শিক্ষা দিচ্ছো যুধ্যপিড ড্যাম করে ইংলিসম্যান ॥
ভাবি বসে দিবা নিশি, লণ্ডনকে করেছ কাশী,
(ইওর) ইন্টিমেট ফ্রেণ্ড ইংলণ্ডবাসী, আর কি মোদের চেন ॥

—(১৯৪৬)

একদিন মুসলমান সমাজও গম্ভীরা গানে যে অংশ গ্রহণ করিত, নিম্নোদ্ধৃত গানটি তাহার প্রমাণ। ইহাতে ভোলানাথকে ভোলানানা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে—

১৬

ধুয়া— কাম কাজ না করিলে মান বহে না হে ভোলা নানা,
চি— দেখ দুই দিন যদি বসে থাকি কেউ তো খেতে কহে না হে
ভোলা নানা।

আর যদি শ্বশুর বাড়ী যায়,
দুই দিন আদরে খাওয়ায়
তিন দিনের বেলাতে শ্বশুর করে দিবে বিদায়,
নানা হে, করে দেবে বিদায়।
ঘরে নাইক খাবার কিছু যোগাড়
প্রাণেতে আর সহে না, হে ভোলা নানা।
আর যদি খাঁটি মজুরী মনে লজ্জা লাগে ভারি,
বাবু গিরি ছেড়ে দিয়ে সাজতে হইল ভিখারী,
নানা হে সাজলাম ভিখারী।
তবু লজ্জা ত্যেজে গেলাম কাজে,
কেউ খাটাইতে চাহে না হে ভোলা নানা।
আর এই শিরুয়ার মেলাতে, একজন কমলা বাড়ী হতে—
ঘুঘলা গোপের মিস্তিন এল মেলা দেখিতে

এই কাচারীতে নানাহে, কাচারী ঘরে,
মেলা করে, ধকম ধক্কা সহে না, হে ভোলা নানা ॥
(আর) শুনেন মোহন পাড়ার উক্তি, গাছ বাঁশ কাটিবার যুক্তি,
ভেঁড়া, ভেড়ি বকরা বকরী
করে দাও ইতি, নানাহে করে দিলাম ইতি। —ঐ

১৭

ধুয়া— শিব, এবার সোনার ভারতকে করিয়া কাগজ,
চিটালি— তুমি কাগজ দিয়ে সোনা নিছ সেকি কেহ করে খোঁজ।
অন্তরা— বহু করি দাদা যত চাষী ভাই
জমি জমা আবাদ করে যা ফসল উঠাই,
তাহে মোদের কি সত্ব নাই।
তুমি ওজন করিয়া কাগজ ধরাইয়া গাড়ী করলা বোঝা ॥
ভারতের অর্জিত জিনিস তুমি কর চালান।
আমরা ভারতের লোক খেটে মরি, বাঁচে কিনা প্রাণ।
ধন্য তুমি বুদ্ধিমান।
মোদের সেই জিনিস, অন্য দেশে দিবার কিসের গরজ ॥
দেশের জিনিস দেশে রইলে অভাব তো হত না
ঘরে খাওয়ার থাকলে ভোকেতে রইতো না,
বাঁচিবার ছিল সম্ভাবনা ॥
তুমি বাঁচাও মার হরি হর অন্তে দিও পদরজ ॥ —ঐ

১৮

ধুয়া- - তুমি যুগে যুগে অবতরি হে জটাধারী
চি তুমি গঙ্গাধর নাম পেয়েছ জটাতে গঙ্গা ধরি হে ত্রিপুরারি
ত্রেতাই ছিল রাবণ রাজা গুণে মানে মহা তাজা
দেবাসুরে নাগ নরে থাকিতে সোজা
তার কাছে থাকিত সোজা ॥
তুমি তাহাকে বিনাশ করিলে হনুমানের রূপধরি
হে জটাধারী ॥

গয়াসুর মহাভাগ্যবান, গযাধামে তার প্রমাণ
তাহাব পিতা ত্রিপুবাসুব সুবেব প্রধান,
জগতে সুবেব প্রধান।
তুমি তাহাকে বিনাশ কবিযা নাম পেলে
ত্রিপুরাবি, হে জটাধাবী ॥
আব তুমি হেন বুদ্ধিমান ভাবতকে কবিলে হত জ্ঞান,
দিনেব পব দিন চলে যায, না হল বিধান ॥
সে কথাব না হল বিধান ॥
তুমি ভাবতকে বিনাশ কবিলে ইংবাজেব রূপধবি
হে ত্রিপুবারি ॥

১৯

বলি, ও ফণিভূষণ, ভাল ত্রিনযন,
বাঘাম্বব পবিধান, আমাদেব দুঃখ কব ত্রাণ,
পেটেব জ্বালাই মোবা, হলাম দিশেহাবা
হাবালাম মান সম্মান আমাদেব দুঃখ কব ত্রাণ ॥
ভারতবর্ষে সোনা চাদি ছিল যত,
একে একে দেখি সব গেল জলেব মত ,
ভাবতবাসী এবে হযে অবনত
(এখন) পেল চবম প্রতিদান।
আমাদেব দুঃখ কব ত্রাণ ॥
সোযা প্রহব সোনা বর্ষেছিল যে দেশে
সেই দেশের লোক আজ ফিবে দীন বেশে
পবিণাম আব কিবা হবে অবশেষে
আতঙ্কে শিহবে প্রাণ ॥
(আমাদের দুঃখ কব ত্রাণ।)
বি, এ, এম, এ পাশ কবে কত বঙ্গসন্তান
চাকুবী খুঁজে খুঁজে হযে গেল হয়রান।
করিতে পাবে না তারা নিজেব পেটের সংস্থান
(হল) হতাশে সদাই ম্রিযমাণ ॥

দলে দলে দেখি দা-কুমড়া সম্বন্ধ,
সর্বত্রয় গেলে আছে দ্বন্দ্ব।
গৃহ-বিবাদ, শিব, না করিলে বন্দ
আমাদের জাতির হবে অবসান ॥
সিঁদুরিয়া মেঘ দেখি আকাশ যেমনে
ভারতের পাশে ঘাঁটি করে চিনে,
নিজের ঘর সামলাও মোদের শিক্ষাদান
(হও তুমি) সময় থাকতে সাবধান ॥
মোদের দুঃখ কর ত্রাণ ॥
করজোড়ে তব পদে এই শেষ মিনতি
যুদ্ধ বিদ্রোহ যেন না হয় সম্প্রতি
সৃষ্টি রক্ষা কর ওহে গৌরীপতি,
অধীনের এই আকিঞ্চন ॥
মোদের দুঃখ কর ত্রাণ ॥ —(১৯৬১)

১৯০৮ সন হইতে ১৯৬১ সন পর্যন্ত সংগৃহীত গানগুলির মধ্যে একটি সাধারণ বিষয় সর্বত্রই লক্ষ্য করা যাইবে যে, ইহাদের মধ্য দিয়া কেবলমাত্র অভাব-অভিযোগের কথা, সামাজিক জীবনে নৈরাশ্যের কথা, কেবল কি করিয়া কি করিব, কি করিয়া কি হইবে ইহাই শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। ১৯০৮ সনে সংগৃহীত নিম্নোদ্ধৃত গানটির সঙ্গে পূর্বোদ্ধৃত কোন গানেরই ভাবগত কোন অসঙ্গতি নাই ; সুতরাং অভাব অভিযোগের কথাগুলি গতানুগতিক নিয়মেই প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে হইবে।

২০

বলব কি গান, ওহে শিব, বাগানে নাই আম।
গাছে গাছে বেড়িয়া দেখ্‌ছি নূতন পাতা সব সমান।
মনে মনে ভাবছি বস্তা কাজের কোন পায় না দিশা,
তেল ধান চাউলের দর খুব কশা ভুষার বেশি দাম,
আর এক শুন নূতন কাহিনী, ঠিক দু'প্রহরের দিন আর পানী,
মাঠে হয় কৃষাণ পেরমানি মরিলে গহম্‌। —(১৯০৮)

ভাওয়াইয়া

জলপাইগুড়ি, রংপুর ও কোচবিহার অঞ্চলের সাধারণ অধিবাসী রাজবংশী নামে পরিচিত। ইহাদের একটি অংশ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিলেও রাজবংশী বলিয়া পরিচিত সমাজের সঙ্গে ইহার লোক-সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে ঐক্য আছে। এই অঞ্চলের যুগীযাত্রা বা গোপীচন্দ্রের গান নামক গীতিকা মুসলমান কৃষক সমাজের মধ্য হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। রাজবংশী সমাজ মূলতঃ কোচ জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোচ ভারতবর্ষের এক অতি প্রাচীন জাতি। পূর্বে কামরূপ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে পূর্ণিয়া জিলা পর্যন্ত একদিন ইহাদের অধিকার বিস্তৃত ছিল। আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোচজাতি ইহার অধিনায়ক হাজুর অধীনে সমবেত হইয়া কাছারীদিগকে উত্তর বঙ্গ হইতে বিতাড়িত করে এবং সেখানকার বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপিয়া নিজেদের এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। দুইশত বৎসর কাল এই রাজ্য স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল। হাজুর পৌত্র বিশু সিং হিন্দুধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র কোচজাতির উপরই হিন্দুধর্মের প্রভাব স্থাপিত হইতে আরম্ভ করে, তখন হইতেই এই জাতির একটি অংশ রাজবংশী নামে নিজেদের পরিচিত করিতে থাকে। আর একটি অংশ কোচ নামেই পরিচিত থাকিয়া যায়। রাজবংশীর উপর হিন্দুধর্মের প্রভাব প্রবলতর হইতে থাকে এবং ক্রমে তাহারা নিজদিগকে ভঙ্গ ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবী করে। ইহাদের মধ্যে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত হয় যে, পরশুরাম যখন পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা তাঁহার ভয়ে এই অঞ্চলে পলাইয়া আসিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে একজন রাজবংশী কবি লিখিয়াছেন—

হায়রে রাজার বংশে লভিয়া জনম।
পরশুরামের ভয় এ বড় সরম॥
রণে ভঙ্গ দিয়া মোরা এদেশে আইয়াছি।
ভঙ্গ ক্ষত্রি রাজবংশী এই নামে আছি॥

আবার কেহ মনে করিয়াছেন, উত্তর বাংলার সাধারণ অধিবাসী বোড়ো

জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। তাহাদের সঙ্গে নিষাদ-কিরাত এবং দ্রাবিড় ভাষী জাতিরও মিশ্রণ হইয়াছে, তারপরও বিহার এবং নিম্নবঙ্গের অধিবাসীদের সঙ্গেও তাহাদের যোগাযোগ ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কোচ সংস্কৃতির প্রভাব তাহাদের মধ্যে অত্যন্ত সক্রিয় হইয়া উঠিয়া প্রত্যেকটি বিভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন তাহাদের উপর হইতে লুপ্ত করিয়া দিয়াছে। এই অঞ্চলের সাধারণ অধিবাসীরই বিশিষ্ট লোক-সঙ্গীতেব নাম ভাওয়াইয়া গান, ইহা বাংলার লোক-সঙ্গীতের একটি অতি বিশিষ্ট নিদর্শন। ইহার এই বিশিষ্টতা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক প্রভাব ইহার উপর বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও ইহা তাহার মৌলিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দেয় নাই, ইহার লোক-সঙ্গীতের ধারাব মধ্যে ইহার এই বৈশিষ্ট্য সেইজন্যই রক্ষা পাইয়া গিয়াছে।

ভাওয়াইয়া গান ভাবমূলক একক সঙ্গীত, প্রেমই ইহার একমাত্র উপজীব্য। সেইসূত্রে ইহা আঞ্চলিক সঙ্গীত হওযা সত্ত্বেও প্রেমসঙ্গীতেব অন্তর্গত। উত্তর বাংলার দুর্গম তরাই অঞ্চলের স্তব্ধতা এবং দ্রুত প্রবাহিত নদনদীর ক্ষিপ্র গতির মধ্য দিয়া এই অঞ্চলের অধিবাসীর একটি বিশিষ্ট চরিত্রগুণ প্রকাশ পাইয়াছে, এই সঙ্গীত এই আঞ্চলিক চরিত্রগুণেব অন্তর্নিবিষ্ট। অবণ্য প্রকৃতির স্তব্ধতার মধ্য হইতেই ভাওয়াইয়ার সঙ্গীতের সুবে দীর্ঘ টানের জন্ম হইয়াছে, ইহার দীর্ঘ টান কিংবা চডা সুর সম্পূর্ণ ভাটিয়ালির মত নহে, ভাটিয়ালিব সুবে কোন ভাঁজ নাই, কিন্তু ভাওয়াইয়াব দীর্ঘ একটানা চডা সুরের মধ্যে ভাঁজ আছে; অবশ্য এই ভাঁজ তালপ্রধান সঙ্গীতের মত স্পষ্ট নহে। ভাঁজের ভিতর দিয়াও এক টানা চডা সুরের গতি ব্যাহত হয় না।

প্রেম-সঙ্গীতের কেবল মাত্র বিবহ বা বিচ্ছেদের অংশ লইয়াই ভাওয়াইয়া গান রচিত হয। এমন কি, মিলনের মধ্যেও ইহাতে বিচ্ছেদের আশঙ্কা প্রকাশ পায়। বৈষ্ণব কবি যেমন লিখিয়াছেন, 'দুহুঁ কোবে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া' ভাওয়াইয়া গানের পল্লী কবিগণ তেমনই প্রেমে বিবহই একমাত্র সত্য বলিয়া মনে করিয়া নরনারীর পার্থিব প্রেমের মধ্যে স্বর্গীয় মহিমা অনুভব করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিতায় সম্ভোগের পর বিবহ, কিন্তু ভাওযাইয়া গানে সম্ভোগ ব্যতীতই বিরহ, সেইজন্য ইহার বেদনাব অনুভূতি প্রথম হইতেই পার্থিব কলুষতা মুক্ত হইতে পারিয়াছে,

ও কি নাগর কানাই তুই মোরে
উজান ছাড়ি ভাটির ছ্যাশং
কল্লেন মায়াবাডী—
ওরে যৌবন কালে দোনো জনায়
হলং ছাডাছাডিরে।
তোমার বাডী আমাব বাডী
(নাগর) অনেক দূরের ঘাটা,
ওরে, কেমন করি হইবে দেখা
ঝোরে চোখের পানি রে।
ভোমরা খালি উডিয়া পড়ে
ফুলের মধুর বাদে,
ওবে, তুই ভোমরার বাদে আজি
মোর না পরাণ কান্দেরে
নাগর কানাই তুই · ॥

শ্রীকৃষ্ণের হাতে যেমন বাঁশী ছিল, বাঁশীব সুরে তিনি গোপ-বালাকে ঘরছাডা করিতেন, ভাওয়াইয়া গানেব প্রেমিক নায়ক মইষালের হাতেও তেমনই আছে দোতাবা বা দোত্‌রা , এই দোত্‌বাব শব্দে সে পল্লীবালাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিযাছে—

রায়ডাক নদীর ঘাটৎ বসি
দোতরা বাজাও আপন খুশী
দোতরায় মোক কবিছে বাডীছাডা।
মোব দোতরার মৈষালী ডাঙ্গে
পাড়ার চেংডীর মনটা ভাঙ্গে
বগলৎ ডাকায় চক্ষুতে ইশিডা
দোতরায় মোক করিছে বাডীছাডা ॥
ও মোর মৈষাল বন্ধুরে,
না বাজান তমান খুটারে দত্‌রা।
নারীৰ মন মোর
করিল রে ঘর ছাডা ॥

ওর এ্যাখেতে স্থতারো বাইজন রে ;
কিনা স্থরে বাজে।
তোর দতরার বাইজন শুনি
মন না অয় মোর ঘরে।

রাধাকৃষ্ণ কাহিনী যে সমগ্র ভারতব্যাপী কেন জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, তাহা এই প্রকার ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লৌকিক প্রেম কাহিনী একটু গভীর ভাবে অনুসরণ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ইহার একটি প্রধান কারণ এই এই যে, একটি সর্বভারতীয় কাঠামোর উপরই ইহার কাহিনীটি স্থাপিত হইয়াছিল। প্রেম এবং তাহার অভিব্যক্তির প্রণালীর সর্বজনীনতার গুণেই ইহার কাহিনী সমগ্র ভারতব্যাপী জনপ্রিয় হইয়াছিল। উপরি-উদ্ধৃত ভাওয়াইয়া গানটি হইতে তাহাই বুঝিতে পারা যাইবে। গ্রাম্য যুবতীর ভাষায় 'দোতরায় মোক্ করিছে বাড়ীছাড়া'ই বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষায় 'বাঁশীর শবদেঁ, বড়ায়ি, হারায়িলো পরাণী' হইয়াছে। ইহা নরনারীর এক শাশ্বতী বেদনা, রাধাকৃষ্ণের মাধ্যমে চিরকালের যুবক-যুবতী কথা বলিয়াছে বলিয়া ইহার আবেদন যেমন নিত্য, তেমনই ব্যাপক।

তিস্তা নদীর তীরে বিস্তীর্ণ অরণ্য ভূমিতে কোন দূর গ্রাম হইতে মৈষালেরা মহিষ চরাইবার জন্য আসে, গ্রাম্য যুবতীরা সেই অরণ্যে কাঠ কাটিবার জন্য যায়, নিভৃত অরণ্যের শুব্ধ নির্জনতার মধ্যে তাহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হয়, যুবতীকে কাঠ কাটিয়া দিতে মৈষাল সাহায্য করে, কাঠের বোঝা মাথায় তুলিয়া দেয়, কঠিন জীবনের মধ্যেও প্রেমের আলো বিদ্যুতের লেখার মত চকিতে দেখা দিয়া যায়—

তিস্তা নদীর পারে পারে
ও মোর বাই গে,
না জানি মৈষাল বন্ধু মোর,
ভইষ চরেবার আসে॥
আজি খড়ি কাটিয়া দেরে মৈষাল,
বোঝা বান্ধিবার দে।
হাতধরোঁ, মিনতি করোঁরে মৈষাল,
মাথাত তুলিয়া দে॥

হাত ধরোঁ মিনতি করোঁরে মৈষাল
আজি আগ্ বাড়েয়া দে।
আগ বাড়েয়া দেরে মৈষাল,
বাড়ীত পঁছেয়া দে॥

গ্রাম্য কুমারী ভিন গাঁয়ের মৈষালকে হাত ধরিয়া মিনতি করিতেছে, গভীর অরণ্যের মধ্যে সে তাহাকে তাহার ঘরের পথে আগাইয়া দিয়া আসুক, বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া আসুক, বোঝাটি মাথায় তুলিয়া দিক। নির্জন অরণ্যপথে মৈষালকে সঙ্গী করিয়া লইয়া তাহার পথ চলিবার এবং বোঝা বহিবার শ্রম লঘু হইয়া উঠুক।

জীবন যত কঠিনই হোক, তাহার মধ্যেও প্রেম তাহার আপনার পথ করিয়া লইতে জানে, প্রেমের অনুভূতিতে জীবনের কঠিনতা অনেকখানি লাঘব হইয়া আসে। মৈষাল ও গ্রাম্য বালিকার সুকঠিন জীবনাচরণের মধ্য দিয়া তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে।

দুর্গম অরণ্যপথচারী মৈষাল যেমন ভাওয়াইয়া গানের নায়ক, তেমনি উত্তর বাংলার দুস্তর পার্বত্য নদীর নৌকার মাঝিও ইহার নায়ক হইয়া থাকে। গ্রামান্তরের মাঝি যখন নদীর তীব্র স্রোতের মধ্যে নিজের নৌকা ভাসাইয়া দিয়া অতি সতর্কে হাল ধরিয়া থাকে, তখন তীরাগত সঙ্গীতের মধ্য দিয়া কোন রিক্ত নারীর বেদনার্ত দীর্ঘশ্বাস ভাসিয়া আসে—

নাইয়ারে—
চাপাও নৌকা কমলাসুন্দরীর ঘাটে রে।
নাও বাইয়া যাও নাইয়া রে
তোর সে মনের সুখ।
ওরে, নায়র বাদাম তুলিয়া, নাইয়া রে,
দেখাও চান্দ মুখ রে॥
মনে বড় দুখ নাইয়ারে,
চিত্তে বড় দুখ।
ওরে নদীর পাথারের মত
ভাঙ্গে নারীর বুক রে॥

নদীর মাঝে থাক নাইয়ারে
নায়ের কাণ্ডারী।
ওরে, অভাগিনী নারীর নাইরে, নাইয়া,
যৈবনের ব্যাপারী রে ॥

উত্তর বাংলার নদনদীর প্রকৃতির সঙ্গে পূর্ববঙ্গের নদনদীর প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। সেইজন্য এই স্বতন্ত্র অঞ্চলের মাঝিকে লক্ষ্য করিয়া যে গান রচিত হইয়াছে, তাহাদের প্রকৃতিও স্বতন্ত্র। উত্তর বাংলার মাঝি খরস্রোতা নদীর মাঝি, পূর্ববাংলার মাঝি ধীর স্রোতা নদীর মাঝি। পূর্ববঙ্গের মাঝির কণ্ঠে যে ভাটিয়ালি গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার সুরে ধীর মন্থর গতির স্পর্শ অনুভব করা যায়, উত্তর বঙ্গের মাঝির কণ্ঠেই তাহার ব্যতিক্রম আছে। সেখানে স্বভাবতঃই তাহাতে একটু দ্রুততা আসিয়া যায়। উত্তর বাংলার নদীর রূপের মধ্যে প্রশান্তির ভাব নাই, ইহাদের ক্ষিপ্র গতির মধ্যে যে তাল ও ছন্দ ফুটিয়া উঠে, তাহাই সেখানের সঙ্গীতের সুরেও প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্ব-বঙ্গে নিম্নভূমির অন্তহীন বিস্তারের মধ্যে নদী গতিবেগ হারাইয়া ফেলে, সেই ভাবেই সেই অঞ্চলে মাঝির কণ্ঠে যে ভাটিয়ালি সুর শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে গতিবেগ অনুভব করা যায় না। যেখানে গতি নাই, সেখানে তাল (rythm)-ও নাই, সেইজন্য ভাটিয়ালী সুরে তাল নাই, কিন্তু ভাওয়াইয়া গানের সুরে তাল আছে, ভাটিয়ালী ঢঙ্গের গান হওয়া সত্ত্বেও ভাওয়াইয়ার দীর্ঘ টানগুলি ভাঁজে ভাঁজে খণ্ডিত হইয়া প্রবাহিত, ভাটিয়ালীর মত সরল রেখায় লম্বিত নহে। প্রকৃতির মধ্য হইতেই মানুষ তাহার গানের সুর খুঁজিয়া পায়, পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের নদনদীর প্রকৃতিগত পার্থক্যের মধ্যেই এই দুই অঞ্চলের মাঝির গানে এই পার্থক্যটুকুর সৃষ্টি হইয়াছে।

ভাওয়াইয়া গান সম্পর্কে আর একটি প্রধান কথা এই যে, ইহা বিচ্ছেদের গান, প্রোষিতভর্তৃকা কিংবা ব্যর্থ প্রণয়িণী নারীর বেদনার্ত হৃদয়ানুভূতিরই অভিব্যক্ত ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রেমে অপূর্ণতার বেদনাই ইহার অনুভূতির বিষয়। ভাটিয়ালী সুরে দেহতত্ত্ব, বাউল ও বৈরাগ্যমূলক গান গাওয়া হয়, কিন্তু ভাওয়াইয়া গানে কেবল মাত্র নারীহৃদয়ের বেদনার অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়।

ও পতিধন, প্রাণ বাঁচেনা যৈবন জ্বালায় মরি—

সখিরে, মনোকে বুঝাব কত !

সখিরে, চিতোকে বুঝাব বা কত !

আজি আকাশেতে নাইরে চন্দ্র কি করে তার তারা,

যে নারীর সোয়ামী নাইরে দিনে আঁধিয়ারা।

তোলা মাটির কলা যেমন রে হল্‌হল্‌ ফল্‌ফল করে,

ঐ মতন নারীর যৈবন দিনে দিনে বাড়ে রে !

সখিরে ...

খোপেতে যে নাইরে কইতর কি করে তার খোপে,

যে নারীর সোয়ামী নাইরে, কি করে তার রূপে,

সখিরে ....

নারীমনের একটি মাত্র বিষয় অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত হইয়া থাকে বলিয়া ইহার মধ্যে যে বৈচিত্র্যহীনতা দেখা যাইবার কথা ছিল, প্রকৃত পক্ষে ইহাতে তাহা দেখা যায় না, কারণ, ইহার অনুভূতি অত্যন্ত গভীর, বেদনার সঙ্গে ইহা যুক্ত বলিয়া ইহা সর্বদাই একটি বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়। কারণ, কবির কথায় বেদনার মধ্য দিয়াই জীবনের মধুরতম সঙ্গীতের সুর বাজিয়া উঠে—'Our sweetest songs are those that telleth of saddest thought'. বৈষ্ণব পদাবলীর মাথুর যেমন করুণতম বিষয়, ভাওয়াইয়া গানও বাংলার লোক-সঙ্গীতের মধ্যে করুণতম বলিয়াই মধুরতম বলিয়া বোধ হয়।

ভাওয়াইয়া গানে সর্বত্রই কেবল মাত্র নারীমনের ভাবেরই অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়। ইহার কারণ সম্পর্কে প্রথমেই বলিয়াছি যে, ইহা স্ত্রী-প্রধান বা মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-জীবন হইতে উৎসারিত হইয়াছে। সেইজন্য এই অঞ্চলের লোক-সাহিত্য মাত্রেই নারীর অন্তর্বেদনাই সঙ্গীতে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। তবে সামাজিক জীবনে নারীই যে বিচ্ছেদমূলক ভাওয়াইয়া গানের গায়িকা, তাহা নহে ; পুরুষই নারীর অন্তর্বেদনাকে ভাষা দেয়, পুরুষ যেমন এই গানের রচয়িতা, তেমনই পুরুষই ইহার গায়ক, তথাপি গানের বিষয়বস্তু সর্বত্রই নারী।

ভাওয়াইয়া গানের সঙ্গে যে বাদ্যযন্ত্রটি অপরিহার্য রূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা দোতারা ; স্থানীয় উচ্চারণে দোত্‌রা। ইহা তারযন্ত্র, কাঠে তৈরী, চারিটি তার সংযুক্ত, তবে দুইটি তারই অঙ্গুলির স্পর্শ পায় বলিয়া দোতারা নামে পরিচিত।

দোতারা বাদ্যের সঙ্গে ভাওয়াইয়া গানের সুর ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির মত মৈষাল বন্ধুর দোতারার সুরও পল্লীবালাকে গৃহছাড়া করে—

ও মোর মৈষাল বন্ধু রে,
না বাজান তমান খুটা রে দতারা।
নারীর মনমোর করিল রে ঘরছাড়া॥
ওর এ্যাখেতে সুতাবো বাইজন রে ;
কি না সুরে বাজে।
তোর দোতরার বাইজন শুনি
মন না অয় মোর ঘরে রে॥

দোতারার সঙ্গে অনিবার্য রূপে গীত হয় বলিয়া ভাওয়াইয়া গানকে দোতারার গানও বলা হয়।

উত্তর বাংলার ভাওয়াইয়া গান ব্যতীতও অন্যান্য কোন কোন লোক-সঙ্গীতেও দোতারার ব্যবহার দেখা যায়। তথাপি মনে হয়, ভাওয়াইয়া গানের জন্যই যেন দোতারার জন্ম হইয়াছে। উত্তর বাংলার লোক-সঙ্গীতের গায়কদের নিকট দোতারা যন্ত্রটি অত্যন্ত প্রিয়। দোতারাকে উপলক্ষ করিয়াও সেখানে অনেক গান শুনিতে পাওয়া যায়। একটি গানে দোতারাকে গায়কের পুত্র বলিয়া কল্পনা করিয়া তাহার সম্পর্কে নানা সস্নেহ উক্তি প্রকাশ করা হইয়াছে। তবে উত্তর বাংলার পুরুষ সমাজই দোতারা বাজাইয়া ভাওয়াইয়া কিংবা অন্যান্য গান গাহিয়া থাকে, স্ত্রীসমাজে যে গানের প্রচলন আছে, তাহাদের প্রায় অধিকাংশের মধ্যেই নৃত্য সংযুক্ত থাকিলেও কোন বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায় না, কোন কোন সময় হাতে তালি দিয়া নৃত্যের তাল রাখা হয়।

ভাওয়াইয়া গান বাংলার প্রেমসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত। আমি অন্যত্র বলিয়াছি. প্রকৃত প্রেম-সঙ্গীতে কোন মালিন্য নাই, ভাওয়াইয়া গান আরও একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ মালিন্য বর্জিত হইতে পারিয়াছে, তাহা এই যে, ইহাতে মিলনের কথা নাই, সুতরাং ইহাতে রসোল্লাস সৃষ্টি হইবার কোন অবকাশ হয় নাই। ইহা নিরবচ্ছিন্ন বিচ্ছেদের গান, গভীরতম বেদনার গান। অন্তরের গভীরতম তলদেশে কোন মালিন্য স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়া ইহা বাংলার পবিত্রতম

প্রেম-সঙ্গীত। লৌকিক প্রেম-সঙ্গীত যে দেবতার নামে নিবেদিত প্রেম-সঙ্গীতের তুলনায়ও নির্মল হইতে পারে, ভাওয়াইয়া গান তাহারই নিদর্শন।

পূর্ব বাংলার কোন কোন অঞ্চলে বিচ্ছেদী গান নামে এক শ্রেণীর লৌকিক বিরহ সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়। তাহা প্রধানতঃ পূর্ববঙ্গের প্রচলিত লোক-সঙ্গীতের সুরে অর্থাৎ ভাটিয়ালী সুরেই গীত হয়, পূর্ববঙ্গের লোক-সঙ্গীতে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রই তাহাতে ব্যবহার করা হয়। ভাব-গভীরতার দিক হইতে ইহারাও ভাওয়াইয়ারই সমকক্ষ। তবে পূর্ববঙ্গের বহু বিচ্ছেদীগানে যেমন রাধাকৃষ্ণের বিরহ-চিত্র গিয়া প্রবেশ করিয়াছে, ভাওয়াইয়া গানে তাহা হয় নাই। ভাওয়াইয়া গান প্রেম-সঙ্গীত হওয়া সত্ত্বেও ইহার সম্পর্কে একটি প্রধান কথা এই যে, ইহাতে রাধাকৃষ্ণের চিত্র কোন দিক দিয়াই প্রবেশ করে নাই। সেইজন্যই ইহার চিত্রগত নির্মলতা রক্ষা পাইয়াছে। দেবতার নামে মানুষ একদিন যে দুর্নীতির আদর্শকে তাহার লোক-সঙ্গীতে গ্রহণ করিয়াছিল, দেবতার অভাবে ভাওয়াইয়া গানে কোন দিক দিয়াই তাহা প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। সেইজন্য ভাওয়াইয়া গানে মানবিক প্রেমানুভূতির পবিত্রতম বিকাশ দেখা গিয়াছে। দেবতার নামে মানুষ এখানে মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিবার অবকাশ পায় নাই।

ভাওয়াইয়া গানের নায়ক কৃষ্ণ বা কানুর পরিবর্তে গ্রাম্য 'চ্যাংরা' বা যুবক,—

> এমন মন মোর করে রে, বিধি, এমন মন মোর করে,
> মনের মতন চ্যাংরা দেখি ধরিয়া পালাও দূরে,
> রে বিধি নিদয়া।

চ্যাংরা বন্ধুর গান শুনিবার জন্য পল্লীবালার মন উন্মুখ হইয়া থাকে, গৃহকর্ম তাহার নিকট অর্থহীন বলিয়া মনে হয়—

> ঢেঁকি কো কাটিম রে,
> ছাইলা কো পুতিম রে,
> কেম্‌নি শুনিম্ মুঞ্‌ঞ চ্যাংরা বন্ধুর গান রে।

এই চ্যাংরা বন্ধুর জন্যই নারীর মন ব্যাকুল হইয়া থাকে। নায়িকার নামও ভাওয়াইয়া গানে রাধিকা নহে, নায়িকার জবানীতে গানগুলি রচিত হয় বলিয়া নায়িকার কোন নামই ইহাতে শুনিতে পাওয়া যায় না; সাধারণ ভাবে নায়িকা বিমুগ্ধা স্মরশরাহতা পল্লীবালিকা মাত্র।

প্রেম-ভাবের সমুচ্চ আদর্শ এই ভাবে রক্ষা করিয়া ভাওয়াইয়া গান রচিত হইয়া চলিলেও ইহার একটি ধারার মধ্যে একটু লৌকিক বিকৃতি দেখা গিয়াছিল, তাহাই অনুসরণ করিয়া ইহার মধ্যে এক নূতন প্রকৃতির লোক-সঙ্গীত রচিত হইয়াছে, তাহা চট্‌কা গান নামে পরিচিত। ইহা লঘু এবং হাল্‌কা কথায় দ্রুততালের ছন্দে রচিত কৌতুক সঙ্গীত মাত্র, যে ভাব-গভীরতা ভাওয়াইয়া গানকে বাংলার লোক-সঙ্গীতের মধ্যে একটি বিশেষ মর্যাদা দিয়াছে, তাহা হইতে ইহা সম্পূর্ণ বঞ্চিত। ভাওয়াইয়া গানে তাল থাকিলেও দীর্ঘ সুরের টানের মধ্যে সেই টান যেমন প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না, ইহাতে তাহার পরিবর্তে দ্রুত তালের ছন্দ ব্যবহৃত হইয়া তালই প্রাধান্য লাভ করিয়া বিষয়বস্তুকে নিতান্ত তরলায়িত করিয়া তুলে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে—

তখনে না কছিস তুইরে হাল চারখানা, গরু পাঁচ খান,
ছেউটি গরু নেকাল জোকাই নাই, বাড়ী আসিয়া দেখনু মুই,
চাতুরালী করলুঁ তুই ঘরোৎ তোর ছাউনি দিবার নাই।
তখনে না কছিস তুইরে মোটা চাউল খাই না,
সরু চাউলের নেকাই জোকাই নাই, বাড়ী আসিয়া দেখনু মুই,
চাতুরালী করলুঁ তুই, ঘরোৎ না তোর কাউনের গুড়াও নাই।

দিব্যভাবমূলক বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেম-সঙ্গীত যেমন লৌকিক স্তরে অবনমিত হইয়া একদিন কবিওয়ালার গানের অধঃপতিত পরিচয় প্রকাশ করিয়াছিল, তেমনই উচ্চ ভাবমূলক প্রেম-সঙ্গীত ভাওয়াইয়া গানও লৌকিক স্তরে অবনমিত হইয়া চটকা গানে পরিণত হইয়াছে। তবে কবিওয়ালার গানের মধ্যে যেমন বৈষ্ণব পদাবলী শেষ পরিণতি লাভ করিয়াছিল, চটকাগানের মধ্যে ভাওয়াইয়া গানের সেই পরিণাম ঘটে নাই—ইহার একটি ধারা এই ভাবে অধঃপতিত হইয়া বিকৃত হইয়া পড়িলেও ইহার মূল ধারাটি অবিকৃত থাকিয়া আজও উচ্চভাবমূলক ভাওয়াইয়া গান রচনার শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। সেইজন্য ভাওয়াইয়া এবং চট্‌কা উভয়েই সমান্তরাল ভাবেই আজও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। ভাওয়াইয়ার ক্ষেত্রে ভাওয়াইয়া এবং চট্‌কার ক্ষেত্রে চট্‌কা ব্যবহৃত হইতেছে।

চট্‌কা গানের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের সারিগানের ভাব এবং রূপগত অনেকখানি

সাদৃশ্য আছে। সারিগানের মধ্যেও প্রেমের বিষয় থাকিলেও যেমন তাহা নিতান্ত লঘু এবং চটুল তাল-প্রধান সুরে রচিত হইবার ফলে তরলায়িত হইয়া উঠে, চট্কা গানেও তাহাই হয়, তবে সারিগানে রাধাকৃষ্ণের দিব্য প্রেমের কাহিনীকে নিতান্ত লৌকিক স্তবে অবনমিত করিয়া কৌতুক উপভোগ করা হয়, চট্কা গানে তাহা করা হয় না, চট্কাই হোক কিংবা ভাওয়াইয়াই হোক, কাহারও মধ্যে বাধাকৃষ্ণের কাহিনী প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই, সে কথা পুর্বেও বলিয়াছি।

এইবার ভাওয়াইয়া গানের ভাষা সম্পর্কে কিছু না বলিলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। উত্তৰ বাংলাব উপভাষার সমগ্র বৈশিষ্ট্য আশ্রয় করিয়াই ভাওয়াইয়া গান বচিত হইযা থাকে, তাহা সাধু ভাষায় রূপান্তরিত করা যায় না, করিলে গানে মৌলিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইতে পারে না। বাংলার সকল আঞ্চলিক লোক-সঙ্গীত সম্পর্কেই এ কথা সত্য। তথাপি ভাওয়াইয়া গানের সম্পর্কে এ কথা আবও সত্য বলিয়া মনে হইবে, কারণ, এই অঞ্চলের উপভাষার একটি বিশেষত্ব আছে, ভাওযাইযা গানেব গঠনে তাহা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হইযাছে।

১

না খাই তোব গুযারে
না খাই তোব পানবে,
না করোঁ তোব বৈদেশী পিবীতি বে॥
বৈদেশী পিবীতি বে
মাটীব কলসী বে,
ভাঙ্গি গেইলে না লাগিবে জোড়া রে॥
উত্তব হাতে আইল্ ভারী,
কথা পুছোঁ মুঞ্ঞ সারাসারি,
কও ভাবি মোর কালা কেমন আছে॥
মোর কালা মানুষ ভাল্
না বুঝে কালা সঞ্ঝা কাল্
না বুঝে এক্লা নারীর কাম রে॥

টেঁকিকো কাটিম্ রে,
ছাইলকো পুতিম্ রে,
কেম্নি শুনিম্ মুঞ্ঞ চ্যাংডা বন্ধুর গান রে ॥
মোব কালা খাইবে ভাত,
কোট্ঠে নাইম্ মুঞ্ঞ কলার পাত,
কোট্ঠে নাইম্ মুঞ্ঞ জীয়া মাগুর মাছ রে ॥ —কোচবিহার

২

বক্ষ বইয়া পড়ে নারীব ঘাম রে।
যে জন বঁধুয়া হবে,
ঘাম মুছিয়া কোলে লবে,
বক্ষ বইয়া পড়ে নাবীব ঘামবে ॥
শাক তোলোঁ মুঞ্ঞ নাতারি বে,
শাক তোলোঁ মুঞ্ঞ পাতারি রে,
আজি শাক তোঁল মুঞ্ঞ বাড়ীব চতুর্দ্দিগে রে
এক নোটা ভুলিতে,
ফিব নোটা ভবিতে,
ওরে ছিঁড়ি গইল্ মোর গলাব চন্দ্রহাব রে ॥
মাও নাই যে বলিম,
ভাই নাই যে কহিম,
আজি কে তুলিয়া দিবে গলার চন্দ্রহার রে ॥

৩

প্রাণ বঁধুরে—
আসিলো কাত্তিকো মাসে,
গোম সরিষা ক্ষেতে ক্ষেতে,
বতর[১] গেলে কি করিবে চাষারে ॥
উজানি[২] দুপুর বেলা,
ভোক[৩] নাগে বন্ধু এলামেলা[৪]
ভোক বীতি গেলে না লাগে তিরিষা ॥

১। মরসুম, ২। উঠ্তি, ৩। ক্ষুধালাগে, ৪। এখন ও তখন।

তোম্‌রা যাইমেন দূর দেশে,
না করেন বন্ধু পরার আশ,
আপন হস্তে আন্ধি খান্ ভাত ॥
কোঁছার কড়ি সাধু না করেন ব্যয়,
পরার নারী সাধু আপন নয়,
আপন হস্তে আন্ধি খান্ ভাত ॥
তোম্‌রা যাইমেন পরবাস,
ঘরে উইয় বন্ধু ফুলের গাছ,
ফুলের নোভে ভোম্‌রা পাক পাড়াবে ॥
দাঁড়ি মাঝি ষোল ঝন
না বলেন সাধু দুর্বচন,
মুখের প্রেমে নৌকা বয়া যামেন হে ॥
পুবিয়া পচ্ছিয়া বাও,
ঘোনা চা'য়া সাধু আটকান নাও,
মুখের প্রেমে নৌকা বয়া যাবেন হে ॥
আইস্‌তে যাইতে বছর বারো,
এ যৌবন কি বাথতে পারোঁ।
থাকেন, কন্যা, ঈশ্বর ভাবিয়া ॥ —ঐ

বার বৎসর কাল প্রোষিত-ভর্তৃকার জীবন কেবলমাত্র কি ঈশ্বর চিন্তা করিয়া কাটাইতে পারিবে ? ঈশ্বরের কথা এখানে কেমন যেন নিতান্ত অবান্তর বলিয়া মনে হইতেছে।

৪

কুকিলার কুহু কুহুরে,—
(আরে মোর) মইওরের ফ্যাকম,
কোন দেশে থাকিয়া ও মোর বন্ধু দেখালু স্বপন।
বালাই দেঙ্‌ তোর পিরীতের মাথাত রে ॥
ধন কাঙ্গালী সাউধের ছাইলারে—
(আরে মোর) ধনক্ নাইগা মন,

ঘরে থুইয়া কাঞ্চা সোনা (ও মোর বন্ধু) বৈদেশে গমন।
বালাই দেঙ্ পিরীতের মাথাত রে ॥
গছ মধ্যে শিমিলার গছরে,
(আরে মোর) সরগে ম্যালেরে ডাল,
নারী হ'য়া এ যৌবন (ও মোর বন্ধু) রাখিম্ কতকাল।
বালাই দেঙ্ তোর পিরীতির মাথাত রে ॥
নদীর পাডত্ বটের গাছ,
ঐট্‌ঠে বন্ধুয়া মারে মাছ,
ওরে কিসের আঙিনা সাম্‌টিম্ মুই।
এক নজর দেখি আইসোঙ্ মুঞ্‌ঞ ॥
বন্ধুয়া যাইবে পাকের হাট,
কিনিয়া আনিবে নাকের নত,
ওরে কিসের বিছনা করিম্ মুঞ্‌ঞ।
এক নজর দেখিয়া মাইসোঙ্ মুঞ্‌ঞ ॥
বন্ধুয়া যাইবে পোড়ার হাট,
কিনিয়া আনিবে ছাপর খাট,
কিসের বাবা বানিম্ মুঞ্‌ঞ।
ওরে এক নজরে দেখিয়া আইসোঙ্ মুঞ্‌ঞ ॥ —ঐ

৫

চাঁদোনী রাইতোতে বসিয়া ঠ্যালোতে[১]
কার সাতে খেলান টুভুয়া।[২]
তোমাকে চিনিছোঁ, তোমাকে জানিছোঁ,
তোমরা হ'ন কোকিলার ছাওয়া।
তোকে না চিনিয়া, মিছায়ে পুষিয়া,
ঠেকিল অবোধ ঢালকাউয়া।[৩]
মেঘের বাওটাটি[৪] লুকাইচে চাঁদটি,
এক্ একবার দেখা দেয় ভুয়া।

১। ডালেতে, ২। লুকোচুরি, ৩। দাঁড়কাক, ৪। সদর ও অন্দর।

লুকায়া তোমরাও, করিচেন্ টুরাও,
এলুকা কিচু নয়, ভুয়া।
আছেন যে নিদোঁতে[৫] সোয়ামী ঘরোতে
সে কান্নে[৬] কাঁপে মোর হিয়া।
দিনোতে খাটিযা পডিচেন্ ঘুমিয়া,
বৈতোচে[৭] শির শিরা হাওয়া।
টু টু করিয়া তুমি, কাঁপাইচেন পিথিমী,
ভাগে বা নিদঁকোনা পিয়া।
তা হ'লে তোমাকে ফেলিবে বিপাকে,
কবিবে কে তোমাক্ দয়া।
ভরিচে জোনাকে,[৮] দেখা যায় সবাকে,
দেখিলে বধিবে সুয়া।
পাকা বাঁশেব নাটী, ব্যাডাতে আছে দুটি,
বুজাইবে ঐ নাটী দিযা।
উডিয়া যাইমেন্ কোটে,[৯] পডিবেন এই কোটে[১০]
পলাইমেন্ কোন্ ভিতি দিয়া।
জাগিলে ননদী বওযা'বে লৌয়ের নদী,
পিটিতে বিদির বাড়ুন দিয়া।
ঘুমাইচে সব বাডী, ক্যানে এ বাডাবাডী,
ঘুমাইচে সক্কলে শুইয়া।
ঘুমাইচে সোয়ামী, একলা জাগি আমি,
জাগাও ক্যান্ তুমি এ গায়া।
শিয়রে মোমবাতি, জ্বলিচে সারারাতি,
শুইয়া গনি ঘরের রুয়া।
কি হ'ল নাই চিন,[১১] চৌকোতে নাই নিঁন,[১২]
এমন হ'ল কি রোগ হয়া।

৫। ঘুমুতে ৬। সেজন্য, ৭। বহিতেছে, ৮। জ্যোৎস্নায়। ৯। কোথায, ১০। দুর্গে, ১১। চিহ্ন, ১২। ঘুম।

ও কালা কোকিলা, কি গাইম্ একেলা,
গেলুরে মোর মাথা খায়া।
ধরিতে যদি পারোঁ, হৃদ্ পিঞ্জরে ভরোঁ,
দুবাহু করিম্ আড়েয়া।[১৩]
পাকা ডালিম দিম্, কত কি করিম্,
মুখোৎ ভাসাম্ চুমা খায়া।
মুখোতে মুখ দিয়া, অমত্ত[১৪] ঢালিয়া,
দিম্বে বুকোতে নিয়া।
আদর পাবু কত, মুখোতে হবুরত,
বাপো মাওক যাবুরে ভুলিয়া।
শুনেক্ রে শুনেক্ কুলি[১৫] শিকাইম কত বুলি
যাইতে পার্বু না আর ধায়া।
কোলাতে রাখিম্, কোলাতে শোয়াইম্,
হইবে যে তোর ভারি পায়া।
রসিক দাসে কয়, ধরিলে ভাল হয়,
দোনোকে[১৬] তখন যাইবে পাওয়া। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত ভাওয়াইয়া গানটি 'চলমল সাধুর' গান বলিয়া পরিচিত, লক্ষ্মীমাতার পুত্র চলমল সাধুর সহিত পাটগ্রামের শঙ্খ রাজার কন্যা দুবুলার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের পর সাধু বাণিজ্যে গমন করে, দুবুলার কাতর মিনতি তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। বার বৎসর ধরিয়া তাহার সহিত দেখা নাই। একদিন ঘাটের পথে সাধুর সহিত দুবুলা সুন্দরীর সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু কেহই কাহাকে চিনিতে পারিল না। না চিনিতে পারিলেও তাহারা উভয়ে পরস্পরকে উপলক্ষ্য করিয়া গান করিতে লাগিল।

৬

'ও নাথ কন্যা ও, জল ভর রে সুন্দর কইনা, জলে দিয়া ঢেউ।
একলা ঘাটে আইসাছ, কন্যা, সঙ্গে নাইকো কেউ॥'
তুমি তো রাজার ছাইলা বিভাও করতে পার।
পরার রমণী দেখে কেন জ্বলে পুড়ে মর॥'

১৩। পক্ষিগণের বসিবার দাঁড় ১৪। অমৃত, ১৫। কোকিল, ১৬। উভয়কে।

'আমি তো রাজার ছাইলা বিভাও করতে পারি।
তোমার মত সুন্দর কন্যা মিলাইতে নারি ॥'
'সাধু, আমার মত সুন্দর কন্যা যদি মিলাইতে চাও।
গলায় কলসী বেঁধে জলে ঝম্প দেও ॥'
'কোথায় পাব কলস, কন্যা, কোথাও পাব দড়ি।
তুমি হইলেন যমুনার জল আমি ডুবে মরি ॥'

এই প্রকার বিচ্ছিন্ন লোক-সঙ্গীতকে অবলম্বন করিয়া কখনও কখনও গীতিকার কাহিনী গড়িয়া উঠে। সেইভাবেই 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র মহুয়া পালা গানের ইহা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। অনেক সময় গীতিকার কোন কোন অংশ স্বাধীন লোক-সঙ্গীতরূপেও আত্মরক্ষা করিতে পারে; এখানে তাহা হওয়াও অসম্ভব কিছুই নহে।

৭

ও নাগর কানাই রে—
বেলা গেল সন্ধ্যা হল, ও কানাই রে,
ও সে জ্বালে মোমের বাতি।
না জানি মোর প্রাণনাথ, আস্‌বে কত রাতি ॥
ও নাগর কানাই রে—
রাত্র একফর হইল, কানাই রে, বেড়ানে দিলে মন।
রাঁধিয়া বাড়িয়া রন্ন, জাগব কতক্ষণ ॥
রাত্র দুই ফর হইল, ও সে গাছে ডাকে শুয়ো।
গা তুলে খাও বাটার পান, নারী কাটে গুয়ো ॥
রাত্র চার ফর হইল কানাই রে, কোকিল ছাড়ে বাসা।
রাধিকার সঙ্গে প্রেম করিয়া, না পুরিল আশা রে ॥

৮

ও কি হায়, পরাণের মাধব রে—
যখন করিলাম পেম তুমি আর ও আমি।
এখন কেন সে সব কথা লোকের মুখে শুনি ॥
যখনে করিলাম পেম সান বাঁধা ঘাটে।
আশমানের চন্দ্র সূর্য তুলে দিল হাতে ॥

বেলা গেল সঞ্জে হল, সঞ্জে লাগাও বাতি।
ফুলশাখে বিছানা পাতে জাগ্‌ব কত রাতি ॥
রাত এক পহরের কালে, চালে ডাকে চুয়ো।
পান খেয়ে যাও, প্রাণের বন্ধু, আডে কাটা গুয়ো ॥
রাত প্রভাতের কালে পুবে উদয় ভানু,
রাধিকার অঞ্চল ধরে বিদায় মাগে কানু ॥

৯

ও নাগর কানাই রে,
ওরে অবোধকালে করিছি পিরীত, তুমি আমি জানি।
এখন কেনে লোকের মুখে নানান কথা শুনি,
ওরে দুইজনায় কইরাছি পিরীত, খাবার নিবার আশে,
বাদি হইল পাড়ার লোকে, পিরীত ভাঙ্গল শেষে ॥
ওরে, নাউ কাটিনু ফালা ফালা, চালে থুনুবে দাও।
অবোধ কালে করিয়া পিরীত আজিও ঝঞ্জায় গাও ॥
ও নাগব কানাইরে—
বনে বনে চরাও রে ধেনু আগোয়ালে মতি।
এলা কেনে বেডাইল তোর গোপন পিরীতি॥
ওরে, ধনেটি খাইল টিয়ে,
কেমনে কাটাব রাত্রি বুকে পাষাণ দিয়ে ॥

১০

ওরে বান্ধিনু বাড়ী, গুয়া উঁনু সারি সারি—
গুয়ার বাগুচায় ঘিরিয়া লইলে বাড়ী বে—
আসিবে মোর প্রাণের গুয়া
তায় পাডাইবে গাছর গুয়া
মুই নারীটা ফাঁকিয়া খাইম তাক্।
ওরে, আসিবে মোর প্রাণের নাথ,
তায় কাটিবে কলার পাত,
মুই নারীটা বসিয়া খাইম বোল ভাত ॥

ও কি ও, প্রাণ কালা রে—
ওরে মহাকালের ফল যেমন,
মোর নারীর যৈবন তেমন
খায়া দেখ কালা যৈবন কেমন মিঠা রে ॥

১১

ও মোর কালা মানুষ ভাল,
না বুঝে কালা সন্ধ্যা কাল,
না বুঝে কালা একেলা নারীর কাম রে—
ওদিয়া গেইছেন কাইল,
তার জন্য মোরে পাড়ে গাইল,
সেও গাইল মোর শুনে পাড়ার লোকে ॥
ও তোর পিরীতির আশে,
বাড়ী বান্দিনু বনবাসে,
তবু কালা না হনু রে আপন ॥

১২

ঐ যে, মল্লি বান্দ রে কন্যা পানি আরও ছেক।
সুন্দর গায়ে কই না কাদা রে মাখ—
পরপুরুষের সঙ্গে কিসের মৈচ্ছ মার রে ॥
মাছ মার রে কন্যা ইলিসা, মাছ মার রে কন্যা খলিসা,
বেছে মৈচ্ছ মাব চন্দনা আর কুরুসারে ॥

১৩

কানাই, ঘাড়ে দেখো তোর লাল বাকুয়া
হস্তে দেখো লাল সিকিয়া রে—
মাথে দেখো মনির আজ পাগরী রে—
ও তুমি কোথা হইতে কোথা যাও।
রে নিষ্টুর, মধুর কথা কয়া যাও ॥

১৪

ও সুন্দর কানাই রে—
আষাঢ় (ও) শ্রাবণ (ও) মাসে
আঙ্খির জলে কানাই মাটি ভেজে
ঔদে না ঘামিল রে গাও।
ও সুন্দর কানাই রে—
দুয়ারের আগে রে কানাই,
হালখানি জুড়িছ
ঔদে না ঘামিল রে গাও
ধিক্ ধিক্ তোর বাপ্ রে মাও,
এমন ব'সে কানাই নাই হয় বিভাও,
পড়া যাউক তোর দালান কোঠা বাড়ী রে।

১৫

সখী, আর কি দেখা পাব জীবনে,
আমার দিনে দিনে তনু অইলো ক্ষীণ,
সখী, ভাবতে ভাবতে তাহারি।
দুই নয়নের জলে আমার বক্ষি ভাসে নদী,
সখী, এতদিনে ক্ষয় হইতাম পাষাণ হইতাম যদি।
হইতাম যদি জলের কুমীর খুজ্যা দ্যাখতাম জলে
সখী, হইতাম যদি বোনের বাঘ রে খুজ্যা দ্যাখতাম জঙ্গলে,
হারে দারুণ বিধি, যদি দিত পাখারে
সখী দ্যাখতাম নয়ন ভরে॥

বাউড়িয়া সম্প্রদায় বাউলের মতই আত্মভোলা, কিন্তু তাহাদের গীতগুলি ঠিক সেই অনুপাতে অধ্যাত্মভাব সমৃদ্ধ নয়। অপর দিকে পূর্ববঙ্গের উদাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গেও ইহাদের প্রচুর মিল রহিয়াছে। তাই ইহাদের গানে বৈষ্ণবের মত বিচ্ছেদ, অন্তরা, পূর্বরাগ, পরকীয়া প্রেমের সন্ধান মিলিবে। কিন্তু তাই বলিয়া কোন নির্দিষ্ট মূর্তি বা গণ্ডীর মধ্যেও ইহাদের আটকাইয়া রাখা যাইবে না। রাধাকৃষ্ণের নামেরও উল্লেখ তাহাতে পাওয়া যাইবে না। ইহারা সারা জীবন

প্রেমের দেবতাকে খুঁজিয়া বেড়ায়। সে রক্তমাংসে গড়া প্রণয়ী ছাড়া আর কিছু নহে।

১৬

প্রেম জানে না অসিক কালাচাঁদ,
ও সে ঘুইরে মরে মোন
কতদিনে বঁধুর সনে হইবে দরশন।
হাঁটিয়া যাইতি নদীব জল
খাকলুম কি খুকলুম কি
খলাল খলাল করে রে।
(হায হায পরাণের বন্ধু রে)।
(বন্ধু) তোমার আশায বইসে থাকি
বট বিরিক্ষির তলে
মন আমাব উডাম বাইরাম করে রে,
উডাম বাইরাম করে।

১৭

যে মোরে করিতো রে পার, দান করিতাম গলার হার,
পার হইযা যৈবন করতাম দান।
ওই পারে বন্ধুর বাড়ী এই পারে মুই নারী,
মধ্যে আছে চিরল নদীর ধারা।
বাহুতে আধিনু বাহুতে বাঁধিনু জলেতে ভাসাইয়া দিলাম হাঁডী।
আর বিযার সোযামী মইলে খাব মাছ আব ভাত রে,
(আর) পান বঁধুয়া মইলে হব আডি।
না জানি সাঁতার রে, না জানি পাহাড না জানি ঘুর‍্যা বাইর,
আমি অকূল দরিযায ক্যামনে হব পাওয়াব।

১৮

প্রেমের আগুন জ্বলছে ধিকি ধিকি মুই যেন জান।
বন্ধুর ঘরে প্রেম করা ভালো,
কেইন্দে কেইন্দে চোখের জল মোর হোল সাবা রে।
মুই যেন জান॥

চন্দ্র সূর্য যাচ্ছে জলিয়া রে,
আরে ওই রকম ওই নারীর প্রাণ সদাই ঝরে রে।

১৯

(আরে ও) মরি হায়রে হায়, নবীন বয়সে মোক্ করলি রে বাউরিয়া,
যখন দো-তারা তোকে নিলাম হাতে, নিষধ করে মোক্ পাড়ার লোকে,
নিষধ করে মোক্ দয়াল বাপ ভাই।
তোর জন্য মোর গেরাম বাদী
আজ তুই দো-তারা বাখলিরে মাথ, রূপা দিয়া মুই বান্ধাবরে কান ···।

২০

ওকে গাড়ীয়াল ভাই, উজান উজান করে গাড়ীয়াল
উজানে বাঘেব ভয়।
গাড়ী ধবিয়া গাড়ীযাল বাড়ী ফিরিয়া যায়।
ভাত ও মাগো খাইয়া গাড়ীয়াল মুখে না দেয় পান,
চালেব বাতায় ধরিয়া কন্যা জুড়িছে কান্দন।
না কান্দ না কান্দ, কন্যা, ভাঙ্গিব রসের গোভা,
আর একদিন ফিরিয়া আসিলে সোনা দিয়া বান্ধিবরে গলা।

২১

ওকি ধন ধন রে তোর শরীলে এতইরে গোঁসা
পিরীতি মুই জান না—
একে ত অন্ধাইরা বাতি হাউসের[১] বন্ধু আমার
গোঁসা হইয়্যা যায়।

২২

চ্যাংড়া বন্ধুরে, আমারে ছাড়িয়া যাবি রে কোথায়।
তোমার জন্যে ভেইব্যে ভেইব্যে হইলাম রে গাছের বাকল
চ্যাংড়া বন্ধু তুই মোর নয়নের কাজল।
তোমার জন্যে কিনিয়া আনলাম বালুরঘাটে মটর থান,
চ্যাংড়া বন্ধু চড়িয়া বেড়ান তবু ক্যান আমায় ছেড়ে যান।

১ হাউসের—সাধের

২৩

নিম্নোদ্ধৃত গান দুইটি প্রেমবিষয়ক না হইলেও ভাওয়াইয়া গানের সুরে গীত হয়, ইহারা আধ্যাত্মিক সঙ্গীত—

আপন কর্মদোষে সব হারালি দোষ দিবি তুই কারে,
মোনরে পুবান পচ্ছিমে বাও রাধাকৃষ্ণের ভাঙ্গা নাও ,
ঠমকে ঠমকে ওঠে পানী।
মোনরে ইঙ্গলা পিঙ্গলার ঘব ঘুমে করেছে জড জড,
খস্তে পডল তোর বত্রিশ বন্ধনের জোডা।
ওপারে কদম্বের গাছ, ঝিল মিল ঝিল মিল করে পাত
তার উপর জোড বগিলার বাসা।
আহারের লোভে রে জমিনে পরিয়ারে
সেই না বগা ঠেকলো মায়াজালে।

২৪

ওরে জীবন ছাডিয়া যাইস মোরে
তুই জীবন ছাডিয়া গেলে আদর কববে কে ?
ভাই বল ভাতিজ্যা বল সম্পত্তিরোরে ভাগী
আগে করবে ধনের আশা
পিছে কববে দেহার গতি।
চিত্রগুপ্তের খাতা লয়ে বেডায় বাডী বাডী
পরমায়ু শেষ হলে হস্তে দিবে দডি।
দুই জনাতে মুক্তি কবে আনল ভবের হাটে
তুই জীবন ছাডিয়া গেলি নিধূয়া পাথারে।

২৫

দাঁডাও, কালা, মোর ঐনা রাজ পন্থে রে,
জনমের মত দেখিয়া নেঁও মোর প্রাণ-কালারে !
মোব কালা মানষিরে ভাল
যাওয়া আসা করে চিরকাল রে।

দাঁড়াও কালারে ঐ না রাজ পন্থে রে !
মোর কালার কঠিন রে হিয়া,
মন ধরিছে কালা পাষাণ দিয়া,
দাড়াও, কালা, ঐ না রাজ পন্থে রে,
জনমের মত দেখিয়া নেও মোর প্রাণ-কালারে।

—জলপাইগুড়ি

২৬

ওকি দৈয়ল রে, আর কতকাল রাখিব সোনার যৌবন।
দোলা মাটির কালা দৈয়ল হলফল, হলফল করে।
বহুদিনের গোপন পীরিত মন না বয় মোর ঘরে।
না যান না যান ও মোর দৈয়ল না যান মোর ছাড়িয়ে,
এ হেন সোনার পিঞ্জরা দৈয়ল
ওকি দৈয়ল রে ···যৌবন।
শেষের কথা কও রে দৈয়ল, দৈয়ল শেষের কথা কও ;
নিদান কালে ওরে দৈয়ল, যেন তোমার চরণ পাঁও,
ওকি দৈয়ল রে······যৌবন। —ঐ

২৭

একবার আসিয়া কালাচাঁদ মোরে যাও দেখিয়া রে,
কোঁড়া কান্দে কুঁড়ি কান্দি, কান্দে বালিহাঁস,
আর ডাউকির কান্দনে মুই সই ছাড়ুন ভাইয়ার দেশ রে।
আর আইলত কান্দে আইল কাশিয়া দোলাও কান্দে হোলা।
বাপমায় বেচেয়া খাইলে সোয়ামী পাগলা ॥
লোকে যেমন ময়না পোষে পিঞ্জরে ভরিয়া
ঐ মত নারীর যৌবন রাখি চোখ বান্ধিয়া। ঐ—

চট্‌কা গান

পূর্বেই বলিয়াছি, ভাওয়াইয়া গানেরই একটি অধঃপতিত রূপের নাম চট্‌কা। ইহা তাল-প্রধান সুরে রচিত। দৈনন্দিন জীবনের নিতান্ত লঘু বিষয় ইহার অবলম্বন। ইহাদের গীতিগুণ যাহাই থাকুক, কোন সাহিত্য গুণ নাই। কয়েকটি নিদর্শন উল্লেখ করা যায়।

১

আবার বাড়ী ছাড়িয়া কোথা যান,
দোহাই আল্লাটে মোর মাথা খান।
কাল মুরগীটা ওসন বইস্যাছে।
কন্যা, আশা দিলি ভরসা দিলি,
কলার মোথাত মোক বসাইয়া থুলি,
সারা রাইত মোক মশা কামড়াইছে।
কন্যা আগুম নিগুমটা না বুঝিয়া,
ভাতের উতালটা দিনু ঢালিয়া,
সোনার অঙ্গে মোর ফোসা পইর‍্যাছে। — কোচবিহার

২

ও শাশুড়ী, মাই না পাবি মুই ভাত রান্ধিবার,
মুই ত' মোড়লের বিটি
ভাত রান্ধিবার না জানি
ভাত খাও ত ধর আন্ধুনী।
ও শাশুড়ী মাই, না পারি মুই গোবর ফ্যালাইবার।
গোবর ফ্যালাইলে হাত গোন্ধাই
খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হয়,
ঝাঁটা মারি মুই গরুর কপালে। — ঐ

৩

আমার বাঙ্‌লায় করে মন ফাঁপর,
চল যাই কইলকাত্তা শহর।

শহরে ভাড়া করলাম ঘর দোতালার উপর।
দিনে দিনে গিন্নীর মন করে ফাঁপর।
গিন্নীর ভ্যানিটিব্যাগ, সোনার গয়না গায়,
ও গিন্নী বাইন্‌তে বলে লেকে ঘর।
ও গিন্নীর ডুরে শারী, রেশমী চুড়ি
তবু তার মন না রয় ঘর। —জলপাইগুড়ি

৪

আমার শ্বশুর করে খুশুর খুশুর ভাশুব করে গোঁসা,
নিদয় হেন স্বামী আস্থা ধরল চুলের খোঁপা।
আমার শাশুড়ী আছে ননদী আছে আছে ভাইগ্‌না বউ
(হারে) এমন কইর‍্যা মাইর মারিল আউগাইল না কেউ। —ঐ

৫

আগা নাও যে ডুবুডুবু পাছা নাও যে বইস
ঢোঙায় ঢোঙায় ছেকো জল রে—
জল ছেকিতে জল ছেকিতে সেঁউতিব ছিড়িল দড়ি,
গলার হার খুলিয়া কন্যা রে—
ও কন্যা সেঁউতির লাগাইস দড়ি।
ভাঙ্গা নাওয়ে খেওয়া দিতে কেমন মজা পাও।
ভাঙ্গাও নোয়ায় চুড়াও নোয়ায় সোনা রূপায় গড়া,
বাজার হতিক পাব করিছো ভবে, ও কন্যা, তোর বা কত ভাড়া।
সব সুন্দরীকে পাব করিতে নিছঙ আনা, আনা আনা,
তোক সুন্দরীকে পার করিতে নেগাইম কানের সোনা॥ —ঐ

৬

হাওয়া গাড়ী চলিয়া গেল বন্ধু আইল কৈ,
জলপাইগুড়ির চিড়ামুড়ি গৌরীর হাটের দৈ,
খাবার বেলা মনে পড়ে গো আমার চেংরা বন্ধু কৈ।
জলপাইগুড়ির রেশমী চুড়ি পয়সা পয়সা দাম,
তারই মধ্যে লেখা আছে আমার চেংরা বন্ধুর নাম।
ওকি হাওয়ার গাড়ী চলিয়া গেল আমার বন্ধু আইল কৈ! —ঐ

বার

জাগ গান

রংপুর, রাজসাহী, পাবনা ও বগুড়া জিলায় একপ্রকার আখ্যায়িকামূলক গীতিকাহিনী প্রচলিত আছে, তাহা জাগ গান বলিয়া পরিচিত। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া এই গান হয় বলিয়াই ইহাকে জাগ গান বলে। পশ্চিম বঙ্গে প্রায় এই শ্রেণীর এক প্রকার গানকে জাগা গান ও জাগরণ গান বলা হয়। জাগ গানে সাধারণত মুসলমান সম্প্রদায়ের পীর দরবেশদিগের অলৌকিক মাহাত্ম্যের কথা বর্ণিত হইয়া থাকে। তবে রাধাকৃষ্ণ এবং নিমাই সম্পর্কেও জাগ গান শুনিতে পাওয়া যায়। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক জাগ গানগুলির মধ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাকৃষ্ণ চরিত্রের রূপটি প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। তবে ইহার অংশগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত আনুপূর্বিক কাহিনীর আকারে কোথাও গ্রথিত নহে।

১

রাধা। কালিয়া কৃষ্ণ জন্মিল কাল যমুনারি পানি।
উপজিল কালিয়া কৃষ্ণ ছাড়নু বেচি কিনি॥
হাট ঘাট ত্যজিনু, বড়াই, মথুরা নগর।
ছাওয়াল কানাইর গুয়া খাইয়া কি হইল ঝগর[১]॥
একদিন দরশন হইল ফুল-বৃন্দাবনে।
সেইদিন হইতে ছাওয়াল কানাই আইসে ঘনে ঘনে॥
আগ দুয়ারে আইসে কানাই পাছ দুয়ারে চায়।
সরুয়া টোকরাই[২] খানি দুই হাতে বাজায়॥
সরুয়া টোকরাই খানি যেন স্বরগের তারা।
মদনে মারিল বাণ গেইল কদমতলা॥
কানাই গেল কদমতলা রাধে রইল ঘরে।
ঘরে আমি চন্দ্রাননী ভাবিত অন্তরে॥

১। বিপদ, ২। শম্বুকাবরণ নির্মিত বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

চম্পা কলা নয় কানাই মিঠে মিঠে খাঁও।
মোন্দা জল[৩] নয়, হে কানাই, মোজা ধারে খাঁও ॥
নেতের বস্ত্র নয়, হে কানাই পিন্দিয়া, ওসার চাওঁ[৪] ॥
খেটে জাও পামরী রাধে সেইটে কৃষ্ণর নাম।
মরিয়া যাও পামরী রাধে টুটুক রাধার নাম ॥

বড়াই। কাণে কাণে কও হে কথা শুনেক চন্দ্রাননী।
তোর কারণে নন্দের ছাইলা ছাড়চে অন্ন পানি ॥

রাধা। নন্দের ছাইলা সুন্দর কানাই সে ভাগিনা হয়।
ধাক্কা দিয়া বাইর করোঁ বুড়িক মিছা কথা কয় ॥
আস নয় পড়শী নয় মোদের ভাগিনা।
কাইল বিয়ানে[৫] আসবে কানাই আমার আঙ্গিনা ॥
কাল শিলায় বাটায় নাই খাঁও পিষিয়া।
ঘরে ছিল কাল বিলাই ফেলাই ছেঁা মারিয়া ॥
কাল মেঘ কোকিলের রাও নাই সয় গো তরে।
ঘরে ছিল কাল গাভী বেচাচোঁ সত্বরে ॥

বড়াই। কালা কেন নিন্দ রাধে কালাক কেন নিন্দ।
কালা হেন কাজলের ফোঁটা কপালে কেন পিন্দ ॥[৬]
কালা নয় হে, ও নাতিনী, কালা নয় শ্যাম।
অঞ্চলে লিখিয়া রাখ কালার নিজ নাম ॥
ঐ ছাইলা করিলে দয়া পাপ বিমোচন ॥

রাধা। খাইলাম তোমার গুয়া, বড়াই, নিলাম তোমার পান।
কয়েন যাইয়া ছাওয়াল কানাইক বাঁশীত দেউক মান ॥
চট্ দিয়া[৭] যায় রঙ্গের বড়াই কানাইর আগত[৮] কর।
তোক বোল ছাওয়াল কানাই মোর যে বচন ধর ॥
যদি চাস রাধিকার নাগাইল[৯] বাঁশীর সৃজন কর ॥
এ বোল শুনিয়া ছাওয়াল কানাই না থাকিল রয়া[১০]।
সোনার নয় বুড়ি কড়ি নিল অঞ্চলে বাঁধিয়া ॥

৩। মিষ্ট রস, ৪। লজ্জা নিবারণ করি, ৫। প্রাতঃকালে, ৬। পর, ৭। সত্বরতাসহকারে, ৮। সম্মুখে, ৯। সঙ্গ, ১০। প্রতীক্ষা করিয়া।

স্বর্ণ মুট কাটারী নিল হস্তে করিয়া।
বৃন্দা বলিয়া কানাই শীঘ্র গেল ধাইয়া॥
এ আরায় ও আরায়[১] বাঁশ বেড়ায় তো দেখিয়া।
তবু তো বাঁশীর বাঁশ না পাইল খুঁজিয়া॥
তরাই ও তরুল বাঁশ ছেও দিয়া দিল।
গোড়াতে ছেওয়াল বাঁশের আগল টলিল॥
হরি হরি বলিয়া বাঁশ ভূমিত পড়িল॥
গোড়াখানি কাটিল বাঁশের গুরুয়া বলিয়া।
আগখানি কাটিল বাঁশের আগালী বলিয়া॥
মধ্যখানি নিল বাঁশের বাঁশীর মাফিক চাইয়া॥
কতকদূর হইতে কানাই কতকদূর যায়।
আর কতক দূর যায়া সে কামারের বাড়ী পায়॥
তোক বোল ভানু কামার রয়া তাম্বূল খাও।
রাধা নামে কানাইর বাঁশী আমাকে কেড়ে দেও॥
আকাশে পাতালে হাতিনার[২] দুই গোঁজ গাড়িল।
চামের দোয়াল[৩] দিয়া ভিড়িয়া বান্ধিল॥
বীর হনুমান মারলে টান গর্জিয়া উঠিল॥
আকর শালের[৪] মাঝে বাঁশী ফোঁড়া আরম্ভিল॥
প্রথমেতে ফোঁড়ান ফোঁড় যেন আকাশের চান।
চন্দ্র সূর্য লাগান বাঁশীতে মাণিক কাঞ্চন॥
তারপরে ফোঁড়ান ফোঁড় যেন স্বরগের তারা।
তারপরে ফোঁড়ান ফোঁড় বোলে রাধা রাধা॥
এক ফোঁড় দুই ফোঁড় তিন ফোঁড় দিও।
সাতখানি বাঁশীর ফোঁড় গণিয়া ফোঁড়াইও॥
বাঁশী ফোঁড়ে কামার ভাইয়া দিল কানাইর হাতে।
বাঁশী পাইয়া ছাওয়াল কানাই আনন্দিত চিতে॥

১। অরণ্যে অরণ্যে, ২। হাপরের, ৩। চর্ম নির্মিত রজ্জু বিশেষ, ৪। লৌহকারের কারখানা।

বাঁশী পাইয়া ছাওয়াল কানাইর আনন্দিত মন।
কদমতলায় ছাওয়াল কানাই করিল গমন॥
কদমতলায় যাইয়া নিল প্রথম যৌবন॥
নিরাকারে সখিগণ প্রভু যদুরায়।
কদমতলায় থাকিয়া কানাই আড বাঁশী বাজায়॥
কদমতলায় থাকি কানাই বাঁশীত দিল সান।
বুক ধরফর চন্দ্রাননীর আউলাল্ পরাণ॥
বুক ধরফর চন্দ্রাননীর ধরণ না যায় হিয়া।
কোন জাগায় নিলাজী[১] ডা.ক রাধা নাম লইয়া॥
যখন তখন বসি গুরুজনার কাছে।
নাম ধরিয়া ডাকে বাঁশী আমি মরি লাজে॥
একে তো বাঁশের বাঁশী বিন্দু গোটা গোটা।
হাতের টিপে মুখের স্বরে দিলে দারুণ খোঁটা॥
একে তো বাঁশের বাঁশী সাতখানি ফোঁড।
কেমনে জানিল বাঁশী রাধা নামটি মোর॥
বাহারে অভাগার বাঁশী কি বোল বলিস মোরে।
বারাও বারাও করে মন পরাণ বিদরে॥
বাঁশীব স্বরে শ্রীরাধিকার ঘরে না রয় হিয়া
কোন ছলে ছাওয়াল কানাইক দেখিব একবার গিয়া॥
কাঁচা না মান্দাবের খডি[২] টোকায় ঝাঁপ দিয়া।
ভরণ কলসীর জল ফেলিল ঢালিয়া॥
ধুমার ছলে চন্দ্রাননী বিরাল[৩] কান্দিয়া॥
জল আনিতে যায় রাধিকা ভাবে মনে মন।
সঙ্গের সঙ্গিনী নিল সখি চারিজন॥ —কোচবিহার

২

খুঁরিয়া[৪] বতুয়া[৫] শাকে ক্ষেত গেইছে ভরি।
রাধা যায় শাক্ তুলিতে নয়া ডালি ধরি॥

১। লজ্জাহীনা। ২। মন্দার গাছের জ্বালানী কাষ্ঠ। ইহা ভাল জ্বলে না কেবল ধূম হয়। ৩। বাহির হইল। ৪। নটেশাক। ৫। বাস্তুকশাক।

সরু কাপড়া প'রছে রাধা কেবল নয়া ধোপ।
নচপচা[1] শাক দেখিয়া রাধার হইল নোভ ॥
বাছের বাছ[2] তোলে রাধা ক্ষেতের ভিতর যা'য়া।
কোচা ভরিয়া তুলি শাক থোয় ডালি ভরিয়া ॥
দেওয়ানীয়া[3] ভালবাসে খুঁরিয়া শাকের ভাজা।
শাক তু'ল্‌তে তু'ল্‌তে মোক কইল্লে ভাজাভাজা ॥
নাজ নাই নজ্জা নাইক গাবুর[4] বউরী।
শাক তুলিতে এমন বউকে দেয় কেমন করি ॥
ঐ যে আসে নন্দের বেটা জুয়ান জাওয়ান কানু।
কেনে আইসে আইলে আইলে বুঝিরে না পালু ॥
কেমন করি চৌকে চায় গিলিয়া যেমন খায়।
জুযান বউরী দেখি এই ভিতি ধায ॥
চিটুল চাউনি তার মুখে মুচ্‌কি হাসি।
রাস্তায় ঘাটায় পাইলে আগে অঞ্চল ধরে আসি ॥
কোন দিকে যাই এখন এ বড বালাই।
যে দিকে পালাই এখন সেই দিকে কানাই ॥
বজ্জব আটুনি ফস্কা গিরো ঘরে মোর তালা।
যেটেসেটে[5] পটেয়া দেয় রাস্তায় পায় কালা ॥
কালার জ্বালায় মোর অঙ্গ হৈল কালী।
পালাইতে পারিলে বাঁচোঙ্‌ থাকুক পডি ডালি ॥
আলুর ক্ষেতে যায়া রাধা হৈল আলু থালু।
যে দিকেতে যায় রাধা সেদিকে যায় কানু ॥
রাধা কয় উহু উহু পায়েঁ লাগিল কাঁটা।
এমন ভাঙ্গা কপাল মোব কপালে মারোঁ ঝাঁটা ॥
পাঁও পাতিতে পারোঁ না মুই কেমন করি যাইম্‌।
নিশ্চয় ননদীর মুই ঝাঁটা খাইম্‌ ॥
খুডিয়া খুডিয়া আনু খুরিয়ায় বন হাতে।
আর তো পারো না মুই এত পন্থা যাইতে ॥

১। নধর, ২। সর্বোৎকৃষ্ট, ৩। বাড়ীর কর্তা, ৪। যুবতী, ৫। যেখানে সেখানে।

কে আছে এমন বন্ধু কাঁটা খুলিয়া দেয়।
জন্মের মত বিনা মূলে রাধাক কিনি নেয় ॥
বাঁশী থুইয়া হাঁসি হাঁসি রাধার কাছে আসি।
ক্ষেতের মাঝত বসি কানাই সুক্‌খে যায় ভাসি ॥
কোমল করে কোমল চরণ বুকে ধরে তুলি।
রাধার চরণ ধরিয়া কানাই সব যায় ভুলি ॥
কানাই বলে, ওগো মামী, তোমার পায়ের কাঁটা।
দাঁত দিয়া তুলিম মুই নন্দ রাজার বেটা ॥
কোন ভয় নাই, মামী, আমি আছি কাছে।
রাধা কয়, শীগ্‌গির তোল কেউবা দেখে পাছে ॥
রাধার রং কাচা সোনা নাল পায়ের তলা।
দেখিয়া দেখিয়া কানাই হয়া গেল ভালা ॥
কানু কয়, মামী, তোমার কাঁটা কই পাও।
যেমনকার তেমনি তোমার আছে, মামী, পাঁও ॥
কি কাঁটা ফুটিছে তোমার বুঝিতে নারি আমি।
হৃদের কাঁটা তুল্‌তে পারঙ্‌ যদি কও, মামী ॥
টুড়িয়া টুড়িয়া দেখনু খুরিয়ার কাঁটা নাই।
এমন চরণ পাইলাউ যদি হৃদে রাগ্‌তে চাই ॥
রাধা কয়, ওরে কানাই, একে কাঁটার জ্বালা।
পচ্ছিয়া বাতাসে আরো চৌকে পড়িল বালা ॥
পাঁও ঘাড়ে রাখিয়া কানু চৌকে দিল ফুক।
এ পালা হইল সারা রাধার কত সুখ ॥ —রঙ্গপুর

নিম্নোদ্ধৃত জাগ গানটিতে শ্রীকৃষ্ণের মাছ ধরিবার নামে জলক্রীড়ার একটি বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। শ্রীরাধিকা এই কাযে তাঁহাকে কি ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহারও উল্লেখ আছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের সঙ্গে এখানে কৃষ্ণচরিত্রের সম্পূর্ণ ঐক্য দেখা যায়।

৩

আষাঢ় মাসে ভর বরিষা উজাই নাগিল মাচ।
মাচ ধরিতে যায় রাধা কানাই নাগিল্‌ পাচ ॥

বড় দীঘির বড় ধোরে[1] বড দিচে নেটা।
নন্দের বেটার সঙ্গে রাধার সেইখানেতে নেটা॥
কানাই বলে মেঘে বর্ষে কেমন জলের ধার।
আকাশ হ'তে পরে যেমন রূপাব শতেক তার॥
দেওয়া চিল্‌কে মাটিত্‌ পডি ডাকে ঐ দেওয়া।
ধডাস্‌ করি চম্‌কি উঠে আমার কোমল হিয়া॥
তরাসে কাঁপিছে হিয়া হাতাশ খান্থু[2], মামী।
বুকে চাপি ধরো আমি তবে বাঁচি মামি॥
ফাঁক নাই ফুক নাই প'ডছে জলের ধাবা।
আকাশে পাতাল ঢাঁক্‌ছে মেঘে চাঁন সুরুজ তারা॥
খাল বিল দীঘি নদী সব একাকার।
তবে কেনে করেন, মামী, সম্বন্ধ বিচার॥
রাধা কয়, কিবা কইস, নন্দের ছাওয়াল।
মাছ মারিতে আসিয়া কেনে ঘটাইস জঞ্জাল॥
ধোরেব ধারে যায়া বাধা ভাবে সাত পাঁচ।
হাতের বাঁশী ভূমে থুইয়া কানাই মারে মাচ॥
রাধার মুখেব দিগে কানাই এক দৃষ্টে চায়।
ডাঙ্গার ডুঙ্গুর চক্ষু দুটী পলক নাহি তায়॥
হাসিয়া কইছে রাধা এ কেমন চাউনি।
এমন চাউনিতে সাপে ধবয়ে পক্ষিণী॥
চক্ষু দিয়া দংশ কেনে তুমি কালা সাপ।
মামীক দংশিয়া কেনে কর মহাপাপ॥
কাল সাপের বিষে আমার অঙ্গ জর জর।
কোন মতে দাঁডায় আছি অঙ্গে দিয়া ভর॥
যমুনাব জলে থাকে সেই কালীয়া সাপ।
দংশিয়া দংশিয়া মোকে বড দেয় তাপ॥
দেওয়ানিয়া সাপের রোজা চাবি দিকে ডাক।
দেখাইবে তায় যদি পায় কালা সাপের নাগ॥

১। পুষ্করিণীতে জলের প্রবেশ নির্গম পথ ২। এস্থলে পাইনু।

এ সাপ বিষম সাপ কদমের ডালে ঝুলে।
পাছে পাছে ফিরে সাপ যমুনার কুলে কুলে ॥
সারা রাত পড়িয়া থাকে ঘরের ছাইঞ্চায়।
বাহির হৈলে পাঁও বেড়িয়া মুখের চুমা খায় ॥
কানাই বলে, ভয় নাই আমি সাপের ওঝা।
কত মন্তর জ্ঞান জানি ঔষধ বোজা বোজা ॥
গাঙের জল পড়িয়া দেই কর তায় সিন্নান।
বিষ নামিবে কাদো ধুবে বাঁচিবে তোমার জান ॥
মাছ ধরিতে সব্ব অঙ্গে লাগিয়া গেইছে কাদা।
ঝক্ ঝক্ করুক অঙ্গ যেমন চক্‌চকিয়া চান্দা ॥
রাধা কয় মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিয়া।
কেমন তুমি সাপের ওঝা সাপের সাপুড়িয়া ॥
সাপুড়িয়া বাঁশীর স্বরে সাপ বাহির হয়া আসে।
তোমার বাঁশীর স্বরে সাপ জাগিয়া উঠিয়া বইসে।
তোমার বাঁশীর স্বরে সাপ কানের ছিদ্দির দিয়া।
বসত বাড়ী করলে সাপ হৃদের গড়ে গিয়া ॥
ঘুমায় না ঘুমায় না সাপ জাগিয়া থাকে সোজা।
তোমার বাঁশীর স্বরে সাপ খায় মোর কলিজা ॥
আর কিছু মাঙ্গিনা, কানু, আর কিছু মাঙ্গিনা[১]।
সাপ বাহির করিয়া ফেলাও, গুণের ভাগিনা ॥
ছাড়না ছাড়না কেনে ও মোর আঙ্গিনা।
তুমি না জাগাইলে আমি কখনো জাগিনা ॥
কানাই কয়, ওরে মামী, কেনে কথার কাটাকাটি
সিন্নান করিয়া উঠ যাই আপন বাটী।
এ উজান বয়সে, মামী, উজান বয়া যাই।
তোমার অঙ্গে অঙ্গ দিয়া একবার সাঁতার খাই ॥
ভরা যৌবন তোমার ভরা পুরা বান।
ইয়াত যাঁয়ে সাঁতার দেয় সেই তো ভাগ্যবান্ ॥

১। ভিক্ষা করি না।

গলা জলে নামিল রাধা করিতে সিনান।
আউলাইল মাথার কেশ যে ছিল বিনান ॥
লম্ফ দিয়া পড়ে কানাই অতল জলের মাঝে।
রাধাকে না হেরি কানুর মনে কেমন বাজে ॥
দূরে ডুবে আসে কানাই রাধার চরণ তলে।
রাধারে ধরিয়া কানাই ভাসিয়া গেল জলে ॥
মনের সুখে হাসি রাধা কয় হাত তুলে।
কেউকি আছেন দরদিয়া দরিয়ার কূলে ॥
ননদিরে শাশুড়ীকে কয় যেন বিচারি।
কুম্ভীরে লইল তোমার জোয়ান বউরী ॥
ঝাইল[১] ভরা গয়না আছে সেই গুলা দিয়া।
ধুমধামে করাক এখন দেওয়ানীয়ার বিয়া ॥
অকুল দরিয়ায় ভাসিল কলঙ্কিনী রাই।
এ পালা হইল সারা এখন বাড়ী চলি যাই ॥

নিম্নোদ্ধৃত জাগগানটিতে মাণিকপীরের জন্ম-বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। মঙ্গলকাব্যে নায়কের জন্ম-বৃত্তান্তের মধ্যে অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।—

৪

পীর সাহ মীরের ঘরে পীরের জনম।
উদরে থাকিয়া পীর ভাবিতে লাগিল ॥
একত মাসের কালে জানে বা জানে।
উদরে থাকিয়া পীর করে কোন কাম।
দুইত মাসের কালে লোকের কানে কানে ॥
বিষের নাড়ী ধরিয়া মায়ের মারে বিষম টান ॥
তিনত মাসের কালে যকৃতের দোলা।
বিষের নাড়ী ধরে মা'র বজ্রটান দিল।
চারত মাসের কালে হাডে হাড়ে জোড়া ॥
মলাম মলাম বলে মা জমিনে পড়িল।

১। বেত্রনির্ম্মিত পেটরা

পাঁচত মাসের কালে পঞ্চফুল কোটে।
দাই ডুলানী এসে তখন ঘেরাও করিল॥
ছয়ত মাসের কালে এটু পলটে॥
হাবা থুবা দিয়া মাকে জামেতে বগলে।
সাতত মাসের কালে সাতে শরীর নয়।
চালের বন্ধা কেটে দাই ঘরে প্রবেশ হইল॥
অষ্টম মাসের কালে মনপ্রাণ চিয়ায়॥
উদরে থাকিয়া পীর করে কোন কাম।
নবম মাসের কালে নবঘনাকৃতি।
ভূমিষ্ঠ হইয়া নিল আল্লাহজীর নাম॥
দশম মাসের কালে পিণ্ডের অনুভূতি॥
যখন মাণিক পীর ভূমিতে পড়িল।
দশমাস দশদিন পূর্ণ হয়ে আইল।
অঞ্চলের পঞ্চ মাণিক দাইকে দিল॥ —রাজসাহী

নিম্নোক্ত জাগগানটি সোনাপীরের জাগ বলিয়া পরিচিত। গোয়ালাজাতির মধ্যেই প্রধানতঃ সোনাপীরের মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়া থাকে। গোজাতির জন্মমৃত্যু তাঁহার ইচ্ছাধীন।

৫

চাটমহর সহর নিয়া সোনাপীরের বাড়ী।
আতোর খুতোর লাললাম তাহার আছা।
নব্বই হাজার ঘর যাহার দক্ষিণ দুয়ারী।
তার গর্ভে জন্ম নিল মাণিকপীর রাজা॥
আল রে আল রে পীর আল আরবার।
সোনাপীর উঠে বলে, মাণিক পীররে ভাই।
চাঁদুয়া টাঙ্গাইয়া পীর হইল দরিয়াপার॥
ক্ষুধায় আকুল তনু জুয়াল ঘরে যাই॥
দরিয়া পার হয়ে পীর চায় চতুর্দিক্।
জোয়ালগরে যেয়ে পীর ছাড়িল জিকির।
স্বর্গ হতে সোনার পালঙ্গ পল আচম্বিত॥

ডিঙ্গালয়ে কালুর মা হইল বাহির ॥
তারি উপর দোন ভাই করিল আশিন।
ভিক্ষুক ফকির নহি, মা গো, ভিক্ষা লয়ে যাব
খাট পালঙ্গ পেড়ে পীর মোরে না দিল ॥
সওয়া সের দুগ্ধ দিলে দোওয়া করে খাব ॥
কোথা পাব গাই গাভী বাতাসে নিয়াছে।
কোথা পাব দুগ্ধ কলা তোমায় দিব খেতে ॥
সুমতি ছিল গোয়ালিনীর কুমতি লাগিল।
ছিকার উপর দুগ্ধ থুযে পীবেরে ভাঁড়াল ॥
সোনাপীর উঠে বলে মাণিক পীর রে ভাই।
এসেছি গোয়াল ঘবে জাহির রেখে যাই ॥
আগাড়ি পাছ করে বাতাসে দিল বাড়ী।
নবলক্ষ ধেনু ম'ল বিশ লক্ষ বাছুরী ॥
বাতানে পড়িয়া ম'ল বাতানে ভাসুর।
দরবারে পড়ে মল দরবারে শ্বশুর ॥
কান্দেবে গোয়ালিনী নারী হস্তে করে দাও।
গোধেনুর বদলে কি না মরিল মাও ॥
কান্দেরে গোযালের নারী হস্তে কবে কাচি।
গোধেনুর বদলে না মবিল চাচী ॥
কান্দেবে গোযালের নাবী হাতে করে ঝারি।
গো ধেনুর বদলে ফেলাইলাম সাড়ি।
সোনা পীব উঠে বলে মাণিক পীর রে ভাই।
মেরেছি গরীবের ধন জিলাইয়া যাই ॥
আগাড়ি পাছ করি বাতাসে দিল বাড়ি।
নব লক্ষ ধেনু তারা পাড়ে দোড়াদোড়ী ॥
বাতানেতে চেতন পেল বাতানে ভাসুর।
দরবারেতে চেতন পেল দরবারে শ্বশুর ॥
আগে যদি জানতাম তুমি সোনা পীর।
আগে দিতাম দুগ্ধ কলা পাছে দিতাম ক্ষীর ॥

জিন্দা চার যুগের সার।
মারিয়া জিলাতে পার, অপার মহিমা তোমার। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত জাগগানটিতে সোনাপীরের বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যাইবে। বন্ত পশুর উপরও যে পীরদিগের অধিকার ছিল, ইহাতে তাহাও শুনিতে পাওয়া যায়—

দক্ষিণ দুয়ারী ঘর ঘন বাঁশের রুয়া।
বাহির করে দেও পিড়ি, পান বাটা ভরি গুয়া॥
বাটা ভরি কাটা গুয়া পাঁচ পীরে খায়।
পাঁচ পীরে যুক্তি করে অরণ্যেতে যায়।
অরণ্যের বাঘ ভাল্লুক দেখিয়া পলায়॥
পলাস না পলাস না রে তোরা।
দরজা ঘুরিয়া দাও নিদান খেলি মোরা॥
নিদান খেলিতে খেলিতে পীরের ,
জেগেজেগে দেও তোমরা সোনা পীরের বিয়া।
প্রথমে চলিল মাল্যানে ফুলের লাগিযা।
আনিল করবী ফুল সাজি ভরিয়া॥
সেও ফুলে হল না রে সোনা পীরের বিয়া।
তারপরে চলিল মাল্যানে ফুলের লাগিয়া॥
আনিল কেয়া ফুল সাজি ভরিয়া।
সেও ফুলে হল না রে সোনা পীরের বিয়া॥
চার তরফ চার কলার গাছ লইল গাড়িয়া।
পাঁচ বাড়ীর পাঁচ আইয়ো আনিল ডাকিয়া।
জেগেজুগে দাও তোমরা সোনা পীরের বিয়া॥

ধুয়া।

জিন্দা সৈয়দ বাঁকা মিঞা মাণিক পীর।
মারিয়া জিলাতে পার আজবে মহিমা তোমার॥

নিম্নোদ্ধৃত জাগগানটি সোনার হারের জাগ বলিয়া পরিচিত।

পেয়ালে জাগ সোনার হারের জাগ ॥
গিরি ভাই, গিরি ভাই, ছওর ছওর।
সোনার পীরের চেলা আ'ল বছর অন্তর ॥
সোনার হারের চেলা দেখে যে করিবে হেলা।
দুই পায় দুই গোদ বাড়াবি চক্ষে বাড়াবি ঢেলা ॥
ঢেলা নয় রে ঢুল্যা নয়রে গায় আইছে জ্বর।
এমন ত দেখি নাইরে সোনার হারের বর ॥
সোনার হার ভক্ত ঠাকুর মুখে চাপদাড়ী।
হেলিয়া দুলিয়া গেলেন গোয়ালনীর বাড়ী ॥
গোয়ালনী গোয়ালনী বইসে কর কি।
তোমার পুত্র মাব খাত্যাছে এই সভার মধ্যি ॥
সুবুদ্ধি গোয়ালের নারী কুবুদ্ধি লাগিল।
সিকার উপব দুগ্ধ থুযে পীবকে ভাঁড়াল ॥
ঘরে গোয়ালনীরে বাথানে মবে গাই।
সাতশ এ ধেনু মরে লেখা জোখা নাই ॥
আগে যদি জানতেম রে, তুমি সত্যপীর।
আগে দিতাম দই দুগ্ধ পাছে দিতাম ক্ষীর ॥
হই চই কবে পীর বাথানে দিল বাড়ি।
বাথানেতে পড্যা রইছে চোদ্দ বোঝা দড়ি ॥
হই চই করিয়া পীব বাথানে দিল ভুষ্যা।
সাতদিনকার মরা ধেনু দন্তে কাটে কুটা ॥
হই চই করিয়া পীর বাথানে দিল বাড়ি।
সাতদিনকার মরা ধেনু পারে নড়ানড়ি ॥
চলো চলো রাখাল ভাই রে আর এক বাড়ী যাই।
এ বাড়ীর মানুষ গরুর বাড়ুক পরমাই ॥

নিম্নোদ্ধৃত জাগগানটিতে পীরের মাহাত্ম্য কীর্তন শুনিতে পাওয়া যাইবে—

৮

ওখান হতে পীর বিদায় হ'ল পঞ্চমাণিক সঙ্গে নিল
আয় পীর চাল্যাজীর বাজারে।
শোন রে চাল্যাজী, ভাই, সোওয়া সের চাউল দেও খাই
দোওয়া করিব আল্লাহজীর ফকির ॥
শোন রে ফকির মোরে তৈয়ার চাল নাইক ঘরে
ভাড়ালি আল্লাজীর ফকিরে ॥
পীরের মনে ছিল হক্কা চালেতে মারিল তুক্কা
সব চাল শূন্যেতে উড়াল ॥
সুমতি ছিল চাল্যাজীর কুমতি লাগিল।
তৈয়ার চাল থাকতে ঘরে ফকিরে ভাঁড়াল ॥
কান্দেরে চাল্যাজীর নারী কার ধন করিলাম চুরি
কেন্দে পড়ে ঐ পীরেরই পায়।
কান্দন শুনিয়া জোরে ডাক দিয়ে বলে পীরে
মনের বাঞ্ছতা পূর্ণ করে খাই ॥

ওখান হতে নাবী বিদায় নিল পঞ্চ মাণিক সঙ্গে নিল
যায় গুড়িয়ার বাজারে।
শুন রে গুড়িয়া ভাই, সোওয়া সের দুধ দেও খাই
দোয়া করিব আল্লাজীর ফকির ॥
সুমতি ছিল গুড়িয়ার কুমতি লাগিল,
তৈয়ার গুড় থাকতে ঘরে ফকিরে ভাঁড়াল।
ফকির হইল হুক্কা গুড়েতে মারিল তুক্কা
সব গুড় শূন্যেতে উড়িল ॥
কান্দেরে গুড়িয়া নারী কার ধন করিলাম চুরি
কেন্দে পড়ে ঐ পীরের পায়।
কান্দন শুনিয়া দূরে ডাক দিয়া বলে পীরে
মনের বাঞ্ছতা পুর্ণ করে খাই ॥

ওখান হতে বিদায় নিল পঞ্চ মাণিক সঙ্গে নিল
যায় কুমারের বাজারে।
শুনরে কুমার, ভাই, একটি পাতিল দাও খাই,
দোওয়া করিব আল্লাজীর ফকির॥
স্থমতি ছিল কুমারের কুমতি ধরিল,
তৈয়ার পাতিল থাকতে ঘরে ফকিরে ভাঁড়াল।
ফকির হইল হুক্কা পাতিলে মারিল তুক্কা
সব পাতিল শূন্যেতে উড়িল॥
কান্দে রে কুমারের নারী কার ধন করিলাম চুরি
কেন্দে পড়ে ঐ পীরের পায়।
কান্দন শুনিয়া জোরে ডাক দিয়ে বলে পীরে
মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করে খাই॥
সা জিন্দা ফককুল্লা ও জিন্দা পীর,
মারিয়া জিলাতে পারে অপার মহিমা তোমার।
শুনতে খেরুয়া ভাই অন্য বাড়ী যাই।
এ বাড়ীর মানুষ গরুর বাড়ুক পরমাই॥ —পাবনা

৭

বাঘে সব নাম লইয়ে ডাকবে,
ও ঠাকুর সোনারায় বাঘ সব ডাকে।
বাড়ী বাড়ী বেড়ায় ঠাকুর হরিনাম দিয়া॥
হরির নাম দিয়া ঠাকুর চলিয়ে পহে যায়।
যত মোগলের ঘাঁটাত[১] নাগাইল পায়॥
যত মোগলের ফৌজ জিজ্ঞাসিল কতা।
মনের গৌরবে ঠাকুর দোগ দোগাল মাতা॥
কমরের পটিকা[২] খসেয়া[৩] ঠাকুরকে বাদিয়াঁ।
ধাকা'তে ধাকা'তে নইল আগোত[৪] করিয়া॥
ধাকা'তে ধাকা'তে নইল কোট সালের[৫] ঘরে।
বাইশ্ মন পাথর দিল তার বুকের উপরে॥

১। রাস্তায় ২। কমর পেটি ৩। খুলিয়া ৪। অগ্রে ৫। হাজত ঘর

ছোট মোগল উঠিয়া বলে, বড মোগল ভাই,
কালিকার বন্ধন, দাদা, চল দেখ্‌তে যাই।
তোনাজ্ঞিল মোগল জাতি করিল ছিনান[৬] ॥
মিটা জলে[৭] মোগল জাতি করিল ভোজন।
বন্ধন দেখিতে মোগল করিল গমন ॥
কতেক্ দূর ছাড়ি মোগল কতেক্ দূর যায়।
আর কতেক্ দূর গেলে কোট সালের নাগাইল পায় ॥
কোট সালের ঘরে যায়া মোগল ভুলকি[৮] মারিয়া চায়।
বাইশ মন ফেলাইবে তোমার নাই সোনারায় ॥
ছোট মোগল উঠিয়া বলে বড মোগল ভাই,
এ বন্ধন ভাল নয়, দাদা, চল বাডিক্ যাই।
বাডী যাইয়া বাঁধি আমরা সাতখানি ঘর।
যে ঘরে থাকিলে পরে বালোক নাই ডর ॥
চিনিবার না পারিল মোগল ছার জাতি,
তোর মোগল মারিয়া যায় নিশা ভাল রাতি।
অরণ্যের কিনারে যায়য়া ঠাকুর মারে হাঁক ॥
এক ঠেলায় চলিয়া আসলো বিশাল এক বাঘ।
বিশাশয়[৯] বাঘ আসিলো বিশাশয়[১০] উঠ ॥
হ্যাট মুখ হয়য়া আস্‌লো বনের ভল্লুক।
ধর ধর বাঘগণ, বাটার পান খাও ॥
এই ব্যাটা মোগলের সাতে বাদ সাদিয়া দেও।
এতেক হুডমুডি বাঘ উঠিল নিল পান ॥
গায়ের ঠেলায় ভাঙ্গিয়া ফেলায় ঘর সাত খান।
ঘর ভাঙ্গিয়া বাঘগুলা হইল কাতর।
লম্ফ দিয়া সোঁদাইল[১১] বাঘ বাডীর ভিতর ॥
মোগলের মাইয়া[১২] গেইচে অন্নশালের[১৩] ঘরে।
নাগাইল পায়া[১৪] মোচড়ায় ঘাড হুডমুড ক'রে ॥

৬। স্নান ৭। মিষ্টি জল ৮। উঁকি ৯। বিংশভ শত ১০। ত্রিংশৎশত ১১। প্রবেশ করিল ১২। স্ত্রীলোক ১৩। অন্নশালা ১৪। পাইয়া

মোগলের বেটী গেইচে[১৫] জল ভরিবার।
বাঘক দেখিয়া নদী সাঁতরিয়া যায় তার॥
মৎস্য বলিয়া তারে ঘড়িয়ালে[১৬] খায়।
আজি কেন বা ঠাকুর মোক্ এতেক তাপ দেয়॥
বাম হস্তে ধরিয়া মোগলক মারে এক পাক্।
মাটিত্ পড়িয়া মোগল করে বাপ্ বাপ্॥
আজি ধ্যানে বা ঠাকুর মোক দ্যায় এতেক্ তাপ্।
ধনের কিঙ্কর নোয়াঁও[১৭] মুই[১৮] মানের কিঙ্কর॥
চরণের ঘোড়া বেচিয়া সেবা করিম্ তোর!
সেইদিন সোনারায় ঠাকুর দিয়া গেল দেখা।
নরলোকে পূজো তাক্[১৯] পাইয়া পরিখা॥

বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের পর বাংলাদেশের বহু লৌকিক কাহিনীই শ্রীকৃষ্ণ ও চৈতন্যদেবের লীলা কাহিনীতে পরিবর্তিত হইয়া যায়। এখানে নিমাইর সন্ন্যাসের কাহিনী শুনা যাইতেছে, ইহাকে নিমাইর জাগ বলে—

৮

নিমাই দুখিনীর ধন,
দুঃখ পাসরার বেটা, রে নিমাই, ওরে নীলরতন॥ ধুয়া
এক মাসের কালে নিমাই ভাসে গঙ্গাজলে।
দুইও মাসের কালে নিমাই করে টলমল॥
তিনমাসের কালে নিমাই লোহু রক্তের গোলা।
চার মাসের কালে নিমাই হাড়ে মাংসে জোড়া॥
পঞ্চম মাসের কালে মিনাই পঞ্চফুল ফোটে।
ছয় মাসের কালে নিমাই মাথার চুল উঠে॥
সাত মাসের কালে নিমাই সাত সুরে গায়।
অষ্টমাসের কালে নিমাই শুয়্যা নিদ্রা যায়॥
নয় মাসের কালে নিমাই নবডঙ্কা মারিল।
দশ মাসের কালে নিমাই ভূমিস্থ পড়িল॥

১৫। গিয়াছে ১৬। জলজন্তু বিশেষ ১৭। নহি ১৮। আমাকে ১৯। কাহাকে।

দশ মাস দশ দিন নিমাইর পূর্ণতা হইল।
নিমাইচাঁদ ভূমিস্থ পড়ে মা বোল বলিল॥
এক মাস যায় মায়ের ঘুতি আর মুতি।
আর এক মাস যায় মায়ের মাঘ মাস্যা শীতি॥
কোথা হতে এল যোগী কেশবভারতী।
কিবা মন্ত্র কর্ণে দিয়া নিমাইরে বান্ধাল সন্ন্যাসী॥
দেখ দেখ নঘুর্‌য্যার লোক দেখ রে চাহিয়া।
নিমাইচাঁদ সন্ন্যাসী চল্‌লো জননী ছাড়িয়া॥
সন্ন্যাসী না হয়, রে নিমাই, বৈরাগী না হয়।
ঘরে বসে কৃষ্ণনামটী মাকে শোনায়॥

এগার

আলকাপ

মালদহ এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রধানতঃ মুসলমান সমাজের মধ্যে বর্ত্তমানে একশ্রেণীর লোক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে, তাহা আলকাপ গান বলিয়া পরিচিত। ইহার দুইটি অংশ—একটি গান, অপরটি ছড়া। গান অংশে রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ ইহার নিজস্ব মর্যাদা রক্ষা করিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু ছড়া অংশে তাহা লৌকিক স্তরে অবনমিত হইয়া বিকৃত রুচির পরিচয় দেয়। ছড়ার মধ্য দিয়া সমসাময়িক অনেক ঘটনারই বর্ণনা হইয়া থাকে, তখন রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গের তাহার আর কোন সম্পর্ক থাকে না। নিম্নে প্রথমতঃ আলকাপ গানের কতকগুলি নিদর্শন উদ্ধৃত করা গেল, এই গানগুলির সঙ্গে রাঢ় অঞ্চল হইতে সংগৃহীত ঝুমুর গানের তুলনা করা যাইতে পারে। প্রেমই মুখ্যত গানগুলির বিষয়—

১

বনে কানুর বাঁশি বাজিল রে।
সুর ও সোহাগে মন মাতিল রে।
পুলকে পুলকে উথলিয়া প্রেমে গদগদ হ'ল হিয়া,
মরমে শরমে আকুল প্রাণে,
আমার মনে ঘন ঘন বাজিল রে। —মুর্শিদাবাদ

২

সখিরে, কালার ভালবাসা আমার সবই নিয়েছে।
যতই দূরে যাইরে, বন্ধু, আমার জোড়া আঁখি,
ঐ কালাচাঁদের মোহনরূপ নয়নে নিরখি,
যেন এমন সুন্দর হাসিরাশি ঢালি দিছে কালোশশী,
আমার মরমে মরমে পশি আকুল করেছে। —ঐ

৩

আমি কার তরে সাজালাম রে, কুঞ্জ ফুল সাজ দিয়া।
সুখের নিশি প্রভাত হ'ল, আমার এল না কালিয়া রে।

ধৈরজ ধরিতে নারি, বল সখি কিবা করি,
প্রেম আগুনে জলে মরি, আমার শ্যামের লাগিয়া রে —ঐ

৪

পীরিতের কি রীতি রে, মন দিয়ে মন পেলাম নাক তার ॥
গোপনেতে প্রেম করেছি জানে না তা কেউ,
প্রতিদানে পেলাম শুধু বিরহেরই ঢেউ,
সাধের আশায় বাধ সাধিল রে সরল প্রাণে আমার।
মন জড়িত যৌবন বনে গুঞ্জরিবে অলি,
মন মাতান স্বরে আমি করব সদা ঢুলি ,
নিঠুরতা করে সে কুজন এল নাক আর ॥ —ঐ

৫

ঘন ঘন বনতরুশাখে কুহু কুহু রবে কোকিল ডাকে,
বসন্ত মলয় বয় যৌবনে লাজ পায়,
বন্ধু নাই মন সাধ মিটাতে।
পুঞ্জে পুঞ্জে গুঞ্জে অলি কুল রে, হায়রে মধু পান করে ফুল দলেরে,
বিরহিণী সে সাধে মরে শুধু বিষাদে, শুধু যে সাড়া দেয় বাঁশীতে। —ঐ

৬

কত দেখলাম সেধে সেধে
হলাম না তার মনেব মতন রে।
এ দুঃখ দিল পদে পদে ॥
তোর জন্যেতে পাগল পারা বেড়ায় বনে বনে,
তুমি যা বলেছ তাও শুনেছি, তবু ঝোলা দিলে স্কন্ধে।
তোর মানের দায়ে যোগী সেজে রে, ভিক্ষা মাগি সদনে ;
আমি নাপিতের বেশ ধরেছি রে
তব আলতা দিলাম পদে ॥ —ঐ

৭

আজ আসিব বলে কেন, সখি, এল না কালা,
কার তরে বল, সখি, নিশি জাগরণ,
কার লাগি গাঁথিব মালা, কেন, সখি, এল না কালা।

মোরা আশায় আশায় বসে কুঞ্জবনে আসিবে শ্যাম কালিয়া,
অতি যতন করিয়ে তুলিয়েছি ফুল সাজায়ে রেখেছি ডালা
কেন সখি এল না কালা।
আগে জানিতাম যদি সেই নিঠুর হরি, দিতাম না প্রাণ তাহারে,
একি বিরহের জ্বালা সইতে নারি বাড়িল দ্বিগুণ জ্বালা ,
কেন সখি এলনা কালা। —ঐ

৮

প্রাণ বন্ধুরে, তোমার আশায় জীবন করলাম ক্ষয়।
যে দেশেতে ঘুরি ফিরি পাড়ার লোকে করে দোষী।
আমায় সকল মন্দ কয়, তোমার আশায় জীবন করলাম ক্ষয়॥
তোমায় যবে মনে প'লে ঘরের জলকে বাইরে ফেলে,
আমি যমুনাতে যাই, তোমাব আশায় জীবন করলাম ক্ষয়॥ —ঐ

৯

স্বপনে ছিল গো, স্বপনে ছিল গো,
তোমাকে দিয়া যাব আমার পবাণ।
আমি যখন জলকে আসি একবার উঠি একবার বসি,
বাঁশীতে দিয়ে টান তোমারে দিয়ে যাব আমার পরাণ॥
কালা যখন বাজায় বাঁশী, ঘরে হইতে বাইরে আসি,
নয়নে দিয়ে টান তোমায় দিয়া যাব আমাব পরাণ। —ঐ

১০

প্রাণের দেবতা গো তুমি আসিলে রজনী প্রভাতে॥
বনমালা গলে নেপুর চরণে তাই,
বনের কোকিলা মাতে আসিলে রজনী প্রভাতে।
প্রাণেরই দেবতা তুমি, রূপেরই প্রতিমা।
মেঘের বিজলী সম দিলে মোরে দেখা,
মুখে মধুব হাসি, সেও তো কালো শশী।
মোহন বাঁশরী হাতে আসিলে রজনী প্রভাতে।
পাগল করেছ আমায় শির শির মস্তরে।
পরনে তো পীতধড়া দেখা দিলে মোরে।

মাথায় ময়ুর পাখা সেও তো কালো সখা।
মোহন বাঁশরী হাতে আসিলে রজনী প্রভাতে। —ঐ

১১

আমায় পাড়ার লোকে বলে কলঙ্কিনী প্রাণ-বন্ধুরে।
বড আশা ছিল মনে প্রেম করিব তোমার সনে,
কতই আলাপনে প্রাণ-বন্ধুরে ॥
পাড়াতে আছে যাবা সঙ্গে ল'য়ে খায় না তারা।
যত জন যত কয় এ জ্বালা কি সহা যায়।
আমায় বন্দী কবে রাখলে আগুন প্রাণে। —ঐ

১২

আমারে না পড়ে তোমার মনে, হে বন্ধু,
দূর বিদেশে গিয়া ॥
আমি আয়নাতে না দেখতে পেলাম তোমাব সোনার মুখ।
হাল্‌কা বাতাসে যেন মনে পড়ে দুখ।
বুঝালে না বুঝে পরাণ, বুঝাই তাবে কি দিয়া,
নিশীথে জাগিয়া ॥
বন্ধু থাকে দূব বিদেশে, আমি থাকি পাগল ভ্যাসে,
বুঝালে না বুঝে পরাণ, বুঝাই তাবে কি দিয়া,
নিশীথে জাগিয়া ॥ —ঐ

১৩

এই বাঁশীতে ডাকে কে শুনেছি সে আজ
মোর পরাণ কাড়িতে চায়।
সে রাখাল রাজ মোর, পরাণ কাড়িতে চায় ॥
তারা কাছে যেতে যদি কাঁটা ভুঁকে পায়।
শাশুড়ী ননদী মুখে কালি দিতে চায়।
তবে নিকটে যাব না মানি সমাজ মোর,
পরাণ কাড়িতে চায় সে রাখাল-রাজ।
যাক কুল যাক মান ক্ষতি নাহি তায়,
এ পুড়া পরাণ আমি সঁপিব তার পায়।

মিটাইতে সাধ মিছে না মানি কো লাজ,
মোর পরাণ কাড়িতে চায় সে রাখাল-রাজ। —মুর্শিদাবাদ

১৪

আমি বন্ধুর লাগিয়া হইলাম আকুল, বন্ধু মেলা বড় দাই-গো,
ভূধর, কন্দর, সরিত, সাগর খুঁজিয়া নাহিক পাই গো,
আমি বন্ধুর লাগিয়া……।
দুর্গম অটবী মাঝে বন্ধু নাই মন বলে,
গগন-বলাকা চাঁচর কেশ বন্ধুর ঝলে,
হায় গো বন্ধু কোথায় আছে ,
জলে নাই বন্ধু, স্থলে নাই বন্ধু, আছে বুঝি ঘরে,
পবন নন্দন করিয়া ভ্রমণ বন্ধুরে না পেলে শেষে।
বলি রাজা দানে বাউনে ব্রাহ্মণে, পাতালে যাইল শেষে,
বলি হায় গো তবে কোথায় পাব ?
আমি কোথা গেলে বন্ধু পাব, হায় গো, তবে কোথা পাব !
করিয়া প্রণয় বিপদ বাড়ে, কি ভাবে তুষ্ট জানিব কি করে,
কি করে জানাব কি ভাবে সন্তুষ্ট বন্ধু, কি করে জানিব।
মনের ভিতরে হৃদয় মাঝারে বন্ধু আছে বুঝি হায় গো।
আমি বন্ধুর লাগিয়া হইলাম আকুল, বন্ধু মেলা বড় দাই গো ॥ —ঐ

আলকাপ গানের যে অংশটি বর্তমানে লৌকিক ছড়ার রূপ লাভ করিয়াছে, তাহা মূলতঃ যে গুরুবিষয়ক আখ্যান-গীতি বা পাঁচালী ছিল, তাহা নিম্নোদ্ধৃত আলকাপের ছড়াটি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। রাধাকৃষ্ণ কিংবা রামসীতা বিষয়ক আখ্যায়িকা-গীতিগুলি অনুসরণ করিয়াই পরবর্তী কালে তর্জার আকারে লৌকিক ছড়াগুলি রচিত হইয়াছে। বর্তমানে আলকাপ গান প্রায় লুপ্ত হইয়া ছড়াই প্রচার লাভ করিতেছে—

আলকাপ ছড়া

১

তোমার কীর্তি দেখে কিস্তিমাৎ ওহে জগন্নাথ,
কাউরে কর চিরসুখী, কাউরে দাও দুঃখ অকস্মাৎ ॥
…ওহে জগন্নাথ ॥

ভয়ে তোমায় ভক্তি করি, ওহে ঘনশ্যাম।
অন্তরে যে ভক্তি নাই জানাই তার প্রমাণ॥
কলি হ'তে সুরু করে সত্যযুগে যাব।
তোমার যে কর্ম, প্রভু, দু-চারটা জানাব॥
কলিযুগে মর্তে এসে নিমাই সাজিলে।
বার বছর বিষ্ণুপ্রিয়া তারে ফেলে গেলে॥
ঘুমের ঘোরে ফেলে গেলে উদ্দেশ্য সাধনে,
দুঃখ দিতে যুবতীবে এনেছিলে কেনে?
শ্রীরাধারে নিয়ে তুমি গোলোকে আছিলে,
স্বার্থ লাগি আয়ানেরে শ্রীরাধায় সঁপিলে॥
তার পরেতে মর্তে এলে যখন বৃন্দাবনে,
কলঙ্কিনী নামটী রাধার হতে দিলে কেনে?
ষোল সহস্রেক রমণী প্রভু তোমার ছিল,
একে একে দানবেতে কি জন্য হরিল?
ধর্মরাজ ভক্ত তোমার ছিল মহাশয়,
ভার্যা তার যাজ্ঞসেনীর কী দুর্গতি হয়?
যে রমণী প্রভু তোমায ডাকতো পলে পলে,
দুঃশাসন কেশ ধরে আনল সভাস্থলে।
জয়দ্রথ দিয়ে তারে করালে হরণ।
বার বছর তুমি তারে পাঠাইলে বন॥
সৌরিন্ধ্রী নাম দিলে বিরাট রাজার ঘরে,
পদাঘাত কিচক আবার কবিলু তাহারে।
রাম রূপী হলে যখন দ্বারকা নগরে,
জানকী সাজিতে বল সত্যভামার তরে॥
সত্যভামা ভক্ত তোমার ভাল আমি জানি,
সভা মধ্যে লজ্জা তারে কেন দিলে তুমি?
রুক্মিণীরে স্বার্থ লাগি দিলে সিংহাসন,
পুষ্পাঞ্জলি পদে দিল পবন নন্দন॥

সুধাৱনা ভক্ত তোমার জানে চরাচরে ;
অর্জুনের হাতে বধ করা'লে তাহারে।
একে একে জানাব কত, ওহে প্রাণ-নাথ ?
তোমার কীর্তি দেখে কিস্তিমাৎ, ওহে জগন্নাথ
ত্রেতা যুগে রামনামে অযোধ্যানগরে,—
আযবংশে জন্ম নিলে দশরথেব ঘরে।
ধনুক ভঙ্গ পণে জীনে জনক নন্দিনী,
অজানা কি ছিল, প্রভু, তুমি অন্তর্যামী ?
কৈকেয়ীর বরে গেলে বার বছর বনে,
ভার্যাসহ সঙ্গে নিল অনুজ লক্ষ্মণে।
রাবণের ভগিনী ছিল সূর্পনখা নামে,
পঞ্চবটী বনে এলে যে কোন কারণে,
বিনা দোষে নাক তার কাটিল লক্ষ্মণ,
নিজেদের দোষ কেন কর না স্মরণ ?
রাবণ হরিল সীতা জাগে তব মনে,
আজ তক ভাবে তাই যত বুধজনে॥
হিংসাপূর্ণ হৃদি তব, ওহে বনমালী।
চণ্ডালেব সঙ্গে তাই করিলে মিতালী।
বিনা দোষে বলিরাজে বধ কি কারণে ?
তারা দেবীর ঝবিতেছে অশ্রু দু-নয়নে॥
রাবণ রাজে কেন এত শক্তি দিয়েছিলে ?
দেবেন্দ্র গাঁথিত হার, যম অশ্বশালে॥
অভয়া মা চিরদিন দিতেন অভয়।
ব্রহ্মা যার কালে কালে আছিল সহায়॥
এত বড রাজে করেন স্ববংশে নিধন।
একে একে বল, প্রভু, কি এর কারণ॥
সীতা উদ্ধারিয়া ফের অগ্নি-পরীক্ষাতে,
ভার্যাসহ এলে তুমি আপন দেশেতে॥

পুনঃ দয়া উপজিল অযোধ্যা ভবনে,
আবার, পঞ্চমাস গর্ভ সীতা পাঠাইল বনে।
তব লাগি সূর্যতপ কর্‌লে যে যুবতী,
পুনঃ এনে শেষে তার ঘটালে দুর্গতি॥
বসুন্ধরা দ্বিধা হল জানকী রোদন।
ধরিত্রী মাতা তাই তারে কোলে দিল স্থান॥
তোমার যত ধর্ম, সব অধর্ম কারে না লাও সাত।
তোমার কীর্তি দেখে কিস্তিমাৎ, ও হে জগন্নাথ॥
সত্যযুগে এ পৃথিবী জলময় ছিল,
জীবজন্তু আদি কিছু তা'তে না জন্মিল॥
বটপত্রে বিষ্ণুরূপে ভেসেছিলে তুমি,
ঐ বটবৃক্ষ কোথা ছিল, বল জগৎস্বামী
কতগুলি প্রশাখা আর কত পত্র ছিল।
শুনিতে বাসনা মম আমায় খুলে বল॥
তখন, ছিল কিনা শশী রবি, হত কিনা দিন আর রাত?
তোমার কীর্তি দেখে কিস্তিমাৎ, ওহে জগন্নাথ। —মুর্শিদাবাদ

আলকাপ গানের লৌকিক ছড়ার আর একটি নিদর্শন এই প্রকার:

২

ধন্য তুমি কলির ছেলে—জানাই গো প্রণাম।
জানাই গো প্রণাম সভাতে কৃরি গো সেলাম॥
দাদা! গরীব ভাইদের দুঃখ দেখে বাঁচেনা পরাণ,
ইহার চেয়েও দুঃখ পায় শিক্ষিত যে জন গো।
চাকরী কর্‌বে বলে ছেলে, পিতা তাদের দেয় স্কুলে।
ছেলেরা চাকরী করব বলে, তারা ডিগরী ধরে নিলে গো।
সরকার একটা চাকরী দিল,
মনে ভাবে ভাগ্য ভাল।
উপরে 'ব্যাকিং' যাদের ছিল,
তারা চাকরী কেড়ে নিল গো।
তখন মনের দুঃখেতে, তারা বেড়ায় কেঁদে কেদে॥

দাদা! অজন্মা হইল দেশে 'টেষ্ট-রিলিফ' আসিল,
ম্যাট্রিকেরা ভাগ্য বলে মহুরা হইল গো।
খাটছে লোক হাজার হাজার,
দেখতে লাগে কি চমৎকার।
মজুর একশো মাটি কেটে
একটা টাকা লবে খেটে গো।
কাগজ কলম নিয়ে মহুরা,
জরিপ করতে যান বাবুরা।
বেটারা দশ মাটি কমায়,
তাঁরা মজুরকে কাঁদায় গো।
'শ্লিপ' করতে গিয়ে মহুরা,
আট-দশজন বাড়ায় তাঁরা।
মজুরকে বলে দুটো নিও,
বাঁকি ছ'টা আমায় দিও গো।
টাকা পয়সা নিয়ে তারা,
বাড়ী চলে যায় মজুররা।
মজুরকে শুধাইলে পরে,
তারা চোখ উল্‌টিয়ে মারে গো।
মহুরা মনের দুঃখেতে—তখন চাকরী দিল ছেড়ে॥
দাদা! কলি যুগের আসল কথা মনে পড়ে গেল।
টাউন ছেড়ে পাড়া গাঁয়ে 'সিনেমা' আসিল গো॥
সখি সখাকে ডেকে কয়,
'সিনেমা' আজ দেখা চায়।
তখন সখা রাজি হলো,
তারা সিনেমায় চলিল গো।
সখ্ জিনিষটা এমনি রে ভাই,
চাষা-ভদ্দর না চেনা যায়।
কারণ 'ড্রাইক্লিনিং' ছিল,
তারা জামা কেচে নিলো গো।

পল্লী গাঁয়ে 'সেলুন' এলো,
চাষীরা সব চুল কাটিল।
তাতে বাবুদের খুব ক্ষতি হলো,
বাবুদের সম্মান চলে গেল গো।
উস্তাদ সিরাজ বলে, বাবুর দলের করো না দুর্নাম ॥
ধন্য তুমি কলির ছেলে জানাইগো প্রণাম ॥ —ঐ

অনেক সময় রাধাকৃষ্ণলীলা অবলম্বন করিয়াও ছড়া রচিত হয়—

৩

রাধা-উক্তি—

আমি ভরা যমুনাতে, পার হব কি মতে,
বসে বসে তাহা ভাবি ॥
মাঝি হে—ওহে মাঝি—
তোমা বিনে, ভাই, পার করবার কেউ নাই,
অস্ত যাচ্ছে সন্ধ্যা রবি ॥

কৃষ্ণ-উক্তি—

চড়, কন্যা, নৌকা পরে, হাল ধরিব শক্ত করে,
ভয় করোনা রাজার কুমারী—
চার বৈঠা বাইয়া জোরে, পৌছে দিব ঐ পারে,
বল বল, কন্যা, কি নাম তোমার হে।

রাধা-উক্তি—

নামটি আমার রাধারাণী, সখা আমার ছিল জ্ঞানী,
হারাইলাম বিজন বিপিনে—
মাথাতে তাঁর চূড়া ছিল, সখা আমার কোথায় গেল,
যাব আমি সেইখানে হে।

কৃষ্ণ-উক্তি—

শোন বলি রাজনন্দিনী, তুমি আমার ধ্যানের ধনী
হারাইলাম বনের মাঝারে—
দেখা তোমায় পাব বলে, চলে এলাম নদীর কুলে,
বসে আছি মাঝি রূপ ধরে হে।

রাধা-উক্তি—

প্রিয় তুমি কি কারণে, ফেলে আস্‌লে বিজন বনে,
সত্য করে বল তাই আমারে—
ষোল শো গোপিনীর কথা, মনে পড়ে ছিল সেথা,
তাইতে বুঝি ফেলে এসেছিলে হে।

কৃষ্ণ-উক্তি—

শোন বলি, রাজনন্দিনী, তুমি আমার প্রেমের খনি
রাধা নামটি সকলের উপরে—
তাইতে তোমায় মাথায় করে, বেড়ায় কলি-দ্বাপরে
বসে আছি নদীর কিনারে হে।
সিরাজদ্দৌলা বলে, যুবতীর দলে
তোরা কৃষ্ণভক্ত হবি ॥
আমি ভরা যমুনাতে, পার হব কি মতে,
বসে বসে তাহা ভাবি ॥ —মুর্শিদাবাদ

আলকাপ গান ক্রম অবনতির পথে অগ্রসর হইয়া প্রথমতঃ ছড়া ও তারপর রং পাঁচালীতে পরিণত হইয়াছে। রং পাঁচালী নিতান্ত লৌকিক সুরের লঘু রচনা, ছড়ার ধর্মই ইহাতে প্রাধান্য লাভ করে, বস্তুর দিক দিয়া ইহাতে ধর্ম কিংবা সুগভীর প্রেমের কোন বিষয় থাকে না, সমসাময়িক কোন কৌতুককর ঘটনা ইহার উপজীব্য হয়। সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করাই ইহার উদ্দেশ্য, সুতরাং ইহাদের মধ্য হইতে কোন কাব্যগুণ আশা করা যায় না। রং তামাসাই ইহার লক্ষ্য। একটি গান প্রথম খণ্ডে (পৃঃ ২৭৭, ৩য় সং) উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এখানে উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক বলিয়া মনে করি।

বার

ছেঁচর গান

মুর্শিদাবাদ জিলার পল্লী অঞ্চলে ছেঁচর গান নামে এক শ্রেণীর লোক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে। কি ভাবে যে এই নামটির উদ্ভব হইল, তাহা জানা যায় না, তবে ছেঁচর গান লঘু-বিষয়ক কোন লোক-সঙ্গীত নহে, বরং ইহার ভিতর দিয়া সুগভীর ভাবের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। রাধাকৃষ্ণের বিষয়ই ইহারও অবলম্বন। পুর্বে যে আলকাপ গানের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, বিষয় ও ভাবের দিক হইতে তাহার সঙ্গে ইহার ঐক্য আছে। নিম্নে কয়েকটি নিদর্শন উদ্ধৃত করা গেল—

আমায় কে ডাকলো গো, বিজন বনের ধারে গো,
বাঁশীর সুরে ও নাম ধরিয়া, বঁধু আসার আশে রহিলাম,
বসে পথ পানে শুধু চাহিয়া।
প্রেম করিয়ে এত জ্বালা, কালার সনে ও প্রেম করিয়া।—মুর্শিদাবাদ

২

যৌবন জ্বালা বড জ্বালা, বঁধু, তুমি জান না।
তুমি যদি জান্‌তে, বঁধু, ছেড়ে যেতে না।
আমার এই প্রেমনদী, স্রোত বহে তার পাইনা ঠিকানা। —ঐ

৩

অসময়ে রংয়ের ছিটা বঁধু গায়ে দিও না।
আমি জেগে থাকি সারা নিশি কৈতো বন্ধু এল না।
আমি কুঞ্জের দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকি কৈ তো তল্লাস নিলে না। —ঐ

৪

বিরহে প্রাণ বাঁচে না, প্রাণবন্ধু কুঞ্জে এল না।
আমি জেগে থাকি সারা নিশি গো পাতিয়ে ফুলের বিছানা।
আমি খুঁজে বেড়াই বনে বনে গো—
শ্যামের দেখা পেলাম না।

৫

বন্ধু, তোমার লাগিয়া রে, এ নব যৌবন আমার
গিয়াছে চলিয়া বন্ধু রে।
তুমি চলে গেলে দূর দেশে, সময়ে এলে না কেন রে—
এ নব যৌবন আমার গিয়াছে চলিয়া বন্ধুরে।
এবার যদি আস, বন্ধু, তুমি আর পাবে না মধুরে—
এ নব যৌবন আমার গিয়াছে চলিয়া, বন্ধুরে।

৬

আমি কেন বা পিরিতি করিলাম।
আগে যদি জানতাম, বন্ধু, প্রেমের এত জ্বালা।
কদম তলায় ঘর করিতাম, থাকিতাম একলা রে—
আগে যদি জানতাম, বন্ধু, প্রেমের এত জ্বালা।
লহার প্রেমে সারে দিয়া রাখিতাম ভরিয়া রে।

৭

বন্ধু জানিয়ে জান না, বল্লে শোন না,
জ্বালিয়ে গেলে মনের আগুন নিভিয়ে গেলে না।
ও যার কাঁচি কাটা চুল, চিকন কালো ছোকড়া,
বন্ধু, খেল কদমের ফুল।
বন্ধু নয়নের কাজল তিলক দণ্ড না দেখিলে
মন হয় রে পাগল॥

৮

কালবরণ ছোকড়া বন্ধু বড় ভালবাসিরে।
খাবার সময় মনে পড়লে গামছায় বেঁধে রাখি রে॥
শুবার সময় মনে পড়লে বিছানায় বসে কাঁদি রে॥

৯

ওগো তুমি আমার ভালবাসা দোই বালুর চরে।
তুমি আমি বাঁধিনু বাসা।
তুমি বিদেশে গেলে, আমি ভাসি অশ্রুজলে—
আমারই হৃদয়ে জাগে কি ব্যথা॥

১০

তোরা, কে কে যাবি আয়লো যমুনাতে যায় লো,
আজকে যমুনাব জল বড ঠাণ্ডা।
যমুনার ওই কালো জলে কৃষ্ণনামে জোয়ার খেলে রে—
শুনে বাঁশির তাল লো, মন করে চঞ্চল লো—
যমুনার জল বড ঠাণ্ডা ॥

১১

কিনারে কিনারে নদীব কিনাবে,
ওগো আসিব বলে আশা দিয়ে এলো নাকে ফিরে।
তুমি যে মোব ভালবাসা, তোমায় আমি কবি আশা,
যেন ভুল না আমাবে।

১২

কতটুকু লেখা যায চিঠিতে, কতটুকু লেখা যায় চিঠিতে।
(দিযে গেছ হায়) ভুলে গেছ তুমি—
ঘুম, ঘুম, ঘুম নাই আঁখি দুটি পাতাতে—
কতটুকু লেখা যায চিঠিতে।
ফুলেরই মধুসাজে, ভ্রমর নেই নিকটে,
জল নেই ঢেউ নেই দীঘিতে—
কতটুকু লেখা যায চিঠিতে।

১৩

ওই যাদু ভরা কাল চোখে, কি মায়া দোলে আমি জানি না,
জানি না জানি না।
ওই স্বপনেরই ইশারায়, প্রাণটি দোলে, আমি জানি গো,
খুশি আমি হ'তে পারি কাছে গো,
আরও খুশি হ'তে পারি মনটি পেলে গো।
তাই দুর হতে এলে কি চলে গেলে, আমি জানি না, জানি না, জানি না।
ওই যাদু ভরা কালো চোখে কি মায়া দোলে, আমি জানি না।

১৪

আমার আকুল প্রাণের রে গোপন প্রাণের কথা রে।
কথা কইতে গেলে, ঝরে দু'টি আঁখি, ঝরে দু'টি আঁখি,
শয়নে স্বপনেরই কথা রে, কথাটা হৃদয়েতে রাখি।
ঝরে দুটি আঁখি।
তুমি এই করলে ভাল, বন্ধু, এই করলে আমার ভাল
পীরিত করে চ'লে গেলে, আর না ফিরে এলে—
আঁচল দিয়ে ঢাকি, ঝরে দুইটি আঁখি।

১৫

ও আমার প্রাণের বন্ধু ঘরে নাই,
হায় রে হায়—
সোনার যৌবন বিফলে চলিয়া যায়।
আমার জীবনের জঞ্জাট আঁচল দিয়ে
সোনার যৌবন ঢেকে রাখব কতকাল।
আমি চুণ পুড়াইয়া করব কালি হে—
আমার কুলের মুখে দিয়ে ছায়।

ছেঁচর গানও নৈরাশ্য এবং বিচ্ছেদের গান, ক্রমে রাধাকৃষ্ণের নাম ইহার সঙ্গে আসিয়া যুক্ত হইলেও পূর্বে ইহা যে লৌকিক প্রেম-সঙ্গীতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের প্রেম-সঙ্গীতের সঙ্গে ইহার নানা বিষয়েই ঐক্য আছে। অন্যান্য প্রেম-সঙ্গীতের মতই ইহার মধ্যে রুচির ও নীতির দিয়া শালীনতা রক্ষা পাইয়াছে।

মুর্শিদাবাদ জিলার আঞ্চলিক সঙ্গীতে একদিকে উত্তর বাংলার এবং আর একদিকে পশ্চিম বাংলার আঞ্চলিক সঙ্গীতের প্রভাব অনুভব করা যায়, সেইজন্য ইহার মধ্যে একটি বিশিষ্ট রূপ প্রকাশ পায় নাই।

তের

ভাটিয়ালি

পূর্ববঙ্গ অঞ্চল লইয়া বাংলা লোক-সঙ্গীতের আর একটি আঞ্চলিক বিভাগ গঠিত হইয়াছে। মৈমনসিংহ, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, ঢাকা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলের প্রধান লোক-সঙ্গীত ভাটিয়ালি নামে পরিচিত। প্রকৃত পক্ষে ভাটিয়ালি বিশেষ কোন এক শ্রেণীর সঙ্গীতের নাম নহে, ইহা লোক-সঙ্গীতের একটি সুরের নাম।

বাংলার লোক-সঙ্গীতকে প্রধানতঃ দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়, প্রথমতঃ উৎসব অনুষ্ঠান কিংবা কোন বিশিষ্ট ক্রিয়ার (action) সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সমবেত সঙ্গীত এবং দ্বিতীয়তঃ নিঃসঙ্গ অবসরের মুহূর্তে গেয় একক সঙ্গীত। কর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সমবেত সঙ্গীতকে প্রধানতঃ সারি শ্রেণীর গান বলিয়া নির্দেশ করা যায়, নিঃসঙ্গ অবসরের একক সঙ্গীতই ভাটিয়ালি নামে পরিচিত। প্রত্যেক দেশেরই লোক-সঙ্গীত প্রধানতঃ ইহার প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সমাজ-মানসের পটভূমিকার উপর জন্মলাভ করে। এক হিসাবে বহিঃপ্রকৃতিই সমাজের মানস-প্রকৃতি গঠন করিতে সহায়তা করে। সেই জন্যই প্রকৃতির সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়া সমাজের রস-সংস্কার বিকাশ লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং বাংলা দেশের বিশেষ একটি অঞ্চলেই ভাটিয়ালি গান জন্ম এবং বিকাশ লাভ করিয়াছে; নদীমাতৃক পূর্ববাংলাই ভাটিয়ালির জন্মস্থান। দেশের যে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্য দিয়া ভাটিয়ালি জন্ম লাভ করিয়াছে, তাহা আশ্রয় করিয়াই ইহা বিকাশ লাভ করিয়া আসিয়াছে। প্রাকৃতিক এই বিশেষ পটভূমিকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া ইহা কোথাও প্রচার লাভ করিলেও তাহাতে ইহার মৌলিক প্রাণশক্তি রক্ষা পাইতে পারে নাই।

কেবল মাত্র নদীর সঙ্গেই যে ভাটিয়ালির সম্পর্ক, তাহাই নহে—বিশাল প্রান্তরের দিগন্ত প্রসারিত বিস্তার, তাহার উপর দিয়া নিঃসঙ্গ অলস মন্থরগতির পথযাত্রা, প্রকৃতির মধ্যে উদাসী বিষণ্ণ বৈরাগ্যের রূপ—ইহারা ভাটিয়ালির প্রেরণা দান করিয়া থাকে। পূর্ববাংলার দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তর বলিতে বিস্তৃত জলাভূমি বা হাওর বুঝায়। হাওর শব্দটি সাগর কথারই অপভ্রংশ। দিগন্ত বিস্তৃত হাওরের বুকের উপর দিয়া অলস মন্থর গতিতে ভাসমান নৌকার হাল ধরিয়া থাকিয়া যখন মাঝি দেহে এবং মনে একটু অবসরের সুযোগ পায়,

তখনই ভাটিয়ালির সুর তাহার কণ্ঠে আপনা হইতে জাগিয়া উঠে। কিংবা হেমন্ত-শীতের বিষণ্ণ মধ্যাহ্নে হাওরের জলরাশি যখন শুষ্ক হইয়া গিয়া ইহার মধ্যে কেবল শূন্যতা হাহাকার করিতে থাকে, তখন কোন মহিষ কিংবা গো-রক্ষক যুবক কোন বৃক্ষচ্ছায়ায় যখন অবসর যাপন করিবার জন্য তাহার নিঃসঙ্গ তৃণশয্যায় আশ্রয় লয়, তখনই তাহার কণ্ঠে ভাটিয়ালির সুর জাগিয়া উঠে। সুতরাং দেখা যায়, ভাটিয়ালির প্রকৃত অবকাশ একদিকে যেমন প্রকৃতির অন্তহীন বিস্তার, আর একদিক দিয়া তেমনই বিষণ্ণ নিঃসঙ্গতা। ইহা একক সঙ্গীত, ইহা বিশেষ অর্থে একক—এখানে গায়কের যেমন কোন সঙ্গী থাকে না, তেমনই গায়কের সম্মুখে কোন শ্রোতাও থাকে না, কাহারও মুখের দিকে তাকাইয়া, কাহারও রস ও রুচির উপর লক্ষ্য রাখিয়া এখানে গায়কের রসোৎসারকে নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রয়োজন হয় না। এখানে গায়ক সম্পূর্ণ স্বাধীন, নিজের নিতান্ত অন্তরের সঙ্গে তাহার একাত্মতার অনুভূতিতে তাহার কোন অন্তরায় নাই। কোন সংস্কার তাহার সহজাত অন্তরের অনুভূতিতে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না। সুতরাং ইহার মধ্য দিয়া গায়কের অন্তরটি যত স্বচ্ছভাবে প্রকাশ পায়, অন্য কোন লোক-সঙ্গীতের মধ্য দিয়া তাহা তত স্বচ্ছভাবে প্রকাশ পায় না। সেই জন্য ইহার প্রধান বিষয় প্রেম। তরুণ গায়কের কণ্ঠে তাহার ব্যক্তিগত প্রণয়-জীবনের আশা নৈরাশ্যের সুর ইহার মধ্যে যেমন ধ্বনিত হইয়া থাকে, পরিণত-বয়স্ক গায়কের কণ্ঠেও তেমনই আধ্যাত্মিক আশা-নৈরাশ্যের সুর ধ্বনিত হয়। উভয় ক্ষেত্রেই গায়কের অন্তর মথিত করিয়া ইহার সুর উৎসারিত হয়। সেই জন্য লোক-সঙ্গীতের মধ্যে ইহাই সর্বাধিক আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ। নিঃসঙ্গ নির্জনতার মধ্য দিয়া বিষাদের ভাবই মনে জাগ্রত হয়, সেইজন্য ভাটিয়ালি গানের প্রেমানুভূতি এই প্রকার বেদনার্ত, যেমন—

পাখী, তোমার পায়ে ধরি মিনতি গো করি
আর আমায় জ্বালাইও না।
'বউ কথা কও'—বলে গো ডাইকো না॥
পাখী ডাকে সন্ধ্যাকালে,
আমি সন্ধ্যা দিতে যাই গো ভুলে,
যদি ডাক নিশিকালে আমি কাইন্দ্যা ভিজাই বিছানা। ॥

পরিণত বয়স্কের কণ্ঠে যখন ভাটিয়ালি গানে আধ্যাত্মিক ভাবের বিকাশ দেখা যায়, তখন তাহাতেও বেদনা ও নৈরাশ্যের অনুভূতিই ব্যক্ত হইয়া থাকে—

ভেবে দেখলাম ভবনদীর নাই রে পারাপার।
আমি যেই দিকে চাই, সেই দিকেই দেখি অকূল পাথার ॥
উন্দুধুন্দু নৈরাকারে, যে কথা মনে পইলে ফাঁপর করে,
চিন্তায় জরজর না দেখি উপায় ॥

ভাটিয়ালি গান প্রধানতঃ বিরহ-বেদনা ও নৈরাশ্যের গান—এই বিরহ-বেদনা যেমন প্রণয়-গত নৈরাশ্য-জনিত হইতে পারে, তেমনই অধ্যাত্ম-জীবনের অসম্পূর্ণতাবোধ হইতেও সৃষ্টি হইতে পারে। প্রকৃতির যে বিশেষ রূপটির কথা ভাটিয়ালির পটভূমিকা রূপে উল্লেখ করিলাম, তাহা হইতেই এই নৈরাশ্য ও বেদনার ভাবটি আসিয়া ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। সুতরাং এই সঙ্গীত ও ইহার সুর প্রকৃতির সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। ইহার এই বিশিষ্ট প্রাকৃতিক পটভূমিকা হইতে ইহাকে বিচ্ছিন্ন করিবার উপায় নাই।

অনেকে এ'কথা যথার্থই মনে করিয়া থাকেন যে, ভাটিয়ালি বাউল গানের অনেক পূর্ববর্তীকালেই উদ্ভূত হইয়াছিল। অর্থাৎ ভাটিয়ালি গানের মধ্যে তত্ত্বকথা যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা অনেক পরবর্তী কালীন যোজনা; মূলতঃ ইহা একান্ত পার্থিব জীবনের দুঃখ-বেদনা ও নৈরাশ্য অবলম্বন করিয়াই রচিত হইত, ইহার মধ্যে তত্ত্বকথার কোনও সংস্রব ছিল না। পার্থিব সুখ দুঃখ অনুভূতির অভিব্যক্তিই সাহিত্যে প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, এ'কথা সত্য, দর্শন বা তত্ত্বকথা পরবর্তী কালে আসিয়া মানব-সমাজের চিন্তার রাজ্য অধিকার করিয়াছে। ভাটিয়ালির যখন উদ্ভব হয়, তখন ইহা মানব-জীবনের পার্থিব দুঃখ-বেদনাকেই রূপ দিয়াছে, ক্রমে পূর্ববঙ্গের বাউল, দেহতত্ত্ব, মুর্শিদ্যা, মারফতির তত্ত্বকথাও ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে পূর্ববঙ্গের প্রায় অনুরূপ ভাবমূলক সকল লোক-সঙ্গীতই ইহা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের উপরি-বর্ণিত বিশিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশ আশ্রয় করিয়া যখনই যে ভাবমূলক সঙ্গীত রচিত হইয়াছে, তাহাতেই প্রধানতঃ ভাটিয়ালির প্রভাব নিজের অধিকার স্থাপন করিয়া লইয়াছে। কিন্তু পূর্ববঙ্গের উক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়া ইহা বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। সেই জন্যই এ'কথা অতি সহজেই মনে হয় যে, ইহা পূর্ববঙ্গেই

অত্যন্ত প্রাচীনকালে উদ্ভূত হইয়া একমাত্র সেখানেই বিকাশ লাভ করিয়াছে। অন্যত্র ইহার বিকাশ ও পুষ্টিলাভ সম্ভব হয় নাই।

ভাটিয়ালি যত প্রাচীনই হউক, ইহা কবে, কি ভাবে যে সর্বপ্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা আজ আমাদের জানিবার উপায় নাই। প্রাচীন বাংলার যে সকল গ্রন্থের মধ্যে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'বৌদ্ধগান ও দোঁহা' গ্রন্থটিই বাংলা ভাষায় রচিত সর্বপ্রাচীন পুঁথি বলিয়া পণ্ডিতগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহাতে যে সাতচল্লিশটি প্রাচীন বাংলা গান সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটিতেই রাগ-রাগিণীর উল্লেখ রহিয়াছে। এই গ্রন্থখানি খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর পূর্বেই সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তবে এ'কথা সত্য, ইহাতে যে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে, তাহা পদগুলি রচনার সমসাময়িক কালীন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না; ইহার পুথি যখন পরবর্তী কালে অনুলিখিত হইয়াছিল, তাহা সেই সময়কার হইয়াই সম্ভব। মধ্যযুগের কোনও সময়ে এই পুথি নকল করা হইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। ইহাতেও দেখিতে পাওয়া যায়, বিভিন্ন প্রাচীন রাগ-রাগিণীর সঙ্গে 'বঙ্গাল-রাগ' নামক একটি রাগের উল্লেখ আছে। যে সঙ্গীতটি সম্পর্কে এই রাগটির উল্লেখ আছে, তাহার রচয়িতার নাম ভুসুকু, তিনি বঙ্গাল দেশের অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। যদিও বঙ্গাল রাগই ভাটিয়ালি কি না, এই বিষয়ে নিঃসংশয়ে কিছুই বলিতে পারা যায় না, তথাপি ইহার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে অনুমান করিবার পক্ষেও যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। কারণ, এ'কথা সত্য, পূর্ববাংলার সর্বাপেক্ষা নিজস্ব উল্লেখযোগ্য সঙ্গীতই ভাটিয়ালি। ইহার প্রসার ও অন্তর্নিহিত সুরগুণ বিচার করিয়া দেখিলে সহজেই মনে হইতে পারে যে, দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহা সেই অঞ্চলেরই একটি বিশিষ্ট গীতিরূপ বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়া আসিতেছে। সুতরাং প্রাচীনতর কালে বঙ্গাল-রাগ ও ভাটিয়ালি একার্থ বাচক হওয়া কিছুই আশ্চর্য নহে। 'বৌদ্ধগান ও দোঁহা'য় অন্যান্য আর যে সকল রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে অন্যান্য নানা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীর সঙ্গে 'দেশাখ্য' বা দেশীয় রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে, তবে তাহাদিগকে গৌড়ীয় বা দেশাখ্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং যাহা বঙ্গাল-রাগ বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে, তাহা দেশীয় কিংবা গৌড়ীয় হইতে পৃথক্ বলিয়া উল্লেখ করা

হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, সাধারণ গৌড়ী, কিংবা দেশী রাগ হইতে ইহা স্বতন্ত্র ছিল, ইহার বিশেষত্বের মধ্যেই ইহার স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়িয়াছিল।

বঙ্গাল-রাগে গেয় যে গানটির প্রসঙ্গ 'বৌদ্ধ গান ও দোঁহা'য় উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা সহজিয়া বা যোগতান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি সাধন-সঙ্গীত। একে ইহার ভাষা প্রাচীন, তাহার উপর সাধন-ভজনের গূঢ় তত্ত্বকথা ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া ইহার অর্থ সহজ বোধ্য নহে। তথাপি বাংলার প্রাচীন একটি সঙ্গীত হিসাবে ইহা এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য। গানটি এই প্রকার—

সহজ মহাতরু ফরিঅ এ তেলোএ।
খসম সহাবে রে বান্ধই কা কোএ॥
জিম জলে পাণিআ টালিয়া ভেউ ন জাই।
তিম মণ রঅণা রে সমরসে গঅণ সমাই॥
জাসু নাহি অপ্পা তাসু পরেলা কাহি।
আইএ অনুঅণারে জাম মরণ ভব ণাহি॥
ভুসুকু ভণই কট রাউতু ভণই কট সঅলা এহ সহাব।
জাই ণ আবই রে ণ তহিঁ ভাবাভাব॥

আধুনিক বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিলে ইহা এই প্রকার দাঁড়াইবে—

সহজ-মহাতরু স্ফুরিত এ ত্রিলোকে।
খ-সম স্বভাবে রে বাঁধে কাহাকে কে এ ?
যেমন জলে পানি ঢালিয়া ভেদ করা যায় না।
তেমন মনোরত্ন রে সমরসে গগনে সামায়॥
যাহার নাহি আপন তাহার পর কোথায়॥
আদৌ অনুৎপন্ন সম্বন্ধে জন্মমরণ ভব নাই॥
ভুসুকু ভণে আশ্চর্য! রাজপুত্র ভণে আশ্চর্য! সকল এই স্বভাব!'
না যায় না আসে রে, না তায় ভাবাভাব॥

এই বৌদ্ধ সহজিয়া গানটি বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিবার একটি বিশেষ কারণ আছে, তাহা এখানে উল্লেখ করিতেছি। পূর্বেই বলিয়াছি যে, ভাটিয়ালিতে তত্ত্বকথাও স্থান পাইয়া থাকে, সুতরাং ইহাতে তত্ত্বকথা আছে বলিয়া ইহা ভাটিয়ালি ইহবার পক্ষে কোন বাধা নাই। যদি ইহা ভাটিয়ালিই হইয়া থাকে, তবে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ভাটিয়ালি নামটির যে উৎপত্তি হয় নাই,

তাহা বুঝিতে পারা যায়। তখন সম্ভবতঃ ইহা বঙ্গাল দেশ বা পূর্ববঙ্গের গীতরূপে বঙ্গাল-রাগ বলিয়াই পরিচিত ছিল। কিন্তু এই বিষয়ে নিঃসংশয়ে কিছুই বলিতে পারা যায় না। ভাটিয়ালি কথাটির কি ভাবে কবে উদ্ভব হইল, তাহা এখন আলোচনা করিয়া দেখিতে হয়।

এ'কথা সকলেই জানেন যে, ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মধ্যে 'ভাটিয়ারী' নামে একটি রাগিণী আছে। মধ্যযুগের বাংলার বৈষ্ণব পদাবলীতেও এই রাগিণীর ব্যাপক উল্লেখ পাওয়া যায়। উপরে বাংলার লোক-সঙ্গীত ভাটিয়ালির যে প্রকৃতির কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার সঙ্গে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত 'ভাটিয়ারী'র কোন দিক দিয়াই সম্পর্ক নাই। ভাটিয়ালির মৌলিক প্রকৃতির মধ্যে যে ভাব-গভীরতা ও সুরের বিস্তার আছে, ভাটিয়ারীর মধ্যে তাহা নাই। 'বৈষ্ণব পদ-লহরী'-তে নিম্নোদ্ধৃত পদটিকে ভাটিয়ারী রাগিণীতে গেয় বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, ইহা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ইহা মাত্রা ও তাল-ভিত্তিক উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত অনুযায়ী রচিত। ভাটিয়ালির রচনা ও ভাবগত বৈশিষ্ট্য কিছুমাত্র ইহার নাই। 'বৈষ্ণব পদ-লহরী'র দুইটি পদ এখানে উদ্ধৃত করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে, যেমন—

মাথহি তপন তপত পথ বালুক
আতপ দহন বিথার।
ননীব পুতুল তনু চরণ কমল জনু
তবহি চলল অভিসার॥

ইহা যদি ভাটিয়ারী হইয়া থাকে, তবে বাংলার পল্লী সঙ্গীত ভাটিয়ালি যে ইহা হইতে স্বতন্ত্র, তাহা বিশদ্ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া না বুঝাইলেও চলিতে পারে।

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের'র মধ্যেই বাংলার প্রাচীন গীত-সাহিত্যে 'ভাটিআলী' নামক একটি রাগের সর্বপ্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন' খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন, সুতরাং 'বৌদ্ধগান ও দোঁহা'র ধারা অনুসরণ করিয়া ইহা 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে' আত্মপ্রকাশ করা কিছুই অসম্ভব নহে। কিন্তু একটি কথা এখানে উল্লেখ করিতে পারা যায়,—'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন' রাঢ় অঞ্চল বা বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলের রচনা, কিন্তু ভাটিয়ালি সম্পর্কে আমরা

পূর্বে যাহা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তাহা পূর্ববঙ্গেরই লোক-সঙ্গীত। পূর্ববঙ্গেরই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা ইহা চিহ্নিত; সুতরাং পশ্চিম বঙ্গের সঙ্গে ইহার কোনও সম্পর্ক থাকিবার কথা নহে। কিন্তু ইহারও একটি সদুত্তর পাওয়া যায়, তাহাই এখানে উল্লেখ করিতেছি।

এ'কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ভাটিয়ালি নৌকার মাঝি মাল্লা ও চাষী রাখালের গান। পূর্ব বাংলার মাঝি মাল্লারা সর্বদা পশ্চিম বঙ্গে জীবিকার্জনের জন্য যাতায়াত করিত এবং সেই সূত্রে তাহাদের নিজেদের অঞ্চলে প্রচলিত সঙ্গীত পশ্চিম বঙ্গেও প্রচার করিবার সহায়তা করিয়াছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, পশ্চিম বাংলার সওদাগরদিগের বাণিজ্যতরী পূর্ববাংলার মাঝিরাই বাহিয়া দেশ দেশান্তরে লইয়া যাইত। মধ্যযুগের প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেই সওদাগরদিগের ডিঙ্গাডুবির পর 'বাঙ্গাল মাঝির খেদ' নামক একটি বিষয় বর্ণনা করা হইত। এই বিষয়টি সুগভীর তাৎপর্যমূলক। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, পূর্ব বাংলার মাঝিদিগের গান কেবল মাত্র মাঝিদিগের মধ্যে পূর্ববঙ্গেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিত না, বরং তাহাদের মধ্যস্থতায় দেশ দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িত। প্রধানতঃ এই ভাবেই ভাটিয়ালি পশ্চিম বাংলায়ও প্রচার লাভ করিয়াছিল। তবে এ'কথা সত্য, সেখানে ইহা প্রচার লাভ করিলেও অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের অভাবে তাহা সেই অঞ্চলে কোনদিন পুষ্টিলাভ করিতে কিংবা বিকাশ লাভ করিতে পারিত না – প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইয়া যাইত। সুতরাং বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গীতিকাব্যে 'ভাটিআলী' নামক যে রাগের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা পূর্ব বাংলার ভাটিয়ালির মধ্য দিয়া ইহার যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' 'ভাটিয়ালি' বলিয়া উল্লেখিত গীতগুলির মধ্য দিয়া আনুপূর্বিক যে সেই বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নহে, পাইবার কথাও নহে। কারণ, বিশিষ্ট একটি লোক-সঙ্গীতের রীতি ইহার নিজস্ব সমাজ ও প্রকৃতি-জীবনের পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া অন্যত্র যখন আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাহার মৌলিক শক্তি অনেকাংশেই হ্রাস পাইয়া যায়। এই বিষয়ে মার্গ-সঙ্গীত ও লোক-সঙ্গীতে পার্থক্য আছে। মার্গ-সঙ্গীত একটি অবিচল আদর্শ অটুটভাবে রক্ষা করিবার ফলে ভারত ব্যাপী সর্বত্র যেমন এক অখণ্ড গীতি-রূপ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, লোক-সঙ্গীতের গীতি-রীত তদপেক্ষা শিথিল-বদ্ধ

বলিয়া তাহা সেইভাবে অনুসরণ করা যাইতে পারে না। এমন কি, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মধ্যেও দেখা যায়, দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত শাস্ত্রীয়-সঙ্গীত যত রক্ষণশীল, উত্তর ভারতে প্রচলিত শাস্ত্রীয় সঙ্গীত তত রক্ষণশীল নহে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রকৃতির গীতরীতির সঙ্গে সম্পর্কের ফলে উত্তর ভারতের শাস্ত্রীয়-সঙ্গীত ইহার প্রাচীনতম আদর্শ অটুটভাবে রক্ষা করিয়া চলিতে পারে নাই; সুতরাং যে লোক-সঙ্গীতের জন্য কোন লিখিত শাস্ত্রই কোন কালে রচিত হয় নাই, তাহার পক্ষে রূপান্তরিত হওয়া আরও সহজ। অতএব পূর্ব বাংলার ভাটিয়ালিই যে 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে' 'ভাটিআলী' বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে, এমন অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। বিষয়ের দিক দিয়াও যদি বিচার করিয়া দেখি, তাহা হইলেও বুঝিতে পারা যাইবে যে, পূর্ব বাংলার ভাটিয়ালির সঙ্গে যে 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে'র 'ভাটিআলী'র একেবারেই কোন ঐক্য নাই, তাহা নহে। পূর্ব বাংলার ভাটিয়ালি যেমন বিরহ, বিচ্ছেদ ও বেদনার গান, 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে' যে গানগুলি 'ভাটিআলী' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও বেদনার সুরের অভাব বোধ হইবে না। প্রথমতঃ দেখা যায় যে, 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে'র 'রাধা-বিরহ' খণ্ডেই অধিক সংখ্যক 'ভাটিআলী' রাগের উল্লেখ আছে। এই রাধা-বিরহ অংশ শ্রীরাধিকার সুগভীর অন্তর্বেদনার ভারে ভারাক্রান্ত। একটি সঙ্গীত এখানে উদ্ধৃত করা যায়—

হরি হরি।

আয়াসেঁ কাহ্নের উরে
শুতিলোঁ দিঞাঁ শিয়রে

প্রাণের বড়ায়ি ল

দারুণ নয়নে ভৈল নিন্দে। ল
কাহ্নাঞির দরশন
যেহেন ভৈল স্বপন

প্রাণের বড়ায়ি ল

যাগিঞাঁ চাহোঁ নাহিক গোবিন্দে॥

ভাটিয়ালির যে কয়টি প্রধান বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সব কয়টিই এখানে রক্ষা করিবার যথাযথ সুযোগ রহিয়াছে। ভাটিয়ালির প্রথম বিশেষত্ব, দুই তিনটি শব্দ লইয়া যে এক একটি শব্দগুচ্ছ রচিত হয়, তাহা

এখানে আছে। তারপর এই শব্দগুচ্ছ গীত হইবার পরই সুদীর্ঘ একটানা যে কেবল মাত্র একটি সুর আন্দোলন-যুক্ত হইয়া প্রকাশ পায়, উদ্ধৃত পদগুলির মধ্যে তাহারও যথাযথ অবকাশ রহিয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন' রচনার সমসাময়িক কালে ইহার এই সকল পদ যে কি ভাবে গীত হইত, তা আজ জানিতে পারা যায় না, তথাপি ইহার রচিত পদগুলি হইতে অন্তত এই অংশ যে ভাটিয়ালির অনুরূপ কোন সুরেই রচিত হইত, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

একথা এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে'র মধ্যেও 'বঙ্গাল-রাগে'র উল্লেখ আছে। সুতরাং 'বৌদ্ধ গান ও দোঁহা'য় বঙ্গাল-রাগের উল্লেখ পাইয়া তাহা যে ভাটিয়ালি বলিয়া অনুমান করিয়াছি, সেই সম্বন্ধে ইহা হইতে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, কারণ কেহ হয় ত বলিবেন, বঙ্গাল-রাগই যদি ভাটিয়ালি, তবে 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে' বঙ্গাল-রাগ উল্লেখ করিবার পরও 'ভাটিআলী'র উল্লেখ থাকিবার প্রয়োজন কি ছিল? এ' কথা মনে রাখিতে হইবে যে, 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' 'বৌদ্ধগান ও দোঁহা'র অন্ততঃ তিনশত বৎসরের পরবর্তী কালের রচনা। সুতরাং এই তিনশত বৎসরের মধ্যে পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আরও নূতন নূতন লোক-সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীর প্রচার হইয়াছে এবং পূববর্তী কাল হইতে প্রচলিত বঙ্গাল-রাগ একটি সুনির্দিষ্ট গীত-রীতিতে পরিণত হইয়া একটি বিশেষ আদর্শ রূপ লাভ করিয়া মূল ভাটিয়ালি হইতে কতকটা স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্য মৌলিক ভাটিয়ালির রূপ নির্দেশ করিবার জন্যই বঙ্গাল-রাগ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া ভাটিয়ালির এক স্বতন্ত্র স্থান নির্দেশ করা হইয়াছে। ক্রমে বঙ্গাল-রাগ ও ভাটিয়ালি দুইটি স্বতন্ত্র গীতি-রীতিতে পরিণত হইয়া গিয়া থাকিবে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, এই বিষয়ে কেবল মাত্র অনুমানই আমাদের নির্ভর, প্রত্যক্ষ তথ্য ইহার কিছুই নাই।

'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন' হইতে মনে হয়, 'ভাটিআলী' রাগটি পশ্চিম বঙ্গেও অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল। প্রায় আঠারটি গীত 'ভাটিআলী' রাগের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ইহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে এ' কথা সত্য, ইহাদের মধ্যে সব কয়টি গীতই নিরাশা-ব্যঞ্জক, অর্থাৎ পূর্ববাংলার ভাটিয়ালির যাহা প্রধান বৈশিষ্ট্য, তাহা ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্য দিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে। স্বাধীন সঙ্গীত ব্যতীতও ভাটিয়ালির আরও একটী বিশেষ প্রয়োগ ক্ষেত্র আছে, তাহা রূপকথা। এ'কথা সকলেই জানেন যে, রূপকথা গীতিধর্মী গদ্য রচনা। রূপকথার কাহিনী

বর্ণনা করিতে করিতে কোন কোন স্থানে যেখানে বর্ণনা নিতান্ত করুণ কিংবা একান্ত গীতিধর্মী হইয়া উঠে, সেখানেই রূপকথার পরিবেশক গদ্য বর্ণনা পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গীতের আশ্রয় গ্রহণ করে। কাহিনীর বিশেষ বিশেষ স্থানেই তাহা সম্ভব হয়, সর্বত্রই যে এমন হয়, তাহা নহে। যেমন মধুমালার কাহিনীর মধ্যে এই অংশ আপনা হইতেই যেন ভাটিয়ালি হইয়া উঠিয়াছে—

আমি স্বপ্নে দেখি মধুমালার মুখ রে,
স্বপ্ন যদি মিথ্যা বে হইত,
গলার হার কি বদল হইত রে, লোকজন!
স্বপ্ন যদি মিথ্যা রে হইত,
অঙ্গুবি কি বদল হইত রে, লোকজন।
মদন কুমাব যাত্রা করে,
মাস্তল ভ্যাঙ্গ্যা পানিত পড়ে রে, লোকজন।

মধুমালা রূপকথাব এই প্রকাব বহু অংশই সার্থক ভাটিয়ালি। ইহা শাশ্বত প্রেমের কাহিনী। ইহাব মধ্যে প্রেমে নৈবাশ্য আছে, নৈরাশ্যের অবসানে মিলনও আছে।

এই ভাবে বাংলাব রূপকথায যে সকল অংশ বিবহ ও বিচ্ছেদমূলক, তাহা অতি সহজেই ভাটিয়ালিতে রূপান্তরিত হইয়া যায়। ভাটিয়ালি মূলতঃ মাঝি-মাল্লা ও রাখাল মহিষালেব গান হইলেও কিংবা নদীমাতৃক দেশের সঙ্গে ইহার মৌলিক সম্পর্ক থাকিলেও, ইহা অন্তঃপুবের বর্ষীযসী নারীর কণ্ঠেও গীত হইয়া সার্থক আবেদন সৃষ্টি কবে, রূপকথাব রহস্যময় পবিবেশকে ইহা আরও রসঘন করিয়া তোলে। সেখানে নদীও থাকে না, প্রান্তরও থাকে না; তবে ভাটিয়ালির আর একটি যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়, অর্থাৎ অবসর, তাহার অভাব থাকে না। রূপকথার পরিবেশেব মধ্যে ভাটিয়ালি এমন নিবিড় সংযোগ স্থাপন করে যে, সঙ্গীতেব সুরে ও কাহিনীর বর্ণনায মিলিয়া তাহা এক সহজ অখণ্ডতা সৃষ্টি হয়।

বাংলার লোক-সঙ্গীতের মধ্যে ভাটিয়ালি যে কেবল মাত্র প্রাচীনতমই তাহা নহে, ইহার মধ্য দিয়া সমগ্র বাংলার লোক-সঙ্গীতের মৌলিক গুণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। সেইজন্য এ'কথাও মনে হইতে পারে যে, বাংলার অধিকাংশ অনুরূপ ভাবমূলক লোক-সঙ্গীত ভাটিয়ালির ভিত্তির উপরই রচিত হইয়াছে।

বাংলার কীর্তন এবং বাংলার টপ্‌পার সঙ্গে যে কোন কোন ক্ষেত্রে ভাটিয়ালির আশ্চর্যজনক ঐক্য রহিয়াছে, তাহা অনেকেই অনুভব করিয়াছেন। এমন কি, এই সকল তথ্য হইতে এমনও মনে হইতে পারে যে, বাংলার লোক-সঙ্গীতের একাংশের ভিত্তিই ভাটিয়ালি, ইহার উপর আশ্রয় করিয়া বাংলার বহু আঞ্চলিক লোক-সঙ্গীত আনুপূর্বিক রচিত হইয়াছে। পূর্ব বাংলার বাউল, দেহতত্ত্ব, মুর্শীদ্যা, মারফতী প্রভৃতি তত্ত্বমূলক বহু সঙ্গীতই ভাটিয়ালির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। অন্তরের সুগভীর ভাব ও সূক্ষ্মতম অনুভূতি প্রকাশ করিবার ভাটিয়ালির যে শক্তি, তাহা বাংলার আর কোন লোক-সঙ্গীতের নাই। সেই জন্য জীবন-দর্শনের সুগভীর বিষয় সমূহ অতি সহজেই ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে। বাংলাব আর কোন লোক-সঙ্গীতের এই গুণ নাই।

ভাটিয়ালি সম্পর্কে একটি প্রধান কথা এই যে, ইহা মূলতঃ কোন যন্ত্রের সাহায্যে গীত হয় না। কেবল মাত্র সুরই ইহার মুখ্য অবলম্বন—ইহার সঙ্গে নৃত্য কিংবা আর কোন উপায়ে তাল রক্ষা করিবার প্রয়োজন হয় না বলিয়া বাদ্যযন্ত্রের সহায়তা ব্যতীতই ইহা গীত হয়। যদিও সকল পল্লী-সঙ্গীতই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বাদ্য-যন্ত্রের সাহায্যে গীত হয়, তথাপি ভাটিয়ালির মধ্যে এই বিষয়ে একটু বিশেষত্ব আছে—ইহার কেবল মাত্র কণ্ঠস্বরই মুখ্য অবলম্বন। তাহার ফলে ইহার স্বরের বিভিন্ন পর্দাগুলি অতি সহজেই সুস্পষ্ট অনুভব করা যায়। যেখানে তাল রক্ষা করিবার প্রয়োজন, কেবল সেখানেই বাদ্যযন্ত্র অপরিহার্য হইয়া উঠে। ভাটিয়ালির সেই দায়িত্ব নাই বলিয়া ইহা এই বিষয়ে স্বাধীন। সুতরাং সহরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কিংবা চলচ্চিত্রে, বেতারে কিংবা রেকর্ডে বিচিত্র বাদ্য-যন্ত্রের সহযোগে আমরা যে ভাটিয়ালি শুনিতে পাই, তাহা প্রকৃত ভাটিয়ালিই নহে—ইহাকে 'নাগরিক ভাটিয়ালি' বলিয়া নির্দেশ করা যায়। সুতরাং এই তথাকথিত 'ভাটিয়ালি' শুনিয়া বাংলার এই বিশিষ্ট লোক-সঙ্গীত সম্পর্কে কোন ধারণাই করিতে পারা যাইবে না। বাদ্য-যন্ত্র প্রায় সর্বদাই কণ্ঠস্বরের দৈন্য গোপন করিয়া থাকে। কিন্তু যাহার কণ্ঠস্বরের মধ্যে একদিকে গভীরতা এবং অন্যদিক দিয়া উচ্চতম গ্রামে উঠিয়া যাইবার ক্ষমতা নাই, তাহার পক্ষে আর যে লোক-সঙ্গীত পরিবেষণ করাই সম্ভব হউক না কেন, ভাটিয়ালি পরিবেষণ করা সম্ভব হইবে না। স্বভাব-সিদ্ধ এই স্বরগুণে যাহার অধিকার না থাকে, সে অনুশীলন করিয়াও তাহার অধিকারী হইতে পারে না। পল্লী-জীবনে

ভাটিয়ালির অবসর যে ভাবে আসে, তাহাতে আয়োজন করিয়া তাহা পরিবেষণ করা সম্ভব হয় না। পল্লী-গায়কের মধ্যে ভাটিয়ালির মেজাজ যখন আসে, তখন তাহার অবসরের মুহূর্ত, দেহ ও মনের বিশ্রামের অবকাশ; সে তখন নিঃসঙ্গ মনের গহনে বিচরণশীল। সুতরাং বহির্জগতের আড়ম্বর ও আয়োজন সেখানে পৌঁছিতে পারে না। তাহার কর্মহীন মুহূর্তের সুমধুর একাকীত্বই তাহার কণ্ঠে সঙ্গীতের সুর আপনা হইতে জাগাইয়া তোলে। সেইজন্য বহির্জগতের উপকরণও সেখানে গিয়া পৌঁছিতে পারে না।

পূর্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি যে, ভাটিয়ালির গীতি-রীতির একটি প্রধান লক্ষণ এই যে, ইহার প্রথম পদটির কয়েকটি শব্দ একসঙ্গে গীত হইবার পর ইহার সর্বশেষ স্বরটি দীর্ঘায়িত হইয়া উচ্চারিত হইতে থাকে, এই দৈর্ঘ্যের সুনির্দিষ্ট কোন পরিমাপ নাই, গায়কের মেজাজ ও রুচি অনুযায়ী ইহা যে কোন সীমায় গিয়া পৌঁছিতে পারে। প্রারম্ভ পদটিই সর্বাপেক্ষা চড়া সুরে উচ্চারিত হইবার পরে পরবর্তী পদগুলির ভিতর দিয়া তাহা কখনও ক্রমে কখনও বা আকস্মিক ভাবে খাদে নামিয়া আসে। ভাটিয়ালির সমস্ত জোর গিয়া প্রথম পদটির উপরই পড়ে এবং প্রথম পদটির ভারই ক্রমে অন্যান্য পদগুলির মধ্য দিয়া নিম্নতর সুরে প্রকাশ পায়। সুতরাং ভাব এবং সুর উভয়ের জন্যই প্রথম পদটিই প্রধানতঃ লক্ষণীয় এবং প্রথম পদের শেষ স্বরটি ক্রমাগত দীর্ঘায়িত হইয়া উচ্চতম সুরে প্রকাশ করিবার ফলে এই স্বরটিও অত্যধিক প্রাধান্য পাইয়া যায়; যেমন—

কৃষ্ণহারা হইলাম গো,
কৃষ্ণহারা হইয়া কান্দ্‌ছি গো বনে নিশিদিনে।
ওগো আমার মত দীন দুঃখিনী
কে আছে আর বৃন্দাবনে॥
সখি গো, যার যে জ্বালা সেই জানে,
অন্যে কি আর জানে,
আমার অরণ্যে রোদন করা
কার কাছে কই, কেবা শোনে।
সখি গো, নয়ন দিলাম রূপ নেহারে
প্রাণ দিলাম তার সনে,

ওগো, দেহ দিলাম, অঙ্গের বসন
মন দিলাম তার শ্রীচরণে।
সখি গো, কৃষ্ণ শূন্য দেহ গো আমাব
কাজ কি এ'জীবনে,
অধীন কালাচাঁদ কয রাই মরিল
রাই মবিল শ্যাম বিহনে।

ইহাব প্রথম পদটিব মধ্য দিয়াই গানেব স্বর ও ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইযাছে, পরবর্তী পদগুলির মধ্য দিয়া তাহারই ব্যাখ্যা ও পুনরুক্তি চলিয়াছে মাত্র। ভাটিযালি কখনও বর্ণনাত্মক হয না, কেবল ভাবাত্মক হইয়া থাকে, সেইজন্য ইহা সর্বদাই রচনার দিক দিযা সংক্ষিপ্ত হয। তবে স্বরের তুলনায় কথাব অংশ অপ্রধান বলিযা বর্ণনাব বাহুল্য থাকিলেও তাহা গীতের মধ্যে কদাচ ভার স্বরূপ হইযা উঠে না। কাবণ, একটি মাত্র চডা সুরেব দীর্ঘায়িত উচ্চারণ ইহাব কথা বা ভাষাকে প্রায সর্বদাই আচ্ছন্ন করিযা দেয।

ভাটিযালি আরম্ভেই যেমন চডা স্ববেব দিকে দ্রুত অগ্রসব হইয়া যায়, তেমনই আবার পরক্ষণেই খাদের দিকে নামিয়া আসে, কখনও বা অত্যন্ত দ্রুত খাদের মধ্যে ইহাব স্বব নামিযা আসে, আবাব কখনও বা ধীবে ধীরেও নামিয়া আসে। সেইজন্য ভাটিয়ালিতে সাত স্ববেবই প্রযোগ হইযা থাকে। কিন্তু চডা স্বরই ইহাব লক্ষ্য থাকে বলিযা পবক্ষণেই ইহা পুনবায় চডাব দিকে অগ্রসর হইয়া যাইতে পাবে। স্ববের সর্বোচ্চ ও সবনিম্ন স্তবে উত্থান পতনের মধ্য দিয়াই ভাটিয়ালিব আবেদন প্রকাশ পায। অন্তবেব অবরুদ্ধ বেদনা যেন ইহার মধ্য দিযা একবার দিগন্তে গিযা প্রতিহত হইযাই পুনবায় অন্তবেব মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া স্তম্ভিত হইযা যায। এই গুণেই প্রধানতঃ ভাটিযালির একটি নিজস্ব বিশেষত্ব প্রকাশ পায়।

এ'কথা সহজেই মনে হয যে, ভাটিযালির প্রভাব এ দেশের পল্লী-সঙ্গীতে অত্যন্ত ব্যাপক। ইহার সুব নানা দিক দিযা মার্জিত ও পরিবর্তিত কবিয়া বিভিন্ন পল্লী-গীতের স্বর জন্মলাভ করিয়াছে, ইহা বাংলাব পল্লী-সঙ্গীতের একটি বুনিযাদি (basic) স্বর। অনেক ক্ষেত্রে ইহাব প্রভাব এ'দেশেব শিল্প-সঙ্গীতের মধ্যেও গিয়া প্রবেশ কবিয়াছে বলিয়া অনুভূত হয। কীর্তনের মধ্যেও ইহার প্রভাব যে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, তাহা পুর্বেও উল্লেখ করিয়াছি।

একজন সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ ভাটিয়ালির সঙ্গে বাংলা টপ্পার সম্পর্ক আছে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। তাঁহার মতে, 'টপ্পা গোড়ায় হিন্দুস্থানী রীতিতে গীত হলেও বাংলাদেশে এ'সে সে নবরূপ ধারণ করেছে, তার মধ্যে বাংলার নিজস্ব রুচি ও মেজাজের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। হিন্দুস্থানী টপ্পায় অত্যন্ত দ্রুত তালের যে তাড়া আছে, বাংলা টপ্পায় তা নেই—এখানে তালগুলির গতি মন্থর। কেবল তাই নয়, এই সব তালে মোটামুটি ভাবে হিসেব থাক্‌লেও মাত্রা গুণতির হিসেব নেই, অর্থাৎ সুর মাত্রাব সঙ্গে লাফালাফি করে অগ্রসর হয় না—ছন্দ এখানে গা ঢাকা দিয়ে পিছনে সরে আছে। ভাটিয়ালির মত এ'র কথাগুলোও এক এক গোছা ক'রে গায়কের মুখে উচ্চারিত হয়, আর তারপরেই কথার হাল থেকে ছাড়ান পেয়ে সুর "জমজমা" নামক তালের মধ্যে বিশ্রাম লাভ করে। তফাৎ দাঁড়াল এই, ভাটিয়ালিতে একটানা সুরের যা কাজ, টপ্পার বেলায় "জমজমা" তালেব কাজও তাই। যদি বলা যায়, বাংলা টপ্পায় ভাটিয়ালির প্রভাব আছে, তাহলে বোধ হয় খুব মিথ্যা কথা বলা হবে না। বাংলার নিজস্ব সঙ্গীত-চেতনা সর্বত্র সঞ্চাবিত হ'য়ে র'য়েছে বলেই টপ্পার মধ্যে এই বিশেষ পরিবর্তন ঘটে গেছে বলে মনে কব্‌তে পারি ('বাংলার লোক-সাহিত্য', ১ম খণ্ড, ৬৮১ পৃষ্ঠা, ৩য় সং)।

রচনার দিক দিয়া ভাটিয়ালি নিতান্ত সবল এবং সংক্ষিপ্ত। বাংলার লোক-সঙ্গীতের মধ্যে ইহাব বচনাই সংক্ষিপ্ততম, ইহার কারণ, কথার পবিবর্তে স্বরই এখানে প্রাধান্য লাভ করে। সেইজন্য ইহাতে কথাব প্রয়োজনীয়তা বেশি নাই। নিম্নোদ্ধৃত রচনাটি ভাটিয়ালির একটি আদর্শ নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, যেমন—

ও সুবল বে, গুণের ভাই রে সুবল,
আমায শীঘ্র এ'নে দেখা রে সুবল
ব্রজেশ্ববী বাধা।
হস্ত দিযে দেখ রে সুবল আমাব হৃদয়ে,
বিনা কাষ্ঠে জল্‌ছে অনল আমার অন্তরে।

কিন্তু অনেক সময় রচনা যে দীর্ঘ হয় না, তাহা নহে। তবে তাহা বর্ণনাত্মক লোক-সঙ্গীতের প্রভাবের ফলেই হইয়া থাকে, ইহাতে ভাটিয়ালির রস অনেক ক্ষেত্রেই নিবিডতা লাভ করিতে পাবে না।

এইবার ভাটিয়ালির বিষয়-বস্তু সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। বাউল, মুর্শিদ্যা, মারফতী, দেহতত্ত্ব যেমন কেবল তত্ত্বমূলক সঙ্গীত, ভাটিয়ালি তাহা নহে। জীবন ও ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব ব্যতীতও ইহার মধ্য দিয়া সুগভীর ভাবমূলক লৌকিক অনুভূতি প্রকাশ পাইয়া থাকে—সে'কথা পূর্বেও একবার উল্লেখ করিয়াছি। মনে হয়, লৌকিক ভাবমূলক সঙ্গীতই ভাটিয়ালির আদিরূপ। সকল লোক-সঙ্গীত সম্পর্কেই এই কথা প্রযোজ্য—প্রত্যেক সমাজেই লৌকিক অনুভূতি অবলম্বন করিয়া ইহার প্রথম সঙ্গীত রচিত হইয়াছে—তারপর ক্রমে ইহার মধ্যে তত্ত্বকথা প্রবেশ করিয়াছে। লৌকিক অনুভূতির প্রথম বিষয়ই প্রেম, সংস্কৃত সাহিত্যে সেইজন্যই ইহাকে আদি রস বলিয়া উল্লেখ করা হয়। প্রেমের মধুরতম অংশই বিরহ। ভাটিয়ালিতে বিরহ ও বিচ্ছেদের বেদনা সঙ্গীতের মাধুর্য লাভ করিয়াছে, ইহার মধ্যে কোন কদর্যতা নাই। অন্তরের নিভৃততম ক্ষেত্র হইতে ইহার উৎসার, সেই জন্যই ইহা দর্পণের মত নির্মল। নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটির মধ্য দিয়া লৌকিক-প্রেম ব্যর্থতার বেদনায় হাহাকার করিয়া উঠিয়াছে, ইহাতে আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ নাই, তথাপি অনুভূতির আন্তরিকতায় স্বচ্ছ ও পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে—

বন্ধু, কই রইলা রে—
অকূলে ভাসাইয়া, বন্ধু, কই রইলা রে।
লহর দরিয়ার বুকে মইলাম সাঁতারিয়া,
কি দুখ বুঝিবে, বন্ধু, কিনারায় দাঁড়াইয়া।
বন্ধু, কই রইলা রে।
বন্ধুরে, কূল নাই কিনারা নাই, উঠছে কত ঢেউ,
এমন নিদান কালে, সঙ্গী নাই মোর কেউ
বন্ধু, কই রইলারে॥

ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বাংলার সমাজের উপর বিস্তার লাভ করিতে লাগিল। তাহার ফলে লৌকিক প্রেম রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর মধ্যে স্বর্গীয়তা লাভ করিল। কিন্তু তথাপি তাহা ধূলিমাটির সম্পর্ক পরিত্যাগ করিল না। পার্থিব প্রেমের অনুভূতিই অপার্থিব আধারে পরিবেষণ করা হইতে লাগিল। ব্যর্থ মানব-প্রেম শ্রীকৃষ্ণের পরিচয়ের অন্তরালে নিজের বেদনার কথাই প্রকাশ করিল—

ওগো রাধে, গোকুলেতে থাকি ।
তোমার লাগি পরের মাকে
আমি মা বলিয়া ডাকি গো ।
কুল দিলাম মান দিলাম আর কি আছে বাকি ।
তোমার লাগি ব্রজপুরে আমি মুরলী যে শিখি গো,
গোকুলে নন্দেব ঘরে ধেনু বৎস রাখি ।
তোমার শ্রীচরণেব লাগি আমি দাসখৎ লিখি গো ॥

রাধা-কৃষ্ণ প্রসঙ্গের উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও ইহা যে ভক্তিমূলক রচনা নহে, বরং নিতান্ত লৌকিক-প্রেম-মূলক, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারিবেন। বাংলা দেশে 'কানু ছাড়া গীত নাই'—সেই সূত্রেই ইহার মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রসঙ্গ আসিয়াছে, কোন আধ্যাত্মিক প্রেরণা হইতে তাহা আসে নাই ।

কিন্তু ক্রমে আধ্যাত্মিক বিষয়কে লইয়াও ভাটিয়ালি বচিত হইতে লাগিল। যে সকল আধ্যাত্মিক বিষয়েব মধ্যে বেদনা ও বৈরাগ্যের ভাব আছে, ভাটিয়ালিতে তাহার সার্থক অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। নিম্নোদ্ধৃত ভাটিয়ালিটি ইহার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন—

জীবনের নাইবে আশা,
কর শ্রীগুরুর চরণ ভরসা ।
দেহেব গুমান কর মিছে,
নিঃশ্বাসের কি বিশ্বাস আছে ?
কাল শমনেজাল পেতেছে—
ভাঙ্‌বে রে তোর সুখের বাসা ।
ভাই বন্ধু দারা সুত
সকল পথের পরিচিত,
যখন প্রাণ তোর হবে হত
কেউ না করবে জিজ্ঞাসা ।
আপন আপন বল যাৱে
কেউ তো সঙ্গে যাবে না রে
গুরু ভজন হইল না রে,
কেবল ভবে যাওয়া আসা ॥

বৈরাগ্যমূলক সঙ্গীতের সঙ্গে ভাটিয়ালির দীর্ঘায়িত চড়া স্বর অতি সহজেই সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারে, সেইজন্য পূর্ব বাংলার এই শ্রেণীর বিষয়ে প্রধানতঃ ভাটিয়ালি সুরই শুনিতে পাওয়া যায়। এই সূত্রে নানা তত্ত্ববিষয় ভাটিয়ালির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। দেহতত্ত্বের একটি সুপরিচিত ভাটিয়ালি গান—

আরে, মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে
আমি আর বাইতে পারলাম না।
আমি জনম ভইরা বাইলাম বৈঠা রে—
তরী ভাইট্যায় বই আর উজায় না।
ওরে জঙ্গি রসি যতই কসি,
ওরে হাইলেতে জল মানে না।
নায়ের তলী খসা, গোড়া ভাঙ্গা রে—
নায় ত গাব গয়নি মানে না।

ইহার ভাব যেমন গভীর, রচনা তেমনই পরিচ্ছন্ন ও সুনির্মল। সুতরাং বাংলার লোক-সঙ্গীতের ইহাই শ্রেষ্ঠ পরিচয়। বাংলার জন-মানসে যে লোকায়ত দর্শনের অনুভূতি দেখা দিয়াছিল, তাহা ইহারই মধ্য দিয়া সর্বাপেক্ষা সার্থকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। সুতবাং ইহা কেবলমাত্র যে সঙ্গীতের আনন্দ দিয়াছে, তাহাই নহে—দর্শনের দৃষ্টিও খুলিয়া দিয়াছে। ইহা একদিক দিয়া যেমন গীতি, আব একদিক দিয়া তেমনই দর্শন।

বর্তমানে সহরে এক শ্রেণীর ভাটিয়ালির সঙ্গে আমাদের পরিচয় স্থাপিত হইয়াছে। তাহাব প্রধান বিশেষত্ব এই যে, নানা বাদ্য-যন্ত্র সহযোগে তাহা গীত হয়, সুতরাং পল্লীর ভাটিয়ালির প্রধান বৈশিষ্ট্যই ইহাতে রক্ষা পায় না। ইহার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, অনেক সময় পল্লীর ভাটিয়ালির নিজস্ব ভাষা পরিবর্তিত করিয়া ইহা সহরের রুচি অনুযায়ী নূতন করিয়া রচিত হইয়া থাকে। এই ভাবে পল্লীর ভাটিয়ালিতে যাহা দেহতত্ত্ব বিষয়ক বলিয়া পরিচিত, তাহাই সহরে আসিয়া সাধারণ প্রেম-সঙ্গীত হইয়া দাঁড়ায়। কারণ, সহরের সঙ্গীত-বিলাসী অধিবাসিগণ তত্ত্ব অপেক্ষা প্রেম-বিষয়টিই অধিকতর আকর্ষণীয় বলিয়া অনুভব করেন। পল্লীর ভাটিয়ালিতে দীর্ঘায়িত চড়া স্বরের মধ্যে আন্দোলন বা কম্পন অধিক থাকে না, এমন কি, আদৌ থাকে না বলিলেও চলিতে পারে; কিন্তু সহরে নানা রাগ-সঙ্গীতের প্রভাববশতঃ

তাহা বিচিত্র আন্দোলন-যুক্ত হইয়া থাকে। এই ভাবে ভাটিয়ালির যাহা প্রকৃত রস, তাহা সহরের ভাটিয়ালির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁহার জমিদারী পরিদর্শন সম্পর্কে পাবনা ও রাজসাহী জেলার গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিতেন, তখন সেখানকার কৃষক ও মাঝি-মাল্লাদিগের মুখে ভাটিয়ালি শুনিতে পাইয়া নিজে সেই অনুযায়ী কয়েকটি ভাটিয়ালি রচনা করেন। কিন্তু তিনি ভাটিয়ালির প্রচলিত বিষয়-বস্তু তাহাদেব মধ্য দিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাহাদের মধ্যে এই প্রকার দেশাত্মবোধক ভাটিয়ালিই তিনি প্রধানতঃ রচনা করিয়াছেন,—

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী॥
ও মা, ফাল্গুনে তোব আমেব বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে, আমি, কি দেখেছি মধুর হাসি॥

এই গানখানি গগন হরকরার 'আমি কোথায় পাব তারে' এই বাউল গানখানির সুরে রচিত হইয়াছে—ইহা সর্ববাদী সম্মত, সুতরাং ঐ গানখানিকে ভাটিয়ালি ঢঙের বাউল বলা যায়। পল্লীর ভাটিয়ালির দীর্ঘায়িত চড়া স্বরের মধ্যে যেমন কোন মাত্রা নাই, গায়ক তাহার মেজাজ ও রুচি অনুযায়ী যত খুসী তাহা দীর্ঘায়িত ও চড়া কবিতে পাবে, ববীন্দ্রনাথেব ভাটিয়ালিতে তাহা হইবার উপায় নাই—কারণ, তাহা যত দীর্ঘায়িতই হোক, তাহা সুনির্দিষ্ট মাত্রা দ্বারা সীমায়িত, মাত্রার শাসন এখানে লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই। পল্লীর ভাটিয়ালির অনিয়মিত বিস্তারিত স্বরকে ববীন্দ্রনাথ নিয়মিত করিয়া লইয়া ভাটিয়ালির স্বর সম্পর্কিত স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। পল্লীর ভাটিয়ালির কথা অপেক্ষা স্বর প্রাধান্য লাভ করে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাটিয়ালিতে তাহার অন্যান্য রচনার মত স্বর অপেক্ষা কথাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের আর একটি উল্লেখযোগ্য দেশাত্মবোধক ভাটিয়ালি—

গ্রাম ছাড়া এই রাঙা মাটির পথ আমার মন ভুলায় রে।
ও রে কার পানে মন হাত বাড়িয়ে লুটিয়ে যায় ধূলায় রে॥
ও যে আমায় ঘরের বাহির করে, পায়ে পায়ে পায়ে ধরে—
ও যে কেড়ে আমার নিয়ে যায় রে, যায় রে কোন চুলোয় রে।

ও যে কোন বাঁকে কোন ধন দেখাবে, কোন খানে কি দায় ঠেকাবে—
কোথায় গিয়ে শেষ মেলে যে, ভেবেই না কুলায় রে॥

ইহার মধ্যেও পল্লীর ভাটিয়ালির বৈশিষ্ট্য যে আনুপূর্বিক রক্ষা পাইয়াছে, তাহা নহে। কারণ, পল্লীর ভাটিয়ালির প্রথম পদটিই যেমন চড়া স্বরের দিকে ধাবিত হইয়া পরবর্তী পদে তাহা তৎক্ষণাৎ খাদে নামিয়া আসে, ইহাতে তাহার পরিবর্তে দ্বিতীয় পদটি চড়া হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বাংলার পল্লী-সঙ্গীতের ভিত্তিটি অবিচল রাখিয়াও ইহার বহিরঙ্গে কারুকার্য করিয়াছেন, ইহার মধ্যেও তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়, সেই জন্যই একজন রবীন্দ্র-সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন, 'ভাটিয়ালি ঢঙের গান তাঁর নেই'। কিন্তু এ'কথা সত্য নহে, পুরাপুরি ভাটিয়ালি তাঁহার না থাকিলেও 'ভাটিয়ালি ঢঙে'র গান তাঁহার আছে। উদ্ধৃত গান দুইটি তাহার প্রমাণ।

সর্ব শেষে ভাটিয়ালি শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করিতে হয়। এই সম্পর্কে কতকগুলি মতই প্রচলিত আছে। ভাটি অঞ্চলের সঙ্গীত বলিয়া ইহার নাম ভাটিয়ালি, ইহাই সাধারণের বিশ্বাস। বাংলা দেশের নিম্নভূমি অর্থাৎ সাধারণতঃ যে সকল অঞ্চল বর্ষায় জলমগ্ন হইয়া যায়, তাহাই ভাটি বলিয়া পরিচিত। এই অর্থে ভাটি বলিতে পূর্ববঙ্গ এবং প্রধানতঃ ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, ঢাকা অঞ্চলই বুঝায়। প্রকৃত পক্ষে ভাটিয়ালি এই অঞ্চলেরই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় লোক-সঙ্গীত। তথাপি ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও যে এই সঙ্গীতের প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

ভাটি বলিতে কেবলমাত্র পূর্ববঙ্গের উপরোক্ত অঞ্চলই যে বুঝায় তাহা নহে, নিম্নবঙ্গ অর্থাৎ খুলনা, বরিশালের দক্ষিণ অংশও বুঝায়। সুন্দরবন অঞ্চলের অরণ্যাকীর্ণ নিম্নভূমিও ভাটি বলিয়াই পরিচিত, সেই অঞ্চলের লৌকিক দেবতা দক্ষিণ রায় ভাটীশ্বর বা আঠার ভাটির অধিপতি বলিয়া উল্লেখ করা হয়। কিন্তু সেই অঞ্চলে যে লোক-সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রধানতঃ ভাটিয়ালি নহে। এই অঞ্চলে পরবর্তী কালে জনবসতি স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া এখনও তাহাতে সুসংহত সমাজ-জীবন গড়িয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। সেই জন্য ইহার লোক-সঙ্গীতও বিশেষ কোন রূপ লাভ করিতে পারে নাই। মুসলমান ধর্ম প্রচারক বা গাজীর গান এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য লোক-সঙ্গীত; কিন্তু তাহা ভাটিয়ালি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহার অরণ্যপ্রকৃতির মধ্যে

ভাটিয়ালির স্বর-বিস্তারের প্রেরণা আসিতে পারে না, কারণ, ইহার মধ্যে বিস্তার ও উদারতা নাই, যাহা আছে তাহা গভীরতা ও রহস্যময়তা, সুতরাং ইহা ভাটিয়ালির জননী হইতে পারে না। অতএব ভাটি শব্দ দ্বারা সাধারণভাবে নিম্ন ভূমি বুঝাইলেও এখানে পূর্ববঙ্গে প্রচলিত বিশেষ প্রকৃতির লোক-সঙ্গীতকেই ভাটিয়ালি বলিয়া উল্লেখ করা হয়, দক্ষিণ বঙ্গে কোথাও ভাটিয়ালির বিশেষ প্রচলন নাই।

এখানে আরও একটি কথা উল্লেখ করিতে পারা যায়, তাহা এই যে, দক্ষিণ বঙ্গের নদ-নদীর প্রকৃতির সঙ্গে পূর্ব বাংলার নদ-নদীর প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। দক্ষিণ বঙ্গের নদ-নদী সর্বদাই জোয়ার-ভাটা দ্বারা আন্দোলিত হইয়া থাকে, জোয়ারের সময়ই হউক, কিংবা ভাটার সময়ই হউক, নদীর মধ্যে তীব্র স্রোতোবেগ সর্বদাই বর্তমান থাকে। ইহা ভাটিয়ালির অনুকূল অবস্থা নহে। একদিকে নদী কিংবা জলাভূমির বিস্তার, আর একদিক দিয়া ইহার অলস মন্থর গতি—এই সহযোগেই ভাটিয়ালির উদ্ভব হইয়া থাকে, এই অবস্থার মধ্য দিয়াই মাঝি কর্মে যথার্থ অবসর লাভ করিতে পারে, এই অবসরের মুহূর্তই ভাটিয়ালির পক্ষে অনুকূল মুহূর্ত। সেইজন্য আবার কেহ কেহ মনে করেন, নদীর ভাটিতে নৌকা ছাড়িয়া দিয়া অলস বৈঠাটি এক হাতে স্থির করিয়া ধরিয়া মাঝি এই গান গাহে বলিয়াই ইহা ভাটিয়ালি বলিয়া পরিচিত। কিন্তু পূর্বেই আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, ভাটিয়ালি কেবল মাঝিরই গান নহে, ইহা গো কিংবা মহিষরক্ষক, রাখাল বা মহিষালের এবং বাউল-বৈরাগীরও গান। সুতরাং পূর্ব বঙ্গের নিম্নভূমি অর্থে ভাটিয়ালি মনে করাই সঙ্গত। পূর্বেই বলিয়াছি, শিল্প-সঙ্গীতের রাগিণী ভাটিয়ারির সঙ্গে লোক-সঙ্গীতের সুর ভাটিয়ালির কোন সম্পর্ক নাই।

উপসংহারে বাউলের সঙ্গে ভাটিয়ালির সম্পর্ক লইয়া কিছু আলোচনা করিতে চাই। বিশেষ এক সাধন ভজনের প্রণালীর নাম বাউল, ইহার সাধক-সম্প্রদায়কে বাউল সম্প্রদায় এবং সাধন ভজন সূত্রে ইহা যে সঙ্গীতের অনুশীলন করিয়া থাকে, তাহাকে বাউল গান বলে। বাউল গান বাংলার কোন বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, অর্থাৎ বাউল আঞ্চলিক সঙ্গীত নহে, পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন স্থানে বাউল সম্প্রদায়ের আখ্ড়া আছে। বাংলার এই বিভিন্ন অঞ্চল জুড়িয়া গীত বাউল সম্প্রদায়ের গানের বিশেষ কোন

একটি নিজস্ব সুনির্দিষ্ট সুর নাই। প্রত্যেক অঞ্চলের বাউল গানে আঞ্চলিক লোক-সঙ্গীতের সুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যেমন পূর্ববঙ্গ ও উত্তর বঙ্গের বাউল গানে প্রধানতঃ ভাটিয়ালি ও সারি এবং পশ্চিম বঙ্গের বাউল গানে প্রধানতঃ ঝুমুর ও কীর্তন গানের সুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং 'বাউল সুর' বলিয়া কিছু নাই। এখানে আরও একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, বাউল গানের সঙ্গে নৃত্যের সম্পর্ক আছে, সুতরাং যে সুর নৃত্যের সহচর হইবার যোগ্য, প্রধানতঃ সেই সুরই বাউল গানে ব্যবহৃত হয়। অতএব ইহা সারি শ্রেণীর গানের পক্ষে উপযোগী, কিন্তু তথাপি পূর্ব বঙ্গে ভাটিয়ালির প্রভাব বশতঃ কিছু কিছু ভাটিয়ালিও ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ভাটিয়ালির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার মধ্য দিয়া জীবনের সুগভীর তত্ত্বকথা অতি সহজে প্রকাশ পাইতে পারে, সেই সূত্রেই বাউল, দেহতত্ত্ব, মুর্শিদ্যা, মারফতী ও নানা বৈরাগ্য-মূলক সঙ্গীত ভাটিয়ালি আশ্রয় করিয়াই বিকাশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু যেখানে নৃত্য অপরিহার্য, সেখানে সারি শ্রেণীর গান ব্যতীত ভাটিয়ালি ব্যবহৃত হইতে পারে না। একজন রবীন্দ্র-সঙ্গীত বিশেষজ্ঞের কথা একবার পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। তিনি অন্যত্রও বলিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ 'বাউল সুর নিয়ে প্রথম ব্যাপক ভাবে গান রচনা সুরু করেন বাঙলায় স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ১৩১২ সনে, তাঁর ৪৪ বৎসর বয়সে। এ ছাড়া সারি গানের সুরও তিনি ব্যবহার করেছিলেন এ'যুগেই।' 'সারিগানের সুর' বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু 'বাউল সুর' কি জিনিষ, তাহা বোধগম্য হয় না। পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, বাউলের নিজস্ব গানের সুর কিছু নাই, বিভিন্ন আঞ্চলিক লোক-গীতির সুর বাউল গানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথও স্বদেশী আন্দোলনের যুগে পল্লী-সঙ্গীতের সুরে যে সকল গান রচনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে যেমন ভাটিয়ালি ঢঙের গান আছে, তেমনই সারি শ্রেণীর গানও আছে। পূর্ব-বাংলার বাউল গানে এই দুইটি সুরই ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহারা 'বাউল সুর' বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। কিন্তু কীর্তনের মত বাউলের একটি নিজস্ব সুর বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে বিকাশ লাভ করিয়া সমস্ত বাংলাদেশের বাউল গানের কোন সুনির্দিষ্ট এবং আদর্শ গীত-রীতি রূপে গৃহীত হয় নাই। সুতরাং বাউল গান থাকিলেও 'বাউল সুর' বলিয়া নির্দিষ্ট কিছু নাই। উক্ত রবীন্দ্র-সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ রবীন্দ্রনাথের বাউল সুরে'র

নিদর্শনরূপে তাঁহার রচিত 'ক্ষেপা তুই আছিস আপন খেয়াল ধ'রে' ও 'তোমরা সবাই ভালো'—এই গান দুইটির উল্লেখ করিয়াছেন ; বলা বাহুল্য প্রথমটি অর্থাৎ 'খ্যাপা তুই আছিস আপন খেয়াল ধ'রে' ভাটিয়ালি ঢঙের গান এবং দ্বিতীয়টি অর্থাৎ 'ওগো তোমরা সবাই ভালো' মিশ্র ঢঙের সুরে রচিত। তারপর স্বদেশী আন্দোলনের যুগে রচিত রবীন্দ্রনাথের বহু দেশাত্মবোধক সঙ্গীতই একদিকে যেমন ভাটিয়ালির ঢঙে রচিত হইয়াছে, তেমনই অন্যদিক দিয়া সারি শ্রেণীর সুরে রচিত হইয়াছে, কোথাও ইহার ব্যতিক্রম নাই। ইহাদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট ভাবে 'বাউল সুর' বলিতে কিছু নাই। ভাটিয়ালি এবং সারিরই বিশেষ ঢঙ্ রবীন্দ্রনাথ রচিত তথাকথিত 'বাউল সুরে'র মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে।

এইখানে একটি কথা বিশেষ ভাবে স্মরণযোগ্য, তাহা এই যে, সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, শাস্ত্রীয়-সঙ্গীতই হউক, কিংবা লোক-সঙ্গীতই হউক কাহারও নিখুঁত স্বরলিপি করা সম্ভব নহে। মাত্রা ও তালহীন ভাটিয়ালির যে গীত-রীতির কথা উপরে উল্লেখ করিলাম, তাহারও নিখুঁত রূপটি কোন স্বরলিপির মধ্য দিয়াই প্রকাশ পাইতে পারে না। অথচ কোন বিষয়কে অনুশীলন করিতে হইলে ইহার কতকগুলি সাধারণ নিয়মেরও সন্ধান করিবার আবশ্যক হয়। সেইজন্য ভাটিয়ালি গানের যে স্বরলিপি রচনা করা হয়, তাহা কেবল মাত্র নাগবিক সমাজেব এই বিষয়ক অনুশীলনের কতকটা সুবিধা দিবার জন্যই করা হয়, পল্লীর ভাটিয়ালিব নিখুঁত রূপটি সর্বত্রই ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে মাত্রা ও তাল রক্ষা করিয়া তাঁহার ভাটিয়ালি ঢঙের গান রচনা করিয়াছেন, সেই প্রকার মাত্রা ও তালের উপর ভিত্তি করিয়া স্বরলিপি বচনাব যে একটি নির্দিষ্ট প্রণালী আছে, তাহা কোথাও পরিত্যাগ করিবার কোন উপায় নাই। সুতবাং যে সহবে ভাটিয়ালির কথা উল্লেখ করিয়াছি, স্বরলিপিব ভিতর দিয়া পল্লীর ভাটিয়ালির কতকটা সেই রূপই প্রকাশ পাইয়াছে। লোক-সঙ্গীতকে নাগরিক উপায়ে শিক্ষণীয় বিষয় করিবার জন্যই ইহার সম্পর্কে নাগরিক পদ্ধতি অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নাই। কাবণ, পল্লী-সঙ্গীত পল্লীতে শিক্ষণীয় বিষয় ছিল না, সহজাত শক্তি দ্বারাই তাহা লাভ করা হইত, সহরে আসিয়া তাহা শিক্ষণীয় বিষয় হইয়াছে বলিয়াই শিক্ষার সুনির্দিষ্ট প্রণালীটিও ইহার উপরে অনিবার্য রূপে আরোপ করিবার আবশ্যক হয়।

বিষয়ের দিক হইতে ভাটিয়ালি গানকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়; যেমন, প্রথমতঃ লৌকিক প্রেমমূলক, দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণপ্রেমমূলক এবং তৃতীয়তঃ বৈরাগ্যমূলক। ইহাদের কিছু কিছু নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত হইল। প্রথমই লৌকিক প্রেমমূলক সঙ্গীতগুলির উল্লেখ করা যাইতেছে—

১

পাখী তোমার পায়ে ধরি মিনতি গো করি,
আর আমায় জ্বালাইও না—আমার মাথা খাও।
জ্বালাইও না—'বউ কথা কও' বলে গো ডাইকো না।
পাখী ডাকে সন্ধ্যাকালে, আমি সন্ধ্যা দিতে যাইগো ভুলে;
যদি ডাক নিশি কালে, আমি কাইন্দা ভিজাই বিছানা। —ঢাকা

জান তরে মৈষে মার্‌বো।
মৈষান মৈষান বলি রে আমি—
মৈষান কাঁচা সোনা, বন্দের থনে আইলা মইষ্,
বাড়ীত্ বাইন্দা থুইও রে।
আরে আমার বাড়ী যাইওরে মৈষান, বস্‌তে দিমু রে পীড়ি,
আরে জলপান করিতে দিমু রে মৈষান,শাইল ধানের মুড়ি রে।
শাইল ধানের মুড়ি না রে মৈষান, বিন্নি ধানের রে খই,—
আরে পেট্ মোটা সবরি কলা রে মৈষান, গামছাবান্দা দইও রে। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে বাঐ অর্থাৎ বাবুই পাখীকে লক্ষ্য করা হইয়াছে—

৩

ও বাঐ রে, ওরে ঝাঁকে ওড ঝাঁকে রে পড তারে বল সাড়া,
কইও মোর বঁধুয়ার আগে বাঐ, পিরীতি জানমারা, রে বাঐ—
কি জঞ্জাল করলি বনের বাঐ রে।
ওরে বাঐ রে, ওরে নলের আগে নল ফুল, ও ফুল বাঐ, বাঁশের আগে টিয়া,
কইও মোর বঁধুয়ার আগে বাঐ, না যেন করে বিয়া রে বাঐ,
কি জঞ্জাল করলি বনের বাঐ রে। —ঐ

ও বাঐ রে, ওরে যখনে করিলাম প্রেম, বাঐ, তুমি আমি জানি,
ওরে এখন কেন সে সব কথা, বাঐ, লোকের মুখে শুনি রে—
কি জঞ্জাল করলি বনের বাঐ রে।
ও বাঐ রে, যখনে করিলাম প্রেম, বাঐ, শানবাঁধা ঘাটে,
ঐ যে আকাশের চন্দ্র যেমুন তুইলা দিলা হাতে, রে বাঐ—
কি জঞ্জাল করলি বনের বাঐ রে।
ও বাঐ রে, হায় রে, ওপারে বুনিলাম ধান বাঐ, টিয়ায় কাইটা খাইল।
ঐ যে কইও মোর বঁধুয়ার আগে যৌবন বইয়া গেল রে,
কি জঞ্জাল করলি বনের বাঐ রে।
ও বাঐ রে, ওপারে কদমের গাছ, বাঐ, বায়ে হালে আগা,
ওরে শিশুকালে কইরা প্রেম, বাঐ, যৌবন কালে দাগা,
কি জঞ্জাল করলি বনের বাঐ রে। —ঐ

বাবুই পক্ষী এখানে প্রেমিকের রূপক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৪

একদিন দেইখাছি যারে, তারে ভোলন না যায় গো।
সবাই বলে মেঘ মেঘ, মেঘ নয় গো আভা,
তোমরা নি দেইখাছ সই, মেঘের আড়ে জবা গো।
একদিন দেইখাছি যারে তারে ভোলন না যায় গো॥
চরণে নূপুর বাজে, হাতে মোহন বাঁশী,
(অ) তার গলে শোভে বনমালা, মুখে মৃদু হাসি গো।
চূড়ায়ে ময়ূরের পাখা করে ঝিকিমিকি,
তারে মনে বলে প্রাণ সই, একবার দেখে আসি গো॥
একদিন দেইখাছি যারে, তারে ভোলন না যায় গো।
পীরিতি পীরিতি যতন, পীরিতি গলার হার গো,
এমন পীরিতি যে জন করে, সফল জনম তার গো॥
একদিন দেইখাছি যারে, তারে ভোলন না যায় গো।
আমার নয়ন নিল কালরূপে, মন নিল বাঁশী গো।
যারে শুইলে স্বপনে দেখি জাগিয়া না দেখি গো॥
একদিন দেইখাছি যারে, তারে ভোলন না যায় গো॥ —ঐ

জাউলার মাথায় জালের বোঝা গো, আমার মাথায় গো ডালি
কেমনে যাইব আমি গো, হলক জাউলার বাড়ী ?
আমার নসিবে ছিল।
বাইট্‌কামারি হলক জাউলা রে, বোয়ালমারি রে নাও।
তোমরানি দেইখাছ বে আমাব হলক জাউলার নাও ॥
আমার নসিবে ছিল।
সাত ভাইএব বইন্ আমি বে পরমা সুন্দরী,
বড বউয়ে দিল ডালি বে আমার জালুয়া ভাতাবী।
আমাব নসিবে ছিল।
ফুল তুলিতে গেলাম আমি গো ফুল বাগিচার মাঝে।
সেখানে টলিল নসিব রে হলক জাউলার সাথে ॥
আমার নসিবে ছিল। —ঐ

৬

মন না জেনে দিস্‌না নয়ন করি গো মানা।
নয়ন দিলে যাবে জন্মেব মতন গো,আব ত তারে পাবি না ॥
তোরা নয়ন দে গিয়ে তাবে,
জান্‌তে পার্‌বি দুই দিন পবে, কেমন ঘটনা,
শেষে ঘরের বাহির হতে হবে গো, তবু তাবে পাবি না ॥
নেওয়ার বেলা কত সন্ধি
নিয়ে করে কপাট বন্ধি,—কেমন ঘটনা,
ওর মত ভুলাইনে সন্ধি গো, জগতে কেউ জানে না ॥
প্রেম করিলে প্রাণ সজনী,
আগে লও তার মরম জানি, নইলে হবে না,
না জানিয়ে প্রেম করিলে গো, শেষে হবে যন্ত্রণা।
রাধায় বলে প্রাণ সজনী,
সে যে মনোচোরার শিরোমণি,—ভাবে যায় জানা,
দেখ্‌তে ভাল, কথায় ভাল গো,
ও তায় স্বভাব কিন্তু ভাল না ॥ —ঐ

৭

আমার মনের মানুষ, প্রাণ সই গো, পাই গো কোথা গেলে।
আমি যাব সেই দেশে যে দেশে মানুষ মিলে ॥
যদি মনের মানুষ পেতেম,
তারে হৃদ-মাঝারে বসাইতেম, অতি যতন কইরে ;
আমি মনসূতে মালা গেথে দিতেম তাহার গলে ॥
ভেবেছিলাম মনে মনে,
সে যাবে না আমায় ছেড়ে, তারে আপন বইলে,
সে যে ফাঁকি দিয়ে গেল চলে,
এই কি ছিল মোর কপালে ॥ —ঐ

৮

আমা দিয়ে হবে না নাগর, ঠিক ধরিয়ে বসেছি।
ভাব না জেনে ভাবে মজে, হুজুকেতে মজেছি ॥
প্রেমের বাজার দেখ্‌তে ভাল
আমার ভাগ্যে না হইল,
কত এল কত গেল, ব'সে ব'সে দেখ্‌তেছি ॥
বড কইরে ছিলাম আশা,
পুরাইব মনের আশা,
যেমন তাল গাছে বাবুইর বাসা, মেঘের জলে ভিজতেছি ॥
বামন হইয়ে চান ধরা,
আমার তেম্নি প্রেম করা,
মৃগী যেমন তৃষ্ণাতুরা মরুভূমে ঘুর্‌তেছি। —ঐ

অরে অ নাগর অবলার দেশে বরিষা রৈয়া যাওরে।
আইল বরিষা ছৈলানি বাইরে পেকচালা ভাঙ্গিয়া আইলা নাটুয়া গাবর রে।
আইল বরিষা কদম্বের মূলে, কদম্বের রেণু খাইয়ে ভোম্‌রায় গুঞ্জরে রে।
আইল বরিষা খাবুর আর খুবুর করে, ঘরে রান্ধিয়া অন্ন কৈ খাইবা বইসা রে।
বরিষা ছয় মাস না যাইও দূরে কাটারি কাটিয়া ফেলমু মুই নারী তোমারে রে।

মায় ত জিজ্ঞাসা করে অবলা গ ঝি, বৈদেশী নাগরের সঙ্গে তোর সম্বন্ধ কি।
বৈদেশী না হয়, মা গ, মোর গলার হার, স্বদেশী কাটিয়া দিমু বৈদেশীর পায়।
পঙ্ক্ষগাভীর দুধ খায়, অ ননদিনী গ, কডার বল নাই তোর ভাইয়ের গায়।
হেলিয়া দুলিয়া পড়ে যেমন গৌড়ের সুক্ষি বেত, হায় গ রসের ননদিনী।

—ঐ

এইবার কৃষ্ণপ্রেম-মূলক ভাটিয়ালি গান কয়েকটি উদ্ধৃত করা যাইতেছে। লৌকিক প্রেমের স্তর হইতেই এখানে কৃষ্ণপ্রেম আসিয়াছে। এখানেও রাধা এবং কৃষ্ণ লৌকিক চরিত্র, তবে একটি নির্দিষ্ট ধারা সঙ্গীতের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই নির্দিষ্ট ধারাটি রাধা-কৃষ্ণলীলা অনুসারী এইমাত্র—

১০

দুষ্‌খু কইওরে—
নিঠুরের কাছে, সই, দুষ্‌খু কইওরে।
সইগো সই, যেই কালে পীরিতি করলাম যমুনার ঘাটে,—
ছাড়ুম না, ছাড়ুম না বইলা হাত দিল মাথে রে।
সই গো সই, যখন গো পীরিতি করলাম তুমি আমি জানি।
এখন কেন সে সব কথা লোকের মুখে শুনি রে।
সই গো সই, বট বিরিখের তলে গেলাম ছেওয়া পাইবার আশে।
পাতা ভেইদা রৌদ্ গো লাগে আপন করম দোষে রে। —ঐ

১১

এই না কালরূপ আমার লাগিল নয়নে গো—
কলঙ্ক রইল্ জলে।
ভরা না দুইফরের কালে জল ভরিবার যাই,
জলের ছায়ায় কৃষ্ণরূপ গো—যেমুন দেখিবারে পাই গো,
কলঙ্ক রইল্ জলে।
সব সখী লাল গো নিল গউর্ বরণ শাড়ি,
শ্রীরাধার পৈরনে শোভে গো কৃষ্ণ নীলাম্বরী গো—
কলঙ্ক রইল জলে। —ঐ

১২

দাদা, জিজ্ঞাসিয়ে দেখ চাই
কার রমণী কাল জলে যায়,
ধীরে ধীরে যায় গো রাধে হীরার কলসী কান্ধে,
মাঞ্জা চিকন হেইলে দুইলে যায়।
আগে পাছে পঞ্চদাসী, মধ্যে রাধা রাই রূপসী,
চন্দ্রবদন কেমন দেখা যায়। —ঐ

১৩

আমি কি হেরিলাম জলে গো নবীন কালিয়া রূপ,
কি হেরিলাম, কি হেরিলাম, কি হেরিলাম গো॥
কালা ভঙ্গী কর‍্যা দাঁড়াইয়াছে চণ্ডা তমাল তলে,
কালা যার পানে চায় তারে মারে যুগল নয়নে গো।
কেহই বলে মেঘই মেঘই, কেহই বলে কালা,
তোমরা নি দেখ্যাছ, সই, মেঘের গলায় মালা গো॥
যদি কালা মেঘ হইত যাই ত রে ঝরিয়া,
তবে কেমনে দেখিতাম রূপ কদম্ব হেরাইয়া গো॥ —ঐ

১৪

প্রাণের সুবল রে,—
আরে কার কামিনী জলে যায়।
সোনার নূপুর বাঙা পায়
রুনু ঝুনু বাদ্য শুনা যায়,
হাউল্‌কা মাজা পবনে হেলায়।
উল্টা খোঁপায় বান্ধা চুল,
খোঁপায় শোভে নানান জাতি ফুল,
ওরে মধুর লোভে ভ্রমর আসে যায়
দুই সখী জলেতে যায়,
আরেক সখী হেইলা পড়ে গায়,
ওরে অনুভবে বুঝি রাধা যায়। —ঐ

১৫

ওগো উন্মাদিনী রাই,
প্রেমডোরে বাঁধব তোরে, কাইল সকালে যদি লাগুর পাই।
কি ক্ষেণে জল ভরতে গো আইলা এত সকালে,
রূপ দেখিয়ে ভুইলে গো রইলাম, দিলে না মানে।
সজনী তোর হাতে গো ধরি শোন বলি তোরে,
এনে দেও মোর প্রাণের গো প্রিয়া মরণের কালে। —ঐ

১৬

ও সুবল রে, গুণের ভাই রে সুবল,
আমায় শীঘ্র এনে দেখা, রে সুবল, ব্রজেশ্বরী রাধা।
হস্ত দিয়ে দেখ্ রে সুবল আমার হৃদযে,
বিনা কাষ্ঠে জল্‌ছে আনল আমার অন্তরে। —ঐ

১৭

জলে ঢেউ দিও না গো সখী—
আমি কাল রূপ—ও রূপ নিরখি।
ওগো ঢেউ দিও না, ঢেউ দিও না
(দিলে) তোমরা হবে পাতকী।
ঐ কদম ডালে বইসে কৃষ্ণ
বাঁশী বাজায় বেইল ভাটি।
ওগো বাঁশীর স্বরে পরাণ গো হরে,
ঘরে ফিরে যাব কি। —ঐ

১৮

ও পার বইসা বাজাও বাঁশী
এই পার বইসা শুনি,
হায় রে, আমি ত অবলা নারী—
সাঁতার নাহি জানি রে।
বাঁশী বাজান জান না।
ওরে, অসময়ে বাজাও বাঁশী—
কালা মন ত মানে না রে।

যখন আমি বইসারে থাকি গুরুজনার মাঝে,
ওরে নাম ধরিয়া বাজে রে বাঁশী,
শুইনা মরি লাজে রে।
ওরে রন্ধনশালাতে বইসা—যখন আমি রান্ধি,—
ওরে ভিজা কাষ্ঠ চুলায় রে দিয়া—
ধূঁয়ার ছলে কান্দি রে।
ওপার বইসা বাজাও বাঁশী—
এই পার বইসা শুনি ,
হা রে আমি ত অবলা নারী—
সাঁতার নাহি জানি রে।
সেই না ঝাড়ের বাঁশী রে তোমার লাগুর যদি পাই—
ওরে ঝাড়ে মূলে উপাড়িয়া--সায়রে ভাসাই রে। —ঐ

১৯

আমি বিকাইলাম, গো রাই কমলিনী, রাধে তোমার চরণে।
ওগো তোমার প্রেমের খাতক হয়ে গো, আমি বেড়াই বনে বনে।
আপন হাতে কর্জ পত্র
আমি লেইখে দিলেম মনের মত,
মহাজন বানাইলাম গো রাধা তোমারে।
ওগো তোমার প্রেমে ঋণী গো হয়ে
(ওগো, ও রাই কমলিনী)
আমি বেড়াই গহন কাননে ॥
লেখে দিলাম দাসখত—
এ দেহ জনমের মত,
ধড়া চূড়া দিলাম গো, রাধে, তোমারে
আমি আর কিছু ধন চাই না গো রাধে
(ওগো ও রাই কমলিনী)
আমায় রেইখো রাঙ্গা চরণে।

যখন আমি গোচারণে যাই,
কদম তলায় বাঁশিটি বাজাই,
বাঁশীর স্বরে ডাকি গো, রাধে, তোমারে।
তুমি বাহির হও গো ওগো রাধে,
(ওগো ও রাই কমলিনী)
তোমায় দেখি দু'নয়নে। —ঐ

২০

প্রাণের হরি বিনে, হরি বিনে মরি প্রাণে,
আমি ধৈর্য ধরে রই কেমনে গো।
ওগো কাইল আসিবে বইলে হরি,
গেছে অক্রূরের রথে চড়ি গো,
বুঝি হরি আসিবে প্রাণ অন্তে,
যদি প্রাণ থাকিতে (ওগো ওগো প্রাণ সখী গো)
না পাই দেখা, তবে আমার কি কাজ আছে জীবন রাখায় গো।
—ঢাকা

২১

ও প্রাণকৃষ্ণ বিনে, সখী, আমি মলেম প্রাণে,
ও কিসে ধৈরজিয়ে রব ঘরে গো।
কাইল ব'লে গিয়াছেন হরি, অক্রূরের রথে চড়ি গো
আইজ কাইল হইতে দুই দিন গণি,
আমার ছেইড়ে গেছে মধুপুরী গো।
আমার অন্তিম কালে, তোরা সব সখী মিলে গো,
নিও ঐ যমুনার তীরে (প্রাণ থাকিতে থাকিতে)
কৃষ্ণ নামটি সুধাইও কর্ণমূলে,
ওগো তোমরা সবে বল, হরি হরি,
ওগো আমি প্রাণে মরি গো। —ঐ

এইবার কয়েকটি বৈরাগ্যমূলক ভাটিয়ালি গান শুনিতে পাওয়া যাইবে। ইহারা প্রধানতঃ অধ্যাত্মবিষয়ক, তবে নিগূঢ় তত্ত্বকথা তাহাতে কিছু নাই।

অনেক সময় রূপকের ব্যবহার আছে এই মাত্র। বাউল, মুর্শিদ্যা, মারফতি, গুরুবাদী, দেহতত্ত্বমূলক ইত্যাদি গানই ইহার অন্তর্ভুক্ত। নিম্নোদ্ধৃত প্রথম গানটি বাউল—

২৩

আমি আপিল করি, ও সাঁই,
শ্রীগুরুর আপিসে,
ভক্তি-প্রেমরসে।
ও সাঁইও, ছয় জন দুরাচার
হইয়া অতি জোরদার
নয়নধারা মতে দখল নিলে।
ভব-নদীর খরচ নাই
ওহে গুরু, চির-গোঁসাই
আমার দিকে দয়া নাহি কৈলে।
তব ধর্ম আদালত
সদা করি দণ্ডবৎ
(আমার) স্বত্ব গেল তামাদির দোষে। —ত্রিপুরা

২৩

মন পাগলারে, হর্দম গুরুজির নাম লইয়ো।
(ওরে) দিবানিশি লইও নাম, কামাই নাহি দিয়ো॥ (আমার মন)
ভাই বল, বন্ধু বলবে, সব সম্পদের সাথী,
অসময়ে নিদানকালে গুরুর নাম সারথী। (রে মন)
টাকা বল, কড়ি বলবে, সব পুরাণ হয়ে যায়,
আমার গুরুজির নাম সদা নূতন রয় (রে মন পাগ্‌লা)
—মৈমনসিংহ

২৪

ওরে দয়াল আমার গুরুধন রে,
সাধনা না জানিরে গুরুধন, ভজন না জানিরে,
(দয়াল আমার গুরুধন রে)

(আরে) যেখানে সেখানে রে থাক আসিয়ো সকালে,
(আর) তুমি গুরু আমি রে শিষ্য জানে সর্বলোকে,
(ওরে) আর কি আসিবারে গুরুধন বাজার ভাইঙ্গা গেলে হে ॥
(দয়াল, আমার গুরুধন রে)
ওরে সোঁতের শেয়ালা হয়ে ফিরি ঘাটে ঘাটে ,
আর এমন বান্ধব নাই যে ডাকিয়া জিজ্ঞাসে হে ॥ —ঐ

২৫

হিসাব করে দেখলি না মন এই বয়সে কি লাভ কৈলে।
ছিলাম যখন মাতৃকোলে,
গেলরে মন ধূলায় খেলে,
মায়া-রসে ডুবে রইলে কাল কাটালে অজ্ঞান ছলে।
আসল যখন সুখের যৌবন লাভ হবারই কথা রইলে ;
কামরসে কামিনীর কোলে রঙ্গে রঙ্গে কাল কাটালে ;
আস্‌ল যখন বৃদ্ধাবস্থা সাধন ভজন সবই গেলে,
ভক্তিস্তুতি দূরে থাকুক উঠতে বসতে অক্ষম হইলে।
কত আশা করেছিলাম তিন কাল গেল বৃথা চ'লে,
কেবলমাত্র আছে ভরসা গফুর আমার দয়াল বলে। —ত্রিপুরা

২৬

(আমার) সোনার তনু দংশিয়াছে পাপজ বিষে, সারিব কিসে ?
কত বৈদ্য বিচারিলাম কেহই না পাইল গো দিশে,
ওহে গুরু, কল্পতরু কোথা গিয়ে রইলে বৈসে। —ঐ

২৭

ওরে দয়াল, তোমায় ডাইকা সামাল না পাই কূল রে ;
ওরে দয়াল, আমার কাণ্ডারী হইও রে।
ওরে তোমার নামের গুণেরে দয়াল,—
দয়াল আমার কাণ্ডারী হইও রে।
তোমার বালক রে দয়াল,
ডাইকা সামাল না পায় কূল রে ,
তোমার নামের গুণে রে দয়াল ফিরিয়া ত লইও রে।

তোমার আসন, তোমার বসন রে দয়াল,
সানাল ফিরিয়া ত লইও রে।
ওরে দয়াল আমার কাণ্ডারী হইও রে।
আগে যদি জানতাম রে ভাই, মাঝির এতই চোট্,
ওরে তবে কি বে দিতাম যা'গা তেমাল্লার ওপর—
আবে মাঝি বাইয়া যাওরে।
মাঝি বাইয়া যাওরে—এলাহ্ দরিয়ার মাঝে।
আমা'র ভাঙ্গা নাও,
আরে মাঝি বাইয়া যাও রে॥ —ঢাকা

২৮

আগের নাইয়া বড ভাল,
ভাটা ছাইয়া উজান ধর—পডবি না ঘোলায়,
আরে প্রেমনদীর কূলে বইসে, তুমি শরীল জুডাও প্রেম বাতাসে,
আরে ভাটাও গেল, জোয়াবও গেল, কোন সন্ধানে যাইবা রে তুমি।
গুরুগোঁসাই কোনরঙ্গে আমাব বেঁধেছে ঘরখানি—
বান্দে বান্দে যোডা,
মহাজনের মাল ভবিয়ে প্রেম নদীতে বইসে আছ বে তুমি। —ঐ

২৯

ওগো প্রাণ সই, এ বার সাধনের ঘরের কূল পাইলাম না।
আরে ভেক দিলা কেবল গুরু, সাজ দিলা না।
কত নৌকা আসে যায়, কত নৌকা মাবা যায়
গো প্রাণ সই, কেহব উনা, কেহব দুনা,
আসলে কেউ বোঝে না॥
কঠিন পাইকা বুলি কয়, যাহাব মনে যাহা লয়
গো প্রাণ সই, রাধার মাধব রাধার কেশব,
আসলে কেউ বোঝে না॥ —ঐ

৩০

ডুবল রে তোর মানবতরী ভবসাগরের পাকে প'ড়ে।
আরে এমন বান্ধব কেবা আছে, কে তুলিবে কেশে ধরে।

এসেছে মন ভবের বাজারে,
কুসুঙ্গাসুরায় (অসুরে) লাগুর পেইলে সব নিবে কেড়ে ;
কি দোষ দিব বিধাতারে সকলই কপালে করে।
মানবতরীর মাল্লা ছয় জনা,
ছয় জনা ছয় দিকে টানে, কেউ ত শোনে না ,
গুণ ছিঁড়িয়া সব পলাইল আমি একা রইলাম পড়ে।
ভবনদীর তুফান যে ভারি,
যে দিকে চাই সেই দিকে নাই কাণ্ডারী ,
গুরু বিনে এই নিদানে কে নিবে আর ভব পারে। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটি গৌরাঙ্গ-বন্দনা, তবে গৌরাঙ্গের সঙ্গে বৈরাগ্যের সম্পর্ক আছে বলিয়া ইহার সুর ভাটিয়ালি—

৩১

ও গউর চাঁদ, তোরা দেখ, আইসে গো চাঁদ
নদে উদয় হইয়াছে।
চাঁদের মালা চাঁদ গাথনি কে গাইথা দিল
(সজনী লো এমন রূপ আর জনম ভরে দেখি নাই গো)
হাতে চাঁদ, কপালে চাঁদ
চাঁদে চাঁদে আলয় কইরাছে।
লেগেছে এক চাঁদের বাজার তাকি জান না,
ওর তার পাদপদ্মে কোটি চাঁদ করে সাধনা,
ওগে ব্রহ্মার বাঞ্ছিত যে চাঁদ
চাদে চাঁদে মিশা গিয়াছে।
—ঐ

ভাওয়াইয়া গানের যেমন চটকা নামে একটি অধঃপতিত রূপের সৃষ্টি হইয়াছে, ভাটিয়ালির তাহা হয় নাই। ইহার কোন অধঃপতিত (degenarated) রূপ নাই। ইহার মধ্যে যদি কোন তাল থাকিত, তা হইলে সেই ছিদ্রপথে ইহার অধঃপতিত রূপের বীজ প্রবেশ করিতে পারিত। ইহার তাহা নাই বলিয়াই ইহা অবিকৃত রহিয়াছে।

চৌদ্দ

ঘাটু গান

বাংলা দেশের প্রায় সর্বত্রই বালিকাবেশী বালকের নৃত্য সম্বলিত গীত প্রচলিত আছে। পুর্বে ইহা বালিকারই নৃত্যগীত ছিল, শিক্ষার প্রভাবে অনেক ক্ষেত্রেই তাহার প্রচলন দূর হইয়া তাহার পরিবর্তে বালিকার বেশ ধারণ করিয়া বালকের নৃত্য প্রবর্তিত হইয়াছে। উড়িষ্যার গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত নাটুপীলার নাচ ইহারই অনুরূপ। বিহার ও পশ্চিম সীমান্ত বাংলার নাচ্‌নী নাচের মধ্যে কেবল মাত্র এখনও বালিকা বা যুবতীরাই নৃত্যগীত করিয়া থাকে।

পূর্ব বাংলা বিশেষতঃ মৈমনসিংহ জিলার পূর্বাঞ্চল, ত্রিপুরা জিলার উত্তরাঞ্চল এবং শ্রীহট্ট জিলার পশ্চিমাঞ্চলে এক শ্রেণীর গীত প্রচলিত আছে, তাহা একটি বালিকাবেশী বালককে কেন্দ্র করিয়াই সাধারণতঃ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাই ঘাটু গান নামে পরিচিত। পশ্চিম সীমান্ত বাংলার নাচ্‌নীর সঙ্গে ইহার কতকগুলি বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও মৌলিক উদ্দেশ্যের দিক দিয়া যে কোন পার্থক্য নাই, তাহা সত্য। নাচ্‌নী নাচে নাচনী ব্যতীত একজন মাত্র পুরুষ গায়ক থাকে, তাহাকে রসিক বলে। ইহার কোন দোহার থাকে না। সুতরাং ইহা প্রধানতঃ একক সঙ্গীত। কিন্তু পূর্ব বাংলার ঘাটু গানের দুইটি অংশ—একটিতে ঘাটু বালক নৃত্যসহযোগে একক সঙ্গীত পরিবেষণ করিলেও, ইহার আর একটি যে অংশ আছে, তাহাতে প্রায় সমবেত সমগ্র জনতাই সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। লোক-সঙ্গীতের প্রধান একটি লক্ষণ এইভাবে ইহার মধ্য দিয়া সার্থকভাবে প্রকাশ পায়। উভয় ক্ষেত্রেই অর্থাৎ নাচ্‌নীর গানেও যেমন, ঘাটু গানেরও তেমনই, বিষয়বস্তু এক এবং অভিন্ন, অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ। তবে ঘাটুগানে কেবল মাত্র বিচ্ছেদ ও নৈরাশ্যের কথা যেমন প্রাধান্য লাভ করে, নাচনীর গানে তাহার পরিবর্তে প্রেমের নানা দিকই উপজীব্য হইয়া থাকে, কেবল মাত্র বিরহই তাহার লক্ষ্য থাকে না।

ঘাটু শব্দটির উদ্ভবের ইতিহাস খুব স্পষ্ট নহে। বর্ষাকালে নৌকার পাটাতনের উপরই প্রধানতঃ ঘাটু গানের আসর বসে; তারপর ঘাটে ঘাটে ঘুরিয়া এই গান গাওয়া হয় বলিয়া কেহ ইহাকে ঘাটু গান বলিতে চাহেন। ইহাকে প্রধানতঃ একদিক দিয়া ঘাটের গান বলা যায়, তাহা হইতেও ইহা ঘাটু গান বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকিতে পারে। ঘাটের গান শব্দের

অর্থ এই যে, এই গানের ক্ষেত্র প্রধানতঃ যমুনার ঘাট ; নদীমাতৃক পূর্ববাংলার নদীর ঘাটের ছবিই ইহার প্রধান অবলম্বন। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া যমুনার ঘাটে জল লইবার জন্য গিয়াছেন, সেখানে কদম্ব শাখা হইতে যমুনার জলে তাহার ছায়ামূর্তি প্রতিবিম্বিত হইতেছে, অপলক দৃষ্টিতে সে দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহাৰ কলসী কখন স্রোতের জলে ভাসিয়া গিয়াছে, ইহাই সাধারণতঃ ঘাটু গানেৰ বিষয় ; সেইজন্য ইহাকে ঘাটের গান হিসাবে ঘাটু গান বলিয়া উল্লেখ করা হইতে পারে।

কেহ মনে করেন, শব্দটিব উচ্চারণ গাঁডু এবং গুজরাটি গাণ্টু শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। আবার কেহ মনে করেন, গানের সঙ্গে ঘাট শব্দ যুক্ত হইয়া ঘাটু হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌছিতে পারা যাইতেছে না।

বিশেষ এই অঞ্চলেই এই শ্রেণীর গান উৎপত্তি ও বিকাশ লাভ করিবার কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, এই অঞ্চলে যে কোন কারণেই হোক, মধ্যযুগ হইতেই বৈষ্ণব ধর্মের বিশেষ প্রভাব স্থাপিত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ বিথলঙ্গের আখডা, কিশোরগঞ্জের শ্যামসুন্দরের আখড়া, বাজিতপুরের হরিবোলের আখডা, আচমিতার গোপীনাথেব আখডা এই অঞ্চলেই অবস্থিত। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকেই শ্রীচৈতন্যদেব পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ করিতে আসিয়া এই অঞ্চলেরই মঠখলা গ্রামে যে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আছে। সেইজন্য চৈতন্যদেবেব জীবন ও আদর্শ দ্বারা এই অঞ্চলের সমাজ তখন হইতেই বিশেষভাবে প্রভাবিত হইতে আবম্ভ করিয়াছিল।

মৌলভি সিরাজুদ্দীন কাশীমপুরী, 'বাঙলা একাডেমী পত্রিকা'য় (১৩৬৮ সালের দ্বিতীয় সংখ্যা, ঢাকা) লিখিয়াছেন, 'ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীহট্টের আজমিরীগঞ্জের নিবাসী জনৈক আচার্য রাধিকার বিরহভাবে আকুল হইয়া (রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের জন্য যে ভাবে উন্মাদিনী সাজিয়াছিলেন) সংসারের মায়া কাটাইয়া কোথায় উধাও হইয়া গেলেন। বেশ কয়েক বৎসর পর তিনি স্বীয় গৃহে ফিরিয়া আসিয়া আপন আবাস-বাটীর সম্মুখস্থ পুকুরের ধারে কুঞ্জ নির্মাণ করিলেন এবং বিরহিণী রাধিকার বেশে মথুরাবাসী কৃষ্ণের অপেক্ষায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। ভাবাবেগে অধীর হইয়া কখন তিনি ফুল তুলিতেন, কখনও অপরূপ কুঞ্জ সাজাইতেন, কখন কলসী কাঁখে জল ভরিতে যাইতেন,

কখনও বা প্রাণ-বেণুর রব শুনিয়া প্রিয় শিষ্য উদয়াচার্যের গলা জড়াইয়া কাঁদিতেন, কখন বা কোকিলার কুহুতানে আপনাকে হারাইয়া ফেলিতেন—তন্ময় হইয়া পড়িতেন।'

'ধীরে ধীরে তাঁহার শিষ্য সংখ্যা বাড়িতে লাগিল, নিম্ন শ্রেণীর অনেক ছেলেও শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল বা শিষ্য করিয়া লওয়া হইল। এই সকল ছেলেকে রাধিকার সখী বেশে সাজান হইত। ছেলেরা নীরবে নাচিয়া ভাব প্রকাশ করিত, বিরহ-সঙ্গীতে সকলকে মুগ্ধ ও ভাবাতুর করিত। ক্রমে এই ছেলে শিষ্যদিগের যোগে গড়িয়া উঠিল গাঁড়ু গান। গাঁড়ুগানের সম্যক্ বিকাশ ও বিস্তৃতি লাভের পূর্বে উক্ত উদয় আচার্য তদীয় গুরুদেবের আচরিত সাধন-পদ্ধতির কিঞ্চিৎ সংস্কার সাধন করিয়া ইহাকে পালা গান বা গাঁড়ু গান আসর, ভজন, সালাম, সাজন, গৌর, বংশী, গোষ্ঠ, জল ভরা, জলরূপ, ফুল তোলা, কুঞ্জ সাজানো, নিদ্রা, স্বপন, কোকিল, বিচ্ছেদ, ভোর, মধুমাস, সখীসংবাদ, সন্ধ্যা প্রভৃতি অঙ্গে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক অঙ্গ আবার সাধারণ গান, খেয়াল গান ও সমগানে বিভক্ত।

উদয় আচার্যের মৃত্যুর পর এই সাধন পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়া লোক-সঙ্গীতে পরিণত হইল। শাশ্বত বিরহের পরিবর্তে নর-নারীর স্বাভাবিক আকর্ষণ-জনিত প্রেম-সঙ্গীতের রূপ লাভ করিল।'

যে তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া ঘাটু গানের এই উৎপত্তির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা নির্ভরযোগ্য বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং ঘাটুগানের উৎপত্তি সম্পর্কে এই অভিমতও বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক আধ্যাত্মিক বিষয় সর্বক্ষেত্রেই এই ভাবে লৌকিক স্তরে নামিয়া আসিয়াছে।

১

আরে বংশী বাজে কোন্ বনে।
শুনিযা বন্শী তান, উদাস হৈযাছে প্রাণ
চিতে আমার ধৈরয না মানে॥
আরে সখীরে—
দাঁড়ায়ে কদম তলা, বাঁশী বাজায চিকন কালা,
গলায় শোভে বনমালা।
বাজায় বন্শী সুতানে, ধৈর্য নাহি মানে॥ —মৈমনসিংহ

২

সোনার গাগরী লৈয়া রাধা যায় জলে।
যায় গো রাধা জলে একা যায় গো রাধা জলে,
যমুনাতে জল ভরিতে, দেখে রাধা আচম্বিতে,
জলের মাঝে চিকন কালা দোলে।
কলসী লইয়া কাঁখে, রাধা নেহালিয়া দেখে,
কানাই বৈসা কদম্বেরি ডালে। —ঐ

শোন গো, পরাণ সই, তোমাকে মরণ কই,
বাঁশী মোরে করল উদাসী, সখী রে ॥
কি ধ্বনি পশিল কানে,
সে অবধি পরাণ আমার
কেন লয় মোর মনে,
বাঁশী কি যাদু জানে
গৃহ কর্ম না লয় আমার মনে, সখী রে ॥ —ঐ

৪

তমাল ডালে বইসে কোকিল ডাকহে ঘন ঘন।
তোম্‌রা কি কেউ দেখছ আমার প্রাণ বন্ধু সুজন রে ॥
ভেরন কাডের নাওখানিরে মধ্যে তাহার ছইয়া।
আগা হইতে পাছায় গেলে গলই পড়ে নইয়া রে ॥ —ঐ

ব্রজবুলি ভাষার অনুকরণেই হউক, কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, ঘাটুগানে অনেক হিন্দী শব্দ ব্যবহৃত হয়। হিন্দী শব্দযুক্ত ঘাটুগানকে সাধারণতঃ তেলেনা গানও বলে। নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীত তাহার নিদর্শন—

৫

শোন কোয়িলারে হাম দুঃখিনীর ফাটে রে ছাতিয়া।
কোনে বিরাজে পিউয়া মেরা হাম নারী ছাড়িয়া ॥
এয়ছে মধু না মাসে, রে কোকিলা, না হেরি কালিয়া।
গাও মেরা পিউয়া নাম জুড়াইতে হিয়া। —ঐ

৬

ললিতে গো কুঞ্জ সাজাও,
মনের বাঞ্ছা পুরাইতে আসবেন গোলকবিহারী ॥
ফুলের রত্ন সিংহাসনে,
বইসে রইলাম রাই একা কুঞ্জে,
আসবে বৈলে আশায় আশায়,
পোহাইলাম নিশি,
প্রাণ সখীরে, আইল না পোড়া বিদেশী ॥
কোন না কামিনী সনে কাটাএ দিন রাতিয়া।
পিউয়া আরে দহে মেবা ছাতিয়া ॥ —ঐ

৭

কাল বসন্তকাল, কোকিলা হইয়াছে কাল,
বসিয়া তমাল ডালে কুহু রবে প্রাণ জ্বালায় ॥
আইজ নিশীথে এই যে প্রাণনাথ,
মম সনে শুইয়ে এক সাথ,
হাসি হাসি নাথ, মুখে দিয়া হাত,
কোকিল ধ্বনি পোহাইল রাত।
শোন গো, সখী, স্বপনকি বাত ॥
এয়ছা সময় গিয়ে, কাছে নাই পিউ মেরা
তুষানলে তনু জবা, ভাসি আঁখিনীরে ॥ —ঐ

ক্যা রূপ হেইরে আইলাম যমুনায়, সখী গো, আইলাম যমুনায় ॥
ও সখী, আচানোকা রূপ হেরিলাম তরুয়া মূলে।
ওরে মেৰা মন হৈৰে নিল—নিলরে ঐ কাল বরণে ॥
একেত আচানোকা রূপ হেৰি—হেরিত যমুনায়।
সেইত অবোলা বামা ধৈরয না মানে হামারি।
মনেরি মন হৈরে নিল—নিল ঐ কাল বরণে ॥ —ঐ

৯

কি রূপ দেখলাম রে, হারে যমুনার জলে,
দেইখ্যা রূপ জিউরায় না মানে।
জিউরায় না মানে, গো সখী, জিউরায় না মানে ॥
যাইতে যমুনার জলে,
সেই কালা কদম্ব মুলে,
আঁখি ধারে প্রাণ লইয়া যায়।
প্রাণ লইয়া যায়, রে সখী, মন লইয়া যায় ॥
কলসী বুড়াইয়া সই গো চাইয়া রইলাম রূপ গো পানে।
কলসী ভাসাইয়া নিল সোতে. রে সখী, জিউরায় না মানে। —ঐ

১০

প্রিয় নিজ নাম শুনাইলে আমারে ঐ নিদান কালে।
আমার প্রাণ জ্বলে গো, প্রাণ সজনী, বিরহানলে ॥
যে দিকে পওন হও রে,
কইও রে শ্যাম বন্ধুর আগে কুঞ্জে আসিতে,
তব নামে মইল পিয়ারী বান্ধা রইল তমালে। —ঐ

১১

ফুলের শেজ্‌জুয়া বিছাও, রামা, লইয়া চল মালঞ্চি,
কুঞ্জে আসবে বাঁকা শ্রীহরি ॥
জাঁতি জুঁতি, কৃষ্ণ, বেলী,
গন্ধরাজ কুসুম কলি,
ফুলেরি শেজ্‌জুয়া বিছাও ওরে ॥
জ্বালাইয়া কাঞ্চনের বাতি,
জাগব আমি সারা রাতি,
ভোরের কোয়িল কণ্ঠে আমি শুনব বন্ধুর গীতি ॥ —ঐ

১২

বিরহ বিচ্ছেদের জ্বালায় প্রাণ বাঁচে না—ইকি যন্ত্রণা।
প্রেম কইরে দুই দিন গো আমার সুখে গেল না ॥

লোকে মোরে করছিল গো মানা,
কঠিনের প্রেমে মইজ্য না ;
যয়বন কালে না পুরাইল মনের বাসনা ॥
আমারে বানাইয়া দোষী,
বন্ধু হইবে পরবাসী, আগে জানি না ,
জানিলে আগে প্রেম কৈবে ফান্দে পডতাম না ॥ —ঐ

১৩

আছমানেব চান উদয়, রে সখী, যমুনার তীরে।
রইতে নারী ঘরে, রে সখী, রইতে নারি ঘরে ॥
যমুনার জল টানে বে সখী, আমার মনেরি জল টানে।
হৃদয়ে তাব গরল ভবা নয়নে বাণ হানে রে সখী,
নয়নে বাণ হানে ॥ —ঐ

১৪

বইলা দে গো তোরা, প্রাণ সজনী—
এগো আমি জনম-দুঃখিনী।
পিউ বিনে মেবা জিউ কান্দে দিবা-রজনী ॥
আমারি কপালে চিঠি কি লেখখ্যাছে না জানি।
এগো আমি জনম-দুঃখিনী ॥ —ঐ

১৫

আমার বিরহ না জালায় গো চিত্ত দহে।
কোথায় রইলা প্রাণেব পিউ আইন্যা মিলাও হে ॥
যয়বন জোয়ারের পানি,
ধাইয়া ধাইযা উডে গো নিষেধ মানে না।
নিষেধ মানে না গো প্রাণে সমুজ মানে না ॥ —ঐ

১৬

কুঞ্জ সাজাও রাইকিশোরী আসিবেন শ্রীহরি।
বিনা সূতে গাঁথ মালা,
শোন, ও গো রাই অবোলা,
মনের সুখে আজু নিশি বঞ্চিবেন হরি ॥ —ঐ

১৭

কোন রসিয়ায় বংশী ফুঁকারে ও রামা,
ধুন শুনিয়া চিত্ত সমুজ না মানে।
আরে সমুজ না মানে॥
মনে করি, ও সজনী,
নিধুবনে যাই গো আমি, দুরন্ত মন-বন মে।
বংশী ধুন নে প্রাণ নিল ও রামা। —ঐ

১৮

কি হইল প্রাণ সই গো, বিফলে গেল রজনী।
আশা পন্থে রইলাম চাইয়া আমি দুঃখিনী॥
চুনী চুনী কালি আনি,
শেজুয়া সাজাও সখীয়া,
পিউয়া বিনে মেরা জিউ আগুনে দহে।
আসিবার আশে রইলাম বৈসে আমু দুঃখিনী॥ —ঐ

১৯

আজুকা স্বপনে গো সখী দেখলাম পিয়াকো,
জাগিয়া না পেখনু তাহাবে।
স্বপনে পেখনু সই গো পিউয়া হামারি শিউবে॥
উঠ গো, উঠ গো, বইলে ডাকে হামারে,
শিয়রে বসিয়া পিউয়া হাত ধৈরা টানে,
জাগিয়া নেহারি পিউয়া নাই হামারি॥ —ঐ

২০

আরে আরে মধুমাসে—এদিন আর কবে হবে।
পিউয়া নাই মহল মে—সখী সখী রে।
বিফলে দিন যায় শুইয়ে, দিন যায় রে শুইয়ে।
সখী, সখী রে॥

আরে, দরদী কেউ নাই—নাই রে হামারি,
পিউ কু মিলায় মহল মে, জিউরায় ত যায় রে বইয়ে ॥
যয়বন-জোয়ার উথালিয়া যায় মেরা,
পিউ বিনা শূন্য দেখি রে জিউরা।
সখী, সখী রে ॥ —ঐ

২১

বাঁশী বাজে কোন্ বন।
রাধা বইলে বাজে বাঁশী, শোন সখীগণ ॥
সখীর সহিতে রাই আছিল বসিয়া।
হেন কালে শ্যামের বাঁশী উঠিল বাজিয়া ॥
ললিতারে বলে রাই, শুনলে শ্রবণে।
নাম ধরিয়া ডাকে বাঁশী ধৈরয নাহি মানে ॥
রাধিকা সখীরে কহে—কহে হাত ধরি।
কে যাইবে আমার সাথে চল ত্বরা করি ॥
কেহ যদি না যাও, সখী, একা যাইব আমি।
যার লাগি কলঙ্কিনী, হইব তার দাসী ॥ —ঐ

উদ্ধৃত ঘাটুগানগুলি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, প্রধানতঃ বংশী ও বিরহখণ্ডই ইহার বিষয়। সুতরাং প্রেমে নৈরাশ্যের দিকটিই ইহাতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। উদ্ধৃত গানগুলির মধ্যে প্রত্যেকটিই সমবেত সঙ্গীত; এই গানের একটি বিশেষত্ব এই যে গানের আসরে যত লোকই উপস্থিত থাকুক না কেন, তাহাদের প্রত্যেকেই সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে, কেবলমাত্র শ্রোতারূপে আসরে কেহই উপস্থিত থাকে না। ঘাটু বালক একক যে সঙ্গীত পরিবেশন করে, তাহা সাধারণ প্রেম-সঙ্গীত, নৃত্য-সম্বলিত করিয়া তাহা পরিবেশন করা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্যবহারিক সঙ্গীত

এক

বিবাহের গান

যে সকল লোক-সঙ্গীত পারিবারিক জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনে বৎসরের যে কোন সময়ই গীত হইতে পারে তাহাদিগকে সাধারণ ভাবে ব্যবহারিক সঙ্গীত (functional song) বলা যাইতে পারে। বাংলাদেশের সর্বত্রই ইহাদের বিভিন্ন রূপ প্রচলিত আছে, সেই সূত্রে ইহারা আঞ্চলিক সঙ্গীত হইতে স্বতন্ত্র। ইহাদের সুনির্দিষ্ট একটি ব্যবহারিক প্রযোজন (function) আছে, তাহা ব্যতীত ইহা কদাচ গীত হয় না, এমন কি, এই ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা যদি দীর্ঘকালের ব্যবধানেও দেখা দেয়, তথাপি ইহারা এই দীর্ঘকালের মধ্যে কোন দিন গীত হইবে না, ব্যবহারিক ক্ষেত্রের বাহিরেও ইহারা কদাচ গীত হয় না। বিবাহ-সঙ্গীতই ইহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। পারিবারিক জীবনে বিবাহের অনুষ্ঠান ব্যতীত কদাচ ইহা গীত হয় না, তবে বিশেষ একটি গ্রামের মধ্যে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বহু পরিবারেই বিবাহের অনুষ্ঠান হইতে পারে, সেই উপলক্ষে প্রত্যেক পরিবারেই বৎসরে একাধিক বার একই সঙ্গীত গীত হইতে পারে।

বিবাহ-সঙ্গীত ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক হইলেও আনুষ্ঠানিক ভাবে ব্যক্তি জীবনের বিবিধ সংস্কার পালন করিবার সময়ও এই শ্রেণীর সঙ্গীত গীত হয়। সেইজন্য গর্ভাধান-বিবাহ সঙ্গীত হইতে আরম্ভ করিয়া শোক-সঙ্গীত (funeral song) পর্যন্ত ইহারই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

বাংলা দেশের চতুঃসীমান্তবর্তী অঞ্চল ব্যতীত বিবাহের গান আজ প্রায় অন্যত্র সর্বত্রই লুপ্ত হইয়াছে। এক শোক-সঙ্গীত ব্যতীত ব্যবহারিক সঙ্গীত সর্বত্রই মেয়েলী সঙ্গীত, সুতরাং স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার বিলুপ্তি অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। এখনও সন্ধান করিলে ইহার যে নিদর্শন উদ্ধার করা যায়, অল্পদিনের ব্যবধানেই তাহার চিহ্নও লুপ্ত হইয়া যাইবে।

প্রথমেই বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলের সাধারণ জন-সমাজের বিবাহ-প্রথা ও তাহার মধ্যে বিবাহ-সঙ্গীতের স্থান সম্পর্কে আলোচনা করা যাইবে।

তারপর বাংলার উত্তর-পূর্ব সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বিষয় আলোচনা করা যাইবে। বাংলার এই দুই প্রান্তবর্তী অঞ্চলে ইহাদের ব্যবহারের নিদর্শন হইতেই পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ইহাদের মূল্য সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যাইতে পারিবে।

পাহাড় ঘেরা কাঁকর-মাটির দেশ পুরুলিয়া। একদিকে পঞ্চকোট, একদিকে বাগমুণ্ডি পাহাড়, আর একদিকে বানশা, কঁচ পাহাড়, আর একদিকে চাণ্ডিলের পাহাড়। পাথুরে মাটি নীরস অনুর্বর। কুর্মী মাহাতো, সাঁওতাল, ওরাও, মুণ্ডা, হাড়ি, বাউরি, বাগ্দী প্রভৃতি জাতির বাস। শাল, পিয়াল, মহুয়া, পলাশ, হরীতকী ও বহড়া গাছের ঘন বন। আজ বনভূমি শ্রীহীনা। বাংলা ভাষারই এক প্রাদেশিক রূপ এই অঞ্চলের কথ্যভাষা, তাহা কুর্মী উপভাষা বলিয়া পরিচিত। এই কুর্মী উপভাষাতেই ইহাদের সঙ্গীত রচিত হয়। বিবাহে সঙ্গীতই ইহাদের একমাত্র আচার। কোন কোন ক্ষেত্রে পুরোহিত আসিয়া মন্ত্র পড়ায়, কিন্তু তাহা নিতান্ত গৌণ স্থান অধিকার করে মাত্র। মুখ্য আচার সকলই সঙ্গীতের ভিতর দিয়া এখনও পালন করা হয়। এই সঙ্গীত প্রধানতঃ মেয়েলী সঙ্গীত। এই অঞ্চলের ভাষায় একটি প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়, 'বিহা ঘরে ম্যায়া রাজা।' অর্থাৎ বিবাহের বাড়ীতে মেয়েদেরই রাজত্ব। কিছুদিন আগেও এই অঞ্চলে ছয়-সাত মাসের পাত্রীর সঙ্গে দুই তিন বৎসরের পাত্রের বিবাহ অনুষ্ঠিত হইত। কারণ জিজ্ঞাসা করলে সহজ ভাবেই তাহারা জবাব দিত, 'বিটি ছ্যালাকে বাইথে কি হব্যেক?' অর্থাৎ মেয়েছেলেকে ঘরে রাখিয়া কি হইবে? সুতরাং যত সত্বর হোক, তাহাকে বিদায় করিয়া দেওয়াই ভাল।

যাই হোক, বিবাহের দিন পনেরো আগে হইতেই যে বাড়ীতে বিবাহ হইবে, তাহাতে আসিয়া প্রতিবেশিনীরা মিলিত হয় এবং এক সঙ্গে গান করিতে আরম্ভ করে—

১

মুন্নুকে যে বিহা দিইভ সাধের বিটির ঘরে গো,
হাথি দিইভ ঘোড়া দিইভ রাস্তায় চ্যইলে যাতে গো।
বাবুকে যে বিহা দিইভ রাজার বিটির সঙ্গে গো,
সনার বাঁধা পাল্কী দিইভ রাস্তায় চ্যইলে যাতে গো॥ —পুরুলিয়া

গানটি শুনিয়াই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ইহা পাত্রপক্ষের বাড়ীতে গাহিবার গান। কিন্তু কন্যার বিবাহ হইলে তাহার পরিবর্তে শুনিতে পাওয়া যাইবে—

২

মিনিকে যে বিহ্যা দিইভ রাজার বেটার সঙ্গে গো।
রূপার বাঁধা পাল্কী দিইভ রাস্তায় চ্যইলে যাতে গো॥ —ঐ

বাংলার অন্যত্র উচ্চতর হিন্দু সমাজে এখানে রাম-সীতার নাম শুনিতে পাওয়া যাইত, কিন্তু এখানে পারিবারিক কিংবা লৌকিক কোন অনুষ্ঠানে পৌরাণিক কোন চরিত্রের প্রভাব অঙ্কিত হইতে পারে নাই। তবে দুই একটি ব্যতিক্রম দেখা যায় মাত্র।

তারপর বিবাহের কথাবার্তা আরও অগ্রসর হইবার পর কন্যার পিতা যখন পাত্রকে আশীর্বাদ করিয়া গৃহে ফিরেন, তখন কন্যা বুঝিতে পারে পিতৃগৃহে তাহার মেয়াদ ফুরাইয়া আসিয়াছে, তাহার বিদায় লইয়া যাইবার দিন আর বেশি বাকি নাই॥ তখন তাহার মুখখানি বিষণ্ণ হইয়া উঠে। মেয়েরা গানের ভিতর দিয়া তখন কন্যার হইয়া কন্যার পিতাকে এই অনুযোগ দেয়—

পাশা খেলতে গ্যেলি বাপু জুহা খেলতে গেলি হে,
কেনে বাপু বিটি হারিলে।
গায় মোষিনী বাবা স্নেহ না হারিলে
ক্যেনে, বাপু, বিটি হারিলে। —ঐ

অর্থাৎ বাবা, তুমি পাশা বা জুয়া খেলিতে গিয়া কেন তোমার মেয়েকে হারিয়া আসিলে? গাঁয়ে এত মহিষ থাকা সত্ত্বেও তুমি তোমার মেয়েকেই হারিয়া আসিলে?

তারপর পিতার হইয়া আবার মেয়েকে গানের মধ্য দিয়াই গায়িকারা তাহার জবাব দেয়—

৪

গাঁয় মোষিনী, বিটি, ঘরের শিরোমণি,
তুমি বিটি পরের অধীন। —ঐ

অর্থাৎ গাঁয়ের মহিষ ইহারা গৃহের অলঙ্কার, কিন্তু ওগো মেয়ে, তুমি পরের অধীন।

বিবাহের নির্দিষ্ট তারিখ যতই ঘনাইয়া আসে, গানের পরিমাণ ততই বাড়িতে থাকে। আত্মীয় স্বজনে বাড়ী ভরিয়া যায়। গানের মধ্য দিয়া যাহাদের সঙ্গে হাস্য-পরিহাসের সম্পর্ক (joking relationship) আছে, তাহাদিগের সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করা হয়। বরের মাসীরা মামীদিগকে লক্ষ্য করিয়া গান গায়,

৫

বিহা বিহা শুনি আমরা কবে হবেক বিহা গো,
বরের মামা ঘরে নাই প্যাল পান গুয়া গো।
গুয়া যদি প্যাল মাগো প্যাল খাঁড়া গুয়া গো,
খাঁড়া গুয়া পাঁয়ে মাসীব মন ভাঙ্গে গেল গো। —ঐ

পাত্রীকে যখন আনুষ্ঠানিক ভাবে আশীর্বাদ করা হয়, তখন মেয়েলী সঙ্গীতে শুনা যায়—

ছুটুমুটু আঙ্গন গো বাবা, বহ্যত প্যারবার
সঁপড়িতে সঁপড়িতে ভাঙ্গল বিহান,
ও হেরে মালা দোয়ে চাঁদয়ে উডে
উঠ, দশরথ বাজা, কব কন্যা দান।
কন্যা দান কব্‌তে কর্‌তে চোখে পড়ে লোর,
আন, বাপু, গায়েব গাম্‌ছা মুছাইব লোর। —ঐ

যদি কোন ব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত থাকে, তবে তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া মেয়েরা গায়—

হামার আঙ্গিনায় বস্থল বামুন,
বস, বামুন, পাঁজিয়া বিছায়,
ভাল দিনকে মন্দ করে মন্দ দিনকে ভালো
শুক্রবার লগন বাঁধাই। —ঐ

তারপর গানের ভিতর দিয়া পাত্রীকে বলে,

৮

উঠগে ধনী, যাগো গে ধনী
নেহ ধনী লগনের গুয়া ॥ —ঐ

পাত্রীর হইয়া তাহারাই আবার গানের মধ্য দিয়া জবাব দেয়—

৯

ক্যানে হামি উঠব, ক্যানে হামি জাগব গো,
ক্যানে হামি লেব গো লগনের গুয়া
কাঁখে যে লেখা আছে চন্দনের ঠপা,
ন্যোহি হামি ল্যোহব লগনের গুয়া। —ঐ

বিবাহের নির্দিষ্ট দিন আসন্ন হইয়া আসে, পাত্রীর বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকাইয়া মেয়েরা তখন গায়—

১০

দশমাস দশদিন উদরে রাখিলে মাগো,
লালন পালন ক্যরে, মাগো, হামারে বাড়ালে ,
এখন, আপন গোত্র ছ্যাড়ো, মাগো, পরের গোত্রে দিলে,
এমন নিঠুর হিয়া, গো মা, পাষাণে বান্ধিলে,
ভ্যাল না ভ্যাল না, মাগো, ভ্যাল না আমারে ॥
কে সংসারের মাঝে, মা গো, তুমি না হইলে ॥ —ঐ

তারপর 'লগ্ন বাঁধা'র গান শুনিতে পাওয়া যায়। লগ্ন-বাঁধা বিবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ আচার। কোন মেয়ের লগ্ন বাঁধা অর্থাৎ লগ্ন অনুযায়ী বরণ করা হইলে, তাহাকে আর কোন পাত্র গ্রহণ করিতে পারে না। এই গানে একটু গালাগালির কথা শুনিতে পাওয়া যায়—

১১

আগানাকে আগাই বাঁধ, পিছানেকে পিছায় বাঁধ,
লগনাকে বাঁধরে কুকুরের ল্যেজে, দেখি কি তামাসা লাগে। —ঐ

ইহার পর বিবাহের আগের দিন অধিবাস হয়। গ্রামের সমস্ত আত্মীয়কে নিমন্ত্রণ করিয়া 'সারুয়া মুড়ি' খাওয়াইয়া আপ্যায়ন করা হয়। বিবাহের দিন

বরকে হলুদ তেল মাখাইয়া স্নান করান হয়, তখন মেয়েলী সঙ্গীতে শুনিতে পাওয়া যায়—

১২

তেলে টগমগ হলুদের মেল।
চল যাব বর মাঝাতে গো। —ঐ

বিবাহের আগের দিন হইতেই গানের পরিমাণ বাড়িয়া যাইতে থাকে। তখন কোন কোন গানের মধ্যে রাম-সীতার কাহিনীও শুনিতে পাওয়া যায়—

১৩

জনক রাজায় পণ করেছে তিন শ টাকা গণ্ডীবাণ,
এই গণ্ডীবাণ যে ভাঙ্গিবে তারে দিব সীতা দান।
কাল নাকি রে রামের বিহা আজ নাকি রে অধিবাস,
রুনুঝুনু সোনার পাল্কী রাম সাজেছে বনবাস।
রাম নাকিরে বনে যাবি, তর বনে যাওয়া উচিত লয়,
শূন্য ঘরে মাকে ফেলে রাম সাজেছে বনবাস।
রথেতে পতাকা উড়ে রাঙা ঘড়ার টক মারে,
সাজিল যে রামের পুত্র যুদ্ধ করিবার লাগে। —ঐ

তারপর পাত্র বিবাহ করিবার জন্য যাত্রা করিবার সময় মেয়েরা গান গায়—

১৪

নানী মর সারারাতি ভুখে মরে
বাবুর আমল খাব বলে গো
হামি মরিলে বাবু উপোস করিহ
হামাকে মানভে গো। —ঐ

বরসহ বরযাত্রী দল পাত্রীর গ্রামের সীমানায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে নৃত্যগীত আরম্ভ হইল। বরযাত্রীরা বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতে লাগিল। পাত্রীপক্ষ তখন একটি ঘড়াতে করিয়া এক ঘটি জল, একটি ভেলা আর বাবলা কাঁটা আনিয়া দিল। সেই সময় মেয়েরা গান গাহে,

১৫

কুলিয়ার মুড়ায় কে গো দাঁড়াই ভাঙ্গা মটরে,
তেতালার উপরে কন্যা তামাসা দেখে,

আজ গো বাহর‍্যাই, দেশে ঘুরাই বর-বর‍্যাতকে
ই সময়ে নায়রে বিহা বাৰ বাজেছে। —ঐ

বৰ বয়সে তরুণ হইলেও তাহাকে লক্ষ্য করিয়া মেয়েরা গান গাহিবে—

১৬

একশ টাকা লিলি, বাবা, দিলি বুড়া বৰে হে,
বরের সঙ্গে যাতে হলো পুরুলা সহবে গো।
পুরুলাৰ লকে বলে ইটা তোমার কে বটে?
লজ্জাকে কারণ বলি ঠাকুর দাদা বটে গো। ঐ—

তারপব পাত্রীর পিতা পাত্রকে বৰণ করিযা লইযা নিজের গৃহে সজ্জিত বরাসনে বসান, তথন মেয়েরা গায়—

১৭

ঝালিদাব শহরে কিসের বাজনা বাজিছে,
আন্‌রে বিরাটের আল চিন্‌ব বৰের আজাকে।
দেখ্‌লি বরের আজাকে (দাদুকে) চিনলি বরের আজাকে,
কত সনার গহনা আনেছ সাধের নাতির বিহা দিতে। —ঐ

পাত্রপক্ষ প্রদত্ত গহনাব কোন ক্রটিকে লক্ষ্য করিযা মেয়েরা পাত্রপক্ষকে বিদ্রূপ করিয়া গায—

১৮

হাঁসাল পিধাঁতে শ্বশুর খুজ্জুব মুজুর,
কাহে শ্বশুর খুজুর মুজুর,
তরে ঘরে বাহরাত সামাস্তি
তবে নয়না জুড়াত হে। —ঐ

১৯

বারে বারে বারণ করি ডাবরে ঘর জুড না,
ইয়ারা জানে নাই, শুনে নাই, ইয়ারা কুটুমের মান জানে নাই,
হাঁড়ি করে হাঁড়র হুঁড়ুর আমরা বলি গো
আমরা বলি ম্যল মোহর কিছুই লয় গো,
ডাবরের ভাঁড়ুগো। —ঐ

পাত্র যদি একটু লেখাপড়া জানে, তবে পাত্রীর বাড়ীর মেয়েরা তাহাকে আক্রমণ করিয়া গায়,

২০

পিসা গো, তোর জামাই আসেছে,
তেঁতল পাতার থলায় করে গহনা আনেছে,
পিসা আমার পড্যাহ পণ্ডিত শুন্‌তে বস্তেছে।
পিসি আমার অভাগিনী কাঁদতে বস্তেছে। —ঐ

কন্যা বিদায় হইয়া যাইবাব সময় তাহার বাড়ীতে মেয়েরা গায়—

২১

মায়ে হামায় পশল যতন করি, যেশন গিয়া গাগরী,
বাবা হামার বেঁচল বাহিঁই ধরি
সে সন্দেহে বাঁচালি হে। —ঐ

পাত্রের গৃহে আসিয়া পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গেই পাত্রের বাড়ীর মেয়েরা পাত্রীকে নিন্দা করিয়া গায়—

২২

বরটির মুখটি দেখ ধাধ্‌কি ফুলের পারা,
ক্যাইনাটির মুখটি দেখ গো ট্যুরি ব্যাঙের পারা। —ঐ

পরদিন পাত্রীর বাড়ী হইতে পাত্রীকে 'ঘুর্যাতে' অর্থাৎ দ্বিরাগমনের জন্য লইতে লোক আসে। সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় পাত্রীকে আশীর্বাদ করিয়া দ্বিরাগমনের জন্য যাত্রা করান হয়, তখন একটি অনুষ্ঠান হয়, সেই সময় মেয়েরা গাহে—

২৩

ভালশিরে লো মল্লিকা মাথা নোয়াবি,
এইটা তোর বটে মল্লিকা নিজের শাস (শাশুড়ী ,
রাস্তায় ঘাটে কালিমাটির হাটে
মাথা নোয়াবি, মল্লিকা, মাথা নোয়াবি। —ঐ

এইভাবে প্রত্যেক আত্মীয়ের সঙ্গেই নববধূকে তখন পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। মেয়েরা অবিশ্রান্ত গাহিতে থাকে—

২৪

ধর ধর, বড বাবু, ছাতা ধর,
ধনী তোমার মলিন হোল গো,
ধনী তোমার ভিজি গেল,
ধনী তোমাব ঘামি গেল গো। —ঐ

বরকে লক্ষ্য করিয়া গায়—

২৫

এতদিন বুললি, বাজা, অহডে বহডেরে,
এইবারে পড্‌লি রাজা রাণীব মহলেবে। —ঐ

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঝাডগ্রাম মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে বিবাহের বিভিন্ন আচার পালন করিবার সময় নিম্নোদ্ধৃত মেয়েলী গীতগুলি গাওয়া হয়—

২৬

এক পয়সার জিরুল ফুল চালে শুকালে
ভাগ্যেছিল আমার ভাই গো বলি ঘরে আনিল।
এডগোদায় কুলি এ হাসা হাসা পাথর,
আলি গেলি, রে বিমলি, মিছবি বলে খালি।

—এড়গোদা (মেদিনীপুর)

২৭

আমফুল জালি জালি ফুলেতে ঘেরেছে,
আমাদের বালা দুধের সর গো বালি লগনে চড়েছে॥ —ঐ

২৮

ভাঙ্গাঘরে খঁজালরা জুরা বলে যাচাগুঁজা
যাবে জুরা ঘর ঘুরে যা॥
পুকুর আড়ায় ডেবা দিব, রঁাধে খাতে চাল দিব,
ভাতে দিতে বেগুন দিব যারে জুরা ঘর ঘুরে যা॥
আয়না কাঁকই নিয়ে জুরা ঘর ঘুরে যা॥ —ঐ

২৯

এতটুকু বেগুন জালি, ওগো, মাগো দেখিয়ে বাঢালি
এমন বাঢন বাঢলি গো ধনি কাঁদিয়ে ছাড়ালি। —ঐ

৩০

ইঘর কাদা সেঘর কাদা বরের মাগো বাইরাবি কি করে
তোমার ভাইকে ছাডবে চিটি আনবে রিক্সা গাড়ি। —ঐ

৩১

আষাঢ মাসের বিজোল লতা, ওগো বলি, শরাবনের গাছি
হুতুকে হুতুকে উঠে, ওগো বলি, কন্যাব মাযের ছাতি॥

৩২

আঁকাবাঁকা নদীধারে, ও আনন্দ, কেমনে পার হলি,
বাব ৰিঘার গুঢা ছাডে. ও আনন্দ. নদীরে দাঁডালি।

৩৩

কুথা হতে আলি তাঁতি কোথায় তোমার ঘর
উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম, ওরে তাঁতি, এডাগাদায় ঘর,
আলি তাঁতি ভাল কবলি, ওরে তাঁতি, কাঁকন বাঁধতে বস।
এক নাটাই সূতা তাঁতী, তাঁতে মিলালি
বহিন বন্ধক দিয়ে তাঁতী সূতা নিয়ে আলি।

বিবাহের বস্ত্রের প্রযোজন হয়, সেই সূত্রে তাঁতীরও আবশ্যক, কিন্তু বিবাহের গানে তাঁতীকে যে কেন গালাগালি শুনিতে হয, তাহার কারণ কিছুই ৰঝিতে পারা যায় না।

৩[illegible]

গায়েব গর্ভে জমন নিল গাই ও বাছুরী,
মায়ের গর্ভে জনম নিল ভাই ও বহিন।
তোরই লিখন, ভাই রে, নিজ পতিঘর,
ভাইরে আমার লিখন পরের ঘর।
তোরই লিখন, ভাই রে, দহিদুধ ভাত,
ভাইরে, আমার ওযে লিখল ভাইরে শাক ভাত —[illegible]

৩৫

এড়গোদার কুলিরে, ওগো বলি, কি কি দোকান বসে,
কি কি গহনা নিবে গো, বরের বাবা,
ওগো বলি, দকান উঠে যাছে,
এডোগাদার কুলি রে, ওগো বলি, কি কি জিনিষ বসে,
কি কি জিনিষ লিবেগো, কৈনার বাবা,
ওগো বলি, জিনিষ উঠে যাছে ॥ —ঐ

৩৬

ধুরা দেশে শ্বশুর ঘর বাবুব গাযে লাগে খরা,
শ্বশুরকে মাগিবে, ওগো বাবু, গায়ের যথা ছাতা।
ধুরা দেশে শ্বশুর ঘর বাবুর পায়ে লাগে তাতা
শ্বশুরকে মাগিবে বাবু পাযের যথা জুতা। —ঐ

৩৭

বনের পথে যাইনা, বাবুবে, শহব পথে যাবে।
চেলাক জাঁকা পৈইসা আছে বাবুবে ছড়ায়ে যাবে।
গাছ পাকা বম্ভা পাবু, বাবুরে, পথে ভাঙ্গে খাবে।
ডবল ডবল ছাতা দিব, বাবুবে, শালা ভুলাবে।
বাঙ্গা টুপা দিব ভালারে শালী ভুলাবে। —ঐ

৩৮

পাগ পোগরী বাঁধিলে, পুতা, কোথারে সাজিল,
দিয়ে রাখে দুধেকেবি ধার।
আমি যে যাছি, মাগো, কামিনী আনতে
সুধি দিব দুধেকেবি ধাব ॥
তোমাকে যে দেবো, মা, জনমের কামিন।
—বেলপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

৩৯

বাবা, এখুনি বসে পায়রা গোমরিছে
সঙ্গের সঙ্গতি খু জছে,

পায়রা ভাই তো ঘুরি ফিরি খাই।
পায়রা মারবার জন্য ফাঁদ এড়িলাম,
লাগি গেল বড় বৌর ভাই,
বড বৌয়ের ভাইকে চিনিতে না পারি ,
ঝিকিমিকি মেঘ তুমি আঁধার। —ঐ

কন্যা পতিগৃহে যাত্রাকালীন নিম্নোদ্ধৃত গান পাওয়া হইয়া থাকে—

৪০

মাকে যে বলেছিলে দুধের পখুর দিতে,
শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় দুধ খেয়ে লিতে।
বাবাকে যে বলেছিলে আম জাম রুয়ে,
শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় জডা পিডে লিতে।
মা কাঁদে মাঝিয়ে ঘরে
বাবা কাঁদে ভিতর ঘরে
পিঠের ভাই কাঁদে রনামেরো ভাই॥ —ঐ

৪১

তুমি যে রে কনে বাছা বিয়ার সাজিলে,
মাকে যে কিছু না বলি লি।
কি আর বলিব, মাগো,
যাছি, মাগো, জনমের কামিনী আনিতে গো॥ —ঐ

৪২

বাস ফুলের বাস মালা, বালা গো, গাঁথিবে যতনে।
তোমার বাবার কোলে বসে, বালা গো, দিবে রাণীর গলে॥
ছিঁড়িলে ভাসায়ে দিবে কাঁনায় জুড়ায় বাশে,
পর্বত পাহাডে, বালা গো, বাছে কাটা ঝাটি।
তোমার রাণী ও বুঝন্ত, বালাগো, ধর জলে ঘটি॥ —ঐ

৪৩

দেশ বেড়ালে, বাবু, নগর বেডালে।
ঘুরে আসে, গো বাবু, গুমরি বসিলে॥

মাও জিজ্ঞাসা করে কোথায় ছিলে, বাবু,
বাবু মুখের বচন না খুলে বলে।
মুখের বচন খুল, বাবু, মা গুরু জনা।
বাবু, দশ লাগুক বিশ লাগুক রাণী দিব আনিয়া ॥ —ঐ

৪৪

ভোবের বেলা আন্ধাব রাতে জামাই পড়ে পুঁথি,
হাতের কলম পড়ে গেলে, গো বাবু, জ্বালো মোমের বাতি ॥—ঐ

৪৫

কালে কালো কালো ভোমবা,
নয়তোন দুয়াত নিশি শিশিরে ভরা।
হুঁকা টানা গাঞ্জা টানা, বউ গো তুমি,
অনেক বেলায় ভাই এসেছে বিদায় দেও তুমি।
হুঁকা টানা গাঞ্জা টানা, দেওর গো তুমি,
অনেক বেলায় ভাই এসেছে বিদায় দেও গো তুমি।
হুঁকা টানা গাঞ্জা টানা, ভাশুর গো তুমি
অনেক বেলায় ভাই এসেছে বিদায় দেও গো তুমি।
হুঁকা টানা গাঞ্জা টানা, শ্বশুর গো তুমি
অনেক বেলায় ভাই এসেছে বিদায় দাও গো তুমি।
হুঁকা টানা গাঞ্জা টানা, শাউড়ি গো তুমি
অনেক বেলায় ভাই এসেছে বিদায় দেও গো তুমি। —ঐ

৪৬

বর ঘরের বইরাতিদের এক্কটিঙ্গা ধুতি,
কন্যা ঘরেব বইরাতিদের দুই টিঙ্গা ধুতি ,
বর ঘরের বইরাতিদের তালতুরকার হুকা,
কন্যা ঘরের বইরাতিদেব সোনায বান্ধা হুকা।

৪৭

একসঙ্গে দুটি পায়রা জোর ভাঙ্গি উড়িল।
ওরে ওরে কাবা বাগাল দেখেছিলে,
সেই আমার পায়রা জোড়া।

ধূলায় লোটনা খেলে গায় হলুদের বরণ,
কপালে মাণিকেব ফোঁটা সেই পাখী জোড।
শ্রবণাকা নদীর ঘাটে ধূলায় লোটনা গো খেলে। —ঐ

৪৮

জডিপাতা নডে চডে মাকে আমাব মনে পডে।
মাগো! কেমনে বহিব শ্বশুর ঘবে।
আমরা বলি বিযা, কবে আমার মেয়েব বিয়া
এবারে মেযে চলিযা গেলে মাকে মনে পডে। —ঐ

এইবার উত্তর বাংলা হইতে সংগৃহীত একটি বিবাহের গান এখানে উদ্ধৃত কবা যাইবে—

৪৯

কন্যা সম্প্রদানকালে গাওযা হয়—

বালির বাবা মন্দিরের আগোৎ জোড কসালের গচ,
একটা কসাল ছিঁডিযা বাবা সম্প্রদান করে।
সম্প্রদান করে বাবা মোচে চউখেব পানি,
আজি হতে মোর মন্দির হইল খালি,
আজি হতে মোব কোল হইল খালি। —কুচবিহার

পূর্ব বাংলায় যে বিবাহেব গান প্রচলিত আছে, তাহা যেমন ব্যাপক, তেমনই বিচিত্র। তাহার এখন উল্লেখ কবা যাইবে।

গর্ভাধান-বিবাহেব সময হইতেই সেখানে মেযেলি সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায। গর্ভাধানেব সময উপস্থিত হইলে বধূব পাঁচটী ফল আঁচলে বাঁধিয়া পতিসহ নিশি যাপন এবং প্রভাতে সেই ফল জলে বিসর্জন করিতে হয়। ইহাকে ফল ভাসানের গীত বলে—

৫০

দেখ, প্রভাত সময ফল ভাসাইতে যায় গো বধূ
ক্ষীব নদীর সাগর।
নাগব রে জাগবণ কইর‍্যা উঠিল সুন্দরী,
ফল ভাসানের সময় হল চলে তরাতরি।

আবের কাকৈএ সুন্দরী বেশ কইর‍্যাছে বেশ,
পারিজাতের খোঁপা সুন্দরী বান্ধাইছে বিশেষ,
শ্বশুর বাড়ীর সম্মুখে পঞ্চ ঘর মালী,
সডক ছুলিয়া দেউক ফল ভাসাইবাম আমি।
সডক ছুলিয়া মালী না বুলাইলো ঝাড়ু
দুই পা ভরিয়া গেল চম্পক ফুলের রেণু,
আগে আগে শাশুডী যায় পাছেতে ননদী,
মধ্যে কইর‍্যা লইয়া চলে জনক রাজার ঝি।
ফলেরে ভাসাইয়া কন্যা নিরখিয়া চায়,
বাইঙ্গনের কলি যেমন জলে ভাইস্যা যায়। —মৈমনসিংহ

নিম্নোদ্ধৃত গান দুইটি সাধ খাওয়ানোর গীত। গর্ভবতী নারীর সাধ খাওয়ানো উপলক্ষে যে মেয়েলী গীত শুনিতে পাওয়া যায় তাহার মধ্যে কখনও কখনও চাঁদ সদাগরের পত্নী সনকার সাধ খাওয়ার উল্লেখ শুনিতে পাওয়া যায়।

৫১

ধুয়া :— রতিলো! ছোটকালের সাধের সাজু এনে দে মোরে।
শাক তুলিতে যাইগো, রতি, গোয়াল ঘরের ছাইছে।
ওগো! চিনা জোকে কামড দিলে নেংটা হইয়া নাচে।
রতিলো! সেই শাক তুলিয়া এনে দে মোরে॥
শাক তুলিতে যাইলো, রতি, তুলে লতাপাতা।
ওরে শাকের লগে দেখা নাই বন্ধুর লগে কথা॥
রতিলো! সেই শাক তুলিয়া এনে দে মোরে।
রতিলো! ছোটকালে খাইছি বাপের বাডী।
মৎস্য পোডা বেগুন তরি-তরকারী॥
রতিলো! সেই সব এনে দে মোরে।
রতিলো! ছোটকালে খাইছি বাপের ধাম।
ওগো। নুন-কাসুন্দে মাখিয়া কাঁচা-আম॥
রতিলো! সেই আম আনিয়া দে মোরে॥

রতিলো! ছোটকালে খাইছি বাপের বাড়ী।
কুলের অম্বল ঘণ্ট মৎস্য চরচরী।
রতিলো! সেই আনিয়া দে মোরে॥
রতিলো! ছোটকালে খাইছি বাপের বাড়ী।
কত পুলিপিঠা পায়সের ছড়াছড়ি॥
রতিলো! সেইসব আনিয়া দে মোরে॥ —ঢাকা

সন্তান জন্মের সময় যে মেয়েলী সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে কোন কোন ক্ষেত্রে রামচন্দ্রের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হইলেও অনেক স্থলেই লখিন্দরের জন্ম-কাহিনীও গীত হয়।

৫২

পরে সাধ খাইয়া সোনাইব প্রসব বেদনা হইল।
রতি রতি বলে সোনাই ডাকিতে লাগিল॥
কোথা গেল ছয বধু দেখগো আসিযা।
বুড়াকালে প্রসব ব্যথা উপজিল বলিয়া॥
এক খাটেব থেকে বাণী অন্য খাটে যায।
মাঝের খাটে রাণী গড়াগড়ি যায॥
রাম-লক্ষ্মণ দুই শূল আসিয়া উপজিল।
হস্তে যোড লখিন্দব ভূমিষ্ট হইল॥
মাটিতে পড়িয়া ছেলে ওযা ওযা বলে।
হেনকালে দাইমা তুলে নিল কোলে॥
সোনার কাটালি দিযা নাড়ী ছেদন করিল।
সোনার নুপুবি কড়ি দাইরে দিল॥
ছয় দিনে লখিন্দরেব ষষ্ঠ হইল।
সাত দিনে লখিন্দরের অশৌচ তুলিল॥
ছয মাসের লখিন্দর হইল তখন।
শুভক্ষণে সোনাই কবিলেক অন্নপ্রাশন॥
সোনাইব সঙ্গে যুক্তি করিযা তখন।
রাখিল লখিন্দর নাম ওঝা বিচক্ষণ॥

দিনে দিনে বাড়ে লখাই মনসার বর।
সাত বৎসরের হইল কুমার লখিন্দর॥
শুভদিন পাইয়া করাইল কর্ণভেদ।
রাজনীতি শিখাইল জানাইল বেদ॥ —ঐ

পুত্র সন্তানের জন্ম হইলে সেই উপলক্ষে যে মেয়েলী গীত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার আরও একটির নিদর্শন এই প্রকার—

৫৩

ভগবান পুত্র পেইয়ে, আনন্দে কোলে নিয়ে রাণী নিদ্রা যায়।
গোপাল কান্দিছ না রে—ঐ আমার কোলে আয় রে॥
কে তোরে বলে কালো—গোপাল রে
যে তোরে বলে কালো, তার কিরে, বাপ, নয়ন কালো।
ঐ তোর ঐ রূপে অন্ধকার করে আলো॥
(গোপাল কান্দিছ না রে)
একদিন দেইখাছি তোরে মৃত্তিকা বোধনের কালে,
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড দেইখাছি তোর বদনে॥
(গোপাল কান্দিছ না রে)
ছিল তোর নয়ন তারা, দুঃখিনীর দুখপাসরা
তিলে তিলে হইলাম রে হারা।
(গোপাল) যাইও না যাইও না কারো গৃহে খেলাইতে;
গৃহে বইসে খেল, মা বলিয়ে ডাক,
শুনুক গোকুলেরই লোকে॥
বাছা যাইও না যাইনা না কারো গৃহে খেলাইতে॥ —ত্রিপুরা

পুত্রের পরিবর্তে কন্যা-সন্তানের জন্ম হইলে নিম্ন প্রকার গীত শুনিতে পাওয়া যাইবে—

৫৪

ওগো, গিরিরাজ, দেখ গো আসিয়া
তোমার ঘরে আজি কোটী চাঁদ মিলিয়া
এক চান্দ হইয়াছে উদয়।

আইস, গিরিরাজ, আর কৈর না ব্যাজ
এমন ভাগ্য না কি আর কারো হয়। —মৈমনসিংহ

বিবাহের সর্বপ্রথম আচার অনুষ্ঠানিক ভাবে বিবাহের দিন স্থির করা, তাহাকে লগ্নপত্র বা বিবাহের লগ্ন স্থির করা বলে। সেই উপলক্ষে যে গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা এই প্রকার—

৫৫

ভাগ্যবতী জামাইর বাপ পণ্ডিত পাঠাইছে
সোহাগিনী কন্যার বাপের বাড়ী রে,
দেও, কন্যার বাপ, বিবাহেব কবুল।
আছে তোমাব বেটী রে, আছে তোমার ভাইস্তি বে,
দেও, কন্যাব বাপ, বিবাহের কবুল।
এরে শুইন্যা কন্যাব বাপ পণ্ডিত ডাকিল রে,
পণ্ডিত ডাইক্যা লেইখ্যা দিল তার বেটীর বিয়া রে।
বইস্যা আছে জামাইব বাপ দরবার করিয়া,
পত্র পড়িয়া দেখে তার বেটার বিয়া। —ঐ

লগ্নপত্রেব পর কোন একটি শুভদিন দেখিয়া সমাজের এয়োগণ একত্র হইয়া 'পানখিল', 'পানখিলি', বা 'পানভাঙ্গানি' নামে এক আচার পালন করেন। ইহাতে কেহ আসিয়া আল্পনা দেন, কেহ মঙ্গলঘট বসান, কেহ বা ধূপ-দীপ জ্বালেন। তারপর সকলে মিলিয়া একত্র বসিয়া এক একটি গোটা পান হাতে লইয়া তাহাতে খিলি বা একটি কবিযা সরু কাঠি পরাইয়া দেন, প্রথমে বরের বাড়ীতে এবং পরে কন্যার বাড়ীতে এই আচার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মেয়েলী সঙ্গীত ইহার একটি অপরিহার্য অঙ্গ—

৫৬

পুরবাসিগণ, সুপারি কাট গো নারীগণ।
আইস আইস আইস মিলি—আইসা দাও পান খিলি
যার হস্তে সোনার কাটাবী, সে আইসা কাটে সুপাবি। —ঐ

৫৭

আয়গণে ডাকাইয়া, উঠানখানি লেপাইয়া
লক্ষ্মী আইসা দিলাইন আলিপন।

লক্ষ্মী দিলাইন আলিপন, গঙ্গা আইতে কতক্ষণ (রাম রে),
গঙ্গা আইসা বসাইল মঙ্গলঘট।
গঙ্গা বসাইল মঙ্গলঘট, পদ্মা আইতে কতক্ষণ (রাম রে),
পদ্মা আইসা জ্বালাইন্ ঘিয়ের বাতি।
পদ্মা জ্বালাইন্ ঘিয়ের বাতি, কালী আইতে কতক্ষণ (রাম রে),
কালী আইসা দিলাইন জোকার
কালী আইসা দিলাইন জোকার, দুর্গা আইতে কতক্ষণ (রাম রে),
দুর্গা আইসা দিলাইন পানখিল। —ঐ

বিবাহের পূর্বদিন বরের বাড়ী হইতে কন্যার বাড়ীতে অধিবাসের তত্ত্ব বা 'তৈলকাপড' আসে। তত্ত্ব পাঠাইবার সময় এই গান গীত হয়—

৫৮

রামের মা কৌশল্যা রাণী বুলে তোরা আয়।
তৈল কাপড আঘিবার শুভ সময় বইয়া যায়॥
যাইতে ঐব মিথিলাতে জনক রাজার বাড়ী
সেইখানে হইব বিয়া তাহার কুমারী॥
পন্থে আছে বিঘ্ন ভয় চোর-দস্যুৰ থানা।
সুবজ না বসিতে পাটে করুক রওয়ানা॥
আঘিয়া পুছিয়া তোমরা কর আশীর্বাদ।
পুরুক মনের বাঞ্ছা কৌশল্যার সাধ॥ —ঐ

অধিবাসের তত্ত্ব যখন কন্যার বাড়ীতে আসিয়া পৌছায়, তখন যে মেয়েলী গীত গাওয়া হয় তাহা এই প্রকার—

৫৯

আনন্দে মাতিল সর্ব পুরী
চল রঙ্গ দেখি সহচরী।
মৎস আইছে ভারে ভারে, জালুয়া সহকারে
ঝাঁকায় ঝাঁকায় পূর্ণ করি,
তৈল কাপড আইসাছে ঋষিব বাড়ী

দধি আইছে ভারে ভারে, গোয়ালা সহকারে,
ভাণ্ডে ভাণ্ডে আছে সারি সারি,
তৈল কাপড আইসাছে ঋষির বাড়ী।
শঙ্খ আইছে ভারে ভারে শঙ্খারু সহকারে
দেইখা ভুলে ঝিয়ারী বহুরী
তৈল কাপড আইসাছে ঋষির বাড়ী। —ঐ

পানখিল উৎসবের দিন হইতে বিবাহের নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত প্রতিদিন বরের গৃহে যে মেয়েলী সঙ্গীত গীত হয়, তাহাতে নানা কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। এখানে রামের জন্ম কাহিনী—

৬০

স্বর্গ হৈতে লাইম্যা রাজা যজ্ঞ যে করিল,
সেই যজ্ঞে দশরথের চাইর পুত্র হৈল।
জনম লইয়া রামরে কৌশল্যার উদরে,
আনন্দ মঙ্গল জোকার অযোধ্যা নগরে।
দূত গিয়া বার্তা কইলো দশরথের আগে
জন্মিছে অপূর্ব শিশু কৌশল্যাব ঘবে।
দূত মুখে বার্তা শুন্যা হরষিত মনে
পন্নাম জানাইলো রাজা বশিষ্ঠের চরণে।
পাঞ্জি খুলিয়া, মুনি, কহিবা এখন
কিবা রাশি কিবা নাম ইহার রাখন।
মুনি বলে, তুলা রাশি রামচন্দ্র নাম
কৌশল্যার গর্ভে জন্ম নবঘনের শ্যাম।
হীরা জিরার তুষ দিয়া আগুন জ্বালাইলো
গয়া গঙ্গাব জল দিয়া গাও ধোয়াইলো।
শ্বেত নেত বসন দিয়া গাওখানি মুছাইলো,
সোনার বিচুরি দিয়া নাড়ীচ্ছেদ করলো,
সোনার একইশ কড়ি দিয়া ধাই মা বিদায় করে,
নব কুশাসন দিয়া আতুর পাতলো ঘবে। —ঐ

৬১

আনন্দে জয় জয়, আনন্দ সর্বময়
মাগো, আনন্দে ছাইছে বাড়ীঘর।
এমন ভাগ্যবতীর পুত্রের উৎসব গো
মা গো, 'আয়'রে না ধরায় বাসর।

*   *   *

নানা মত বাদ্য বাজে অযোধ্যা ভবন
আনন্দ উৎসবে আইলাইন নারীগণ।
স্বর্ণখিলি পানে তুইল্যা করিলাইন গাঁথন
একে একে পদ্মখিলি করে নারীগণ
স্বর্ণ থালে পান তুইল্যা কল্লো সমর্পণ
গেরামে গেরামে লইয়া করাইলো ভরমণ।
নানা মত বাদ্য বাজে অযোধ্যা ভবন
রাম সুন্দরী বলে পানখিল সমাপন। —ঐ

৬২

চলরে পবন, কৈলাস ভবন
যেখানে বইসে পার্বতী শঙ্কর (নারে)
বাটা ভইরা বীড পান, গুয়া দিল একুশখান
যায় রতিদেবের ভবন (নারে)
আগে দিও গুয়া পান, তারপরে নিমন্তন্
তারপরে কইও রামের বিয়া (নারে)। —ঐ

৬৩

চল গো চল গো, দুর্গা, যাই,
নিমন্তন্ন কইর‍্যা গেছে রামচন্দ্রের ছোট ভাই।
চল গো চল, গো গঙ্গা, যাই,
নিমন্তন্ন কইর‍্যা গেছে রামচন্দ্রের ছোট ভাই।
চল গো চল গো, পদ্মা, যাই,
নিমন্তন্ন কইর‍্যা গেছে রামচন্দ্রের ছোট ভাই।

চল গো চল গো, কালী, যাই
নিমন্তন্ন কইর‍্যা গেছে রামচন্দ্রের ছোট ভাই।
চল গো চল গো, লক্ষ্মী, যাই,
নিমন্তন্ন কইর‍্যা গেছে রামচন্দ্রের ছোট ভাই। —ঐ

৬৪

কইর‍্যা সিংহরথে আরোহণ, দুর্গা কল্লেন গমন,
যাইব অযোধ্যা ভবন, রাণী কৌশল্যার মনোবাঞ্ছা পুরাইতে।
সহচরী গো, তোরা যাইবি গো, শ্রীরামের উৎসব দেখিতে।
কইর‍্যা মকরেতে আরোহণ, গঙ্গা কল্লেন গমন,
যাইব অযোধ্যা ভবন, রাণী কৌশল্যার মনোবাঞ্ছা পুরাইতে,
সহচরী গো, তোরা কে যাইবি গো, শ্রীরামের উৎসব দেখিতে।
কইর‍্যা হংসরথে আরোহণ পদ্মা কল্লেন গমন,
যাইব অযোধ্যা ভবন, রাণী কৌশল্যার মনোবাঞ্ছা পুরাইতে,
সহচরী গো, তোরা কে যাইবি গো, শ্রীরামের উৎসব দেখিতে।
কইর‍্যা পুষ্পরথে আরোহণ, কালী কল্লেন গমন
যাইব অযোধ্যা ভবন, রাণী কৌশল্যার মনোবাঞ্ছা পুরাইতে,
সহচরী গো, তোরা কে যাইবি গো শ্রীরামের উৎসব দেখিতে।
কইর‍্যা গরুড়েতে আরোহণ, লক্ষ্মী কল্লেন গমন
যাইব অযোধ্যা ভবন, রাণী কৌশল্যার মনোবাঞ্ছা পুরাইতে,
সহচরী গো, তোরা কে যাইবি গো, শ্রীরামের উৎসব দেখিতে। —ঐ

৬৫

আয়' আয়' ডাক পড়েরে আকার,
আইলাইন্ ধর্মের আয়' দেও রে জোকার
আয়'রে বসিতে দেও রত্ন সিংহাসন
'আয়'রে পা পাখালিতে দেও রে ভৃঙ্গারে জল। —ঐ

৬৬

আইজ রাণী হরষিত মনে, লক্ষ্মণরে পাঠাইয়া দিলা দুর্গার কারণে।
যোড় হস্ত কইর‍্যা লক্ষ্মণ নিমন্তন্ন করে, যাইতে হবে
দুর্গা মা গো।

শ্রীরামের উৎসবে তোমার যাইতে হবে।
আইজ রাণী হরষিত মনে, ভরতেরে পাঠাইয়া দিল
গঙ্গার কারণে,
যোড হস্ত কইর‍্যা ভরত নিমন্ত্রন্ন করে, যাইতে হবে
গঙ্গা মা গো,
শ্রীরামের উৎসবে তোমার যাইতে হবে।
আইজ রাণী হরষিত মনে, লক্ষ্মণরে পাঠাইয়া দিল
পদ্মার কারণে,
যোড হস্ত কইর‍্যা লক্ষ্মণ নিমন্তন্ন করে, যাইতে হবে
পদ্মা মা গো,
শ্রীরামের উৎসবে তোমার যাইতে হবে।
আইজ রাণী হরষিত মনে, ভরতের পাঠাইয়া দিল
কালীর কারণে,
যোড হস্ত কইর‍্যা ভরত নিমন্তন্ন করে, যাইতে হবে
কালী মা গো,
শ্রীরামের উৎসবে তোমার যাইতে হবে।
আইজ রাণী হরষিত মনে, লক্ষ্মণরে পাঠাইয়া দিল
লক্ষ্মীর কারণে
যোড হস্ত কইর‍্যা লক্ষ্মণ নিমন্তন করে, যাইতে হবে
লক্ষ্মী মা গো,
শ্রীরামের উৎসবে তোমার যাইতে হবে। —ঐ

৬৭

স্বর্গেতে ধুম্‌ধুমি বাজে মর্ত্যে বাদ্য বাজে
রামের বিয়ার শব্দ শুন্যা দেবগণ সমাজে।
ব্রহ্মা সাজে, বিষ্ণু সাজে, সাজে মহেশ্বর,
সোনার চৌদলে সাজে রাম রঘুবর।
হাতীর পিষ্ঠে সাজান করে ভরত শত্রুঘ্ন,
পুষ্পের পথে সাজন করে ঠাকুর লক্ষ্মণ।

রাম শিঙা, শ্যাম শিঙা, শিঙা, ঘণ্টা তাল,
ঢাক আর ঢোল বাজে কাঁস করতাল।
শত শত মালী চলছে সোনার মশাল হাতে,
পঞ্চ শব্দ বাদ্য লইয়া চলছে মিথিলাতে।
জনক রাজার বাডীর সামনে ঢাক দিল বাড়ি,
জনক রাজার বাডীব লোকে দিল জয়ধ্বনি।
জনক রাজা জিজ্ঞাস করে করিয়া বিনয়,
এই দুইটী ছাইল্যা, মুনি, কাহার তনয় ?
দশরথ নামে রাজা অযোধ্যা ভুবন
তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ।
ধনুকের ঘরে রাজ গেলেন তখন,
ধনুক ধরহ বাম বলে সর্বজন।
যত যত রাজা ছিল ভাবিল অন্তরে
দেখিব কেমন শিশু ধনুভঙ্গ করে।
শ্রীরাম বলেন শুন বশিষ্ঠ মহাশয়
আজ্ঞা কর করিব কি ধনুক ধারণ ?
এতেক বলিয়া রাম সহাস্য বদনে,
ধনুক ধরিল করে দেখলো সবজনে।
ধনুকেতে দিয়া বাণ গুণে দিল টান
'মড মড' শব্দে ধনু হৈল দুইখান।
দেখিয়া জনক রাজা হরষিত মন
পঞ্চ শব্দ বাদ্য বাজে মিথিল ভুবন।
স্বর্গ কাঁপে মর্ত্য কাঁপে কাঁপে চরাচর
কৈলাসেতে থাক্যা কাঁপে পার্বতী শঙ্কর।
পার্বতী উঠ্যা বলে, শুন মহেশ্বর,
আইজ কেনে কৈলাস আমার করে টলমল ?
শঙ্করে উঠ্যা বলে, শুনহে পার্বতী,
ভাঙিছে হরের ধনু সীতার হৈছে পতি।

দশরথের পুত্র সেই রাম রঘুবর
জানকীরে লইয়া যায় অযোধ্যা নগর।
রাবণের মৃত্যু বীজ আইজ হৈল রোপণ,
দিনমণি বলে ভাগ্যে যার যেমন। —ঐ

৬৮

পান পত্র নিমন্তন্ন প্রতি ঘরে ঘর
দূত পাঠাইয়া দিল অযোধ্যা নগর।
পন্নাম করিয়া দূত কয় যোড হাতে
জনকে পাঠাইছেন, মুনি, তোমার সাক্ষাতে।

* * *

রাম বলে, শুন, মুনি, নহেত বিহিত
বিনা নিমন্তনে গেলে শুনিতে কুচ্ছিৎ।
মুনি বলে, শুন রাম, এমত বল কেনে?
স্বয়ম্বরে যাইতে ধর্ম লেইখ্যাছে পুরাণে।
সাজিলেন রামচন্দ্র কৌশল্যার নন্দন
বিশ্বামিত্র লইয়া চলে মিথিলা ভুবন।
আগে যায়রে বিশ্বামিত্র পাছে যায়রে রাম,
তার পাছে চইল্যা যায় লক্ষ্মণ গুণধাম।
দুইটি ছাইল্যা লইয়া মুনি এক বৃক্ষ তলে,
বেলা অবশেষে যায় ভাগীরথী কূলে।
নিশি পোহাইল রামের অথিত বাসরে
বিশ্বামিত্র লইয়া চলে মিথিলা নগরে।
মুনিকে দেখিয়া রাজা উঠিল তখনে,
পাদ্য অর্ঘ দিয়া মুনির বসাইলো আসনে।
তবে রাজা জিজ্ঞাস করে করিয়া বিনয়,
এই দুইটি ছাইল্যা মুনি, কাহার তনয়?
এই দুইটি ছাইল্যা রাজা দুর্বাদল শ্যাম
দশরথের প্রধান পুত্র রামচন্দ্র নাম।

তাহার বৈমাত্র ভাই অনুজ লক্ষ্মণ
স্বয়ম্বর দেখতে আইছে তোমার ভূবন।
হরের হাতের ধনু গোটা আছে আমার ঘরে
এই ধনুতে গুণ দিতে কেবা জন পারে।
এই ধনুতে গুণ দিতে যেবা জন পারে
পূর্ণ লক্ষ্মী সীতা আমি দানে দিব তারে।
মুনি বলে রামচন্দ্র ধনু ভাঙ গিয়া
পূর্ণ লক্ষ্মী সীতা দেবী তুমি কর বিয়া।
রাম বলে, লক্ষ্মণ ভাইরে, আন ধনুখান
বিক্রম করিয়া কিছু পুরাই সন্ধান।
লক্ষ্মণে আনিয়া ধনু থইলো রামের বায়
ঘিলায় মাজিয়া ধনু করলো পরিষ্কার।
যত যত রাজা উঠে ভাঙিবারে
পর্বত সমান ধনু তুলিতে না পারে।
একে একে রাজগণ পাইয়া অপমান
পূর্বমত বসিলেন যার যেই স্থান।
ধনু হস্তে লইয়া রাম জিগায় মুনি স্থানে
কোন্ পৃষ্ঠে দিবাম বাণ কহ মুনিগণে।
বুকে দিয়া দিলে বাণ কেবা কারে জানে
পৃষ্ঠ দিয়া দিলে বাণ সভার বাখানে।
বাম হস্তে ধনু নিয়া দক্ষিণ হস্তে টান
'মড় মড' শব্দে ধনু হইল দুইখান।
স্বর্গ কাঁপে মর্ত্য কাঁপে কাঁপে চরাচর
কৈলাসে থাকিয়া কাঁপে পার্বতী শঙ্কর।
জল কাঁপে স্থল কাঁপে পর্বত গভীর
লঙ্কাতে থাকিয়া কাঁপে রাবণ মহাবীর।
লঙ্কাতে থাকিয়া রাবণ বলছে হায় হায়,
পচা ধনু ভাইঙ্গ্যা রামে সীতা লইয়া যায়।

পরশুরাম জিন্যা রাম আপন দেশে গেল
বধূ দেইখ্যা পরিতোষ সকলেই হৈল। —মৈমনসিংহ

এই উপলক্ষে শকুন্তলার বিবাহের কাহিনীও গীত হয়—

৬৯

চন্দ্রবংশে জন্মিল দুষ্মন্ত নরপতি
করিব গন্ধর্ব বিয়া শকুন্তলা সতী
তপোবনে আছিল রাজা যতেক তফাৎ
দূত গিয়া বার্তা কৈল রাজার সাক্ষাৎ।
মৃগ অন্বেষণে রাজার রঙ্গ হইল মনে
সরোবর স্থানে দেখা শকুন্তলার সনে।
এক বর্ণের তিন কন্যা নামিয়াছে জলে।
কমলের পুষ্প যেন ফুটিয়াছে জলে।
চম্পকের কলি যেমন জলে ভাইস্যা যায়,
থির বিজলীর শোভা মনে সন্দে পায়।
সর্বাঙ্গে সুন্দব কন্যা অতি দীর্ঘ টান
কি দিয়া না বিধি তারে কইরাছে নির্মাণ।
এক কন্যা দেখে রাজা অধিক সুন্দর
রূপেতে কইরাছে তার পবাণ ফাঁপর।
ভরুর ভঙ্গিমা দেখ্যা হৈছে অনুমান
কন্দর্প লামাইয়া রাখছে তার ধনুখান।
এক দৃষ্টে চায় রাজা রূপ নিরখিয়া
ধর্ম হারা হৈল রাজা বিয়ার লাগিয়া।
তত্‌ক্ষণে শকুন্তলা করিল সুদৃষ্টি
রথের উপর দেখে মদন মুরতি।
সখি বুলে, শকুন্তলা, একি কুস্বভাব
হাসাইয়া মুনির পুরী রাখিবা খেতাব।
অবিবাহিত কন্যা তুমি মুনির কুমারী
পরপুরুষে দেখলো বল্যা লজ্জা নাই তোমারি

সখির বচনে কন্যা লজ্জিত হইল মনে
চাঁচরে ঢাকিয়া মুখ ডুব দিল তখনে।
কিছু দূর যায় রথ চল্যা ধীরে ধীরে
ততক্ষণে শকুন্তলা উঠিল গো তীরে।
আস্তে বেস্তে চল্যা যায় মুনিব ভবন
বস্ত্র শয্যা ছাইড়া কন্যার ভূমিতে শয়ন।
কন্যারে না দেইখ্যা রাজা চায় চাইর দিকে
কোন্ পথে গেল কন্যা আঁখিব নিমিষে।
কেমন পাষাণ মন ব্রাহ্মণেতে মজে
যা হউক তা হউক রত্ন ছাড়ব না সহজে।
শুন্যাছি এইখানে মুনি কণ্বের আশ্রম
তারি এ পালক কন্যা কইছে আমার মন।
না কইযা না বল্যা কন্যা কেন্ বা তাড়াতাড়ি
চউক্ষে চউক্ষে চাইয়া চাইয়া চল্যা গেল নারী
কোন্ পথে বা গেল কন্যা কাব বা গৃহেতে
যে হউক সে হউক আমি যাইবাম সাক্ষাতে।
ভূমিতলে পইড়া শকুন্তলা অচেতন
ময়ূর পাঙ্খার বাতাস করে সখি দুইজন।
শীতল চন্দন লেপে শকুন্তলার গায
চউক্ষে মুখে সুশীতল জল না ছিটায়।
ততক্ষণে শকুন্তলা চৈতন্য পাইল
প্রিয় সখি পানে চাইয়া কহিতে লাগিল।
তোদের সঙ্গে গিয়াছিলাম সেই না সরোবরে
দেখ্যাছি পুরুষ এক রথের উপরে।
রথের উপর বইস্যা আছে মদন মূরতি
দেখ্যাছি অবধি আমার অস্থির হৈছে মতি।
সখির কাছে কইছে কথা লজ্জা-সরম ছাড়ি
যেখান হৈতে পাও তারে আন শীঘ্র করি।

সখি বুলে, শকুন্তলা, ঠেকাইলা দায়
এত রাত্রে মনের মানুষ কোথায় পাওয়া যায়!
এই কথা শুন্যা রাজা সাক্ষাতে দাঁড়াইল
একে একে তিন সখি বলিয়া উঠিল।
এত রাত্রে কেবা তুমি আইলা একেশ্বর
মনে মনে নাই কি তোমার ব্রহ্মশাপের ডর?
এই কথা শুন্যা রাজা হরষিত মনে
হাস্য পরিহাস করে সখিদের সনে।
তোমাদের কাছে আমি করি নিবেদন
শকুন্তলা নাম রইলো কিসের কারণ?
শুক পক্ষী রাখে তারে পাখে আচ্ছাদিয়া
শকুন্তলা নাম হৈল তেই সে লাগিয়া।
এক সখি জিজ্ঞাস করে শকুন্তলার মন
রাজারে জিজ্ঞাস করে দিয়া সিংহাসন।
আর সখি জিজ্ঞাস করে শকুন্তলার পাশে
ভাব্যা দেখ পাইছ কিনা মনের মানুষে।
এক সখি চল্যা গেল মুনির সন্ধানে
আর সখি চল্যা গেল দেব নিমন্ত্রণে।
এক সখি চল্যা গেল পুষ্পের কারণে
আর সখি গাঁথে মালা অতিশয় যতনে।
পুষ্পমালা গলে দিয়া শকুন্তলা সতী
হর যেমন তুষ্ট হৈল পাইয়া পার্বতী। —ঐ

এইবার রুক্মিণীর বিবাহের কাহিনীও শুনিতে পাওয়া যাইবে—

৭০

বিদর্ভ রাজ্যের রাজা ভীষ্মক নরপতি
তার ঘরে আছেন কন্যা রুক্মিণী সুন্দরী
কামের কামিনী কন্যা অতি বুদ্ধিমতী
শিশুকাল হৈতে বাঞ্ছা কৃষ্ণ হৈত পতি।

দিনে দিনে বাড়ে কন্যা যৌবন পরেশ
স্বয়ম্বর দিতে রাজার হইল আদেশ।
পাত্র মিত্র সঙ্গে রাজা পণ্ডিত সহিত
শুভক্ষণে লগ্ন করে বিয়ার শুভ দিন।
চতুর্থ দিনে অধিবাস পঞ্চম দিনে বিয়া
নানা দেশী রাজাগণ আনে নিমন্ত্রিয়া।
পান পত্র নিমন্তন লইয়া চলে দূতগণ
যত দেশে যত রাজা আছিল তখন।
প্রথমে জানাইল গিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণে
তার শেষে নিমন্ত্রিল যত দেবগণে।
ব্রহ্মা আসে, বিষ্ণু আসে, আসে মহেশ্বর
আর যত মুনি আসে ত্বরিত গমন।
অন্ধরাজা বন্ধরাজা আসিল সত্বর
দ্বারকা হইতে আসে কৃষ্ণ দামোদর।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা বন্দিল চরণ
সকলকে বসিতে দিল রত্ন সিংহাসন।
স্নান করে রুক্মিণী মাগো গন্ধতেল গায়
অধিবাস করাইল রুক্মিণীর মায়।
শঙ্খ আর কঙ্কণ পরি করে ঝলমল
নাকেতে মুক্তার দানা কানেতে কুণ্ডল।
চরণে নূপুর দিল গলায় গজল
থ্‌থারু পাতা আর দিল সর্বানন্দী মল,
নীলাম্বরী শাড়ী পরে মুখে স্বর্ণ জাল
অঙ্গেতে তুলিয়া পরে গঙ্গাজলি শাল।
কপালে সিন্দূর দিল মোমেতে মিলাইয়া
সপ্ত ঋষি আছে যেমন ভুঁই পানে চাইয়া।
সাজাইয়া পরাইয়া কন্যা আনিল সভায়
দেখিয়া সভার লোক করে হায় হায়।

কেহ বুলে এমন রূপ না দেখি কখন
কেহ বুলে কামের কামিনী এই জন।
কেহ বুলে এ রমণী স্বর্গের ইন্দ্রাণী
কেহ বুলে হবে এই শিবানী ব্রাহ্মণী।
কেহ বুলে শাপভ্রষ্টা লক্ষ্মী এই হবে
কেহ বুলে উর্বশী কি তিলোত্তমা তবে।
কেহ বুলে মানবী না লয় মোরে মন
কেহ বুলে করে কন্যা মোরে নিরীক্ষণ।
কৃষ্ণেরে দেখিয়া কন্যা করিল গমন
কৃষ্ণের গলায় মালা দিল করিয়া যতন।
ইহা দেখ্যা মনে মনে দুঃখিত হইয়া
সভার লোক চল্যা গেল সভা ভঙ্গ দিয়া।
রুক্মিণী পাইয়া কৃষ্ণ হরষিত মনে,
দ্বারকা নগরে চলে ত্বরিত গমনে।
মায় বুলে মোর ঝি বড ভাগ্যবতী
আসনে বসিয়া পাইল কৃষ্ণ হেন পতি।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ দুইটি অন্তরে স্মরিয়া
সুনীতি রচিল গীত রুক্মিণীর বিয়া। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটিতে সুভদ্রার বিবাহের কথা শুনিতে পাওয়া যাইবে।

৭১

চল সখি দ্বারকায় সেখানে দেখিব হায়,
কি করেন শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন,
অর্জুন বইসাছে রঙ্গে সভা করি কৃষ্ণের সঙ্গে
পরিপাটি মিল্যাছে দুইজন।
রত্ন অলঙ্কার পরি সুভদ্রা না সুন্দরী
যায় তখন অর্জুনের সাক্ষাতে
হাতের পাশা ভূমিৎ থইয়া অর্জুন রহিল চাহিয়া
মূর্ছা গেল রূপের ঝল্‌মলিতে।

ইহা দেখ্যা নারায়ণ হাইস্যা আকুল হন
তুলিলেন অর্জুনের হস্ত ধরি
অর্জুন বুলে, নারায়ণ, এক কথা নিবেদন
এই কন্যা কাহার কুমারী।
রূপে গুণে অতিশয় বলরামের ভগ্নী হয়
অবিবাহিত কন্যা পিতার ঘরে।
কৌরবে পাণ্ডবে বাদ তাতে কন্যা দিতে সাধ
কিবা লইছে কৃষ্ণের অন্তরে।
বলরাম বড় ভাই তার কাছে জিজ্ঞাসা চাই
এই কন্যা আইবে স্বয়ম্বর।
তুমি কৃষ্ণ দিলে বিয়া কি করিবে নিষেধ দিয়া
আমি কইলাম হউক স্বয়ম্বর। —ঐ

৭৬

দ্বারকা নগরে গিয়া রাজা অইলেন হরি
তার ভগ্নী রূপবতী সুভদ্রা সুন্দরী।
বয়সে ষোড়শী কন্যা পরথম যৈবন
চিন্তাযুক্ত অইলেন হরি বিয়ার কারণ।
চলিলেন নারায়ণ অর্জুনের কাছে
বইস্যা আছে পঞ্চ ভাই রাজসভার মাঝে।
শিব মন্ত্র জপ তুমি, পাণ্ডুর নন্দন
আমার ভগ্নী সুভদ্রারে কর গ্রহণ।
চলিলেন নারায়ণ অর্জুন সহিতে
উপস্থিত অইলেন দ্বারকা পুরীতে।
বসিতে আসন আইন্যা দিলেন রুক্মিণী
সুভদ্রা সাজাইতে যায় সত্যভামা রাণী।
কোমরে তুলিয়া পরে অগ্নিপাটের শাড়ী
অগ্নির মত ঝল্মল্ করে সুভদ্রা সুন্দরী।
চরণে তুলিয়া পরে বাজন নূপুর
রুমুঝুমু শব্দ যেমন গুঞ্জরে ভমর।

হস্তেতে পরিল শঙ্খ নাম রাম-লক্ষ্মণ
তাহার নিকটে শোভে কাশিয়ার কঙ্কণ।
গলাতে তুলিয়া পরে গজমতি হার
বাহুতে তুলিয়া পরে কনকদণ্ড তাড।
কানেতে তুলিয়া পরে মকর কুণ্ডল
নাকেতে তুলিয়া পরে নবমুক্তা ফল।
কপালে তুলিয়া পরে সিন্দূরের ফোঁটা
চন্দ্রের নিকট যেমন তারা গোটা গোটা।
ভরুতে তুলিয়া পরে কাজলের রেখা
যেমন আশমানে দেয় রামধনু দেখা।
কাঁকইয়ে আঁচডাইয়া চুল বাইন্ধ্যা দিল খোঁপা
খোপার উপরে দিল গন্ধরাজ চাঁপা।
সাজাইয়া পরাইয়া হস্তে দিয়া মালা
সত্যভামা সঙ্গে কর‍্যা সভা মধ্যে গেলা।
শিবমন্ত্র জপ তুমি সদা শিব তোষি
ইহারে করিও তোমার শিবপূজার দাসী।
সুভদ্রা পরাইল মালা পদ্ম হস্ত দিয়া
সুনীতি রচিল গীত রুক্মিণীর বিয়া। —ঐ

সাবিত্রী আদর্শ সতী , সুতরাং বিবাহ উপলক্ষে তাঁহার কথা শুনিতে পাওয়া আরও স্বাভাবিক,

৭২

মদ্র দেশে আছিল রাজা, অশ্বপতি নাম
পুত্র কন্যা নাই যেমন ফুল শূন্য বাগান।
চাইর দিকে নাম যশ প্রতিষ্ঠা তার ভারি
ভাডার ঘরে মণিমুক্তা যায় গডাগডি।
লক্ষ্মীর আসন পাতা মাইঝ মঞ্চ তলে
দিন নাই রাত্রি নাই ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলে।
স্বভাবে চঞ্চলা লক্ষ্মী অচলা তার ঘরে
লক্ষ্মীরে কইরাছে তুষ্ট রাজা কি কৌশলে।

স্বর্ণ সিংহাসনে বইস্যা করেন বিচার
স্বর্ণ ছত্র ধইরা রাখছে মস্তকেতে তার।
সোনার ভিঙ্গারে কইরা সিনান করায়
সোনার থালে পায়েস কইরা রাজারে খাওয়ায়।
সোনার ঝারিতে রাজা পাখলিয়া মুখ
সোনার খড়িকা দিয়া করে দন্ত শোধ।
সোনার বাটাতে রাজা পদ্ম খিলি খায়
সোনার খাটেতে শুইয়া সুখে নিদ্রা যায়।
কাছে বইস্যা রাণী তার পরমা সুন্দরী
রাজারে বাতাস করে ময়ূর পাঙ্খা ধরি।
লাখে লাখে হাতী ঘোড়া রথের সাজান
রাজ্যি জুইড্যা ফল আর ফুলের বাগান।
তার মইধ্যে কত বৃক্ষ আছে সারি দিয়া
পঙ্খীগণ করে রব ডালের মাঝে বইয়া।
ফুলের যোগান দিয়া নিত্য নিত্য ভোরে,
বাগানেতে থাইক্যা মালী চাঁচা ছুলা করে।
শানেতে বান্ধা ঘাটে বইস্যা রাণী মাজে গা
পাছে দিয়া ফেইল্যা আইস্যা চুপে চুপে পা।
দুই হস্ত দিয়া রাজা রাণীর মাঞ্জা ধরে
আল্‌গছে তুইল্যা নিয়া জলের মাঝে পড়ে।
কোন দিন জল খেলা করে রাণীদের সনে
কোন দিন বা চইল্যা যায় মৃগয়ার কারণে।
এই মতে সুখের রাজ্যে সুখে করছে বাস
একদিন দূত আইস্যা কয় রাজার কাছ।
গুপ্ত ভাবে থাইক্যা শুন্‌ছি প্রজাগণে কয়
আটকুড় রাজার রাজ্যে থাকন উচিত নয়।
এই কথা শুন্যা রাজা কোন কাম করিল
রাণীর মহলে যাইয়া উপস্থিত হৈল,

কি কর, মহিষী, আরে শুন্‌ছনি এক কথা,
আটকুড কইয়া গালি পাড়ে দেশের মত প্রজা।
রাজকার্য কর্তে আমি মনে পাইনা সুখ
ভোবে উঠ্যা দেখতে চায়না আটকুডেব কেউ মুখ
রাজপাট ছাইড়া রাণী যাইগা চল বনে
থাকতে গেলেই ঐ সব মন্দ শুন্তে হইবে কানে।
সুনীতি কয় শুন্যা ৰাণীর মুখখানি হৈল কালা
রাজারে উঘাবি বলে আপন দুঃখের জ্বালা।

দুই চউক্ষেৰ জল কবছে ছল ছল
বাজবাণী তাবে কইল
গত হৈল কাল বংশের দুলাল
মোর ঘবে না জন্মিল।
মিছা দেবী দেবা কবিলাম সেবা
তীর্থে তীর্থে দৌড়া দৌড়ি
আশায আশায় থাইক্যা দিন যায
না জন্মিল পুলা পুবী
রাজ্য ধন জন হৈল অকারণ
জল পিণ্ডের গতি কিবা
লোকে আটকুড়ী কহিলে কিবা কবি
আছিল কর্মেব লেখা,
শুনিতাম আগে লোকেরে কহিতে
পুত্রেষ্টি যাগেব কথা
তাই, রাজা, কর ধর্ম পথ ধৰ
ঘুচিবে মনেব ব্যথা।
লোকের কথায় কিছুত না পায়
তাও আমি বুঝি, রাজা,
আপন মনের আগুনে আপনে
হইলাম ভাজা ভাজা।

সংসারে সকলে স্ত্রীরে ক্ষেত্র বলে
তা হৈতে ফলে সন্তান।
যদি জন্মে ভরা থাকে আটকুড়া
এই ক্ষেত্রের কিবা কাম।
একটু দেখিয়া কর তুমি বিয়া
দিব অনুমতি স্বামী,
সতীন পুত্র থাকে মা আসিয়া ডাকে
তবু ভাগ্যবতী আমি।
রাজা কয়, রাণী, তোমার কথা মানি
দৈব বল বড বল
শাস্ত্রে-পত্রে কয় মিথ্যাত না হয়
যোগ্য মত হৈলে ফল।
গুরু পুরোহিত সবের সহিত
রাজা মন্ত্রণাতে বইল,
দেখিতে দেখিতে পক্ষ না যাইতে
যাগের উদ্‌যোগ হৈল।
পাইয়া নিমন্তন্ আইল মুনিগণ
যত ঋষি ব্রহ্মচারী,
মঙ্গল আচারে বেদমন্ত্র পড়ে
থাইক্যা সবে অনাহারী।
সাত দিন পরে যজ্ঞ শেষ কইরে
যখন দিব আহুতি
যজ্ঞ কুণ্ড হৈতে দেখে আচম্বিতে
উঠিল দেবীর মূর্তি।
কহে দৈববাণী শুন রাজা রাণী
যজ্ঞে তুষ্ট হইলাম,
তনয়া হইয়া গর্ভে জন্ম লইয়া
পুরাইবাম মনস্কাম,

এই মাত্র কইয়া গেল মিলাইয়া
হরষিত মন মুনি,
মনেতে ভাবিল যজ্ঞ সিদ্ধ হৈল
ফল পাইল রাজা রাণী।
শান্তি কুম্ভ কাছে রাজা রাণী বইসে
শান্তি পড়ে পুরোহিত।
দৈববাণী কথা না হৈল অন্যথা
সুনীতি রচিল গীত।

যথাকালে হৈল রাণীর গর্ভের লক্ষণ
সাত মাসে করাইল সাদ ভক্ষণ।
দশ মাসে রাজ্য মধ্যে উঠে কলরব
পরমা সুন্দরী কন্যা হৈয়াছে প্রসব।
রূপেতে ছাইয়াছে তার রাজ অন্তঃপুর,
শুন্যা হরষিত হৈল রাজার অন্তর।
ঢোলের ঘোষণা পড়ে পরগণা জুড়িয়া
দীন দুঃখী অন্ধ আইস্যা ধন যায় লইয়া।
ব্রাহ্মণ ডাকিয়া করে দুই হাতে দান
সোনা রূপা ধেনু তোলা বস্ত্র থান থান।
দৈবজ্ঞ ডাকিয়া করে লগ্নের ঠিকানা
দেখিয়া কন্যার রূপ হইল দেওয়ানা,
এমন সুন্দর রূপ কেউ ন্যাহি দেখে
যে অঙ্গ নেহারী চায় সেই অঙ্গে ঠেকে।
নৃপতির মন যেমন দুঃখেতে দহিত
কন্যা দেইখা জুড়াইল জ্বালা-পোড়া যত।
কেউ না দেখ্যাছে এমন রূপের কাঠাম
লগ্ন ঠিক কইরা রাখলো সাবিত্রী তার নাম।
দিনে দিনে বাড়ে কন্যা পুন্নিমার শশী
লালিয়া পালিয়া রাণী মনে বড় খুসী।

পুত্র না জন্মিল তাতে কিবা আসে যায়
কন্যার মত কন্যা হৈলে স্বর্গেতে পৌঁচায়
আদরে সোহাগে রাণী রাখে সর্বক্ষণ
নিশিদিন বুলে তারে মধুর বচন।
আইস আইস কোলে আইস সাবিত্রী গো মাতা,
নয়নের মণি তুমি পরাণের দুহিতা।
এতদিন হৈয়া আছলাম যেমন শুষ্ক লতা
শুষ্ক গাছে মুঞ্জরিলে তুমি পুষ্পপাতা।
দুঃখিনী মায়ের তুমি সাগর সেচা ধন
সাবিত্রীরে কোলে লইয়া মা করে চুম্বন।
রাজা রাজকার্য সাইরা কাছে আইস্যা বইসে
নানা মত বস্তু দিয়া সাবিত্রীরে তোষে।
সাবিত্রী হৈয়াছে তার গলার যেমন মালা
সর্বদা লইয়া তারে করে আলাঝালা।
এই মতে রাজা রাণীর আহ্লাদে দিন যায়
বাল্যকাল গিয়া কন্যার যৈবন পরকাশ পায়।
মনে মনে রাজা তখন কল্লেন বিবেচনা,
নিজে না করিবেন কন্যার পাত্রের ঠিকানা।
সাবিত্রী তার দেখ্যা আইস্যা যার কথা বলে,
তার হাতে দিবেন তুইল্যা সাবিত্রী কমলে।
একদিন সাবিত্রীরে কল্লেন অনুমতি,
দেখ্যা শুন্যা ঠিক করিতে নিজের যোগ্য পতি
দাস দাসী লইয়া কন্যা রথে চইড়া যায়,
এক রাজ্য ডাইনে থইয়া এক রাজ্য যায়।
কত দেশ কত রাজ্য করিল ভরমণ
খুজ্যা না পাইল বর মনের মতন।
মনের দুঃখেতে কন্যা ফিইরা যখন আইসে
চান্দের মত পুরুষ দেখলো রথের কাছে।

আগল আগল চক্ষু দুইটী পরথম যৈবন
তারে দেইখ্যা টল্যা গেল সাবিত্রীর মন।

জিজ্ঞাসি লোকের কাছে পাইল সন্ধান,
রাজা দ্যুমৎসেনের পুত্র নাম সত্যবান্।
বিধির নির্বন্ধ বল কে খণ্ডাইতে পারে
কন্যা আইস্যা তার কথা জানাইল রাজারে।

* *

হরি গুণ গাইয়া আইলাইন নারদ তপোধন
রাজা দিলাইন পাদ্য অর্ঘ্য বসিবার আসন।
নারদ বুলে যৈবনকাল দিল আইস্যা দেখা
বিয়া কেনে দেওনা. রাজা, তোমার বালিকা
রাজা বুলে নিজে কন্যা করছে মনোনীত
বিয়া হৈব দ্যুমৎসেনেব পুত্রেব সহিত।
মুনি বুলে দ্যুমৎসেন শাল রাজ্যের রাজা
শত্রুর চক্রান্তে পইড়া ঘটে তার সাজা।
রাজ্য ধন কাইড়া নিল দিয়া তাকে ফাঁকি,
কপালের দোষে হৈল অন্ধ দুইটি আঁখি।
সেই হৈতে আছেন রাজা বনবাসী হৈয়া
বিঘোর অরণ্য মাঝে পত্নীপুত্র লইয়া।
সত্যবান্ নামে তার পুত্র এক রয়,
পিতামাতার সেবা করে ধন্য সবে কয়।
স্বভাবে সুন্দর পুত্র বড শুদ্ধাচারী
রূপে গুণে তার না তুলনা দিতে পারি।
কিন্তু বিধাতার কার্য কি কহিব হায়
এক বৎসর পরে তার মৃত্যু লেখা যায়।
এই না কথা শুন্যা রাজার চমকিয়া উঠে মন
সাবিত্রীরে নিষেধ করে মুছিয়া নয়ন।

না আন না আন, মাগো, ইহার কথা মুখে
মুনির কথা শুন্যা আগুন জ্বলিছে আমার বুকে।
জান নাকি, সুন্দর কন্যা, এই বংশের তুই বাতি
নিব্যা গেলেই আর গতি নাই আসবে ধূমাবাতি।
সোনা তোলা ভাব্যা তোরে আদর কল্লাম আমি
এখন বুঝি আমার আশা ছাই করিবে তুমি।
মনে কল্লাম তোরে দিয়া থাকবে বংশে নাম
নিষেধ করি, সাবিত্রী, তুই করিস না এই কাম।
মুনি বাক্য সত্য হৈব নাহি তার খণ্ডন
শাল রাজার হৈয়াছে মহা দুঃখের আমোল।
রাজ্য গেল চক্ষু গেল যাও যা ছিল সুত
কয়দিন পরে বাইন্ধা তারে নিবে যমের দূত।
তাই বলি, সাবিত্রী, তুমি এই নাম না লইও,
চিরায়ু পতিরে লইয়া বংশে প্রদীপ দিও।
সাবিত্রী কয় এমন কাম কেমনে পিতা হবে
আমারে বিলাইয়া দিছি আমি তারে কবে।
এখন সে অল্পায়ু হৈলে কি করিবাম গতি
প্রাণ দিয়া প্রাণ ফিইরা নিলে সতী ধর্মে ক্ষতি।
থাকে যদি দুঃখু লেখা ভোগ করিবাম তাই
মনে মনে সত্যবানে প্রাণে দিছি ঠাঁই।
এখন যদি তারে আমি ভুল্যা যাই তবে
দ্বিচারিণী তোমার কন্যা এ সংসারে কবে।
ধন্য ধন্য ধন্যরে, কন্যা, বুলে নারদ মুনি
তুমি ত সামান্য নও নারীর শিরোমণি।
তোমার সনে সত্যবানের এই মিলনের কাম
আগেই বিধি কইরা রাখছে আমরা কেন হই বাম।
শুন শুন, অশ্বপতি, আমার কথা ধর,
সত্যবানরে সুন্দর কন্যা সমর্পণ কর।

পৃথিবীতে যা কোন দিন হৈয়াছে শুনি না,
এই কন্যা দেখাইতে আইছে সতীর সেই মহিমা।

বাইজ্যা উঠলো নহবৎ বাইজ্যা উঠলো ঢোল
সাবিত্রীর ফুট্যা উঠলো বিবাহের মুকুল।
সাজায়ে গুছায়ে কন্যা রত্ন অলঙ্কারে
অশ্বপতি লইয়া যায় অরণ্য মাঝারে।
দ্যুমৎসেন রাজা করেন যেখানে বসতি
অবিলম্বে কন্যা লইয়া গেলেন অশ্বপতি।
নিকটে ডাকাইয়া আনি কুমার সত্যবান্
সোনার প্রতিমা কল্লেন সাবিত্রীরে দান।
এই মতে দরিদ্রেরে রত্ন বিলাইয়া,
দুঃখিত অন্তরে রাজা আইলেন ফিরিয়া।
কিন্তু শেষে এই কন্যা কি কাম করিল
কঠিন ব্রত আচারে এক বছর রইল।
পতিরে ধরিয়া যখন যমে—দিল টান,
সেই দিন দেখাইল সতীত্বের প্রমাণ।
পতির পরাণ পরে যমে গেল দিয়া
শ্বশুরেও রাজ্য চক্ষু পাইল ফিরাইয়া।
অপুত্রক পিতা পরে হৈলেন পুত্রবান,
একশ পুত্রের পিতা হৈলেন সত্যবান্।
সুনীতি[১] কয় জন্মে যে না দেখলো পতিমুখ,
সে কেমনে বুঝিবে পতি জিয়ানির সুখ। —মৈমনসিংহ

১ এখানে বিভিন্ন পৌরাণিক চরিত্রের যে বিবাহ বর্ণনা শুনা গেল, তাহাদের প্রায় সর্বত্রই একজনের ভণিতা শুনিতে পাওয়া গেল, তাঁহার নাম সুনীতি। তাঁহার সম্পর্কে বিস্তৃত কিছু জানা যায় না, তবে উপরের ভণিতা হইতে বুঝিতে পারা যায়, তিনি চিরকুমারী ছিলেন। নতুবা শিশুকালেই বিধবা হইয়াছিলেন। জনশ্রুতি এই, তিনি এক গ্রহবিপ্রের কন্যা। ময়মনসিংহ জিলার দিগজানে তাঁহার বাড়ী।
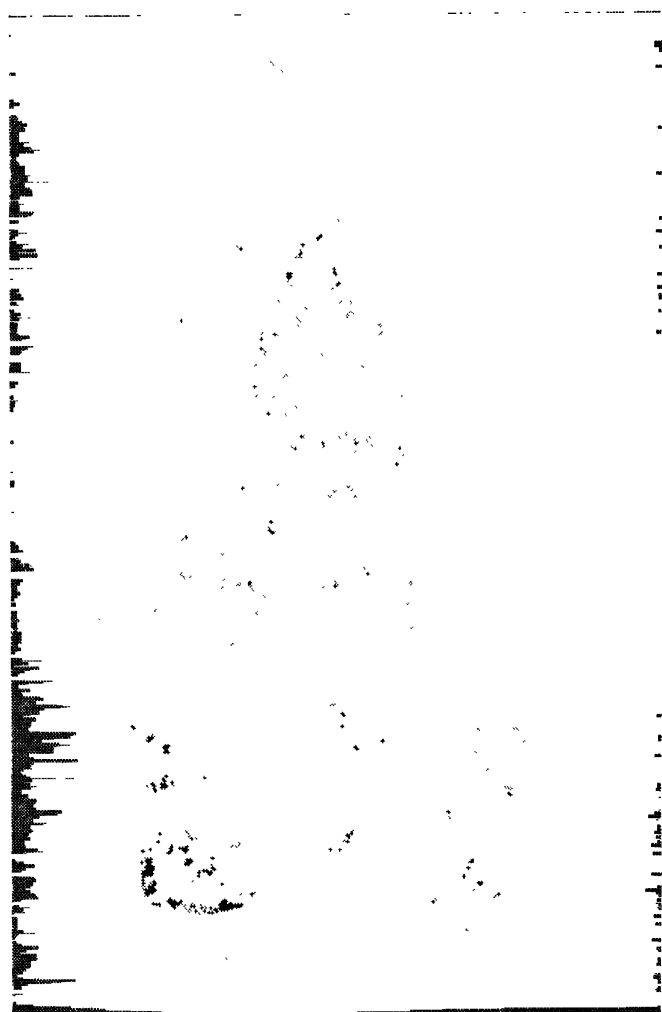
ছো-নাচের মুখোস—দুর্গা (পুরুলিয়া)

নিজস্ব সংগ্রহ

ছো-নাচের মুখোস—শিব (বেলপাহাড়ী, মেদিনীপুর)

নিজস্ব সংগ্রহ

ছো-নাচের মুখোস—গণেশ (পুরুলিয়া)

নিজস্ব সংগ্রহ

ছো-নাচের মুখোস—রামচন্দ্র (পুরুলিয়া

নিজস্ব সংগ্রহ

ছো-নাচের মুখোস—লক্ষ্মণ (পুরুলিয়া

নিজস্ব সংগ্রহ

ছো-নাচের মুখোস—শত্রুঘ্ন (পুরুলিয়া)
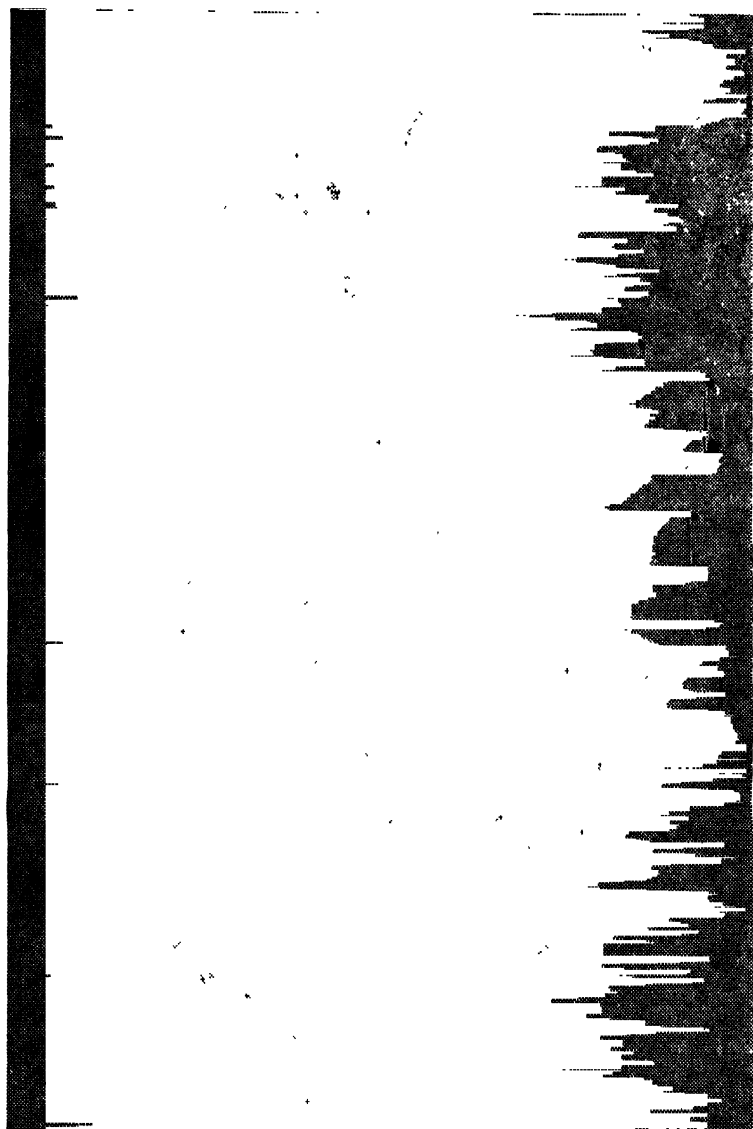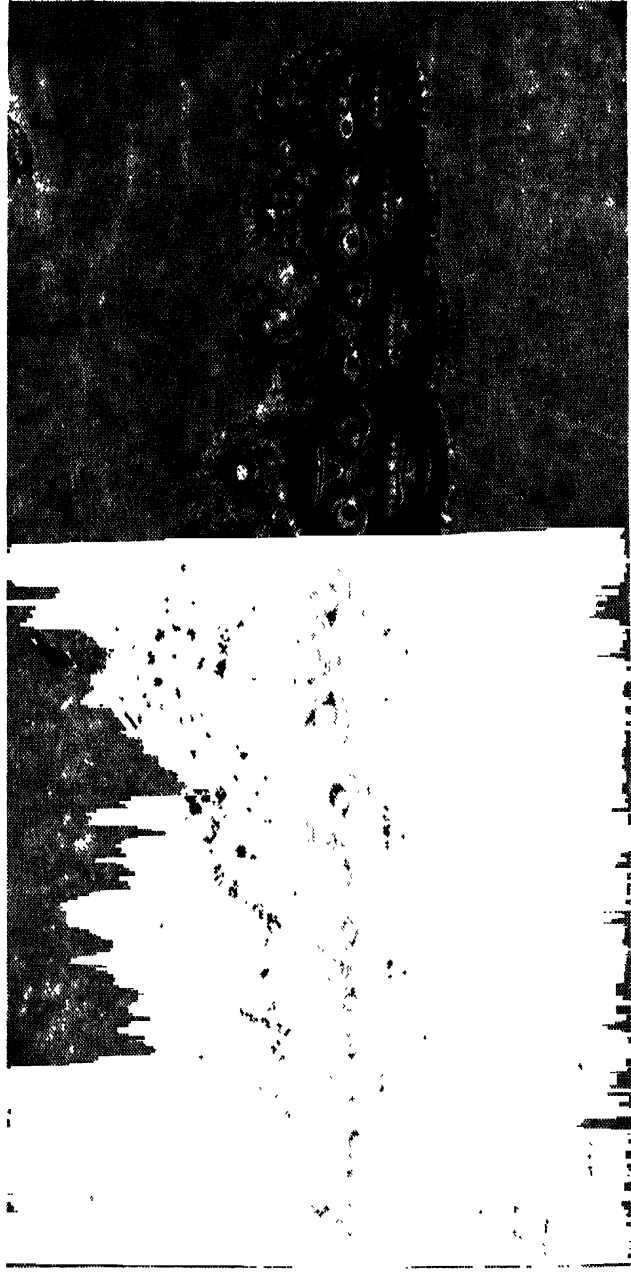
নিজস্ব সংগ্রহ

ছো-নাচের মুখোস—রাবণ
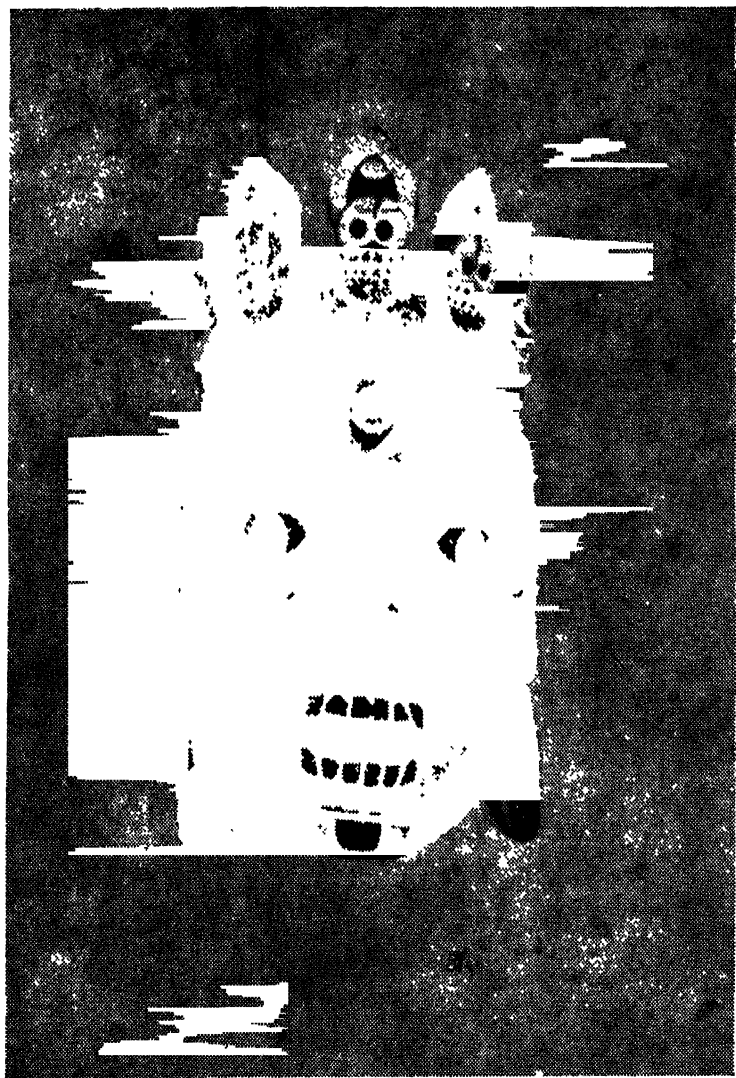
নিজস্ব সংগ্রহ

ঐন্দ্রজালিক নৃত্যের মুখোস—কাঞ্চনজঙ্ঘা (দার্জিলিং)

নিজস্ব সংগ্রহ
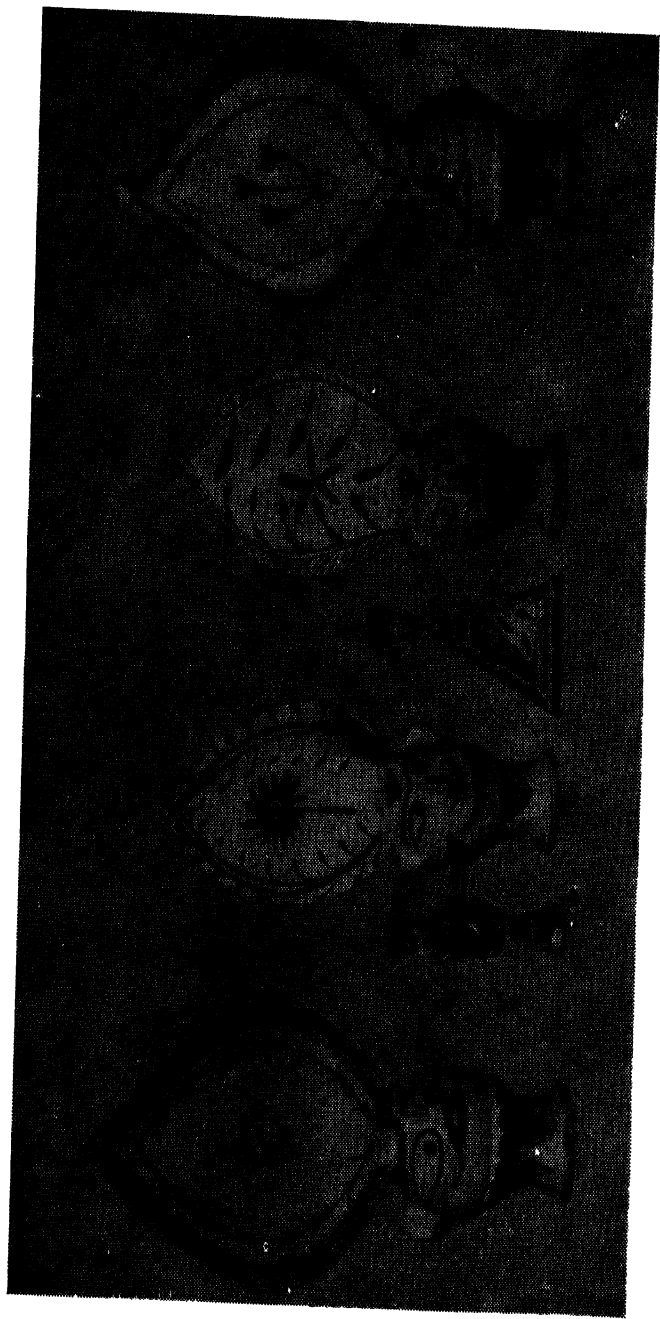
বাবাঠাকুর (২৪ পরগণা)
মধ্যে টুসু ও মনসা

নিজস্ব সংগ্রহ

বাংলার লোক-সাহিত্য, ৩য় খণ্ড

বড় গাজি খাঁ—২৪ পরগণা

পুরুলিয়া জিলার অযোধ্যা গ্রামের এক গৃহ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা স্নাতকোত্তর বিভাগের লোক-সাহিত্য শাখার ছাত্র-ছাত্রীগণ লোক-সঙ্গীত সংগ্রহ করিতেছে।
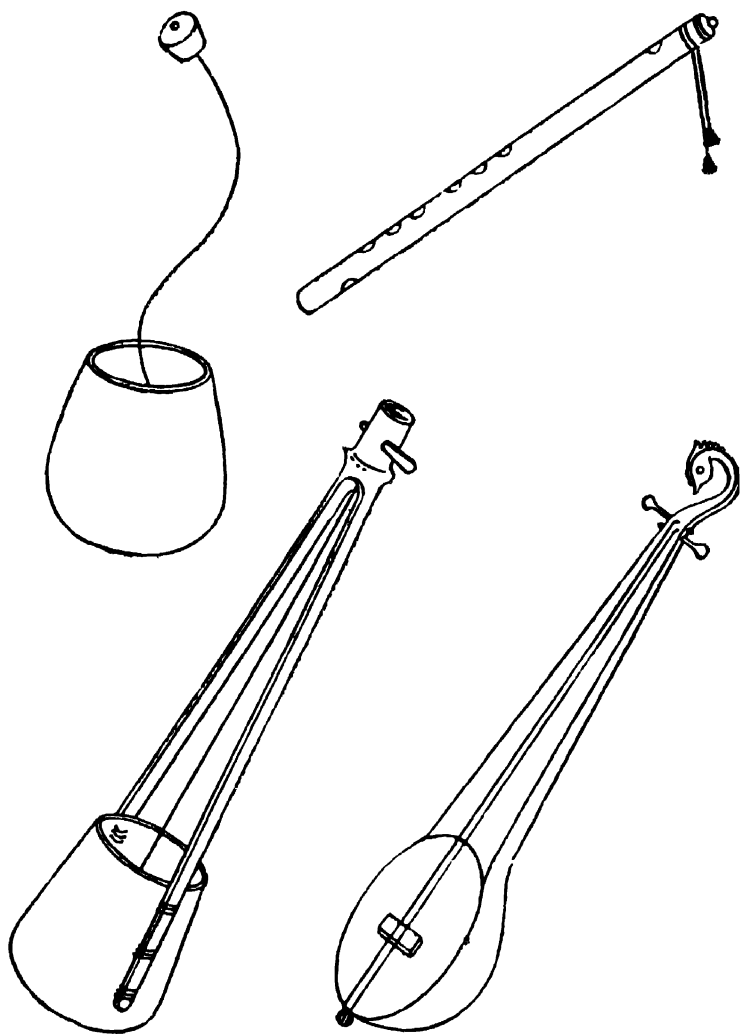
আলোকচিত্র—কমলা পেরেরা

বাংলার লোক-সাহিত্য, ৩য় খণ্ড

লোক-সঙ্গীতের বাদ্যযন্ত্র

গাবগুবাগুব বাঁশী

একতারা দোতারা

লোক-সঙ্গীতের বাদ্যযন্ত্র

করতাল মন্দিরা

ঝাঁঝর সারিন্দা কাঁসি

লোক-সঙ্গীতের বাদ্যযন্ত্র

ধাম্‌সা ঘুঙুর

মৃদঙ্গ মাদল
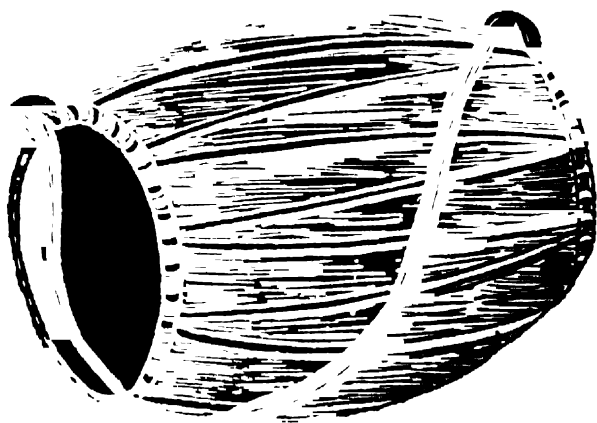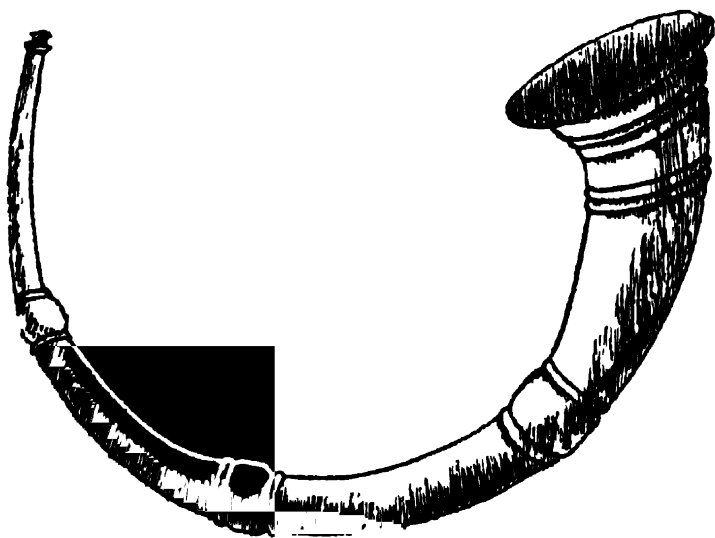
লোক-সঙ্গীতের বাদ্যযন্ত্র

শিঙা

ঢোল

লোক-সঙ্গীতের বাদ্যযন্ত্র

টিকারা ঢোলক

লাউ
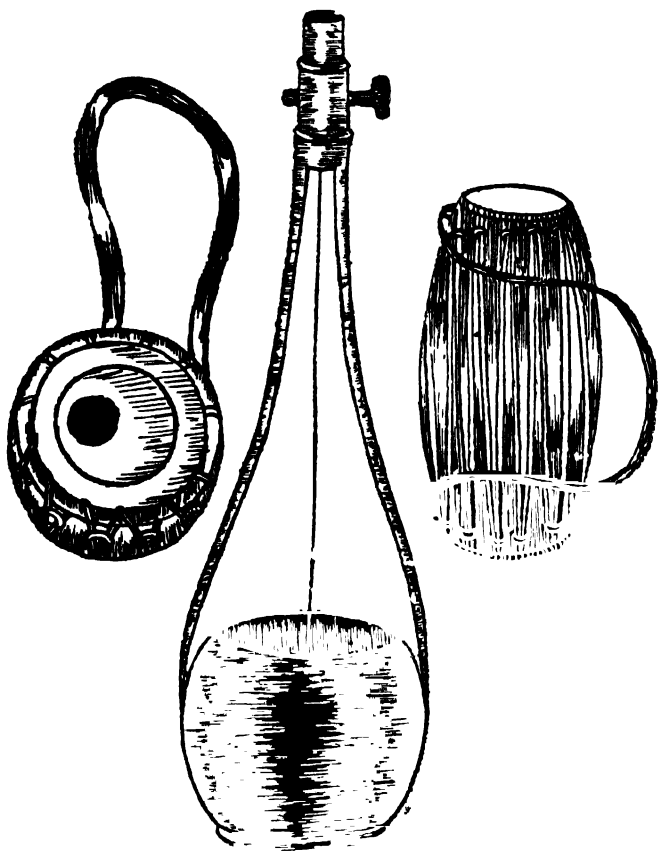
বিবাহের নির্দিষ্ট দিন যে বিবিধ আচার পালন করা হইয়া থাকে, তাহাদের প্রত্যেকটির সঙ্গেই সঙ্গীত যুক্ত হইয়া থাকে। প্রথমেই জলভরার গীত শুনিতে পাওয়া যাইবে—

৭৪

ধুয়া—কুক্ষণে জল ভরতে আইলাম বিরহিণীর দেশে ॥

কেউর কান্ধে লুটা গো ঘটি, কেউর কান্ধে কলসী
রাধিকা সুন্দরীর কান্ধে হীরার মাঙ্গা কলসী।
কেউর পিন্ধনে লালো গো নীলে, কেউর পিন্ধন শাড়ি
রাধিকা সুন্দরীর পিন্ধনে গো কিষ্ট লীলাম্বরী। —ঐ

৭৫

রাধা যায় যমুনার জলে গোয়াল পাড়ায় সাড়া পড়ে
আইজ রাধার পড়ছে বাধা।
ঘর থনে বাহির হইতে, মাথা ঠেকে উপর চালে
আইজ রাধার পড়ছে বাধা।
জলে কলসী ভইরে লয়ে রাধা দাঁড়ায় কদম তলায়।
ননদিনী বলে, বধূ, কদমতলায় কিসের মধু।
বধূর কথা কইমু মায়ের আগে।
আইস, মাতা, মোর হেথা, শুন তোমার বধূর কথা
কালার সঙ্গে করেন পীরিতি।
বধূ আমার শিশুমতি, কালার আমার প্রাণের পতি
তার সঙ্গে কিসের পীরিতি ॥ —ঐ

৭৬

এ গো, সাঁজের বেলা কে তোরে জল আনতে বলেছে।
দাদা এলে বলে দিব বলে দিয়ে মাইর খাওয়াব
শয়তানি তোর ঘুচাইব আয়ানের কাছে।
কে, জল আনতে বইলাছে।

ঘরের জল বাইরে ফেলে যমুনার জল আনতে গেলে,
না জানি কোন কালার সনে প্রেমে মইজাছে।
কে, জল আনতে বইলাছে। —ঐ

৭৭

ঘরের থেকে বাহির হইতে চালে ঠেকল মাথা গো,
চল, সখি, জলে যাই।
রাজকুমারী উইঠ্যা বলে কিসের জয়ধ্বনি লো,
চল, সখি, জলে যাই।
আগে সখী পাছে সখী, মধ্যের সখী রাধা গো,
চল, সখী, জলে যাই॥

৭৮

কেমন রসিকের বাঁশী রাধা বলে বাজিছে।
কেমন বাঁশীর সুরে মন উদাসী করিছে।
রাধিকা জল ভরতে যায়, নীল বসন পরিয়া গায়,
যে ঘাটে দাঁড়ায়ে কালা, সেই ঘাটে জল আনতে যায়।
শুনিয়া বাঁশীর তান, চমকিয়া উঠে প্রাণ,
বসন দিয়ে বাতাস করে দূরে থাক্যা কালা চান্দ।
বাঁশীর সুরে মন উদাসী রাধিকার মন মজিছে।
এমন রসিকের বাঁশী জগতে মন ভুলিছে॥ —ঐ

৭৯

অতি রঙ্গে রঙ্গিণী রাই, সঙ্গে ব্রজের বড়াই
যমুনায় গিয়ে কিশোরী,
কদম তরুর তলে, কৃষ্ণে দেখে বলে
মেঘের মত ওকি নেহারি?
সখি গো, মেঘেতে বিহারে চপলা, সে যে বিদ্যুতের খেলা,
অঙ্গ শীতল মেঘের জলে, সে মেঘে কি অঙ্গ জলে?
কে দিয়াছে মেঘের জলে, মালতী পুষ্পের মালা?
অঙ্গ অধৈর্য হল মেঘের হিল্লোলেতে
ললিতার কাছে প্যারী কেঁদে বলে॥

ওতো মেঘ নয়, মেঘের বরণ কি লো সই,
দেখলাম ঐ কদম্ব মূলে ?
তোদের সঙ্গেতে যমুনা জল নিতে এলেম যমুনায়
মেঘের ভঙ্গী দেখে হলেম আনমনা,
চঞ্চল নয়নে চেয়ে ঐ মেঘের পানে
রাধার ধৈর্য আজ লোপ পাইল সমূলে,
ওতো মেঘ নয়, মেঘের বরণ কিগো, সই,
দেখলাম ঐ কদম্ব মূলে ?
আমি কেন এলেম এসে পড়লেম ঢলে ?
সখি গো, কালা হেরে হল আতঙ্ক, আমার শিহরে অঙ্গ,
শান্ত দাস্য মধুর ভাবে, মগন রই পূর্ব ভাবে
উথলিল বাঁশীর রবে গোকুলে প্রেমতরঙ্গ। —ঐ

৮০

তোরা কে কে যাবি জল ভরিতে চল গো, অবলা,
কদমতলায় নট গো বর ডাকছে চিকন কালা গো।
শ্যামের গলে মোহনমালা, হাতে মোহন বাঁশী গো।
আমি মনে করি ভুলি ভুলি, ভুলিতে না পারি গো,
আমার গৃহে যাইতে মন চলে না, আমি যাব কদমতলা গো।
ওগো পীরিত কইরে যে জন মরে, আগো সফল জনম তার গো।
আমি সইতে না পারি আর গো শ্যাম পিরীতের জ্বালা গো।

—ঢাকা

বর সাজানোর গীত এই প্রকার,

৮১

সাজাও রামেরে ধীরে ধীরে যাতে সীতার মনোহরে।
হুলুধ্বনি দেও সবে মিলে, ওগো, হুলুধ্বনি দেও সবে মিলে
নবপদে বাদ্য বাজে, সঙ্গে কত সৈন্য সাজে
বাজলে বাজুক অযোধ্যা নগরে সাজাও রাম ধীরে ধীরে।

মস্তকে মুকুট পরা কটিতে কিঙ্কিণী ঘেরা,
সোনার নূপুর বাজিছে চরণে।
সাজাও রামে ধীরে ধীরে।
দাঁড়াও শ্যাম বাঁকা হয়ে ত্রিভঙ্গমুরারি হয়ে,
মোহন চূড়া বামে হেলে পড়ে,
সাজাও রাম ধীরে ধীরে। —ঐ

৮২

কৃষ্ণের পায়েতে নূপুর কৃষ্ণের মাথায় লম্বা চুল।
হাতে বাঁশী মোহন চূড়া কানে কর্ণফুল। ধুয়া।
চন্দন আস সকালে, এত বিলম্ব কেনে।
তোমার চন্দন তুমি পর পরাব না আর রামে
কাজল আস সকালে এত বিলম্ব কেনে।
তোমার কাজল তুমি পর ইত্যাদি!
তাগা আস সকালে এত বিলম্ব কেনে।
তোমার তাগা তুমি পর ইত্যাদি।
মালা আস সকালে এত বিলম্ব কেনে।
তোমার মালা তুমি পর ইত্যাদি।
চূড়া আস সকালে এত বিলম্ব কেনে।
তোমার চূড়া তুমি পর ইত্যাদি।
বস্ত্র আস সকালে এত বিলম্ব কেনে।
তোমার বস্ত্র তুমি পর ইত্যাদি। —ঐ

৮৩

শুন গো সুমিত্রারে তুমি লাগ কিসে। ধুয়া॥
বাহির কর পাটা সুযতন করিয়ে।
তুমি না হইলে হলুদ রাখব কিসে।
হলুদে জিজ্ঞাসে তুমি লাগ কিসে?
তুমি না হইলে রামের বিয়ার ছিরি উঠে সাঁজের আকাশে।
মটুকরে জিজ্ঞাসে তুমি লাগ কিসে?
তুমি না হইলে রামের মস্তক শোভা কিসে।

পাটারে জিজ্ঞাসে তুমি লাগ কিসে ?
তুমি না হইলে রামের কমর শুভা কিসে।
মালারে জিজ্ঞাসে তুমি লাগ কিসে ?
তুমি না হইলে রামের গলা শুভা কিসে।
বস্ত্ররে জিজ্ঞাসে তুমি লাগ কিসে ?
তুমি না হইলে রামের গতর শুভা কিসে।

—মৈমনসিংহ (সেরপুর)

৮৪

সাজাও সাজাও গো
তোমার কানু সাজাইয়া দেও।
বিনা জলে চন্দন ঘইসে
তোমার গোপালরে সাজাইয়া দেও।
বিনা তৈলে কাজল পাইড়ে
ও তোমার গোপালেরে সাজাইয়া দেও।
বিনা সোনায় চুড়া গইড়্যা
ও তোমার গোপালেরে সাজাইয়া দেও।
বিনা স্থতে মালা গাঁইথ্যা
ও তোমার গোপালেরে সাজাইয়া দেও।
বিনা রূপায় বাঁশী গইড়্যা
ও তোমার গোপালেবে সাজাইয়া দেও। —ঢাকা

কন্যাকে বিবাহের বেশে সাজানো উপলক্ষে বিস্তৃত মেয়েলী গীত শুনিতে পাওয়া যায়—

৮৫

সীতারে সাজাইল রে সখীগণ মেলি।
বাজু দিল খাড়ু দিল, দিল পাঁচলহরী॥
সীতারে সাজাইল রে আইয়গণ মেলি।
মাথায় মটুক দিল অগ্নিপাটের চেলি॥
সীতারে সাজাইলরে মায় স্থমিত্রা রাণী।
লজ্জাবস্ত্র দিয়া মুছে নয়নের পানি॥ —ঐ

৮৬

ঘরে যাব না ঘরে যাব না, ঘরে গিয়ে কি কাজ করমু
বিনা জলে চন্দন ঘষমু, ঘরে যাব না যাব না।
ঘরে গিয়ে কি কাজ করমু, বিনা তৈলে কাজল পাড়মু
ঘরে যাব না যাব না।
ঘরে গিয়ে কি কাজ করমু, বিনা সূতায় মালা গাঁথমু
ঘরে যাব না যাব না।
ঘরে গিয়ে কি কাজ করমু, বিনা রূপায় বাঁশী গড়মু
ঘরে যাব না যাব না।
ঘরে গিয়ে কি কাজ করমু, মালার ফুলে ফুল মিশামু
ঘরে যাব না যাব না। —ঢাকা

৮৭

সাজাও সাজাও প্রিয়রে ফুল মালতী রাই। ধুয়া।
আমার সীতার আঁখি ভালো কাজলে করছে আলো।
আমার সীতার কপাল ভালো চন্দনে করছে আলো।
আমার সীতার হাত ভালো চুড়িতে করছে আলো।
আমার সীতার গলা ভালো মালাতে করছে আলো।
আমার সীতার মস্তক ভালো চূড়াতে করছে আলো।
আমার সীতাব গতর ভালো বস্তরে কবছে আলো।
আমার সীতার বাহু ভালো বাজুতে করছে আলো। —ঐ

শুধু বর ও কনেকে সাজানই নহে, কনের সখীদিগকে সাজানো উপলক্ষেও মেয়েলী গীত শুনিতে পাওয়া যায়—

৮৮

লুলুক দিয়া সই সজাব
চিরতন মাত্র শেষে দিব, সই লো সই,
মনের মত রাই সাজাব যাইও বিক্র বনে॥
সীতা দিয়া সই সাজাব
সীথি মাত্র শেষে দিব, সই লো সই,
মনের মতন রাই সাজাব যাইও বিক্র বনে॥

মাকড়ি দিয়া সই সাজাব,
কানপাশা মাত্র শেষে দিব, সইলো সই,
মনের মতন রাই সাজাব যাইও বিক্রবনে ॥ —ঐ

এইবার গায়ে হলুদের হলুদবাটা বা হলুদ কোটার গান,

৮৯

হলুদ বাইট না বাইট না। হলুদ বাটন অবাটন ॥ ধুয়া !
হলুদ বাটতে কি কি লাগে, পঞ্চ আইও ডেকে আনি ॥
হলুদ বাটতে কি কি লাগে। ধোপার পোলা ডাইকে আনি ॥
হলুদ বাটতে কি কি লাগে। কুমারের মুছি লাগে ॥
হলুদ বাটতে কি কি লাগে। পুষ্করণীর পাড়ের দূর্বা লাগে ॥
হলুদ বাটতে কি কি লাগে। কলার মাইচ কেটে আনি ॥
হলুদ বাটতে কি কি লাগে। পাঁচকোনার ছন লাগে ॥
হলুদ বাইট না বাইট না ॥ —ঢাকা

৯০

রজনী প্রভাত কালে মহারাজা হুকুম করে হলুদ আনতে হবে,
সিন্দূর রে, তোর জনম কোনখানে,
আমার জনম জানতে পার বানিয়ার দোকানে।
হলুদ রে, তোর জনম কোনখানে,
আমার জনম জানতে পার গেরস্তের পালানে। —ঐ

এইবার বরকে আনুষ্ঠানিকভাবে কামানো উপলক্ষে যে গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাদের কয়েকটির নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

৯১

বাছা লাপিতো রে, বাছা লাপিতো রে,
মুর্[১] বাছাক্[২] ভাল কর‍্যা কামায়ো রে।
দুধ খা'তে গাই দিব লাপিতে রে,
মুর্ বাছাক্ ভাল কর‍্যা কামায়ো রে !
চর‍্যা বেড়াতে ঘুঁড়ি[৩] দিব লাপিতো রে,
মুর্, বাছাক্ ভাল কর‍্যা কামায়ো রে !

১। মোর ২। বাছাকে ৩। ঘোটকী

পান খাওয়ার বাটা দিব নাপিতো রে,
মুর্ বাছাক্ ভাল কর‍্যা কামায়ো রে। —রাজসাহী

৯২

সখীগণ নাপিত আন হইল গো বেলা। ধু॥
রামের মায়ে জিগ্যেস করে কি কি দ্রব্য লাগে
নরুণ লাগে বাটি লাগে লাগে পিড়ি কুলা।
রামের মায়ে জিগ্যেস করে আর কি দ্রব্য লাগে
ও নয়া কাপড় গামছা আন গো হইল বেলা।

—মৈমনসিং (সেরপুর)

৯৩

রজকের ছেলে, আসরে সকালে,
স্নান করাব আমার রামচন্দ্রেরে।
হলুদ হলুদে মার্জন করিয়ে
মাখ যেয়ে রামের কোমল অঙ্গেতে।
সুতারের পিড়ি, আন গঙ্গার জল,
কুমারের মুছি, আন গো সকল।
কস্তুরি মিশায়ে জলে
ঢাল মেয়ে রামের শিরের উপর।
নাপিতের ছেলে আনগো ডাকিয়া
রাম স্নান করাও হুলুধ্বনি দিয়া॥ —ঢাকা

৯৪

সোহাগ মাগিবার একটি গান এই প্রকার—

শচী লক্ষ্মী সরস্বতী মেনকা সুন্দরী।
রতি তিলোত্তমা রম্ভা রামা বিদ্যাধরী॥
মোহন বেশেতে সাজে নারীগণ যত।
সোহাগ মাগিতে চলে গাইয়া নানা গীত।
সাবিত্রীর কাঁখে কলসী মেনকার মাথায় কুলা।
সোহাগ মাগিতে রাণী দেবপুরে গেলা।

এই মতে চইল্যা যায় প্রতি ঘর ঘর
তারপর চইল্যা যায় আপনার বাসর
মেনকার মুখের পান গৌরীরে দিয়া
গ্রন্থি মোচন করলো কুলা নামাইয়া। —ঐ

কেবলমাত্র স্ত্রী আচার উপলক্ষেই যে মেয়েলী গীত শুনিতে পাওয়া যায় তাহা নহে, যে সকল আচার বৈদিক, তাহাদের উপলক্ষেও গান শুনিতে পাওয়া যায়। নান্দীমুখ অনুষ্ঠান উপলক্ষে গীত এই প্রকার—

৯৫

তোরা উলু দে, লো সখিগণ, নান্দীমুখে বইসাছে রাজন। (ধুয়া)।
প্রাতঃস্নান কইর‍্যা রাজা করিলেন আগমন
হেনকালে আইলেন বশিষ্ঠ তপোধন।
যেই ঘরে শুভকার্য বইসা করিবেন রাজন
বিচিত্র আলিপন দিলা যত সখিগণ।
শুভকার্যে মহারাজ বসিলেন সেইক্ষণ
ঘৃত দিয়া পঞ্চবাতি জ্বাইলা দিল সখিগণ।
আচমন কইরা আগে পড়িলা স্বস্তিবাচন
তীর্থ আবাহন করি করিলা অর্ঘ্য স্থাপন।
সঙ্কল্প পড়িয়া পঞ্চদেবতা দিক্‌পালগণ
একে একে ভক্তিভরে পুজিলা রাজা তখন।
ষোড়শ মাতৃকা পুজা করি আগে সমাপন
বসুর ধারা দিতে উঠে হইয়া হরষিত মন।
মাতৃপক্ষ পিতৃপক্ষ কইরা রাজা নিরূপণ
একে একে চৌদ্দ পুর্ষের নাম করে উচ্চারণ। —মৈমনসিংহ

বরকে বরণ করা উপলক্ষেও মেয়েলী গীত শুনিতে পাওয়া যায়—

৯৬

রাম রূপ দেখবি যদি আয় সঙ্গে আয়।
যূথী জাতি মালতী ফুলে, গাঁথিয়ে মালা বকুলে।
দিয়ে রামের গলে,
কি অপরূপ দেখা যায়॥

চান্দ বলে চান্দ ঘরে আয়
মেঘ বইলে চাতকী ধায়
তোরা আয় গো আয়
আইজ সোনার জামাই করমু বরণ
শাঁখ বাজাইয়ে আয়॥ —ঐ (সেরপুর)

শাশুড়ী যখন আনুষ্ঠানিকভাবে বধূকে বরণ করেন, তখন এই গীত শুনিতে পাওয়া যায়,—

৯৭

বাছা কোকিল রে,
তুমি কার ঘরের খোপ কবুতর আনছাও রে।
উয়ার না মা ধন রে, উয়ার না বাপধন রে
যেন কতই কান্দন কান্‌তাছে। —ফরিদপুর

যে ঢেঁকিতে মঙ্গলদ্রব্যাদি কোটা হয়, তাহাকেও বরণ করা হয়—ঢেঁকি বরণের একটি গান নিম্নোদ্ধৃত হইল—

৯৮

এ নারদমুনি বরিবারে কি কি দ্রব্য লাগে।
তেল লাগে সিন্দুর লাগে, লাগে গুয়া পান
আর লাগে নারদমুনির দূর্বা আর ধান॥ —মৈমনসিংহ (সেরপুর)

৯৯

সুমন্ত্রের বাণী শুনে রাজরাণী।
বলিলেন তখনি কৌশল্যা গো রাণী॥
আন এয়োগণ যত ছানার সন্দেশ তত।
তৈল সিন্দুর দিয়ে ধান্য ভানে রাণী॥ —ঐ

বরকে বরণ করিবার সময় নৃত্যভঙ্গিসহ মেয়েরা গায়—

১০০

কি বরণ বরেলো, ও রামের সোহাগিনী
সোহাগী বরণ বরে হাতের কঙ্কণ ঝিকমিক করে লো
কি বরণ বরে লো, ও রামের সোহাগিনী।

সোহাগী বরণ বরে, হেলকে চুলে মাজা পড়ে লো
কি বরণ বরেলো, ও রামের সোহাগিনী।
সোহাগী বরণ বরে গলার হার টলমল করে,
মুখেতে মধুর হাসি দশনেতে খেলে দামিনী লো
কি বরণ বরে লো, ও রামের সোহাগিনী।
সোহাগী বরণ বরে বুকের কাপড খসে পডে
পৃষ্ঠেতে খোঁপা দোলে পায়ের নূপুর খসে পডে লো
কি বরণ বরে লো ও রামের সোহাগিনী। —ঐ

বর ও বধূ গৃহে আসিবার সময় মেয়েরা গায়—

১০১

শিব সাজে বিয়ার কাজে, ঐ শিঙা ডম্বুরা বাজে,
সাজে শিব কৈলাসের ঈশ্বর (গো ভবানী),
উমার পিতা গিরিরাজ, কইরাছে চণ্ডালের কাজ
উমার লাগি আন্‌ল পাগলা জামাই ॥ (গো ভবানী)
উমার পিতা গিরিরাজ, কইরাছে চণ্ডালের কাজ,
আন্‌ল জামাই দুই চক্ষু খাইয়া। (গো ভবানী)
ঝিয়ে বলে, ওগো মা, শিব নিন্দা কইর না,
এই শিব কৈলাসের ঈশ্বর ॥ (গো ভবানী)
মায় বলে, ওগো ঝি, অগ্নিকুণ্ডে ঢাল ঘি,
মায়ে ঝিয়ে মবিব পুড়িয়া ॥ (গো ভবানী)
ঘর ঘর বিচারি চাইলাম, শুধু ভাঙের লাডু পাইলাম,
খাইতে উমার কিছু নাই ॥ (গো ভবানী)
সিন্দুর পরিতে নাই (সখী গো ভবানী) ॥ —ত্রিপুরা

১০২

তোরা কে যাবি, গো সহচরী, সীতা ধনকে আর্ঘন করিতে।
ওগো সখি দূর্বা আনি, নিছ্যা ফেলাও বদনখানি।
রাজহংসের ডিম্ব আনি, নিছ্যা ফেলাও বদনখানি।
ঘিরতের পঞ্চ দীপ আনি নিছ্যা ফেলাও বদনখানি।
তোরা কে যাবি গো সহচরী রাম-সীতাকে আর্ঘন করিতে। —ঐ

মুখচন্দ্রিকা বা শুভদৃষ্টির সময় এই প্রকার গান শুনিতে পাওয়া যায়—

১০৩

হের গো সবে যুগল মিলন।
কর সফল নয়ন।
শ্যামের বরণ কালো, রাই করেছে আলো।
আবার হেসে চেয়ে আছে মরি কি মোহায়।
শ্যাম পানে চেয়ে রাধায় আঁখি হানে গো,
হেরগো সবে।
তমাল মূলে তনু জর জর।
বিজলী খেলে, আলোক মেলে,
শ্যাম পানে চেয়ে রাধায় আঁখি হানে গো।
হের গো সবে যুগল মিলন॥ —ঢাকা

বাসরের গান বিবাহ-সঙ্গীতের একটি বিশেষ সমৃদ্ধ অংশ—

১০৪

কনক লতিকা কেন অধোমুখে ওই দেখ বঁধু এসেছে।
অরুণ উদয়ে সোহাগের হাসি ওই দেখ ফুটে উঠেছে।
হের, সখী, হের সরম পাশর
প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছে। —হুগলি

১০৫

আজি তোর জীবন সফল
পূজেছিলি পশুপতি দিয়ে বিল্বদল।
তুই যেমন লো রসবতী
পেয়েছিস লো রসিক পতি
সুখে থাক, ও যুবতী, রঙ্গে ঢলঢল। —ঐ

১০৬

ওগো আমার, মুখখানি তো বেশ।
আধখানি চাঁদ কপালখানি কাদম্বিনী কেশ

ঠোঁট দু'খানি হাসিমাখা নাইক তাতে বিষাদ রেখা,
নাকটি যেন ফোলো বাঁশীর পারা,
চোখ দুটি ঠিক ভোরের তারা,
নাইক তাতে কুটিলতার লেশ। —ঐ

১০৭

আহা মরি মরি, কি রূপ মাধুরী,
হের লো, হের লো, সই।
নবজলধর শ্যাম নটবর শতদল পরে ওই ॥
চরণে চরণ রাখিয়ে শ্যামে
দাঁড়ায়ে রইয়াছে ত্রিভঙ্গ ঠামে,
চুড়ায় ময়ূর পাখা হেলিছে বামে,
হেলিয়া রইয়াছে ওই ॥ —ঐ

১০৮

হায় চোরা পরিবাদে নিকুঞ্জেতে বংশীধারী,
অমনি বাঁধ্‌তে শ্যামকে, শ্রীরাধিকে গো,
কর্ল্লেন হুকুম জারী।
সখি, কুঞ্জের দ্বারে দ্বারী থেকে তোরা সকলে,
কি কর্ল্লে, হে সখি, তোরা সকলে,
বুঝি চোরের সঙ্গে করে যুক্তি, আধা আধি করে চুক্তি
দেখায়ে প্রেম-বিলাস ভক্তি, বিচ্ছেদ ঘটালে।
লয়ে সঙ্গিনী সমস্ত—নীল পদ্মের পদ্ম হস্ত
অমনি বাঁধলেন তারা,
কঠিন বন্ধনে কাতর কৃষ্ণ মনোচোরা,
নেত্র ধারাতে গোকুল ভেসে যায়।
আমরা কি দেখলাম কুঞ্জময়ী রাধে চন্দ্রমুখী,
নীলপদ্ম কি ঠেকেছে দায়?
শ্যাম রায় হায়, হ'লেন নিরুপায়!
রাধে, যার মায়ায় ব্রহ্মাণ্ড বাঁধা তায় কি বাঁধা যায়?
মরি হায়, হায় হায় রাধে, তায় কি বাঁধা যায়?

অমনি মানিনীর মান রাখবার তরে, সঙ্গিনী রঙ্গিণীর করে
রাধাবল্লভ বাঁধা পড়ে, রাধার প্রেমের দায়। —মৈমনসিংহ

১০৯

চন্দ্রার সাধ পূর্ণ কল্লে্ন কালো শশী,
ভানু উদয় দেখে, কুঞ্জের দ্বারে এসে
রাই বলে বাজালেন বাঁশী।
প্যারী সেই বাঁশীর রব শুন্তে পেয়ে
গা তুলে চৈতন্য হয়ে, কুঞ্জ পানে চায়,
দেখে শশী অস্ত যায়, প্রভাত সময়, হায়,
পঞ্চস্বরে কোকিল ডাকে, শর হান্ গো শর হান্ গো বুকে,
কুহু কুহু কুহু ডাকে, মরি মরি প্রাণ যায়।
প্যারী বাঁশীর রব শুনে কানে, বলে ললিতার স্থানে
না গো না,
আমি ভোর বেলায় বাঁশীর রব আর শুন্‌ব না,
হল ভোর ভোর ভোর—রাই বলে কে বাজায় বাঁশী
তোরা সখি কর গো মানা॥
গেল বিফলে যামিনী, এল না চিন্তামণি
ও সজনী, জাগলাম একাকিনী,
জাগরণের এত জ্বালা, দিলো সেই চিকণকালা
আমি এ জ্বালা, প্রাণ থাকতে আর ভুলবো না,
হল ভোর ভোর রাই বলে কে বাজায় বাঁশী
তোরা সখি, কর গো মানা।
বাসি মুখের হাসি এখন আর ভাল লাগে না॥
আমি বনে বনফুল তুলেছি, মনের সাধে হার গেঁথেছি
দিবার জন্যেতে কালাচাঁদের গলেতে, ওগো ললিতে
আসবে বলে চিকণকালা, সাধের মালা রইলো তোলা
সে মালা কি জপের মালা, পরবো নিশি প্রভাতে।
সকালে রাখালের মুখ আর হেরব না,
তোরা বারণ কর গো ললিতে, যেন কালা কুঞ্জে আসে না।

কি কাজ করলাম ব্রজপুরে, রত্ন দিলাম রাখালেরে যত্ন করলে না।
চোরা বাঁশের বাঁশী বাজায় কালা ওগো, প্রেমের ধর্ম রাখলে না। —ঐ

১১০

আনহ কেঁচি, কাট্‌রহ পান, বাসর-ঘরে লাগাও দোকান।
এ মেরে জান—
তাই তুই তাম্বালিকা[১] ছুক্‌রী॥ ধুয়া
যারা যারা ছুক্‌রী পান বহুত খায়,
থোড়া[২] যে পানের লাইগ্যা পাহ্যারী পাড়া[৩] যায়।
এ মেরে জান—
তাই তুই তাম্বালিকা ছুক্‌রী॥
যারা যারা ছুক্‌রী জদ্দা বহুৎ খায়,
থোড়ামে জদ্দা লইগ্যা পদ্দা-পার যায়।
এ মেরে জান—
তাই তুই তাম্বালিকা ছুক্‌রী॥
রাস্তায় যাইতে সারি কদম গাছে ন'শা, বাজে মোহন বাঁশি।
আমার গায়ে না দিও হাত ন'শা;
আমি যুবতী নারী।
যেদিন পড়িবে জোড়-কলমী দানে ন'শা,
আমি সেদিন তোমার রাণী॥
কদমতলে দাঁড়িয়্যা দাঁড়িয়্যা শোধায়ছে সীজান,
আমার ঠাণ্ডা বাসরে কে আছে!
এক আছে নানী-দাদী আর এক আছে কামিনী,
হাস্‌তে হাস্‌তে ঢুকলো রে সীজান—
বসিল কামিনীর ডান পাশে।
অবলা তো লওরে কামিনী, তোমার সঙ্গে ভাব আছে।
তোমার সঙ্গে ভাব করিতে আমার কামাই করা মিট্যাছে—
কদমতলে দাঁড়িয়্যারে দাঁড়িয়্যা॥ —রাজ্য

১। তাম্বূল পানকারিণী বা তাম্বূল বিক্রয়কারিণী। ২। থোড়া, অল্প। ৩। যে পাড়ার লোকেরা পানের চাষ করে।

১১১

মিঠা জাম্ভিরায়ার তলে হে ন'শা,
সোনার পিঞ্জিরায়া বানায় আরে কে।
আইসো নাকিন্ আইসো হে আরশ[১]
আমার পিঞ্জিরায়ার মাঝে আরে কে।
তোমার পিঞ্জিরায় গেলে হে ন'শা,
মা বলিব কা'কে আরে কে।
তোমার পিঞ্জিরায় গেলে হে ন'শা,
বাপ বলিব কা'কে আরে কে।
সোহ্যা-বোহ্যা[২] চলিও হে আরশ,
শাশুড়ি হ'বে মা-ও আরে কে।
সোহ্যা-বোহ্যা চলিও হে আরশ,
শ্বশুর হ'বে বাপো আরে কে।
তোমার মায়ের জবান হে ন'শা,
গোলমরিচের ঝালো আরে কে।
আমার মায়ের জবান হে ন'শা,
চিনি-মিশ্রির শরবত আরে রে॥ —ঐ

১১২

বাসর ঘরে বর ও কন্যার পাশা খেলার সময় আমোদ-আহ্লাদ করিয়া গান গাওয়া হয়—

রাম যদি ঢালে পাশা দাসী হব ঐ চরণে।

এদিকে—

সীতা যদি ঢালে পাশা পণ করিব রাজ্যধনে। —ঐ

১১৩

আজি কি আনন্দ—
কি আনন্দ হৈল গো সখি—রস-বৃন্দাবনে,
শ্যাম নাগরে খেলে পাশা মনমোহনীর সনে।

১। কনে ২। স'য়ে ব'য়ে

আজি কি আনন্দ—
নিকুঞ্জের চারি ধারে কুঞ্জ লতার বেড়া ,
কখন উঠে চন্দ্র স্বরুয কখন উঠে তারা ।
আজি কি আনন্দ—
সাক্ষী হৈও চন্দ্র স্বরুষ কইনার জ্যেষ্ঠ ভাই ,
তোমার বোনে খেলে পাশা, আমাব দোষ নাই
আজি কি আনন্দ—
তোমার বোনে হাব্‌লে পাশা দাসী হবে পায়,
শ্যাম-নাগরে হাব্‌লে পাশা ভুষণ দিবে গায় ।—
আজি কি আনন্দ ।— —ত্রিপুরা

১১৪

পাশা খেলার গানে রাম আব কৃষ্ণ অনেক সময় একাকার হইযা যায়, নতুবা রামের হাতে বাঁশী আসিবে কোথা হইতে ?

পাশা খেলে কে গো, পাশা ঢালে কে গো,
পাশা খেলে কিশোব আর কিশোবী ।
খেলিতে খেলিতে পাশা, হারিলেন শ্রীহরি ।
রামে ঢালে পাশা বাবো, সীতায় ঢালে তেরো,
লক্ষ্মণে উঠিয়া বলে, দাদা, বুঝি হারো ।
রামে যদি হাবে পাশা নিব হাতের বাঁশী,
সীতায যদি হারে পাশা হব নিজ দাসী ।
পাশা খেলে কে গো । —ঢাকা

১১৫

নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটিতে দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতীর ভণিতা পাওয়া যাইতেছে ; ইহা তাঁহার রচিত বামায়ণেরই অংশ—

আজি কি আনন্দ হৈল জনক ভুবনে ।
রামচন্দ্র খেলছেন পাশা জানকীব সনে ॥
উত্তম শীতলপাটী ফুলের বিছানা ।
সখীরা করিছে রঙ্গ কত না বাহানা ॥

আজি কি আনন্দ হৈল,
সোনার পাতিল শরা, সোনার একুশ কড়া,
তাহাতে খেলিছে পাশা অষ্টসখী ঘেরা।
চন্দ্রাবতী কহে পাশা খেল বিনোদিনী
পাশাতে হারিবেন এবার রাম গুণমণি। —মৈমনসিংহ

বিবাহের গানে ক্বচিৎ রাধাকৃষ্ণের নাম শুনিতে পাওয়া যায়—

শুভক্ষণে খেলছে পাশা রাই সনে বংশীধারী,
চারিপাশে রঙ্গ করে সর্ব সহচরী। —ঐ

১১৬

যজ্ঞে হোম করিবার সময় এই গান গীত হয়—

হা মরি, হা মরি, কি আনন্দ আইজ কৌশল্যার কুলে
রাম যজ্ঞ করে নীলদল ছবি উষার অঙ্গে খেলে।
সহস্র দলে যুগল মিলন, রাম যজ্ঞ করে।
কি শোভারে আইজ কৌশল্যার কুলে। —ত্রিপুরা

১১৭

হা মরি, হা মরি, বাজিল বাঁশরী,
কি আনন্দ আইজ কৌশল্যার কুলে
রাম যজ্ঞ করে।
নীল দল ছবি উষার অঙ্গে খেলে।
সহস্র দলে যুগল মিলন।
রাম যজ্ঞ করে।
কি শোভা আইজ কৌশল্যার কুলে।
হা মরি হা মরি। —মৈমনসিংহ

১১৮

বেদী-গমন সময়ে এই গান গীত হয়—

রাইয়ে কি ঠমকে হাটে—
শ্যামচাঁদের পাছে যেমন, মেউরে পেখম ধরে।
আগে চলে পুরুত-ঠাকুর জলের ঝারি লৈয়া;
পাছে পাছে শ্যাম নাগর কিশোরীরে লৈয়া।

রাইয়ে কি ঠমকে হাটে,

শ্যামচাঁদের পাছে যেমন, মেউরে পেখম ধরে। —ঐ

কালরাত্রির পরের দিন শুভরাত্রি, ঐ দিন মধ্যাহ্নকালে বধূকে বরের আনুষ্ঠানিক ভাবে ভাত-কাপড দেওয়ার বিধান আছে। অন্ন-ব্যঞ্জনাদি থালায় সাজাইয়া বধূর হস্তে সমর্পণ করাকেই 'ভাত কাপড' দেওয়া বলে; তখন এই গীত গাওয়া হয়—

১১৯

নাগর, তুমি বৈদেশে যাইও না।
একলা ঘরে কাইন্দ্যা মরে সুন্দরী ললনা।
এখন অইতে নাগব তোমার পায় লাগলো বেড়ি,
সুন্দর মুখ তার মলিন অইল কর যদি দেরী।
চুপি দিয়া চাইয়া থাকবো আম গাছের তলায়,
যেখানে সোনাব কোকিল আমের মুকুল খায়,
আমের মুকুল খাইয়া কোকিল কুহু কুহু করে,
বিরহিণী নারী বল কেমনে ধৈর্য ধরে?
থাক থাক সুন্দরী গো, ধৈরয ধরিয়া,
তোমার লাইগ্যা আন্‌বাম সিন্দূব থানেতে ভরিয়া।
থাক থাক সুন্দরী গো, তিন দিনের লাগিয়া
পাটেশ্বরী শাড়ী আন্‌বাম তোমার লাগিয়া।
থাক থাক সুন্দরী লো, পথের পানে চাইয়া,
ঢাকা থাইক্যা শাঁখা চুড়ী আন্‌বাম কিনিয়া।
এরে বুল্যা হাতে তুইল্যা ভাত কাপড দিল,
চারিদিগে নারীগণ জোকার কবিল। —ঐ

১২০

দেখ দ্বারকা ভবন, রুক্মিণীবে অন্ন বস্ত্র দিছে নাবায়ণ।
শঙ্খ বস্ত্র সঙ্গে নিয়া ফুলমালা চন্দন,
স্বর্ণ থালে শাইলের অন্ন অতি সুলক্ষণ।
চতুর্দিকে খণ্ড খণ্ড বাটীতে ব্যঞ্জন
দধি দুগ্ধ ঘৃত আর অপূর্ব মাখন।

বেষ্টন কইর‍্যা বইস্যা আছে নন্দের নন্দন,
সামনে আইস্যা রাজকুমারী দিলা দরশন।
ভাত কাপড় দিয়া কৃষ্ণ তোষিলেন মন,
মঙ্গল জোকার দিল যত সখীগণ। —ঐ

চোরপাণি নামে একটি অনুষ্ঠান আছে। 'বিবাহের দিন অতি প্রত্যুষে পূর্ব-ময়মনসিংহ ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে কন্যার বাড়ীতে 'চোরপাণি' নামে জল তোলার একটি স্ত্রী-আচার অনুষ্ঠিত হয়। ভোর না হইতে এয়োরা এই গানটি গাহেন এবং কন্যার মাতা ও পিতাকে সঙ্গে করিয়া নিকটস্থ কোনও পুষ্করিণী বা নদীতে জল তুলিতে যান।' সেই সময় এই গীত শোনা যায়—

১২১

নিশি পোহাল রে কোকিলা করে রাও,
নিশি পোহাইয়া যাও।
উঠ উঠ কন্যার মা, কত নিদ্রা যাও
চোরপাণি ভইরা আইসা দধিচিড়া খাও। —ঐ

ক্ষীর ভোজন বা স্বামিস্ত্রীর একত্র আহার করা একটি বিশেষ স্ত্রী-আচার। মুসলমান সমাজেও ইহা প্রচলিত আছে। তাহার একটি গান এখানে উদ্ধৃত করা হইল।

১২২

ক্ষীর খাও রে ন'শা, ক্ষীর খাও,
তোমার বাবা দিবে ভরি ভরি দান।
আমে-দুধে রে বাছা, রান্ধ্যাছি ক্ষীর,
খাও খাও রে বাছা, বাপের খাতের ক্ষীর।
বাপের মোল্লাই-করা[১] টাকা স্যাহাজে[২] পাব,
তেবে[৩] খাবরে হামি বাপের হাতের ক্ষীর॥
বহিনের ঘাঁইত্যা[৪] করা টাকা স্যাহাজে পাব,
তেবে খাব রে হামি বহিনের হাতের ক্ষীর॥

১। মোড়লী করা ২। উপঢৌকন ৩। তবে ৪। জমানো, সঞ্চিত

ছি রে ছি—, জাইত নাশা[১] কইলে।
ছি রে ছি—, গ্যারাম-হাঁসা[২] কইলে।
আরশের দাদিকে দাবিদোরে[৩] পাইলে।
আরশেব মুখে দিতে আপনার মুখে দিলে।
এ্যাক্‌টা আন্ধাঘা[৪] বগলেব তলে দাবিলে॥ —ঐ

দধিমঙ্গল আচাব উপলক্ষে নিম্নের এই গান শুনিতে পাওয়া যায়—

১২৩

দধিমঙ্গল করে সীতারাণী গো,
আয সকলে আমাব নীলমণি॥ ধুয়া॥
আন গো দধির ভাণ্ড, ভেঙে কব অষ্ট খণ্ড,
আয সকলে ইত্যাদি।
আন গো ক্ষীরের ভাণ্ড, ভেঙে কর অষ্ট খণ্ড,
আয সকলে ইত্যাদি।
আন গো চিনিব ভাণ্ড, ভেঙে কর অষ্ট খণ্ড,
আয সকলে ইত্যাদি।— —ঢাকা, বিক্রমপুর

১২৪

দধিলঙ্গল করে সীতাবাণী গো আয় সকলে (ধুয়া)
আন গো দধির ভাণ্ড। ভাইঙ্গে কব আষ্ট খণ্ড।
আন গো ক্ষীবের ভাণ্ড ভাইঙ্গে কর আষ্ট খণ্ড।
আন গো চিডাব ভাণ্ড ভাইঙ্গে কব আষ্ট খণ্ড।
আন গো সকালে সকালে
দধিমঙ্গল কবে বিধুমুখী গো আয সকলে॥ —ঐ

১২৫

নিশি ভোর হল গো এক্ষণে।
ভোর হল নিশি, অস্ত গেল শশী
রাম লয়ে তোরা বসে যা ভোজনে।

১। জাতি-নাশ ২। গ্রাম-হাসা অর্থাৎ হাস্যাস্পদ হওযা বা করা ৩। দারিদ্র্য, এখানে বভুক্ষা ৪। তেলে পিঠা।

আন দধি আন চিড়া ছানার সন্দেশ ক্ষীরা,
রাম লয়ে তোরা বসে যা ভোজনে। —ঐ

বাসি-বিবাহ বিবাহের পরের দিন অনুষ্ঠিত হয়। সেই উপলক্ষে গীত—

১২৬

শ্রীরামচন্দ্রের বাসি বিয়া মিথিলায়।
দেখতে রামের বিয়া, স্বর্গপুরের বাসী যারা—
গোপনে থেইকে চায়।
যেমন রাম সাজিল কমল আঁখি,
তেমনি সীতা বিধুমুখী, তরুতলে দাঁড়াইল,—
ও তার রূপে জগৎ মোহিল।
স্বর্গ থেকে দেবগণে পুষ্প বরিষণ করে।
ঐ রূপে যে দেখিল নয়ন ভরে,
তার জন্ম সফল হৈল। —ঢাকা

কন্যাবিদায়ের গানগুলি বিবাহ সঙ্গীতেব মধ্যে যেমন বাস্তব, তেমনই করুণ; জীবন রসের স্পর্শে ইহারা সমুজ্জ্বল।

১২৭

ও ঝি গো, কেমনে বঞ্চিবা জামাইর ঘর।
বিপুলারে কোলে করি, সুমিত্রা সে সুন্দরী,
সকরুণে কান্দয়ে বিস্তর॥
সদায় ঘুমের ভুলা, ভাল মন্দ না বুঝিলা,
(ও ঝি গো,) জামাই তোমারে যাবে লইয়া।
সাত পুত্র আছে মোর, রূপে গুণে বিদ্যাধর,
তাতে মোর নাহি এত দয়া॥
পদ্মা সনে যার বাদ, জীবনের নাহি সাধ,
কেমনে রব বুকে পাষাণ দিয়া।
নিশিকালে নিদ্রা যাইও, সকালে মা জাগিও,
গুরুজনে সেবিও মন দিয়া॥
শতেক বৎসর জীও, সাত পুত্রের মা হইও,
পাকা চুলে পরিও সিন্দূর।

মানিও স্বামীর কথা, না করিও অন্যথা,
কইও কথা অতি সুমধুর ॥
(বিপুলার উক্তি)
মা গো, সাত ভাই কুশলে রউক, বাপের কল্যাণ হউক,
মা গো, তুমি থাকো জন্মের আয়োরাণী।
যদি সে কান্দহ মাও, আমার মস্তক খাও,
মা গো, কন্যা হৈলে হয় পরাধিনী ॥ —মৈমনসিংহ

১২৮

চল কন্যা দেশে যাই, আর বিলম্বে কার্য নাই ,
মা রৈছেন্ বৌ-ঘরা পাতিয়া।
চল কন্যা দেশে যাই, আর বিলম্বে কার্য নাই ,
ভগ্নী রৈছে ময়ূর-পাখা লৈয়া।
চল কন্যা দেশে যাই, আর বিলম্বে কার্য নাই,
পিসী বৈছেন্ ধান্য দূর্বা লৈয়া।
চল কন্যা দেশে যাই, আর বিলম্বে কার্য নাই,
(আমাব) মামী বৈছেন্ ঘৃতেব বাতি লৈয়া। —ঐ

১২৯

নদীর কূলে কিসের বাজনা বাজে রে ?
সোনার ফাতেমা বে। ধুয়া
নদীর কূলে মা কিসের হাউই উডে রে ?
সোনার ফাতেমা রে !
যাবে দিচ্ছি, মা, এ মুখেব জবান রে—
সোনার কাতেমা রে।
যারে দিচ্ছি, মা, এ মুখের বাণী রে—
সোনার ফাতেমা রে !
তারাই আলো[১], মা, ওলোট-বাজী লিয়া রে—
সোনার ফাতেমা রে !

১। আসিল

তারাই আ'লো, মা, পালোট-বাজী লিয়া রে—
সোনার ফাতেমা রে !
কেমনে সইবো. মা, পরার পুতের[২] জ্বালারে ?
সোনার ফাতেমা রে !
কেমনে সইবো, মা, তার বাপ-মা'র জ্বালারে ?
সোনার ফাতেমা রে !
নদীর কুলে, মা, বট বিরিক্ষ আছে রে,
সোনার ফাতেমা রে !
নদীর কূলে, মা কল্‌মিলতা আছে রে,
সোনার ফাতেমা রে !
তারা যে সয়, মা, ভরা গাঙ্গের আফাল রে,
সোনার ফাতেমা রে !
তারা যে সয়, মা, চৈড-বৈঠার বাড়ি রে,
সোনার ফাতেমা রে !
তেমনি[৩] সয়ো. মা, পরারপুতের জ্বালা রে,
সোনার ফাতেমা রে !
তেমনি সয়ো, মা, তার মা-বাপের জ্বালা রে,
সোনার ফাতেমা রে !! —রাজসাহী

বিবাহান্তে বরবধূর যাত্রামঙ্গলের গীত—

১৩০

যত যত নারী দিল মঙ্গল জোকার
যাত্রা কৈল বরকন্যা আনন্দ অপার।
হাতেতে আরসি-মাইঞ্জি বান্ধা গামছা দিয়া—
সোনার চান্দ ঘরে যায় রে নতুন বউ লইয়া।
দুয়ারে মঙ্গল ঘট চিত্র আলিপনা।
ধান্যদূর্বা দই পঞ্চপল্লব যোজনা।
নবরঙ্গে বাদ্য বাজে মঙ্গল জোকার।
চিরজীবী হৈয়া থাক সুন্দর কুমার ॥ —মৈমনসিংহ

২। পরপুত্রের : স্বামীর

নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটি বিদায়কালীন গান, ইহা কন্যা নিজে গাহিয়া থাকে। এই প্রকার সঙ্গীত পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই প্রচলিত আছে, ইহাকে **bridal farewell song** বলে—

১৩১

দেখ গো দয়ার সাত ভাই দুই নয়ন মেলিয়া,
কালি যে আছিলাম গো সাত ভাই
তোম্‌রার উর ভরা।
আজ্ উতি যে যাইবাম গো সাত ভাই
তোম্‌রার উর খালি॥
দেখ গো দয়ার মাওজান দুই নয়ন মেলিয়া;
কালি যে আছিলাম গো মাওজান
তোম্‌রার উর ভরা,
আজু উতি যে যাইবাম গো মাওজান
তোম্‌রার উর খালি॥ —মৈমনসিংহ

১৩২

জননীর কণ্ঠে উপরোক্ত সঙ্গীতটির জবাবরূপেই শুনিতে পাওয়া যায়—

আগে যদি জানতামরে, ময়না,
তোরে নিবে পরেরে, সুন্দর ময়নামতীরে।
পাটার চন্দন পাটায় না থুইয়া
তোরে লইতাম কোলে, লো সুন্দর ময়নামতীরে।
আধেক গাঙ্গে ঝড়বৃষ্টি,
আধেক গাঙ্গে বিয়ারে, সুন্দর ময়নামতীরে।
ময়নারে যে নিয়া গেল
চিলের ছোঁও দিয়ারে সুন্দর ময়নামতীরে। —ঐ

১৩৩

পরের ঘরে যাওবে কন্যা, কন্যা, আরে কইয়া দেই তোর আগে,
দুঃখিনী জননীর কথা, মা গো, তোমার মনে যেন থাকে।
কত কষ্টে পালন কল্লাম, কন্যা, আরে কল্লাম আলা ঝালা,
না চাইতে হাতে তুইল্যা দিলাম কত সোহাগের ডালা।

দশ মাস দশ দিন, কন্যা, আরে গর্ভে ধর্ল্লাম তোরে,
খাইতে শুইতে চলতে ফিরতে মর্ল্লাম কত দুর্ভাবনা করে।
কত নিয়ম পালন কর্ল্লাম, কন্যা, বইসা ঘরের কোণে,
ভোগলাম কত বিষ-বেদনা কেউর কাছে না কইয়া গোপনে।
নিদ্রা নাহি গেছিরে, কন্যা, দিছি, কন্যা, পেট ভইর‍্যা না দানা,
অসুখে বিসুখে আমি তোমার লাইগ্যা হইয়াছি দেওয়ানা।
কত মন্ত্রে কত ঔষধ দিছি আইন্যা কত মুলুক খুঁইজ্যা,
অত বড কর্ল্লাম তোরে কত নারে দেব দুর্গা পুইজ্যা।
বর ভালা, ঘর ভালা পাইয়া, কন্যা, তোরে কর্ল্লাম রে কোল ছাডা,
তুই যে আমার প্রাণের নিধি তুই যে আমার নয়ানের তারা।
দিবা নিশি ভাববাম রে, কন্যা, কন্যারে তোর সোনামুখখানি,
ঘরেব বস্তু পরকে দিয়া কাইন্দ্যা মরবে অভাগি জননী।
মনে অইলেই মরবাম রে, কন্যা, তোমার লাইগ্যা জ্বলিয়া পুডিয়া,
পাখ থাকিলে পঙ্খী অইযা পডতাম যাইযা তোর কাছে উড়িয়া।
যাওয়ার কালে একটিরে কথা. কন্যা, আরে কইয়া দেইরে তোরে,
বিষ খাইয়া বিষ হজম কইর‍্যা, কন্যা, তুমি থাইকো জামাইর ঘরে।
শাশুডী ননদীর কথা, কন্যা, তুমি শুইনো মন দিয়া,
হই না যে কলঙ্কিনী, কন্যা, তোমাব গভেতে ধরিযা। —মৈমনসিংহ

১৩৪

সীতা কি মোব ঘর যাইবে গো।
বড পুকুরের ভদই চিংডি কে খাইবে গো,
মাছেব তলায় ছাতুর হাঁডি কে খাইবে গো।
সীতা মোর ঘর যাইবে গো।
সাত হামারেব ধান খাবিয়ে
সীতা তবু মোর পরের বৌ
সীতা মোর ঘর যাইবে গো।
সাত পুকুরের মাছ খাবিয়ে
সীতা তবু মোর পরের বৌ
সীতা মোর ঘর যাইবে গো।

সাত বাগানের আম খাবিয়ে
সীতা মোর পরের বৌ
সীতা মোর ঘর যাইবে গো।
সাত গাইয়ের দুধ খাবিয়ে,
সীতা তবু মোর পরের বৌ,
সীতা মোর ঘব যাইবে গো। —২৪ পরগণা

১৩৫

ধুঞ্চি ফুলের আটুনী, কুঞ্জে ফুলের ছাটুনী
চম্পাফুলের গিরিল বাগিয়ে।
ছাড়ে দেও বে কালেনি, ছাড়ে দেও রে মালেনি,
ছাড়ে দেও আমার চলন ঘোড়ার লাগাম,
ছাড়ে দেও আমাব চলন ঘোড়ার লাগাম।
আমি ফিরে আসতি খাব বাটাব পান
আমি ফিবে আসতি কব দুচার কথা।
মাযে ত বলেরে, ও ফুল মালাবে,
তুমি ঘরে আসে খাও দুধ ভাত।
অওত ভাত খাব না, অওত ঘরে যাবো না,
আমার মন চলেছে কালাচাঁদের সাথে
আমাব মন চলেছে নীলা ঘোড়ার সাথে।
মাযেত বলেরে ও আল্লা বস্থলবে
বেটির জন্ম না হয় কার ঘরে রে। —ফরিদপুর

তারপর বরের বাড়ীতে বধূকে শাশুড়ী যখন ববণ করিয়া নেন, তখন এই গীত শুনিতে পাওয়া যায়—

১৩৬

বামের মা বরণ বরে হেলকে ঢুলে মাজা পড়ে,
কি বরণ বরে লো ও রামের সোহাগিনী।
রামের মা বরণ বরে
হাতের কঙ্কণ ঝিকমিক করে
কি বরণ বরে গো ও, রামের সোহাগিনী।

রামের মা বরণ বরে
পায়ের নূপুর খসে পড়ে
কি বরণ বরে লো ও, রামের সোহাগিনী। —ফরিদপুর

বরবধূ বাড়ীতে পৌছাইলে এই সংগীতটি গীত হয়—

১৩৭

তুমি যে গেছলা রে বাছাই, নবীন শ্বশুর দেশে, নবীন শ্বশুর-দেশে,
তোমার শ্বশুর-শাশুড়িয়ে কি কি দান কর্চ্ছে?
দিছিল একটা শালের গো যোড়া,
তারে থৈয়া আইছি, তারে থৈয়া আইছি,
তোমার বধূরে লৈয়া দেশে চল্যা আইছি॥ ইত্যাদি, —মৈমনসিংহ

এইবার পিতৃগৃহ হইতে দ্বিরাগগমনের জন্য কন্যাকে লইয়া যাইবার লোক আসিয়াছে। তাহাকে 'নাইওর যাওয়া বলে। 'নাইওর' যাওয়া উপলক্ষে গীত—

১৩৮

স্ত্রী— ভাত ত কড় কড়, ব্যন্নুন হল বাসি,
ভাইধন আইছেরে নিবার রে
সাধুয়ে আমার নায়ার যাবার দাও।
স্বামী—তুমি যাবে নায়ারে রে, ফুলমালা, আমার ভাত রাঁধবে কেডা,
তুমি যাবে নায়েরে রে, ফুলমালা, আমার পান বানাবি কেডা।
ছয় মাসের ভাত রে সাধু আমি ছয় দণ্ডে রাঁধিব
ছয় মাসের পান রে সাধু আমি এক দণ্ডেই দেব।
তুমি যাবে নায়ারে রে, ফুলমালা, আমার বিছানা দিবে কেডা,
ছয় মাসের বিছানারে সাধু এক দণ্ডেই দেব।
তুমি নায়ারে গেলে রে, ফুলমালা, আমার কথা কইবে কেডা,
ছয়মাসের কথারে সাধু আমি এক দণ্ডেই কব॥ —ফরিদপুর

কন্যার দ্বিরাগমণ উপলক্ষে এই গীত শুনিতে পাওয়া যাইবে—

১৩৯

দয়াল বড় মিঞার ঝি,
জোড়কাড়া বাজাইয়া যায় গৈ বারই পাড়া দিই।

বারই পাড়ায় মাঁইয়া পোয়া থিয়াই তঁ-অসা চায়
জোড়কাড়ার ধমকে ভইনউন চমকি আছাড় খায় —চট্টগ্রাম

১৪০

যাও হে, গিরি, ত্বরা করি আনিতে প্রাণ-উমারে।
হইল বৎসর গত, প্রাণে ধৈর্য নাহি মানে॥
শুনিয়াছি ত্রিপুরারি, ত্যাজ্য কইরেছেন গৌরী,
আনন্দে বৃষভ চড়ি, শ্মশানে মশানে ফিরে॥
গত রজনী নিশীথে, দেখিয়াছি স্বপনেতে,
উমা কেন্দে কেন্দে বলে. 'মা মনে না কর মোরে। —ফরিদপুর

দ্বিরাগমনের পর জীবনের চক্র আবার ঘুরিয়া আসে ক্রমে আবার গর্ভাধান, বিবাহ-সঙ্গীত, সাধ খাওয়ার সঙ্গীত, সন্তান জন্মকালীন সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়। এইভাবে জীবনের চক্র অনন্তকাল ধরিয়া ঘুরিতে থাকে।

দুই

শোক-সঙ্গীত

শোক-সঙ্গীত (Funeral Song)-কেও ব্যবহারিক সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়। কারণ, বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত ইহাদেরও ব্যবহার হয় না। শ্মশানযাত্রীরা সাধারণতঃ এই গান গাহিয়া শবানুগমন করে; তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বৈরাগ্যমূলক গান রূপে বৃদ্ধের কণ্ঠে অন্যত্রও তাহা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাদের সঙ্গে এক অতি করুণ স্মৃতির সম্পর্ক জড়িত থাকে বলিয়া ইহারা সাধারণতঃ অন্যত্র পরিহার (avoid) করা হয়। বিশেষ এক বয়সের লোকের মধ্যেই এই গানের ব্যবহার সীমাবদ্ধ, তথাপি ইহা কদাচ নারীর সঙ্গীত নহে। অবসর বিনোদনের জন্য যুবক-যুবতীও কদাচ এই গান গাহিবে না, ক্বচিৎ বৃদ্ধের কণ্ঠে অন্যত্র এই গান শুনিতে পাওয়া গেলেও প্রধানতঃ পল্লী অঞ্চলে শবানুগমনকারীরা এই গান গাহিয়া থাকে। পল্লী বাংলার সর্বত্রই এই গানের ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক, সামান্য কয়েকটি মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

১

স্বর গুঞ্জার রতনপুরে রাজা জনমিলেল।
শিলগুড়ে (শিলিগুড়ি) রাজা মরিরে,
পায়ের জুতা রাজা পায়ে মিলয়ে গেল,
হাতী ঘোড়া শুধাই দূরিরে। —অযোধ্যা (পুরুলিয়া)

ইহার অর্থ রাজা জন্মিল রতনপুরে, মরিল শিলিগুড়িতে, পায়ের জুতা হাতী ঘোড়া ইত্যাদি সমস্তই পড়িয়া রহিল।

২

জাননারে মন, মদিলে দুনয়ন পড়ে রবে বিষয় রত্ন ধন।
চারিজনে মিলি নিবে স্কন্ধে তুলি, হরি হরি, বলি করি গমন ॥
পেছু পেছু যাবে, গোবর ছড়া দিবে, যে তোমার ভালবাসার ধন,
দিন দুই চারি কাঁদবে বিনয় করি জননী কাঁদিবে আজীবন ॥
—বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

৩

হাতি কাঁদে হাতিশালে ঘোঁড়া কাঁদে ঘোঁড়াশালে,
রাণী কাঁদে পালঙ্কো উপরে।

গো রাজার মায়া ছাড়ি কেমনে ?
আমার রাজার মায়া ছাডি কি করে ?
চল যাব তুমকা শহরে, রাজার মায়া ছাডি কেমনে ?
গিদর পুত্‌বো[১] সেও কাঁদে, তাকেও আমরা পারি গো
রাজার মায়া ছাডি কেমনে। —২৪ পরগণা

৪

মন ভাবছ কিবে বইয়া, নদীর কূলে হবে শেষ বিয়া।
যখন বিয়াব চলন হইল, খোল করতাল সব সঙ্গেই লইল,
তারা যায় গো হরি গুণ গাইয়া
মহাদেবে করে গো গান ডুম্বুরী বাজাইয়া ॥
শিরে পায় কাপড় দিয়া বইছে বে মন ঘুমাইয়া
তারা যায় গো বিয়ার জামাই লইয়া।
শ্মশানঘাটে নিয়া তাবা বিয়া দিবে গো করাইয়া।
জালালপুর তোর শ্বশুব বাডী, বাইর বাডী ভূতের কাছারী
তারা নাচে পঞ্চভূত লইয়া।
যত শিয়াল কুকুর আস্‌তে আছে বিয়াব খাওন পাইয়া ॥ —মৈমনসিংহ

৫

দিন ফুরাইল সইন্দা অইল, পথর সম্বল লইলা কি ?
ভবর মায়া তেয়াগ গরি, যঅন পইরব তরাতরি।
ন গেলে তে বান্ধি নিব, মোটা রছি গলাত দিই।
পেয়াদা যারা আছে খাডা, শমন লই পিছদি। —চট্টগ্রাম

নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটি মুসলমান সমাজ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে—

৬

আদমরে সোনার আদম বিষমাল্লার কোল পাবেরে একদিন।
কোরানেরি বয়ানে লেখা আলেপলাম
ফতেমায় তরাইয় লইবে হাসরের দিন।
রোজা কব নমাজ পড় শইরতের চিন,
রছুল বিনে কে তরাইবে হিসাবের দিন। —মৈমনসিং

১ গিদর পুত বো—ছেলেপিলে

তৃতীয় অধ্যায়

আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত

এক

বারমাসী পার্বণ-সঙ্গীত

যে সকল সঙ্গীত বৎসবেব নির্দিষ্ট দিনে কিংবা নির্দিষ্ট তিথিতে বিশেষ কোন সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে গীত হয়, তাহাকে সাধারণতঃ আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত বলা যায়। ইংরেজিতে ইহাকেই Calendric song বলে। বিবাহ-সঙ্গীত যেমন পারিবারিক জীবনের বিবাহের প্রয়োজনে গীত হয়, আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত তাহার পরিবর্তে বৃহত্তর সামাজিক জীবনেব উৎসব অনুষ্ঠান অর্থাৎ পূজাপার্বণ ইত্যাদি উপলক্ষে গীত হয়। বৎসরেব মধ্যে ইহাদের গাহিবার সময় নির্দিষ্ট থাকে, বিবাহ-সঙ্গীতের মত বৎসরের যে কোন সময় ইহারা গীত হয় না। বিশেষতঃ বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য যে গান সুনির্দিষ্ট আছে, সেই অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে ইহারা অন্যত্র কোথাও গীত হয় না। ইহাদের এই বিষয়ে যে একটু অনমনীয়তা (rigidity) আছে, তাহাই ইহাদের ক্রমবিকাশের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, পূজার মন্ত্রের মত ইহারা প্রায় অনেক ক্ষেত্রেই বিশিষ্ট এক একটি রূপের মধ্যে সুনির্দিষ্ট হইয়া যায়। যে সকল পূজাপার্বণের সঙ্গে ইহাদের সম্পর্ক, সেই সকল পূজাপার্বণ সমাজের মধ্যে লুপ্ত হইয়া গেলে ইহাদেরও বিনাশ অনিবার্য হইয়া উঠে। লোক-সঙ্গীত ক্রমপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে রকম বিকাশ লাভ করে, ইহারা সেই ধর্ম হইতে অনেকখানি বিচ্যুত হইয়া পড়ে। সেইজন্য সাধারণতঃ ইহাদের বিনাশ হয়, কিন্তু বিকাশ হয় না। সুতরাং অতি অল্প ক্ষেত্রেই ইহাদের মধ্যে সাহিত্যিক গুণের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। তবে বাঙ্গালীব পূজাপার্বণেব মধ্যে যে একটু বিশেষত্ব আছে, তাহা অনুসরণ করিলে দেখা যায় যে, পূজাপার্বণের শাস্ত্রীয় আচারের অন্তরাল দিয়াও ইহার একটি লৌকিক আচারের ধারা সর্বত্রই প্রবহমান থাকে। সেই লৌকিক আচারের মধ্য দিয়া অনেক সময় মানবিক গুণ বিকাশ লাভ করে। অধিকাংশ

অনুষ্ঠানের সঙ্গেই এক একটি লৌকিক কাহিনীও জড়িত হইয়া যায়, সেই লৌকিক কাহিনীটিই বিচিত্র মানবিক গুণ সমৃদ্ধ হইয়া উঠে।

প্রথমতঃ বৎসরের বিভিন্ন মাসে যে সকল পূজা-পার্বণের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহা অনুসরণ করিয়াই সঙ্গীতগুলি এখানে উদ্ধৃত করা যাইবে। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সঙ্গীতের একটি অংশ আঞ্চলিক সঙ্গীতের মধ্যেও উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এখানে যে সকল সঙ্গীত কেবলমাত্র সমগ্র বাংলাদেশ-ব্যাপী প্রচলিত পূজা-পার্বণে গীত হইয়া থাকে, তাহাই উদ্ধৃত হইবে।

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ়—বৎসরের এই তিনটি মাসে অনুষ্ঠিত কোন সামাজিক উৎসবের কোন সঙ্গীত সংগৃহীত হইতে পারে নাই। এই সময়ে যে সকল অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহাদের সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য এবং তাহাদের অধিকাংশের সঙ্গেই ছড়ার সম্পর্ক থাকিলেও কোন সঙ্গীতের সম্পর্ক থাকে না। আঞ্চলিক সঙ্গীতের মধ্যে ইহাদের কিছু কিছু নিদর্শন পুর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং শ্রাবণ মাস হইতেই এখানে আরম্ভ করা হইতেছে।

প্রথমতঃ শ্রাবণ মাসে যে মনসার পুজা হয়, সেই উপলক্ষে মেয়েলী গীত শুনিতে পাওয়া যায়। দুইটির নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

১

লামো মনসাদেবী শঙ্কর-দুহিতা।
জরৎকারু মুনি-পত্নী আস্তিকের মাতা॥
ব্রহ্মার দুর্লভ রথ দিয়াছেন বাপে।
সেই রথে লামো, মাগো, পূজার মণ্ডপে॥
হংসবাহন রথে জয় পদ্মাবতী।
অষ্টনাগ লইয়া লামো দেব পশুপতি॥
জালুমালু দুই ভাই কার্তিক গণাই।
সঙ্গে করে নিয়া লামো পাত্র নেতাই॥
আলিপন চিত্রপট রক্ত পদ্মপাতে।
আতপ তণ্ডুল ক্ষীর ঘৃত মধু তাতে॥
স্থানে স্থানে পাতিয়াছে রক্ত পদ্মপাতে।
কুশিয়ারি খণ্ড খণ্ড শোভিয়াছে তাতে।
হংস কবতর বলি ছাগ মেষ সনে।

ব্রাহ্মণ সজ্জনে পুজে কল্যাণ কারণে।
রুধিরে বহন্তি নদী মাংসপঙ্ককুলে।
চৌদিকে থাকিয়া লোক হরি হরি বলে॥
লামো মনসা দেবী…… .. —মৈমনসিংহ

২

লামো, মা গো, পূজার মণ্ডপে,
হেথা আসি পুজাস্থান, ঘটে হও অধিষ্ঠান,
মা গো, সেবকে পূজয়ে ভক্তিভাবে।
দিয়া গন্ধ চন্দন, করিয়াছি নিমন্ত্রণ,
মা গো—
কায়মনচিত্তে ভক্তি, যা পারি আপন শক্তি
মা গো, তাহা দিয়া পূজিব তোমারে।
তুমি দেবী চতুর্ভুজা, যে করে তোমার পূজা
মা গো, ধনে পুত্রে বাড়ে সেই জনে,
সিজবৃক্ষের ডাল আনি, উপরে চান্দুয়া টানি
মা গো… । —ঐ

ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে রঙ্গপুর জিলাব পল্লী অঞ্চলে শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত সঙ্গীতের আকারে পরিবেষণ করা হইত। ১৩১৬ সালে সংগৃহীত সেই প্রকার একটি সঙ্গীত একটু দীর্ঘ হইলেও এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য। কারণ, বাংলার লোক-সাহিত্যে কৃষ্ণলীলার যে একটি বিশেষ রূপ প্রকাশ পাইয়াছিল, ইহার মধ্যে তাহার একটি উল্লেখযোগ্য অংশের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

৩

উগ্রসেন মহারাজা তিরি জগতে[১] জানি।
তার ঘরত্ উপজিল[২] কন্যা নাম দৈবকিনী॥
কার ঘরত্ দিম[৩] কন্যা যোগ্য নাই বর।
রূপ আছে রতন আছে পরম সুন্দর॥

১। ত্রিজগতে ২। জন্মগ্রহণ কবিল ৩। দিব

হেনকালে চলিয়া আইল নারদ মুনিবর।
মুনিক দেখিয়া রাজা করিল সম্ভাষণ॥
বসিবার দিল মুনিক্ উত্তম সিংহাসন।
পাও ধোয়ার[৪] আনিয়া দিল ঝারিতে করি জল।
এক ডালা আনিয়া দিল নানামত ফল।
কর্পূর তাম্বূল দিল বাটা ভরি পান॥
রাজা কইল ভাল হ'ল মুনিঠাকুর ইতি আগমন।
মোর[৫] ঘরে বাড়ে কন্যা নামে দৈবকিনী।
দেখিতে রূপসী বড় চন্দ্রবদনী॥
রূপে গুণে বাড়ে কন্যা পরম সুন্দর।
কোন্ স্থানে দিম[৬] বিয়া[৭] যোগ্য না পাই বর॥
হেনকালে গণিয়া[৮] কইল নারদ মুনিবর।
গোকুল নগরে আছে বাসুদেবের ঘব॥
সেইস্থানে দেও বিয়া দৈবক সুন্দর।
দৈবকিনী বাসুদেব তুই মম ঘর॥
তাক্ শুনিয়া দৈবক রাজা হরষিত হ'য়া।
নারদক্ পাটেয়া[৯] দিয়া বাসুদেবক্ আনিয়া ধরিয়া॥
নানা রাজ্যের রাজাক্ আনে সম্ভাষিয়া॥
বাউয়া[১০] ভাট ব্রাহ্মণ ভায়া আসিল বিস্তর।
নানা লোকজনে ভবলো দেবকেব ঘব॥
চারি গাড়ি রামকলা আঁগিনায়[১১] গাড়িয়া[১২]।
সোনার ঘট চা'লন বাতি[১৩] দিয়া লইল বরিয়া॥
আট নগম[১৪] চার করিয়া দৈবকিনীর বিয়া॥
ধুমধাম পড়িয়া গেল বাসুদেবক্ দিয়া।
বাসুদেব দৈবকিনীক্ থু'য়া[১৫] একমন্তর॥
হস্তী ঘোড়া দান করে রাজ-রাজেশ্বর॥

৪। চরণ ধৌত করিবার ৫। আমার ৬। দিব ৭। বিবাহ ৮। গণনা করিয়া ৯। পাঠাইয়া ১০। ববাহুত ১১। অঙ্গনে ১২। প্রোথিত করিয়া ১৩। ববণডালা ১৪। লগ্ন ১৫। রাখিয়া

পত্তমেতে দান করে দান কন্যার হয় মাঁও[১৬]।
তাঁয়মে[১৭] করিল দান একশত মাঁও ॥
তার পাচত্[১৮] করে দান কন্যার হয় ভাই।
তাঁযমে করিল দান একশত গাই ॥
তার পাচত্ করে দান কন্যার হয় জেটা ॥
একটা গাভী করিল দান তারও নেংগুর[১৯] কাটা ॥
তার পাচত্ করে দান কন্যার হয় জেটাই।
তায়মে করিল দান চরকা কাটা নাটাই ॥
তার পাচত্ করে দান কন্যার হয় আজ্জা[২০]।
দান নাই দক্ষিণা নাই খালি হাকু দাকু ॥[২১]
তার পাচত্ করে দান কন্যার হয় মামা।
তাঁয়মে করিলে দান ভাঙ্গা গাইলের সামা ॥
হেনকালে গণিযা কইল মুনিবর।
কংস তোর মরণ দেখি দৈবকিনীর উদর ॥
এ বোল শুনি কংস রাজা মনে বড় দুঃখী।
হস্তে খড়্গ লইযা যায় কাটিতে দৈবকী ॥
সাত পাঁচ রাজা তাকে বান্ধিল ধরিয়া।
হেনকালে মুনি গোঁসাই বুজা'ল আসিয়া ॥
গো বধ বামন বধ দানেতে পলায়।
তিরি বধ করিলে পাতক সঙ্গে চলি যায়।
দৈবকী বসুদেব গেল গোকুল নগর।
সপ্ত সন্তান জনমে তাঁর বচর বচর ॥
জন্মে জন্মে বসুদেব কৃষ্ণের আরাধনা করে।
সেই কৃষ্ণ জন্ম লইল দৈবকীর উদরে ॥
মাসের শেষে চাঁদের দিনে দৈবকীর পাইল ঋতু।
গিলা আমলা লইয়া চলিল সিনানে।
পূর্ণরূপে পথে দেখা দিলেন নারাযণে ॥
ও দৈবকী ও দৈবকী দৈবকিনী রাই।

১৬। মাতা ১৭। তিনি ১৮। পশ্চাৎ ১৯। লাঙ্গুল ২০। মাতামহ ২১। তাড়াতাড়ি

তোমার গরভৎ খানিক্ মাগি ঠাঁই ॥
দেবকিনী বলে আজ কি হ'ল আমার।
চতুর পাশে দেখি আমি ঘোর আঁধিয়ার ॥
রবির তাপেতে হামি পন্থ দেখি দূর।
না জানি কোন্ দেবে হামাক্ ডাকে উরাউর ॥
তুমি কেন চিন্ত, মাতা, দৈবকী সুন্দরী।
মারিব তোমার ঐরি আমি যে শ্রীহরি ॥
এক্ দিনকার নিশিযোগে এড়িব গদাধর।
সবংশে বধিব রাজাক্ কার্য কত বড়্ ॥
মৈল ব'লে মারিব রাজা তাক্ গণিবার পারি।
বধিব রাজা কংসাসুর তবে কত ঘড়ি ॥
স্নানেতে চলিল তখন দৈবকী সুন্দরী।
মাটিরূপে গরূবে বাস লইলেন শ্রীহরি ॥
এ পারূত স্নান করে সত্যের দৈবকিনী।
ও পারূত স্নান্ করে যশোদা রুহিণী ॥
যশোদা বলে—সই বল, পরাণের সই, সে কওঁ বোল।
মাজোত্[২২] নদী যমুনা না হ'লে ছুঁইয়া দিহু হয় কোল ॥
এ বোল শুনিয়া যমুনা নদী ছাড়িয়া গেল পরে ॥
দুই সই কোলাকুলি করে জলের উপরে ॥
যশোদা বলে—সই সই পরাণের সই সে কওঁ তোক্ বাণী।
কয়দিন কয়মাস তোর এ গরভ খানি ॥
কথা শুনি দৈবকিনী লাগিল কাঁদিবার।
তুঁই কিনা জান সই ভাই যে পর আমার ॥
সাত দিবসে সাত ছাওয়াক্[২৩] প্যাটাবো যমের ঘর ॥
আরের হয় দশদিন দশমাস মোর হইল বাচার ॥
যশোদা বলে—সই বল পরাণের সই শুন সত্য করি ॥
তোমার ছাওয়া দিবেন মোক্ দৈবকী সুন্দরী ॥

২২। মধ্যেতে ২৩। পুত্রকে

আমার ঘরে যদি কন্যা হয় তোমাক্ ক'রমো দান।
তোমার ঘরে পুত্র হইলে দিবেন মোকে দান ॥
দুইজনে সত্যসোদা করিল নদীর ধার।
এক সত্য দুই সত্য সত্য যে তিনবার ॥
সই সত্য ভঙ্গ হ'লে পাচোত্ ভালাই নাই।
দুই জনে সত্যসোদন করিল এ ঠাঁই ॥
হাঁটু পানিত্ নামিয়া দৈবকিনী হাঁটু করিল সুদ।
হিয়া পানিতে নামিয়া দৈবকিনী দিল পঞ্চ ডুব ॥
কুঘাটে নামি দৈবকিনী কি সুঘাটে উঠিল।
দৈবকিনীর মাথায় তখন পুষ্পবৃষ্টি হইল ॥
ভিজা বস্তর[২৪] ছাড়িয়া তখন সুখন বস্তর পরে।
কাঁখের কুম্ভ নইল তখন কাঁখের উপরে ॥
দুই ঝনে চলিয়া গেল দুই ঝনের ঘরে।
ইহার পরে কি হইল তাহা বলিব ইহার পরে ॥
স্নান করি' দৈর্বকিনী মন্দিরে দিলেক পাঁও।
দিনে দিনে বাডিয়া গেল পাঁও পাঁও[২৫] ॥
হেনকালে বলে আইসে অসুর ঘরে ঘর।
উরিয়া চলে চকিয়া নিশাচর ॥
এই মতে গেল চর রাজার দরবার।
মথুরা নগরেতে কংস রাজা বসে দিয়া বার ॥
পঞ্চপাশে আছে রাজার এ পঞ্চ পাত্তর।
নাজির উজির আছে রাজার বেয়াল্লিশ শাস্তর ॥
ডাণ্ডী কাঁসী তামা পিতল বাজিছে সাঁনাই।
রণসিঙ্গা করতাল বাজে লেখা জোঁকা নাই ॥
রাজা বোলে বাজনিয়া ব্যাটা বাইজ থ্যামা কর।
কি খবর নিয়া আইল চর বলুক উত্তর ॥
হস্তজোড়ে চর ব্যাটা করে নমস্কার
দেখছি দৈবকীর গর্ভ মুঁই গদাধর ॥

২৪। বস্ত্র ২৫। পা পা

কথা শুনিয়া কংশ রাজার টাটাইল গাও।
হাটমুণ্ড হইল রাজা মুখে না ব্যারায় রাও॥
বিয়ান বেলা জল দিয়া রাজা করিল ছিনান।
পঞ্চপাত্র লইয়া রাজা বসিল দেওয়ান॥
রাজা বলে, পাত্তরগণ, কোন্ বুদ্ধে তরি।
হামাক্ বধিতে জন্ম নইছেন হরি॥
নাজির উজির বলে, রাজা, লোহার বাঁধ গড।
হস্তি ঘোঁড়া রাখ রাজা লোক নস্কর॥
এতেক্ থাকিতে রাজা কার সে বাজোক্ ডর।
পাত্তর বলে, মহারাজা, মোর বুদ্ধি ধর॥
তোমার বইন দৈবকিনীক্ আনিয়া বন্দী কর।
এই বুদ্ধিতে চল্লে রাজা না থাকিবে ডর॥
এ শিশু হইলে তাক্ পাঠামো যম ঘর।
এ বোল শুনিয়া কংস হরষিত মন।
চর চর বলিয়া রাজা ডাকে ঘন ঘন॥
ডাক মাত্তর চব ব্যাটা দিলেক দবশন।
আসিয়া সে চব ব্যাটা করিলেক বন্দন॥
হস্ত জুড়ি' চর ব্যাটা কবে নমস্কার।
কি কাবণে, মহারাজা, তলফ্ হামার॥
সেই চরোক পাচিল বাজা চক্ষেব টিপ্ দিয়া।
যাহরে চলিয়া, চব, গোকুলক্ নাগিযা॥
এক্ আজ্ঞা না পার ছও যে আজ্ঞা পায়।
হস্তে শ্যাল[২৬] ববষা নিযা দিক দৌড়ে ধায়॥
দৌড পাড়ে কংসের চর না বাঁধে মাথার ক্যাশ[২৭]।
গোকুল নগরে যায়া হইল পরবেশ॥
গোকুলে যাইয়া চব কিরাইয়া দেই।
লাগিছে রাজার দববাব না হইবে ভালাই॥

২৬। শেল

বসুদেব দেবকী যমুনা হও পার।
শীগ্‌গির করিয়া যাও তোম্‌রা রাজার দরবার॥
ঠাকুর বলাই বলে মধুর বচন।
মিঠাই জলপান কিছু করহ ভোজন॥
মিটাই সন্দেশ আদি চরোক ভোজন করা'য়া।
দুইজনে কাপড পিন্দে ঘরের ভিতর যায়া'॥
বসুদেব দৈবকিনীক্ আগোত্ করিয়া।
রাজার দরবাবোত্ চর উতরিল গিয়া॥
হস্তজোডে বসুদেব করে নমস্কার।
কি কারণে, মহারাজা, তলপ্ হাঁমার॥

রাজা বলে, ও বসুদেব,

পুরাণ নারদমুনি কইছে বারে বার।
ভাগিনা ভাগিনী হ'লে মরণ তোমার॥
দুইজনে থাক বন্দী গডেব ভিতর।
ভূমিষ্ঠ হইলে ছাইলাক্ পাটামোঁ যম-ঘর॥
কথা শুনি দৈবকিনী লাগিল কাঁদিবার॥
বিনাইয়া বিনাইয়া কয় রাজার দরবার॥
ভাই, গোওইলুঁ পরাণে দোসর এক্‌খানি ঝিউ নারি।
কন্যা, দাদা, নাথুল্ গোচর মরুক, দাদা, তোর হাতী-ঘোঁডী॥
তোব মাউগ[২৮] হয়ে থাক রাঁডী।
আপনে টলুক, দাদা, তোব মাথায় পাগুডী॥
আপনে বারাউক তোর পেটের নাডি ভুঁডী।
কংস বলে চর তোর বাপের মাথা চাঁও।
ধাক্কা দিয়ে দৈবকিনীক্ গডের ভেতর নেও॥
দৈবকিনী বলে ভাল মন্দ কয়লো কোন জন।
রাজা হয়া বসচো তুমি বড মোহাজন॥
চর তো উঠিয়া বলে তুঁই বসুদেবের রাণী।
কে তোক্ বলিবে মন্দ রাজার ভগিনী।

২৭। কেশ ২৮। স্ত্রী

তখন বাসুদেব দৈবকিনীক্ করে বন্দী।
করিল বন্দী নানা করিয়া সন্দি[২৯] ॥
আশি মন লোহা দিয়া বাঁদে গড শাল।
বাহিরের পরকাশ নাই উপরে বর্ম জাল ॥
কাঁদি কাঁদি দৈবকিনী করিলা শয়ন।
শিয়রে বসিয়া স্বপন দেখাল নাবাযণ ॥
কি কারণে কাঁদ মাও তোমরা দুইজন।
তোমার গরভে বাস লইলাম নারায়ণ ॥
এক দিনকার নিশি যোগে দেখামো নিজের বল।
স্ববংশে বধিব রাজাকে কার্য কত বল ॥
গোকুলে জনমিতে হাঁমার হইছে আবার মন।
ইন্দ্র আদি দেবগণ আসিবে জনে জন ॥
নিদ্রা ছিল দৈবকিনী পাইল চেতন!
উঠ উঠ, ওহে প্রভু, আমার মাথার রতন ॥
আজ নিশাকালে বিয়ান কালে[৩০] দেখিনু স্বপন।
হামার গরভে বাস লইছে নারায়ণ ॥
গোকুলে জনমিতে তাঁব হইছে বড মন।
এই বোল বলিয়া তায় গেইছে ইন্দ্রের ভুবন ॥
দেবগণ বলিয়া কৃষ্ণ ডাকে ঘনে ঘন।
শুন সব দেবগণ হাঁমার বচন ॥
হস্ত জোড়ে দেবগণ করে নমস্কাব।
কি কারণে, মহাপ্রভু তলফ্ হাঁমার ॥
কৃষ্ণ বলে মধুর স্বরে, ওহে দেবগণ।
গোকুলে জন্মিতে হাঁমার হইয়াছে মন ॥
সবে আসিয়া কর ঝড বরিষণ।
একুন দেবগণ হাঁমার বচন ॥
বাওয়ান্ন পুটি বাও নইয়া হ'ল পবনের সাজন।
চল্লিশ পুটি শিল লইয়া হ'ল শিলাবতীর গমন ॥

২৯। সন্ধি ৩০। প্রাতঃকালে।

বার মেঘ লইয়া হল ইন্দ্রের সাজন।
সিংহনাদে হস্তী ডাকে মেঘের গরজন ॥
সাত রাত নও দিন ঝড়ে গোকুল ভিতর।
কত ঘর বাড়ী পড়ে সংখ্যা নাই তার ॥
মটুক[৩১] নালে বর্ষে ম্যাগ বজ্জোর[৩২] নাগে শিলা,
গাছ বিরিক্[৩৩] ভাঙ্গিয়া বিরিকের উডায় ধূলা ॥
শ্রীফল পড়ে নেঙ্‌গুড়[৩৪] ভাঙ্গিয়া।
বাগায়[৩৫] মারে নল।
কংস রাজার চর পলাইয়া গেল মাচার তল ॥
পাইক্ পলায় ধনকো পলায় করিয়া নোডা-মুডি ॥
ঝড়ের চোটেতে ম'ল কত বুডা বুডী ॥
এক পাইক্ পলেয়া[৩৬] গেল হালুয়াদের[৩৭] কাছে।
ঢাল তলয়ার তেজ্য করি ক্ষেতের থুবডা বাচে ॥
আর চর পলেয়া গেল কাঁচ পোয়াতির কাছে।
মাথার পাগ্‌ডী কাডিয়া নিয়া ছাওয়ার টিকা মোচে ॥
মাউগেক্ বলে মাঁও মা ও দুয়ার চাপি ধর।
ঝডের ঠেলায় মোর হইচে বড ডর ॥
আর ঝাঁয় কাচ্‌রি করে মাউগ্‌ হয় তার মাও।
ভ্যাডোল কারয়া পুসিম্[৩৮] বিরধ[৩৯] বান্ মাও ॥
ঢাল তলয়ার ভাঙ্গিয়া গডাইম্ কাচি দাও।
ক্ষেত করবার প'াল্লে মুঁই মারিম এক দাও ॥
দিন করিল যেমন তেমন রাত্তির হ'ল নিশি।
দৈবকিনীর ছাইলা হ'ল না জানে পড়সি ॥
উপজিল বরণ কালা গলায় বোনের মালা।
নাকের স্বর বাঁশীয় আও[৪০]মুখখানি ভরা হাঁসি ॥
রূপেতে আঁধার নাশি হাঁসি হাঁসি ডাকে মাও মাও।
মাণিক মকুট মাতে শ্রীফল কমল হাতে ॥

৩১। মুকুট ৩২। বজ্র ৩৩। বৃক্ষ ৩৪। লাঙ্গুল ৩৫। ব্যাঘ্র ৩৬। পলাইয়া ৩৭। কৃষক ৩৮। পষির ৩৯। বদ্ধ ৪০। রব

ডাইনে লক্ষ্মী বামে সরস্বতী ॥
হালিয়া ঢুলিয়া যায় যুগল নেপুর[৪১] পায়
বাহিরায় অঙ্গের কত জ্যোতি ॥
ইন্দ্র আইল ঐরাবতে শচী আইল পুষ্পরথে
বসুমতী করে নাভিচ্ছেদ ॥
ব্রহ্মা আর শূলপাণি দেবগণ যত মুনি
ছাইলা দেখি মিটাইল ক্ষেদ ॥
মায়ে বলে পুত পুত দেখাও বাছার চাঁদ মুখ
কেন আইলা অভাগিনীর ঘরে।
এখনে কংসের চরে বাডী ঘরে নটিয়া নডে
অছাডিয়া মারিবে শিলের পরে।
আঁধার ঘরোত্ উপজিল কৃষ্ণ হইল জোনাকময়[৪২]।
ওদর হ'তে ভূমে পডিয়া মায়েব সনে কতা কয় ॥
কৃষ্ণ বলে,—হাঁমাক্ গরভে বাস দিয়া মা বড পাইলা দুখ।
রাধবার দিনে মা যেমন চন্দ্র মুখ ॥
শীঘ্র করিয়া, মাও, গোকুল চলায় কংস জিবার নয়।
হায় বলিয়া দৈবকী বালিসে মারে ঘাও ॥
কে আর ডাকিবে মোক্ বলিয়া বলাইর মাও ॥
জয় রে দে জয় বে ধনি যবে আনন্দিত।
বিদ্যাধরী করে নাচ গন্ধর্বে গায় গীত ॥
কৃষ্ণ বলে,—পিতা, বচন মোর ধর।
হামাক্ বদলায়া আইসো নন্দ ঘোষের ঘরোত্ ॥
বসুদেব বলে,—পথম্ পাইক জাগে হাতে ধনু শর।
তিন ত্রিফলা জাগে, বাপু, দেখিতে লাগে ডর ॥
উলমান সুরমান জাগে ঝাড শব্দ খাডা।
আর বাঁশাব খাপুয়ার জাগে জাগে ঘনে ঘন ॥
ঢালী সবে জাগে, বাপু, ঢাল ক'রি কাঁধে।
বন্দুকচী[৪৩] সর্গায়[৪৪] জাগে বন্দুক লয়ে কাঁধে ॥

৪১। নূপুর ৪২। জোৎস্নাময় ৪৩। বন্দুকধারী ৪৪। সকে

নেগম্ পাইক জাগে রাজার বড ঘরের পাচে।
ফুল পাইক আদি জাগে একে একে পাচে।
গডখাইয়া জাগে বাপু এলা আগমন।
কংস রাজার বিশ্বাস মাদাই জাগে ঘনে ঘন॥
হস্তি-পিটে মাউত আর ঘোডা পিটে জিন।
আট ভাই ভেঁউর বাজায় জাগে রাত্র দিন॥
পড়ুয়া পণ্ডিত জাগে তোমার কারণ।
লোক ল'য়ে ছাওয়াল কৃষ্ণ কেমনে করিব গমন॥
এ বোল শুনিয়া ছাওয়াল কৃষ্ণ হরষিত মন।
নিন্দ্রায়ালি বলিয়া কৃষ্ণ ডাকে ঘনে ঘন॥
ডাক মাত্র নিন্দ্রায়ালি দিলেক্ দরিশন।
নিন্দ্রায়ালি করে কৃষ্ণের চরণ পরিশন॥
হস্ত জোডে নিন্দ্রায়ালি করে নমস্কার।
কি কারণে, মহাপ্রভু, তলফ্ আমার॥

কৃষ্ণ বলে,—তোক্ বলো, নিন্দ্রায়ালি, বচন মোর ধর।
কংস-রাজার পুরী সহিত অচৈতন্য কর॥
এ বোল শুনি নিন্দ্রায়ালি চলিল হাসিয়া।
উহিলি কুহিলি নিন্দ্রা দিলেন ছাডিয়া॥
পত্তমে পাইক নিন্দ্রা গেল হস্তে ধনুশর।
তিন ত্রিফলা নিন্দ্রা গেল দেখিতে নাগে ডর॥
উরমান সুরনান নিন্দ্রা গেল ঝাড শব্দ খাডা।
আর বাঁশুয়ার খাপুয়ার নিন্দ্রা গেল পডিয়া রইল কঁড়া॥
বন্দুকচী নিন্দ্রা গেল বন্দুক ল'য়ে কাঁধে।
ঢালী সব নিন্দ্রা গেল ঢাল নাহি বাঁধে॥
গডখায়েরা নিন্দ্রা গেল এলা আগমন।
কংস-রাজার বিশ্বাস মান্দাই নিন্দে হল অচেতন॥
হস্তি পিষ্টে মাহুত পহরী ঘোডা পিষ্টে জিন।
আট ভেঁউরিয়া ভেঁউর বাজায় সেও পডিল নিন॥

এও সব পড়ুয়া পণ্ডিত নিদ্রা গেল।
একে একে রাজপুরী অচেতন হ'ল ॥
কৃষ্ণ বলে, পিতা গোও, হাঁমাক্ লইয়া চল।
তখন ঘর হতে হ'ল বাহির ঝড় বাতাস গেল ॥
মাইর স্মরণেতে আগোত্ যায় মহেশ্বর।
দেব গন্ধর্ব মাতে, যমুনায় দিল বালুচর ॥
দেখিয়া যমুনার ঢেউ প্রাণে নাগে ডর।
কিরূপে এই যমুনা হম[৪৫] মোৰা পার ॥
কৃষ্ণ বলে, আগে, বাপু, শৃগালী হয় পার।
হাঁটু পাণি হবার নয় হামাক্ যমুনা কর পার ॥
মনোত্ না কবিও ডর, বাপু, পাব হও মোক্ ধরে।
অনেক পুণ্যের ফলে আসিচোঁ তোর ঘরে ॥
গুণনিধি লইয়া কোলে বসুদেব নামিল জলে।
ছিনান কবিল যাদুমণি ॥
থাকিয়া পিতার কোলে ঝাঁপ্ দিয়া পইল জলে।
বসুদেব হাঁচ্তায়[৪৬] যমুনার পানি ॥
বসুদেব হাঁচতায়া চায় কেষ্টের নাগাইল নাহি পায়।
বিষাদে মনে মনে গণে ॥
কি হ'ল কপালে মোর সুখের পালা হ'ল ভোর।
কি করিম ছাইলাৰ সন্ধানে ॥
সাত পুত্তের শোকে তনু হ'ল জর জর।
এ কতা শুনি দৈব্যকিনী না বাঁচিবে আর ॥
ডাকিয়া বলে শ্রীহরি এবে স্নান করোঁ।
কাঁদিয়া বেকুল কেনে কি হইবে এ কোন্ তোৰোঁ ॥
দশমাস দশদিন মায়ের ওদরত্[৪৭] আচিনু।
তন না খাঁও দুদ না খাঁও তেঁও তো মুঁই বাঁচিনু ॥
জলোক্ স্নান দেহা করিয়া দেও শুদ।
এত দড় হচিস্, বাবা, ত্যাও নাই তোর বুধ্[৪৮] ॥

৪৫। হইব ৪৬। অনুসন্ধান করে ৪৭। উদরেতে ৪৮। বুদ্ধি

জলোত্ হাঁচতায়া' পাইল, কোলাত্ তুলিয়া লইল।
উপস্থিত নন্দের বাড়ীত্ যায়া ॥
বসুদেব বলে,—অনেক পুণ্যের ফলে কৃষ্ণ আসিছে মোর ঘরে।
আন দেখি তোর মহামায়া ॥
নন্দ বলে,—মোর ঘরে হইচে ছাওয়া নাম থুচি মহামায়া
রূপে গুণে বড় বিদ্যাধরী ॥
কৃষ্ণ বলে,—এক কন্যা দান ক'রবে কোটি-পুরুষ উদ্ধার হইবে।
পুত্তর রূপে পাইবে শ্রীহরি ॥
শ্রীহরিক্ নিল কোলে তুই চক্ষুত্ যেন রতন জলে।
মহামায়াক্ বদল করিয়া ॥
সুখে ভাঁসি নন্দ যায় হাঁসি খুঁসি যশোদায়
পুত্র কোনাক্ কোলাত্[৪৯] দিল নিয়া ॥
কোন্ বা গরবাথাকি গরবে দিবে ঠাঁই
তার বা পরাণে কত ধরে।
বদল করিয়া নিল মাই ॥
ঝড় বাতাস গেয়াল ॥
কংসের চর ঘিরিল বাড়ী দূত মুখে তাড়াতাড়ি
চবে করে রাজার গোচর।
তোমার হইচে ভগিনী, দূত মুখে বার্তা শুনি
রাজা যায় শিগ্‌গির সেই ঘর ॥
বার করে মহামায়া ধোপার পাটোত্ আচড় দেয় যায়া।
উড়িয়া হ'ল তাঁয় আকাশ-কামিনী ॥
উড়িয়া যায় মহামায়া তাঁয় সে যায় কয়া।
যা হয়, মামা, কর তুমি মোর কতা শুনি ॥
মারিম্ না তোমাকে মুঁই মোকেও মারতে পারবু না তুঁই।
ইয়ার প্রিতিকার বুজবু তুঁই পরে ॥
তোমাক্ বধিবে যেই, গোকুলত্ বাড়িছে সেই।
দেখ যায়া' নন্দঘোষের ঘরে ॥

৪৯। কোলেতে

কত্তা শুনি কংস-রাজা আচম্বিত মন।
চর চর বলিয়া রাজা ডাকে ঘনে ঘন॥
মহাপাত্র উঠিয়া রাজাক্ জানাল উত্তর।
তোমার মিত্র আছে রাজা কালীদও সাগর॥
কালীদহের কূলে কূলে উনকুটি নাগের থাল।
সেই বুদ্ধে মারিমেঁা ছাইলাক্ কাল্যে দেখামেঁা চাইল॥

—রঙ্গপুর

আশ্বিনমাসে দুর্গোৎসব উপলক্ষে মেয়েলী সঙ্গীতে এই আগমনী শুনিতে পাওয়া যায়।

৪

পুণ্যধাম বাপের বাড়ী, যাইতে চাহে সকল নারী,
ঐ দেখ না দুর্গাদেবী সিংহবাহিনী।
গণেশের কোলত করি আইসেন জননী॥
সম্মুখেতে নন্দী আইয়ের আশা ছোটা ধরি।
ভিঙ্গি চলে পাছে পাছে ধুতুম্ তুতুম্ করি।
মেনা আইলো বারাই নিতে আদরের ঝি।
ঝি নাতি দেখি মেনা হাসে ভাসে সুখে।
বাটা ভরি আনে পান দিতে ঝিয়ের মুখে॥
আক বাড়াইয়া নিল মায়ে বাড়ীর ভিতর।
পূজা দিল বলি দিল খাবাইল বিস্তর॥
তিন দিন রাখিল মায়ে বড় যতন করি।
চারি দিনর দিন বিদায় দিল যাইত নিজের বাড়ী॥
শিবে বোলে কি আনিলা আমার কারণ।
আলুনি কচুশাক টুনি পোড়া পাণি ভাত,
গরীব বাপের বাড়ী আমার ভোজন॥ —ঢাকা

রাণী, দেও গো জয়ধ্বনি।
তোমার উমা লইয়া আসিল নন্দিনী॥

একে শুক্র উদয় শরত সময়,
ভাগ্যে বুঝি ব্রহ্মময়ী আসল হিমালয় ॥
উমা কোলেতে আনি, বসাইলেন রাণী,
আস আমার চাঁদবদনী জুড়াও গো প্রাণি ॥
আমি জিজ্ঞাসা করি হে গো তারিণী,
কেমন কইরা হবের গৃহে আছিলা তুমি ॥
না বহে বাণী, শুন জননী,
না দেয় বলে হরনাথে, উড়েছিল প্রাণি ॥
জামাই কি আপন নিশির স্বপন,
উমা ধনকে না দেখিলে ত্যজিবে জীবন ॥
এক পাগলের পুব, শুনিতে অদ্ভুৎ,
শ্মশানে মশানে ফিরে খায় ভাঙের গুড়া ॥ —ত্রিপুরা

দুর্গাপূজা উপলক্ষে এইপ্রকার গান শুনিতে পাওয়া যায়—

৬

দুর্গা আমার বিপদ্ বিনাশিণী।
জয়তারা তারিণী মা গো হিমালয়-নন্দিনী।
মা গো তোমাব পদে করি স্তুতি, বাম রঘুমণি ॥
ব্রহ্মা হৈলেন পুরোহিত, রাম হৈলেন যজমান।
কত ব্রহ্মা ভগবতীব পূজার বিধান ॥
শঙ্খ লাগে সিন্দুর লাগে, রজত কাঞ্চন।
কুম্‌কুম্ কস্তুরী লাগে,—আগর চন্দন ॥
সপ্তমী পুজিলেন ব্রহ্মা, সপ্ত উপচারে।
ভোগ নৈবিদ্যি দিলেন ব্রহ্মা, হাজারে হাজারে ॥
অষ্টমী পুজিলেন ব্রহ্মা, অষ্ট উপচারে।
বিল্বপত্র দিলেন ব্রহ্মা—হাজারে হাজারে ॥
নবমী পূজিলেন ব্রহ্মা নব উপচাবে।
মেষ-মৈষ দিলেন ব্রহ্মা, হাজারে হাজারে ॥ —মৈমনসিংহ

৭

বন্দোম্ সরেস্বতী দেব নারায়ণ
পেরথোমে বন্দিলাম, মাগো, দুগ্গার চরোণ।
বন্দোম্ সরেস্বতী দেব নারায়ণ ॥
তারপরে বন্দিলাম মোরা অসুরের চরোণ।
বন্দোম্ সরেস্বতী দেব নারায়ণ ॥
তারপরে বন্দিলাম মোরা জয়ারি চরোণ।
বন্দোম্ সরেস্বতী দেব নারায়ণ ॥
তারপরে বন্দিলাম মোরা বিজয়ার চরোণ।
বন্দোম্ সরেস্বতী দেব নারায়ণ ॥
তারপর বন্দি যে দেব কাতিকের চরোণ।
বন্দোম্ সরেস্বতী দেব নারারণ ॥
তারপর বন্দি যে দেব গোণেশের চরোণ।
বন্দোম্ সরেস্বতী নারায়ণ ॥ —বরিশাল

রামলীলা উপলক্ষে এই গান শুনিতে পাওয়া যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে রামলীলা বাঙ্গালীর নিজস্ব জাতীয় অনুষ্ঠান নহে, তথাপি কোন না কোন সূত্রে রামোপাসনারও একটি ক্ষীণ ধারা বাংলাদেশে প্রবাহিত হইয়াছিল। তাহারই পরিচয় ইহার মধ্যে আছে।

৮

মাগো, সরস্বতী, করি স্তুতি, বল্‌তে নাহি জানি,
পিতৃসত্য পাল্‌তে বনে চল্‌লেন রঘুমণি।
সঙ্গে জানকী লয়ে লক্ষ্মণ ভায়ে করিলেন গতি,
পঞ্চবটী বনে স্থিতি করলেন বসতি।
শুন্‌ল রাবণ রাজা, শুন্‌লো রাবণ রাজা
বল প্রজা রাক্ষসে প্রধান।
মায়া-মৃগ পাঠায়ে সাজালো রথখান।
হ'লো সেই সাগর পার, হলো সেই সাগর পার,
দণ্ডধর সন্ন্যাসীর বেশে।
ভিক্ষা ছলে ধর্‌ল সীতা কেমন সাহসে।

তুলে নিল অশোক বনে, তুলে নিল অশোক বনে
চেড়ীগণে রাখলেক প্রহরী।
শূন্য পুরী কাঁদেন হরি না দেখে সুন্দরী।
জানকী কোথায় গেল! জানকী কোথায় গেল
কিনা হ'ল ভাইরে লক্ষ্মণ,
সূর্যবংশ হবার ধ্বংস বুঝি তার লক্ষণ।
মোর এই 'বক্তে' ছিল, মোর এই 'বক্তে' ছিল
পিতা মোল অন্ধমুনির শাপে,
শূন্য ঘরে সীতা চুরি করলে কোন পাপে। —মুর্শিদাবাদ

পৌরাণিক দুর্গার একটি লৌকিক রূপ বনদুর্গা, তিনি অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী (sylvan goddess)। তাঁহার পূজার এই নিয়ম,—'শেওড়া বা বটগাছের গোড়ায় কলার পাঁচটি আঙ্গট্ পাতায় আতপের চিড়া, চাট খৈ, বিনা বালুতে ভাজা ধানেব খৈ, চাউল পোড়া, ঝিকর, বীচি কলা, ফুল, দূর্বা, চিনি বাতাসা প্রভৃতি নৈবেদ্য দিতে হয়। বনদুর্গা গাছের মধ্যে অধিষ্ঠিতা থাকেন, এই বিশ্বাসে ব্রতিনী গাছের ডালে শাঁখা-সিঁদুব, আয়না-চিরুণী, লাল-হলুদ সূতা, কাপড় অথবা তৎপরিবর্তে হলুদ দিয়া রঙ করা কাপড়ের টুকরা, ঝুলের কালিতে রং-করা কাপড়ের পাড, দুইটা বীচি কলা, দুই ভাগে পান-সুপারি ও দুই মুঠ মাখা চিড়া-গুঁড়া দিয়া থাকেন। অপব একটি আঙ্গট্পাতায় পিটুলীর তৈয়ারী দুইটি মূর্তি ও মাটির তৈয়ারী কাল রং-এর দুইটি গোলাকার চুড়ি দেওয়া হয়। কলার খোলের দুইটি ডোঙ্গায় করিয়া ধান ও চাউল এবং দুইটি হাঁসের ডিমও দিবার রীতি আছে।'

কই গেলা গো মালী ছেড়া, এব' ক আইস চাই,
পদ্মখানি চাইছা দেও সইয়ের বাড়ী যাই।
কই গেলা গো মালী ছেড়ি, এব' আইস চাই,
পদ্মখানি ছিটাইয়া দেও সইয়ের বাড়ী যাই।
কই গেলা গো প্রাণের ননদী এব' আইস চাই
গয়নাখানি পরাইয়া দেও সইয়ের বাড়ী যাই।

কই গেলা প্রাণের দেওরিয়া এর' আইস চাই,
সোয়ারিখানি আইনা দেও সইয়ের বাড়ী যাই।
কই গেলা গো গুণের শাশুড়ী এর' আইস চাই,
শঙ্খ সিন্দুরে সাজাইয়া দেও সইয়ের বাড়ী যাই ॥ —মৈমনসিংহ

মানুষ এবং দেবতায় যে কি ভাবে সখীত্বের সম্পর্ক স্থাপন করা হয়, তাহা বনদুর্গা ব্রতের আচার হইতে এই ভাবে জানা যায়। 'বনদুর্গার ব্রতের শেষ দিকে ব্রতনী 'সই' 'সই' বলিতে বলিতে শেওড়া গাছের সঙ্গে সাত বার কোলাকুলি করেন এবং দুই ভাগে দেওয়া উপকরণাদির এক ভাগ নিজের দিকে টানিয়া আনেন, আর এক ভাগ গাছের দিকে ঠেলিয়া দেন; আবার নিজেরটি গাছের দিকে ঠেলিয়া দেন এবং গাছেরটি নিজের দিকে টানিয়া আনেন, সাতবার এইরূপ করিবার পর ব্রতিনীর সহিত বনদুর্গার সখিত্ব পাকা হয় এবং ব্রতিনী এক ভাগ উপকরণাদি লইয়া ঘরে ফিরেন। এই সময়ে ব্রতিনীরা একটি গীত করেন—'

১০

আজি কি আনন্দ, সই গো, মধুপুর যাইতে,
শাড়ী বদল করুইন তারা দুই সইয়ে।
আজি কি আনন্দ, সই লো, মধুপুর যাইতে,
শঙ্খ বদল করুইন তারা দুই সইয়ে।
আজি কি আনন্দ, সই গো, মধুপুর যাইতে,
সিন্দূর বদল করুইন তারা দুই সইয়ে।
আজি কি আনন্দ······ —ঐ

১১

ভক্তিভাবে পুজিবাম তোমারে গো,
বন-দুর্গা,—ভক্তিভাবে,
হংস কৈতর দিবাম, জুলুঙ্গা, ভরিয়া গো,
বন-দুর্গা,—ভক্তিভাবে, ইত্যাদি —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত গীতটি বনদুর্গাব্রতের 'গাছ জাগাইবার' অর্থাৎ গাছের মধ্যে প্রাণ-সঞ্চার করিবার গীত,—

১২

আগেত ঝাপবা শেওড়া গুঁড়িতে মুরলী
ঘুমের ঘুমুখী শেওড়া কে তোরে জাগাইল ?
—খৈ চিড়ার বাসে গো আপনে জাগিলাম।
আগেতে ঝাপ্‌বা শেওড়া গুঁড়িতে মুরলী,
ঘুমের ঘুমুলী শেওড়া কে তোরে জাগাইল ?
ভোগ নৈবেদ্যের বাসে গো আপনে জাগিলাম।
আগেত'.......... ... জাগাইল ? —ঐ

১৩

মায়েত জিজ্ঞাসা করুইন দুর্গা গো ভবানী,
বৈরি দুপরিয়া কালে রইলা কেন একেশ্বরী ?
একলা নয়, গো মা, লগে পঞ্চ দাই,
ঠাকুর বাপার শেওড়ার নীচে বইয়া পূজা খাই।
খুড়ীয়েতে জিজ্ঞাসা করুইন, দুর্গা গো ভবানী,
বৈরি দুপরিয়া কালে রইলা কেন একেশ্বরী,
এক্‌লা নয়, গো মা, লগে পঞ্চ দাই,
ঠাকুর কাকার শেওড়ার নীচে বইয়া পূজা খাই। —ঐ

১৪

কাটারিয়ে কাটিয়া বাটারে ভরিয়া
রাজসভা দেবসভা জানাইয়া আইস গিয়া,
দেবী যাইবাইন সইয়ালায় গো, কে কে যাইবা সঙ্গে
সই, আইস বইস,
দোলা যে পাঠাইছলাম, সই, তাতে না আইলা কেন,
ইচ্ছামতী ধলাই গাং কেমনে হইলা পার,
সই, আইস বইস।
নাকের বেশর, সই, খেওয়ানিয়ে দিয়া এমনে হইলাম পার।
সই, আইস বইস।

পিন্ধনের শাড়ী, গো, সই খেওয়ানিরে দিয়া এমনে হইলাম পার।
সই, আইস বইস।
হস্তের শঙ্খ, গো সই, খেওয়ানিরে দিয়া এমনে হইলাম পার।
সই আইস বইস। —ঐ

১৫

লাম লাম, বনদুর্গা, যাইট শেওড়ার নীচে,
কিমতে লামিবাম আমি শাড়ী নাই আমার সঙ্গে।
সইয়ারে পাঠাইয়া দিছি নশিরাবাজের শ'রে
শাড়ী যে আনিছেন সইযায় সিঙ্গিবায় বইলে।
লাম লাম, বনদুর্গা, যাইট শেওড়ার নীচে।
কিমতে লামিবাম আমি শঙ্খসিন্দূর নাই আমার সঙ্গে।
সইযারে পাঠাইয়া দিছি শম্ভুগঞ্জের হাটে,
শঙ্খসিন্দূর যে আনিয়াছে সইয়ায় কাগজে বইলে।
লাম লাম, বনদুর্গা, যাইট শেওড়ার নীচে॥ —ঐ

কার্তিকী অমাবস্যা তিথিতে যে কালীপূজা হয়, সেই উপলক্ষে মেয়েলী সঙ্গীত গীত হয়। এই বিষয়ক নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটি লক্ষ্য করিবার মত—

১৬

ও মা, বসন পৈর। ক
বসন পৈর, মা গো, বসন পৈর তুমি।
চন্দনে চর্চিত জবা পদে দিব আমি।
পাতালে আছিলা, মা গো, হয়ে ভদ্রকালী।
মহীরাবণ কর্তো পূজা দিয়ে নরবলি।
মাথায় সোনার মুকুট ঠেক্যাছে গগনে,
মা, হইয়া উলঙ্গ কেন বালকের সনে॥
বাম হস্তে রুধির ভাণ্ড ডাইন হস্তে অসি।
কাটিয়া অসুরের মুণ্ড করছ রাশি রাশি॥
জিহ্বায় রুধিরধারা গলে মুণ্ডমালা।
হেট্‌মুখে চাইয়া দেখ, মা, পদতলে ভোলা॥ —ঐ

১৭

কালীঘাটের কালা, গো মা, কৈলাসের ভবানী :
বৃন্দাবনের রাধাপ্যারী, গোকুলের গোপিনী,
গো মা, বসন পর।
দক্ষিণে চলিছ, মা গো, ও মা, হইয়া দিগম্বরা,
কার মানবজনম সফল করলে, গো মা, হয়ে দশভুজা,
গো মা, বসন পর।
এ মা, ঘাটে ঘাটে করি পূজা পুষ্প উজান ধায়,
সঙ্কটে প'ড়েছি, মা গো, মোদের রক্ষা করতে হয়।
গো মা বসন পর। —ফরিদপুর

১৮

মাগো, গঙ্গাজলে বিল্বপত্রে বামনের ছেইলা করছে পূজা।
কার বাড়ী গেছিলা, মাগো, কে করছে পূজা।
মাগো, শিরে দেখি রক্ত-চন্দন কমলপদে জবা গো, মা গো, গঙ্গা জলে,
দশরথের ঘাটের আগে মালসী সারি সারি।
সেই মালসী তুইলা আমরা চরণ সেবা করি, মাগো গঙ্গা জলে। —ঢাকা

নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটিতে বাঙ্গালীর আসাম যাওয়ার বিরুদ্ধে দেবীর নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে। ইহার হয়ত কোন ঐতিহাসিক কারণ ছিল।

১৯

কালিকে, ওমা ভবপালিকে, বাঙ্গালীকে নিও না আসাম।
তুমি আদ্যাশক্তি, ভগবতী,
সন্তানের প্রতি হইও না বাম॥ ইত্যাদি —মৈমনসিংহ

২০

আমি ঘরে বইসে চরণ পাব, কেন গঙ্গার তীরে যাব,
আপন জায়গা থাকৃতে কেন পরের জায়গায় বাস করিব।
আপন মাতা থাকতে কেন বিমাতাকে মা বলিব।
মায়ে পুতে মকর্দমা শিবে শুনলে কি বলিব,
কালীর নামে ভক্তি থাকলে মকর্দমা ডিক্রী হইব। —ত্রিপুরা

২১

আমার এই বাসনা, শবাসনা, পুজ্‌ব জবা বিল্বদলে
বইস, মাগো, হৃদ্‌কমলে।
আর কিছু তো চাই না, মাগো, জায়গা দিয় চরণতলে,
বইস, মাগো, হৃদ্‌কমলে॥
ভক্তি জবা সুচন্দনে এইনাছি, মা, রেখ যতনে
ভক্তিবারি মিশাইয়ে অর্ঘ্য দিব গঙ্গা জলে॥
শরৎ তোমার অবোধ ছেলে, নিও না, মা, আর কুপথে,
বইস, মাগো, হৃদ্‌কমলে। —ত্রিপুরা

কালীপুজার পর ভাইফোঁটা, সেই উপলক্ষে দুইটি মেয়েলী গীত এই,

২২

আশ্বিন যায়, কার্তিক আইয়ে গো,
দ্বিতীয়ার চান্দে দিল দেখা।
ভাই দ্বিতীয়ারে দিলাম ফোঁটা।
ওরে ওরে, করুয়াল, তুই সরে যাইতে,
ভাই-ফোঁটার কথা শুনতাম, গোবর আইন্যা দিতে।
ওরে ওরে, করুয়াল, তুই সরে যাইতে,
ভাই-ফোঁটার কথা শুনতাম, মেথী আইন্যা দিতে।
ওরে ওরে, করুয়াল, তুই সরে যাইতে
ভাই-ফোঁটার কথা শুন্‌তাম্ আগ্রী আইন্যা দিতে। —মৈমনসিংহ

২৩

আশ্বিন যায় কার্তিক আইতে গো
ভাই-ধনেরে দুতীয়া দিব রঙ্গে।
পারারি ডাকাইয়া বইনে রঙ্গী গুয়া পাড়িল গো,
ভাই-ধনেরে দুতীয়া দিব রঙ্গে।
বারুইয়া ডাকাইয়া বইনে ঝারি পান কিনিল গো।
ভাই-ধনেরে দুতীয়া দিব রঙ্গে।

কেমন গৌরব যোগী ভইনের,
ভাই-ধন বসিল গো।
ভইনের ধোয়া চন্দন হইয়া গেল বাসি গো।
ভইনের ধান্য-দূর্বা হইয়া গেল বাসি গো।
কাপইডা ডাকাইয়া ভইনে ক্ষিরুয়াজোড়া কিনিল গো।
মিঠাইয়া ডাকাইয়া ভইনে চিনি সন্দেশ কিনিল গো।
ভাই-ধনেরে দুতীয়া দিব রঙ্গে। —ঐ

উত্তরবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে অনুষ্ঠিত কার্তিকব্রতের গান অত্যন্ত ব্যাপক। কার্তিক ব্রত প্রধানতঃ কৃষিব্রত, কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে এই ব্রতের অনুষ্ঠান হয় বলিয়া ইহার এই নাম। তবে ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর ন্যায় কার্তিকও পুত্রদাতা, ইহা ব্রতের গান হইতেও জানিতে পারা যায়।

পূজার আগের দিন সংযম, সেই দিনই পূজামণ্ডপ তৈরী করিবার রীতি, এই সময়ের গান,

২৪

বিছাইয়া আইলাম পাটী রাবণের কাছে,
নিজ পতি ব্রাহ্মণ বাঁশেরে গেছে।
অবিয়স্থা কার্তিক ঠাকুর উদামে রইছে,
যেও গেছে বাঁশেরে, সেও না আইল।
অবিয়স্থা কার্তিক ঠাকুব উদামে রইছে,
নিজপতি ব্রাহ্মণ ছনেতে গেছে। —ত্রিপুর

এইরূপে পর পর রুয়া, বেত ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া গীত হয়।

কার্তিক পূজার দিন সারারাত্র গান গাহিবার নিয়ম। এই বিষয়ে একটি গীত,

২৫

যেই হাটে যায় রে কার্তিক খরচা করিবারে,
সেই হাটে যায় রে উষা ছত্র ধরিবারে।
কাতিক ঠাকুর যায় রে ঘট কিনিবারে,
সেই হাটে যায় রে উষা ছত্র ধরিবারে।

এইরূপে তিল, তুসলী এবং কার্তিক মাসের নানা ফলের উল্লেখ করিয়া গীত হয়।

সাক্ষী হইঅ দেবধর্ম সাক্ষী হইঅ তুমি,
অবিযস্থা কার্তিকেব মাথায উষায় ধবে ছাতি। —ঐ

অবিয়স্থা শব্দের অর্থ অবিবাহিত, উষা কার্তিকের প্রতি প্রণয়াসক্ত ছিল, সেইজন্যই সে নিঃসঙ্কোচে তাহাব মাথার উপর ছাতা ধবিযাছে। পৌরাণিক জগতে এই প্রকার স্বাধীন প্রেমেব দৃষ্টান্ত বড় বিবল।

২৬

বুলে আবে কার্তিক যাইবাইন,
অভিলাসে এযো, কে কে যাইবা?
সঙ্গে লো ঠমকী বাধা, কে কে যাইবা?
ঘরে থাক্যা বামেব পিসী বুলে—
আমি এযো, আমি যাইবাম সঙ্গে লো,
ঠমকী বাধা, আমি যাইবাম। —ঐ

এই উপলক্ষে শস্যক্ষেত্র বিনষ্টকাবী বাঘ মাবিবাব গীত গাওযা হয—

১।

বাঘায বুলে বাঘুনী, কিসেব ঢোল বাজে,
অমুক গাযেব নাবীলোক, আইজের বণে সাজে
বাঘায কান্দেবে
বাঘায বুলে বাঘুনী, ঐনা পথে যাইও ..
অমুকেব গরু দেখ্যা সেলাম জানাইও।
সাজিল কামিনীকুল, কানে তুলে কন্নফুল
মারে তীব হুমকা বাঘেব গায রে,
বেবতী আব চন্দ্রকলা, এক হাতে ধনুছিলা
আব হাতে বাচ্ছ্যা তুলে বাণ বে। —মৈমনসিং

বাংলার পল্লীর মেয়েরা যে একদিন নিজ হস্তে বাঘ শিকাব কবিতেন, উপরে গানটি হইতে তাহাই বুঝিতে পাবা গেল।

পাখীতে পাকা ধান খাইয়া যাইবার কথাও কার্তিক পূজার গানে শুনিতে পাওয়া যায়,

২৮

পক্ষীরে, আরেরে বাবুইরে, ক্ষেতের পাকেনা ধান খাইলে।
উইড়া উইড়া ধান খায়, পইড়া পইড়া রং চায়।
সরাইনলের আগ বাসারে।
এক বাবুই ধলিয়া, আর এক বাবুই কালিয়া,
আর এক বাবুইর কপালে তিলক।
কাল না ছেলেটায়, ডাক দিয়া কইয়া যায়,
বাদুড় পড়িছে রাধার ক্ষেতে।
একেলা না পুতের বৌ, সাত ক্ষেত রাখে গো,
আরও জোগায় পান তেলের কড়ি।
আরে রে বাবুই রে, ক্ষেতের পাকেনা ধান খাইলে।

নিম্নোদ্ধৃত কয়টি পদে বাঙ্গালী নারীর বাণ নিক্ষেপ করিবার রূপটি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে—

হাতীবান, হাতীবান, দেবী তোরে ডাকেরে।
কি কারণে দেবী, মাগো, আমার তলবরে।
তুমি নি পারিবা উষার ব্রত ভাঙ্গিবারে।
আমি মাগো না পারিলে, পারিবে কেমুন জনেরে।
হাতীবান মারিল উষা, দুই পা খেঁচিয়ারে। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে পাইকের যুদ্ধসজ্জার বর্ণনা আছে—

২৯

সাজ কি, আরে পাইক, রণের বালা।
যুঝ কি, আরে পাইক, রণের বালা।
অমুক বাড়ীর যত পাইক জিত্যা ঘরে আইল রে।
অমুক বাড়ীর যত পাইক হাইরা ঘরে গেলরে।
অমুক বাড়ীর যত পাইক সবের কানে সোনারে।
অমুক বাড়ীর যত পাইক সবের পিন্ধন তেনারে। —ঐ

ইহাতে স্বপক্ষের পাইকের প্রশংসা এবং প্রতিপক্ষের পাইকের নিন্দা শুনিতে

পাওয়া গেল। অমুক শব্দটির স্থলে প্রয়োজনমত স্বপক্ষের ও বিপক্ষের ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হইয়া থাকে।

প্রধানতঃ কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, গোয়ালপাড়া ও রংপুর জেলার রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের গ্রামীণ নারীসমাজের মধ্যে প্রচলিত একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান 'কাতি পুজা' বা কার্তিকপুজা। এই অনুষ্ঠান কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিনে হয়। কার্তিক ঠাকুরকে মানত করিয়া ছেলের জন্ম হইলে কার্তিক সংক্রান্তির দিন অবশ্যই ইহার পুজা করিতে হইবে। মালী কার্তিক ঠাকুরের মূর্তি নির্মাণ করে। কার্তিক ঠাকুর সোলা দিয়া তৈয়ারী হয়। হাতির উপরে ময়ুর, তাহার উপরে বসিয়া থাকেন কার্তিক ঠাকুর। কখনও বা 'জোড় কাতি' অর্থাৎ একজোড়া কার্তিক ঠাকুরের মূর্তি নির্মাণ করিয়া পুজা হয়, পুজার শেষে 'গিদালী'রা অর্থাৎ পেশাদার গায়কও নৃত্যশিল্পীর দল সারারাত ধরিয়া গান গায় ও নৃত্য করে। ঢাকীরা নাচের তালে তালে ঢাক বাজাইতে থাকে।

শাস্ত্রীয় আচারে পুজার পর্ব শেষ হওয়ার পর আরম্ভ হয় মেয়েদের হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কতকগুলি বিশেষ ধরণের মুদ্রার সঙ্গে সঙ্গে পুজার ঘট বসানো, পুজা পাতা, মাড়োয়া গাড়া, চাইলন বসানো, ব্রাহ্মণকে বরণ করা, গিদালী অর্থাৎ যাহারা পুজাশেষে গান গাহিতে ও নাচিতে আসিয়াছে এবং ঢাকুয়া প্রভৃতিকে বরণ করিয়া লইবার জন্য 'বসুমতী মা'র কাছে একটুক মাটির জন্য প্রার্থনা সঙ্গীত।

৩০

বসুমতী মাও, একটুক মাটি দ্যাও,
এ ঘট বসেবার চাঙ্ রে।
বসুমতী মাও, একটু মাটি দ্যাও,
এ পুজা পাতিবার চাঙ্।
বসুমতী মাও, একটুক মাটি দ্যাও,
মাড়োয়া গাড়িবার চাঙ্।
বসুমতী মাও, একটুক মাটি দ্যাও,
বামোনেকে বসেবার চাঙ্।
বসুমতী মাও, একটু মাটি দ্যাও,
গিদালীক বসেবার চাঙ্।

বসুমতী মাও, একটুক মাটি দ্যাও,
ঢাকুয়ারোক বসেবার চাঙ্।
মাড়েয়ার ঘরের আগদুয়োর দ্যাও
আইস্‌চে চাউইয়া মান্‌সি পীড়া ভাড়া দ্যাও।
সোনার খড়ম পাঙোত নিয়া বেল বা গচি রুনু
বেল তোক কিসের বাদে রুনু ?
এক জোড়া বেল পাত হইলে কালে মোর কাতি পূজা হয়।
এক জোড়া গুয়া হইলে তেঁই মোর কাতি পূজা হয়।
ফুলের গচ তোক কিসের বাদে রুনু ?
এক জোড়া ফুল হইলে কালে মোর কাতিপূজা হয়।

—কুচবিহা

তারপর শিবের বিবাহ-সম্পর্কে গান গাওয়া হয়—

৩১

ফুলের বাগাম যায়া বুড়া শিব ফুলের যতন করে,
ভাঙ্-ধুতুরা খায়া বুড়া শিব চিতোর হয়া পড়ে।
নারদ ভাগিনা বুলিয়া বুড়া শিব ডাকাইতে লাগিল,
নারদ ভাগিনা আসিয়া তখন জিজ্ঞাসা করিল।
এক ড্যাকো দুই ড্যাকো তিন ড্যাকো দিল,
ফিরা ড্যাকের বেলা বুড়া শিব উত্তর করিল।
তল্‌তা পাড়া করিয়া শিবোক মন্দিরোতে নিল,
চ্যাতোন পায়া বুড়া শিব ভাবে মনে মনে,
নিধুয়া পুবীতে আমোক দ্যাখে বা কোন জনে। —ঐ

বুড়া শিব ভাবিয়া দেখিলেন, তাঁহার শারীরিক অবস্থা ভালো নয়। এই বয়সে সেবা ও শুশ্রূষার প্রয়োজন, সেইজন্য তিনি নারদ ভাগিনাকে তাঁহার জন্য পাত্রীর সন্ধান করিতে নির্দেশ দিলেন,—

৩২

শোনেক শোনেক, নারদ ভাগিনা, কতা শোনেক মোরে।
পাত্রীর খোজোং যাবে বাবা পণ্ডিতের গোচরে॥

সেই কতা শুনিয়া নারদ না করিল হেলা।
পণ্ডিতের বাড়ীত যায়া দুয়োরাৎ দিলেক ঠেলা ॥
এক ড্যাকো দুই ড্যাকো তিন ড্যাকো দিল।
তিন ড্যাকের বেলা পণ্ডিত ঘরের বাইরা হইল ॥
ক্যানে ড্যাকাইস, নারদ ভাগিনা, কওতো দেখি মোকে।
'শিব মামার কইনা কোটে আচে গণিয়া দেখান মোকে।' —ঐ

৩৩

সোনার খাটে বইসে পণ্ডিত রূপার খাটে পা।
রূপার পাঞ্জি উল্টি বামোন সোনার পাঞ্জি চায় ॥
পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ গণে চাইর কোণে।
গণাপড়া করে বামোন আপনার মনে ॥
আকাশের তারা গণে পাতালের বালু।
তেতিলির পাত গণে তেতিলির গচে ॥
ভরা হাঁড়ীর ভাত গণে আন্ধার বাতির মাঝে।
গণিয়া গাতিয়া দেখে কন্যাক হিমালয়ের ঘরে।
শিবের সাথে চণ্ডীর জোড়া শাস্তোরে ধরা পড়ে ॥
শোনেক শোনেক, শিব মামা, কই তোমার কাছে।
তোমার সাথে চণ্ডীর জোড়া হিমালয়ের মাঝে ॥ —ঐ

তখন বুড়া শিব বিবাহের বাজার করিবার জন্য পাড়া-প্রতিবেশীকে ডাকিয়া সঙ্গে 'ভারভারাটি'কে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

৩৪

পাড়ার আশ পড়শীক ডাকেয়া আনিল।
সোনার নও বুড়ী কড়ি আন্‌চোলে বান্ধিল ॥
ভার ভারাটিকে সঙ্গে নিয়া হাটের দিকে চলে।
সঙ্গে চলে পাড়া-পড়শী রঙ্গে কুতুহলে ॥
পরথোমেতে কাঁইয়া হাটিৎ যায়া চণ্ডীর শাড়ী নিল।
শাঁখারী হাটিৎ যায়া নারদ চণ্ডীর শাখা নিল ॥
বানিয়া হাটিৎ যায়া কেনে চণ্ডীর কানের সোনা।
শীষের সেন্দুর কেনে চণ্ডীর সেন্দুর হাটিৎ যায়া ॥

কুমার হাটিং যায়া বিয়ার ঘট গচা নিল।
ডোম হাটিং যায়া ফির চাইলন কিনিল॥
আবো না কেনে শিব মণিরাজ পাগুডী।
গুয়া হাটিং যায়া কেনে পান আর স্থপারী॥
কলা হাটিং যায়া শিব কলার ঝুকি নিল।
দই হাটিং যায়া শিব দইয়ের ভার বান্দিল॥
ভার-ভারাটি নিয়া শিব ফিবিল আপন বাড়ী।
কুত্তি গেইলেন, নারদ ভাগিনা, আইসো তাড়াতাড়ি॥
কি কবেন নারদ ভাগিনা নিশ্চিন্তে বসিয়া।
বামোন, সাগাই, পৰজাপালিক খবর দেও যায়া॥
ভাঙা কডকা, ভাঙা ঢোল ডাকেযা আনিল।
ভাঙা ঢোল, ভাঙা খোল বাজাইতে লাগিল॥
সাপের না মালা শিব গালাতে পিন্দিল।
চিতুয়া বাঘের ছাল শিব কমোবে বান্ধিল॥
কিসেব ধুতি কিসেব পাগুডী সগুল বইলো পড়ি।
যায় যায বুড়া শিব চণ্ডীমায়েব বাড়ী॥
জই জোগারে আই বৈবাতি নিলো শিবোক বরি।
স্থববণেব ঝাবি দিযা পাও বা ধোযাইল॥
শ্বেতেব চঙেরে শিবোক ববণ কবি নিল।
শুভক্ষণ দেখিয়া শিব বিয়াতে বসিল॥
বিষ্টি পড়ে টুপুব টাপার শীতে ভেজে গাও।
শিব চণ্ডীর বিয়াও হয় ঢাক্কে জোগার দেও॥ —ঐ

এখানে বাংলার স্থপরিচিত ছেলেখেলাব ছড়াটি স্বভাবতঃই মনে হইতে পারে—

বিষ্টি পড়ে টাপুব টুপুর নদে এল বাণ,
শিব ঠাকুরের বিযে হল তিন কন্যা দান।

অবশ্য এখানকার শিব ঠাকুর একটি কন্যাই লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি ইহাদের মধ্যে যে একটি মৌলিক সম্পর্ক আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

এই সময় মেয়েদের মধ্যে হুলুধ্বনির সাড়া পড়িয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকীদের মধ্যেও তৎপরতা বাড়িয়া যায়।

৩৫

মাড়োয়া ক্যানে হ্যালেরে।
মাড়োয়া ক্যানে ডোলেরে ॥
কি দান দেয়বে কইনার আরো আবো।
এ বার দান না দিলে আর বার পাবো ॥
দান দেয়রে কইনার আরো মামা।
এ্যাচিয়া ব্যাচিয়া দিল ভাঙা গাইলের সামা ॥
দান দেয়বে কইনার আবো মামী।
এ্যাচিয়া ব্যাচিয়া দিল ভাঙা গাইলেব সামী ॥
দান দেয়রে কইনার আরো পিসা।
দান নাই দক্ষিণাও নাই না পায় নিজের দিশা ॥
বিয়াও বাদা করিয়া চণ্ডীমাও এমন ধীরে যেইল
কি দিয়া রাতি মাও চণ্ডী নিত্তি ছিনান পাইল ॥
কাজলী, আলো ধাইবে।
রূপার বাটায় ধূলা নিল সোনার বাটায় খইল,
বান্দী দুইজন সঙ্গে নিয়া দীঘির ঘাটে চইল।
কাজলী, আলো ধাইরে।
ছ্যাকা খইলা পাড়িয়া চণ্ডীমাও ধর্মকুর্মক দিল।
ফিরাও বারের চইল চণ্ডীমাও মাও গঙ্গাক দিল।
কাজলী, আলো ধাইরে।
ফিরাবারের চইল চণ্ডীমাও মস্তকে মাখিল।
আজি এক ঠাসা দুই ঠাসা তিন ঠাসা দিল।
ফিরা না ঠাসার বেলা মাথা ঘসা হইল ॥
কাজলী, আলো ধাইরে।
হাটু পানিত যায়া চণ্ডীমাও হাটু গাড়িয়া রইল।
বুক পানিত যায়া চণ্ডীমাও বুক পাড়িয়া শুইল।

গলা পানিত যায়া চণ্ডীমাও গলা শুদ্ধ করে,
মাথা পানিত যায়া চণ্ডীমাও পঞ্চডুব পাড়ে।
কাজলী, আলো ধাইবে।
কুঘাটে শুইয়া চণ্ডীমাও সুঘাটে উঠিল।
কাজলী, আলো ধাইবে।
ভিজা বস্ত্র ফেলেযা চণ্ডীমাও শুরাবস্ত্র পরে,
শুক্লা বস্ত্র পবিযা চণ্ডীমাও ধর্মক প্রণাম দিল।
ধর্মকে না প্রণাম করি শিবেব মন্দির গেইল।
শিবের মন্দিব যায়া চণ্ডীমাও শিবোক প্রণাম কবে।
কাজলী, আলো ধাইবে।
শিবোক প্রণাম কবি চণ্ডীমাও পানি পস্তা খাইল।
পানি পস্তা খাযা চণ্ডীমাও শযন মন্দির গেইল।
কাজলী, আলো ধাইবে।
ডাইন হাতে শ্রীফল বাম হাতে নারিকেল,
গেইল চণ্ডী শিবেব মন্দিবে।
পান তামাকুব খাযা চণ্ডীমাও বং তামাসা কবে।
বং তামাসা কবে চণ্ডীমাও বুড়া শিবেব ঘবে॥
কাজলী, আলো ধাইবে। —ঐ

এইবার কার্তিকেব জন্মবৃত্তান্ত বিষযে গান গাওযা হইবে—সুতরাং ইহা লৌকিক কুমাব-সম্ভব।

৩৬

শেষ রাতি চণ্ডীমাও কাতিক জন্ম দিল।
কাতিব জন্ম দিযা চণ্ডীমাওএব খুশী উপজিল॥
কাজলী, আলো ধাইরে।
কাতিবে কাতি তোব মাতা বানাইল কোন জনে।
আমু জনমে নারিকল বিলাইচং
মাতা বানাইচে বাসুদেবে।
জনোম তোব বুড়া শিবের ঘরে।
কাতিরে, কাতিরে, তোর বুক বানাইচে কোন জনে

আন্থ জনমে শিল বাটা বিলাইচং,
বুক বানাইচে বাসুদেবে।
জনোম তোর বুড়া শিবের ঘরে।
কাতিরে কাতি, তোৰ পিটি বানাইচে কোন জনে,
পিটি বানাইচে বাসুদেবে,
জনোম তোর বুড়া শিবেব ঘরে। —ঐ

এমনি করিয়া একের পর এক প্রতিটি অঙ্গের বর্ণনা করা হয়। যেমন চক্ষু বা চোখের সঙ্গে তারা, নাকের সঙ্গে বাঁশী, কানের সঙ্গে পিটা অর্থাৎ পিঠে, গালের সঙ্গে পান, কপালের সঙ্গে 'দেওয়ারী' অর্থাৎ দিয়ারী, চন্থু অর্থাৎ জানুদেশের সঙ্গে 'কলার পটুয়া' অর্থাৎ কলার গাছ, পেটের সঙ্গে শারিঙ্গা, কোমরের সঙ্গে মোড়া, 'নগুল' অর্থাৎ আঙ্গুলেব সঙ্গে 'গচার অস্তা' অর্থাৎ প্রদীপের সলতে, চুলের সঙ্গে পাটা অর্থাৎ পাটজাত তন্তুর তুলনা করিয়া গান গাওয়া হয়।

এইবার ঘট তোলার গান শুনিতে পাওয়া যাইবে—

৩৭

ঘট তোলা মাড়েয়ারে।
তোমার পুণ্য ঘট নড়েরে।
জইজোগারে তোলো ঘট মস্তকেব উপরেরে,
ঘট তোলো মাড়েয়াৰে।
গিদালে বসাইচে ঘট, মাড়েয়ার মাইয়া তোলেরে।
তোমাৰ পুণ্য ঘট বাখহ্ যতনেরে।
জোড়হস্ত করিয়া ঘট তোলহ্ যতনেৰে।
ঘট তোল মাড়েয়ারে। —ঐ

কার্তিক পুজার আনুষ্ঠানিক পর্ব শেষ হইয়া যাইবার পর সারারাত ধরিয়া যে আনন্দানুষ্ঠান হয়, তাহাতে অংশ গ্রহণ করে 'গিদালী' অর্থাৎ পেশাদার নৃত্য গীতে অংশগ্রহণকারিণী মেয়েরা। এই পর্বের কিছু গান উদ্ধৃত হইল:

৩৮

দূর হাতে আইলরে বাদুর কলা খাবার আশে;
আরে গচের কলা গচে রইলো বাদুর গেইল মোর দেশেরে।

আরে তীর পড়ে ঝাঁকেরে ঝাঁকে বাটুল পডেরে রয়া,
আরে কুত্তি গেলুরে মাডেযার মাইযা বাটুল কুডাও আসিয়ারে।
আবে গচের আডে থাকিয়ারে বাদুৰ কমোরের শাডী যাচেরে।
দূব হাতে আইলরে বাদুর কলা খাবার আশে। —ঐ

৩৯

কেনে, হে বাধা, বিরস মন, ও তোর কানাইয়ায়ে বাজায় বাঁশী।
আরে মুই গেনু যমুনার জলে, হেটা উঠাল মাটি,
ছিঁড়িল গলারই হার, আই মোর ভাঙ্গিল কলসী।
আরে যমুনার কুলে কুলে, কদম সারি সারি—
আরে ফুলতোলে ডাল ভাঙ্গে রাধা বিনোদিনী।
পরার ঘরে থুইচে নাম বাধা চন্দ্রাবলী।
আরে বাপমায বাখিচে নাম আলালী দুলালী। —ঐ

কার্তিক পুজার গানে বিবিধ শস্য নাশকাবী পশুপক্ষী শিকাব করিবার যে গান শুনিতে পাওযা যায়, তাহাদেব সঙ্গে সঙ্গে যথার্থ শিকারের অভিনয় করা হয়। ছোট ছোট ছেলেমেযেরা বাদুড হইযা কলাগাছ হইতে কলা চুরির অভিনয কবে। সুতবাং ইহাতে নৃত্য, গীত অভিনয তিনই হইয়া থাকে।

অগ্রহাযণ মাসের বাসলীলা উপলক্ষে নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায—

৪০

শ্রীনন্দের নন্দন হরি উদ্দেশে প্রণাম কবি,
যাইতে নিকুঞ্জে রসরায় গো রাই।
বাসমণ্ডলে চল সবে যাই ॥
কার্তিকের পূর্ণমাসী, কদম্ব ডালেতে বসি,
মুরারি পুরে গুণ গো বাই।
রাসমণ্ডলে চব সবে যাই।
শুন গো ললিতা সই—তোমার ঠাইন্ মরম কই।
নাম ধইরা ডাকে চিক্কণ কালা গো রাই।
রাসমণ্ডলে চল সবে যাই ॥

কালার বাঁশীর গানে, অন্তর ধরিয়া টানে।
কী দৈব ঘটাইলো মোহন চূড়া গো রাই॥
সিন্দুর কাজল জ্বলে অলঙ্কার স্থানে স্থানে।
কপালে বান্ধিয়াছে মোহন-চূড়া গো রাই॥
করে করে বাইন্ধা ঝুপা, এক নারীর এক খোঁপা।
শিরে বাইন্ধাছে মোহন-চূড়া গো রাই॥
হস্তে হস্তে ধরাধরি, মধ্যে শোভে বংশীধারী।
গোপী আইস্যা রাধারে বুঝায় গো রাই।
রাসমণ্ডলে চল, সবে মিলি যাই॥ —মৈমনসিংহ

পৌষ মাসে বাঙ্গালী গৃহস্থের ঘরে ঘরে যে বাস্তু-পূজা হয়, সেই উপলক্ষেও মেয়েলী সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়—

৪১

স্বর্গের হাডিয়া, হাডিয়া, হাডিয়া রে।
মঞ্চে লামিয়া খোলা চাঁচ্যা দে।
বাস্তু দেবী খাইবেন পূজা খোলা চ্যাঁচা দে।
স্বর্গের হাডিয়া, হাড়িয়া, হাডিয়া রে।
মঞ্চে লামিয়া ছডাঝাট দে।
বাস্তু দেবী খাইবেন পূজা ছডাঝাট দে
স্বর্গের হাডিয়া, হাডিয়া, হাডিয়া রে,
মঞ্চে লামিয়া ফুল তুল্যা দে।
বাস্তুদেবী খাইবেন পূজা ফুল তুল্যা দে। —বরিশাল

পৌষ-পার্বণ উপলক্ষে সাধারণতঃ গানের পরিরর্তে ছড়াই শুনিতে পাওয়া যায়, যেমন—

৪২

আল্ লড়ি দিয়া যায় রে বাঁটই, গাল লডি দিয়া যায়,
গোড়া লড়ির বাড়ি খেয়ে বাপের বাড়ী যায়।
শ্যামের চিকণ কালার বাঁটই রে বাপের বাডী যাব্যা তুমি,
চুল ধরিয়া আন্‌ব আমি, শ্যামের চিকণ কালার বাঁটই রে—
'চুল ধরিয়া আনব্যা তুমি, গোড় খাইয়া পড়ব আমি।'

'গড় খাইয়া পড়ব্যা তুমি, কোলে করে আনব আমি।
'কোলে করে আনব্যা তুমি, গাঙ্গে গিয়া ধুইব আমি।'
'গাঙ্গে নিয়া ধুইবা তুমি, গাঙ্গ-মৎস হইব আমি।'
শ্যামের চিকণ কালার বাঁটই রে—
'গাঙ্গ মৎস হইব তুমি, জাল্যা দিয়ে ছাক্‌ব্যা আমি।'
শ্যামেব চিকণ কালার বাঁটই রে—
'জ্যাল্যা দিয়া ছাক্‌ব্যা তুমি, আকাশ-তারা হব আমি',
'আকাশ-তারা হব্যা তুমি, তীর বাঁটুল দিয়া মারব আমি।'
'তীব বাঁটুল দিয়া মারব্যা তুমি, হুরার তলে পলাব আমি।'
'হুরার তলে পলাবে তুমি, হুরায় আগুন দিয়া মারব আমি।'
'হুরায় আগুন দিয়া মারব্যা তুমি, সর্ধা হয়ে রব আমি।'
'সর্ধা হয়ে রবে তুমি, কবিতর হয়ে খুটব আমি।'
'কবিতর হয়ে খুটব্যা তুমি ইন্দুর হয়ে রব আমি।'
'ইন্দুর হয়ে রবে তুমি, বিলাই হয়ে মারব আমি।'
শ্যামেব চিকণ কালার বাঁটই রে॥ —পাবনা

মাঘ মাসে মাঘমণ্ডল ব্রত উপলক্ষে কুমারী কন্যার মুখে যাহা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা গান নহে, বরং ছড়া। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে—

৪৩

নব-পরিণীতা অষ্টমবর্ষীয়া গৌরীকে লইয়া স্যাই ঠাকুর নিজ দেশে যাত্রা করিতেছেন। মা সাশ্রুনেত্রে প্রবোধ দিতেছেন—

টাকা নয় রে কড়ি নয় রে কোচরে রাখিব।
পরের ল্যাগা হৈছে গৌরা পরেরে সে দিব॥

স্যাই ও গৌরী নৌকায় নদীপথে ভাসিয়া চলিয়াছে; সে মাঝিদের মিনতি করিয়া বলিতেছে—

ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা ঢলকে ওঠে পানি।
ধীরে ধীরে বাও, রে মাঝি-ভাই মায়ের কান্দন শুনি॥

ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা ঢলকে ওঠে পানি।
ধীরে বাও, রে মাঝি-ভাই, ভাইয়ের কান্দন শুনি॥
ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা ঢলকে ওঠে পানি।
ধীরে ধীরে বাও, রে মাঝি-ভাই, বুইনের কান্দন শুনি॥

—ফরিদপুর

শীতের অবসানে বসন্তের যখন প্রথম সূচনা হয়, তখনই বাংলার পল্লীজীবনে নানা বিচিত্র অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা হয়; সেইজন্য ফাল্গুন মাসেই গানের সংখ্যা সর্বাধিক। প্রথমই উত্তম ঠাকুরের পূজা উপলক্ষে গান; উত্তম ঠাকুর বসন্ত কালেরই প্রতিনিধি,কখনও তিনি কৃষ্ণের সঙ্গে একাকার হইয়া গিয়াছেন।

প্রথমই উত্তম ঠাকুরকে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করিবার গান—

৪৪

কদম পুষ্পের ঝুরু গো ঝুরু, পরথম মাইলানী,
তার নীচে পাইলেন গো ঠাকুরে পরমা সুন্দরী।
তুমি ধর সাজি, লো কন্যা, আমি তুলি পুষ্প,
স্ত্রী হইয়ে তোলে গো পুষ্প কি না কার্যে লাগে।
পুরুষ হইয়ে তোলে গো পুষ্প দেবকার্যে লাগে।
বকুল পুষ্পের ঝুরু গো ঝুরু পরথম মাইলানী,
তার নীচে পাইলেন গো ঠাকুরে পরমা সুন্দরী।
তুমি ধর সাজি, লো কন্যা, আমি তুলি পুষ্প,
স্ত্রী হইয়ে তোলে গো পুষ্প কি না কার্যে লাগে,
পুরুষ হইয়ে তোলে গো পুষ্প দেবকার্যে লাগে। —মৈমনসিংহ

৪৫

তোরা কে যাবি ফুলবনে কুল মজাইতে।
চণ্ডী যায় গো রাউলের পুষ্পবনে।
আথটিয়া চণ্ডিকাগো আথইট ভালা করে,
সাজি বুইনা দেন বাবা পুষ্প তুলিবারে।
চণ্ডী যায় গো রাউলের পুষ্প বনে।

সকলের বাপে পুজা করে পুষ্প দূর্বা দিয়া,
চণ্ডীর বাপে পুজা করে ভাইট বাকস্ দিয়া।
সাজি বুইনা দেন বাবা পুষ্প তুলি গিয়া।
নবকোঠা সাজির পত্তন দিলেন যে বাপে,
সন্তুইর কামনার আগে.
সত্বরে বুনিয়া সাজি দিবে চণ্ডীর হাতে।
মাতাপিতার নিষেধ চণ্ডী না ভাবিল মনে,
আপনার সাজনে চণ্ডী সাজি লইল হাতে।
তোরা কে যাবি গো ফুলবনে কুল মজাইতে।
চণ্ডিকার পঞ্চ ভাই গেল পঞ্চ পুষ্প হইয়া,
অষ্ট নিশান দিল বাপে অষ্ট স্থানে পুতিয়া।
এক নিশান লডলে ঝি গো না নিবাস ঘরে,
উপস্থিত হইল গিয়া চণ্ডী পুষ্পবনের মধ্যে।
নারদে গিয়া খবর কইলো সদাশিবের কাছে,
কোন্ ধাতুরিয়া বেটী মামা আসছে তোমার কমল বনে।
একথা শুনিয়া শিবে ত্বরিতে চলিল,
ত্বরিতে চলিয়া শিবে বসুযা সাজাইল।
বসুয়া সাজাইয়া শিব গো ত্ববিতে চলিল,
উপস্থিত হইল গিয়া পুষ্পবনের মাঝে,
শিব হাঁটে ডালে ডালে, চণ্ডী পাতায় পাতায়,
হস্তে না ধইরো, শিব গো, হস্তের শঙ্খ লড়ে।

বসন্তকালে নানা ফুলে পল্লীর বনভূমি আচ্ছন্ন হইয়া যায়। ফুলই বসন্তের পুজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ, এইরূপ ফুল তোলার গান শুনিতে পাওয়া যাইবে।

কেশে না ধইরো শিব গো বেশে লজ্জা পায়।
চাম্পা ফুল, চাম্পা ফুল, তুমি সোদর ভাই,
ক্ষণিকের লাগি, ভাই গো, ছাপাইয়া রাখ মোরে।
ময়ূরের পেখম হেন তোমার ডাঙর খোঁপা
কিভাবে রাখবাম ছাপাইয়া?

তোরা কে যাবি গো ফুলবনে কুল মজাইতে।
চণ্ডী যায় গো রাউলের পুষ্প বনে। —ঐ

সংস্কৃত নাটকে যেমন চুতমঞ্জরী ঋতুরাজ বসন্তের অর্ঘ্যরূপে উপহার দেওয়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, বাংলার পল্লীর বসন্ত-আবাহনের মধ্যেও সঙ্গীত সহযোগে এই পুষ্পোপহার দিবাব কথা শুনিতে পাওয়া যায়—

৪৬

সুগন্ধ মালীর ঝি, তোর নি ঘবে আছে ফুলের আলি ?
আছিল জবার আলি, বিকায়ে লয়েছি কডি।
গো ভাগিনা, কাইল কেন না আসিলে সকালে ?
সুগন্ধ মালীর ঝি, তোর কি ঘরে আছে তুলসীর আলি ?
আছিল তুলসীব আলি, বিকায়ে লয়েছি কডি,
গো ভাগিনা, কাইল কেন না আসিলে সকালে।
সুগন্ধ মালীর ঝি, তোব নি ঘরে আছে তিলের আলি ?
আছিল তিলেব আলি বিকায়ে লয়েছি কডি,
গো ভাগিনা, কাইল কেন না আসিলে সকালে। —ঐ

৪৭

ভ্রমর, কইওবে কালিয়া,
শ্রীরাধিকা ক্রন্দন কবে কৃষ্ণহারা হইয়া,
সাপলা পুষ্পে গৌবব কবে, আমার ষোল পাখি,
অরুণ উদয়কালে সূর্যেব সঙ্গে আসি।
ভ্রমব, কইওবে কালিয়া,
পদ্মপুষ্পে গৌরব করে আমাব বিশ পাখি,
না করছিলাম পতির সেবা ডালেতে শুকাইছি।
ভ্রমর, কইওরে কালিয়া,
বকুল পুষ্পে গৌবব করে আমাব পাখি রেণু,
আমায় নিয়া খেলা কবে নন্দের ঘরের কানু।
ভ্রমর, কইওরে কালিয়া,
শ্রীরাধিকা ক্রন্দন করে কৃষ্ণহারা হইয়া। —ঐ

৪৮

ঠাকুর, বলিরে তোমারে।
তুলসী পত্রে রাধার নাম লেইখা দেও আমারে
কেওয়া-কেতকী পুষ্প একত্র করিয়া,
ব্রতী সকলে দেয় পুষ্প উত্তমের লাগিয়া।
ঠাকুর, বলিবে তোমারে।
পদ্মপুষ্পে রাধার নাম লেইখা দেও আমাবে।
জয়া-জয়ন্তী পুষ্প একত্র কবিয়া,
ব্রতী সকলে দেয় পুষ্প উত্তমের লাগিয়া।
ঠাকুর, বলিবে তোমারে। —ঐ

৪৯

অমুকে লাগায় ফুল বাড়ীর সম্মুখে,
কে তোলবে ফুল রাজবাড়ীর মধ্যে ?
অমুকের ভগ্নীয়ে তোলে ফুল মনের উল্লাসে,
ডাল ভাঙি তোলে ফুল খোঁপা ভইরে পরে।
কে তোলরে ফুল রাজবাড়ীব মধ্যে ?
তোলে বা না তোলে ফুল ডাল ভাইঙে পড়ে।
অমুকের বউয়ে তোলে ফুল মনেব উল্লাস।
কে তোলবে ফুল রাজবাড়ীর মধ্যে ?
পঞ্চ ভাইয়ের ভগ্নী আমি পুষ্পের অধিকারী,
সাজি ভইরে তুলি ফুল খোঁপা ভইরে পবি।
কে তোলরে ফুল বাজবাড়ীর মধ্যে ? —ঐ,

অমুকের স্থলে গৃহস্থ ও তাহার আত্মীয় এবং আত্মীয়াদিগেব নাম উল্লেখ করা হয়।

উত্তম ঠাকুরের পূজা সমাপন করিয়া মেয়েরা সেই পূজিত বৃক্ষমূলে দাড়াইয়া গান ধরেন—

৫০

কুঞ্জেব মাঝে কে বে, কুঞ্জেব মাঝে কে ?
নন্দের ছাইলা কালাচান্দ কৃষ্ণ আইসেছে।

এক দেউরী দুই দেউরী তিন দেউরী পরে।
তিন দেউরীর পরে গিয়া পাইলাম ঠাকুরের লাগ রে ॥
কুঞ্জের মাঝে কে ?
কুঞ্জে গিয়া ঠাকুর কৃষ্ণ খাইলাইন একটুক্ পান।
রাধিকারে দেখইন ঠাউক্রে পুন্ন্ মাসীর চান ॥
কুঞ্জের মাঝে কে ?
কুঞ্জে গিয়া ঠাকুর কৃষ্ণ খাইল একটুক্ গুয়া।
রাধিকারে দেখইন্ ঠাউকরে পিঞ্জরের সুয়া ॥
কুঞ্জের মাঝে কে ? —ঐ

৫১

কে তুল রে ফুল বাজবাডীর মাঝে ?
ঠাকুব-বাডীর ঝি গো আমি ফুলের অধিকারী।
কে তুল রে ফুল ?
আগা ধইরা তুল ফুল, মাঝে ভাঙ্গ্যা পড়ে।
কে তুল রে ফুল ?
সাজি ভইবা তুলে ফুল, খোঁপা ভইরা পবে।
কে তুল রে ফুল ?
সাত ভাইয়েব বইন গো আমি, ফুলেব অধিকারী।
কে তুল রে ফুল ? —ঐ

উত্তম ঠাকুর ব্যতীতও বসন্ রায় নামক দেবতাব পূজা উপলক্ষেও গীত শুনিতে পাওয়া যায়। বসন্ রায় বা বসনরা প্রকৃতপক্ষে বসন্ত রায় বা বসন্তরাজ। বসনরার পূজা মদনদেবের পূজা, ইহা উত্তম ঠাকুরের পূজার মতই পল্লীর বালিকাদিগের বসন্তোৎসব। ইহাতে বসন্ত ঋতুকে উত্তম ঠাকুরের মত একটি মানুষ বলিয়া কল্পিত হয়,

৫২

কি কর বসন্তের মাগো, নিশ্চিন্তে বসিয়া ?
তোমার বসাই বিয়া করে এয়ো জানাও গিয়া।
কিবা এয়ো জানাইবাম্ আমি হস্তে পান লইয়া,
বসাইর ধ্বনিতে এয়ো আসিবো চলিয়া।

কি কর বসন্তের মাগো, নিশ্চিন্তে বসিয়া।
তোমাব বসাই বিয়া করে ঢুলি জানাও গিয়া।
কিবা ঢুলি জানাইবাম্ আমি হস্তে পান লইয়া।
বসাইর ধ্বনিতে ঢুলি আসিবো চলিয়া॥ —ঐ

৫৩

সুন্ধা গাছি লাগাইলাম্ আওডা বেডা দিয়া,
এ কি সুন্ধা, গন্ধেব আগলি সুন্ধা, কে চুরি করল রে ?
সকল বাসর বিচরাইলাম, সুন্ধার বাস না পাইলাম,
এ কি সুন্ধা, গন্ধেব মুরলী সুন্ধা, কে চুরি করলো রে ?
অমুকের ধৃতির কোনায় সুন্ধাব বাস পাইলাম বে।
এ কি সুন্ধা, গন্ধের মুরলী সুন্ধা, কে চুবি করলো রে ?
অমুকেব ধৃতির ...

নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটিতে বসন্ত বাযেব বিবাহেব কথা শুনিতে পাওয়া যাইবে চৈত্র বাজাব কন্যাব সঙ্গে বসন্তবাজেব বিবাহ।

৫৪

বসন্‌বা বিয়া করে চৈতা রাজাব কন্যা বে।
বিযা কবলা বসন্‌বা, বিধান পাইলা কি ?
হাতী পাইলাম ঘোডা পাইলাম,
আবো পাইলাম কন্যারে।
বিযা কবলা বসন্‌রারে বউ থইলা কৈ ?
অমুকেব মাইঝ ঘরে বউ থইয়া আইলাম রে।
বসনবা বিয়া কবে চৈতা রাজার কন্যা বে। —ঐ

বসন্ত বাযেব সঙ্গে চৈতা রাজার কন্যার বিবাহ হইল—ইহার পরিকল্পনার মধ্যে পল্লী বাংলাব প্রকৃতিবোধের একটি বিশেষ পরিচয় প্রকাশ পাইল।

৫৫

আম ধরে ঝুকা ঝুকা, তেঁতুই ধরে বেঁকারে,
চল, বসন্‌রার বিয়া।
বসন্‌রা বিয়া করে, অমুকে দিবো টেকারে,
চল, বসন্‌রার বিয়া। —ঐ

৫৬

হস্তেতে মোহন বাঁশী চরণে নূপুর—
নাচিতে নাচিতে আইল' বসাই ঠাকুর।
কি কর, গো অমুকের মায়, গৃহেতে বসিয়া—
বসাই ঠাকুর নৃত্য করে দেখ আসিয়া।
অমুকের মায় উইঠ্যা বলে, কি বর দিল মোরে ?
সামনের বছর জামাই দেখবাম ঘরে।
অমুকের মায় উইঠ্যা বলে, কি বর দিল মোরে ?
সামনের বছর বউ দেখলাম ঘবে। —ঐ

চাটি ফালাও, পাটি ফালাও, গায়ে উঠলো জ্বর,
এক দিনের জ্বরে গো বসাইর চক্ষে ঢুলুম ঢুলুম,
দুই দিনের জ্ববে গো বসাইর গায়ে ঠসা ঠসা,
তিন দিনের জ্বরে গো বসাইর শয্যা করলো কালী।
মায় বলে, ও পুত্র বসাই, কিনা কার্য করলে,
ভাল বরাহ্মণের মেয়ে বাছিয়া রাডী করলে ?
শঙ্খ ভাঙ্গে ঝামুর ঝুমুর, শাডী ছিডে লাসে,
শীষের সিন্দূর মুইছা গো ফাল্‌তে বড দয়া লাগে।
বইনের কান্দন আইতে গো যাইতে, মায়ের কান্দন সাব,
ঘরের স্ত্রীর কান্দন দেশের ব্যবহার। —ঐ

কিন্তু বসন্ত যেমন আসে, তেমনই চলিয়া যায়, যৌবনের উল্লাসে চৈত্ররাজেব কন্যার সঙ্গে বিবাহ হইবার পরক্ষণেই তাহার উপর মৃত্যুর ছায়া আসিয়া পড়ে, তাহার বিদায় লইয়া যাইতে বিলম্ব হয় না। সেইজন্যই এখানে তাহার বিদায় বা মৃত্যুর সঙ্গীত শুনা গেল। কখনও কখনও বসন্ত রায় কানাই বা শ্রীকৃষ্ণেব সঙ্গেও একাকার হইয়া যান—

৫৮

খেইল জমেছে কানাইর কদমতলে রে,
কালাচাদ মিল আইয়া কদম্বের তলে।

খৈ-চিড়া লইয়া ডাকে রে মায়,
কালাচাদ মিল আইয়া কদম্বের তলে !
দুই হাত উডাইয়া মায় ডাকে রে,
কালাচাদ মিল আইয়া কদম্বের তলে।
মেষ-মহিষ লইয়া ডাকে মায়,
কালাচাদ মিল আইয়া কদম্বের তলে। —ঐ

৫৯

গাঙ্গের পাড়ে সবল ধুতুরা,
তার নীচে ঠাকুবে বাজায় মন্দিরা ,
আমি কি ছল করলাম রন্ধনরে বসাইয়া,
ঠাকুর যাইতে না দেখলাম চাইয়া।
ও তোরা ব্রজগোপী আন রে ফিরাইয়া
ঠাকুর যায় গো রাধারে ছাডিয়া।
গাঙ্গের পাড়ে সবল ধুতুরা,
তার নীচে ঠাকুরে বাজায় মন্দিবা।
আমি কি ছল করলাম বাঁশীরে বানাইয়া,
ঠাকুরের হস্তে না দিলাম উঠাইয়া।
ও তোরা ব্রজগোপী, আন রে মানাইয়া,
ঠাকুর যায় গো রাধাবে ছাডিয়া।
গাঙ্গের পাড়ে সবল ধুতুরা,
তার নীচে ঠাকুবে বাজায় মন্দিরা।
আমি কি ছল কবলাম চুডারে বানাইয়া
ঠাকুরেব শিরে না দিলাম উঠাইয়া।
ও তোরা, ব্রজগোপী, আন রে ফিরাইয়া,
ঠাকুর যায় গো রাধারে ছাডিয়া।
গাঙ্গের পাড়ে সবল ধুতুরা,
তার নীচে ঠাকুরে বাজায় মন্দিরা।
অমি কি ছল করলাম নূপুবরে গডাইয়া,
ঠাকুরের পায়ে না দিলাম পরাইয়া।

ও তোরা, ব্রজগোপী, আন রে ফিরাইয়া
ঠাকুর যায় গো রাধারে ছাড়িয়া। —ঐ

৬৫

ফাল্গুন মাসে হোলী উৎসবও প্রায় বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসবে পরিণত হইয়াছে, সেই উপলক্ষেও যে সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাও যেমন বিচিত্র তেমনই সমৃদ্ধ। কিন্তু এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য—হোলিগানকে অনেকে লোক-সঙ্গীত বলিয়া মনে করেন না, কারণ, ইহার গীত-রীতির মধ্যে সামগ্রিকভাবে লোক-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইবার পরিবর্তে কোন কোন অংশে রাগ-সঙ্গীতের রীতি ব্যবহৃত হয়। হোলি সাধারণতঃ বাংলাদেশে বৈঠকীগান নহে, ইহা এদেশে প্রায় সর্বত্রই সমবেত ভাবে পল্লীর গায়কগণ গাহিয়া থাকে। উত্তর ভারতের কোন কোন স্থানে হোলীর গীত-পদ্ধতির সঙ্গে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সম্পর্ক থাকিলেও বাংলাদেশে তাহা প্রায় লোক-সঙ্গীতের পর্যায়েই নামিয়া আসিয়াছে। তবে হোলী মেয়েলী সঙ্গীত নহে, ইহা পুরুষের গান—

৬০

কেশব, তোমার কাল অঙ্গে রং ভাল সেজেছে,
আবিরেতে অঙ্গ মাখা, কালরূপ গিয়েছে ঢাকা,
চিহ্ন কেবল নয়ন বাঁকা, তাই তোমাকে চিনা গেছে। —ঢাকা

৬১

আজ হোলি খেলব, শ্যাম, তোমার সনে,
একলা পেয়েছি তোমায় নিধু বনে।
ওলো ওলো ছুঁড়ী, মার পিচকারী,
কুমকুম লাগাযে দাও ঐ রাঙ্গা চরণে।
কোমরেতে লাল ঘাঘ্‌রী, পরাব কাশ্মিরী শাড়ী,
মারিব লাল পিচ্‌কারী, ফাগুয়া নয়নে। —ঐ

৬২

এল বসন্ত দুরন্ত, কোকিল ডাকে তমালে,
বৃন্দাবনে এল না সই শ্রীমন্ত।

বসন্ত বাহার্‌রা, না মানে জীয়রা, হা মরি মরি,
সুখের কালে কোথা প্রাণনাথ, মরি, প্রাণ, সই কৃষ্ণ কই,
ভেবে না পাই অন্ত। —ঐ

৬৩

কর দরশন, আহা, কিবা মনোলোভা শোভা হয়েছে।
আজি কিশোর-কিশোরী মিলে হোলি খেলিছে।
অরে অ মরি হায় বে, নিয়ে সব সহচরী,
দোহে মিলে খেলে হোলি,
ময়ুর ময়ূরী নাচিছে, শুক্‌শারী গায়িছে।
আজ আবীর কুমুকুমে সবে লাল হয়েছে। —ঐ

৬৪

বসেছি আজ এই আসরে, কর্তে হোলি-গান,
মরি হায় হায় রে, আমি অতি মূঢ়মতি, শ্রীপদে যেন থাকে মতি,
শুন হে জগৎপতি, এই মিনতি চরণে তোমার,
যা ইচ্ছা তাই কর, প্রভু দিযাছি চরণে ভার।
আমার জীবনান্তে পদপ্রান্তে, স্থান দিও হে ভব কর্ণধার। —ঐ

হোলীর আনন্দোৎসবের মধ্যে ক্বচিৎ বিবহের গানও শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা হোলীগানেব একটি দুর্লভ ব্যতিক্রম।

৬৫

কাল কোকিল ডাকে তমালে,
না আসিল প্রাণকান্ত বসন্তকালে
আমি, বিচ্ছেদ ভুজঙ্গ বিষে মরি গো জ্বলে।
একে বিরহিণীব প্রাণ, তাহে কোকিলের গান, হৃদে হানে বাণ।
বাণে বুক ফেটে যায়, বলিব কায়, আছি অকুলে।
প্রাণপাখী মোর গেছে উড়ে, শূন্য পিঞ্জর আছে পড়ে,
কে দিবে ধরে!
সঙ্গিনী করব কারে, দিতে ধবে মরিরে, এ চিহ্ন পাখা
পাখীর শিরে

যতনে পুষিয়াছিলাম, প্রাণপাখী দিয়ে ফাঁকি, গিয়েছে উড়ে,
শিকল ছিঁড়ে গেছে উড়ে, দুঃখিনী করে মোরে।
কে জানে প্রেম গুরুমূলে, বিচ্ছেদ ভুজঙ্গ ছিলে
ভাবিয়া বাঁচি না অন্তরে।
শ্যামের আসার আশে আছি বসে, গিয়াছে রে বনান্তরে। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটি অনেক অঞ্চল হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে—

৬৬

নাকের উপরে বেশর দিব,
প্রাণবন্ধুরে আজ রমণী সাজাব।
লাল শাড়ী পরাব, পীত ধড়া খসাব,
নাগর হয়ে মোহন বাঁশী আমরা বাজাব।
আবীর কুমকুম ভবি, তাতে মাবব পিচকারি
সব সখীরা মিলি হোলি খেলাব। —মৈমনসিংহ

৬৭

মলযেরি স্নিগ্ধ বাযে ফুল ফুটেছে বাগানে,
এমন সুন্দর শোভা দেখি নাই আব নযনে।
ফুলে ফুলে কোলাকুলি, ফুলেব গলে ফুলেব ডালি,
ফুলের সনে ফুলের বিয়ে দেখতে মনোহর,
গন্ধরাজের বাসে শোভে মালতী টগর।
কামিনী কাঞ্চন জবা হাসিছে,
জাতি যূথী যুঁই মালতী আড নয়নে দেখিছে।
এমন সুন্দর শোভা, দেখিতে যে মনোলোভা,
এই ত ফুলের সভা।
দেখিতে সুন্দর অতি মনোহর,
ফুলে ফুলে কথা বলে, বুঝে তা বসিক জনে।
মলয়েবি স্নিগ্ধ বায়ে ফুল ফুটেছে বাগানে॥ —ঐ

৬৮

হেমন্ত হইল অন্ত শীত অন্তে বসন্ত,
বাগানেতে চারিভিতে ফুটেছে ফুল অনন্ত।

সারি সারি সারি ভ্রমরা ভ্রমরী,
বিহরিছে মধুপানে এ ফুল ও ফুলে,
মধুপানে মত্ত অলি আছে যে ভুলে।
জাতি যূথী যুঁই মালতী ফুটেছে,
সম্মুখেতে ঝুমকাটি মৃদু বাতে দুলিছে।
পুষ্পবাজ মনসুখে ফুলেব নাচন দেখে, ফুল ধনু নিয়ে কাঁখে,
নাচিয়ে নাচিয়ে আসিয়ে সভাতে,
ফুলেব সনে করছে খেলা প্রাণ নাহি হয় শান্ত। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত হোলীগানটিতে বাণীবন্দনা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহাও সাধারণ নিয়মের একটি দুর্লভ ব্যতিক্রম। হোলীগানে সাধারণতঃ রাধাকৃষ্ণের মিলন প্রসঙ্গ এবং বসন্ত ঋতুবই বর্ণনা শুনিতে পাওয়া যায়, তবে গায়কের মেজাজ অনুযায়ী বিভিন্ন গানও গীত হইতে পারে। সাধাবণ প্রেম-বিষয়ক সঙ্গীতও ইহাতে গীত হয়।

৬৯

এস গো জননী, বাণী বীণাপাণি অম্বিকে,
অজ্ঞান সন্তানে ডাকে, দয়া কর ববদে।
মমতা যত, জেনেছি তত,
    শিশুকাল হ'তে যত কবেছি আব্দার,
    যতনে জননী পূর্ণ করিয়াছ তাব।
সেই ত ভরসামাত্র কবি সার,
পতিত পাবনী বাণী, জানি আছেন আমার,
অবোধ সন্তান বলে, মা, আমাকে কর কোলে
    যেমন করতে বাল্যকালে।
মনের বাসনা পূরাও না, পূরাও না,
তব সন্তানে সান্ত্বনা কর, মা বিনে আর করে কে।
এস গো জননী, বাণী বীণাপাণি অম্বিকে। —ঐ

৭০

প্রেমিকে প্রেমিকে প্রেম-রসিকে রস বিতরণ,
করে যেজন সেই ত সুজন নৈলে ঘটে বিড়ম্বন।

মরম যাতনা গেল না গেল না,
প্রেমবারি হলে সুখী চাতকিনীর মন,
মেঘের গর্জনেতে নাচে শিখ-শিখিগণ।
বরষাতে ভেকগণের সুখের উদয়,
বসন্তে কোকিল সুখী শীতেতে বায়সচয়।
মনের কথা মনে মনে, কার কাছে কই কেবা শুনে ;
বলবো না আর কারো সনে, মনের ভরসা সকলি দুরাশা,
কত সুখের কথা মনে গাঁথা, কার কাছে কই সে ঘটন।
প্রেমিকে প্রেমিকে প্রেম রসিকে রস বিতরণ। —ঐ

৭১

বসন্তেরি আগমনে ফুটেছে ফুল বাগানে,
অতসী অপরাজিতা গোলাপ বেলি এক স্থানে।
গন্ধরাজ মনোহর ফুটেছে যুঁই টগর.
চম্পা কলি হেলি দুলে, দুলছে মলয় বায়,
এক ফুল ঢলে পড়ে আর এক ফুলের গায়।
কেমনে প্রেমের খেলা খেল্‌তেছে,
ভ্রমরা-ভ্রমরী এসে সভায় দেখ নাচ্‌তেছে,
ফুলে ফুলে হুলাহুলি, ফুলে ফুলে কোলাকুলি,
বোঝনিক' ফুলের বুলি, শুনিতে মধুর দেখিতে সুন্দর।
রসিক বিনে সে সন্ধান রাখে কি অন্য জনে।
বসন্তেরি আগমনে ফুটেছে ফুল বাগানে।

৭২

সুখ-বসন্ত সুখের দিন ত এল বুঝি গোকুলে,
কোকিলায় কুহু করে শাল-তাল-তমালে।
ভ্রমরা ভ্রমরী নাচে সারি সারি,
ফুলে ফুলে ঘুরিতেছে মধু করে পান,
কুহু তানে পাগল হয় বিরহিণীর প্রাণ।

ময়ূরা ময়ূরী নাচে—নাচে এক সঙ্গে,
শুক শারি জলে বসি ভাসে প্রেমতরঙ্গে,
এ সুখ বসন্ত দিনে, ধৈর্য নাহি মানে প্রাণে, প্রাণনাথ বিহনে।
মরিব মরিব জীবন ত্যজিব,
প্রাণনাথ বিনে প্রাণ গেল বুঝি বিফলে ॥ —ঐ

৭৩

আমি কত বা বুঝাব বারে বারে।
এ প্রেম গোপনে রেখো না রাধে প্যারে ॥
দেবলোকে ইন্দ্ররাজা, পুত্র তুল্য পালে প্রজা,
গোপনেতে গুরুপত্নী হরে।
গুপ্ত কথা কয়দিন থাকে প্রকাশ হলে পরে পাকে।
শাপান্ত সর্বাঙ্গ কলেবরে।
কুন্তী দেখ কুমারীতে, প্রেম করিল সূর্য সাথে,
গর্ভ ধরে মস্তক ভিতরে।
কর্ণ দিয়ে জন্মাইল পুন মায়া পাসরিল,
সেই সন্তানকে ভাসায়ে দিল নীরে।
বিদ্যা প্রেম করিল রঙ্গে, গোপনে সুন্দর সঙ্গে
রত্নাবতী দশানন হরে ॥
মৎসগন্ধা রাণী ছিল, সিন্ধু মাঝে প্রেম করিল
সেই প্রেম বিদিত সংসারে ॥
এ প্রেম গোপনে রেখো না, রাধে প্যারে ॥ —মুর্শিদাবাদ

৭৪

আজ যে ঘটনা ঘটিল গোকুলে
এ প্রাণ কেঁপে উঠে সে কথা স্মরিলে।
যে সময়ে ব্রজনাথ হয়েছিল মূর্ছাঘাত
কমল দুই নয়ন মুদিলে।
হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ, বলে ধূলাতে লুটাই সকলে।
ঔষধ খুঁজে কোথাও না মিলে ॥

হেনকালে কথা হইতে বৈদ্য এল নগরীতে,
তোমাই বাঁচাইল ঔষধি বলে।
রুগী হয়ে শয্যায় পরি, আবার, বৈদ্য হয়ে এলেন হরি
এই দেখো শ্রীকৃষ্ণের লীলা ॥ —ঐ

ফাল্গুন-সংক্রান্তিতে ঘেঁটুর পূজা হয়, ইনি খোস-পাঁচড়ার দেবতা। ফাল্গুন মাসে বসন্তোৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যেও বাস্তব জীবনের রূঢ় সত্যটির কথা কেহ বিস্মৃত হইতে পারে না। তবে এই উপলক্ষে যে গান শুনা যায়, তাহাতে কবিত্ব কিছু নাই—

৭৫

সে বছরে খোস হয়েছে শ্রীরামচন্দ্রের গায়।
হায় হায় হায়!
সে বছরে খোস হয়েছে লক্ষ্মণের গায় ॥
কৌশল্যা সুমিত্রা রাণী এরা, কেঁদে কেঁদে পাগলিনী
দশরথ নৃপমণি ভূমিতে লোটায়।
হায় হায় হায়!
মন্ত্রী বলে,—'শোন রাজা কর তুমি ঘেঁটুর পূজা।
আপদ বালাই দূরে যাবে, যমযন্ত্রণা, মম মন্ত্রণায়।' —২৪ পরগণা

৭৬

ঘেঁটু তাই ভাবি মনে।
আর তো সহা জলের কষ্ট যায় না গো কেনে।
গিন্নী বলেন, আর তো আমি জল খাব না পুকুরে।
কুলীতে তপ্ত বালি চলতে নারি দুপুরে ॥
কর্তা বলেন, লখুরে,
যেখানে সস্তা পাবি আন ডেকে মজুরে।
পচা চাল ঘরে ছিল, সেগুলোর গতি হল ॥
মিষ্টি জল উঠল তবু এঁটেল মাটির গহনে;
ঘেঁটু গো ভাবি তাই মনে ॥ —ঐ

ঘেঁটুর রূপ-বর্ণনা কৌতুকের বিষয় হইয়া উঠে—

সাধের মালা হইল গাঁথা বরণ ডালাতে,
ঘেঁটুর রূপ দেখে আজ বিরূপ হলাম আমরা সবেতে।
আ মরি কি রূপের গঠন, দেখে গা'টা করছে কেমন,
গলা সরু মাজা মোটা টাক ধরছে মাথাতে।
কম হয়েছে চোখের জ্যোতি, জোল হয়েছে বুকের ছাতি,
দাঁতগুলো সব নড়্‌তেছে, চুল নাই চোখের ভুরুতে॥ —ঐ

৭৭

এইবার ঘেঁটুর বিবাহের কথা শুনিতে পাওয়া যায়—

ঘেঁটু বাজার জন্যে কনে দেখতে যাই ক'জন,
সীতাপুরে আছে মেয়ে, নামটি বাসনা,
মেয়ের বয়সের নেই গাছ পাথর
আশীর কম হবে না।
হবে যেটি ঘেঁটুর কনে, কুলোয় শুয়ে দুধ খায় দু বেলা। —ঐ

৭৮

আজ আনন্দে ঘেঁটু লয়ে সঙ্গে
নাচিয়া চল সবে যাই।
মনের আনন্দে দাও গো পূজা
এমন দিক ত আর হবে নাই॥
খোস চুলকুনা ঘেঁটু দিছিস গায়
সতী নারীর বীর পতি পায়।
বামে দাঁড়ায়ে সতী নারী
পতি বিনা সতীর গতি নাই। —ঐ

ফাল্গুন চৈত্র মাসে বসন্ত রোগের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শীতলা পুজারও ব্যাপক অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই উপলক্ষেও সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়। শীতলার ঘট স্থাপন উপলক্ষে নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতগুলি শুনা যায়—

৭৯

পদ্মের আসন পদ্মের চাটন পদ্মের সিংহাসন,
পদ্মের পাতায় জন্ম নিলেন সত্যনারায়ণ।

ঘট কেন নড়ে রে দেবী, আসন কেন টলে,
ঐ আসতেছেন মা-শীতলা এই আসরের পরে। —যশোহর

৮০

ঝড়ি বৃষ্টি অন্ধকারে,
গোপাল গেলেন নন্দের ঘরে ;
আপন যদি মা ধন হত
ক্ষিধের বেলায় ননী দিত।
কৃষ্ণধন, আমার কোলে আয়,
আয় রে গোপাল, করি কোলে—
তাপিত প্রাণ শীতল করি।
আপন যদি মা ধন হত,
ধূলা ঝেড়ে কোলে নিত।
কৃষ্ণধন আমার কোলে আয়
আয়রে গোপাল করি কোলে,
তাপিত প্রাণমন শীতল করি,
আপন যদি মা ধন হত,
হাতে তুলে বংশী দিত। —ঐ

শীতলার ঘট নামাইবার সময় ঢাকীরা গায়—

৮১

ঘোষ গেছে বাথানে রে যশোদা গেছে ঘাটে
শন্য গোয়াল পায়্যে গোপাল সকল ননী নোটে।
ছড়ি হাতে নন্দরাণী যায় গোপালের পিছে,
লম্ফ দিয়া উঠল গোপাল কদম্বেরি গাছে।
পাতায় পাতায় বেড়ায় কৃষ্ণ ডালে না দেয় পাও,
তলায় থেকে নন্দরাণী কপালে ঘা খায়॥
নামারে নামারে, গোপাল, পেড়ে দিব ফুল,
ডাল ভাঙ্গিয়ে তলায় পড়ে মজাবি দু'কুল।

বেন্ধো না বেন্ধো না, মাগো, আরে বেন্ধোনা এঁটে,
তোমার বন্ধনে আমাব বুক্ষু যায় যে ফেটে।
কাল সকালে, মাগো, আমি মাতুল বাড়ি যাব,
হাপনী বিক্রী হয়ে, মা, ননীব কড়ি দিব।
রাধিকাবে নাষ উঠ্যাযে কানাইব মনে খুসী,
হালির কাটায হেলান দিযে বাজায মোহন বাঁশী। —ঐ

যশোহব জিলায প্রচলিত শীতলা নৃত্য সম্পর্কে গুরুসদয় দত্ত লিখিয়াছেন, 'শীতলার ঘটস্থাপনার পর প্রতিদিন সেই কুলা নিযে মেযেবা বাড়ী বাড়ী মেঙে বেড়ান। মেয়েরা যেই বাড়ীতে যান, বাড়িব গিন্নী সর্বাগ্রে উঠানে একখানা আসন পেতে দেন। ঐ আসনেব উপব কুলা ও ঘট নামিযে রেখে মেয়েরা তাব চাবদিকে নানারূপ সুন্দব ভঙ্গিতে নাচতে থাকেন। ঋষি জাতীয ব্যক্তিরা ঢাক বাজায। এই থেকে নৃত্যেব নাম 'ঘট ওলানো।' প্রতিদিন এইরূপ নৃত্য হয। নৃত্যেব তৃতীয বা পঞ্চম দিনে বুনাব মন্দিবে (বুনা স্থানে শীতলার মন্দিব) ঐ কুলা ও ঘট নিযে গিযে পূজা দেওয়া হয।

বন্দনা নৃত্য, প্রণাম নৃত্য, আড়ুযা নৃত্য, বাযেনা নৃত্য ও কল্কাদাব নৃত্য মূল নাচের অঙ্গীভূত। আনুষঙ্গিক নাচেব মধ্য জোড় নৃত্য, কুচে-মড়া, পিপঁড়ে-মাবা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। হাস্যরসাত্মক নাচেব মধ্যে ক্ষুদিবামের মাথাধরা, কুলপাড়া, বৈবাগী ডাকা ও তামাক পোড়ান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নাচের সঙ্গে ঢাকীও মাঝে মাঝে গান করে থাকে—

৮২

পেঁচা নাচে পেঁচি নাচে নাচে পেঁচাব মা,
চাবি ধাবে জুযাড় পড়ে মধ্যি কেহই না।
আমাব আসন ছাড়, মা, লও তন্য ঠাই,
আব কি বলিব, মা, তোব শিবের দোহাই॥' —ঐ

উপবে যে শীতলা পূজা ও নৃত্যেব গান সম্পর্কে উল্লেখ কবা গেল, তাহা যথার্থ বারোমাসী পার্বণ-সঙ্গীতেব অন্তর্ভুক্ত নহে, কাবণ, শীতলাব পূজা ও নাচ যে বৎসবের কোন নির্দিষ্ট দিনে অনুষ্ঠিত হয, তাহা নহে, গ্রামে যখন শীতলা বা বসন্ত বোগ প্রবল আকারে দেখা দেয, তখনই তাহাব পূজা হয। সুতরাং ইহা নৈমিত্তিক পার্বণ-সঙ্গীতেব অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক। তথাপি ফাল্গুন

* চৈত্র মাসেই বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব সর্বাপেক্ষা বেশী হয় বলিয়া এখানেই তাহা উল্লেখ করা গেল।

চৈত্র মাসে বাংলার পল্লীসমাজে গাজন নামে যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহা বাঙ্গালীর অন্যতম জাতীয় উৎসব বলিয়া উল্লেখ করা যায়। শিবের গাজন, ধর্মের গাজন, নীলের গাজন, নীল পুজা ইত্যাদি বিভিন্ন নামে ইহা পরিচিত। ইহা বর্তমানে লৌকিক শিবোৎসবেরই রূপ ধারণ করিয়াছে, নানাভাবে শিবকাহিনী কীর্তন ইহাতে শুনিতে পাওয়া যায়—

৮৩

প্রণাম গুরুদেব, অখিল ভুবনে সেব্য
গুরু চতুর্ভুজ সিংহ অপরূপ।
যাঁহার চরণ ধরি, এ ভব সংসার তরি
গুরু হন ব্রহ্মার স্বরূপ॥
আহা অন্ধের লোচন গুরু, ভক্ত-বাঞ্ছা কল্পতরু
ভক্তজনার প্রতি গুরুর দয়া।
শিবের সেবক নন্দী শিবের চরণ বন্দি
আর বন্দি মা মহামায়া॥
গুরু গোঁসাই কর দয়া দেহ মোরে পদছায়া
ও রাঙা চরণ বিনে গতি নাই।
অন্তিম কালে যমদূতে লয়ে যায়,
সেবক বলিয়া, প্রভু, রেখো রাঙা পায়। —নদীয়া

শিবের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে অনেক সময় বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের কথাও আসিয়া পড়ে—

৮৪

শিবের বিয়ের গান—

পড়ল কৈলাসেতে বিয়ার সাড়া বাজিল ঢোল ডগর কাঁড়া
সানাই শঙ্খ বাজে শত শত,
সেতারা চৌতারা বাজে জগঝম্প মাঝে মাঝে
মৃদঙ্গ তানপুরা শত শত।

সঙ্গে চলে যত জনা ঠিক যেন সব যুদ্ধের সেনা
ঢাল তলোয়ার ঘোরে উল্টা পাকে।
করে চলে তলোয়ারে কাটাকাটি কেহ মারে কারে লাঠি
কেহ জোর করিয়া পুরীর মধ্যে ঢোকে॥ —বরিশাল

৮৫

আর, এ ভবে যার বিয়া দুই
তার কপালে সুখ নাই কিছুই॥
দেখ, শিবের ঘরে গঙ্গা-দুর্গা দুই রমণী
তারা বিবাদ করেন দিবারাতি।
একজনের থালে দুইজন বইসে
প্যাট না ভরলে কান্দন আইসে।
আর অভিমানে রাগে কথা কয় না
গাল ফুলাইয়া রয়॥ —ঐ

শিবের গাজন ত্রিপুরা জেলায় নীল পুজা নামে অভিহিত হয়। সাধারণত তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই শিবের গাজনে গান গাহিয়া থাকে। সমস্ত চৈত্রমাসই গাজন গাহিবার রীতি।

৮৬

একদিন অন্নপূর্ণা অন্নের ছলে বাহির হইল নগরে,
সকলের কুলবধূ জিজ্ঞাসা করে
তুমি পঞ্চাননের গিন্নী হইয়া ভিক্ষা মাগ নগরে।
তখন কেন্দে কেন্দে মনের খেদে উমা কয় মধুর স্বরে
পতির গুণ বলব কত কপালে করে;
আমি যে সুখে গিরস্তি করি মন জানে, বলব কারে॥
সে যে বয়সেতে বাপের বড়, বেটা নিপুণ সিদ্ধিতে,
কুলীন দেখিয়া বিয়া দিয়াছিল পিতে,
অস্থিচর্মসার করিলাম ভাং ধুতুরা বাটিতে॥
সে যে শ্মশানে মশানে ফিরে অঙ্গে মাখে চিতার ছাই,
লজ্জাতে দেবসমাজে মুখ না দেখাই,
তাঁর লীলাখেলা ভূতের মেলা দিবা নিশা ভেদ নাই॥

তাঁরে সবে বলে পাগলা ভোলা, জাতিভেদ মানে না তায়,
চণ্ডালে দিলে অন্ন ইচ্ছা কইরা খায়,
তাঁর নাই কোন গুণ, কপালে আগুন, বাপ্তার মত সাপ খেলায়॥
পাক্‌না চুল দাঁত লডবইড়া আইজ মরে কি কাইল মরে,
পতির গুণ বলব কত কপালে করে। —ত্রিপুরা

৮৭

ভাঙ্গড় ভোলা, শিব, তোমার একি মোহন বেশ,
মাথাতে পরেছ মুকুট নেই কো জটার লেশ।
বাঘছাল কোথায় গেল, কোথায় গেল হাড়ের মালা,
মাথার সাপ কি বনে গেল হইয়ে ঝালা পালা।
রাজার মেয়ে করলে বিয়ে হলে রাজার জামাই,
ঘরে আছে গঙ্গামাই তুলনা তার নাই,
কিন্তু, বাবা, বলি তোমা করি প্রণিপাত,
এই দুই সতীনে বিবাদ হলে না হয় বিসম্বাদ।
শুন বলি, ওগো ঠাকুর, পেন্নাম শ্রীচরণে,
গঙ্গামাই মাথায় রেখো গৌরী গো হৃদয়ে।—২৪ পরগণা (টাকী)

৮৮

শিব বলে, শুন ভাইগ্না, নারদ তপোধন,
তোমার মামীরে আন দেখিতে নাচন।
একে ত কোন্দলিয়া নারদ, আরো আইজ্ঞা পাইলো,
কোন্দলের ঝুলিখান কান্ধে তুইল্যা নিলো ;
এমত শুনিয়া নারদ করিল গমন,
চণ্ডিকার নিকটে গিয়া দিল দরশন।
নারদ বলে, শুন মামী, হেমন্ত-নন্দিনী,
বাড়ীর আগে আনছে মামা কোথাকার রমণী !
নারদ মুনি বলিয়াছেন যে সব বিধানে,
চণ্ডিকা আসিয়া দেখে সবই বিদ্যমানে।
চণ্ডী বলে, ভাঙ্গুড়া শিব, তোর লাজ নাই,
তোরে যে দেবতা বলে তার মুখে ছাই !

শিব বলে, শুন চণ্ডী, রাগ কেন কর,
আপনারি মনে আপনি বিচারিয়া দেখ,
নলের ছোবায় কভু নাহি জন্মে বাঁশ,
স্ত্রী হইয়া স্বতন্তর লোকে উপহাস।
তুই হালুয়াব বাড়ী তখন নারদ চলে যায়,
সারাদিন উবাসী নারদ ভ্রমিয়া বেড়ায়।
এক ক্ষেতেব হাজাউড়া আর এক ক্ষেতে ফালায়,
তুই হালুযায় কিলাকিলি নাবদ বইসে রঙ্গ চায়।
অষ্টমী হইল সাঙ্গ নবমী আসিল,
চান বদন ভরিয়া সবে দেবেব দেবের বল॥ —মৈমনসিংহ

৮৯

শিব-শঙ্কর, ভোলানাথ, কৈলাসের অধিকারী,
গৌবী যে যাইবো নাইয়র তাবে বলো কি?
গৌবী যে যাইবো নাইযব শুনতে লাগে ধান্ধা,
কাতিক গণেশ তুইটি পুত্র থইয়া মোর বান্ধা।
গঙ্গা উঠিয়া বলে, শিব বুদ্ধি নাই বে তোব,
এমন যৌবতী কন্যা কেবা দেয় নাইয়ব।
গৌবী সে উঠিয়া বলে, তুই সে বড সতী,
জ্যৈষ্ঠি আষাঢ মাসে তোব উৎপত্তি।
না জানিয়া না শুনিয়া নবলোকে তোর জল খায়,
যোন শ' গাবরে তোর বুকে বৈঠা যায়। —ঐ

হর-পার্বতীব দাম্পত্য জীবন-প্রসঙ্গ বর্ণনায বাঙ্গালী গ্রাম্য কবি চিরকালই নিজের জীবন চিত্র আঁকিয়াছে—

চালো নাইগো ছন, গৌরী, বেড়াং নাইগো বন,
বৎসবে বৎসরে, গৌবী, নাইয়রে সাজন।
গেছিলাম গেছিলাম, গৌরী, তোব বাপের বাড়ী,
খাইতে না দিল্ ভাং ধুতুবা, বইতে না দিল্ পিঁড়ি।
ভাং খাও ধুতুরা খাও বুইড্যা, শিব গো, ভাঙ্গের মর্ম জান,
গাং পাইড্যা যত ভাং বুড্ বাইন্ধ্যা আন।

বুড়্ বাইন্ধ্যা ভাং তুইল্যা থইল্যো চালে,
বৈকালে নামাইয়া ভাং ঢেঁকী দিয়া কুটে।
বারখানা ঢেঁকী শিবের, তেরখানা কুলা,
রাইতে দিনে কুইট্যা মরে জউট্যা ভাঙ্গের গুঁড়া॥ —ঐ

৯০

ধান লাড ধান লাড, গোরী, আউলাইয়া মাথার কেশ,
জল চাইলে না দেও জল এই বা কোন্ দেশ?
নেও ঝাড়ি, নেও পানি, দিও পানি, দেশ কেন নিন্দ?
এ ভব আলিযাব মাঝে ঠমক কেন মাব?
ঠমক নয় ঠমক নয় ঠমক তোমাব হিযা,
একটি কথা জিজ্ঞাস কবি খাট কোনথান দিযা?
হস্তী না হয, ঘোড়া না হয, গেবা না হয তল,
তুমি নি খাইতে পাব শুকনা সাপলাব জল? —ঐ

৯১

শিব মন্দিরে শিবের নিদ্রা ভঙ্গ প্রসঙ্গে গাজনের সন্ন্যাসীবা এই গান গাহিয়া থাকে—

প্রভু, যোগনিদ্রা কব ভঙ্গ,
সেবকেব দেখ বঙ্গ, পবিহব তোমাব চবণে।
কাতিক গণেশ কোলে, শযন আছে নিদাভোলে,
আমরা তোমায প্রণাম করিব কেমনে।
নিদ্রা ত্যেজ দেববাজ, বহ মা খট্টার মাঝ,
নিবন্তব গোবী বাখহ বাম ভাগে।
প্রভু, তুমি দেব অধিপতি, হবি ব্রহ্ম কবে স্তুতি
অন্য দেব কোনখানে লাগে।
প্রভু ত্যজই নিদ্রেব মাযা, সেবকেবে কর দযা
পুরামর্ত দেব ত্রিপুবাবি।
শিঙ্গা ডম্বুব হাতে, বৃষভ রাখহ বামভাগে,
বাসুকি রহুক ফণা, শিরে ধবি স্নিগ্ধ গঙ্গা,
কপালে চন্দন চাঁদ বেড়ি,

তথি মধ্যে শোভে ফোঁটা, হাড় মালা যোগপাটা
গায়ে শোভে বিভূতি ভূষণ।
প্রভু, দেব ত্রিলোচন, বিঘ্ন কর বিমোচন,
নরের শকতি, আমরা তোমার আস্তা করি,
শাল খুলে ভর করি।
আগমে নিগমে কয়, প্রভুদেব গঙ্গাধর, দেবতার ঈশ্বর,
অপরাধ ক্ষমহ, মৃত্যুঞ্জয়।
বৃষভ বাহনে শিব, ত্যেজহে কৈলাসগিরি,
পুরা অর্থ দেব ত্রিপুরারি।
গম্ভীরে করহ অধিষ্ঠান। তোমার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম॥

—বর্ধমা

৯২

দিক্ বন্দনা: দেউল বন্ধন, দেহারা বন্ধন, শাঠ পাঠ লাঠী বন্ধন,
আস্থের তুলসী বন্ধন, আর বন্দ সরস্বতীর গান,
ডাইনে বন্দ রামলক্ষণ, সীতা বামে বীর হনুমান।
পুর্বে আছেন ভানু ভাস্কর, তাঁর চরণে করি পঞ্চ প্রণাম॥
উত্তরে আছেন ভীম কেদার,
তার চরণে কবি পঞ্চ প্রণাম।
পশ্চিমে আছেন আরুব বৈদ্যনাথ।
তার চরণে কবি পঞ্চ প্রণাম।

—বর্ধমা

৯৩

তাহার পুজাব আয়োজন হয়, ফুল তুলিবার ধূম প
হেমন্ত বসন্তকালে বিকশিত ডালে ডা
ও কি ভাই রে, হরের মালঞ্চে নানা ফু
ডব্বা তুলি আঁটি আঁটি ফুলেতে ভবিল সাজি
ও কি ভাই রে, হরের মালঞ্চে নানা ফুল
অশোক অপরাজিতা স্বুবর্ণ মালতী লতা হে
ওকি ভাই রে, হরের মালঞ্চে এত ফুল।

পৃথিবীতে পুষ্প যত   তাহা বা কহিব কত হে,
স্থলপদ্ম দেখিতে সুন্দর ॥
ফুলেতে ভরিল সাজি   চল ঘরে যাই আজি হে,
ফিরায়ে মনে লয় আসিও আর বার ;
প্রাণ কাশীনাথ মনে   প্রাণ ভোলানাথ মনে
মনে লয় আসিও আর বার ॥ —ঢাকা

চৈত্র সংক্রান্তির গাজন উপলক্ষে যাহারা সন্ন্যাসী বা ভক্ত্যা হইয়া থাকে, তাহারা গ্রামের পথে পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনেক সময় তর্জার মত ছড়া বলিত এবং নানা পৌরাণিক বিষয় লইয়া গান রচনা করিয়া গাহিত, তাহাকেই সাধারণতঃ বোলান গান বলে। নিম্নে বীরভূম জিলা হইতে সংগৃহীত গোষ্ঠ-বিষয়ক বোলান গান শুনিতে পাওয়া যাইবে। বৈষ্ণব পদাবলীর একটি লৌকিক রূপ ইহাদের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—

৯৪

প্রভাতকালে মায়ের কোলে আছে রে নীলমণি।
নিশামণি অস্ত গেল উদয় দিনমণি ॥
একবার, এস ভাই, এস ভাই, ধেনুগণ লয়ে যায়।
ওরে, গোষ্ঠে গিয়ে করব খেলা এই বাসনা মনে।
ওরে, তাই তোরে নিতে সেই জন্যেতে এলাম সর্বজনে ॥
সদা বাঞ্ছা মনে,
খেলবো, কানাই, তোমার সনে।
গগনে হইল বেলা সেজে আয় রে নানা।
ঐ দেখ বলাই করে শিঙার ধ্বনি আমরা শুনি রে ॥ —বীরভূম

৯৫

মাকে বল সাজাইতে ধড়া চূড়া দিয়ে।
অলকা তিলকা ভালে পদে নূপুর লয়ে ॥
একবার নেচে নেচে আয় রে।
দেখ গোষ্ঠের সময় যায় রে ॥
ওরে মায়ের কোলে থাকলে কেনে তেমন সুখ পাই না।
আমরা কাকে করব রাখাল রাজা তুমি বাদ যাবে না।

ও ভাই, বল রে কানু।
কে বাজাবে মোহন বেণু॥
তোরে লয়ে গোষ্ঠে গেলে।
বড় সুখে থাকি কেলে॥
বনফুলে সদাই হারে।
গাঁথিয়ে পরাই তোরে॥ —ঐ

৯৬

ঊর্ধমুখে গাভীগণে, ভাই, হাম্বা হাম্বা রবে।
অঙ্গনে দাঁড়ায়ে ডাকে কোথায় প্রাণ কেশবে॥
তাদের চক্ষে ধারা বয় রে।
এ দুঃখ কি প্রাণে সয় রে॥
গোপাল, তোমা বিনে গোপালগণে কাননে না চলে।
তাদের মন নাই ঘাসে, তোমার আশে ভাসে নয়ন জলে॥
একবার দেখ রে, কানাই।
দাড়ায়ে তোর নব লক্ষ গাই॥
তুই বিনে চলে না হরি।
দাঁড়ায়ে সবে সারি সারি॥
বংশীধারী তার উপায় কি করি।
মরি, ভেবে মরি॥ —ঐ

৯৭

আপনি শিঙার ধ্বনি করে হল সারা,
কেন আর বিলম্ব কর, ও ভাই, মাখনচোরা।
ডাকিছে ডাকিছে দাদা।
শিঙার স্বরে বলাই দাদা॥
ও তুই কেমনে রইলি ঘরে ওরে কেলে সোনা।
ওরে নিদয় কেন রাখাল প্রতি বল না, বল না॥
কেন নিদয় হলি ভাই,
কি দোষ করিলাম সবাই॥

যদি দোষ করে থাকি।
ক্ষমা এখন পাব না কি ॥
সৃষ্টিধরের ঐ ভাবনা।
ভেবে সেরে কেলে সোনা ॥ —ঐ

৯৮

তোমা বিনা সে বিপিনে মনে শঙ্কা নাই বে।
সাধে কি, ভাই, আমরা তোমায সঙ্গে নিতে চাই বে ॥
আমরা একলা যেতে পারি না।
তুই না গেলে কেলে সোনা ॥
ওরে, ক্ষুধার সময়, ও রসময়, কে দিবে ভাই খেতে,
ওরে, তুই যদি, ভাই, সবে ববি, না যাই গোষ্ঠেতে,
আর কে দেবে খেতে।
ক্ষুধাব সময় সেই বনেতে ॥
তুই গেলে খেতে পাই অন্ন।
তোমা বিনে জীবন শূন্য ॥
তুমিই ধন্য অন্য কে তা পাবে।
ও ভাই, কানাই বে ॥ —ঐ

পরিণত বয়স্কেব বচনা বলিযা কোন কোন গোষ্ঠেব গানে শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে বালকোচিত ধারণাব পবিবর্তে বিজ্ঞজনোচিত ধাবণা প্রকাশ পায়। নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটিতে শ্রীকৃষ্ণকে সেইজন্যই 'জীবনদাতা' বলিয়া উল্লেখ কবা হইয়াছে। তবে ইহা একটি ব্যতিক্রম মাত্র। লৌকিক গোষ্ঠ-গীতি সর্বত্রই নিতান্ত সহজ ও সরল।

৯৯

জলে কিবা অনলে, ভাই, তুই বে জীবনদাতা।
তুই জানিস আব আমবা জানি আব কে জানে তা।
ও ভাই অন্যে কেউ তা।
জানে না, তোর আমার মরমের কথা।
ও ভাই বনবিহারী,
বনে যেতে কেন রে দেরী ॥

তবে আর কেন ভাই, চরাতে গাই, যেতে করছ দেরী।
মায়েব কাছে বল বল।
গোষ্ঠসাজে সেজে চল।
এলো এলো ঐ দেখ বলাই।
হেতা দিস না ব্যথা ভাই। —ঐ

১০০

হাসি হাসি, কালশশী, আমরা আসি ভাই বে।
তোব আশাতে আশা মোদেব অন্য আশা নাই রে॥
একবার এস ভাই, এস ভাই,
আমবা নেচে নেচে গোষ্ঠে যাই॥
ও ভাই, গিবিধবা পডবে ধরা ধৈর্য ধরতে নারি।
ও তুই, বাখাল মাঝে এলি সেজে আনন্দে বিহারি॥
দুঃখ দিও না, হবি।
আয়বে, ভাই, তোব পায়ে ধরি।
যদি, ভাই, তোব পায়ে বাজে।
কাঁধে কবব বনমাঝে,
এখন মা যে নাচন দেখতে চায় বে,
নেচে নেচে আয় বে॥ —ঐ

নিরক্ষব পল্লী কবিব বচনা বলিয়া ইহারা বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর মধ্যে স্থান পাইতে পারে নাই। কিন্তু এ'কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী রচয়িতাদিগের রচনাব তুলনায় ইহারা অধিকতর আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ। এমন কি, রচনার মধ্যেও কোন গ্রাম্যতা অনুভব করা যায় না।

১০১

রাখালের বিনয়বাণী নীলমণি শুনিয়ে।
প্রণমিয়ে দাঁডাইল মায়ের কাছে গিয়ে॥
বলে, সাজাইয়ে দাও, মা।
বিলম্বে কাজ নাই, জননী॥

তখন নন্দরাণী নীলমণি সাজাইয়ে দিল।
অমনি মায়ের পদে প্রণাম করি রাখালরাজ বলিল ॥
মিশো না রাখালদলে রাখালসাজে রাখালরাজ।
আগে আগে চলে ধেনু, মাঝে চলে রাম-কানু।
শিঙা বেণু বাজায়ে বাজায়ে নেচে নেচে গেয়ে গো।
রাখালগণ আনন্দ মনে পাছু পাছু যায় গো।
আনন্দের আর নাইকো সীমা কত শোভা পায় গো।
সবাই নেচে নেচে চলিল গো, ধেনু চরাইতে।
ওগো, সৃষ্টিধর কয় সখ্যভাবের যাই বলিহারি।
মনে এই বাসনা উপাসনা ঐরূপ যেন করি, দিবা বিভাবরী।
ঐরূপ শয়নে স্বপনে হেরি, দশের পদে প্রণাম করি।
পদরজঃ শিরে ধরি, বদনেতে বল হরি হরি। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত বোলান গানটি প্রায় পাঁচালীর মত সুদীর্ঘ রচনা, পবিত্র বাৎসল্যের রস ইহার মধ্য দিয়াও সার্থক ভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

১০২

প্রথমে বন্দিব আমি গণেশের চরণে ॥
দক্ষিণে জলদা নদী বন্দি জগন্নাথে।
যার প্রসাদ খেয়ে লোক হাত বুলায় মাথে ॥
জগন্নাথের কি মহিমা, বলে কে জানাই সীমা।
গণেশ থাকিতে যেবা অন্য লোকে পূজে।
নানা বিঘ্ন হয় তার সিদ্ধ না হয় কাজে।
আমি দেখে এলাম পাতাল পুরে, গণেশ পূজে ঘরে ঘরে ॥
বন্দনা করিতে আমার হবে অনেকক্ষণ।
একই বারে বন্দিব সকল দেবগণ ॥
মন দিয়া তোমরা শুন, হরি হরি মুখে আন।
শয়নেতে ছিলেন নন্দ রত্নসিংহাসনে।
শুনিয়া কোকিলধ্বনি উঠিল বিহানে ॥
উঠ্‌রে বাপ, নীলমণি, শূন্য কোলে আছি আমি।
উচ্চৈঃস্বরে কোকিল ছাড়িছে দেখ রা।

গা তোল গা তোল বলে ডাকে যশোদা।
উঠরে, বাপ নীলমণি, উঠে খাওরে ক্ষীর-নবনী।
কত নিদ্রা যাওরে, গোপাল, আমি ত না জানি।
জাগিল গোকুলের লোক পোহাল রজনী।
একবার উঠে আয়রে কোলে,
চাঁদ মুখে ডাক মা মা বলে।
উঠে নন্দ শ্রীদাম মোর সুদাম বলে ডাকে।
গোচন করিয়া ধেনু লয়ে যায় রে মাঠে ;
গগনেতে বেলা হলো, কানাই এবার গোঠে চল।
রাম নাম বলে তখন শিঙায় দিল সাড়া।
বলরামের শিঙার স্বরে সাজিল গোয়ালা পাড়া।
বলরামের শিঙার স্বরে, গোধন হাম্বা চাম্বা করে,
তখন বাথানে জড়ো দ্বাদশ রাখাল।
সকল রাখাল মিলে ডাকাইছে পাল,
গগনেতে বেলা হলো, গোষ্ঠের সময় বয়ে গেল।
তায় প্রাণের ভাই বলে শ্রীদামও চলিল।
মায়ের কথায় কানাই ঘরেতে রহিল ॥
গগনেতে বেলা হলো, ধেনুগুচ্ছ সকল খোল।
গগন পানে চেয়ে দেখ গোষ্ঠে বেলা হলো।
আসি বলে গেল কানাই এখন না এলো ॥
আসি বলে গেল চলে, বসে আছে মায়ের কোলে ॥
শ্রীদাম সুদাম মোর তিলেক রেখ ধেনু।
ঘরে গিয়ে পাঠাইব শ্রীনন্দের কানু ॥
হরি হরি বলে, ভেসে যাই নয়নজলে।
রাখাল প্রবোধ দিয়ে শ্রীদামও চলিল।
মায়েরও নিকটে গিয়া দরশন দিল ॥
কোথায় কা গো নন্দরাণী, গোঠে পাঠাও তোর নীলমণি ॥
করেছি কঠোর ব্রত সাগরে ঢেলে গা।
অনেক ভাগ্য হয়ে আছি গোপালের মা।

শিবের মাথায় ঢেলে মধু, কোলে পেলাম সোনার যাদু ॥
কানাই ভাইকে রেখে যদি আমরা যাব গোঠে।
ভাই বিনা কে তরাবে বিষম সঙ্কটে ॥
ফলে যদি যাব গোঠে, কে তরাবে এ সঙ্কটে ॥
একদিন মরেছিলাম বিষজল খেয়ে।
বাঁচিয়ে দিল ভাই কানাই প্রাণদান দিয়ে ॥
মরেছিলাম বিষ খেয়ে, বাঁচিয়েছিল কানাই ভেয়ে,
কে যাবি যে যাবি তোরা কানাইকে আনিতে।
সুবল বলে, আমি ভাই রে পারব না যাইতে।
শুন শ্রীদাম আমাব বাণী, যাতে এসে নীলমণি,
সুবল বলে আমি, ভাই রে, গিয়েছিলাম কাল।
কানাইএর মা নন্দরাণী দিয়েছিল গাল ॥
তোর মায়েব কি কঠিন হিযে, দয়া নাই চাঁদমুখ চেয়ে ॥

—কীর্ণাহার (বীরভুম)

বোলান গানে কৃষ্ণ প্রসঙ্গ ব্যতীতও বামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণে

দুই

জারিগান

মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম পর্ব উপলক্ষে যে সঙ্গীত গীত হয়, তাহাকে জারিগান বলে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমান সমাজেই ইহা প্রচলিত থাকিলেও মৈমনসিংহ জিলার জারিগান ঐ অঞ্চলের লোক-সঙ্গীতের অন্যান্য বিষয়ের মত একটি বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে। ইহা নৃত্যসম্বলিত সঙ্গীত হইলেও পুরুষের সঙ্গীত এবং বাংলার সমগ্র লোক-সঙ্গীতের মধ্যে ইহাতেই একটু পৌরুষের স্পর্শ অনুভব করা যায়। ইহার বিষয়বস্তু কারবালার যুদ্ধবৃত্তান্ত; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা নিরবচ্ছিন্ন বীররসাত্মক সঙ্গীত নহে। ইহার যুদ্ধবিষয়ক বীররসের অন্তরাল দিয়া করুণ রসের একটি প্রচ্ছন্ন প্রবাহ বর্তমান আছে। শত্রু দ্বারা ফোরাত নদীর তীর অবরুদ্ধ হইলে এমাম হোসেনের তৃষ্ণার্ত শিশুপুত্র একবিন্দু জলের জন্য যখন আর্তনাদ করিতেছিল, এমন সময় শত্রুশিবির হইতে নিক্ষিপ্ত এক তীরে শিশুর হৃদয় বিদ্ধ হয়, তাহাতেই অতৃপ্ত তৃষ্ণা লইয়া শিশু প্রাণ ত্যাগ করে। যুদ্ধবৃত্তান্তের মধ্যে স্বভাবতই যে সকল করুণ বিষয় থাকে, তাহার সঙ্গে এই কাহিনীটিও যুক্ত হইয়া ইহাকে বিশেষভাবে করুণ রসে আচ্ছন্ন করিয়াছে। অথচ শত্রুর উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষাও ইহার মধ্যে ব্যক্ত হইয়া ইহাকে বীররসেরও আধার করিয়াছে। জারিগান দীর্ঘ কাহিনীমূলক গীত (narrative), ইহার একজন মূল গায়েন গানের মধ্য দিয়া কাহিনী পরিবেষণ করে, নৃত্যপর একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী নৃত্যের তালে তালে ধুয়া ধরিয়া কাহিনীটি অগ্রসর করিয়া দিতে সহায়তা করে। প্রথমেই বন্দনা গান শুনিতে পাওয়া যায়,—

১

হায় হোছেন।
পুবেতে বন্দনা করি পুবের ভানুশ্বর,
একদিগে উদয় গো ভানু চৌদিগে পশর।
দক্ষিণে বন্দনা করি ক্ষীরনদী সাগর,
যেখানে বাইতো ডিঙ্গা চান্দ সদাগর

উত্তরে বন্দনা করি হিমালয় পর্বত,
যেখানে রাইখ্যাছে আলীর মাল্লামের পাথর।
পশ্চিমে বন্দনা করি মককা হেন স্থান,
উদ্দিশে জানায় গো ছেলাম মমিন মুছলমান।
ইহার পশ্চিমের কথা কহনও না যায়,
বাডিয়ে রান্ধিলে ভাত বরাহ্মণে খায়॥ —মৈমনসিংহ

২

হায় হোছেন।
চাইর কোনা পৃথিবী বানলাম মন করিয়া স্থির,
সুন্দরবন মোকামে বানলাম গাজী জিন্দা পীর।
গাজী সায়বের বাপের নাম গো শাহা সেকান্দর,
পাথর দিযা বান্ধাইছেন তিনি বৈরাট নগর।
হাত পাতিয়া মাইলে পাথর বুক পাতিয়া লয়,
ছাট্‌নি ভরে পড়লে পাথর জুদা জুদা হয়।
আল্লা আল্লা বল ভাইরে নবী কর সার,
নবীর কলেমা পড়ি হইয়া যাইবা পার।
লাইলাহা পডবে মিঞা কলেমা রব্ব বাণী,
আর নি লবে মানুষ জনম বল আল্লার ধ্বনি।
আল্লা ভাবো তইক্যা রাখ, যার গো দিলে নাই
থাক্ বন্দা বেহেস্তে যাইব তার দোজখে জাগা নাই।
দোজখ সাছা, দোজখ মিছা, দোজখ নৈরাকার
এই দোজখে পুইড্যা মরব বান্দা গোনাগার।
দোজখের কীডা ভাইরে আঙ্গুল পরিমাণ
সেই কীড়ায় কুড়িয়া খাইব পাপীরো পরাণ॥
ভাই বল বান্ধব গো বল পন্থের পরিচয়,
মইলেনি কেউ সঙ্গে যাবে, ইহি কারো নয়॥
হায় হোছেন।
আইস, মা, ফতেমা, মাগো, তোমার গুণ গাই
অধম দেইখ্যা ছাড যদি ঐ আল্লার দোহাই।

আইস, মা, ফতেমা, মাগো, ভুবনের ছায়বাণী,
এই অধম বালকে লইলাম তোমারো কাহিনী।
তুমি যদি ছাড, মাগো, আমি না ছাড়িব,
বাজুইন্না নেপুর হইয়া চরণে ধরিব।
খেড্‌ওয়ালেরি কান্ধে, মাগো, থইয়া রাঙ্গা পাও,
আমারো কান্ধেতে বইয়া হরফ জুগাও।
তুমি অইও কল্পতরু, আমি অইব লতা,
যুগল চরণ বেইড্যা রাখব ছাইড্যা যাবে কোথা।
সভা কইর‍্যা বইছেন মিঞারা মমিন মুছলমান,
সবারো জনাবে আমি অধমের ছেলাম। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটিতে সখিনার বিবাহের বর্ণনা শুনিতে পাওয়া যায়—

৬

দিশা : হায় হায়, কাসিদ ভালো, হায় হায়, কাসিদ।
মায় না ভজিলে তারে, ভজিবে এজিদ কিরে,
হায় হায়, কাসিদ, হায় হায়, কাসিদ ভালো।

বয়াত : মরবার বেলা একখান কথা কইয়া গেছিল্ ভাই,
ছখিনারে দিতাম বিয়া কাছুমালীর ঠাই,
গো যদি না রয় এ কডার,
আখেরে দোজখী অইব শুন সমাচার॥ (হায়)
হায় হায়, কাসিদ
জুড়নি আইলো ছখিনারো উদাসের দিন
স্বর্গ তনে চাইর ফিরিশতা লামিল আচম্বিত,
গো বিয়ার উকিল দিব কারে?
এই বিয়ারো উকিল দিব মুছে পেগাম্বরে—(হায়)
হায় হায় কাসিদ
কি শুনাইলা আয়গো, চাচা, কি করিলা রাও,
কলিজায় উঠায়া মাইলা শক্তিশেলের ঘাও,
গো, চাচা, এই ভব সংসারে .

ভাই হইয়া ভগ্নী বিবা করে কেমন জনে—(হায়)
হায় হায় কাসিদ, হায় হায় কাসিদ ভালো। ইত্যাদি —ঐ

দিশা আরে ও—ও, আমার সোনাবরণ জয়নাল—
কান্দে জয়নাল বন্ধখানা ঘরে।
এজিদে বাইন্ধ্যাছে ঘর, জয়নাল আছে বন্ধ ঘর,
বাইশ মণী পাথর আছে ছাত্তিরো উপর।
ও ভাইও নাই বান্ধবও নাই, কে লইব খবর।

বয়াত : হায় হোছেন!
পত্র লিখে জয়নাল আবদীন আইক্ষ্যে ঝরে পাণি।
পত্রেরো উপরে লেখে দুঃখেরো কাহিনী॥
পত্র লইয়া যাওরে, কাসিদ, মেওয়াজানির শ'র।
খবরো পৌছাও গো নিয়া হানিফার গোচর॥
এন সময় জয়নালের কাসিদ পন্থে মেলা দিল।
সাম্‌নে আইয়া জঙ্গলার বাঘ মুড়ি যে ধরিল॥
আমারে যে খাইবা, বাঘ রে, তারো নাই সে দায়।
সঙ্গে যে জয়নালের পত্র কি হবে উপায়॥
খাহরে খাহরে, ব্যাঘ্র, আমারে ধরিয়া।
সঙ্গে যে জয়নালের পত্র দিও পৌছাইয়া॥
এন সময জয়নালের কাসিদ কোন্ কাম করিল।
মারো মারো কইবা কাসিদ পন্থে মেলা দিল॥
উপস্থিত হইল গিয়া ফাল্‌গুন দইর‍্যার ঘাটে।
ফাল্‌গুন দইরার ঢেউ দেখিয়া কাসিদ কাইন্দ্যা ওঠে॥
হায় হোছেন!
ফাল্‌গুন দইরার ঢেউ দেখিয়া কাসিদ কাইন্দ্যা ওঠে।
কেমনে হইবাম গো পার খেয়ানী নাই ঘাটে॥
পার কর গো, ছাহেব আল্লা, না জানি সাঁতার।
অঘোর নদী, ভাঙ্গা নৌকা কেমনে অইব পার॥

এন সময় জয়নালের কাসিদ কোন্ কাম করিল।
বাতাসে হিলায়া নৌকা পার করিয়া দিল ॥ —ঐ

৫

নিশি প্রভাত-কালে,
কোকিল বলে, ওরে সখিনা—
এ বেশে আর ঘুমিয়ে থেকো না,
মাঝ-দরিয়ায় ডুবলো তোমার লাল ডিঙ্গাখানা।
তুমি জাগিয়ে দেখ বিছানা 'পর
খসে পলো নাকের সোনা,
বুঝি গলার হার খাসিয়ে প'লো, বিধির কারখানা।
তখন শিরে করাঘাত মেরে বলে,
বিধিরে, তোর কি এই বিবেচনা।
বলে, আর ডাকিস্‌নে কালো কোকিল,
প্রভাতেরও কালে—
শুয়েছিলাম, ছিলাম নিরালে, ও তুই ডাক দিয়ে কেনে,
শোকের অনল দিলিরে জ্বেলে !
একগুণ আগুন ত্রিগুণ জ্বলে,
নির্বাণ হয় না জলে গেলে।
প্রাণপতি মোর ছেড়ে গেছে, বসন্তেরও কালে,—
আমি কোন্ দেশে যাই, কোথা বা পাই,
কোকিলরে, ও তুই, দে আমায় বলে।
করি এই নিবেদন, হে নিরঞ্জন, তোমার দরবারে,—
তুমি ভালবেসে দোস্ত কও কারে,
কি মহালীলা প্রকাশিলে সেই বংশের 'পরে।
তুমি, কারেও হাসাও কারেও কাঁদাও,
কাহারে ভাসাও সায়রে।
আমার বিয়ের রাতি ম'লো পতি, কোন্ বা বিচারে,
মোস্‌লেম কয়, তার অসীম লীলা,
সসীমে কে তা বুঝতে পারে। —যশোর, খুলনা

৬

তরাও নিজগুণে নিজেরও অধীনে
বরকত-জননী, মা আমার !
পড়ে ভবঘোরে ডাকি বারে বারে, মা তোমায়—
ওগো, রসুলের মেয়ে,
ইমাম হোছেনের মা হয়ে, হলে জগৎ-মা,
তোমার ইমাম হোছেন কাঁদে,
জামা দিলে পিঁদে, পুত্র ব'লে তায়,
ও মা, খুসী হয়ে মনে, যেয়ে সেই ময়দানে,
ইদের নামাজ করিলেন আদায় ।
তরাও নিরবধি, ওগো সৈয়েদজাদী,
দয়া করো যদি আপনি—
হাসরেরও মাঠে, বিষম সঙ্কটে,
পড়িব মোরা যেদিনে ।
অম্মতেরি তলাসে, পৌছাবেন নবী এসে, কিতাবে শুনি,
সেদিন নবীব তলাসে,
পাগলিনীর বেশে আসিবেন আপনি,
সেদিন আমাদেরি ভয়, না জানি কি হয়—
মাগো মা, এই ভাগ্যে না জানি ॥
মা ব'লে কোলেতে যাবো, মনেতে আশা—
ও মা, সেইদিন যেন হয় না মা, সেই কুলছুমির দশা ।
তোমার পুত্রবেটা শুনি, দোমের মাদার মণি,
দোজকে যেদিন পড়িলো—
আজরাইল ধরে ছোড়া, মারে অগ্নির কোড়া,
ধমকে আগুন উড়িলো ।
ধমকেরি চোটেতে, মা মা মা ব'লে ডাকে রক্ষা পাইলো,
যেদিন ঘোর বিপদ, ভারি বিপদভয় হ'লো—
তাই, তাহের আলি বলে, থেকে চরণতলে,
মাগো মা, দাও চরণধুলো ॥ —ঐ

৭

ওগো, মনে রি কষ্ট, বলবো পষ্ট, এখন এই সভায়—
অনেকদিনের মনের কষ্ট, বলবার সময় নাইকো হয়।
ভাগ্যগুণে পেয়েছি তোমায়, কোন্ মাটিতে কথা বলো কয়—
সে মাটি আছে কোন্ জায়গায়॥
মগরবের নামাজ বাদে, আসর কোন্ দিন হয়—
আর একদিন শুনি সূর্য উদয়, আর নাইকো দেখি সেথায়।
এমন কাণ্ড ঘটেছে কোথায়, আমি শুনবো বলে করেছি আশায়,
বয়াতি দাও না পবিচয়॥
বৃক্ষডাল সর্প রূপ ধরে, বলো কোন্ সময়—
এর কোন্ বৃক্ষেতে এরূপ হলো,
সে বৃক্ষ আছে কোথায়, শুনব, বলে করেছি আশায়।
আমি তাহেব গাইন অতি দুবাশয,
বয়াতি বলো সব বিষয়॥ —ঐ

৮

কথা—আরে ও ভাই রে, হোছেন,
কারবালাতে তুমি যাইও না।
কারবালাতে বে-দীন আছে দীন তো মানে না।
ফাঁকি দ্যা কাববালায় নিয়া পানি দিবা না।
দোহার—মরি, হায় হায় হায়।
খেউড—মুলগায়ক—আমার এই গানের যে করবেন হেলা।
কত শত দুঃখ পাইবেন শুতে যাবার বেলা॥
দোহার—ওহো, ব্যাশ ব্যাশ।
প্রভাতী—কি বিদ্রাহী পরিত্রাহি, বাপ রে, ও বাপ, মলেম মলেম।
কি তামাসা সকল চাষা, ভেবেছিলো রাজা হলেম।
হাতে পলো, কাঁধে লাঠি লোটে যত ঘটিবাটি।
মাংনা খারো, আল্লার জাতি, ভয়ে ভীরু অবাক হলেম।
দেশের যত হিন্দুর ভদ্র, তারা কি আর আছে ভদ্র।
আমাদের দেখামাত্র নজর আর বাজায় সেলাম। —ঐ

৯

সাকিনা—বিয়ের কালে যুদ্ধে যেতে গো, কেন আকিঞ্চন।
হে, অনাথিনী করে মোরে বিবাহ বাসরে,
কোন প্রাণে, প্রাণনাথ, চলেছ সমরে হে॥
কাসেম—হো, মহাকর্ত্তব্যের তরে, ও-রে সাকিনা।
চলেছি, এ ঘোর সমরে কেঁদ না, কেঁদ না রে॥
সাকিনা—যেও না, যেও না, নাথ, আমারে ছাড়িয়া।
যদি যুদ্ধে যেতে ছিল সাধ, কেন করিলে বিয়া হে···
হে, উদয় অস্তে একই সাথে কে দেখেছে কুথায়?
বিয়ার ঘরে স্ত্রী রেখে স্বামী যুদ্ধে যায় হে।
কাসেম—রণে যদি না যাই পিয়া হাসরের দিনে।
ক্যামনে দেখাব মুখ বাবাজীর সামনে হে॥
সাকিনা—যাও হে, বীরেন্দ্র, কাঁদে রাত্র মাধ্যখানে।
ডুবাও এজিদের নাম ছেঁড়া তরী জলে হে॥
কাসেম—হয়তো আবার দেখা হবে হাসরেব দিনে।
বিরহ বিচ্ছেদ জ্বালা নাই গো সেখানে হে॥
সাকিনা—তুমি যেথা দাসী তথা জেনো গো নিশ্চয়।
আসমুদ্র সীমাময় ঘোষিবে ধরায় হে॥ —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত জারিগানটিতে হাসাবানুর বিলাপ শুনিতে পাওয়া যাইবে—

১০

ওরে বাপ, কাসেম আলি, গেলিরে কোথায়,
হায়-হায়।
আমার মদিনার চাঁদ আঁধারে লুকায়॥
বাসর খালি করে গেলি ওবে জাদুধন,
হায় হায়।
দেখে বুক ফাটে সাকিনার বচন॥
সাকিনার কপালে আগুন জ্বেলে পালালি,
হায়-হায়!

লগুনের লওসা কোথায় লুকালি !
কি বলে বাপ সাকিনাকে আমি বুঝাব,
হায়-হায় !
আমি কি দিয়ে বাপ তারে ভুলাব ॥
পানি নিয়ে আসি বলে গেলি কারবালায়,
হায়-হায় !
তুই পড়ে কেন আছিস্‌রে ধূলায় ॥
ফোরাত হ'তে পানি আনতে আর কি যাবি না,
হায়-হায়রে, বাপ, তুই কি দুটা কথা বলবি না ॥
দেখ চেয়ে. বাপ, এজিদের লস্কর ডাকিছে তোরে,
হায়-হায় ।
কেন পড়ে আছিস ঘুমের ঘোরে ॥
মদিনার চাঁদ ডুবলো, বে বাপ, কারবালায় এসে,
হায়-হায় ! আমি শূন্য ঘরে যাব কি বলে ॥
ওঠ বাপ, যাদুমণি, চড়রে ঘোড়ায়,
হায়-হায় ।
এ জগতে আর কি তোরে পাব না ॥
ওয়ে বাপ, কাসেম আলি, গেলিরে কোথায়,
হায়-হায় । মদিনার চাঁদ আঁধারে লুকায় ॥ —মুর্শিদাবাদ

তিন

নৈমিত্তিক পার্বণ-সঙ্গীত

যে পার্বণের জন্য বৎসরের মধ্যে নির্দিষ্ট কোন দিন থাকে না, যখন প্রয়োজন, তখনই অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তাহাকে নৈমিত্তিক পার্বণ বলা যায়। শীতলার পূজার গান সম্পর্কে তাহার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এখানে সেই শ্রেণীর আরও কিছু নিদর্শন উদ্ধৃত করা গেল। প্রথমেই সই পাতানোর গান শুনা যাইবে।

সই পাতানো শুধু বাংলার সমাজ-জীবনে নহে, বাংলার প্রতিবেশী আদিবাসী সমাজেরও একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। এই উপলক্ষে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, সঙ্গীত ইহার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অঙ্গ। নিম্নে কয়েকটি মাত্র এই শ্রেণীর গান উদ্ধৃত হইল। ইহাদিগকে সহেলার গান বলে—

১

লঙ্গ ফুলের মালা রে বেদনী সইয়ের গলে।
সীথার সিন্দূর বদল করে, তানা দুইয়ে সইয়ে।
হাতের শঙ্খ বদল করে, তানা দুইযে সইয়ে।
আয়না কাকই বদল করে, তানা দুইয়ে সইয়ে॥ —মৈমনসিংহ

২

চলিলা কমলা গো—সহেলা পাতিবারে।
চিড়া-গুড়া লৈল কমলা, ডাইলারে ভরিয়া॥
কলা চিনি লৈল কমলা, ডাইলারে ভরিয়া।
পান শুবারী লৈল কমলা, বাটারে ভরিয়া॥
পুষ্প দূর্বা লৈল কমলা, সাজিরে ভরিয়া। —ঐ

একজন সই অপর সইএর বাড়ীতে রওনা হইবার সময়ে মেয়েরা গান ধরে—

৩

সই সই বলিয়া সই নি আছ ঘরে গো,
বেদনী, আগো সই গো।
সইএর বাড়ীত সইএ যাইতে পন্থে হাঁটু পানি গো,
বেদনী. আগো সই গো।

সইএর কাছে কইঅ খবর, জাঙ্গাল বাইন্ধ্যা দিত গো,
বেদনী, আগো সই গো!
সইএর বাড়ীতে সইএ যাইতে রইদে কষ্ট পাইলাম গো,
বেদনী, আগো সই গো।
সইএর কাছে কইঅ খবর,— ছত্র লইয়া আইত গো,
বেদনী, আগো সই গো!
খিড়কি দুয়ার, বেতের বান্ধ, সই পলাইল ঘরে গো
বেদনী, আগো সই গো!
সইএর কাছে কইঅ খবর, বাইর কইরা দিত গো,
বেদনী, আগো সই গো। —ত্রিপুরা

সারাদিন উপবাস করিয়া সন্ধ্যার পর কোন প্রান্তরে বা চতুষ্পথে ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি দ্বারা বৃষ্টি দেবতার পুজা করিবার পর এক শ্রেণীর ভজনগান গীত হইয়া থাকে, তাহাকে লৌলাগান বলে। প্রয়োজনমত তাহারও অনুষ্ঠান হয়।

বন্দ ঘরে কেরু কেশের আড়ে, (ধ্রু)
মা কালীর চরণ বন্দন শিরের উপরে। —মৈমনসিংহ

৫

উড়ে উড়ে রে বওলা উড়ে যায়। (ধ্রু)
মা কালীর গাছা আইচে ঐ ত দেখা যায়!
গাজী সাবের গাছা আইচে ঐ ত দেখা যায়॥ —ঐ

৬

এই না ফুলের ডালা আনিয়া দে। (ধ্রু)
মা কালী চাইছেন ফুল, সাজি ভরিয়া দে!
ফতেমা চাইছেন ফুল, সাজি ভরিয়া দে। —ঐ

সাধারণতঃ পৌষ মাসে বালকের দল গৃহস্থের বাড়ীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যে গান গাহিয়া নূতন ধানের চাল, শাক সব্জী সংগ্রহ করে, তাহাকে কুলের মাগনের গান বলে, তাহার কয়েকটি নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত হইল। এই বিষয়ক ছড়াকে কুলের মাগনের ছড়া বলে। গানগুলি বারমাসী পার্বণ সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত

হইতে পারে, কিন্তু ইহাদেরও গাহিবার সুনির্দিষ্ট কোন তিথি কিংবা তারিখ নাই বলিয়া ইহাদিগকে এখানে উল্লেখ করা গেল।

৭

সাজ সাজ সাজ গো সব রাখাল।
কুলের মাগনে যাবে নন্দের গোপাল॥
সাজিয়া কাজিয়া গোপাল নূপুর দিল পায়।
ঘর থেকে বাহির হতে নিষেধ করে মায়॥
সাজ সাজ বলিয়ারে নগবে পডল ধ্বনি।
আজিকের মাগনে যাবে আমাদেব নীলমণি॥
সাজিয়া কাজিয়া গোপাল মুখে দিল পান।
ঘর থেকে বা'ব হল যেন পূর্ণিমার চান॥
সাজ সাজ বলিয়াবে নগরে পডল সাডা।
আজিকে মাগনে মোবা যাব সকল পাডা॥ —ঢাকা

নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে নৌকা-বিলাসের বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যায়—

৮

পার করিয়া দে,
আমরা যাব মথুরা নগরে।
পার কববে ওরে কানাই, ডাকি কুলে রযে,
মথুরাতে বেচাকিনির সময় গেল বয়ে।
সব সখি পার করিতে লব আনা আনা,
বাধিকারে পাব করিতে লব কানেব সোনা।
কাঠের দেশে থাক, কানাই, কাঠের কিবা দোষ,
ভাঙ্গা নৌকায় খেয়া দিয়া মিছে কর রোষ।
ভাঙ্গা নহে নৌকা যেন শিমুলের সাব,
কত হাতী ঘোডা করি পাব—রাধা কত ভাব।
লজ্জা কেন কর, রাধে, আগা ছেডে এস,
ফুটি ফুটি জল ফেলাও পাছা চেপে বস।
সেও জল ফেলাইতে সেওতের ছিঁড়ল দড়ি,
কেডে নিব গলার হার, গ'ণে নিব কডি।

এত বড় হয়েছ, কানাই, বিয়ে না কেন কর,
পরের রমণীর সাথে চাতুরালি কর।
বিয়া যে করিব আমি বিয়া যে করিব,
তোমার মতন সুন্দরী, রাধে, কোথায় গিয়ে পাব ?
আমার মতন সুন্দরী কেন তুমি চাও ?
গলাতে কলসী বেঁধে যমুনাতে যাও।
কোথায় পাব হাঁড়ী কলসী কোথায় পাব দড়ি ?
তুমি হও যমুনার জল, আমি ডুবে মরি। —ঐ

৯

সই, এ বনফুলের মালা আমি কারে পরাব গো ?
গাঁথিলাম ফুলের মালা, ঘটিল বিষম জ্বালা,
সে জ্বালায় অঙ্গ জলে যায় গো।
বিরহ সহিতে নারি, না আসিল বংশীধারী,
বাসনা যে ফুরাইয়ে যায় গো।
যার জন্য গাঁথিলাম হার, সে না দেখা দেয় গো আর,
ভ্রমরা না করে মধু পান গো। —ঐ

১০

(অ) কানাই বলেরে শ্রীদাম,
বেলা গেল বিলম্বে আর কায নাই।
বেলা গেল, সন্ধ্যা হল, রবি গেল তল,
বিলম্বের আর কার্য নাই ধেনু লয়ে চল।
ধবলী, শ্যামলী গাই পালের প্রধান,
হারায়ে ধবলীর বাছুর উড়িল পরাণ।
গাছে থাক পাখীগণ নজর বহুদূর,
এই পথে কি যাইতে দেখেছ ধবলীর বাছুর ?
দেখেছি দেখেছি বাছুর কালিন্দীর তীরে,
গলায় ঘণ্টা পায়ে ঘুমুর চলছে ধীরে ধীরে।
হেনকালে এল ঘাটে কলসী কাঁখে রাধে,
কলসে ভরিতে চায় আকাশের চাঁদে।

না পারি, বলিল চাঁদ থাক মেঘের আড়ে,
অমবস্যার প্রতিপদে ধরিব তোমারে।
হাতের অঙ্গুরী দিয়া কানাই পাত্‌ল ফাঁদ,
তবু না ধরিতে পারল আকাশের চাঁদ।
কলসী ভরিয়া রাধে বাম কাঁথে লইল,
কলসী ভাঙ্গিয়া জল সবই পড়ে গেল।
ননদিনী দিল গালি, ওগো সর্বনাশী,
কেমনে ভাঙ্গিলি আমার হাউসের কলসী।
বাড়ীর কাছে কাল কুমার আনরে ডাকিয়া,
হেন কলসী গড়ে লও রাধার কড়ি দিয়া।
কুমার ছানিয়া মাটী তুলে দিল চাকে,
সুবর্ণের কলসী হল মাত্র আড়াই পাকে।
সোনার কলসীতে, রে ভাই, রূপার দিও কাদা,
কলসীর গায়ে লিখে দিও কলঙ্কিনী রাধা। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন করা হইয়াছে—

১১

মন্দোদরী বলে,
রাবণ, তুমি যুদ্ধেতে যেয়ো না।
বধিল রাম ইন্দ্রজিতে, দেও ফিরায়ে তারে সীতে,
রামকে তুমি সামান্য ভেব না।
শুন, ওগো মন্দোদরী, তোমায় বলি বিনয় করি,
এমন কথা আমারে বলনা।
আমার ভয়ে, আকাশ পাতাল কম্পমান, নর-বানরে তৃণজ্ঞান
করি আমি, ভয় কিছু কর না।

নাথ-সম্প্রদায়ের গুরু ত্রিনাথ সম্পর্কেও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষতঃ পূর্ব বাংলায় বিবিধ সঙ্গীত প্রচলিত আছে। ত্রিনাথ বলিতে নাথধর্মের তিনজন শ্রেষ্ঠ সাধক যথা গোরক্ষনাথ, মীননাথ ও জালন্ধরীপাকে বুঝায়। প্রয়োজনমত

ইহাদের যে সেবা বা পূজা দেওয়া হয়, তাহাতে নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়—

১২

আসরেতে কর আগমন,
(ত্রিলোকের জীবন প্রভু) কব আগমন।
আমি অতি মূঢ়মতি না জানি ভজন।
তিন নাথ রূপে প্রভু বসিলেন আসনে,
জয় জোকার দেও সবে তোমরা নারীগণে।
এ দেহ জলের বিম্ব কখন জানি মবি,
ত্রিনাথ আনন্দে ভাই বল হরি হরি।
তোমার তাল তোমার মন্ত্র কব এসে খেলা,
অধম বালকে দিছে তিন নাথেব মেলা।
যন্ত্র যদি পড়ে থাকে লক্ষ জনাব মাঝে,
যন্ত্রী না হইলে যন্ত্র কখনও না বাজে॥ —ঢাকা

১৩

এল বে তিন নাথ ঠাকুব জগতে.
আজগুবি তামাসা হল কলিতে॥
কলিতে হরি সর্বময়,
পুবেতে পাগলের আশ্রয,
চিতুইলাতে শম্ভুচাঁদ আপনি উদয।
ডেক্‌রা বইট্টাব সিদ্ধেশ্ববী ধামবাইব মাধব রথেতে। —ঐ

ত্রিনাথের পুজাকে 'সেবা' কিংবা 'মেলা' বলা হয়। ইহার প্রধান উপকরণ গাঁজা। ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া ভক্তগণ তাহা প্রসাদরূপে গ্রহণ করে।

১৪

তিন পযসাতে হয় যাব মেলা,
কলিতে তিন নাথের লীলা॥
এক পয়সাব পান সুপারি তাতে নাই মশলা,
খেয়ে, পানের খিলি সাধু মিলি গায় আর বাজায় একতাল

এক পয়সার তেল দিয়ে তিন বাতি সাজায়ে,
মেলা দিচ্ছে তার চেলা।
বাতি জ্বলছে ধীরে নিবে না রে, একি এক আজব লীলা।
(ঠাকুর তিন নাথের মেলার মাঝেরে)
বাতি জ্বলছে…।
এক পয়সার গাঁজা দিয়ে তিন কলকি সাজায়ে
মেলা দিছে তার চেলা।
গাঁজায় মারছে দোম বলছে বোম্
ববম্ ববম্ বোম্ ভোলা। —ঐ

মুসলমান ধর্মপ্রচারককে গাজী বলে। তাঁহাদের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করিয়া যে সকল সঙ্গীত রচিত হইয়াছে, তাহা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত আছে। এখানে তাহাব তুই একটি নিদর্শন উল্লেখ কবা গেল—

১৫

পেথ্থমে বন্দনা করি গাজী পীরের পায়,
যাহার লা'গে পয়দা হইলাম এই তুনিয়ায়।
জীবের তুঃখ দেইখা খোদার আৰ সয়না তর,
কলির শ্যাযে জন্ম নিল গাজী পীব পয়গম্বর।
তারপরে বন্দনা কবি কালু ফকিব ঠাঁই,
এক ডালেতে তু'টি পক্ষী যেন যমজ ভাই। —ঢাকা

গোয়ালা জাতির সঙ্গে গাজি সাহেবের একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে, কারণ, গাজী সাহেবের মাহাত্ম্য প্রথম গোয়ালা জাতির নিকটই প্রকাশ পাইয়াছিল বলিয়া সর্বত্র শুনিতে পাওয়া যায়—

১৬

হারে দোম্ দোম্ বলিয়া গাজী ছাড়িল জীগির।
নন্দ ঘোষের মায় বলে, এই আইল ফকিব॥
নন্দ ঘোষের মায় বলে কালু ঘোষের ঝি।
বাড়ী আইল গাজীর ফকির ভিক্ষা দেব কি॥

ভিক্ষা করতে আইছি আমি ভিক্ষা লইয়া ফিরি।
বাটায় করিযা আন চাউল পয়সা কড়ি ॥
দধি দুগ্ধ থাকে যদি গাজীব থানে দেব।
সিন্নী দিযা গাজীর নামে দোযা কইরা যাব ॥
তখন, সুবুদ্ধি গোযাইলাব মাইয়াব কুবুদ্ধি জাগিল।
ছিয়ার উপর দৈ থুইযা মিথ্যা কথা কইল ॥
ফকিব বলে, মিথ্যা কথা কইলি গাজীব থানে।
ইহাৰ সাজা দিব আমি গোয়াইলার বাতানে ॥
ঘরে মইল গোযালিনী, আতালে মইল গাই।
হাইলা গরু মইল কত ল্যাকা জোকা নাই ॥
গোয়াইলা তখন কাইন্দা কাইটা গেল গাজীব কাছে।
গাজীর নামে হাজত দেব গরু যদি বাঁচে ॥
তখন দোম্ দোম বলিযা গাজী, পিষ্ঠে দিল বাড়ি।
সাত দিনের মবা গরু হাইটা ওঠল বাড়ী ॥ —ঐ

স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিযাছেন, 'গাজী সাহেবের গানের যে নকল পাইয়াছি, তাহাব বিবরণ পাঠ কবিলে মনে হইবে, ঢাকাব নবাবী আমলে মোবারক গাজী ও রাজা মদন বাযেব আবিভাব। ১৭শ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদে নবাব নাজিমের বাজধানী পত্তন হয। সুতবাং তৎপুর্বে গাজী সাহেবেব নাম জাহির হইয়াছিল। বাজা মদন বাযেব অষ্টম পুরুষ অধস্তন স্বর্গীয দেবেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী মহাশয়েব মুখে শুনিযাছি, ঢাকাব নবাব সাযেস্তা খাঁর সমযে রাজা মদন রায় ঢাকায গিযাছিলেন। তৎকালে নবাবেব কর্মচারিগণ সাধারণের উপর কিরূপ অত্যাচাব কবিত, জমিদাবেবা ও কিরূপ খাজনা বাকি ফেলিতেন, মুসলমান ফকিবগণেব হিন্দু-মুসলমান সকলেব উপব কিরূপ প্রভুত্ব ছিল, হিন্দু বড়লোকেও মুসলমান পীর ও গাজীকে কিরূপ সম্মান কবিতেন, মোবারক গাজীর কিরূপ অলৌকিক ক্ষমতা ছিল, তাহা এই গাজী সাহেবেব গানে বর্ণিত হইযাছে। একপ গান বঙ্গের নানাস্থানে হিন্দু ও মুসলমান সমাজে নানা হীন জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে।'

১৭

মোবারক বলেন দুঃখী শুন ফরমান।
ঘুটারিতে সরোবর করিব নির্ম্মাণ ॥
এখনি যাইব আমি মক্কার সহরে।
পানি আনিব আমি হওয়জ কওপুরে ॥
সেই পানি এনে আমি পুখুরে রাখিব।
মক্কা বলিয়া আমি প্রচার করিব ॥
আসিয়া পুখুরে সবে করিবে গোছল।
মনের বাসনা তাদের হইবে সফল ॥
যাত্রী-লোকে এই কথা সকলে জানিবে।
গোছল করিবে সবে পদ নাহি ধোবে ॥
যাও, দুখী, খবর কর সকলকার কাছে।
পুখুর কাটিবে বাবা মনেতে করেছে ॥
এই কথা শুনে দুখী খবর করে গিয়া।
মাটি কাট্‌তে সবে যায় কোদালী লইয়া ॥
চৌহাদ্দি করিয়া গাজী দেখাইয়া দিল।
মাটি কাট্‌তে কোড়াদাব পুকুরে ভেজিল ॥
এলাহি ভাবিয়া গাজী মক্কা তৈয়ার করে।
নবাব আসিয়া বসে ঢাকার সহরে ॥
নবাব বলে, সেরেস্তাদার, মেরা পানে চাও।
বাকি কেত্তা জমিদার বোলাইয়া দেও ॥
কাগজ দেখে সেরেস্তাদার এই কথা বলে।
মদন রায় নামে রাজা দক্ষিণ মেদন মলে ॥
তিন সন খাজনা বাকী কাগজে তাহার।
শুনিয়া নবাব জ্বলে আগ্‌ বরাবর ॥
এত্তা বড জমিদার এত্তা জোর ধরে।
তিন সন খাজনা বাকি আমার সরকারে ॥
আন সেই জমিদার হাতে রসি দিয়া।
বারজন সেফাই সাজে এ কথা শুনিয়া ॥

বারজন সেফাই চলে এক জমাদার।
আইল তলবে সবে হয়ে রাহাদার॥
একাক্রমে তিন মাস পথে চলে এলো।
কলিকাতায় এসে সবে উপনীত হলো॥
কালীঘাট মহামায়ী দেখিবারে পায়।
প্রণাম করিয়া সবে এই কথা কয়॥
জগতজননী, মাগো, প্রণাম করি পায়।
যাবা মাত্র পাই যেন রাজা মদন রায়॥
যাবা মাত্র জমিদারে যদি লাগ্‌ পাব।
ফেরতা কালে চরণেতে বিল্বপত্র দিব॥
কালীঘাটে জমাদার এই কথা কয়।
ঘুটারিতে মোবারক অন্তরে টেব পায়॥
অন্তর্যামী গাজী সাহেব অন্তরে জানিল।
দুখী দুখী বলে গাজী ডাকিতে লাগিল॥
ছালাম করিয়া দুখী এই কথা কয়।
কি কারণে, বাবাজী গো, ডাকিলে আমায়॥
গাজী বলেন তবে দুখী বলি তব কাছে।
মদন রায়ের তলবেতে পিয়াদা এসেছে॥
যদি তারা মহারাজেব হাতে বসি দিবে।
আমাকে বাবাজী বলে কেহ না ডাকিবে॥
দুখী বলে, বাবাজী গো, শুন দয়াময়।
বলুন দেখি মহারাজের কি হবে উপায়॥
এ কথা শুনিয়া গাজী কহেন দুখীরে।
আসে যদি আশীর্বাদ কবিব তাহারে॥
তব আশীর্বাদে তাহার কি ফল হইবে।
গাজী বলে মোকদ্দমা ফতে হয়ে যাবে॥
বাপ বেটা দুয়ে মিলে এই কথা কয়।
কালীঘাট হইতে সিফাই হইল বিদায়॥

রাজপুর বাজারেতে আসিয়া পৌছিল।
দেখে সবে প্রজা সবে ভয়যুক্ত হল॥
কেহ বলে খুড়া জ্যেঠা কেউ বলে ভাই।
নবাবের সিফাই এল কোথায় পালাই॥
কেহ বলে মহারাজে খবর দিতে হলো।
কেহ বলে সিফাই কি ফকিরগণ এলো॥
মুসলমান ফকির সবে এইরূপে বেড়ায়।
এসেছে ছয় লাফে বুঝিনু নিশ্চয়॥
কেহ বলে ফকির যদি ইহারা হইবে।
পঞ্চ হাতিয়ার কেন সঙ্গেতে থাকিবে॥
যুদ্ধের সাজ সেজে এলো বুঝিনু নিশ্চয়।
ফকির কখন নয় সিফাই নিশ্চয়॥
চল সবে দেখা করি তাহাদের সাথে।
সিফাই হইলে কিন্তু মোট দিবে মাথে॥
পেয়াদার বোঝা বয়ে যাইতে হইবে।
ছাতা জুতা বস্তাদি মাথায় তুলে দিবে॥
একথা বলিয়া সবে দাঁড়াইয়া রয়।
আসিয়া জমাদার পথে ধরিল সবায়॥
কাহারা কোথায় যাবে বাটী কোন্ স্থানে।
এখানে দাঁড়াইয়া কিসের কারণে॥
প্রজাগণ বলে, মোর গোমস্তা মুহুরী।
ব্রহ্মোত্তর তালুক আছে খাজনা তহশীল করি॥
জমাদার বলে, তুমি মেবা পানে চাও।
কোন জমিদার তেরা পরিচয় দাও॥
প্রজাগণ কহে আসি যোড়হস্ত করি।
বেহালা নিবাস রাজা সাবর্ণ চৌধুরী॥
জমাদার বলে গিধি মেরা পানে চাও।
মদন রায়ের বাড়ী কোথা দেখাইয়া দাও॥

—অসম্পূর্ণ, ২৪ পরগণা

১৮

ভিক্ষা নাহি লিব মাতা তোমার বাসরে
থোড়া দুগ্ধ দাও মতো খেয়ে যাব ঘরে।
দই-দুধ নাই মানিক বলি গো তোমারে
আছে একটি বাঁজা গাই খাও না দুইয়ে।
কেমনি সত্যবাক্ ফকীর দেখিব তোমারে।
বাঁজা গায়ের দুগ্ধ আজ খাইব দুইয়ে॥ —ঐ

চতুর্থ অধ্যায়

প্রেম-সঙ্গীত

লোক-সঙ্গীতের একটি প্রধান অংশ প্রেম-সঙ্গীত। কিন্তু প্রেম সঙ্গীত বিষয়ে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অধ্যায় নির্দেশ কবা অত্যন্ত কঠিন। পূর্বে আঞ্চলিক সঙ্গীত নামে যে একটি বিস্তৃত অধ্যায় নির্দেশ করিয়াছি, তাহার এক বিপুল সংখ্যক সঙ্গীত আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও প্রেম-মূলক, এ কথা উদ্ধৃত নিদর্শনগুলির মধ্য হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। পূর্বোদ্ধৃত আঞ্চলিক সঙ্গীতের অন্তর্গত ঝুমুর, ভাওয়াইয়া ও ঘাটু গান প্রধানতঃ প্রেম-সঙ্গীত। তথাপি ইহাদের মধ্যে এমন এক একটি আঙ্গিক ব্যবহৃত হইয়াছে, যে জন্য ইহারা একটি সর্বজনীন ভাবমূলক রচনা হওয়া সত্ত্বেও বাংলার সর্বত্র প্রচারলাভ করিতে পারে না। কেবলমাত্র বহির্মুখী আঙ্গিকই নহে, ইহাদের সুরের মধ্যেও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য আছে। সেইজন্যই ইহাদিগকে আঞ্চলিক সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এমন কতকগুলি সঙ্গীতও আছে, বিষয়-বস্তুর গুণে ইহারা বাংলার সর্বত্র প্রচার লাভ করিবাব পক্ষে কোন বাধা সৃষ্টি হইতে পারে না, প্রকৃত পক্ষে ইহারা বিশেষ কোন অঞ্চলে উদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও ইহারা নিজেদের আঞ্চলিক সীমা অতিক্রম কবিতে পারে। প্রধানতঃ তাহাদিগকেই এই অধ্যায়ের মধ্যে উদ্ধৃত কবা যাইবে।

প্রেম-সঙ্গীতগুলিকেও কতকগুলি ভাগে ভাগ কবা যাইতে পারে, প্রথমতঃ ভাবমূলক, দ্বিতীয়তঃ বর্ণনামূলক। ভাবমূলক প্রেম-সঙ্গীতকেও দুইটি ক্ষুদ্রতর ভাগে বিভক্ত করা যায়, যেমন লৌকিক এবং পৌরাণিক। পৌরাণিক অর্থে এখানে কেবলমাত্র রাধাকৃষ্ণই বুঝিতে হইবে। কাবণ, রাধাকৃষ্ণের প্রেম-কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াই এই শ্রেণীর সঙ্গীত রচিত হইয়াছে। অবশ্য পুর্বেই বলিয়াছি, এই রাধাকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ হইতে আসেন নাই, তাহারাও লৌকিক চরিত্র, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার একটি সুনির্দিষ্ট ধারা এই সঙ্গীতগুলির মধ্যে প্রধানতঃ অনুসরণ করা হইয়াছে বলিয়া ইহাদের স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বাধীন বিকাশ সম্ভব হয় নাই—একটি আদর্শ সর্বদাই ধারাটিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, সেইজন্য লৌকিক ধারা হইতে ইহাকে স্বতন্ত্র বলিয়া নির্দেশ

করিতে হয়। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেম-সঙ্গীতে যেমন মিলনের এবং তাহার বিভিন্ন অবস্থার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, লৌকিক প্রেম-সঙ্গীতে বিরহ ব্যতীত আর কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না। সেইজন্য ইহারা ধূলি-বালির স্পর্শে কোনদিক দিয়াই মলিন হইয়া উঠিতে পাবে নাই। রবীন্দ্রনাথ এই সম্পর্কে বলিয়াছেন, 'সেখানে বাস্তবিকতার কোঠা পাব হইয়া মানসিকতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে হয়। প্রাত্যহিক ঘটনা সাংসাবিক ব্যাপার, সামাজিক রহস্য সেখানে স্থান পায় না। সেই অপরূপ রাখালের রাজ্য বাঙালি ছড়া রচয়িতা ও শ্রোতাদের মানস রাজ্য।' (গ্রাম্য সাহিত্য, রবীন্দ্ররচনাবলী ৬, পৃ ৬৫৭)।

রামসীতা কিংবা হরগৌরীর কাহিনী লইয়া যে সঙ্গীত রচিত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ গার্হস্থ্য জীবন-বিষয়ক, প্রেম-বিষযক নহে। সুতরাং এই অধ্যায় তাঁহাদের নাম শুনিতে পাওয়া যাইবে না।

এক

লৌকিক

যদিও বাংলার প্রবাদে শুনিতে পাওয়া যায়, 'কানু ছাড়া গীত নাই', তথাপি যে অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব খুব ব্যাপক হইতে পারে নাই, সেই অঞ্চলে রাধাকৃষ্ণ কাহিনী-নিরপেক্ষ প্রেম-সঙ্গীতও শুনিতে পাওয়া যায়—

১

ও চাঁদ, আমার বাড়ী তোমার বাড়ী মধ্যে হীৰা নদী।
কি যাব তোমার বাড়ী, রে চাঁদ, পাঙ্খা নাই দেয় বিধি ॥
একবার আসিয়া কি ও মোর সোনার চাঁদ যান ত দেখিয়া হে।
আমার বাড়ী তোমার বাড়ী মধ্যে ব্যাতের আড়া।
কি যাব তোমারো বাড়ী, আমার কপাল পোড়া ॥
আমার বাড়ী তোমার বাড়ী একে ত আঙ্গিনা।
আত হলেও মোৰ সোনার চাঁদ দিন হইলে ভাগিনা ॥

—কুচবিহার

২

মনে বড় দুঃখ সখিরে, চিতে বড় দুখ,
নদীর ধারিঙ্গার মত ভাঙ্গিয়া পড়ে বুব
সখিরে মন কে বুঝাব কত। —জলপাইগুড়ি

৩

নাইলের[১] আগাত[২] লাল শালুকা, বাঁশের আগাত্ টিয়া
রে বুনের বায়ৈ[৩] রে।
আর কতদিন রাখব যৈবন বাবা-মায়ের ঘরে
রে বুনের বায়ৈ বে!
আর কতদিন রাখব যৈবন চাচা চাচীর ঘরে
বে বুনের বায়ৈ রে!
ন'লের[৪] আগাত্ লাল শালুকা,
বাঁশের আগাত্ টিয়া, রে বুনের বায়ৈ রে!

১। নাল, মৃণাল। ২। আগায, অগ্রে। ৩। বাবুই পাখি। ৪। মৃণাল

আমার তেল আস্‌বে শিশি-র মুখ মোড়া হয়্যা
রে বুনের বাঁয়ে রে !
আমার সেন্দুর আসবে সোয়ার কোটায় ভর‍্যা
রে বুনের বাঁযে রে। —রাজসাহী

ক্ষুদ্র বাবুই পক্ষীটিকে এখানে প্রেমিকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে—

৪

ও বাঐ রে, ওরে ঝাঁকে ওড, ঝাঁকে রে পড তারে বল সাড়া,
কইও মোর বঁধুয়ার আগে বাঐ পিরীতি জান্‌মারা। (রে বাঐ)
কি জঞ্জাল কর্‌লি বনের বাঐ রে।
ও বাঐ রে, ওরে জলের আগে নলফুল, বাঁশের আগে টিয়া,
কইও মোর বঁধুয়ার আগে বাঐ, না যেন্‌ করে বিয়া (রে বাঐ),
কি জঞ্জাল কর্‌লি বনের বাঐ রে।
ও বাঐ রে, ওরে যখন করিলাম প্রেম, বাঐ তুমি আমি জানি,
ওরে এখন কেন সে সব কথা, বাঐ, লোকের মুখে শুনি রে,—
কি জঞ্জাল করলি বনের বাঐ রে।
ও বাঐ রে, যখন করিলাম প্রেম বাঐ শানবাঁধা ঘাটে,
ঐ যে আকাশের চন্দ্র যেমুন তুইলা দিল হাতে। (রে বাঐ)
কি জজ্ঞাল কর্‌লি বনের বাঐ রে।
ও বাঐ রে, হায় রে, ওপারে বুনিলাম ধান বাঐ, টিয়ায় কাইটা খাইল,
ঐ যে কইও মোর বঁধুয়ার আগে যৌবন বইয়া গেল রে,—
কি জঞ্জাল করলি বনের বাঐ রে।
ও বাঐ রে, ওপারে কদমের গাছ বাঐ বায়ে হালে আগা,
ওরে শিশুকালে কইরা প্রেম, বাঐ, যৌবনকালে দাগা (রে বাঐ) —ঐ

৫

অরে, বন্ধু স্বজনের পীরিতি যে জন ভাঙ্গিবে, সেজন হইবে বধের ভাগী,
এই বাড়ী হতে বাদশার দরবারে যাইতে (অ প্রাণ বন্ধুরে)
কাওলায় কাটিল সর্ব গাও,
কালুকা বিহানে সেই না জঙ্গল ছুটামু রে বন্ধু বাড়ৈর
হাতে দিয়া ধারের দাও।

সকলের বন্ধুয়া আইসে ধলা ঘোড়ায় সওয়ারী (অ প্রাণবন্ধু রে),
মুই নারীর বন্ধু আইসে ভুঁই পাও।
কালুকা বিহানে সেই না ঘোড়া কিনামু, সোয়ামী বেচিয়া দিমু জিন্।
—ঢাকা

স্বামীকে বিক্রয় করিয়া এখানে প্রণয়ীর ঘোড়ার জিন্ কিনিয়া দিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করা হইয়াছে, কেবলমাত্র লোক-সঙ্গীতের ক্ষেত্রেই যে স্বাধীন প্রেমের অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে ইহা তাহারই একটি নিদর্শন।

৬

তারে আমি পর ভাবি গো সই, কেমনে।
সে ত আমার পরাণের পরাণ সখি রে,—
জীবন যৌবন সকলি কল্লেম অর্পণ,
আমার বন্ধুর যুগল চরণে।
তারে আমি পর ভাবি গো সই, কেমনে॥ —ঐ

অনুভূতির গভীরতায় নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটি অপূর্ব সার্থক হইয়াছে—

৭

হৃদয় দহিছে রে—আমার তাপিত হৃদয় দহিছে রে,—
হৃদি দহিছে দহিছে দহিছে রে বন্ধুর লাগিয়া।
ওগো আমি যদি (ওগো সখী, প্রাণ-সখী গো)
মাটী হইতাম—বন্ধুর চরণে লাগিয়া রহিতাম।
ওগো আমি যদি (ওগো সখী, প্রাণ সখী গো)
চন্দন হইতাম—বন্ধুর অঙ্গেতে মিশিয়া রইতাম।
ওগো আমি যদি (ওগো সখী, প্রাণ সখী গো)
কাজল হইতাম—বন্ধুর চক্ষেতে লাগিয়া রহিতাম —

৮

আরে কোহিলা না ডাহিও আর
বন্ধু গিছুন যস্ত, ডাহ কোহিল হস্ত,
হিন যদি ডাহ কোহিল, মোর মাথাটি খাও।
বন্ধু গিছুন বিদেশৎ, খৎনা লিখুন ছমাসৎ রে,
আরে বন্ধুর লাগি মোর কলিজা জলি জলি যায় —

আমি নন্দে'র জ্বালায় বাঁচি না,
কাল যমে আমায় নিল না !
দেইখে যাও গো বইন সকলে,
এত খিট্‌কাল কার বাড়ীতে
নিত্যই খিট্‌কাল ভাল লাগে না !
ওগো নন্দে ভাল কইতে মন্দ বোঝে গো !
বাপ ভাইয়ে দিছেন বিয়া,
সুখের কামাই খাব গিয়া,
সুখ হবে তার দুখ্‌ই গেল না। —ঐ

১০

আঁচলে বাঁধাছে সর্বদায় সে আমায়,
কেমন করে তার ভালবাসা পাসরিব।
সে যে রূপেবি রূপ আমি মনে মনে ভুলে রব।
অন্তবে বাঁধাছে সর্বদায সে আমায়,
কেমন করে তাব ভালবাসা পাসবিব।
সে যে মধুব কথা, আমার হৃদয়ে রয়েছে গাঁথা,
আমি কেমন কবে তোমায় ভুলে না দেখে প্রাণ ধরে রব ?
—ফরিদপুর

১১

এত ঘুমের কাতর কেনে তুমি, অবলার বন্ধু রে,
উঠ উঠ প্রাণকান্ত,
তুমি বিনে প্রাণ নহে শান্ত।
দারুণ বিধি দিল বিষম ব্যথা,
নিদ্রাতে রহিলা তুমি,
ডাকি আমি অভাগিনী,
কর্ণ দিয়া শোন মোর কথা।

শুকাইলো ফুলের মালা
উতলে মনের জ্বালা
গা তুলিয়া বৈস চিকণ কালা
কুহরি ডাহুকী আমি
ফুরাইল দুখের যামী
কে নিভাইব পোড়া মনের জ্বালা। —চট্টগ্রাম

১২

ওরে আমার সুয়াধন পাখী,
তোমারে ডাক্যাছি আমি ঘুমাইছ নাকি।
নিশি ত ভোর হৈল কুহরি কুহরি (রে ময়না) কুহরি কুহরি।
পিঞ্জরার সুয়া কেমনে পরাণ নিলি হরি।
আগে যদি জাইনতাম, ময়না, কাঁদাবি তুই মোরে (রে ময়না)
হৃদের মাঝে বাঁধি রাইখ্‌তাম প্রেমেব সোনার ডোরে।
ঘব বাড়ি ছাড়ি দিয়া দেবাইল্যার বেশ (রে ময়না)
তোর লাগি ঘুইৰলাম আমি কত অচিন দেশ। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত প্রোষিত-ভর্তৃকাব সঙ্গীতটিকে স্বামীর আকিয়াব ও রেঙ্গুন যাইবার কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসিগণ ইহার সংলগ্ন ব্রহ্মদেশে গিয়া সেখানেই বিবাহাদি করিয়া নূতন সংসার পাতিয়া বসিত, গৃহের কথা স্মরণও করিত না, এই অঞ্চলের প্রেম-সঙ্গীতে তাহার উল্লেখ শুনিতে পাওয়া যায়।

১৩

কোথায় রইলি আমার আশক ধন,
হৃদ্‌মাঝারে প্রেমের আগুন জ্বলে ঘন ঘন।
আমি ত অবলা নারী থাকি একাশ্বর,
যত দিলাম চিঠিপত্র না দিলা উত্তর।
আইক্যাব রঙ্গুন চিঠি দিলাম রে (ও বন্ধুয়া),
ন পাই তোমার দরশন।

১। উটাগাল—সমক্ষিণাজী

মা বাপে ত বিবা দিল উট্যাল[১] গিরছ চাই,
হাউসের যৈবন ভাসি গেল গৈ তোমার দেখা নাই,
শুইলে স্বপ্পন দেখি রে (বন্ধুয়া)
তোমার মধুর চান্ বদন।
রান্নাঘরে বন্দী আমি নাই রে আমার ডানা,
দিলরে মোর কেমনে বাঁধি নাই রে মানে মানা,
বনের পাখী হৈতাম যদি রে (ও বন্ধুয়া)
উডকা দিতাম তোর কারণ।
চৈত্রল বসন্ত কালে কোকিলা কুস্বরে,
ইচ্ছা নয় রে নারীর যৈবন ফিরাই নিত ঘরে,
শ্যাম বন্ধুয়ার লাগত পাইতাম রে (ও বন্ধুয়া),
সঁপি দিতাম যৈবন ধন॥ —ঐ

১৪

ওলো বিদেশী, যৈবন হইল সার রে,
মনের আশা না পুরাইল রে॥
আম গাছে আম ধরে কাউল ফেলে মুছি,
মা বাপে বাডাইল যৈবন পরে নিল শুসি।
বৈলতলে খোয়া ঝরে কুইক্যা[১] উঠে মাতি,
একেলা যুবতী নারী কাটি সারা রাতি।
আম গাছে আম ধরে তেতই ধরে বেঁকা,
দেশের বঁধু বিদেশ গেলে আর নি হৈব দেখা। —ঐ

১৫

নিশি তো হৈয়া গেল ভোর, নিধুর বঁধুয়া রে
সারা রাতি দুয়ার ধরি
তোর লাগি কুহরি মরি
পরাণ কেনে হরি নিলি কালা।

১। কুইক্যা—পেঁচক

আমতলে খোয়া রে ঝরে
আঁখিব পানি নাহি ধরে
দারুণ বিধিব হইল বিষম জ্বালা।
একে ত যুবতী নাবী
মনে দুখ দিলি ভাবি
মায়া কেনে লাগাই গেলি মনে,
চিবদিন একাশ্বরী
তুষের আগুনে মবি।
মনের জ্বালা জুড়াই কেমনে। —ঐ

১৬

সখি মযনা বে,
সাইগবে ভাসানিবে আমাবে।
হাঁইস্যা কোণে[১] ধৈবল মেঘে দেবা[২] নৈল ডাক
ছিঁড়ি গেল পালেব বশি নৌকা নৈল পাক রে
অচিন দেশেব পাখী বে আমার গহিন বনে চড়ে,
উড়ি গেল পিঞ্জরার সুযা, ফিরি ন আইল ঘবে।
আঙ্খির টারে পাগল কবি হরি নিল মন,
এমতে দেবানা হৈযা কাডিল যৈবন বে
ভাসি বৈলাম জন্মাবধি পাইলাম না বে কুল,
দারুণ বিধি হবি নিল আসমানেব ফুল। —ঐ

১৭

ও ভাই, দিলেব কথা কাবে কই।
যার লাগি দেওযানা হৈলাম তাবে পাইলাম কই।
বেবাম দরিযার মাঝে নৌকা দিলাম ছাড়ি,
মনের আগুন মনে লৈযা ছাইরলাম ঘব বাডী।
চিরদিন রইলাম ভাইস্যা রে কুলকিনারা পাইলাম কই

১। হাঁইস্যা কোণে—ঈশান কোণ ২। দেবা—মেঘ

পিঞ্জরার সুয়া আমার কেমনে দিল ফাঁকি,
নিশিদিন নৌকা বাহিয়া খুঁইজলাম মনপাখী।
আর কতদিন রইব, ভাইস্তা রে, মনের জ্বালা মনে লই। —ঐ

চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমুদ্রগামী নৌকার নাম সাম্পান। এই সাম্পানে করিয়া চট্টগ্রামের সঙ্গে অকিয়াবের বাণিজ্য চলিত। সাম্পানের মাঝিরা বাণিজ্য ব্যপদেশে দীর্ঘকাল প্রবাস-জীবন যাপন করিত। গৃহে পরিত্যক্তা তাহাদের নবপরিণীতা বধূর অন্তর্বেদনায় এই অঞ্চলের লোক-সঙ্গীত করুণ করিয়া রহিয়াছে।

১৮

অ ভাই, চাঁদমুখে মধুর হাসি।
দেবাল্যা বানাইলি সাম্পানের মাঝি।
বাহার মাঝি যাবগৈ সাম্পানরে।
ন মানে উজান ভাডি।
কুতুবদিয়ার পাছিমধারে সম্পানঅলার ঘর।
লাল বঅটা তুলি দিয়ে সম্পানর উঅর।
অ ভাই চাঁদমুখে মধুর হাসি।
দেবাইল্যা বানাইলি মোরে সম্পানার মাঝি। —ঐ

নিম্নোক্ত সঙ্গীতটির মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধকালীন দুর্ভিক্ষের কথার উল্লেখ হ'ছে।

১৯

আঁয়ার স্বোয়ামী গেলগই ত্যাশ ছাড়ি,
এই দুনিয়ার জ্বালা আই সইত ন পাড়ি।
জাউ খেচুরী পাইযস বলি, নংগলখানাৎ যাই,
তারা হগগলে পাইল খেচুরী, আর তালাস নাই।
এতক্ষণে কিল্যাই আইযস, তোর লাই নাই আর খেচরী।
কণ্টল দাইডগ্যার ঘরৎ গেলাম কইরতাম তার খেচমত,
দারুণী পেটের লাই বলি, ন চাইলাম ইজ্জত,
আঁর মনে ন লয় বুজ,
পোয়া উগ্যা মইরগ্যে, ঝি'র পোয়াউয়া ফুলি হইয়ে তুজ।

পেটের রোগৎ গেল গই যাদু, বুকত ছেল মারি
অনরে পাডাইল্যা মা বইন, ইজ্জতে থাইক্য,
আতিক্যা বিপদে পইলে খোদারে ডাইক্য। —ঐ

২০

মনরে ধর্ম মানে নারে, দাদা,
দিল রে আর ধর্ম মানে না।
চাঁটিয়া ছাডাইল মোরে পরীজান সোনা,
পরীজান রাস্তা দিয়া যায়,
ফিব ফির শাডীর আঁচল বাতাসে উডায়।
তাব চোখের বিজলী, মন করে দেবালা,
পবীজনেব গামছা বর উম,
বুকত রাইয়লে বুক জুডায় চোখত আরে ঘুম।
তার ঠোঁডর কতা হুইনলে উটে পরাণে মুবছ না।
পরীজানেব মাথায় কালাচুল।
য্যান মেয়র পিছে হাজার পদ্দীপ করে জুল্ জুল্।
তাব চোখ ডাকে ইসারায়, হাতে করে মানা।
তার হাতত্ বাজু, পঅত জোডা মল,
তার বুকত্ দবদের ঝরনা, মুঅত কবে ছল।
ওতার মুখর কতা কনে চায়, দাদা, দিল যদি যায় জান। —ঐ

২১

এই বছব নতুন কুইলায় ডাক ছাডে
অমন পরাণ বিদরে,
কুইলা কালা শব্দ ভালা নানান্ ভেংচা জানে।
গাছের আগাত পাতার হেবত বইরা কুহরে
অই মোর পবাণ বিদরে। —

২২

পরাণ বঁধুরে,
ঘরের কোণায় থাকিরে আমি, তুমি থাকরে মাঠে,
কাঠ ফাটা রইদে রে তোমার মাথা ফাটে.

তোমার লাগিয়া বন্ধুরে আমি ছেঁওয়ায় পাইরে যে তাপ।
কি জানি কোন্ জন্মেরে, বন্ধু, কইরাছিলাম পাপ।
শাওনের রৈদবে বন্ধু নিমের পাতার তিতা,
বিচ্ছেদ হৈতে অনেক ভাল তেঁতৈ কাঠের চিতা।

—মৈমনসিংহ

চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, মৈমনসিংহ জিলা ও উত্তর বঙ্গের কোন কোন অঞ্চলের প্রেম-সঙ্গীতেই প্রধানতঃ রাধাকৃষ্ণের নাম শুনিতে পাওয়া যায় না। নতুবা বাংলার সর্বত্রই প্রেম-সঙ্গীতে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ অখণ্ড অধিকার স্থাপন করিয়াছে।

দুই

পৌরাণিক

যে সকল প্রেম-সঙ্গীতের মধ্যে নায়ক-নায়িকারূপে রাধাকৃষ্ণের নাম, কিংবা তাহাদের প্রেমলীলার ইঙ্গিত অনুভব করিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকেই পৌরাণিক প্রেম-সঙ্গীত বলিয়া নির্দেশ করা যায়। তবে পূর্বেই বলিয়াছি, রাধাকৃষ্ণ ব্যতীত পুরাণের আর কোন চরিত্র বাংলার প্রেম-সঙ্গীতে প্রবেশ করিতে পারে নাই। এ কথা সত্য, বিবাহ-সঙ্গীতে যে কখনও কখনও শকুন্তলা, সাবিত্রী কিংবা রুক্মিণীর বিবাহের বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে কোন কোন ক্ষেত্রে এই সকল নারীচরিত্রের মধ্যে প্রেম-বিষয়ক স্বাধীন অনুভূতির অভিব্যক্তি দেখা যায়। তবে ভাবমূলক প্রেম-সঙ্গীতে রাধাকৃষ্ণ ব্যতীত নায়ক-নায়িকারূপে আর কাহারও নাম শুনিতে পাওয়া যায় না। আঞ্চলিক সঙ্গীত অধ্যায়ে ঝুমুর ও ঘাটুগানে এই শ্রেণীর বহু সঙ্গীত উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে আরও কয়েকটি সঙ্গীত উদ্ধৃত করা যায়। প্রকৃতপক্ষে বাংলার লোক-সঙ্গীতে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক প্রেম-সঙ্গীতের সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না, আকাশের নক্ষত্রের মতই ইহারা অগণিত।

১

চিনিস্ না, সই, তোরা, ও সে গোপীর বসন করে চুরি,
যায় না গোয়াল পাড়া শ্যাম কেলে সোনা—
ও সে কালো ছেঁড়া শঠের গোড়া, সদাই থাকে গোয়ালপাড়া,
ঐ একখানা গেরুয়া বসন পরিধান করে আছে সাধুর গোড়া।
তুমি শ্রীরাধারে আশা দিয়ে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গেলে—
বলি, এই কি তোমার সাধুপনা, সব গিয়েছে জানা।
তুমি শুন রে শ্যাম, বনমালী, খাটবে না তোর নাগরালী
মাথা মুড়ে ঘোল ঢালিব, আমরা ব্রজাঙ্গনা। —খুলনা, যশোর

২

বন পোড়ে তা সবাই জানে,
মন পোড়ে ত' কেউ না জানে।
তোমারে কাজের বেলায় ধেনু রাখা
ব্যবসা গো শ্যাম ননী চরি। —ঐ

উদ্ধৃত সঙ্গীতটির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এই পদটির তুলনা করা যাইতে পারে—

বন পোড়ো আগ বড়াই,
জগজনে জানি,
মোর মন পোড়ে যেহ্ন
কুম্ভারের পণী।

৩

ও কালা কার আশায় এই কদম গাছে
বাজাচ্ছ মোহন বাঁশরী,
তুমি জান না কি, প্রাণের বন্ধু, মান কৈরাছে, রাইকিশোরী।
আমরা যত সখীগণে ধরি রাধার শ্রীচরণে,
মান পড়ে না তার কি করি—
তুমি বাঁশীর স্বরে করলে পাগল,
ব্রজের পাগল রাইকিশোরী। —ঐ

৪

বল বল বল বিন্দে, কালা বিনে ঘরে বা রই—
ও আমাব বুক ধরে দেখ না বিন্দে
ধান দিলে হয় পোড়া রে খই।
সিন্ধু নদীর কালো জলে প্রাণ ত্যাজিব কৃষ্ণ বলে
যদি জলে শীতল হই।
আমি কালার জ্বালায় মলেম্ জ্বলে
এ জীবনে ধৈয ধরতে পার্‌লাম কই ? —ঐ

৫

তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশী অ প্রাণনাথ
তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশী,
বাঁশী দেও নেও, নইলে মোরে সঙ্গে নেও,
নইলে কর নিজ দাসী।

অ প্রাণনাথ,

তোমার বাঁশীর টানে ভাইটাল নদী উজান চলে,

আমি নারী হয়ে কেমন গৃহে রই।

অ প্রাণনাথ,

শ্রীকৃষ্ণ মথুরা যাইতে রাধার কাছে বিদায় নিতে

আমি নারী হয়ে বিদায় দেই কেমনে।

অ প্রাণনাথ। —ত্রিপুরা

গানগুলি চট্টগ্রাম হইতে সংগৃহীত হইলেও ইহাদের মধ্যে চট্টগ্রাম ভাষা ব্যবহৃত হয় নাই, উচ্চতর এবং শিক্ষিত পরিবারের স্ত্রী-সমাজে অনেক সময় প্রাদেশিক ভাষার পরিবর্তে সাধু ভাষা ব্যবহৃত হইতেছে।

৬

বাঁশী বাজাইও না,

নন্দের সুতে বাজায় বাঁশী রাধা নাম লইও না।

নন্দের সুতে বাজায় বাঁশী শুনতে বিপরীত,

নীরবে বসিয়া আমি শুনতাম বাঁশীর গীত,

তবল বাঁশের বাঁশী তাতে সপ্ত ভেদা

বাঁশী কেমনে জানে কলঙ্কিনী রাধা।

তবল বাঁশের বাঁশী যে মুড়াতে[১] পাই

কাটারি কাটিয়া বাঁশী সাগরে ভাসাই।

ভাসিতে ভাসিতে বাঁশী ঠেকল বালুর চরে,

পবনের বাতাসে বাঁশী রাধা রাধা বলে।— —চট্টগ্রাম

নিঠুর কালা বাঁকা শ্যাম

বাঁশীতে না লইও রাধার নাম।

চন্দ্রাবতীর কুঞ্জে গেলে রে বঁধুয়া

পূর্ণ হবে মনস্কাম।

বাঁশীতে না লইও রাধার নাম

১। মুড়া—ছোট পর্বত

শ্রীচরণে হৈলাম গো দাসী
যার নামে বাজাইলাম বাঁশী
গোপীর মন ভুলাতে জান রে বঁধুয়া
আমার পতির এমনি বান,
বাঁশীতে না লইও রাধার নাম। —ঐ

৮

সখী, কোন্ বনে মুরলীধ্বনি শুনা যায়,
বাজিল বন কি বংশীবটে জেনে আয়।
সখী কোন বনে ইত্যাদি
সখী তারে কর গো মানা,
অসময়ে রসরাজে বাঁশী বাজায় না।
ও তার বাঁশীর স্বরে বৃন্দাবনে কুলবধূর কুল মজায়,
সখী কোন্ বনে মুরলীধ্বনি শুনা যায়। —ঐ

৯

কুটিল স্বভাব রে তোর গেল না,
তোর জ্বালায় ত ও কুটিলা প্রাণ ত বাঁচে না।
দাদার কাছে সোহাগিনী রে কুটিলা,
কালার প্রেম ত জানিস না,
তোর জ্বালায় ত ও-কুটিলা ইত্যাদি।
কাউয়া কালা কোকিল কালা,
আঁখির পুতলি কালা,
কালা তোর অঙ্গের নিশানা,
কালো রূপে জগৎ জোড়া রে কুটিলা
লোকে করে ঘোষণা,
সেই কালার লাগি প্রাণ ত বাঁচে না। —ঐ

১০

বৃন্দে সই,
আসবে বলি প্রাণ কালিযা নিশি জেগে রই।
আজ আসবে কাল আসবে বলে পথ পানে চেয়ে রই

বুঝি আমার কপাল মন্দ না আসিলে প্রাণ-গোবিন্দ,
আমার মনের দুঃখ মনে রইল,
তোমায় বিনে কারে কই। —ঐ

১১

সখী, তোরা হৈলে মরতিস প্রাণে
যার জ্বালা সে জানে,
আমি আপন জ্বালায় জ্বলে মরি
শ্যাম বঁধুয়ার প্রেম বিহনে।
যার জ্বালা সে জানে॥ —ঐ

১২

বৃন্দে, অন্তরে মোর নাই রে সুখ,
কইতে নারি ফেটে যায় রে বুক।
আমি রাইএর কারণে বৃন্দাবনে গো,
ওগো বৃন্দে, দিয়েছি প্রেমের তমস্থক। —ঐ

১৩

তোরে বলি, ওরে নূপুর,
উনুর ঝুনুর না বাজিও পায়,
নিঃশব্দ হইয়া থাক,
আমি রাধার কুঞ্জে যাই।
ও প্রেমময়ি, রাই। —ঐ

১৪

চিত্তে ধৈর্য ধর, রাধে, প্রেম রেখ গোপনে,
প্রেম রেখ গোপনে, রাধে, প্রেম রেখ গোপনে।
যাই না চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রাধে
মিছা কেন বলগো তুমি,
জন্মে জন্মে আছি বাঁধা শ্রীচরণ কমলে।
রাধে গো, প্রেম রেখ গোপনে॥

স্নান করি বসি গো ধ্যানে,
মূলমন্ত্র জপি তোমার নাম ,
মন জানে প্রাণ জানে আমাব বিচ্ছেদ জানি।
চৈতন্যধৈর্য ধব বাধে (ধুয়া)। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটি ভাবগভীরতা এবং অনুভূতির সাত্ত্বিকতায় কোন বৈষ্ণবপদাবলী হইতেই হীন নহে—

১৫

গগনে গুঞ্জরে দেওয়ান, সই গো, কোথায় মদন মুরারী,
একেলা মন্দিরে রাধায়, প্রিয় মধুপুরী গো ,
শ্যাম বিনে প্রাণ বাঁচে না।
শূন্য হইল বৃন্দাবন সই, শূন্য সিংহাসন,
একেলা মন্দিরে রাধায় করতেছে রোদন,
শ্যাম বিনে প্রাণ বাঁচে না
শূন্য হইল বৃন্দাবন, সই, শূন্য তরুলতা ,
পশুপাখীর রব না শুনি না শুনি কৃষ্ণকথা ,
শ্যাম বিনে প্রাণ বাঁচে না
কাইল বলিয়া গেছে শ্যাম, সই, সেই কাইল আসিবে কবে ,
সেই কাইল আসবে বুঝি আমি রাধা পরাণ মইলে ,
শ্যাম বিনে প্রাণ বাঁচে না।
মথুরাতে নতুন রাজা হয়, সই, কুব্জা পাটেশ্বরী,
আমারে করিলেন হরি ব্রজের কাঙালিনী গো ,
শ্যাম বিনে প্রাণ বাঁচে না। —ত্রিপুরা

১৬

ত্রিভঙ্গ হইয়ে বাঁশীটি বাজাও বসিয়া কদম্বমূলে,
রাধা রাধা বলে রে প্রাণনাথ আসিব যমুনার জলে।
যমুনায় আসিবা পীরিতি করিব হইব তোমার দাসী,
শরাঘাতে বধেছ, প্রাণনাথ, বাজায়ে মোহন বাঁশী।

আগে যায় দুজনা, পিছে যায় দুজনা,

সকলের কানে রে সোনা,

কৃষ্ণের হাতে মোহন বাঁশী, রাধিকার বন্ধু সেই জনা,

আগে না জানিয়া, পিছু না বুঝিয়া,

যেজন পীরিতি করে,

তুষের আগুনে হৃদয় মাঝাবে

জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে।

এ সুখ সংসার সকলি ছাড়িলাম তোমার লাগি,

তুমি যদি ছাড়ি যাও, প্রাণনাথ, হইবা বধের ভাগী।

যমুনায় আসিয়া পীরিতি করিলাম, পীরিতির এত জ্বালা,

হাতে ধরে মাথায় লইলাম নিজ কলঙ্কের ডালা। —ত্রিপুরা

বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাস যে বলিয়াছেন, 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে'—নিম্নের পদটিতে তাহারই অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে—

১৭

আমি ঠেকলাম রূপের ফান্দে,—

গো সই, শ্যামচান্দের।

মদনেরি পঞ্চবাণে পঞ্চশর বিন্দে,

ধইরয না মানে চিত্তে যার লাগি কান্দে,—

গো সই শ্যামচান্দের॥

রাধা রাধা বৈলেগো বাঁশী বাজায় আমার বৌন্ধে,

কৃষ্ণকলঙ্কিনী বৈলে লোটায় আমার নন্দে,—

গো সই, শ্যামচান্দের।

পীরিতের উলটা গো রীতি মন প্রাণ কান্দে,

অভয় বলে মনোমোহিনী, রূপের লাগি কান্দে—

গো সই, শ্যামচান্দের॥ —ঢাকা

এখানে নন্দে অর্থ ননদে।

১৮

রূপসাগরে ডুব্‌ল নয়ন, উপায় কি বল না।

ঘরের জ্বালা কাল ননদী দেয় সদা যাতনা।

কাঁচাসোনা নীলবরণ, রমণীর মন করে হরণ,
মন চলে না গৃহে যেতে—উপায় কি বল না।
কালিন্দী যমুনার ঘাটে, রূপসী সব দেখলাম তাতে,
কাখের কলসী ভূমে থুইয়ে, মন চলে না গৃহে যেইতে
উপায় কি বল না। —ঐ

শ্রীরাধিকা গুরুজনের মধ্যে বসিয়া আছেন, সেখানে কৃষ্ণের বাঁশী শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, কৃষ্ণ রাধা রাধা বলিয়া ডাকিতেছেন, একদিকে লজ্জা, আর একদিকে আনন্দ শ্রীরাধার চিত্ত অধিকার করিল। নিরক্ষর পল্লী কবির রচনায় এই অনুভূতির নিবিড়তা বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইতে পারে।

১৯

ওরে, বাঁশী বাজ ধীরে ধীরে,
এত কেন গভীর গরজ তোমার।
গভীর রবে গৃহে জাগে কাল ননদী আমার!
গভীর গরজ সম্বর, ক্ষণেক ধৈরয ধর,
এলাম, বিলম্ব নাই আর।
কৃষ্ণ অধর-সুধাপানে, গৌরব বেড়েছে মনে,
উন্মত্ত আছ গানে, না কর বিচার।
বসি গুরুজন মাঝে, বাজ বাঁশী, মরি লাজে,
নাম ধরে বেজ নারে আর। —ঐ

২০

নিদাগাতে দাগ লাগাইল প্রাণ-বঁধু কালিয়া
আরে, প্রেমজ্বালায় প্রাণ যায়,
বল্ সজনী, প্রাণ-সজনী বংশীর ধ্বনি শুনা যায়,
ওগো, কদম্বেরি ডালে বংশী বাজায় শ্যামরায়।
হাইটা যাইতে পাড়ার লোকে যত মন্দ বলে যায়,
(ও প্রাণ-সই প্রাণ-সই গো)।
ওগো লোকের মন্দ পুষ্প-চন্দন—
অলঙ্কার পরেছি গায়। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটি লৌকিক প্রেম-সঙ্গীত বলিয়াও গৃহীত হইতে পারে, কালিয়া এবং রাধা নাম দুইটি এখানে অবান্তর মাত্র।

২১

প্রাণবঁধু কালিয়া—
ও বঁধুরে, আমি অতি রাঙ্গা রে পতি—কদম্বেরি ফুল,
তুমি নি রাখিবা বঁধু রাধার জাতিকুল।
ও বঁধু রে, আকাশেতে ওঠে যে তারা আভে যায় ঘেরিয়া,
যাইবার কালে নিঠুর, বঁধু, না চাহিলা ফিরিয়া (সুজন বঁধু)। —ঐ

২২

দেহ প্রাণ সঁপিলাম গো যার লাগি ও বঁধুবে।
পদর উপর পদ থুইয়া, কদম্ব হেলান দিয়া,
বাজাও বাঁশী রাধাব নামটি লইযা রে।
ঝাড়িয়া মাথারই চুল, খোঁপায় দিতাম চম্পা ফুল,
খোঁপার উপর ভ্রমবা গুঞ্জবে।
গোকুলের যত নারী সবই তোমার আজ্ঞাকারী,
বঁধু, তোমার লাগি আমার চিত্ত বাঁধা রে। —ঐ

২৩

সময় ছাড়িয়া রইলা রে শ্যাম গুণমণি,
আমি পাড়ায় পাড়ায় ঘুইরা ফিরি,—হইয়াছি পাগলিনী রে।
পুরুষ ভ্রমর জাতি, আগে ত না জানি,
প্রেম কইবে ছেইড়ে গেল কইরে কলঙ্কিসী রে।
সোহাগে সোহাগে প্রেম শিখাইয়াছি আমি,
এত কষ্ট দিবা বইলে আগে ত না জানি রে। —ঐ

২৪

ওগো, কালাব পিরীতে কুলমান হারাইলাম সই,
আর যাব কই!
না জাইনে কঠিনেব সনে কেন প্রাণ সঁপিলাম,
আর যাব কই!

যার জন্য পাগলী হইলেম সে বা কই আর আমি কই,
পান খাইয়া চুণে মইলেম,—মনে ছিল কাঁচা দই ! —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত পদটির মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর বাসক-শয্যার সুর শুনিতে পাওয়া যাইবে।

২৫

প্রাণসখি, বৃন্দে গো, প্রাণবল্লভ রইল কই গো !
না হেরিয়ে কালরূপ কিসে বাঁচে প্রাণ, সই গো !
সাজায়ে বাসর শয্যা, তা'তে পেলেম বড লজ্জা গো,
বনফুলের মালা গেঁথে দিলাম শ্যামেব গলে কই গো।
সারানিশি যায় বিফলে,
আমি ভাস্‌লাম কেবল নয়নজলে গো ,
(ও গো) আমি বিনা জলে চন্দন ঘ'ষে,
দিলাম শ্যামের পদে কই গো ? —ঐ

২৬

সোনা বন্ধু ও, তুমি বই আব কে আছে সংসারে ও ॥
এ ছার জীবনের আশা, আমায় কবলে নৈবাশা
আব কি অমন জনম দিবা মোরে, ও বন্ধো ॥
ও বন্ধু ও ! এ তব মস্‌জিদ কোরাণে, কুলুবিল মমিনানে,
আবশেলিল্লাহ পবে ও,
আসিয়া মানুষেব সঙ্গে, নানান রঙ্গের খেলা করে
এখন পাইনা তোরে মম কল্প পুবে, ও বন্ধো ॥
ও বন্ধু ও। একদিন রাত্রে কুঁঞ্জে এসে তুই একাসনে
হস্ত দিলা মাথাব পবে ও
ছাডবে না ছাডবে না বলে, কত আশা দিয়াছিলে
এখন সে সব কথা নাই তোমার অন্তরে, ও বন্ধো ॥
ও বন্ধু ও। দেখেচি এই ব্রজপুরে, ধেনু বৎস মাঠে চরে,
গাভী যখন যায় চলে দূরে ও,
বৎস যখন হাম্বা করে, গাভী আয় গো ত্বরা কবে
সেরূপ আমি আহাদ পড্যাছি তোর দূরে, ও বন্ধো ॥ —ঐ

২৭

কথা শুনে জীবন জুড়াই,
শোন্ গো, ধনী, বিনোদিনী রাই।
তুমি যদি উপেক্ষিলে রাই ধনী গো,
আমি কোথা গেলে স্থান পাই॥
তোমার কারণে, রাই, নন্দের বাধা মাথে বই,
বনে যেয়ে রাখাল রাজা হই,
বনে যেয়ে ধেনু রাখি, রাই ধনী গো,
বাঁশীতে তোমার গুণ গাই॥
বাঁশীদ্বারা নাম জপি, আত্মা মনপ্রাণ সঁপি,
তোমার চরণে দিয়া রাই,
তুমি দয়া না করিলে রাই ধনী গো,
আমার ত্রিভুবনে স্থান নাই।
ধড়া চূড়া বাঁশী দিলেম, খত সম্বন্ধে খাতক হলেম,
তবু দয়া হল না গো রাই,
তব চরণে ধরিয়া বলি গো, রাই ধনী,
আমার এমন বান্ধব ভবে নাই॥ —ঐ

পূর্বেই বলিয়াছি, বৈষ্ণব রসশাস্ত্র অনুযায়ী রাধাকৃষ্ণ প্রণয়লীলার বিভিন্ন বিভাগ নির্দেশ করা হইয়াছে, পল্লী কবিগণ সেই সুনির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ রচনা করেন নাই। তাঁহারা স্বাধীনভাবেই এই প্রেমলীলা আস্বাদন করিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহাদের অনুভূতি যেমন অকৃত্রিম, তেমনই সুনিবিড়।

তিন

বর্ণনা-মূলক সঙ্গীত

বারমাস্যা

বাংলার প্রেম-সঙ্গীতকে সাধারণতঃ দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়, ভাবমূলক প্রেম-সঙ্গীত এবং বর্ণনামূলক প্রেম-সঙ্গীত। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিভিন্ন অঞ্চলের ভাব-মূলক প্রেম-সঙ্গীত উদ্ধৃত হইয়াছে, বর্তমান অধ্যায়ে কেবলমাত্র বর্ণনামূলক প্রেম-সঙ্গীতের উল্লেখ করা যাইবে। বর্ণনামূলক প্রেম-সঙ্গীত সাধারণতঃ বারমাসী গান বা বারমাস্যা নামে প্রচলিত।

বারমাস্যা বা বারমাসী গান সম্পর্কে ইতিপূর্বে যে কিছু আলোচনা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ডক্টর শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য প্রণীত 'ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা' গ্রন্থ (কলিকাতা, ১৯৫৯) এবং একজন বিদেশীয় পণ্ডিত ডক্টর ডুসান জ্‌বাবিতেল লিখিত 'The Development of the Baromasi in the Bengali literature' (*Archiv Orientani* 29, 1961 pp. 582-619) প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নাম হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, 'ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা'র মধ্যে কেবলমাত্র বাংলা দেশের প্রচলিত বারমাসীর বিষয়ই নহে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক-সাহিত্যে প্রচলিত বারমাসীরও আলোচনা এবং উদ্ধৃতি আছে। বিশেষতঃ সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গেও ইহার সম্পর্কের কথা তাহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে। ডক্টর ডুসান জ্‌বাবিতেল অসাধারণ অধ্যবসায়ের সঙ্গে বাংলার আঞ্চলিক ভাষায় অধিকার লাভ করিয়া এ দেশের লোক-সাহিত্যে বারমাসীর উৎপত্তি, ইহাতে তাহার ব্যবহার, বারমাসীর মৌলিক রূপ, শ্রেণীবিভাগ, বিষয়-বৈচিত্র্য, জীবন ও প্রকৃতি দর্শন, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বারমাসী, ইহাদের রূপ ও রীতি ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃত পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের আলোচনার একটি প্রধান ত্রুটি এই ছিল যে, তাঁহারা বিস্তৃততর উপকরণের সন্ধান পান নাই, কেবলমাত্র মুদ্রিত এবং প্রধান সাহিত্যিক বারমাসীর উপরই তাঁহাদের প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হইয়াছিল, কিন্তু এই পর্যন্ত যে সকল লৌকিক বারমাসী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা যেমন নগণ্য, বিষয়ের দিক দিয়াও তাহা তত বৈচিত্র্যপূর্ণ নহে।

বিয়ে যে বারমাসীগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই এখনও মুদ্রিত হয় নাই। সুতরাং বিস্তৃততর উপকরণের সাহায্য লাভ করিতে পারিলে তাহাদের সিদ্ধান্তগুলি যেমন নির্ভরযোগ্য হইতে পারিত, এই ক্ষেত্রে তাহা তেমন হইতে পারে নাই। তথাপি ডক্টর ডুসান জ্‌বাবিতেলের আলোচনার মধ্য দিয়া বাংলা লোক-সঙ্গীতের এই একটি বিশেষ বিষয় সম্পর্কে যে সুগভীর চিন্তা এবং তাহা প্রকাশ করিবার মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বাংলা লোক-সঙ্গীতের আলোচনায় একটি নূতন দিগন্ত উন্মোচন করিয়া দিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বারমাসীর অনুসন্ধান বিষয়ে ডক্টর শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যও যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাও উপেক্ষণীয় নহে। সমগ্র বৎসর বা বারমাস ব্যাপী পরিবর্তশীল প্রাকৃতিক পটভূমিকায় প্রধানতঃ প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকার মনোভাবের অভিব্যক্তিই বারমাসীর বর্ণনামূলক সঙ্গীতের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়। প্রেমে নৈরাশ্যের ভাবটিই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। সেইজন্য ইহা বিরহ-বিচ্ছেদের গান, তথাপি বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনা ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে বলিয়া ভাবমূলক প্রেম-সঙ্গীতের মত ইহাদের মধ্যে ভাব-গভীরতা নাই। ইহার চিত্র-প্রধান রচনা একান্ত সুগভীর ভাবকেন্দ্রিক নহে। বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতেই এই শ্রেণীর গান সংগৃহীত হইয়াছে।

বারমাসীর উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে ডক্টর ডুসান জ্‌বাবিতেল যাহা বলিয়াছেন, তাহা নির্ভরযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন, 'the Baromasi originated in folk-poetry , that owing to its intrinsic attractviness and its great popularity in Bengal, it found a place again and again in the classical literature, being, of course, always reshaped and remoulded by various poets according to their poetic aims, imagination and creative ability ; at the same time, however, it followed its own course of development in folk-poetry itself, being influenced in its turn by those forms and types creative in the sphere of art literature especially in Vaishnava poetry.'

বৎসরের বিভিন্ন মাস হইতেই বারমাস্যার সূচনা হইয়া থাকে, তবে অগ্রহায়ণ

এবং বৈশাখ মাসেই অধিক সংখ্যক বারমাসীর সূচনা হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত বারমাস্যা গানটি বৈশাখ মাসের বর্ণনা দিয়া আরম্ভ হইয়াছে—

নাথ, আমার ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে।
বৈশাখে বসন্ত জ্বালা, ছেড়ে গেল চিকন কালা,
আমরা নারী হই অবলা।
কেমন করে রইব ঘরে,
নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে॥
জ্যৈষ্ঠেতে যমুনার জলে, ডেকেছিলে রাধা বলে,
শাড়ীর না আঁচল ধরে,
কতই না কাঁদাত মোরে,
নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে॥
আষাঢ়ে দু' কূল জল, পদ্ম ভাসে টল মল,
হত যদি গাছের ফল
অভাগী আনত ঘরে।
নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে॥
শ্রাবণে হয় বরিষা, রাম ছাড়া হলেন সীতা,
আমার বাদী কে বা ছিল,
আমার পতি নিল হরে,
নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে॥
ভাদ্রে ভাবি দিবা নিশি, নয়নের নীরে ভাসি,
আমি নারী হই রূপসী,
কেমন করে রইব ঘরে।
নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে॥
আশ্বিনে আনন্দ মাসে বন্ধু রইল পরবাসে
আমি নারী হই অবলা,
কেমন করে রইব ঘরে।
নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে॥

কার্তিকে কালিকা পুজা, বাবুগণের রং তামাসা,
আমি নারী শূন্য ঘরে,
পতি নাহি পালঙ্কের উপরে।
নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে॥
অগ্রাণেতে নতুন ধান, ঘরে ঘোচাবে মান
কাল বেঁধেছি রবির ধান,
ষষ্ঠী রম্ভা ধারণ করে।
নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে॥
পৌষে পরমসুখী বন্ধু হলেন পরবাসী
আমার বাদী কেবা ছিল,
আমার পতি নিল হরে।
নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে॥
মাঘেতে মাঘ বসন্ত, ফুরাইল মনে ভ্রান্ত,
আমার কান্ত এলো না ঘরে
নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে॥
ফাল্গুনে ফাগুয়া খেলি, ডেকে ছিল রাধা বলি,
খাট পালঙ্ক ত্যজ্য করি,
কবে পতিকে আনবো ঘরে।
নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে॥
চৈত্রেতে চড়ক যাত্রা, ফুরাইল মনের ভ্রান্ত,
আমার কান্ত এলোনা ঘরে,
নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে॥ —মেদিনীপুর

নিম্নোদ্ধৃত বারমাস্যাটি ফাল্গুন মাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহা একটি সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম—

কত পাষাণ বাইন্ধ্যাছ পতিহি মোনেতে—
ফাগুন মাসে অধিক জ্বালা
চৈত্রে নারীর বরণ কালা (রে)

বৈশাখ মাস গেল কইন্যার ভাবিতে ভাবিতে,
কত পাষাণ বাইন্ধ্যাছ মনেতে।
জ্যৈষ্ঠ মাসে মিষ্টিফল
আষাঢ মাসে নয়া জল (রে)
শাবণ মাস গেল কইন্যার শয়নে স্বপনে,
কত পাষাণ বাইন্ধ্যাছ, পতিহি, মনেতে।
ভাদ্দব মাসে আউল্যা ক্যাশ,
আশ্বিন মাসে বর্ষার শ্যাষ (রে),
কার্তিক মাস গেল কইন্যার উঠিতে বসিতে
কত পাষাণ বাইন্ধ্যাছ, পতিহি, মনেতে।
অঘাণ মাসে হেমতি টান,
পৌষ মাসে শীতের বাণ (রে),
মাঘ মাস গেল কইন্যার দেখিতে দেখিতে,
কত পাষাণ বাইন্ধ্যাছ, পতিহি, মোনেতে। —কুচবিহার

৩

অঘান মাসে নতুন ধানা
পৌষমাসে নায়ের মালা (হে),
বঁধু, মাঘের শীত না সহে পরাণে।
কত পাষাণ বেঁধেছে বধূ হে,
ও বঁধু (পরাণে) মাঘের শীত না সহে পরাণে
ফাগুন মাসে দেহ কালা
চৈতমাসে প্রেম জ্বালা (হে),
বৈশাখ মাসে নানা ফুল ফোটে ফুলবনে (হে)
মাঘের শীত না সহে পরাণে।
জ্যৈষ্ঠ মাসে, মিষ্টি ফল হে,
আষাঢ় মাসে নতুন জল হে,
শ্রাবণ মাসে জলকেলি করে,
(কত) বঁধু সনে, বঁধু হে,
মাঘের শীত না সহে পরাণে।

ভাদ্দরেতে তালের পিঠা
আশ্বিনেতে শশা মিঠা
কার্তিক গেল, বঁধু বিনে রইব কেমনে
(হায় হায়)
কত পাষাণ বেঁধেছ বঁধু মনেতে। —ঐ

জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে নিম্নোদ্ধৃত বারমাস্যা গানটির আরম্ভ হইয়াছে। ইহাও সাধারণ নিয়মের একটি ব্যতিক্রম—

৪

জ্যৈষ্ঠ মাসে মিষ্ট ফল, আষাঢ় মাসের নূতন জল,
শ্রাবণ মাস কাটাইল নারীর নাইয়রে নাইয়রে,
আরে নাইয়রে।
তিন মাস গত অইল, কপ্তন সাধু না আসিল,
আস্‌লা, বন্ধু, রইলা কার মন্দিরে।
কত পাষাণ বান্‌ছরে সাধু বৈদেশে।
ভাদ্র মাসে আওলা কেশ, আশ্বিন মাসে বর্ষশেষ,
কার্তিক মাস কাটাইল নারী কাতরে কাতরে,
আরে কাতরে।
ছয় মাস গত অইল কপ্তন সাধু না আসিল
আস্‌লা, বন্ধু, রইলা কার মন্দিরে,
কত পাষাণ বান্‌ছরে সাধু বৈদেশে।
আগুন মাসে দাওয়া মারী, পৌষ মাসে শীত ভারী,
মাঘ মাস্যা শীত নারীর অন্তরে অন্তরে,
আরে অন্তরে।
নয় মাস গত হইল কপ্তন না আসিল,
আস্‌লা, বন্ধু, রইলা কার মন্দিরে?
কত পাষাণ বান্‌ছরে সাধু বৈদেশে।
ফাগুন মাসে দ্বিগুণ জ্বালা, চৈত্র মাসে শরীর কালা,
বৈশাখ মাসে অইল নারীর যৌবন উতালা,

বার মাস গত অইল রুপ্তন সাধু না আসিল,
আস্‌লা, বন্ধু, রইলা কার মন্দিরে।
কত পাষাণ বান্‌ছরে, সাধু, বৈদেশে। —মৈমনসিংহ

বারমাসের প্রকৃতি-বর্ণনায় অনেক সময় বাস্তব জগৎকে উপেক্ষা করা হয়, নতুবা নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটিতে পৌষ মাসে গৃহস্থদিগেরে নালিতা বা পাট চাষের জন্য এত ব্যস্ততা দেখা যাইবে কেন?

৫

পৌষ মাসেতে ভাই রে পুষ্প অন্ধকারী,
নাল্যার লাগ্যা গিরস্থেরা না লয় ঘর বাডী।
(দিশা) ও নিলকে, শরীল করলাম কাল রে ভাই
নাল্যা নিডাইতে।
মাঘনা মাসেতে, ভাই রে, ক্ষেতে নিলাম আল।
লাঙ্গল ভাঙ্গলাম জোয়াল ভাঙ্গলাম আরও
ভাঙ্গলাম ফাল।
ফাল্গুনা মাসেতে ভাইরে, ক্ষেতে নিলাম মই।
দূর্বায় ভেদাল্লায় কয় আমরা যাইবাম কই॥
চৈত্রি না মাসেতে, ভাই রে, রবির বড জ্বালা।
নাল্যা ক্ষেতে গোবব ফালতে শরীর করলাম কালা॥
বৈশাখ মাসেতে ভাই রে নাল্যার ফাললাম আলি।
নাল্যা বেচ্যা কিন্যা আনলাম ভাউজের লাগিল বালি।
নাল্যা যে নিডাও গো তুমি ধানত নিডাও না।
গোসা কর্‌্যা বইয়া থাকবাম ভাত বান্‌তাম না॥
জ্যৈষ্ঠি না মাসেতে, ভাই রে, নাল্যার আইল্যা পডে আগা।
নাল্যা বেচ্যা কিন্যা আনবাম্‌ ভাউজের লাগ্যা তাগা॥
আষাঢ মাসেতে, ভাই রে, গাঙ্গে নয়া পানি।
হউরীর আগে বউয়ে কয় নাইয়র যাইবাম্‌ আমি॥
শাউনা মাসেতে, ভাই রে, নাল্যার লইল ফুল।
নাল্যা বেচ্যা কিন্যা আনবাম্‌ ভাউজের লাগ্যা নাক ফুল॥

ভাদ্র না মাসেতে, ভাইরে, নাল্যার লইল আলি।
নাল্যা বেচ্যা কিন্যা আন্‌বাম ভাউজের লাগ্যা বালি॥
নাকফুল দিলা যেমন তেমন বালি দিলা ভাঙ্গা।
তোমার ঘাড়' ঠেঙ্গ্ থইয়া আমি বইবাম হাঙ্গা॥
আশ্বিন মাসেতে, ভাই রে, পাটের অইল ভাউ।
পাট বেচ্যা গিরস্থেরা কিন্‌ল দৌড়ের নাউ॥
কার্তিক মাসেতে, ভাই রে, বাড়ীর কর্‌লাম ঠাট।
ছয় দেউড়ী ছাড়াইয়া ভাউজে লার্‌ত যায় পাট॥
অগ্রাণ মাসেতে, ভাই রে, সবে নয়া খায়।
নাল্যা বেচার যত টাকা খাজনা ফাজনায় যায়॥
ও নিলাকে, শরীল কর্‌লাম কালা রে ভাই,
নাল্যা নিড়াইতে॥ —মৈমনসিংহ

উদ্ধৃত বারমাস্যাটির বিষয়-বস্তুর দিক হইতে অভিনবত্ব আছে। ইহা নালিতার বারমাস্যা, পাট গাছকে নালিতা বা নাল্যা বলে। ইহা পাট চাষীর পাঁচালী, প্রেম-মূলক সঙ্গীত, ইহাতে ভাউজ কিংবা ভ্রাতৃজায়ার প্রতি অবৈধ প্রণয়ের কথা আছে।

৬

চৈতে থর থর—বৈশাখে ঝড়পাথর।
জ্যৈষ্ঠে তারা ফুটে—তবে জানবি বর্ষা বটে॥
পৌষে গরমি, বৈশাখে জাড়া।
প্রথম আষাঢ়ে ভরবে গাড়া॥
বৎসরের প্রথম ঈশানে বয়।
সে বৎসর বর্ষা হবে খনায় কয়॥
চৈতে হেরানি, বৈশাখে জাড়া।
প্রথম জ্যৈষ্ঠে ভরবে গাড়া॥
ডাক বলে এ তিন বাণী, আষাঢ় শ্রাবণ নাইকো পানি॥

ডাক ও খনার বচনে বার মাসের জলবৃষ্টি গণনা করা হয়, তাহাকেও বারমাসী বলে, ইহা প্রেমমূলক বারমাসী নহে। তবে রচনা রীতিটি তাহারই অনুকল।

নিম্নোদ্ধৃত বারমাস্যাটিতে রাধার বিরহ বেদনা বর্ণিত হইয়াছে। সেইজন্য ইহা রাধার বারমাস্যা বলিয়া পরিচিত—

৭

মাঘেতে মাধবী করল মথুরায় গমন গো,
সখি, মথুরায় গমন—
দশ দিকে অন্ধকার আরো বিঁধে বন গো, ললিতে—
কে হরিয়া নিল মোদের প্রাণনাথে গো, ললিতে!
ফাগুনে দ্বিগুণ দুঃখ চিতে উঠে রোল,
গোলকে গোবিন্দ নাই কে সাজাবে দোল গো,
গো ললিতে—
কে হরিয়া নিল মোদের প্রাণনাথে গো ললিতে!
চৈতে চাঞ্চকী পাখি নিকুঞ্জ-মন্দিরে,
কুহুকুহু রব করে, পরাণ বিদরে, গো ললিতে।
বৈশাখে রোদের তাপ—অঙ্গ পুড়ে যায়,
তা হতে অধিক তাপ কান্ত ছেড়ে যায়, গো ললিতে—
কে হরিয়া নিল মোদের প্রাণনাথে, গো ললিতে!
জ্যৈষ্ঠেতে যমুনার জলে খেলত বনমালী,
শ্যাম অঙ্গে দিত জল অঞ্জলি অঞ্জলি, গো ললিতে—
কে হরিয়া নিল মোদের প্রাণনাথে, গো ললিতে!
আষাঢ়ে নূতন মেঘ করয়ে গর্জন,
দিনে দিনে বয়ে যায় পেলব যৌবন, গো ললিতে—
কে হরিয়া নিল মোদের প্রাণনাথে, গো ললিতে!
শ্রাবনে ঘন বরিষা না শুকাল চুল,
আমি নারী বিরহিণী হয়েছি আকুল, গো ললিতে—
কে হরিয়া নিল মোদের প্রাণনাথে, গো ললিতে।
ভাদরেতে ভরা নদী দুকুল পাথার,
আমি নারী বিরহিণী না জানি সাঁতার, গো ললিতে—
কে হরিয়া নিল মোদের প্রাণনাথে, গো ললিতে!

আশ্বিনে অম্বিকা-পূজা সর্বঘরে খুশি,
ঘরে ঘরে কান্ত নাই কাঁদছে দিবানিশি, গো ললিতে—
কে হরিয়া নিল মোদের প্রাণনাথে, গো ললিতে!
কার্তিকে কালিয়া দমন করেছিল হরি,
ফুটিল চম্পকলতা, কি রূপের মাধুরী, গো ললিতে—
কে হরিয়া নিল মোদের প্রাণনাথে গো ললিতে!
মাইসরে হিমের জনম তনু কাঁপে শীতে,
শয়ন-শয্যা ভিজে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে, গো ললিতে—
কে হরিয়া নিল মোদের প্রাণনাথে, গো ললিতে!
পৌষে পাঠালাম পত্র পঞ্চানন্দের বাড়ি,
পৌষ গেলে মাঘ আসবে, আসবে গুণমণি, গো ললিতে—
কে হরিয়া নিল মোদের প্রাণনাথে, গো ললিতে। —মেদিনীপুর

নিম্নোদ্ধৃত বারমাস্যাটি তোয়াবালী কন্যার বারমাস্যা বলিয়া পরিচিত, ইহার নায়িকার নাম তোয়াবালী বা তোয়া, সেইজন্য ইহাব এই নাম। ইহা মৈমনসিংহ জিলা হইতে ১৩৩৯ সালে সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল—

৮

কান্দন করে তোয়াবালী আউলায় মাথার কেশ,
এমন সুন্দর তোয়া সাধু পরদেশ।
বইয়ে গেল এ' মাস, আইল পরতম্ আগুন মাস,
তোয়ারে ফেলাইয়া যায়রে সাধু পরবাস॥
শ্বশুর আছে ভাসুর আছে তারা পঞ্চভাই,
তোয়ারি করম্ দোষে সাধু ঘরে নাই।
আইন্যানি দিতে পার তোয়ার নিজপতি,
এমন সুন্দরগো তোয়া সাধু পরদেশী।
আর কি আরে এইতো পোষ না মাসে,
পোবাল বায়রে বাও সেজ্বায়ায় নিদ্রা নাইরে।
নিদ্রা কাঞ্চাবাঁশের বাও, কাঞ্চাবাঁশের বাওনাবে উঠ্ল জলনি,
আর কতকাল রাখব যৈবন দিয়া মুখের বাণী।

আইন্যানি দিতে পার তোয়ার নিজ পতি,
এমন সুন্দর গো তোয়া সাধু পরদেশী।
ঐ না মাঘ না মাসে তরল পরে শীত,
শীতল পাডী বিছাইয়া কন্যা শিয়রে বালিস্।
শিতানে বালিস্ পৈতান বালিস টান দিয়া লইল কোলে,
আভাইগ্যা তোয়াবালী মুখে নাইসে বলে।
কান্দন করে তোয়াবালী আউলায় মাথার কেশ,
এমন সুন্দর তোয়া সাধু পরদেশ।
ঐত ফাল্‌গুন মাসে চতুর দিকে চাষা,
আম ডালে বইসে কন্যা কোকিল বানায় বাসা।
বাসা করে লণ্ড ভণ্ড পাইডা মারে ছাও,
যথায় গেল মোর সাধু তথায় চৈইল্যা যাও॥
আইন্যানি দিতে পার তোয়া নিজ পাতি,
এমন সুন্দব গো তোযা সাধু পরদেশী।
ঐনা চৈত্রিক মাসে গিরস্তে বুনে বীজ,
আনগো কটোয়া ভইরে খাইয়া মরি বিষ।
বিষ খাইরা মইরে গেলে জান্‌বে মা ও বাপে,
আব নি দিবে গো বিয়া ভিন্ পুরষের কাছে।
আপন দেশে পরগো বাসী যারগো নাগাল পাই,
খণ্ডরে কাডিয়া শির চণ্ডীবে বিলাই।
আন্যা নি দিতে পার তোয়া নিজ পতি,
এমন সুন্দর গো তোয়া সাধু পরদেশী।
আরকি আবে বৈশাখ মাসে গিরস্তে বাছে নাইল্যা,
কেহ খায় নাইল্যা শাগ্ তোয়ার অঙ্গ তিতা,
রান্ধিয়া বাডয়া শাগ্‌রে সন্তুরিলে থালে,
তরি সাধু নাইকো ঘবে শাগ্ খায়াব কারে।
কান্দন করে তোয়াবালী আউলায় মাথার কেশ,
এমন সুন্দর তোয়া সাধু পরদেশ।

ঐত জৈষ্ঠি না মাসে গাছে পাক্‌না আম,
থাক্‌ত যদি মর সাধু খাইত গাছের আম।
আম খাইত কাডাল খাইত, খাইত গাভীর দুধ,
তবে সে না নারীর আমার যাইত মনের দুখ্।
কান্দন করে তোয়াবালী আউলায় মাথার কেশ,
এমন সুন্দর গো তোয়া সাধু পরদেশ।
ঐত আষাঢ় মাসে গাঙ্গে নয়া পানি,
ডুম্বুরা দৌড়াইয়া যায় গুঞ্জরে বাগুনী।
গুঞ্জরে বাগুনী নারে অনেক পানি চড়ে,
তারে দেইখ্যা কানি বগা গাল ফুলাইয়া মরে।
আইন্যানি দিতে পার তোয়ার নিজপতি,
এমন সুন্দর গো তোয়া সাধু পরদেশী।
আইলরে শাউন্ মাস আউস ধানের পার,
বেউস্ গুয়ারের লাইগ্যা শইল করল্যাম কালা।
শইল করলাম কালা আরে পায়ের পাঙুনী করলাম শেষ,
মনে লয় ছাইডা যাইতাম ছাইডা রাজার দেশ।
আইন্যা মিলাইও হায়রে আমার নিজপতি,
সুন্দর কুমারের লাগ্যা বাইখ্যাছি যৌবতী।
ঐত ভাদর না মাসে গাছে পাক্‌না তাল,
নারী অইয়া যৈবন আমি রাখবাম কতকাল।
আইন্যানি দিতে পার তোয়ার নিজপতি,
এমন সুন্দর গো তোয়া সাধু পরদেশী।
ঐত আশ্বিন মাসে নব দুর্গার পূজা,
তোয়ায় মানসিক্ করে নব লক্ষ পাডা।
নব লক্ষ পাডা নারে লেখা জুকা নাই,
তোয়ারি করম দুষে সাধু ঘরে নাই।
কান্দন করে তোয়াবালী আউলায় মাথার কেশ,
এমন সুন্দর গো তোয়া সাধু পরদেশ।

এইত কার্তিক না মাসে গাছে পাকা গুয়া,
রইছে যেন মোর সাধু কামিনী পাইয়্যা।
কামিনী যে কাডে গুয়া মোর সাধু খায়,
হাসিতে খেলিতে তারা রজনী পবায়।
আর কি আরে বার মাসের তের চান লওরে গণিয়া,
এই গীত বানাইয়া দিল গায়েব জইধর বাইন্যা।
কান্দন করে তোযাবালী আউলায় মাথার কেশ,
এমন সুন্দব গো তোয়া সাধু পরদেশ।
আইন্যানি দিতে পাব তোযাব নিজ পতি,
এমন সুন্দব গো তোয়া সাধু পর দেশী॥ —মৈমনসিংহ

নিম্নোদ্ধৃত বারমাস্যটি নীলাব বারমাস্যা নামে পরিচিত, ইহার নায়িকার নাম নীলা—

নীলা, ও সুন্দব বে, ও আমাব নীলা নুতুন করোল বে।
তুমি ধোপ-কাপড়ে লাগাইছো কালির মৈলাম রে॥
এ না কালির মৈলাম বে ও মোব সাধু সাবানে উঠাবো রে।
আমার মনেব কালি না ওঠে জনমে রে॥
ঝাড়েব বাঁশ কাটিয়া রে, ও মোর, নীলা, সাজালাম বাঙ্গালা রে।
আমাব দাডী-মাল্লা বস্যা ন্যায দরমা বে॥
সীতাপাটি বেচ্যা রে ও মোব সাধু দাডী-মাল্লারে দেবো রে।
তুমি আরো ছযমাস রহিবা ও আমাব ঘরে॥
ঝাড়েব বাঁশ কাটিয়া রে ও মোর, নীলা, সাজালাম বাঙ্গালা রে,।
আমাব দাডী-মাল্লা বস্যা ন্যায় দরমা রে॥
হাতের বাজু বেচ্যা বে ও মোর, সাধু, দাডী-মাল্লারে দেবো রে।
তুমি আবো ছযমাস রহিবা ও আমার ঘরে॥
পাতাজলে নাম্যা রে, ও মোব নীলা, পাতা মাঞ্জন করে রে।
আমার মনেব কালি না গেল জনমে রে॥
হাটুজলে নামিযা বে, ও মোর নীলা, হাঁটু মাঞ্জন করে রে।
আমাব নীলাব পরাণ না নেয় ঘব-বাডী রে॥

বুকজলে নামিয়া রে, ও মোর নীলা, বুক মাঞ্জন করে রে।
আমার নীলার পরাণ না নেয় ঘর-বাড়ী রে ॥
থুথুজলে নামিয়া রে আমার নীলা থুথু মাঞ্জন করে রে।
আমার নীলার পরাণ না নেয় ঘর-বাড়ী রে ॥
ও সাধু বলে রে—একেতে আশ্বিন মাসে নিশিভাগ রাতে।
নিশির শয়নে দেখি নীলা তুই বড় যুবতী রে।
ও সাধু বলে রে একেতে অগ্রাণমাসে মদনেরই বাড়ি।
তোমার সর্বাঙ্গে তুল্যা দেবো অষ্টালঙ্কার ॥
সাধু বলে রে—একেতে পৌষ মাসে রে দুগুণ পড়ে জার।
একেলা ঘুমাও নারী জোড-মন্দিরাব ঘর ॥
ও নীলা বলে রে—এমন নারী নহে আমরা ঘুমাইয়া ভুলি।
পর রে পুরুষ নিয়া খেলা নাহি করি ॥
ও সাধু বলে রে, খিল খাড্যা বাঁকমল দেবো পায়েতে পাসলী।
মাঞ্জাতে জিঞ্জিরা দেবো গলেতে হাঁসুলী ॥
পরিধান বসন দেবো কামরাঙ্গা সাড়ী।
দুই কাণে ঝুল-বিস্তার দেবো সোনার মদনকড়ি ॥
ও নীলা বলে রে—শাগুরীর দুর্লভ আমার সোয়ামীর পরাণ।
পর রে পুরুষ দেখি আমরা বাপ-ভাই-এর সমান ॥
ও নীলা বলে রে—একেতে মাঘমাসে গাছে গুয়া পাকা।
মোর সাধু আস্‌বে হ্যাশে কর্‌বো আমি খেলা ॥ —পাবনা

পরপুরুষের সকল প্রলোভনকে জয় করিয়া স্বামি প্রেমের পরীক্ষায় নীলা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। নিম্নোদ্ধৃত বারমাস্যাটি শান্তিব বারমাস্যা, ইহাব সঙ্গে মৈমনসিংহ গীতিকার মহুয়া পালার একটি প্রণয় দৃশ্যের সাদৃশ্য আছে।

১০

ইয়ত না কার্তিক মাসে, আরে শান্তি, ধানে ভরে ক্ষীর,
শান্তি কন্যার যৌবন দেখে আমার প্রাণটি না হয় স্থির।
স্থির কর সাউধের কুমার, আরে, শান্ত কর মন,
কাউল্‌কা জলেরে যাইতে আয়ে অইব দরশন ॥

সোনার বাটায় কাষ্ঠরে গিলা, আরে কুমার, রূপার বাটায় তেল,
ধীরে ধীরে শান্তি গো কন্যা, আরে জলের ঘাটে গেল।
জলভর যৈবতী কন্যা, আরে, জলে দিছ মন,
কাইল যে কইছ্‌ল্যাম কথা আছে নি স্মরণ।
আছে আছে সাউধের কুমার, কুমার আরে, আমার মনে লয়,
হায়রে, পর্‌থম্‌ বয়সেরি (গো) যৈবন সু স্বামীর ধন।
ইয় মাস বাড়াইলে শান্তি, শান্তি আরে, না পুরাইলে আশ,
নর রঙ্গ ছুরত (রে) লইয়া সাম্‌নে অগ্রাণ মাস।
অগ্রাণ না মাসেতে শান্তি দ্বিতীয়ার চান্দ,
দেখা দিয়ে রাখ গো শান্তি, আরে, নাগরের পরাণ।
অষুধ নয় সে জানিরে কুমার, কুমার আরে, মন্ত্র নয় সে জানি,
কি দিয়া রাখিবাম গো আমি নাগরের পরাণি ?
ইয় মাস বাড়াইলে শান্তি, শান্তি আরে, না পুরাইলে আশ।
পৌষ না মাসেতে শান্তি পুষব অন্ধকারী,
আন্ধার রাত্রিতে, শান্তি, (তোমার) যৈবন করবাম চুরি।
পারবে পারবে সাউধের কুমার, কুমার আরে, গায়ে আছে বল,
তোর গলায় কলসী বান্ধ্যা আরে জলে ডুব্যা মর।
আরে, দুয়ারে বান্ধিয়া রে রাখবাম্‌ গজমস্ত হস্তী,
সঙ্গেতে জাগন্তরে রাখবাম আরে নবলক্ষ দাসী।
আরে, পাড়িয়া মারিবাম্‌ লো আমি গজমস্ত হস্তী,
ডপাড়ে পলাইয়া যাইব, আরে, নবলক্ষ দাসী।
আরে, তুমি অইও গাঙ্গের জলগো, শান্তি আরে,
আমি আনবাম আড়ি,
সেই আড়ি গলায় গো বান্ধ্যা জলে ডুব্যা মরি।
চাইর পর রাত্রির মধ্যে যে চুরার নাগাল পাই,
কান্‌ডা কাটিয়া গো আমি চণ্ডিরে বুঝাই।
ইয় মাস বাড়াইলে শান্তি, শান্তি আরে, না পুয়াইলে আশ,
মাঘা না মাসেতে শান্তি, শান্তি আরে, দ্বিগুণ পরে শীত,
শীতল পাটী বিছাও আন্যা শিয়রের বালিশ।

শিতান বালিশ পৈতান্ বালিশ, হায়রে, বালিশ লইলাম বুকে,
হায়রে, আভাগ্যা দারুণ রে বালিশ, আরে, মুখে রাও না করে
ইয় মাস বাড়াইলে শাস্তি, শাস্তি আরে, না পুরাইলে আশ।
ফাল্গুন না মাসেতে শাস্তি রবির বড় জ্বালা,
আম ডাল ভরসা করে কুয়িলমে বাসা।
ডিম্ পার, বাচ্চারে তোল, তোল তুইলা ছাও,
বিধুকালে যথায় মরণ, আরে, তথায় চল্যা যাও।
ইয় মাস বাডাইলে শাস্তি, শাস্তি আরে, না পুরাইলে আশ।
চৈত্র না মাসেতে, কুমার, চাষায় বুনে বীজ,
আনত কডরায় ভইরা খাইয়া মরি বিষ।
আর, বিষ খাইয়া মরতাম আমি জানত বাপ মায়,
তবু না সপিব যৈবন ভিন্ন পুরুষ ঠায়।
ইয় মাস বাড়াইলে শাস্তি, শাস্তি আরে, না পুরাইলে আশ।
বৈশাখ না মাসেতে কুমার, কুমার আরে, নবীন নালিতা,
আরে, সকলেই যে তোলে শাক্ গো আমার আঙ্গিন থিত।
রান্ধিয়া বাড়িয়া শাক্ গো ডাল্যা লইলাম পাতে,
আপন পতি নাই গো গৃহে হুইদ করবাম কাতে।
ইয় মাস বাড়াইলে শাস্তি, শাস্তি আরে, না পুরাইলে আশ।
জ্যৈষ্ঠ না মাসেতে কুমার গাছে পাক্না আম,
আপন পতি নাইগো বাডীত খাইত গাছের আম।
আম খাইত কাডল্ খাইত, আরে, খাইত গাভীর দুধ,
জোড় মন্দির ঘর বইয়া, আরে, কৈত কৌতুক।
ইয় মাস বাড়াইলে শাস্তি, শাস্তি আরে, না পুরাইলে আশ।
আষাঢ় মাসেতে কুমার, কুমার আরে, গাঙ্গে নয়া পানি,
হায়রে, হাঁসা হাঁসি করে খেলা উজানয় আর ভাটী।
সাকল্য জীবন বে হাসি, আরো, বনের পঙ্খী হইয়া,
সঙ্গে উড় সঙ্গেরে পড আপন পতি লইয়া।
ইয় মাস বাড়াইলে শাস্তি, শাস্তি আরে, না পুরাইলে আশ।

শ্রাবণ না মাসেতে, কুমার, (আর) জলে ধানের পারা,
অর্বুলার ডাউকের গো রায়ে (আমি) শরীর কর্লাম সাড়া।
শরীর কর্লাম্ সাডা, নারে, পাঞ্জল করলাম শেষ ;
(হায়রে) এই অবধি ছাইডা গো যাইবাম্ (আরো)
চণ্ডী রাজার দেশ ;
ইয় মাস বাডাইলে শান্তি, শান্তি আরে, না পুরাইলে আশ।
ভাদ্র না মাসেতে কুমার, কুমার আরে, গাছে পাকনা তাল,
(হায়রে) নারী অইয়া যৈইবন গো আমি রাখলাম কত কাল।
কত কাল রাখিবাম্ গো যৈবন লোকেব বৈরী অইয়া।
ইয় মাস বাডাইলে শান্তি, শান্তি আরে, না পুবাইলে আশ।
আশ্বিন্ না মাসেতে শান্তি, শান্তি আরে, বছরের পরে শেষ,
বিদায় দাও বিদায় দাও, শান্তি, যাইগো আপন দেশ,
আরে, তুমি আইলা লক্ষ পুরুষ আমি কডার স্তিরি,
স্তিরি অইয়া পুরুষ বিদায় আমি কেমনে করি।
ডাইল দিলাম চাউল দিলাম রসুই করে খাও,
জোড মন্দির ঘর দিলাম আরে শুইয়া নিদ্রা যাও।
আরে, বারো মাসের তের কথা, কুমার আরে, লওরে তবে গণিয়া,
এই গান বানাইয়া রে দিছে আরে, জৈধর বানিয়া। —মৈমনসিংহ

১১

মাঘ না মাসেতে রাম রে বনবাসে যায়।
অভাগিনী রামের মাগো কান্দিয়া বেডায়॥
রাজা অইতা বাজ্য লইতা মনে ছিল সাধ।
কেকই মা পাষাণী অইয়া ঘটায় পরমাদ॥
আহা, পুত্র রামচন্দ্র কৌশল্যানন্দন।
কিরূপে রইলা বনে তোমরা তিন জন॥
ফাল্গুন মাসেতে রামরে মনে উঠে বোল।
গোকুলে গোবিন্দ নাই কে করিবে দোল॥
চৈত্রি না মাসেতে, রামরে, যুধিষ্ঠির ধরাণ।
কেমনে রইব ঘরে মায়ের পরাণ॥

বৈশাখ মাসেতে, রাম রে, বসি বৃক্ষতলে।
পঞ্চসুখে ধেনু মায়ে তুল্যা লইল্যা কোলে॥
এইত না মাসেতে, রাম রে, গাছে কচি পাতা।
অভাগিনী মায়ের তোমার মনে জাগে কথা॥
জ্যৈষ্ঠি না মাসেতে, রাম রে, গাছে পাকে আম।
কে মোরে আনিয়া দিব নবগুণ শ্যাম॥
যে আমারে আইন্যা দিব নবগুণ শ্যাম।
অযোধ্যার অর্ধেক রাজ্য তারে করবাম দান॥
আষাঢ় মাসেতে, রামরে, ঘন বরিষণ।
কাষ্ঠের কটরায় আছ তোমরা তিনজন॥
শ্রাবণ মাসেতে, রামরে, বৃষ্টি পড়ে ধারে।
পশুপক্ষী রোদন করে বস্যা তরুডালে॥
ভাদ্র না মাসেতে, রামরে, গাছে পাকে তাল।
কেমনে হাঁটিবা, রামরে, পায়ে ফুটব শাল॥
আশ্বিন মাসেতে, রামরে, দুর্গাপূজা দেশে।
অবশ্য আসিবা, রামরে, দুর্গারে পূজিতে॥
কার্তিক মাসেতে, রামরে, রাণীর চোখ হল অন্ধ।
যারে দেখে তারেই বলে আইস রামচন্দ্র॥
অগ্রাণ মাসেতে, রামরে, সবে নয়া খায়।
অভাগিনী রামের মাগো কান্দিয়া বেড়ায়॥
পৌষ মাসেতে, রামরে, পুষ্প অন্ধকার।
যামিনী লইয়া আইল রাম রঘুনাথ॥ —ঐ

সীতার বনবাসের দুঃখবর্ণনা করিয়া এই প্রকার অসংখ্য বারমাসী গান রচিত হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে প্রেমের কথা নাই সত্য, তবে যে পতিভক্তি এবং বেদনার কথা আছে, তাহা জন-মানসে ব্যাপক আবেদন সৃষ্টি করিয়া সার্থক হইয়াছে। নিম্নে আরও কয়েকটি গান উদ্ধৃত করা হইল।

১২

একদিন ভগ্নী নয় জনক-নন্দিনী।
কহিতে লাগিল যত বনের দুঃখের কাহিনী॥

জানকীর প্রতি জিজ্ঞাসিল তিনজন।
কি প্রকার প্রাণ, দিদি, বনে ছিলে তিন জন॥
সীতা বলে বনে যখন প্রথম প্রবেশ।
মন দিয়া শুন সবে আমাদের ক্লেশ॥
প্রথম মধু চৈত্র মাস কাননে গমন।
তপস্বীর বেশ হৈল ভাই দুই জন॥
মাথে জটাভাব দোহার বল্কল পবিধান।
অগ্রপথে যান প্রভু দূর্বাদল-শ্যাম॥
পশ্চাৎ লক্ষ্মণ যায় হস্তে ধনুঃশর।
প্রবেশ কবিলাম সব বনের ভিতব॥
বৈশাখ মাস হৈল বাড়িল দিন আর।
প্রথম হৈল রৌদ্র অতি খরতব॥
চলিতে না পারি দেখি কমললোচন।
বৃক্ষ নীচে বৈসে কান্দি দুঃখের কারণ॥ —রাজসাহী

এই বারমাস্যাটি অসম্পূর্ণ। পববর্তী বারমাস্যাটিতে রাম ও লক্ষণের দুঃখ-ভোগের কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে—

১৩

সাতে পাঁচে সখি মিলে বসিয়া বিরলে,
ও রাম বসিয়া নিরলে—
এক সীতার দুঃখের কথা কহেন ধীরে ধীরে।
প্রথম চৈতেতে রাম কাননে প্রবেশ,
ও রাম কাননে প্রবেশ—
শিরে জটা ধরেন রাম সন্ন্যাসীর বেশ।
গাছের ফুল গাছের ফল আনিলা লক্ষ্মণ,
সে ফল হইতে রাম করিলা বণ্টন।
আইলা বৈশাখ মাস জলন্ত অনল—
ও রাম জলন্ত অনল—
চলে যাইতে পুড়ে রামের চরণ কমল।
আচ্ছাদন দিতে রামের মস্তক-উপরে।

জ্যেষ্ঠেতে যতেক দুঃখ পাইলা কাননে,
আগো, সেই দুঃখের কথা ৮য়ে মনুষ্য-পরাণে।
আইলা আষাঢ মাস বরিষার সময়,
ও রাম বরিষার সময়—
ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী তুলে বাঁশরী সঞ্চয়।
গগনে বরষে জল—বরষে জলধব,
ভিজিতে ভিজিতে বাম যায় তরুতল।
শবাবনে দাও গো, লক্ষ্মণ, বাঁধিয়ে কুটিব,
ও রাম বাঁধিযে কুটির—
বামসীতা কুটির ভিতব, লক্ষ্মণ বাহিব।
লক্ষ্মণেব দুঃখ দেখি ধিক প্রাণ ফাটে—
ও রাম, ধিক প্রাণ ফাটে।
ধীরে ধীরে উঠে বাম গহন কাননে, গহন কাননে
ভাদরে হৃদয-জ্বালা সইতে নারি ঘবে,
ও বাম সইতে নারি ঘবে—
দারুণ কষ্টেব পালা—রক্ত বহে নীবে,
আচ্ছাদন দিতে রামের মস্তক উপবে।
আশ্বিনে অম্বিকা-পূজা এ তিন ভুবনে,
ও রাম, এ তিন ভুবনে ,—
সন্ধিসেবা করেন রাম গহন কাননে।
এক চিত্তে পূজেন রাম আতপ-চাল কলা,
এক চিত্তে পূজেন রাম সূর্য বংশ-বালা।
কার্তিকে কুটির ছাড়ি যান অন্য বনে,
ও বাম, যান অন্য বনে—
সারাদিন দেখা নাই ফলমূলের সনে।
সারাদিনেব পর ফল মিলে দুই চারি—
আগো, রামসীতা ফল খায়, না খায় লক্ষ্মণ,
সেদিন হইতে রঘুমণি রইলেন উপবাসে।

আইল অগ্রাণ মাস বাঁধিয়ে আপন,
ও রাম বাঁধিয়ে আপন—
নতুন অন্ন খেতে প্রভুর সাধ গেল মন।
পৌষে প্রলয় শীত ঘনায় হতাশ,
আগো হিমালয় হইতে এবার আইলা বাতাস ;
কাশী যাবো, গয়া যাবো, আর যাবো বৃন্দাবন,
আগো, যাবো বৃন্দাবন,
সকল তীর্থের ফল দুয়ারে তুলসী।
মাঘের মকর যাত্রা পঞ্চমীর তিথি,
ও রাম, পঞ্চমীর তিথি—
একচিত্তে পুজেন রাম দেবী সরস্বতী।
ফাল্গুনে দুঃখের কথা সইতে নারি ঘরে,
ও রাম, সইতে নারি ঘরে—
আগো, সীতাকীর্তি বারমাস্যা কইব বা কাহারে ॥ —মেদিনীপুর

নিম্নোদ্ধৃত বারমাস্যাটিতে অশোক বনে বন্দিনী সীতার বারোমাসের অন্তর্বেদনা ব্যক্ত হইয়াছে। তবে ইহাতে বারমাসের পরিবর্তে দশমাসের বর্ণনা শুনিতে পাওয়া যায়।

১৪

মাঘ মাসে যেন কুশাসন চিরে,
ফুটিল মাধবী বসন্ত ঘিরে, গো বসন্ত ঘিরে।
প্রাণ কাঁদে যেন না মানে চিতর—
একাকিনী মোরা রহিব কত।
অশোকের বনে কত কাঁদ সীতা,
শ্রীরাম বিনে গো শ্রীরাম বিনে ॥
ফাল্‌গুন মাসে ডাকে কুইলি,
হায় রাম, জয় রাম, শ্রীরাম বলি গো, শ্রীরাম বলি।
শ্রীরাম বলে আছি গো পড়ে,
এই ছিল দুর্দশা আমার কপালে।

অশোকের বনে কত কাঁদ সীতা,
শ্রীরাম বিনে গো শ্রীরাম বিনে ॥
চৈত্র কো মাসে চাতক পাখি,
আতঙ্ক হয়েছে চলনা দেখি।
জন্মিয়া জাহান কেন না মরল,
ভাবিতে শুনিতে পরাণ গেল গো, পরাণ গেল
অশোকের বনে কত কাঁদ সীতা,
শ্রীরাম বিনে গো শ্রীরাম বিনে ॥
বৈশাখ মাসে উঠিলা তাপ,
জানকীর শুধু না বাঁচে জয়।
হেরি ঘিরে অঙ্গে রয়েছে ঘাম,
মোর প্রাণনাথ গ্রীষ্মে হিম।
অশোকের বনে কত কাঁদ সীতা,
শ্রীরাম বিনে গো শ্রীরাম বিনে ॥
জ্যৈষ্ঠক মাসে গ্রীষ্মকো কালে,
আম কি পনস পাকিলা ডালে।
আম কি পনস মরিলা আসি,
কবে দেবেন, প্রভু খাইবেন বসি গো, খাইবেন বসি
অশোকের বনে কত কাঁদ সীতা,
শ্রীরাম বিনে গো শ্রীরাম বিনে ॥
আষাঢ় মাসে লইতন মেঘে,
কামিনীর মন আবার কান্তকে জাগে।
নবঘন মেঘে দেখিয়া নয়নে
শ্রীরামলক্ষ্মণে হইল মনে গো—হইল মনে।
অশোকের বনে কত কাঁদ সীতা,
শ্রীরাম বিনে গো শ্রীরাম বিনে ॥
শ্রাবণ মাসে সলিতা ধারা,
ঘন ঘন বৃষ্টি নাইক খরা।

আমার প্রতি নাথ হয়েছেন হারা,
সোনারি শরীর জীয়ন্তে মরা গো, জীয়ন্তে মরা।
অশোকের বনে কত কাঁদ সীতা,
শ্রীরাম বিনে গো শ্রীরাম বিনে॥
ভাদর মাসে পাকিলা তাল,
মোর প্রাণনাথে ঘটে না ফল।
মোর প্রাণনাথ থাকিতেন ঘরে—
নানা ফল দিতেন স্বর্ণ-থালে গো, স্বর্ণ-থালে।
অশোকের বনে কত কাঁদ সীতা,
শ্রীরাম বিনে গো শ্রীরাম বিনে॥
আশ্বিন মাসে অষ্টমী তিথি,
সাগর বেঁধে রাম পূজেন পার্বতী।
রাবণ বধে রাম হয়েছেন ধ্বজা,
বিভীষণে রাম করিবেন রাজা গো, করিবেন রাজা।
অশোকের বনে কত কাঁদ সীতা,
শ্রীরাম বিনে গো শ্রিরাম বিনে॥
কার্তিক মাসে ধুমধুমি বাজে,
রাম-রাবণের সংগ্রাম সাজে গো, সংগ্রাম সাজে।
কাতরে পড়িল বিক্রম দাস,
সীতার পূর্ণ হ'ল এই দশ মাস।
অশোকের বনে কত কাঁদ সীতা,
শ্রীরাম বিনে গো শ্রীরাম বিনে॥ —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত বারমাস্যাটির মধ্যে রামায়ণের মূল ঘটনাবলী সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। সীতার চরিত্র ভক্তিমতী ও পতিব্রতা নারীর পরিবর্তে অনেকটা নায়িকা সুলভ হইয়াছে। বারমাসীর সাধারণ বিরহিণী নায়িকার গুণই তাহার উপর আরোপ করা হইয়াছে বলিয়া কতকটা অনুভূত হইবে। কারণ, দেখা যায়, ভাদ্র মাসে রাম চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, যুবতী সীতা এই মাস কি করিয়া কাটাইবে।

১৫

বৈশাখ মাসেতে দিনরে নানা পুষ্পময়।
রামরাজা নিজপতি সর্বলোকে কয়॥
তাহাতে পাষণ্ড বিধি দৈবেরি কারণ।
ভবতেরে দিয়া রাজ্য রাম যায়রে বন॥
আগে যায়রে রামলক্ষ্মণ সঙ্গে যায়রে সীতা।
মাথায় হস্ত দিয়া কান্দে দশরথ পিতা॥
গণ্ডে হস্ত দিয়া কান্দে কৌশল্যা জননী।
দারুণ পেটে থইয়াছিলাম আমি রাম রঘুমণি
প্রাণেব অধিক রামরে দুর্লভ জানকী।
সঙ্গে লইয়া যাও লক্ষ্মণ ধানুকী॥
জ্যৈষ্ঠি না মাসেতে সীতা দেখিল সম্মুখে।
সুবর্ণের মৃগ এক পাশারে খেলিতে॥
মৃগ দেখি সীতা দেবী মনে অইল খুসী।
ধইবা দেও, প্রভু, বামরে চর্ম পাতি বসি॥
মৃগ বধিতে গেলেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
শূন্যগৃহ পাইয়া সীতা হরিল রাবণ॥
হস্তে ধবি সীতাদেবী রথেতে তুলিল।
রথে করি সীতাদেবী সমুদ্র পাব কবিল॥
সীতাবে থুইল নিয়া অশোকেবি বন।
সীতাব প্রহবী দিল দাকণ বাক্ষসগণ॥
লঙ্কাব বাবণ রাজা অতি দুরাচাব।
সুধাফল দিয়া সীতা রাখিছে ·॥
আষাঢ় মাসেতে দিনবে ঘন ববিষণ।
কই গেলা প্রভু বামরে দেবর লক্ষ্মণ॥
আহা, প্রভু, রঘুনাথরে, ত্রিজগতেব সাব।
পইড়াছি রাক্ষসেব হাতে করহ উদ্ধার॥
শ্রাবণ মাসেতে দিনরে মেঘেতে বিভোর।
পক্ষীগণে করে নৃত্য শুনিতে মধুর॥

ভাদ্র না মাসেতে রামরে ভাবনা যুক্ত অইল।
এমন যৌবন সীতা কেম্‌তে রইল ॥
আশ্বিন মাসেতে সীতা দেখিল স্বপন।
সমুদ্র লঙ্ঘিয়া আইসে পবন নন্দন ॥
শুন, প্রভু, নিজ বার্তা সব বিবরণ।
সারা নিশি পোহায় সীতা করিয়া ক্রন্দন ॥
পশু জন্ম ভাল জন্ম লইয়া উড়ে পতি।
অভাগিনী সীতার কর্মে এতেক দুর্গতি ॥
কার্তিক মাসেতে সীতার মন না হয় স্থির।
পতিপূজা না ঘটিল আমি অভাগীর ॥
যার পতি ঘরে আছে লক্ষকোটীর মূল।
রামচন্দ্র ঘরে নাহি কি করিব মুই ॥
অগ্রাণ মাসেতে দিনরে মনে জাগে তাপ।
দেখিয়া সমুদ্রে সীতা যুড়িছে বিলাপ ॥
বিলাপ করিয়া সীতা হইল কাতর।
বিনা প্রভু দরশনে না অইব শীতল ॥
পৌষ মাসেতে দিনরে পুষ্প অন্ধকারী।
শয়ন মন্দিরে একা নইতে না পারি ॥
রাক্ষস দেশেতে যে গো সদা পুড়ে হিয়া।
কতকাল থাকিব সীতা রামেরে ছাড়িয়া ॥
মাঘ মাসেতে সীতা দেখিল স্বপন।
রামরূপে বিষ্ণু আইসে রাক্ষসের যম ॥
ফাল্গুন মাসেতে দিনরে অহল্যার ধার।
সমুদ্র লঙ্ঘিয়া সীতা অইল উদ্ধার ॥
চৈত্রি না মাসেতে দেশে যুধিষ্ঠির ঘরণি
প্রভু দরশনে শান্ত অইল সীতার পরাণি ॥ —মৈমনসিংহ

মাঠে নিড়ানী বা টাঙ্গী দিতে দিতে সারিবদ্ধভাবে দাড়াইয়া দাঁড়াইয়া অথবা বসিয়া বসিয়া মাথাল মাথায় সমবেত চাষী 'পরিয়াত'গণ মিলিতকণ্ঠে এই গান গাহিতে থাকে। ইহার বিষয় রাধাকৃষ্ণ।

১৮

বসন্ত বৈশাখে রাধা ভাবিত সদায়,
কৃষ্ণের বিরহ প্রাণে সহন না যায়।
বলিয়া গেলরে কৃষ্ণ, আসিব ত্বরিত,
বিলম্ব দেখিয়া নিরীক্ষণ করি পথ।
জ্যৈষ্ঠের যন্ত্রণা যত সহন না যায়,
ঘিয়ের আনল ওঠে জলিয়া সদায়।
আষাঢে নবীন মেঘ ডাকে গরজিয়ে,
এত দুঃখ দিলি বিধি মোর মাথা খেয়ে।
শ্রাবণে অশেষ দুঃখ হেন নাহি মোব মনে,
এ ছার জীবন আমি রাখি কি কাবণে।
ভাদ্দরে ভরিল জলে যমুনার কূল,
তাহাতে উঠিল ফুটি কমলের ফুল।
ভ্রমর ভ্রমরী যেমন মধু করে পান,
এই মত ছাড়িয়া গেছেন শ্রীকৃষ্ণ আমায়।
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা প্রতি ঘরে ঘর,
আনন্দের অবধি নাই গোকুল নগর।
কার্তিকে করিলেন প্রভু বৃন্দাবনে রাস,
কৌতুকে বসেছেন কৃষ্ণ গোপী চারিপাশ,
অগ্রহায়ণে অশেষ দুঃখ হেন নাই মোব মনে,
অনুক্ষণ পড়ে মনে নন্দসুত ধনে।
পৌষমাসের পীড়া ওঠে বিপরীত,
প্রভুর বিরহ শীতে তনু হয় কম্পিত।
মাঘমাসে মোর মরণ হ'ত সেও ছিল মোর ভা[illegible]
শ্রীকৃষ্ণ ছাড়িয়া যবে মথুরাতে গেল।
ফাল্গুনে ফুটিল যত নানাবিধ ফুল,
ভ্রমর ভ্রমরী ডাকে একে সমতুল।
চৈত্রেতে চিন্তিত রাধা চিত্ত নাহি রে স্থির,
অম্বস্বর রামধন······পিরীত।

অক্রুর হরিয়া নিল রথে নারায়ণ,
ফিরিয়া না দিলে, কৃষ্ণ, আমায় দরশন।
শ্রীকৃষ্ণ পেয়েছিলাম অতি বড় সাধে,
ছাড়িয়া গেলরে কৃষ্ণ কোন অপরাধে। —যশোহর

নিম্নোদ্ধৃত বারমাস্যাটির রাধিকার বারমাসী। বৈষ্ণব প্রভাবিত রাঢ় অঞ্চলের বারমাসী প্রধানতঃ রাধিকারই বারমাসী। তাহা ছাড়াও বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব ইহার উপর আরও নানাদিক হইতে পড়িয়াছে বলিয়াই অনুভূত হইবে।

১৭

মাঘে মাধব কৈল মথুরা গমন।
শূন্য হইল দশদিগ্ শূন্য বৃন্দাবন ॥
তাহে মরমে গৌরী হৈ গেল দুখ।
গমন সময়ে না দেখিলাম চান্দমুখ ॥
উদ্ধব, কহ বারে বার।
মথুরা হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর ॥
ফাল্গুনে দুগুণ দুখ্ চিতে উঠে বহল।
গোকুলে গোবিন্দ নাহি কে করিবেক দোল ॥
আগর চন্দন চুয়া দিব কার অঙ্গে।
ফাগুয়া আবির খেলা খেলিব কার সঙ্গে ॥
ফাগু হেরি ফাগু খেলি ফাগু দিলাম তার গায়।
চতুর্দিকে ব্রজবধূ মধ্যে শ্যামরায় ॥
উদ্ধব, কহ বারে বার।
মথুরা হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর ॥
চৈত্রে চাতক পক্ষী নিভৃত মন্দিরে।
পিয় পিয় রব করি ডাকে উচ্চ স্বরে ॥
মোর পিয়া মধুপুরে অধিক সন্তাপ।
দুগুণ দগধে হিয়া শুনি কোকিল আলাপ ॥
উদ্ধব, কহ বারে বার।
মথুরা হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর ॥

জ্যৈষ্ঠে যমুনা জলে খেলে বনমালি,
শ্যাম অঙ্গে দিলাম জল অঙ্গুলি অঙ্গুলি।
চতুর্দিকে ব্রজবধূ মধ্যে দামোদর।
ফুটিল কমল যেন শোভিত ভ্রমব॥
উদ্ধব, কহ বাবে বাব।
মথুরা হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আব॥
আষাঢে অধিক দুখ বাডিল অন্তরে।
কালিযা বরণ দেখি নব জলধরে॥
নব জলধব দেখি ফাটে মোয় হিয।
না জানি কি কবি গেল শ্যাম বিনোদিয়া॥
উদ্ধব, কহ বাবে বাব।
মথুরা হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আব।
শ্রাবণে সপনে উদ্ধব শ্যামেব সঙ্গীত।
নিভৃত মন্দিবে বসি গাহিবে ...।
.. ... হিযা পাশে।
সেই বাত্রি শুনি আমি বিবল হুতাশে।
উদ্ধব, কহ বাবে বাব।
মথুব হইতে কৃষ্ণ না আসিবে আব।
... . যমুনা পথাব।
গতাযাত নাহি যাব [মথুবাব পাড]।
পাখী হযে উডে যাই পাখা না দেয বিধি।
মারিয়া প্রেমের শেল গেল গুণনিধি।
উদ্ধব, কহ বাবে বাব।
মথুবা হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আব।
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা প্রতি ঘবে ঘরে।
অম্বিকা উৎসব দিনে আসিবেন বৃন্দাবনে।
আজি কালি কবি দিবস গোঙাই হ
দিবস দিবস কবি মাসা।

মাসা মাসা করি বছর গোঙাই হরি
হরি হরি কি মোর জীবন আশা।
উদ্ধব, কহ বারে বার।
মথুরা হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর।
কার্তিকে করিলা হরি কালীয় দমন।
কুসুমের ফুল ও যে অঙ্গের ভূষণ।
কালিয়া কুসুম তুলি গলে বনমালা।
না জানি কি হয়ে গেল বিনোদিয়া গলা।
উদ্ধব, কহ বারে বার।
মথুরা হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর।
অগ্রাণে শুনেছি এক অপরূপ কথা।
মথুরাতে মাধব দণ্ডধারী ছাতা।
সেই সঙ্গে এক কথা শুনি ভাগ্য মানি।
শুনেছি কুবজা নাকি হইছে পাটের রাণী।
উদ্ধব, কহ বারে বার।
মথুরা হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর।
পৌষে লিখিলাম পত্র প্রিয়সখীর হাথে।
মথুরা যাইব বলি এলাম এই পথে।
ভাল হইল এলে, উদ্ধব, হোলো দরশন।
কি বোল বলিবেন মোরে শ্রীমধুসূদন।
উদ্ধব, কহ বারে বার।
মথুরা হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর। —বর্ধমান

নিম্নোদ্ধৃত বারমাসীটিও রাধিকার বারমাসী। মাঘ মাস হইতে ইহার সূচনা। ভাদ্র মাসে নদীর দুই কূল ভরিয়া গিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ সাঁতার জানেন না, কি করিয়া আসিবেন, রাধা তাহাই ভাবিতেছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ এখানে নিতান্ত লৌকিক চরিত্র, তাহার ভগবত্তা নাই।

১৮

মাঘে মাধবীলতা মথুরায় গমন।
দশদিক্ চেয়ে দ্যাখ শূন্য বৃন্দাবন।

আসবেন বলে গিয়েছেন কৃষ্ণ মথুরা নগরে।
আর না আসিল কৃষ্ণ রাধিকার মন্দিরে।
ফাগুনে দু'গুণ চুরি চিত্তে উঠে রোল।
প্রাণনাথ গোবিন্দ নাই, কে করিবে দোল।
চোতে চাতক পাখী ডাকে পিয়া পিয়া।
বিধাতা বঞ্চিল মোর হাতে নিধি দিয়া।
বৈশাখেতে শুন, প্রভু, অতি গুণমন্ত।
অভাগী রাধিকার প্রাণ দুঃখের নাহি অন্ত।
জ্যৈষ্ঠেতে যমুনার জল খেল্‌ছে বনমালী।
শ্যাম অঙ্গে দিয়া জল অঞ্জলি অঞ্জলি।
আষাঢ়ে নবীন হাওয়া এলরে ডাকিয়া।
এত দুঃখ দিলে, প্রাণনাথ, বিদেশে থাকিয়া।
শাওনেতে হেন প্রাণ হেন মোরে করে।
হেথায় জীবন রাখা কোন্‌ প্রয়োজনে।
ভাদরে ভরণ নদী দুকুল পাথার।
কেমনে আসিবে শ্যাম না জানে সাঁতার।
আশ্বিনে অম্বিকা পুজা প্রতি ঘরে ঘরে।
অভাগী রাধিকার প্রাণ আর কত সয়।
কার্তিকে কামিনী-মন বশ ধীরে ধীরে।
বসনেতে তুলে রাধে দু'নয়ন ঝরে।
আগুনে হেমন্ত ধান জগত প্রসাদি।
পৌষে প্রবল শীত সেই তো ছিল ভাল।
ঠাকুর কৃষ্ণ ছেড়ে কেন মথুরা রহিল॥ —রঙ্গপুর

২

মাঘেতে মাধব গেছে মথুরা নগর।
আহিরী রমণী মোরা ভাবি নিরন্তর॥
ফাল্গুনে ফাগুয়া খেলা দোলযাত্রা গণি
মনে ভাবি প্রাণনাথ আসিব এখনি॥

চৈত্রেতে চঞ্চলা মোরা থাকি সর্বক্ষণ।
বিষাদিত হইয়া মোদের ঝরে দুই নয়ন॥
বৈশাখে বিষম জ্বালা রবির কিরণ।
মনে ভাবি প্রাণনাথ আসিব এখন॥
জ্যৈষ্ঠেতে যতেক মোরা আহিরী রমণী।
একত্র বসিয়া কহি দুঃখের কাহিনী॥
আষাঢে আসিব বন্ধু হেন লয় মনে।
এক দৃষ্টি চাহিয়া থাকি বন্ধুব পথ পানে॥
শ্রাবণে পুণিমা নিশি ঝুলন খেলাতে।
মনে ভাবি প্রাণনাথ আসিব খেলিতে॥
ভাদ্রেতে ভরা নদী হইল সাঁতার।
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা এ তিন ভুবন।
মনে ভাবি প্রাণনাথ আসিব এখন॥
কার্তিকে কাননে বন্ধু চরাইত ধেনু।
গোবর্ধন তটে বসি বাজাইত বেণু॥
অগ্রানে অক্রুর মুনি আনিল সংবাদ।
বৃন্দাবনে আসবেন হরি দিনেক দুইদিন বাদ॥
পৌষের পুষিত শীত সহনে না যায়।
পীরিতি বিচ্ছেদ জ্বালা দ্বিগুণ জ্বালায়॥

—মৈমনসিংহ (সেরপুর)

২০

জ্যৈষ্ঠের সুমিষ্ট ফল, আষাঢ়ে বরিষার জল,
শ্রাবণ কাটাইল নারী সায়রে সায়রে।
কত পাষাণ বাইন্ধাছ প্রাণ বিদেশে॥ ধু॥
ভাদ্রের ভরা নদী, আশ্বিনে অম্বিকা পুজি,
কাতিক কাটাল নারী কাতরে কাতরে।
কত পাষাণ বাইন্ধাছ প্রাণ বিদেশে॥
অগ্রানে নয়া নতুন, পৌষে বাড়ে দ্বিগুণ,
মাঘের শীত লাগল নারীর অঙ্গেতে পিষ্ঠেতে।

কত পাষাণ বাইন্ধাছ প্রাণ বিদেশে ॥
চৈত্রেতে রবির জ্বালা, বৈশাখে শরীর কালা,

* * * *

কত পাষাণ বাইন্ধাছ প্রাণ বিদেশে ॥
এই সকল মাস গত হইল, দেশের বন্ধু দেশে আইল,
আসিয়া রহিল বন্ধু কার মন্দিরে।
কত পাষাণ বাইন্ধাছ প্রাণ বিদেশে ॥ —ঐ

উদ্ধৃত বারমাসীটির মধ্যে রাধার কথা নাই, সুতরাং ইহাকে লৌকিক বারমাসী বলিয়া উল্লেখ করা যায়। ইহাতে দেখা যায়, বন্ধু দেশে শেষ পর্যন্ত ফিরিয়া আসিয়াও নায়িকাকে উপেক্ষা করিয়া অন্য প্রণয়িণীর মন্দিরে গিয়াছেন।

২১

কুঞ্জে না আইল বনোয়ারী (ধু)।
চিত চঞ্চল ভেল ভারী ॥
আইল ফাল্গুন বসন্ত কাল,
ফুলে ফলে, সখি, ভরে গো ডাল,
আইল বসন্ত, মদন দুরন্ত,
কামিনীর মন চুরি ॥
কুঞ্জে না আইল বনোযারী (ধু)।
চৈতে চাতকী, বৈশাখে খরা,
জ্যৈষ্ঠেতে, সখি, হই গো মরা,
আনি শ্যামরায়, বাঁচাহো আমায়
একলা কুঞ্জে রইতে নারি ॥
জষ্টে যমুনা রহে গো বারি,
আষাঢ়েতে নব মেঘ সঞ্চারি,
নব মেঘ দেখি কালা পড়ে মনে,
ধৈরয ধরিতে নারি ॥
শ্রাবণ মাসেতে বরষা ভারি,
দুর দুর শবদে ডাকে দাররি,

আইল ভাদর, অতি সে কাতর,
জলে ঝাঁপ দিয়ে মরি ॥
আশ্বিনে অম্বিকা দেবীর পূজা,
কার্তিকে শারদ শশীর প্রভা,
শশীরে দেখিয়ে, আবেশ করিয়ে,
চিত নিবারিতে নারি ॥
অঘ্যাণ পৌষ দু'মাস দেখি,
নিশ্চয়ই পরাণ ত্যজিব সখি,
গাঁথি ফুলমালা, না আইল কালা,
মালা দেগা জলে ডারি ॥
মাঘে গঙ্গারাম কহে ঝুমুরি,
বার মাস গেল না আইল হরি,
হরি, আসি বলে গেল, পুনঃ নাহি এল,
প্রেমে কৈল দাগাদারি ॥
কুঞ্জে না আইল বনোয়ারী ! —পুরুলিয়া

আরও একটি ব্যাপকতর অর্থে বারমাসী শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাতে বারমাসী বলিতে বিস্তৃত জীবন-কাহিনী বুঝায়। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র পালাগানগুলিকে 'মলুয়ার বারমাসী', 'লীলার বারমাসী', 'কমলার বারমাসী' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। এই শ্রেণীর কতকগুলি বারমাসীও বাংলার লোক-সাহিত্যে প্রচলিত আছে। নিম্নে 'সীতার বারমাসীটি উদ্ধৃত করা হইল। ইহা প্রকৃতপক্ষে রামায়ণের সীতা চরিত্রের একটি সংক্ষিপ্তসার, ইহা কোন অজ্ঞাতনাম্নী মহিলা কবির রচনা। বিবাহ উপলক্ষে পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলের মহিলারা এই গান গাহিয়া থাকেন।

২২

সাত পাঁচ সখী বইসা গো জোড-মন্দির ঘরে।
এক সখী কহে কথা গো জিজ্ঞাসে সীতারে ॥
তুমি যে গেছলা গো সীতা এই বনবাসে।
কোন্ কোন্ দুঃখ পাইয়াছিলা গো কোন্ কোন্ মাসে ॥

আমার দুঃখের কথা গো কহিতে কাহিনী।
কহিতে কহিতে গো উঠে জলন্ত আগুনি ॥
জনম-দুঃখিনী সীতা গো দুঃখে গেল কাল।
রামের মত পতি পাইয়া গো দুঃখেরি কপাল ॥
এ কত দিনের কথা শুন সখীগণ।
চারি বইন আছি গো মোরা মিথিলা ভুবন ॥
আনন্দে কাটায়ে দিন গো শৈশবেরি বেলা।
মায়ের কোলেতে থাকি গো করি খেলাধূলা ॥
বাপের আছিল পণ গো আচরিত কথা।
যে ভাঙ্গিবে শিবের ধনু গো তারে দিবে সীতা ॥
কত রাজা আইল গো গেল সীমা-সংখ্যা নাই।
ধনুক ভাঙ্গিতে পারে গো সাধ্য কারো নাই ॥
একদিন রাত্রে আমি গো দেখিলাম স্বপন।
শিয়রে বসিয়ে প্রভু গো কমললোচন ॥
উঠ উঠ জানকী গো কত নিদ্রা যাও।
আমি রামচন্দ্রে ডাকি গো আঁখি মেলিয়া চাও।
বহুদূর দেশ হইতে গো আইলাম মিথিলা ভবন।
ভাঙ্গিব শিবের ধনু গো করিয়াছি পণ ॥
রজনী প্রভাত হইল গো ভাঙ্গিল স্বপন।
নয়নে লাগিয়া রৈল গো শ্যামল বরণ ॥
দূর্বাদল শ্যাম তনু গো সঙ্গেতে লক্ষ্মণ।
আজি বুঝি সত্য হইল গো নিশার স্বপন ॥
সঙ্গেতে আসিলা তবে তার গো বিশ্বামিত্র মুনি।
যজ্ঞস্থলে গেলা প্রভু গো রাম রঘুমণি ॥
মিথিলার লোকে দেখে গো বলে অতঃপর।
যেই জন দেখে বলে গো সীতার যোগ্য বর ॥
চন্দ্র সূর্য দুই ভাই গো নর-বেশ ধরি।
পণে উদ্ধারিতে বাপে গো আইল বুঝি পুরী ॥

আজানুলম্বিত বাহু গো মুনির ইঙ্গিতে।
ভাঙ্গিল শিবের ধনু গো যেন অলক্ষিতে ॥
জয় জয় শব্দ হইল গো মিথিলা ভবন।
নৃত্যগীত করে যত গো সহচরীগণ ॥
মন্দ বর ধন্দ লাগে গো কেউ বলে কালী।
কেউ বলে মেঘের গাযে গো শোভিছে বিজলী ॥
হাস্য পরিহাসে দেখ গো রজনী পোহায।
সীতারে লইযা প্রভু গো অযোধ্যাতে যায ॥
আর ত দিনেব কথা গো শুন মন দিযা।
এই মতে প্রভুব সঙ্গে গো অভাগিনীব বিযা ॥
অযোধ্যা নগবে আছি গো হবষিত মন।
শুইযা প্রভুর কোলে গো দেখিলাম স্বপন ॥
সিংহাসনে বসি প্রভু গো কমললোচন।
তাব পাছে দাঁড়াইল গো ভাই তিনজন ॥
চামব ঢুলায় কেউ গো শিবে ছত্র ধরে।
যথাবিধি তিন ভাই গো পদসেবা করে।
এর মধ্যে আব দিন গো দেখিলাম স্বপন।
বামচন্দ্র রাজা হয় গো অযোধ্যা ভুবন ॥
স্বপন সফল হইল গো কালি অধিবাস।
মন্থবা কুমন্ত্র দিযা গো ঘটায সর্বনাশ ॥
বামচন্দ্র বাজা হবে গো পইবা তিলক ছটা।
বিমাতা কৈকেযী তাবে গো পইবায বাকল জটা ॥
শবতের চান্দ যেন গো মেঘেতে ডুবিল।
সোনাব অযোধ্যা পুবী গো অন্ধকাব হইল।
বৈশাখ মাসেতে দিন রে অবণ্য প্রবেশ।
শিরে জটা প্রভু বামেব গো সন্ন্যাসীব বেশ।
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে দিন বে রবির বড জ্বালা।
হাঁটিয়া যাইতে প্রভুব গো বদন হৈল কালা ॥

পাষাণে ঠেকিল পদ গো রক্ত পড়ে ধারে।
দুঃখিত হইয়া প্রভু গো সীতার অঙ্গে বাতাস করে॥
পদ্মপত্রে জল আনে গো ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কতক্ষণ প্রভুর কোলে গো ছিলাম অচেতন॥
ঘুরিতে ঘুরিতে আইলাম গো আমরা তিনজন।
গোদাবরী নদীর কূল গো পঞ্চবটী বন॥
এইখানে রঘুনাথে গো কহিলা লক্ষ্মণে।
কুটির বান্ধিয়া গো বাস করি এইখানে॥
লতাপাতা দিয়া গো কুটির বান্ধিল লক্ষ্মণ।
কুটির মধ্যে মোরা গো থাকি দুইজন।
বৃক্ষতলে দাণ্ডাইল গো দেবর লক্ষণ।
ধনুহাতে দিবানিশি গো রহে জাগরণ॥
দেবরের গুণ আমি গো না পারি কহিতে।
অরণ্য ভাঙ্গিয়া গো ফল তুলি দেয় হাতে॥
রসাল বনের ফল গো পাতার কুটির পাইয়া।
অযোধ্যার রাজ্যপাট গো গেলাম ভুলিয়া॥
লক্ষ্মণ কানন হইতে গো আনি দেয় ফল।
পদ্মপত্রে আনি আমি গো তমসার জল॥
চরণ ধুয়াইয়া প্রভুর গো তৃণশয্যা পাতি।
মনের আনন্দে কাটি গো বনবাসের রাতি॥
কি করিবে রাজ্যসুখ গো রাজসিংহাসনে।
যত রাজ্যপাট আমার গো প্রভুর চরণে॥
ভোরেতে উঠিয়া মালা গো গাঁথি বনফুলে।
আনন্দে পরাই মালা গো প্রভু রামের গলে॥
সুন্দর দীঘল প্রভু গো বাহু উপাধান।
প্রত্যেক রজনী সীতার গো এমতি শয়ান॥
মৃগ ময়ূর আর গো বনের পশুপাখী।
সীতার সঙ্গের সঙ্গী গো তারা সীতার দুঃখে দুঃখী॥

শুকসারী ছিল দুই গো পঞ্চবটী বন।
বনে হইল প্রতিবেশী গো তারা দুইজন ॥
কভু বা শুনায় গান গো শুক আর সারী।
কাননে বেড়াই গো প্রভু রামের গলা ধরি ॥
কায়াব সঙ্গেতে যেমন গো ছায়ার ঘুরণ।
পর্বত কাননে ঘুবি বেড়াই গো তিনজন ॥
আব ত দিনেব কথা গো শুন সখীগণ।
কপালে আছিল সীতার গো এতেক বিডম্বন ॥
পোহাইল সুখের নিশি গো আমি অভাগিনী।
বঞ্চিযা প্রভুব সাথে গো সুখের বজনী ॥
গগনেতে হইল বেলা গো দণ্ড তিন চারি।
সে দিনেব দুঃখকথা গো কহিতে না পারি ॥
কুটিরেব বাইরে বসি গো আমরা দুইজন।
তরুতলে বসিযাছেন গো দেবব লক্ষ্মণ ॥
বসিতে বসিতে মোর গো ঘুমে ঢুলে আঁখি।
অলস নযনে গো প্রভুব চান্দমুখ দেখি ॥
উরু উপাধান গো প্রভু পাতিল তখন।
অঞ্চল পাতিযা গো আমি করিলাম শয়ন ॥
এমন সমযে এক গো সোনার হরিণী।
কুক্ষণে নজর পড়ে গো আমি অভাগিনী ॥
মেঘের অঙ্গেতে যেমন গো বিজলীব ঝলা।
চলিছে সোনার মৃগ গো বন কবি উজলা ॥
প্রভুরে কহিলাম আমি গো যুড়ি দুই পাণি।
এত যে হইবে গো নাহি জানি অভাগিনী ॥
এমন সুন্দব মৃগ গো কভু দেখি নাই।
সোনার হরিণ ধবি গো দেহ ত গোঁসাই ॥
শুক্‌না লতায় বান্ধি গো কুটিরের দ্বারে।
যাবৎ না মানে পোষ গো রাখিব ইহারে ॥

অযোধ্যাতে যাব মোরা গো এই মৃগ লইয়া।
বনের চিহ্ন রাখ গো প্রভু ইহারে ধরিয়া॥
হাতে ধনু উঠিলেন গো কমললোচন।
নাগপাশ অস্ত্র লইয়া গো করিয়া যতন॥
'হরিণ ধরিতে আমি গো চলিলাম বনে।
সীতারে রাখিও, লক্ষ্মণ, অতি সাবধানে॥'
এত বলি প্রভু রাম গো করিলা গমন।
কতক্ষণ পরে শুনি প্রভুর ক্রন্দন॥
'কোথায় লক্ষ্মণ, ভাই গো, শীঘ্র কইর‍্যা আইস।
রাক্ষসের হাতে মোর প্রাণ হইল নাশ।'
শুইয়াছিলাম আমি গো বসিলাম উঠিয়া।
আর বার কহে প্রভু গো লক্ষ্মণে ডাকিয়া॥
'শুন শুন দেবর গো আমার মাথা খাও।
প্রভুরে রক্ষিতে তুমি শীঘ্র কইর‍্যা যাও॥'
হাতেতে ধনুর শর গো চলিলা লক্ষ্মণ।
চিন্তায় আকুল প্রাণ গো পবন-গমন॥
একাকিনী বনমধ্যে গো আমি অভাগিনী।
ভুজঙ্গ চলিল যেমন গো এড়াইয়া মণি॥
এত দুঃখ ছিল সীতার গো যদি জানিতাম।
মৃগ ধরিবারে প্রভুর গো সঙ্গে যাইতাম॥
শিবশঙ্কর নাম গো লইয়া আচম্বিতে।
দাণ্ডাইল যোগী এক গো আসিয়া দ্বারেতে॥
দণ্ডকমণ্ডলুধারী গো অঙ্গে মাখা ছাই।
দুয়ারে আসিয়া বলে গো, 'ভিক্ষা কিছু চাই'॥
কি ভিক্ষা দিব গো আমি শুনহ গোঁসাঞি।
শূন্যগৃহে একাকিনী গো প্রভু সঙ্গে নাই॥
আজি যদি থাকতাম আমি গো অযোধ্যা ভবনে।
ধামায় মাপিয়া গো দিতাম রত্নাদি কাঞ্চনে॥

যোগী বলে, 'ধনে মোর নাহি প্রয়োজন।
ঘরে আছে বনের ফল গো তাই কর দান॥
ক্ষুধায় অবশ অঙ্গ গো আইলাম তব দ্বারে।
অতিথে না দিলে ভিক্ষা গো যাই তবে ফিরে॥
একটি বনেব ফল গো অঞ্চলে বান্ধিযা।
কুটিরেব বাহিব হইলাম গো ভাবিয়া চিন্তিযা॥
আমি কি গো জানি সখি কালসর্পবেশে।
এমনি করিয়া সীতায গো ছলিবে রাক্ষসে॥
প্রণাম কবিনু আমি গো পড়িযা ভূতলে।
উড়িযা গরুড পক্ষী গো সর্প যেমন গিলে॥
বথেতে তুলিল মোরে গো দুষ্ট লঙ্কাপতি।
দেবগণে ডাকি কহি গো দুঃখেব ভাবতী।
অঙ্গের আভবণ খুলি গো মাবিনু রাক্ষসে।
পর্বতে মারিলে ঢিল গো কিবা যায আসে॥
কতক্ষণ পবে গো আমি হইলাম অচেতন।
এখনো স্মবিলে কথা গো হাবাই চেতন॥
জাগিযা দেখিনু আমি গো আছি লঙ্কাপুবী।
আমাবে বেড়িযা পাশে গো বসি যত চেড়ী॥
অশোক কাননে গো বাস আমি অভাগিনী।
সেইদিন সাজিলাম গো যৌবনে যোগিনী॥
বস্ত্র-অলঙ্কাব ত্যজি গো নিদ্রা ও আহাব।
রাক্ষসেব গৃহে থাকি গো কবি অনাহার।
কান্দিযা নয়ন গলে গো মৈলান হইল কেশ।
দিবানিশি জাগে প্রভুর গো সন্ন্যাসীব বেশ॥
পাগলিনী হইল সীতা গো কিছু নাহি জ্ঞান।
প্রভুরে দেখিতে শুধু গো বাখিলাম প্রাণ॥
মরণে বাসনা নাই গো চবণ পাইবাব আশে।
সীতার চক্ষের জলে গো অশোক-বন ভাসে॥

আষাঢ় মাসেতে দিন রে ঘন বরিষণ।
তর্জিয়া গর্জিয়া আসে গো যত দেয়াগণ॥
মেঘে তত নাইকো পানি সীতার চক্ষে যত জল।
কান্দিয়া ভিজাই আমি গো অশোকের জল॥
বিষ খাই জলে ডুবি গো বুঝিতে না পারি।
সান্ত্বনা করিয়া রাখে গো সরমা সুন্দরী॥
শ্রাবণ মাসেতে আমি গো দেখিনু স্বপন।
হইল প্রভুর সঙ্গে গো সুগ্রীব-মিলন॥
ভাদ্রে স্বপন দেখি গো দিবসে জাগিয়া।
অশোকের ডালে পক্ষী গো বসিল উড়িয়া॥
পক্ষী নয় পক্ষী নয় গো প্রভু রামের চর।
বীর হনুমান বৈসে গো ডালের উপর॥
কত ভাবে কত মতে গো সীতারে বুঝায়।
প্রাণ ত বুঝে না গো সীতার হইল বড দায়॥
রামের অঙ্গুরী বীর গো দেখাইল মোরে।
অঙ্গুরী দেখিতে সীতার গো অশ্রু পড়ে ধারে॥
পাইল রামচন্দ্র গো সীতার বারতা।
তারপর শুন গো সীতার উদ্ধারের কথা॥
আশ্বিন মাসেতে সীতা গো দেখিল স্বপন।
বনেতে করেন প্রভু গো অকাল-বোধন॥
রাবণ বধিতে প্রভু গো পূজেন অম্বিকায়।
সীতার দুঃখের দিন গো এইরূপে যায়॥
কার্ত্তিক মাসেতে দিন রে ছোট হইল বেলা।
কান্দিয়া কাটাব দিন গো বসিয়া একেলা॥
নয়নের জলে মোর গো নদী বইয়া যায়।
সুখের বারতা আইস্যা গো সরমা জানায়॥
কান্দিতে কান্দিতে সীতার গো অস্থিচর্ম-সার।
এত দুঃখ ছিল বিধি গো কপালে আমার॥

অগ্রহায়ণ মাসেতে শুনি গো বৃক্ষ আর পাথরে।
দুরন্ত সাগর, আসি গো, বান্ধিল বানরে ॥
পৌষ মাসেতে দিন রে পৌষ অন্ধকার।
বানর-কটকে ঘিরে গো লঙ্কার চারিধার ॥
মাঘ মাসেতে আমি গো দেখিনু স্বপন।
রণে মরে ইন্দ্রজিত গো রাবণ-নন্দন ॥
স্বপন সফল হইল গো লঙ্কা ছারখার।
সাগরের কূলে শুনি গো রাক্ষসের হাহাকার ॥
ফাল্গুন মাসেতে আমি গো দেখিনু স্বপনে।
সবংশে মরিল রাবণ গো শ্রীরামের বাণে ॥
স্বপন সফল হইল গো দুঃখের দিন যায়।
বানর-কটক শুনি গো রামগুণ গায় ॥
চৈত্র মাসেতে সীতার গো দুঃখ হইল দূর।
পোহাইল দুঃখের নিশি গো আইল সুখ ভোর ॥
অন্ধেতে পাইল যেমন গো নয়নের মণি।
তেমতি দুঃখিনী সীতা গো পাইল রঘুমণি ॥ —মৈমনসিংহ

এই সুদীর্ঘ রচনার মধ্যেও বারমাসীর বিশেষ লক্ষণ অর্থাৎ বারমাসের দুঃখ-জীবনের যে বর্ণনা, তাহা আছে। বিস্তৃততর সকল বারমাসীর মধ্যেই নায়িকা জীবনের এই প্রকার বারমাসের দুঃখ-বর্ণনা শুনিতে পাওয়া যায়। সেইজন্যই এই শ্রেণীর রচনাকেও বারমাসীই বলা হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

কর্মসঙ্গীত

প্রত্যক্ষভাবে দৈহিক পরিশ্রম সাপেক্ষ কোন কর্মের মধ্যে লিপ্ত থাকিবার সময় কর্মের শ্রম লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে সমবেতভাবে যে গীত গাওয়া হয়, তাহাই কর্মসঙ্গীত, ইংরেজিতে ইহাকে work song বলা হয়, বাংলায় ইহাকে শ্রমসঙ্গীতও বলা যাইতে পারে। কারণ, দৈহিক কোনও পরিশ্রম করিবার কালীন শ্রম লাঘব করিবাব উদ্দেশ্যেই সাধারণতঃ ইহা গীত হয়। এই সঙ্গীতের একটি প্রধান ক্রটি এই যে, বহির্মুখী শারীর ক্রিয়া ইহার প্রধান লক্ষ্য থাকে; সেইজন্য ইহার মধ্যে ভাব-নিবিড়তা প্রকাশ পাইতে পারে না, ইহার ভাব নিতান্ত তরল। জীবনের কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ প্রেম কিংবা আধ্যাত্মিকতা ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইবার উপায় নাই। তাল (rhythm)-ই ইহার মুখ্য, তালের নিকট ইহার ভাব সর্বদাই বিসর্জিত হইয়া থাকে; সুতরাং কোন উচ্চ ভাব বর্জিত এই রচনা বিশেষ কোন সাহিত্য-গুণান্বিত হইতে পারে না। কর্মসঙ্গীতের মধ্যে সারিগানই প্রধান।

বাংলা লোক-সঙ্গীতের যে শাখা কর্মসঙ্গীত বা ইংরেজীতে work song বলিয়া পরিচিত, সারিগান তাহাবই অন্তর্ভুক্ত। সমাজ-জীবনে কর্মের যেমন বৈচিত্র্য দেখা যায়, কর্মসঙ্গীতেও তেমনি বৈচিত্র্য আছে। কর্মসংগীত কর্মের সহচর, ইহা কর্মের শ্রম লাঘবকারী, কর্মের প্রকৃতি অনুযায়ী ইহা একক, দ্বৈত এবং সমবেত সঙ্গীত হইতে পারে, কিন্তু সারি গান সর্বদাই সমবেত সঙ্গীত; সমবেত সঙ্গীতের সকল বৈশিষ্ট্যই ইহার বৈশিষ্ট্য।

ইতিপূর্বে বাংলা পল্লী-সঙ্গীতের দুইটি প্রধান বিভাগের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে—ভাটিয়ালি ও সারি। ভাটিয়ালির কথা বিশ্লেষণ করিয়া বলা হইয়াছে যে, ইহার সুর প্রথমেই আকস্মিক ভাবে অত্যন্ত চড়ায় পৌছাইয়া ধীরে এবং মন্থর গতিতে খাদের দিকে নামিতে থাকে। ইহার অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহা তাল বা rhythm-বিহীন একক সঙ্গীত; সারি গান সম্পূর্ণ ইহার বিপরীত। সাধারণ ভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, ইহার সুরের

মধ্যে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উচ্চারণ-গত একটি সমতা থাকে, বিশেষ উত্থান পতন থাকে না। তবে অনেক পদের প্রারম্ভেই একটি মাত্র শব্দ কথনও প্রথমে সমগ্র পদটি হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবেই পদাবলীর আখরের মত বা ইংরাজি yell এর মত উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হইয়া থাকে। ইহার ধর্ম ভাটিয়ালি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহা ছন্দ, তাল বা rhythm যুক্ত সমবেত সঙ্গীত, ইহা কদাচ একক গীত হয় না। ইংরেজীতে work song বলিতে যাহা বুঝায়, ইহা তাহারই অন্তর্গত বলিয়া ইহার সঙ্গে একটি বিশিষ্ট শারীর ক্রিয়া (physical action) অবিমিশ্র ভাবে জড়িত হইয়া থাকে। ভাটিয়ালি কোন কর্মের সঙ্গে জড়িত নহে, পূর্বেই বলিয়াছি, তাহা নিঃসঙ্গ অবসরের সঙ্গীত। কিন্তু সারি গান সঙ্গী সমভিব্যাহারে কর্মরত অবস্থার সমবেত সঙ্গীত। সেই জন্য ভাটিয়ালির সঙ্গে ইহার মৌলিক পার্থক্য স্বভাবতই লক্ষ্য করা যায়।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে একদিন নৌকা চালান একটি প্রধান কর্ম ছিল, সেই সূত্রে সারি গান প্রধানতঃ নৌকা চালনার সময় গীত হইত, সুতরাং অনেকে নৌকা চালাইবার সময় সমবেত কণ্ঠে যে সঙ্গীত গীত হয়, একমাত্র তাহাকেই সারি গান বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু নৌকা চালনা ছাড়াও যে সকল সঙ্গীতের মধ্যে সমবেত ভাবে একই প্রকৃতির শারীর ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, তাহাকেও সারি গান বলা যায়। তবে কর্মের প্রকৃতি অনুযায়ী সারি গানের বিভিন্ন নামকরণ হইয়াছে, যেমন, ছাত পেটার গান, ধান কাটার গান, পাট কাটার গান, তাঁত চালাইবার গান, ধান ভানিবার গান ইত্যাদি। ইহারাও প্রকৃতপক্ষে সারি গান, কিন্তু এখন সারি বলিতে কেবল নৌকা চালাইবার সময় যে সমবেত সঙ্গীত গীত হয়, তাহাই মনে করা হয়। সারি কথার অর্থ শ্রেণী, সারি শব্দটিও শ্রেণী হইতেই জাত। সেই জন্য যাহা এক সঙ্গে গাওয়া হয়, তাহাই সারি গান বলিয়া পরিচিত। কিন্তু যাহাই সমবেত কণ্ঠে গীত হয়, তাহাদের সকলই যে সারি গান, তাহাও নহে। এমন অনেক পল্লী-সঙ্গীত আছে, যাহা এক সঙ্গে গীত হয় সত্য, কিন্তু তাহাতে কোন শারীর ক্রিয়া প্রকাশ পায় না, তাহা সারি গান নহে। যেমন মেয়েলী বিবাহ-সঙ্গীত কিংবা বিবিধ ব্রত সঙ্গীত, এই সকল সঙ্গীত কোন শারীর ক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত নহে বলিয়া ইহাদের মধ্যে কোন তাল বা rhythm সৃষ্টি হইতে পারে না, সেই জন্য ইহারা অন্যান্য প্রকৃতির সঙ্গীত। সুতরাং সারি গানের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য

এই যে, ইহার সঙ্গে সুনির্দিষ্ট একটি শারীর ক্রিয়া অপরিহার্য ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিবে, তাহা ব্যতীত সারি গান হইতে পারে না। ভাটিয়ালি গানও সারি গানের মত নৌকার মাঝি গাহিয়া থাকে, কিন্তু যে মাঝি নৌকায় ভাটিয়ালি সুরে গান ধরে, তাহার হাতে কোনও কাজ থাকে না, সে এক হাতে বৈঠা কেবলমাত্র ধরিয়া রাখিয়া নদীর ভাটিতে নৌকা ছাড়িয়া দেয়, ভাটার টানে নৌকা আপনা হইতে ভাসিয়া চলে, মাঝির অঙ্গ সঞ্চালন দ্বারা বৈঠা চালাইতে হয় না। কিন্তু যে মাঝি সারি গান গাহে, তাহার বৈঠা তাহার আর কয়েকজন সহকর্মীর বৈঠার সঙ্গে তালে তালে জলের মধ্যে পড়ে, তারপর তাহাদের নিজেদের বাহুর শক্তিতে সেই জল ঠেলিয়া তাহারা নৌকা লইয়া অগ্রসর হয়, জল হইতে বৈঠা তুলিয়া আবার জলে ফেলিবার পূর্বে নৌকার বাতায় (edge) একবার করিয়া বৈঠা দিয়া সজোরে আঘাত করে, তাহাতে তাল বা rhythm রক্ষা পায়। সারি গানে এই ভাবে কোন না কোন উপায়ে তাল রক্ষা করিবার আবশ্যক হয়। ভাটিয়ালিতে এই তাল নাই, সুতরাং তাহা রক্ষা করিবারও কোনও দায়িত্ব নাই।

নৌকার মাঝির বৈঠা বাহিবার কিংবা দাড় টানিবার কায ব্যতীত সমবেত কণ্ঠে গীত যে কোন সঙ্গীত প্রাচীন কাল হইতেই সারি গান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া আসিতেছে, যেমন খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি বিজয় গুপ্ত লিখিয়াছেন—

কুহু কুহু করিয়া কোকিল গায় সারি।
চারিদিকে বেড়িয়া মদন করে ধাড়ী॥ —মনসা-মঙ্গল

ইহার পূর্বে বাংলা সাহিত্যে এই শব্দটির এই অর্থে ব্যবহৃত হইবার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' এই অর্থে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয় নাই। তৎপূর্বে 'বৌদ্ধগান ও দোহা'য় শব্দটি একবার পাওয়া যায় সত্য, যেমন—

আলি কালি বেনি সারি সুনিয়া।
গঅবর সমরস সান্ধি গুণিয়া॥

অর্থাৎ আলি কালি অর্থাৎ স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ এই দুইটিকে বীণার ছড়ি বা ছড জানিলাম।

এখানে সারি অর্থ ছড বলিয়াই মনে হইতেছে। সারি গানের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে গানের সঙ্গে সম্পর্ক এবং একাধিক বিষয়ের উল্লেখ হইতে ইহাতে সারি গানকেও লক্ষ্য করা হইতে পারে।

তবে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গল রচনাতেই ইহার এই অর্থে সুস্পষ্টভাবে সর্বপ্রথম উল্লেখ দেখা যায়।

মনসা-মঙ্গলের কবি বিপ্রদাস পিপ্‌লাইও লিখিয়াছেন, চাঁদ সদাগর যখন বাণিজ্য যাত্রা করিয়াছেন, তখন—

পুজিল বেতাই চণ্ডী চাঁদ দণ্ডধর।
হরষিতে সারি গায় নায়ের নফর ॥

বিপ্রদাস পিপ্‌লাই খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, যদি তাহাই সত্য হয়, তবে নৌকা বাইচের গান কথার ব্যবহার বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম। কিন্তু বিপ্রদাসের এই রচনা আধুনিক।

ক্রমে মধ্যযুগ হইতেই সারিগান মাঝিদের গানরূপেই পরিচিত হইল। যেমন খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর কবি দ্বিজবংশী দাস লিখিয়াছেন—

চৌদ্দ ডিঙ্গা বাইয়া যায়,
পাইক সবে সারি গায়। —মনসা-মঙ্গল

সমবেত কর্মসঙ্গীত (work song) মাত্রই সারিগান হইলেও কালক্রমে এই শব্দটির অর্থ সঙ্কুচিত (contraction) হইয়া কেবল মাত্র নৌকার দাঁড় কিংবা বৈঠা টানিবার সময় গেয় সমবেত সঙ্গীতকেই সারিগান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। আমরা এখানে ব্যাপক অর্থেই শব্দটি ব্যবহার করিব।

সারিগানের সঙ্গে নৌকা এবং নদনদী বিল হাওরের সম্পর্ক আছে বলিয়াই পূর্ব এবং নিম্নবঙ্গে ভাটি ও জলাভূমি অঞ্চলের মধ্যে ইহা সীমাবদ্ধ। মধ্যযুগে বাংলার ইতিহাসে যে বারভূইঞার উল্লেখ পাওয়া যায়, তাঁহাদের অধিকাংশই পূর্ব ও নিম্নবঙ্গে স্বাধীন ভাবে নৌবল রক্ষা করিতেন। যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের যে এক শক্তিশালী নৌবাহিনী ছিল, তাহা ইতিহাস হইতেই জানিতে পারা যায়। এই প্রকার চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র, বিক্রমপুরের চাঁদ রায় এবং কেদার রায়, কিশোরগঞ্জের ঈশা খাঁ মসনদ আলি, সুসঙ্গের রাজা রঘু ইত্যাদি প্রত্যেকেরই নৌবহর ছিল। দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের সেনাপতি ইস্‌লাম খাঁ যখন মুঙ্গের হইতে বাংলা সুবার রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত করিয়া লইয়া মগ জলদস্যুদিগকে বিধ্বস্ত করিবার কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তখন তিনি এক বিপুল নৌবাহিনী গঠন করিয়া তাহা দ্বারাই নিম্নবঙ্গে অত্যাচাররত মগ জলদস্যুর শক্তি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহাদের

নৌবলের প্রধান অঙ্গ ছিল দীর্ঘাকৃতি এক প্রকার ছিপ নৌকা ; তাহা দৈর্ঘ্যে অনেক সময় একশত গজ এবং প্রস্থে মাত্র দুই তিন গজ হইত। ইহার দুই ধারে দুই সারি করিয়া পঞ্চাশ হইতে প্রায় একশত সশস্ত্র মাঝি থাকিত, ইহারা বৈঠা দিয়া জল টানিয়া টানিয়া ক্ষিপ্র গতিতে অগ্রসর হইয়া শত্রুদিগের উপর আক্রমণ এবং প্রতিআক্রমণ চালাইত। পূর্ব ও নিম্নবঙ্গের স্বাধীন ভূস্বামিগণ প্রায় প্রত্যেকেই সারা বৎসর ব্যাপিয়াই এই শ্রেণীর ছোট বড নৌবল রক্ষা করিতেন। যুদ্ধের সময় ব্যতীত উৎসবে পার্বণে এই সকল রণতরী অনেক সময় একত্র সমবেত হইয়া নদী, হাওর কিংবা বিলের মধ্যে বাইচের (race) প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করিত , প্রধানতঃ তাহা অবলম্বন করিয়াই সারি গান উৎপত্তি ও বিকাশ লাভ করিয়াছে। ক্রমে নৌযুদ্ধের প্রযোজনীয়তা লুপ্ত হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহা সামাজিক জীবনের নানা উৎসবে পার্বণে এবং সম্পন্ন লোকের সৌখীনতায় ব্যবহৃত হইতে লাগিল। এইভাবে বাংলার রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাসে তাহার নৌশক্তির উত্থান পতনের সঙ্গে সারি গানের সম্পর্ক জড়িত হইয়া রহিয়াছে।

সারি গানের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহা যে কেবল তালযুক্ত তাহাই নহে, ইহার তাল অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। লোক-সঙ্গীতের মধ্যে তালের একটি প্রধান দোষ এই যে, অনেক সময় ইহা একঘেযে হইয়া উঠে , কিন্তু সারি গানের তাল যেমন বিচিত্র, তেমনই সমৃদ্ধ। সারি গানের একমাত্র লক্ষ্য তাল—ভাবও নহে, বিষয়ও নহে। তালই ইহার প্রধান আকর্ষণ। কর্ম-সঙ্গীত মাত্রই ভাব-গভীরতাহীন , যেখানে শারীর ক্রিয়া প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠে, সেখানকার সঙ্গীতের মধ্যে ভাবের দিক দিয়াই হউক, কিংবা রসের দিক দিয়াই হউক, নিবিড়তা দেখা দিতে পারে না , বহির্মুখী শারীর ক্রিয়া দ্বারা অন্তর্মুখী ভাব যেমন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, তেমনই ইহার আশ্রিত রসও বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। সেইজন্য সারি গান রচনার দিক দিয়া যেমন শিথিল বন্ধ, তেমনই ভাবের দিক দিয়াও অত্যন্ত তরল। বাংলাদেশে 'কানু ছাড়া গীত নাই'। সারি গানের সম্পর্কেও এ'কথা সত্য, সারি গানও প্রধানতঃ রাধা-কৃষ্ণের বিষয় অবলম্বন করিয়াই রচিত হইয়া থাকে। ইহাদের প্রেম বিষয়ের মধ্যে যেমন গভীরতা থাকে না, তেমনই কোনও আধ্যাত্মিকতার ভাবও প্রকাশ পায় না। ক্ষিপ্র গতি ও দ্রুত তালই ইহার প্রধান লক্ষ্য থাকে বলিয়া ভাবের দিক দিয়া

ইহা নিতান্ত তরলায়িত হইয়া উঠে, ভাটিয়ালির সঙ্গে এইখানেও ইহার পার্থক্য দেখা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটি উল্লেখ করা যায়। ইহার মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ এবং প্রেমের বিষয় উভয়ই আছে সত্য, তথাপি কোন বিষয়ই ইহাতে গভীরতা লাভ করিতে পারে নাই, তাহা লক্ষ্য করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যাইবে।

শুন, ললিতে, কই তোমারে শ্যাম-পীরিতের লাঞ্ছনা।
হায়, পীরিত আমারে ছাইড়ো না॥
পীরিত রতন পীরিত যতন গো, হায় গো, পীরিত গলার হার।
পীরিত কইরা যে জন মরে সফল জীবন তার॥
এক পীরিতি কইরাছিল গো, হায় গো, রাধের সনে কানু।
কোন যুগে কবছিল পীরিত আইজও ঝুরে তনু॥
এক পীরিত কইরাছিল গো, হায় গো, রাধে কইতো পারে।
নন্দের ছাইল্যা ভাইগ্‌না লইয়া ফিরছিল বনে বনে॥
হায়, পীরিত আমাবে ছাইড়ো না॥

ইহাতে পীরিতি বা প্রেমের কথা থাকিলেও, এই প্রেমে গভীরতা নাই, কেবল কৌতুক আছে, আধ্যাত্মিকতা নাই, কেবল ব্যঙ্গ আছে; ইহা চণ্ডীদাসের 'পীরিতি রতন' নহে।

সারি গানের অশ্লীলতার অপবাদ অত্যন্ত প্রাচীন। (রেভাঃ মর্টন বাংলা প্রবাদের সে সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে সারি গান সম্পর্কে নিম্নোদ্ধৃত প্রবাদটি গ্রহণ কবা হইয়াছিল—

গঙ্গায় সারি গাইলে গঙ্গা হয় না তুষ্ট।
দুষ্টেব গুণ গাইলে দুষ্ট হয় না শিষ্ট॥

তিনি সারি গান অর্থে obscene song বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। সারি গানের ভাব এই প্রকার নিতান্ত তরল, তবে সর্বদাই অশ্লীল নহে।) আর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ কবা যায়—

ও রায়কিশোরী, তোর সনে মোর কথা ছিল কি?
ঐ কাল জলে চান করাব সই,
ও সইরে, ডাল ভাঙ্গিয়া বাতাস করি।
তোর সনে মোর কথা ছিল কি?

বেড়াই আমি তোমার লাগে,
অন্নধারী হলাম সাথী, তোমার লাগে,
ঘুরছি আমি রাত্রিদিনে করছ কেন চাতুরী ?
তোর সনে মোর কথা ছিল কি ?

সারি গান নৌকা বাইচের গান বলিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গের মধ্যে যেখানে নৌকায় যমুনা পারাপারের বিষয় আছে, তাহা অবলম্বন করিয়াই প্রধানতঃ ইহা রচিত হয়। কৃষ্ণলীলার মধ্যে নৌকাখণ্ড এবং পারখণ্ড বা নৌকাবিলাস একটি উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ, তাহারই একটি নিতান্ত লৌকিক রূপ অধিকাংশ সারি গানেরই বিষয় হইয়াছে। যেমন—

আরে ও কানাই, পার করে দে আমারে।
আজিকাব মথুরার বিকিদান করিব তোমারে ॥
তুমি ত সুন্দর কানাই, তোমাব ভাঙ্গা না।
কোথায় রাখব দইয়ের পসরা, কোথায় রাখব পা ॥
শুনে কানাই বলে তখন, শুন, রসবতী।
ভরা কালে ভরা গাঙ্গে, কেন এলে যুবতী ॥
আগা নায়ে রেখে দই মাঝখানাতে বস।
ফুটিক ফুটিক ফেল জল, লজ্জায় কেন ভাস ॥
সর্ব সখী পাব করিতে নেব আনা আনা !
রাধিকারে পার করিতে নেব কানের সোনা ॥

বাইচের নৌকার গতি সকল সময় সমান থাকে না, ইহা কখনও মন্থর গতিতে চলে, তখন গানের তাল মন্থব হয়, যখন ইহা দ্রুত গতিতে চলে, তখন ইহার তাল দ্রুত হয়। নৌকাব গতি দ্বারা ইহার তাল অনেক সময় নিয়ন্ত্রিত হয়। বিভিন্ন নৌকার সঙ্গে প্রতিযোগিতা যখন একেবারে শেষ সময় অর্থাৎ finishing point-এ আসিয়া পৌঁছায়, তখন তাহাতে আব কোনই গান থাকে না, কেবল প্রবল উত্তেজনামূলক উচ্চ ধ্বনি (yell) শুনিতে পাওয়া যায়। অনেক সময় প্রবল এই উত্তেজনার মুখে তালও সম্পূর্ণ বিসর্জিত হয় ; সুতরাং অন্যান্য গানের যেমন একটি সুনির্দিষ্ট ধারা আছে, ইহার তেমন নাই। বাইচ খেলায় মাঝির মেজাজ ও প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ইহাব তাল ও সুর সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে এবং বাইচের উত্তেজনা যখন প্রবলতম

হইয়া উঠে, তখন গান সুর এবং তাল সকল কিছুই বিসর্জিত হইয়া কেবল এক উচ্চ কোলাহল ব্যতীত তাহাতে আর কিছুই শ্রুতিগোচর হয় না।

দেশ দেশান্তরের কর্ম-সঙ্গীত (work song) মাত্রেরই ইহাই বিশিষ্ট রীতি। এই বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য লোক-সঙ্গীত বিশারদ T. C. Brakeley উল্লেখ করিয়াছেন—The rhythmic character of the songs is largely dictated by the nature of the work they accompany. The broad division of rhythm by tasks are clearly shown in the sea chanteys. If the work requires a heavy blow or pull, particularly when the efforts of a group must be poole accomplish something beyond the strength of an individual, the works may be sung fairly slowly but in strongly accented rhythm, each stress signalling the moment of effort. অর্থাৎ কর্মের প্রকৃতি অনুযায়ী এই শ্রেণীর সঙ্গীতের তাল নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। সমুদ্রে নৌকার বাইচ খেলিবার সময় যে গান গাওয়া হয়, তাহাদেরই মধ্য দিয়া কর্মসঙ্গীতের তালের বিভিন্ন বিভাগগুলি সুস্পষ্ট ভাবে অনুভব করা যায়। বহু ব্যক্তি বিপুল শক্তিদ্বারা এক সঙ্গে যদি কিছু আঘাত কিংবা আকর্ষণ করে, তখন গানের তাল মন্থর হয়, কর্মের গতি যখন তীব্র ও দ্রুত হয়, তখন তালও সেই পরিমাণে তীব্র ও দ্রুত হয়।

বাইচের নৌকাগুলি যখন গ্রাম হইতে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করে, তখনই ধীর মন্থর গতিতে গান গাহিতে গাহিতে অগ্রসর হইয়া থাকে। প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিয়া যখন কোন বিজয়ী নৌকা ধীর মন্থর গতিতে স্বগ্রামে ফিরিয়া আসে, তখন মৃদুতালের এই প্রকার সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়—

জয় দেগো, রামের মা ; তোর গোপাল আইল ঘরে,
ধান্য দূর্বা বরণ কুলা দে, গো ঐ গলুয়ার কপালে।
নডিয়া চডিয়া তোমার গোপাল নে যাও ঘরে ॥
সাত সাগরের পার থিকা যে আনছে বরণ মালা,
দুধের বাটি ক্ষীরের নাড়ু আনো থালা থালা ॥

যেই দেবতার দয়ায় আসে তোমার গোপাল ঘরে।
সেই দেবতা পবন ঠাকুর পেন্নাম যাই তারে ॥

পূর্ব এবং নিম্ন বাংলায় বৎসরের বিশেষ বিশেষ দিনে নৌকা বাইচের জন্য বিশেষ বিশেষ কতকগুলি স্থান বহুকাল যাবৎই নির্দিষ্ট হইয়া আছে, বিশেষ উৎসব উপলক্ষে শত শত বাইচের নৌকা সেখানে আসিয়া সমবেত হয়। বর্ষার জলে চারিদিক প্লাবিত হইয়া সেই সকল স্থান সমুদ্রের মত মনে হয়, ইহাই বাইচ খেলার প্রশস্ত স্থান। সেই উন্মুক্ত জলরাশির উপর, চলন্ত ছিপের মধ্যে বাহুর শক্তি দ্বারা বৈঠা টানিতে টানিতে এক এক ছিপের মধ্য হইতে পঞ্চাশ হইতে শতাধিক মাঝি একসঙ্গে তালে তালে সারি গান গাহিয়া থাকে। সুতরাং ঘরের মধ্যে বসিয়া যে পল্লী-সঙ্গীত গীত হয়, তাহার প্রকৃতি ইহা হইতে স্বতন্ত্র হইবে, তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক।

হিন্দুর দুইটি প্রধান উৎসব উপলক্ষে গোষ্ঠীগতভাবে পূর্ব ও নিম্নবঙ্গে প্রধানতঃ নৌকা বাইচের প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে, তাহা মনসার ভাসান এবং বিজয়া। বিজয়ার ভাসানের সময় অনেক বিল ও হাওরে জল শুকাইয়া যায়; কিন্তু মনসার ভাসানের দিন অর্থাৎ শ্রাবণ সংক্রান্তির পরবর্তী দিন ১লা ভাদ্র তারিখে ইহার যে অনুষ্ঠান হয়, তাহাই বৃহত্তম। ইহা ছাড়া বিশেষ কোন উৎসব ব্যতীত এবং অন্যান্য অবকাশ মতও মধ্যে মধ্যে বাইচের প্রতিযোগিতা হয়, তবে তাহা এত ব্যাপক আকার লাভ করিতে পারে না। পূর্ববাংলার সারিগানের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ প্রাধান্য লাভ করিলেও অন্যান্য সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বন করিয়াও তাহাতে সঙ্গীত রচিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভাবের দিক দিয়া নিতান্ত অগভীর এবং রচনার দিক দিয়া শিথিল বলিয়াই ইহারা কোন স্থায়ী আবেদন সৃষ্টি করিতে পারে না; রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীতই হোক, কিংবা অন্যান্য সমসাময়িক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া রচিত সঙ্গীতই হউক, এক বৎসরের সঙ্গীত পরের বৎসরেই আর শুনিতে পাওয়া যায় না, নূতন বৎসরের জন্য নূতন সঙ্গীত মুখে মুখে রচিত হয়, বৎসরের প্রয়োজন মিটিয়া গেলে বাসি ফুলের মত তাহা সমাজ-মানস হইতে পরিত্যক্ত হয়।

কিন্তু দক্ষিণ বঙ্গ বিশেষতঃ যশোরের সারি গানগুলির একটু বিশেষত্ব আছে। সেখানকার নদনদী বিল খালের জল পূর্ববাংলার বর্ষার জলের মত এত দ্রুত শুকাইয়া যায় না; সেইজন্য বিজয়া দশমীর নৌকা বাইচই সেখানে

প্রধানতম নৌকা বাইচের উৎসব। বিজয়ার মধ্য দিয়া যে একটু বাস্তব বেদনার স্পর্শ আছে, মনসার ভাসানের মধ্যে তাহা নাই। কারণ, মনসা দেবীর ভাসানের মধ্যে মানবের চোখে অশ্রু দেখা যায় না, কিন্তু বিজয়া দশমীতে আমরা যে প্রতিমা বিসর্জন করি, তাহা দেবীর প্রতিমা হইলেও মানব-কন্যা রূপে তাঁহার আগমন হয় বলিযাই আমরা অনুভব করি। সেইজন্য ইহার ভাসানের সঙ্গে একটু বেদনাবোধের সংমিশ্রণ হইয়াছে। ইহার ভাব পূর্ববাংলার সারি গানের মত এত তরল কিংবা ইহার রচনা এত শিথিলবদ্ধ নহে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—

সোনার কমল ভাসিয়ে জলে আমাব মা বুঝি কৈলাসে চলিল।
হাস ম'ষ দিয়ে মাগো কল্লেম তোব পূজা,
কোথায ফেলে গেলে এ'সব ওমা দশভুজা।
(সোনার কমল)
মাগো, কার বাড়ী গিয়েছিলে, কে করেছে পূজা,
কার জনম করলে সফল হয়ে দশভুজা।
(সোনার কমল)

বাংলার সুপরিচিত কাহিনী নিমাই সন্ন্যাস, ইহার সুরও বেদনারই সুর, বিজয়ার বেদনাবোধের সঙ্গে ইহারও সুব এবং ভাবগত একটু সম্পর্ক আছে; সেইজন্য এই অঞ্চলের সারি গানের মধ্যে নিমাই সন্ন্যাসের প্রসঙ্গও শুনিতে পাওয়া যায়—

কেমনে বাঁচিবে তোর মা,
আরে, ও নিমাই, সন্ন্যাসেতে যেও না।
যখনে জন্মিলে, নিমাই, নিম তরুতলে,
আমি বাছিয়া রাখিলাম নাম, নিমাই চাঁদ তোমারে।
সন্ন্যাসী না হইও, নিমাই, বৈরাগী না হইও,
ঘরে বসে কৃষ্ণনাম আমারে শুনাইও।

সারি গান সুস্পষ্ট তালযুক্ত সঙ্গীত বলিয়া অনেক সময় ইহার সঙ্গে অতি সহজে নৃত্যও যুক্ত হইয়া থাকে। তবে যাহারা বৈঠা টানে, তাহাদের দ্বারা নৃত্য সম্ভব হয় না, সম্মুখ ভাগের বিস্তৃত গলুইয়ের উপর দাঁড়াইয়া বৈঠার তালে তালে অনেক সময় এক কিংবা একাধিক ব্যক্তি নৃত্য করিয়া থাকে। কিন্তু

নৌকা যখন স্বাভাবিক গতিতে চলিতে থাকে, তখনই এই নৃত্য সম্ভব, প্রতিযোগিতার মুখে নৌকা যখন ক্ষিপ্র গতিতে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন তাহা কদাচ সম্ভব নহে। চলন্ত ছিপের উপর এই নৃত্যের মধ্য দিয়া উচ্চ কোন গুণ প্রকাশ পাইতে পারে না।

সারি গানের বাদ্যযন্ত্র ঢোলক এবং কাঁসি, অনেক সময় কাঁসি দেখা যায় না, কেবল মাত্র ঢোলকেই কাজ চলিয়া যায়। কিন্তু বাদ্য কিংবা নৃত্য কিছুই ইহার মুখ্য নহে। বৈঠা দ্বারা ইহাতে যে তাল রক্ষা করা হয়, তাহা বাদ্য এবং নৃত্যের তাল ছাপাইয়া যায়, অন্য বাদ্যের প্রয়োজনীয়তা কেহই অনুভব করিতে পারে না। এই বিষয়ে একজন বিশিষ্ট পাশ্চাত্য লোক সঙ্গীতবিদ্ বলিয়াছেন—'The only accompaniment to most work-songs is the beat of impliments flails, pestles, axes, and sledge hammers—the tinkle of animal bells, the clack of heddles, the heavy tread of feet or the sharply expelled breath or grunt of the workers as the stroke falls. Yet for some tasks and in some countries instruments have been used to liven the song or pace the work—the bagpipe for harvesting in England, drum and rattle in the Dominion Republic, conchshell trumpet, flute for Greek oarsman, banjo for American plantation works'

বাংলার লোক-সঙ্গীত একটু একঘেয়ে এবং মেয়েলী ভাবাপন্ন হইলেও, তাহাতেও যে কিছু কিছু ব্যতিক্রম আছে, সারি গান তাহার নিদর্শন। সারি গানের মধ্যে কোন কোন সময় পৌরুষ ভাবের একটু স্পর্শ অনুভব করা যায়, তবে এ'কথা সত্য, জারি গান কিংবা অন্যান্য যুদ্ধ সঙ্গীতের মত তাহা তত উচ্চ গ্রামে পৌঁছিতে পারে না, কারণ, রাধা-কৃষ্ণের প্রেম এবং বিজয়ার বেদনার অনুভূতি বিষয়ের দিক দিয়া মুখ্যতঃ ইহার অবলম্বন হইয়াছে, প্রেম এবং বিচ্ছেদের মধ্যে বীররসের স্পর্শ দান করা সম্ভব নহে।

সারি গানেরই একটি নিতান্ত আধুনিক অধঃপতিত রূপ ছাত পেটানোর গান। নদীমাতৃক বাংলাদেশের পূর্ব রূপ আজ আর নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নদনদী হাওর খাল বিলগুলি মজিয়া গিয়াছে, সারি গানের প্রয়োগের

ক্ষেত্রও সেই অনুযায়ী সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছে। আধুনিক নাগরিক জীবন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে একটি নূতন কর্ম দেখা দিয়াছে। পাকা গৃহনির্মাণে ছাত পিটানো একটি প্রয়োজনীয় সমবেত কর্ম। বিশেষতঃ বৈঠার তালে তালে যেমন মাঝিরা বাইচের নৌকা বাহিয়া থাকে, ছাত পিটানোর সময়ও তেমনই ছাত পিটাইবার সরঞ্জাম বা কণিকটি তালে তালে ফেলিয়া অনুরূপ তাল রাখা হয়। কর্মের এই বহির্মুখী ঐক্য আশ্রয় করিয়াই ছাত পিটানোর মধ্যেও সারি গানের রূপটি গিয়া প্রবেশ করিয়াছে। এখানে উদার জলরাশির সেই উন্মুক্ত বিস্তার নাই, অবরুদ্ধ নাগরিক পরিবেশের কদর্য সঙ্কীর্ণতা আছে, তাহার ফলে ভাবে ও ভাষায় ছাত পিটানোর গানগুলি কদর্য রুচির পরিচায়ক হইয়া উঠিয়াছে। পুরুষ একটি শ্রমসাধ্য কর্ম সম্পাদন করিবার সঙ্গে সঙ্গে সারি গান গাহিত ; কিন্তু যাহারা ছাত পিটায়, তাহারা অধিকাংশই স্ত্রীলোক, তাহাদের কর্ম শ্রমসাধ্য নহে, বরং নিতান্ত অলস প্রকৃতির ; একজন মাত্র পুরুষ মূল গায়েন, প্রকৃত কর্মের সঙ্গে কোন সম্পর্ক স্থাপন না করিয়াই বেহালা বাজাইয়া সঙ্গীত পরিচালনা করিয়া থাকে। কিন্তু সারি গানের একজন মূল গায়ক বা পরিচালক থাকিলেও সেখানে সে কর্মী এবং গায়ক ; সকলের স্থানই সেখানে সমান। নিষ্ক্রিয় গায়ক সেখানে কেহ নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উভয়ের ক্ষেত্র পৃথক্ হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য যদিও একের অনুকরণে অপরের সৃষ্টি হইয়াছে, তথাপি একের অভাব অন্যের দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে নাই।

কর্ম-সঙ্গীত তাল-প্রধান সঙ্গীত বলিয়া ইহাতে কোন স্থায়ী রসগত আবেদন প্রকাশ পাইতে পারে না। সেইজন্য প্রাচীন সারি গানের সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহা সাময়িক প্রয়োজনে আবেগ ও উত্তেজনার মুহূর্তে রচিত হয়, উত্তেজনা এবং প্রয়োজনীয়তা দূর হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। শ্রম-সঙ্গীত মাত্রেরই এই বৈশিষ্ট্য হইলেও সারি গান বা নৌকা বাইচের গানে এই বৈশিষ্ট্য সর্বাধিক পরিমাণে প্রকাশ পাইয়া থাকে। নতুবা ধান ভানার গানও শ্রম-সঙ্গীতেরই অন্তর্গত, ইহা স্ত্রী-সমাজে প্রচলিত বলিয়া ইহার মধ্যে গার্হস্থ্য জীবনের যে সরস চিত্র অনেক সময় প্রকাশ পায়, তাহার ভিতর দিয়া ইহাদের একটি সর্বজনীন আবেদনও সৃষ্টি হয়। ধান ভানার গান সারি গানের মত উত্তেজনার মুহূর্তে সৃষ্ট নহে, বিশেষতঃ প্রায় সমস্ত বৎসর ধরিয়াই ইহাদের ব্যবহার চলে ; সেই জন্য ইহাদের পক্ষে অন্ততঃ কিছুকালের জন্য

স্থায়িত্ব লাভ করা সম্ভবপর হয়, কিন্তু সারিগান কেবলমাত্র মুহূর্তের প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াই লুপ্ত হইয়া যায়। নারী রক্ষণশীল বলিয়া সে তাহার সৃষ্টিকে যে ভাবে রক্ষা করে, পুরুষ সর্বদাই প্রগতিধর্মী বলিয়া সে তাহার সৃষ্টির উপর কোন গুরুত্ব আরোপ না করিয়া কেবলমাত্র প্রয়োজনীয়তার ক্ষুধা মিটাইয়াই সমুখের দিকে অগ্রসর হয়। সারি গানে নারীর কোন অধিকার নাই, ইহার ক্ষেত্র চিরকালই পুরুষের অধিকারভুক্ত। এমন কি, কোন কোন লোক-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যে দেখা যায়, পুরুষ কালক্রমে নারীর গীতগুলি গ্রহণ করিয়াছে, সারিগান সম্পর্কে তাহাও দেখা যায় না, ইহা পুরুষেরই চির অধিকারভুক্ত, সেইজন্য ইহার বহির্মুখী একটি পরিচয় থাকিলেও অন্তর্মুখী কোনও সম্পদ নাই।

একান্তভাবে বিশেষ একটি কর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলিয়া সারি গান বাংলা দেশের মধ্যেও ব্যাপক প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। এমন অনেক কর্ম আছে, যাহা সমস্ত বাংলা দেশব্যাপীই প্রচলিত, যেমন ধান ভানা, সেই সূত্রে ধান ভানার গানগুলি যেমন এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে প্রসার লাভ করিয়াছে, নৌকা বাইচ পশ্চিম এবং উত্তর বঙ্গে প্রচলিত নাই বলিয়া সারি গান সেই অঞ্চলে প্রসার লাভ করিতে পারে নাই, অথচ সারি গান যে বাংলার আঞ্চলিক সঙ্গীত, তাহাও নহে, কারণ, পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলেই যেমন ইহার প্রচলন আছে, তেমনই নিম্ন বঙ্গ বিশেষতঃ যশোহর এবং খুলনা জিলার নদনদী প্লাবিত অঞ্চলেও ইহার তেমনি প্রচলন রহিয়াছে। অনেক সময় সর্বজনীন আধ্যাত্মিক কিংবা প্রেমমূলক কোন ভাবের বাহন হইলেও লোক-সঙ্গীত এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে প্রসার লাভ করিতে পারে। কিন্তু সারি গানে কোন আধ্যাত্মিক সুর দানা বাঁধিতে পারে নাই, রাধাকৃষ্ণের নাম ইহার মধ্যে থাকিলেও ইহা ভক্তিচন্দনে সুরভিত নহে। সুতরাং স্থায়ী কোন আবেদন সৃষ্টি করিবার যেমন ইহার কোন শক্তি নাই, তেমনি ব্যাপক প্রচার লাভেরও ইহাদের সুযোগ হয় নাই। বিশেষতঃ যে কর্মের সঙ্গে ইহা অপরিহার্যভাবে সংশ্লিষ্ট, তাহার ক্ষেত্রও নিতান্ত অপরিসর বলিয়া ব্যাপক প্রচার লাভে ইহার অন্তরায় সৃষ্টি হইয়াছে।

নৌকা বাইচ এবং সারিগানে যে প্রতিযোগিতার ভাবটি আজও প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহাতে সারি গানকে মধ্য যুগের যুদ্ধ-সঙ্গীতের অবশেষ বলিয়া মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে। সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়াছেন, প্রতিযোগিতামূলক

যে কোন সামাজিক ক্রিয়া প্রাচীন গোষ্ঠি-সংগ্রামের অবশেষ মাত্র। সারিগান সম্বন্ধেও তাহাই মনে হইতে পারে। তবে যুদ্ধ-সঙ্গীতের মধ্যে যে বীররস আমরা স্বাভাবিক ভাবেই আশা করিয়া থাকি, ইহার মধ্যে তাহার কোন অস্তিত্ব নাই। কোন কোন সময় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ এক পক্ষ অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে সারি গান রচনা করিয়া তাহার ভিতর দিয়া তাহাকে কুৎসিৎ আক্রমণ করে। সকল সমাজেই বাহুযুদ্ধ ক্রমে বাগ্‌যুদ্ধে পরিণত হইয়াছে, ইহাতেও তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়, তবে ইহাদেব মধ্যে যে বাগ্‌যুদ্ধের অবতারণা হইয়া থাকে, তাহা প্রায়শঃই কুৎসিৎ গালিগালাজে পর্যবসিত হয় মাত্র, ইহাতে ইতর মনোবৃত্তি প্রকাশ পাইলেও, বীবরসেব লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকে না।

সারি গান কর্মসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ইহার সঙ্গে যে কর্মের সংস্রব রহিয়াছে, তাহা সামাজিক কিংবা ব্যক্তিগত জীবনে অপবিহার্য নহে। ইহার কর্ম অবসর মুহূর্তের বিলাস মাত্র, বিশেষতঃ দুইটি প্রধান উৎসবের সঙ্গেও ইহার সম্পর্ক আছে, তাহাদের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের একটি মনসার ভাসান, অপবটি বিজয়া দশমী। সুতবাং নৌকায় বৈঠা বাহিবার কর্মের সঙ্গে ইহাতে উৎসবেবও একটু যোগ বহিয়াছে। সেই দিক হইতে আনুষ্ঠানিক বা festival song-এর সঙ্গেও ইহাব সম্পর্ক আছে বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। তারপর কেবল মাত্র বর্ষাকাল ব্যতীত এই সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হইবার উপায় নাই, কারণ, ইহার সঙ্গে জীবনেব অবসর এবং বর্ষার জলরাশির বিস্তার উভয়েবই একসঙ্গে সংযোগ প্রয়োজন হয়। কিন্তু ধান ভানার গীত কিংবা অন্যান্য কর্মসঙ্গীতের সীমা এত সঙ্কীর্ণ নহে। ইহাদেব প্রয়োগ বৎসরের বিশেষ কোন কোন সময়ে ব্যাপক হইলেও, সমগ্র বৎসর ব্যাপিয়াও সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যায় না। সেইজন্য বৎসবের প্রায় সকল সময় কিছু কিছু তাহা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সারি গান নানা কারণে কচিৎ শুনিতে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র ছাত পিটানোর গানে তাহার সুব এখনও সহরের আকাশে আর্তনাদ করিয়া মরিতেছে।

যদিও সারি গান শব্দটির অর্থ সঙ্কুচিত হইয়া আধুনিক কালে ইহা দ্বারা কেবল মাত্র নৌকা বাইচের গানই বুঝাইয়া থাকে, তথাপি ব্যাপক অর্থে প্রত্যক্ষ কর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কোন তাল-প্রধান সমবেত সঙ্গীতই সারি গান বলিয়া

পরিচিত হইবার যোগ্য। পূর্বে ছাত পেটানোর গান ও ধান ভানিবার গানের কথা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করিয়াছি; তাহাদের সঙ্গে পাট কাটিবার গান, ধান কাটিবার গান, তাঁত চালাইবার গান ইত্যাদি সারি গানের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। পূর্বেই বলিয়াছি, প্রত্যেকটি কর্মের প্রকৃতি অনুযায়ী সারি গানের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। সেই হিসাবে নৌকা বাইচের গানের সঙ্গে ধান ভানিবার গানের নীতিগত সম্পর্ক থাকিলেও বহির্মুখী সকল বিষয়ের এক অখণ্ড ঐক্য থাকিতে পারে না। পাট কাটা, ধান কাটা, তাঁত চালানো প্রত্যেকেরই প্রকৃতি পরস্পর স্বতন্ত্র, সেই অনুযায়ী প্রত্যেকের বহির্মুখী পরিচয়ে কিছু না কিছু পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী।

প্রথম পাট কাটা ও ধান কাটার গানের কথাই যদি ধরা যায়, তবে দেখা যায়, পাট কাটার প্রণালীর সঙ্গে নৌকা বাইচের প্রণালীর পার্থক্য আছে। নৌকা বাইচের মধ্যে একটি গতিবেগ আছে, তাহার শিহরণ আছে, সঙ্গীতের মধ্য দিয়া উদ্দাম গতিবেগের পুলক শিহরণ কার্য করিয়া থাকে, বিশেষতঃ বহুসংখ্যক মাঝির একসঙ্গে জলের মধ্যে বৈঠা ফেলা এবং বাহুবলে জল টানিয়া পুনরায় বৈঠা জল হইতে তুলিয়া বৈঠার নিম্ন ভাগ একসঙ্গে একবার মাত্র শূন্যে ঘুরাইয়া এক সঙ্গে শত শত বৈঠা দ্বারা নৌকার বাতা (edge)-য় আঘাত করিয়া পুনরায় বৈঠা সশব্দে জলে ফেলা পর্যন্ত সমগ্র কর্মটির ভিতর দিয়া একটি যে অপূর্ব চিত্র জাগিয়া উঠে, নৌকা বাইচের গান তাহারই যেন অন্তর্নিবিষ্ট (integrated) হইয়া যায়। পাট কাটার গানই হোক, ধান কাটার গানই হোক, তাহাদের মধ্যে এই পরিবেশ নাই; সেইজন্য তাহাদের গান সারি গান হইলেও, নৌকা বাইচের গানের সুর ও তাল তাহাতে লাগিতে পারে না।

পাট কাটিবার গান কিংবা ধান কাটিবার গানের মধ্য দিয়া সারিগানের রূপ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবার একটি প্রধান বাধা এই যে, ইহাদের মধ্য দিয়া তাল রক্ষা করিবার কোনও সক্রিয় উপায় নাই। নৌকা বাইচের গানে বৈঠার সাহায্যে তাল রক্ষা করা হয়; কিন্তু ধান কাটাই হউক কিংবা পাট কাটাই হউক, ইহাদের মধ্যে তাল রক্ষা করিবার মত কোন যন্ত্র গায়কের হাতে থাকে না; এমন কি, পা ফেলিবার তালে তালে যে কোন কোন সারি গানে তাল রক্ষা করা যাইতে পারে, ইহাদের মধ্যে সেইভাবে পা ফেলিবারও কোন অবকাশ রচিত হয় না; সুতরাং তালরক্ষা করা সারিগানের যে একটি বিশিষ্ট ধর্ম, তাহা

ইহাদের ভিতর দিয়া সুষ্ঠুভাবে পালন করা যাইতে পারা যায় না। সেইজন্য ধানকাটা কিংবা পাট কাটার গান ব্যাপক প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। বহুল পরিমাণে ইহারা রচিতও হয় নাই। বাংলার বিপুল লোক-সঙ্গীত সংগ্রহের মধ্য হইতে যে কয়টি মাত্র ধান কাটা কিংবা পাট কাটার গান সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের মধ্য দিয়া কোন বিশিষ্ট রস কিংবা বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ হয় নাই, ইহাদের কয়েকটি আধুনিক রচনা বলিয়াও মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে। রাজসাহী জিলা হইতে সংগৃহীত নিম্নোদ্ধৃত পাট কাটার গানটি এই সম্পর্কে লক্ষ্য করা যাইতে পারে—

পুবের থনে আইল বাতাস নদী অইল তল।
ছ্যাশ পিরথিমি সাগর ভাইসা চড়ায় নামল জল॥
(জোনা ভাইরে।)
কাঁচি বাগি সঙ্গে লইয়া পাট কাটিতে চল।
(জোনা ভাইরে।)
পূবের থনে বইছে বাতাস নামছে ম্যাঘের ঢল।
এক নিমেষে তুই না জাহান করব বুঝি তল॥
(জোনা ভাইরে।)
ঝড় বাদলে দিন মজুরী দিব ট্যাহা ট্যাহা।
শিগ্‌রি কইর‍্যা বাইরাও রে ভাই চালাও বিষম ঠ্যাহা॥
(জোনা ভাইরে।)
বিহান বিকাল দিব খাওন পাবদা বোয়াল কই।
তাহার লগে পাইবা আরও হাটের সরস দই॥
(জোনা ভাইরে।)
কাঁচি বাগি সঙ্গে লইয়া পাট কাটিতে চল॥

নৌকা বাইচ যে অর্থে যৌথ ক্রিয়া (group action), সেই অর্থে পাট কাটা যৌথ ক্রিয়া নহে, বৈঠা চালনার প্রতিটি ক্রিয়ার মধ্য দিয়া যে এক অখণ্ড ঐক্য প্রকাশ পায়, পাট কাটার মধ্য দিয়া তাহা পায় না ; কারণ, নৌকা বাইচে প্রত্যেক মাঝির হাতেই এক একটি করিয়া বৈঠা থাকিলেও তাহার একজন কর্ণধার বা কাণ্ডারী থাকে, একা সেই নৌকার হাল ধরিয়া গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে ; সুতরাং ইহাতে বিভিন্ন মাঝির মধ্য দিয়াও তাহা দ্বারাই একটি

ঐক্য রক্ষা পাইয়া থাকে, কিন্তু পাট কাটা কিংবা ধান কাটা কর্মের ভিতর দিয়া কোন মুল পরিচালক থাকে না, সেইজন্য তাহা আশ্রয় করিয়া কর্মের মধ্য দিয়া একটি অখণ্ড ঐক্য সৃষ্টি হইবার সুযোগ হয় না। সুতরাং সারি গানের মূল ধর্ম ইহাতে রক্ষা পাইবার পক্ষে কিছু অন্তরায় সৃষ্টি হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। পাট কাটার কাজ যোথ ক্রিযার পরিবর্তে অনেকটা একক বা individual ক্রিয়া; সেইজন্য সারি গানের সুর এবং তাল ইহাদের মধ্য দিয়া তেমন স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইতে পারে না।

এই সম্পর্কে তাঁত চালাইবার গানের কথাও উল্লেখ করিতে পারা যায়। হস্ত চালিত তাঁত চালাইবার সময় নিযমিতভাবে একই তালে তাঁতের মাকু হইতে যে উচ্চ শব্দ হইতে থাকে, তাহা আশ্রয় করিয়া তাঁত চালাইবার গান সৃষ্টি হইয়াছে; ইহাকেও সারিগানের অন্তর্ভুক্তই করিতে হয। কিন্তু নৌকা বাইচের গানের সঙ্গে ইহার পার্থক্যও নিতান্ত অল্প নহে। ইহাতে স্পষ্ট হইয়া তালটি প্রকাশ পাইবার সুযোগ থাকিলেও, ইহাকে সমবেত সঙ্গীতরূপে গণ্য করা সকল সময় কঠিন। কারণ, বহু ব্যক্তি এক সঙ্গে তাঁত চালায না, বরং একজনই নিঃসঙ্গ ভাবে তাঁত চালাইয়া থাকে, সুতরাং তালপ্রধান সঙ্গীত হইলেও সারি গানের আর একটি যে প্রধান বিশেষত্ব, অর্থাৎ সারি গান যে সমবেত সঙ্গীত, তাঁত চালাইবার গান তাহা নহে, সুতরাং সারি শব্দের যাহা মূল অর্থ, তাহাই ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পায না। অতএব ইহার মধ্য দিয়া সারি গানের অন্যান্য যে গুণই প্রকাশ পাক না কেন, ইহার মৌলিক গুণটিই বিসর্জিত হইয়া থাকে।

ঢেঁকির গান বাংলার সারিগানের আর একটি প্রধান অংশ। ইহা সমবেত কণ্ঠেই গীত হয়, তবে ইহার ধুয়া অংশটিই সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়া থাকে, অন্যান্য অংশ এক বা একাধিক গায়িকা কর্তৃক উচ্চারিত হইতে পারে। ইহার আর একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহা নৌকা বাইচের গানের মত কয়েকটি অঞ্চলেই মাত্র সীমাবদ্ধ নহে, বরং কৃষিভিত্তিক ভারতের পল্লীসমাজের প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত। বাংলা দেশেও পল্লী অঞ্চলে যতদিন ধান কল প্রবেশ না করিয়াছিল, ততদিন পর্যন্ত ইহার ব্যবহার ব্যাপক ছিল। কর্মের ঐক্য অনুসরণ করিয়া ইহা একস্থান হইতে যে অন্যস্থানে সহজেই বিস্তার লাভ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। উত্তর বাংলায় রংপুর জেলা হইতে সংগৃহীত একটি গান এখানে উদ্ধৃত করা যায়—

ধান বাহানো ধান বাহানো ওরে নারদ-মুনি,
বিন্দ্যাবনে ধান বাহানে বাধে গোযালিনী।
এ ধান বাহানো রে সোনাব কামিনী,
এ ধান বাহানো বে ॥ ধুয়া ॥
ঢেঁকিতে উঠিযা বলে,—আমি সাবে চাবি হাতেব কাঠ,
সোনাব কমিনী ধান বাহানে, ঝাইড্যা মারে লাথ।
এ ধান বাহানো বে সোনার কামিনী,
এ ধান বাহানো বে। ধুয়া ॥
পুযাতে উঠিযা বলে, আমবা দোনো ভাই,
সোনাব কামিনী ধান বাহানে, আমবা গান গাই।
আগশালাইতে উঠিযা বলে,—আমি থাকি মধ্যস্থলে,
সোনাব কামিনী ধান বাহানে আমাব বাহুব বলে।
এ ধান বাহানো বে। —রংপুর

ইহার সঙ্গে মেদিনীপুব জেলাব পশ্চিম-উত্তব সীমান্তবর্তী পুরুলিয়া জিলার সংলগ্ন অঞ্চলেব একটি গ্রাম হইতে সংগৃহীত নিম্নোদ্ধৃত গানটিব তুলনা করিলেই বুঝিতে পাবা যাইবে যে, যেখানে কর্মের বহির্মুখী ঐক্য আছে, কর্ম-সঙ্গীতেও সেখানে ঐক্য আছে। মেদিনীপুব জেলা হইতে সংগৃহীত গানটি এই—

ও নব ঢেঁকিযাবে সামালে কুট ধান।
ঢেঁকিটায বলে বে ভাই আমি নাবদেবই নাতি
অষ্টাঙ্গ থাকিতে মোব ল্যাজে মারে লাথি।
ও নব ঢেকিযাবে সামালে কুট ধান ॥ (ধুযা) ॥
আকশোলোযাটা বলে বে ভাই আমি এক রিত্ত্যে কাঠ,
আমি না থাকিলে ঢেকি, চিৎ পট্টাং কাত।
ও নব ঢেঁকিযাবে ...
ঢুসলিটায বলে বে ভাই আমাব লোহায বাঁধা মুখ,
আমাব এঁটো খেয়ে যত চাঁদ পারা মুখ,
ও নব ঢেঁকিয়াবে
পাযা ছু'টোয বলে রে ভাই আমরা ছু'টি ভাই,
নব ঢেঁকি ধান ভানে আমরা গীত গাই।

ও নব টেঁকিয়ারে……
আর ঝাঁটাটায় বলে রে ভাই আমার কোমরে বাঁধা দড়ি,
নব টেঁকি ধান ভানে ঝ্যাটায় জড় করি।
ও নব টেঁকিয়ারে……
কুলাটায় বলে রে ভাই আমি বাঁশেরই পাতুলি,
ও নব টেঁকি ধান ভানে লিকায় আর পাছুড়ি।
ও নব টেঁকিয়া রে সামালে কুট ধান ॥ —মেদিনীপুর

উপরি-উদ্ধৃত দুইটি ধান ভানার গানের সঙ্গে চট্টগ্রাম হইতে সংগৃহীত একটি গানের তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, কর্মপ্রণালীর যেখানে ঐক্য আছে, গানের সুর, তাল এমন কি অনেক সময় ভাষা এবং চিত্রেরও সেখানে ঐক্য দেখা যায়।

বারা বাঁধরে সুন্দর কামিনী হওসের চুড়া দু'করে,
টেঁকিৎ উইঠ্যা বলে আঁই বনর হাতী।
সুন্দরী ও বারা বাঁধতে পিঠ চাই মারে লাথি,
আড়ালে উইঠ্যা বলে আঁই তুঁই মিশ,
সুন্দরীতে বারা বান্তে আঁরা গাইয়ম গীত।
কিলায়ে উইঠ্যা বলে আঁই আছি দড়।
আঁই না থাকিলে তুঁই কি বইল্যা পড়।
ওঁচায়ে উইঠ্যা বলে আঁরার মুখর গেড় চড়।
ঘরে যাই কুট্‌না বুড়ী চইলর হিসাব লড়।
পয়লে উইঠ্যা বলে আঁয়ার বুকখানা গেল।
নিত্যি পত্যি বারা বান্ধি কলিজা কইল্যা জোল।
পিছাই উইঠ্যা বলে আঁর গলা পেচা বাঁধ।
সঅল কাইতুন পুড়ি কোঁচাই পয়লে দিলাম ধান।
চালুনী উইঠ্যা বলে আঁয়ার চাক পেইচ্যা বাঁধ।
আড়াই পেঁচ ঘুড়াইয়া আঁই ভাসাইয়া তুলি ধান।
কুলাই উইঠ্যা বলে আঁর পিঠে একটা কুঁজ।
বাম হাতে পাটকাইয়া সুন্দরী উড়াইয়া দিছে তুস।

লাইয়ে উইঠ্যা বলে আঁই নিত্যি ঘুডাই ধান।
দুজনে দুকান চাই ধরি হেঁচকাই মারে টান। —চট্টগ্রাম

সারি গানের মধ্যে একমাত্র ঢেঁকির গানই স্ত্রীসমাজ কর্তৃক গীত হইয়া থাকে। এক অতি প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করিয়া ঢেঁকির গান বিকাশ লাভ করিয়া আসিতেছে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রসঙ্গ ইহার মধ্যে স্থান লাভ করিয়া আসিয়াছে। 'ধান ভানতে শিবের গীত', 'ধান ভানতে মহীপালের গীত' এই প্রবাদগুলিই তাহার প্রমাণ।

আজ সভ্য সমাজে মানুষের হাতেব কাজ যন্ত্র কাড়িয়া লইতেছে, সেই সূত্রেই আজ যন্ত্রের গর্জনেব মধ্যে কর্মসঙ্গীত-গাযকেব কণ্ঠ ডুবিয়া যাইতেছে। নদনদী মজিয়া যাইতেছে, নৌকাব ব্যবহার অপ্রচলিত হইতেছে—যেখানে এখনও কিছু কিছু নদ নদীব চিহ্ন বহিযাছে, সেখানেও নৌকার পরিবর্তে লঞ্চ ষ্টীমাব বা বৈঠা চালিত নৌকার পবিবর্তে বাষ্প চালিত পোত দেখা দিয়াছে; সেখানে মাঝির গানের অবকাশ নাই, কেবল যন্ত্রের গর্জন বেসুরা হইয়া তর্জন করিতেছে। যন্ত্রের সম্মুখে মানুষেব কণ্ঠ আজ দিকে দিকেই নীরব হইয়া যাইতেছে। সেইজন্য কর্মসঙ্গীতেব ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে, সারি গানের ক্ষেত্র সেই সূত্রে আবও সঙ্কুচিত হইযাছে।

আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথও কিছু সাবিগান রচনা করিয়াছেন, তাহা লোক-সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও এই বিষয়ে লোক-সঙ্গীতের সঙ্গে তাঁহার রচিত সারিগানগুলির কি পার্থক্য সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করা যাইতে পারে। সকল রবীন্দ্র-সঙ্গীতেই যেমন কথাকে একটি বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, তাহাব সারিগানেও ইহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় না। অথচ এ'কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, তালকে প্রাধান্য দিবাব জন্য লৌকিক সাবিগানের কথা প্রাধান্য লাভ কবিতে পাবে না, ভাষা যেমন অশিথিলবদ্ধ, ভাবও সেই পবিমাণে ইহাতে তরলায়িত হইয়া থাকে। পূর্বোদ্ধৃত সারিগানগুলি হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। কিন্তু ববীন্দ্রনাথের সারিগান তেমন নহে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, ববীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশে'র এই সাবিগানটি সুপরিচিত—

খরবায়ু বয় বেগে চারি দিক ছায় মেঘে,
ওগো নেয়ে নাওখানি বাইয়ো।

তুমি কষে ধরো হাল, আমি তুলে বাঁধি পাল
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো ॥

শৃঙ্খলে বার বার ঝন্ ঝন্ ঝঙ্কার
নয় এতো তরণীর ক্রন্দন শঙ্কার ;
বন্ধন দুর্বার সহ্য না হয় আর,
টলোমলো করে আজ তাই ও।
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো ॥

গণি গণি দিনখন চঞ্চল করি মন
বোলো না 'যাই কি না যাই রে'।
সংশয়পারাবার অন্তরে হবে পার,
উদ্‌বেগে তাকায়ো না বাইরে।
যদি মাতে মহাকাল, উদ্দাম জটাজাল
ঝড় হয়ে লুণ্ঠিত, ঢেউ উঠে উত্তাল,
হোয়ো নাকো কুণ্ঠিত, তালে তার দিয়ো তাল—
জয়-জয় জয়গান গাইয়ো।
হাঁই মারো মারো টান হাঁইও ॥

ইহা কথা-প্রধান ভাবকেন্দ্রিক গীত, অথচ কর্মের উন্মাদনার অভিব্যক্তিও ইহাতে সার্থক; ইহার রচনায় কবি কেবলমাত্র নৌকার কর্মরত দাঁড়ি মাঝিদিগের উপরই লক্ষ্য রাখেন নাই, তাঁহার নিজস্ব শিল্প ও সৌন্দর্য বোধকে জাগ্রত রাখিয়াছেন, ইহা সচেতন শিল্পসৃষ্টি বলিয়াই ভাবে ও ভাষায় অশিথিল। অথচ রচয়িতার কৃতিত্বের গুণে দাঁড়ী-মাঝির অঙ্গ সঞ্চালনের চিত্রগুলি পর্যন্ত ইহাতে চোখের সম্মুখে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু লোক-সঙ্গীত এই ভাব এবং শিল্প চেতনা লইয়া কেহ রচনা করে না, সেখানে কর্মের ভিতর হইতেই যেন সঙ্গীতের বিকাশ হইয়া থাকে; সেইজন্য কর্মের প্রকৃতি অনুযায়ী ইহা সহজেই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। ভাব এবং ভাষার দৈন্য ইহাতে কর্মের উল্লাসের ভিতর দিয়া পূর্ণ হইয়া যায়; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিকট এখানে কর্ম প্রত্যক্ষ নহে, তাহা গৌণ মাত্র; সেইজন্য ছন্দ, ভাষা এবং ভাব দ্বারাই ইহার প্রত্যক্ষ কর্মের অভাব

পূর্ণ করিয়া দিতে হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ইহাতে একমাত্র তাল ব্যতীত লৌকিক সারিগানের আর কোন রূপই প্রকাশ পায় নাই। লৌকিক সাবিগানে সাধারণতঃ দাদরার তাল শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই গানটিতে কতকটা অন্য সুর শুনা যায়। বিশেষতঃ দ্বিজেন্দ্রলাল যে পাশ্চাত্ত্য গানেব সুর অনুকরণ করিয়া বাংলা সারি শ্রেণীর গান রচনা করিয়াছিলেন, ইহার মধ্যেও তাহারই প্রভাব অনুভব করা যায়। বিদেশী ব্যাণ্ডের বাদ্যের তালে এই সঙ্গীত রচিত বলিয়া মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে। সুতরাং ইহার মধ্যে কেবলমাত্র তাল ব্যতীত বাংলা লোক-সঙ্গীতেব আর কোন রূপ নাই, কিন্তু কর্মসঙ্গীতে পৃথিবীর সর্বত্রই তাল অভিন্ন। অতএব কেবলমাত্র তাল ও ছন্দেব জন্যই ইহাকে বাংলা সারিগানের সমধর্মী বলিয়া উল্লেখ কবিবার কোন কাবণ নাই।

এক

নৌকা বাইচের গান

১

সুন্দরীলো বাইরইয়া দেখ,

শ্যামে বাঁশী বাজাইয়া যায় রে,

ও শ্যামে বাঁশী বাজাইয়া যায় রে।

শ্যামে বাঁশী বাজাইয়া যায় রে॥

ভাল, তাইরিয়া নাইরিয়া নাইরে তাইরে নাইরে নার

তাইরিয়া নাইবিয়া নাইরে তাইরে নাইরে নার॥

শ্যামে বাঁশী বাজাইয়া যায় রে।

ভাল, আষ্ট আঙ্গুল বাঁশী নারে মধ্যে মধ্যে ছেদা।

নাম ধরিয়া ডাকে বাঁশী কলঙ্কিনী রাধা॥

শ্যামে বাঁশী বাজাইয়া যায় রে॥

ভাল, বাঁশীটি বাজাইয়া কৃষ্ণে থইল কদম ডালে

লিলুয়া বাতাসে বাঁশী রাধা রাধা বলে।

শ্যামে বাঁশী বাজাইয়া যায় রে। —মৈমনসিংহ

২

মন ভজ তুমি রে গঙ্গা নারায়ণ।

আগে আগে যায় ভগীরথ শঙ্খের ধ্বনি দিয়ে

পাছে পাছে যায় গঙ্গা নদী নালা হইয়ে। —ঐ

৩

পিরীত করিয়া কুল মজাইল রে,

আরে নাগর কানাইয়া রে॥

আরে, ভাইরে,

পিরীত রতন পিরীত যতন পিরীত গলার হা

পিরীত কর‍্যা যেজন মরছে সফল জীবন তার

আরে. নাগর কানাইয়া রে॥

আরে, ভাইরে,
পিরীতি বিষম রে জ্বালা টেংরা মাছের কাঁড়া।
ছাড়াইলে ছাড়ানি যায় না, পিরীত বড় লেডা॥
আরে, নাগর কানাইয়া রে॥
আরে, ভাইরে,
পিরীতি দারুণ রে শেল যার অন্তরায় লাগে।
এক চইক্ষে নিদ্রা গেলে আর এক চইক্ষে জাগে।
আরে নাগর কানাইয়া রে॥
আরে, ভাইরে,
এক পিরীতি কর‍্যাছিল রাধে আর কানু।
রাধে বাজায় করতাল কানাইয়া বাজায় বেণু।
আরে, নাগর কানাইয়া রে॥
আরে, ভাইরে,
আর এক পিরীত কর‍্যাছিল ডাগ্‌গুয়ার সনে পাত।
পুর্দা পুর্দা অইয়া গেলে তেওনা ছাড়ে সাথ।
আরে, নাগর কানাইয়া রে॥
আরে, ভাইরে,
আর এক পিরীত করছে দেখ মাছে আর পানি।
তিলেক ছাড়িয়া থাকিলে উড্যা যায় পরাণি।
আরে নাগর কানাইয়া রে॥ —ঐ

অনেক সময় নৌকা বাইচের গানের বিষয় করুণ রসাশ্রিত হইতে পারে। কারণ, নদীর বিশাল বিস্তারের মধ্যে কেমন যেন একটু বিষাদের সুর আপনা হইতেই জাগিয়া উঠে।

৪

শশী কেন্দে বলে গো কোথায় রইল গৌর প্রাণধন।
আমার কোলের ধন, আমার জীবন ধন—
শশী কেন্দে বলে গো কোথায় রইল গৌর প্রাণধন।
বল বল নগররাসী কও কথা শুনি
এই পথে নি যাইতে দেখছ গৌর গুণমণি॥

ত্যজিলেক বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গেরি বরণ
অন্ধকার হইল নৈদে না দেখি নয়ন ॥ —ঐ

৫

নন্দ আগ বাড়াইয়া দেখ,
রাজপথে দাঁড়াইয়া গোপাল বইলে ডাক—নন্দ হে।
বিহানে গিয়াছে গোপাল কিছু না খাইয়ে,
কোন বনে রৈল গোপাল ধেনু বৎস নিয়ে—নন্দ হে।
ভাত হই কড কড়া, দুধে পৈল মাছি,
কোন বনে রৈল গোপাল দিনের উপাসী—নন্দ হে। —ঐ

৬

উদ্ধবরে, আইজ বাঁশীর রব শুনি শ্রবণে রাধা রাধা
বইলেরে ডাকিব কেমনে।
মথুরাতে গেলায় কৃষ্ণ হৈল ছয় মাস
সে অবধি শ্রীরাধিকা নিত্তি উপবাস।
যেখানে দেখিলাম কৃষ্ণ সেখানে সে নাই
ফুলরস বৃন্দাবনে হারালাম কানাই ॥ —ঐ

জল ভরিয়ে ঘাটে রইওনা শুন রাধে গো,
কালার নয়ন পানে চাইও না।
জলে যাইও না যাইও না ঘাটে রইও না গো ॥
যাইওনা সুন্দরী রাধে তরুতলে দিয়া
কালায় সেইছাছে পান পীরিতের লাগিয়া।
যমুনার জলে যাইতে পড়িল বিষম বাধা
ভাল মন্দ না জানিয়ে জলে গ্যাল রাধা ॥
যমুনার জলেরে যাইতে আর পন্থা নাই,
যে ঘাটে ভরিবার জল সেই ঘাটে কানাই,
যমুনার জলে যাইতে দেও করিল আন্ধি
পান্থ খানি হারা হৈয়ে কৃষ্ণ বইলে কান্দি,

যমুনার জলে যাইতে চালে চালে ঘর,
সঙ্গে রাধার কেহ নাই কেবল একেশ্বর।
শাশুড়ীয়ে গালি পাড়ে বাপ ভাইও তুলি,
কেমনে ভাঙ্গিলায় আমার সুবর্ণের কলসী,
বাড়ীর কাছে আছে যেন কুমারিয়া ভাই,
এক কলসী ভাঙ্গলে পরে আর এক কলসী পাই। —ঐ

নিমাই-সন্ন্যাসের বেদনাময় কাহিনী বাংলার লোক-সঙ্গীতের বিভিন্ন বিষাদমূলক বিষয়কেই অবলম্বন করিয়াছে—

কোয়িলার সুরে মায় কান্দেরে,
নিমাই চান সন্ন্যাসে যায় রে॥
আরে ভাল্
সন্ন্যাসী না অইও রে, নিমাই, বৈরাগী না অইও।
আগে তোমার মাও মরিলে পাছে সন্ন্যাস যাইও॥
লেখিয়া পড়িয়া নিমাই পণ্ডিত অইছ দড।
শয়াল বুঝাইতে পার, মাও কেন ছাড॥
নিমাই চান সন্ন্যাসে যায় রে॥
সন্ন্যাসে যে যাইবারে, নিমাই, তার নাই যে দায়।
ঘরে আছে বিষ্ণুপ্রিয়া কি অইব উপায়॥
আগে যদি জানতাম রে, নিমাই, যাইবারে ছাড়িয়া
ছুডু বেলা মার্‌য়া ফাল্‌তাম গলায় টিপুন দিয়া।
নিমাই চান সন্ন্যাসে যায় রে॥
আধ শরীল খাইছিল মায়ের গুয়ে আর মুতে।
আধ শরীল খাইছিল মায়ের মাঘ মাস্যা শীতে॥
মায়ের অঙ্গের বস্ত্রখানি যাদুর অঙ্গে দিয়া।
সারা রাইত পোহাইছিল মায়ে আনল বুকে লইয়া॥
নিমাই চান সন্ন্যাসে যায় রে॥

ছুডু বেলা পালছিলাম নিমাই দুগ্ধ কলা দিয়া।
অখন কেনে ছাড়্যা গেলা বুকে শেল দিয়া॥
নিমাই চান সন্ন্যাসে যায় রে॥ —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত গানটির প্রথম পদটি ধুয়া, অবশিষ্ট অংশের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। তাহাতে একটি সৌন্দর্যচর্চার বর্ণনা আছে। গোপীচন্দ্রের গানের হীরা নটীর রূপসজ্জায় এই প্রকার বর্ণনা আছে।

৯

শ্যাম রূপ সাজাইয়া দে গো ললিতে,
শ্যাম রূপ সাজাইয়া দে॥
আনিল বেসরের ঝাঁপি খুলিল ঢাকুনি।
দশ নউখে বাছিয়া লইল আবের কাঁকইখানি॥
একেত আবের কাঁকই চন্দনের ফোঁটা।
আঁচুরিয়া মাথার কেশ কল্ল গুটা গুটা॥
আচুরিয়া মাথার কেশ বাঁয় বান্ধিল খোঁপা।
খোঁপার উপুর তুল্যা লইল গন্ধরাজ আর চাঁপা॥
সেই খোঁপা বান্ধিয়া কন্যা খোঁপার পানে চায়।
দিলমন নাইসে খুসী অইলে খুয়াইয়া ফালায়॥
তারপরে বান্ধিল খোঁপা, খোঁপার নাম কেও।
খোঁপার মধ্যে লট্‌কিয়া রইছে বিয়াল্লিশ গণ্ডা দেও॥
বিয়াল্লিশ গণ্ডা দেও নারে বিয়াল্লিশ গণ্ডা মাছি।
তবুত কন্যার কেশ না ইলে এক গাছি॥
সেই খোঁপা বান্ধিয়া কন্যা দিলে খুসী হইল।
এক দুই কর‍্যা সাড়ি পৈরাইতে লাগিল॥
পরথমে পৈরাইল সাড়ি নামে মুক্তা মণি।
সাত রাজার ধন লাগ্যাছে সাড়ির গাঁথুনি॥
সেই সাড়ি পৈরাইয়া কন্যা সাড়ির পানে চায়।
দিলমন নাইসে খুসী অইলে দাসীরে পৈরায়॥
চাটগাঁও, সোনারগাঁও, হরিপুর মধুপুর লেখছে থরে থরে।
কত পক্ষীর নাম লেখ্যাছে সাড়ীর কিনারে॥

দইগল খঞ্জন লেখ্যা থইছে যার বুক কালা।
কুসুম পক্ষী লেখ্যা থইছে রাও শুনিতে ভালা॥
কুঁড়া কুঁড়ি লেখ্যা থইছে টুল্লুব্ টুল্লুব করে।
কানি বগা লেখ্যা থইছে গাল ফুলাইয়া মরে।
সাড়ির মধ্যে লেখ্যা থইছে হাঁসা হাঁসীর জোড়া।
সাড়ির মধ্যে লেখ্যা থইছে টাডি টাঙ্গন ঘোড়া॥
সাজিয়া পারিয়া কন্যা মুখে দিল পান।
ঘর্ তনে বাহির অইল পুন্ন্ মায়ের চান॥
সাজিয়া পারিয়া কন্যা ঘরের বাইরি অইল।
চান সুরুজ লজ্জা পাইয়া আবরে লুকাইল॥ —ঐ

কোন কোন অঞ্চলে নৌকা ছাড়িবার পূর্বে মাঝিরা এই গান গাহিয়া থাকে—

১০

গুরুমান, পথ চেন কেন বেড়াও ঘুরে,
হাট করতে এসেছ বান্দা ভবের হাটুরে।
ভবের হাটে এসে বান্দা বেচ কেন খাও,
আলিস্যি কর না, বান্দা, আল্লার নাম নাও। —খুলনা

বাইচ খেলায় হারিয়া গেলে মাঝিরা কোন কোন অঞ্চলে গাহিয়া থাকে—

১১

নিমাই সন্ন্যাসের কথা মায় যেন শোনে না,
আমি যাবো ঐ বৃন্দাবনে, আমার মা যদি শোনে,
শুনলে পরে শচীরাণী বাঁচবে না প্রাণে।
আমি মায়ের একা পুত্রধন—
আমি বিহন মায়ের এ সংসার সং-সারের জীবন।
আমার মায়েরে তোমরা করো সান্ত্বনা। —ঢাকা

যখন বাইচ খেলা শেষ হইয়া যায়, গৃহাভিমুখে ফিরিবার জন্য মাঝিরা প্রস্তুত হয়, তখন কোন কোন অঞ্চলে তাহারা এই গানটি গাহিতে থাকে—

১২

বেলা গেল সন্ধ্যা হল,
কানাই এবার গৃহে ফিরে চল।
ওই দেখ গগনেতে নাহি আর বেলা
গোঠেব খেলা খেলবে কত বল ?
ডেকে বলে বলাই, ও নীলমণি,
তোর লাগিযা কাঁদিছে জননী,
চল রে সকাল সকাল গৃহেতে যাই,
গোঠের খেলা সাঙ্গ হল।

—ফবিদপুব (কোটালিপাডা)

বাইচের নৌকা যখন মালিকের ঘাট হইতে রঙ্গক্ষেত্রের দিকে রওনা হয়, যখন গ্রাম-বধূরা বরণ-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তখন কোন কোন অঞ্চলে এই গানটি কাঁসার তালে তালে গীত হয়—

১৩

কয় নীলমণি, ও জননী।
সাজাইযা দাও গোষ্ঠে যাব আমি
যাব গোচারণে রাখাল সনে
বলাই দাদা শিঙেয় দিচ্ছে ধ্বনি।
দে মা! মোহন বাঁশী মোহন চুডা,
কটিতে, মা, বাঁধ পীতধরা—
দেও, মা, পায়ে নৃপুব, হাতে বলয,
বাখালবেশে সাজিয়ে দেও তুমি ,
শোন মা! গাভী বৎস রাখালগণে,
সবাই চেয়ে আছে আমাব পানে,
আমি না গেলে, মা, গোচারণে—
ধেনুগণ খায় না তৃণপানি। —ঐ

আরঙ্গের চলতি পথে পুরুষের কণ্ঠে এই মেয়েলী গীত শুনিতে পাওয়া যায়—

১৪

কোন কোন সখি তোরা যাবে গো জল ভরিতে,
(ওগো) জল ভরিতে (ওগো) জল ভরিতে।
সাজিয়া চল গো, সখি, জলের ঘাটে যাই,
(হাঁ হাঁ বেশ)
যে ঘাটে ভরিব জল সেই ঘাটে কানাই (গো)।
জল ভর সুন্দরী, কন্যা, জলে দিয়া ঢেউ,
(হাঁ হাঁ বেশ)
হাসি মুখে কও কথা ঘাটে নাই কেউ। (গো)
জল ভর সুন্দরী, কন্যা, জলে দিয়া মন,
(হাঁ হাঁ বেশ)
কাইল যে কইচ্‌লাম কথা আছেনি স্মরণ (গো)

—মৈমনসিংহ

১৫

বাজ্‌ল বাঁশী গইন কাননে, প্রিয়ে রাধে রাধে বইলে,
প্রিয় রাধে রাধে বইলে (গো) প্রিয় রাধে রাধে বইলে।
আষ্ট আঙ্গুল বাঁশের বাঁশী মধ্যে মধ্যে ছেদা,
(হাঁ হাঁ বেশ)
নাম ধরিয়া ডাকে বাঁশী কলঙ্কিনী রাধা (গো)
আষ্ট আঙ্গুল বাঁশী নারে জলে ভাস্যা যায়,
(হাঁ হাঁ বেশ)
বালু চড়ে ঠেক্যা বাঁশী রাধা গুণ গায় (গো)
যদিরে শ্যামের বাঁশী তোর লাগাল পাই,
(হাঁ হাঁ বেশ)
জড়ে পড়ে উগ্‌ড়াইয়া সায়রে ভাসাই (গো)। —ঐ

১৬

আমার গৌর যায়রে আরে নবীন সন্ন্যাসে,
নবীন সন্ন্যাসে, আরে নবীন সন্ন্যাসে।

সন্ন্যাসী না অইও, বাছা, বৈরাগী না অইও,
অভাগিনী মায়ের পরাণ বধিয়া না লইও।
আগে যদি জান্তাম, নিমাই, যাইবেরে ছাড়িয়া,
কুলবধূ বিষ্ণুপ্রিয়া না করাইতাম বিয়া।
নিমতলে থাক, নিমাই, নিমের মালা গলে,
অইয়া পুত্র মইরা যাইতা না লইতাম কোলে। —ঐ

কোন কোন সময় নৌকা বাইচের গানের মধ্য দিয়া সকরুণ বাৎসল্যরস যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে—

১৭

যাত্রা করাইয়া মোরে দেগো, মা, নন্দরাণী,
মাগো, কালীদয়ে যাব আমি।
যাত্রা করাও, নন্দরাণী, বেইলের দিকে চাইয়া,
আইজের যাত্রা করাইয়া দাও তেল সিন্দূর দিয়া।
যাত্রা করায় নন্দরাণী মুখে দিয়া পান,
ঘরত না বাইরি আইল পুন্নুমাসীৰ চান্।
ভাত যে রান্ধিবা, মাগো, না ফালাইও ফেনা,
কালীদয়ে যাইতে, মাগো, না কৰিও মানা।
সাজ সাজ, বইলাবে, নগরে দিল সাড়া,
শ্রীকৃষ্ণের সাজন দেইখ্যা সাজে গোয়ালপাড়া। —ঐ

অনেক সময় বাইচ আরম্ভ করিবার সময় বন্দনা গান গাওয়া হয়—

১৮

প্রথমে বন্দনা করি নিত্যানন্দ গৌরহরি।
নিত্যানন্দ গৌরহরি, নিত্যানন্দ গৌরহরি।
দ্বিতীয়ে বন্দনা করি পুবে ভানুশ্বর,
এক দিকে উদয় ভানু চৌদিকে পশর।
তৃতীয়ে বন্দনা করি দেবী সরস্বতী,
এস, মাগো, মোর কণ্ঠে করহ বসতি।
তার পরে বন্দনা করি দেব ত্রিপুরারি,
মাথে শোভে গঙ্গাদেবী বামে শোভে গৌরী।

পশ্চিমে বন্দনা করি ঠাকুর জগন্নাথে,
পুনর্জন্ম নাহি তার যে দেখ্যাছে রথে।
দক্ষিণে বন্দনা করি ক্ষীরনদী সাগর,
যাহাতে বাণিজ্য করে চান্দ সদাগর।
ভকতি করিয়া বন্দি জগৎগুরু হরি.
বৈষ্ণবের চরণ বন্দি নমস্কার করি।
সর্ব দেব দেবীর পদ বন্দি ভক্তি করি,
এই পর্যন্ত বল্যা আমি বন্দনা সাঙ্গ করি। —ঐ

ভোলান গাওয়ার সময় নৌকা চালানো বন্ধ করিয়া মাঝিরা নৌকার কিনারায় বৈঠার গোড়ালী ঠুকিয়া ঠুকিয়া তাল রক্ষা করিয়া গায়—

১৯

দিশা—শুন, ললিতে, কই তোমারে শ্যাম পীরিতের লাঞ্ছনা,
হায়, পীরিত আমারে ছাইড়ো না॥
বয়াত—পীরিত যতন পীরিত রতন গো
হায় গো—পীরিত গলার হার,
পীরিত কইর‍্যা যে জন মরে সফল জীবন তার।
হায়, পীরিত আমারে ছাইড়ো না॥
এক পীরিতি কইর‍্যাছিল গো হায় গো, রাধের সনে কানু,
কোন যুগে করছিল পীরিত আইজো ঝুরে তনু হায়।
এক পীরিতি কইর‍্যাছিল গো হায় গো, রাধে কইতো পারে,
নন্দের ছাইল্যা ভাইগ্না লইয়া ফিরছিল বনে বনে হায়॥
এক পীরিতি কইর‍্যাছিল গো হায় গো, ডাগুয়ার সনে পাত,
ফুরদা ফুরদা হইয়া গেলেও তেও না ছাড়ে সাথ, হায়॥
এক পীরিতি কইর‍্যাছিল গো হায়গো, চডা আরও চড়ি,
কোন যুগে করছিল পীরিত আইজো টানে বেড়ি, হায়।
এক পীরিতি কইর‍্যাছিল গো হায় গো, লঙ্কারি রাবণ,
ঘুর ঘুইর‍্যা বানরে হায় মজাইছিল্ ভুবন, হায়॥
পীরিত যতন পীরিত রতন গো হায় গো, পীরিত যে জন করে,
একশো একখান আক্কল তাহার বিন্‌ওস্তাদে বাড়ে হায়॥

লোহার সনে কাঠের পীরিত গো হায় গো, জলে ভাসে ছুই জনা,
জলের সনে মাছের পীরিত জল বিনে প্রাণ বাঁচে না,
হায়, পীরিত আমারে ছাইড়ো না॥ —মৈমনসিংহ

২০

দিশা—ঝুম ঝুম নেফুর বাজে
রাধার পায় লো,
জল ভবিবার সাধ নাই॥

বয়াত—বাধিকা জলেতে যায় গো, হীরার কলসী লইয়া,
কিষ্ণ ঠাকুর পাছে চলে মূরলী বাজাইয়া।
বাধিকা জলেতে যায় গো, মেঘে কৈরল ঘোর।
চলিতে না পারে রাধে চরণে নেযুব॥
রাধিকা যায় জল ভরিতে মেঘে কৈবল আন্ধি।
কাঙ্খের কলস ভাইঙ্গ্যা গেল, হাত রইলো কান্ধি॥
জল ভর সুন্দরী, কইনা, জলে দিছ ঢেউ।
একেলা ভরিছ জল নাকি সঙ্গে আছে কেউ॥
জল ভরি সুন্দবী, কইনা, জলে দিছি ঢেউ।
একেলা ভরিছি জল সঙ্গে নাই মোর কেউ॥
জল ভর সুন্দরী, কইনা, জলে দিছ মন।
কাইল যে করছিলা সত্য আছেনি স্মরণ॥
জল ভরি সুন্দরী, কইনা, জলে দিছি মন।
কালি যে করছিলাম সত্য আছে তো স্মরণ॥
জল ভর সুন্দরী, কইনা, কল্‌সী কর কাইত।
আমি যে জিজ্ঞাসা করি তুমি কোন জাইত্॥
জল ভরি সুন্দরী, কইনা, কল্‌সী করি কাইত্।
আমি তো গোয়ালার মাইয়া তুমি কোন জাইত্॥
তুমি তো গোয়ালার মাইয়া আমি বরাহ্মণ।
আমাব সঙ্গে করতে আলাপ কিসের লাজ-শরম॥

কলসী ভরিয়া রাধে থইলো তরুতলে।
তরুর ফুল ঝরিয়া পড়ে কলসীর মাঝারে ॥
আগে যদি জানতাম রে, তরু, পডবে রে ঝরিয়া।
শাডীরো আইঞ্চলে রাখতাম কলসীর মুখ ঢাকিয়া ॥
কলসী ভরিয়া জলে থইলো সরাই পথে।
সেই কলসী ভাঙ্গিয়া ফাল্‌লো বিনন্দ রাখওয়ালে ॥ —ঐ

২১

দিশা—বাঁকা শ্যাম, তোর বাঁশীর গানে জগৎ ভুলাইলে ॥
বয়াত—বাঁশী দে বাঁশী দে, কন্যা, বাঁশী দে আমারে।
বাঁশীর লাগি করব কান্দন গোকুল মাঝারে ॥
বাঁশের দেশে থাকরে কালা, বাঁশের কিবা দুখ্‌ ?
আষ্ট আঙ্গুল বাঁশীর লাইগ্যা কালা করল্যা মুখ ॥
বাঁশীটি বাজাইয়া কৃষ্ণ থইল কদম ডালে।
লিলুয়া বয়ারে বাঁশী রাধা রাধা বলে ॥
রাধার বস্ত্র কানাইর বাঁশী থইয়া নাম্‌ল জলে।
বস্ত্র নিল চিকণ কালায়, কলসী নিল সোতে ॥
আষ্ট আঙ্গুল বাঁশের বাঁশী মধ্যে দিয়া ছেঁদা।
নাম ধরিয়া বাজে বাঁশী কলঙ্কিনী রাধা ॥
আষ্ট আঙ্গুল বাঁশের বাঁশী জলে ভাইস্যা যায়।
বালুচরে ঠেইক্যা বাঁশী রাধার গুণ গায় ॥ —ঐ

নৌকা বাইচের সঙ্গে জল ও নদীর সম্পর্ক আছে বলিয়াই ইহাতে নদনদীও জলের ঘাটের চিত্রগুলি সহজেই জাগিয়া উঠে। এখানে যমুনা-স্নানে আসিয়া শ্রীরাধিকা কি ভাবে নিজের বস্ত্রখণ্ড শ্রীকৃষ্ণের হাতে হারাইয়াছেন, তাহার সরস বর্ণনা পাওয়া যায়।

২২

সকলে—মায় কান্দেরে নিমাই চান সন্ন্যাসে যায় রে ॥
বয়াতি—শচী মায়ের কান্দনেতে বিক্ষের পত্র ঝরে।

সকলে—নিমাই চান সন্ন্যাসে যায় রে।
বয়াতি—যখন জন্মিলে রে, নিমাই, নিমতরুর মূলে,
হইয়া কেন না মর্‌ছিলে, না লইতাম কোলে ॥
সকলে—নিমাই চান সন্ন্যাসে যায় রে।
বয়াতি—আগে যদি জানতামরে, নিমাই, যাইবে রে ছাড়িয়া।
এমন অল্পকালে তোরে না করাইতাম বিয়া ॥
সকলে—মায়ের দুর্লভ চান গেলে কোথাকারে।
অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া, নিমাই রে, দিয়া গেলে কারে ॥ —ঐ

২৩

সকলে—ও সই, যাবেনিগো যমুনায় জল আনিবার ছলে।
কি রূপ দেখিয়া আইলাম কদম্বের মূলে ॥ ও সই…
বয়াতি—একদিন রাধে স্নানের বেলায় কিনা কাম করিল।
দেখ, সোনার কলসী কাঁকে লইয়া যমুনাতে গেল ॥
সকলে—ও সই, কি রূপ দেখিয়া আইলাম কদম্বের মূলে।
বয়াতি—কাহার পিন্ধন লাল নীল, কাহার পিন্ধন সাদা,
সুন্দর রাধিকার পিন্ধন কৃষ্ণ নামটী লেখা।
সকলে—ও সই, যাবেনি গো যমুনায় জল আনিবার ছলে।
বয়াতি—জলের ঘাটে গিয়া রাধা কি না কাম করিল,
দেখ, বসনখানি বাইখ্যা পাড়ে জলেতে নামিল ॥
সকলে—ও সই, যাবেনি গো যমুনায় জল আনিবার ছলে।
বয়াতি—সখীগণ সঙ্গে রাধা জলকেলি করে,
কল্‌সী গেল সুতে ভাইস্যা বসন নিল চোরে।
গলা পানিত থাকিয়া রাধা বসনখানি চায়,
কালা বলে এইরূপে কি বসন দেওয়া যায়।
সকলে—ও সই, যমুনায় জল আনিবার ছলে।
বয়াতি—কোমর পানিত থাকিয়া রাধা চাহিল বসন।
শ্যাম বলে, রাধে, তোমার নাই কি সরম ?

সরমে ভরমে কি হইবে—

তখন হাঁটু জলে থাকিয়া রাধা চাইল বসনখানি,
কৃষ্ণ বলে, দেখি তোমায় তীরে আইস ধনি!
তীরে উঠিয়া রাধা বলে বসন দাও হে, শ্যাম,
কৃষ্ণ বলে আগে রাধে যৌবন কর দান।

সকলে—ও সই, যাবে কিগো যমুনার জল আনিবার ছলে। —ঐ

যখন নৌকাগুলি ঘরে ফিরিয়া আসে, তখনকার গান—

২৪

মায়ের কথা মনে হইল রে, লক্ষ্মণ, ভাই,
চল আমরা দেশে যাই।
হেঁহইয়া হো। হেঁহইয়া হো॥ —ঐ

২৫

জল ভরিতে যাইস্ না কদমতলা দিয়া।
কানাইয়া পাইতাছে ফান পীরিতের লাগিয়া॥ —ঐ

২৬

যা গো, বৃন্দে, মথুরাতে শ্যামকে আনিতে।
একবার আইনে দেখা, দূতী, আমার জীবন থাকিতে।
কাল আস্‌বে বলে বন্ধু আমার গেল এই পথে,
পন্থ চাহিতে অন্ধ হইলাম সখি আসার আশাতে। —ঐ

নৌকা লইয়া যাত্রা করিবার গান—

২৭

যাত্রা করাইয়া দে শুভরাণী,
কালীদহে যায় কৃষ্ণ বাজাইয়া মুরলী।
হেঁহইয়া হো! হেঁহইয়া হো!! —ঐ

বিজয়ার দিনে যশোহর অঞ্চলে এই প্রকাব সারিগান শুনা যায়—

২৮

হা রে ও মাঝি, বসে ভাবছ কি।
ধান দূর্বা লয়ে হাতে দাঁড়ায়ে আছে ঝি॥

ভালো ছদে চিনি দিয়ে রামসাগরের ধারে।

তারাদেবী রাণীর মেয়ে দাঁড়ায়ে পথের ধারে ॥ —যশোহর

উত্তর বাংলার নদনদীযুক্ত অঞ্চল হইতেও কয়েকটি সারিগান সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের নাম বিশেষ একটা শুনিতে পাওয়া যায় না—

২৯

হো, ঐ দেখ্ কে যায়রে,
নিশান টাঙাইয়া নাও বাইয়া,
জিজ্ঞাস কইরা ছাখ তারে কোন্ বা দেশী নাইয়া।
বাইছালী খেলাইয়া মধুর স্থরে যায় গান গাইয়া,
নিশান টাঙাইয়া নাও বাইয়া।
ছাডছে তরী তাডাতাডি, কোন্ বা ছাশ বলিয়া,
কোন্ ছাশ হইতে কোন্ ছাশে নাও লাগাবে বাইয়াবে,
নিশান টাঙাইয়া নাও বাইয়া।
নিদ্রা নাই বিশ্রাম নাই ভাত পানি না খাইয়া,
বিনা পয়সায় ব্যাগাব খাটে কোন বা সে স্থখ পাইয়ারে,
নিশান টাঙাইয়া নাও বাইযা।
দেখিয়া নাওখানি কহে মজিদ্ মিঞা
নাওরে বার্নিশ দিছে, রং লাগাইছে
চকমকিবাব লাইগারে,
নিশান টাঙাইয়া নাও বাইয়া। —রাজসাহী

এই গানটির মধ্যে একটু আধ্যাত্মিক স্থর শুনিতে পাওয়া যায়, তবে ইহাতে নৌকা, মাঝি ইত্যাদির চিত্র আছে—

৩০

আমার একা যেতে ভয় করে,
চলরে, গুরু, দুজন যাই পাডে।
আমার এ দেহ পাষাণের সমান,
গুরু এসে মন্ত্র দিয়ে করল ফুলবাগান।
(চল দু'জন যাই পাডে)।

বাগানে ফুল ফুট্যাছে, বাস ছুট্যাছে,
সৌরভ ছুট্যাছে রে,
ও তাতে অধর চাঁদ বিরাজ করে,
চলরে গুরু দু'জন যাই পাড়ে।
আগে দেহের স্বভাব ছাড বাহির ভিতর সমান কর,
সুজন মাঝির সঙ্গ ধর, নিবেন নৌকায় তুলে।
মায়ার খেলা ছাডরে মন বেলা যায় তোর বহিয়া।
চৌষট্টি বচ্ছরের পাড়ি বেলা আছে দণ্ড চারি,
বেলা শেষে বসবে নবি আসবে ঘাটে বসে আয়,
মায়ার খেলা ছাড়রে মন বেলা যায় তোর বহিয়া।

—দিনাজপুর

৩১

উজান মুখে চালাও তরী দরিয়ায়,
ওরে ঈশান কোণে ম্যাঘ উঠ্যাছে রে
লাওয়ের বাদাম লিলে তায়!
(হারে) বাউরী বাতাস লাগে আইস্যা
কালাপানীব গায়
লাওয়ের বাদাম লিলে তায়॥
(ওরে) ঢেউয়ের বুকে হালের দড়ি ছিঁডল বুঝি হায়,
(ওরে) গুরুর নামে সিন্নী দিব রশুল পীরের দরগায়,
লায়ের বাদাম লিলে তায়। —ঐ

কিন্তু পুর্ববঙ্গে প্রচলিত সারিগানের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের চিত্র ব্যতীত বিশেষ আর কোন চিত্রই নাই—

৩২

যা গো বৃন্দে, মথুরাতে, শ্যামকে আনিতে,
একবার আইনে দেখা, দূতি, আমার জীবন থাকিতে।
কাল আসবে বইলে বন্ধু আমার—ও গো গেল ঐ পথে,
আমি পন্থ চাইয়া অন্ধ হইলাম সখি শ্যামের আশাতে।

* * * *

আমি কারে বা দেখাব দুঃখ হৃদয় চিরিয়া,
আমার সোণার অঙ্গ মলিন হইল ভাবিয়া চিন্তিয়া।
রাজার ঝিয়ারী আমি থাকি বিপিনে বসিয়া,
শাশুরী ননদী ডাকে শ্যাম, কলঙ্কী বলিয়া।

* * *

সুবল বল বল বল ভাই
কেমন আছে কমলিনী রাই,
যার কারণে বৃন্দাবনে, রে সুবল
কান্দিয়া সদা বেড়াই।
ডুবেছিলাম মান-সায়রে
সাধিলাম রাইএর চরণ ধরে,
নয়ন তুলে চাইল নাকো রাই,
আমার যত ময়লা
সব হল বিদূর যে সুবল—
আমি জন্মের মত বিদায় চাই। —মৈমনসিংহ

গৃহস্বামীর ঘাট হইতে নৌকা যাত্রার কালে পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলে সাধারণতঃ গীত হয়—

৩৩

যাত্রা করাইয়া দে, মা, কালীদয়ে যাই গো,
চূড়া বান্ধিয়া দে।
চূড়া বান্ধিয়া দে, ধড়া পরাইয়া দে,
শিঙ্গা রবে বলাই দাদা বলিছে ডাকিয়া,
সকাল কইরা আয় রে, কানাই, ক্ষীর ননী লইয়া। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত গানগুলি সাধারণতঃ যখন কোন প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়, তখনই গাওয়া হইয়া থাকে। নদীতে নৌকার উপর প্রতিমা তোলা হয় এবং ডুবকিগুবা ও একতারা বাজাইয়া দলবদ্ধভাবে এই গান গাওয়া হয়।

৩৪

কোথায় আছ, নবীন কাণ্ডারী।
যমুনাতে পার করিতে আন পারের তরী॥
সকালে এসেছি মোরা যত ব্রজনারী।
হাজার ডাকে রা করো না বুকের পাটা ভারী॥
এবার কোথায় আছ নবীন কাণ্ডারী।
ছানা, মাখন বেচব বলে এলাম তাড়াতাড়ি।
বাজার বেলা বয়ে যায়, তাইত ভেবে মরি॥
এবার কোথায় আছ নবীন কাণ্ডারী॥
এবার সামাল সামাল হেলে, দাদা, হাল যেন ঠিক থাকে।
ভাইরে পশ্চিমে উঠেছে ও মেঘ তুফান ঘন ভারি।
এঁটে মেরো হালে থাবা, গেয়ে গানের সারি। —মুর্শিদাবাদ

এই গান প্রতিমা বিসর্জনের সময় নৌকায় চড়িয়া একজন দাঁড়ি গাহিয়া যায়, আর কয়েকজন দোহার গানের প্রথম মাত্রা গাহিয়া যায়। তারপর মূল গায়েন একের পর এক অন্তরা গাহিয়া যায়, গায়ক পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অবস্থা বিশ্লেষণ করে, কাহারও গুণগান করে, কাহারও দুর্নাম করে। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে দেব-দেবতার সম্বন্ধে বা ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু লইয়াও এই গান রচিত হয়, তবে এই গান প্রধানতঃ নৌকার দাঁড়ি মাঝিগণই গায়।

৩৫

ও ভাই, পুলিন্দাতে বেজেছে ঢোল,
লাগল হট্টগোল, চল্ সজনী, নৌকা বেয়ে কিসের কলরোল॥
মনোহর মণ্ডল ভাবছে বসে টাকা বাড়বে কিসে।
গড়গড়াতে তামাক টেনে খুকুর খুকুর কাশে॥
অন্নদা শুঁই ভাবছে বসে বাঁচা হল দায়,
ডাকাত ভয়ে বন্দুক নিয়ে সদাই জেগে রই।
ও ভাই, পুলিন্দাতে বেজেছে ঢোল কিসের কলরোল॥
ও পারার ওই পেনী বাবু হয়েছে কাবু,
টুপা পানার মধ্যে পড়ে খাচ্ছে হাবুডুবু।
ও ভাইরে· ····কিসের কলরোল।

শিশু দন্তের খাড়ছে ভুঁড়ি হচ্ছে কোলা ব্যাঙ,
সূর্য দে ব্যাপার দেখে লাফায় তিড়িং তাং।
ও ভাইরে ····· কিসের কলরোল।
ধর্মরাজের পূজা দিতে বাঁধলো হট্টগোল,
ঠুনকো মুডোল ঠাকুর চরণ হয়েছে পাগল॥
রামনাথপুরের মদনমোহন ক্ষুদ্র মুখে কয়,
আমাদের এই রঙ্গরসে না ধরবেন ভুল, মহাশয়॥
ও ভাইরে, পুলিন্দাতে বেজেছে ঢোল লাগ্‌ল হট্টগোল।
চল, সজনী, নৌকা বেয়ে কিসের কলরোল। —মুর্শিদাবাদ

রাজসাহী হইতে সংগৃহীত নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে নাটোরের রাণী ভবানীর কন্যা তারাদেবীর নাম শুনিতে পাওয়া যাইতেছে—

৩৬

ওরে, ও মাঝি। বসে ভাবিস্ কি।
ধানদূর্বা লয়ে হাতে দাঁড়িযে আছে ঝি॥
খাঁটি দুধে চিনি দিয়ে রামসাগরেব পারে।
তারা দেবী রাণীব মেয়ে দাঁডাযে পথেব ধারে॥
দশভুজা করে পূজা প্রসাদ লযে হাতে।
দশমীর আরতি দিতে দাঁড়ায়ে আছে পথে। —রাজসাহী (নাটোর)

৩৬

তুমি ও যে সুন্দর, কানাই, আমি তোমার মামী।
কোন সাহসে বল রে, কানাই, জল ফেলাব আমি॥
তুমি ও যে সুন্দর, কানাই, না করিলে বিয়ে॥
পরের রমণী দেখি, কানাই, মব জলে পুড়ে॥
কোথায় পাব টাকাকড়ি কোথায় পাব মাইয়ে।
তোমার মত সুন্দরী পেলে করতেম আমি বিয়ে॥ —খুলনা

৩৭

জল পোরো রাই, বিনোদিনী, জলে দিয়া ঢেউ,
নয়ন মেলে কও কথা ঘাটে নাই কো কেউ।

দেখিয়া যমুনার ঢেউ রে, ও নাগর, প্রাণ কাঁপেরে ডরে,
আজ আমি কব না কথা যা ফিরে তোর ঘরে।
কেমন তোমার মাতাপিতে কেমন তোমার হিয়ে,
বার বছর হয়েছে বয়স না দিয়েছে বিযে।
ভাল আমার মাতাপিতে ভাল আমার হিয়ে,
তোমার চায়ে সুন্দর কুমার সেই করেছে বিযে।
পরের নারী দেখে কুমাব জ্বলে পুড়ে মর।
নিজ ধন ভাঙ্গায়ে কুমাব বিয়ে না রে কর ॥
কোথায় পাব টাকাকড়ি কোথায় পাব মাইয়ে।
তোমার মত সুন্দরী নারী, কোথায পাব যাইযে ॥
আমার মত সুন্দর নারী, কুমাব, যদি চাও।
উলুর ছোটা কলসী নিযে যমুনায় ভাসাও ॥
কোথায পাব কলসী, নারী, কোথায পাব দড়ি।
তুমি হও যমুনার জল আমি ডুবে মবি ॥ —যশোর

৩৮

তুমি ও সুন্দব, কানাই, তোমার ভাঙ্গা নাও।
কোথায় থোব দুধের পসব বে, কানাই, কোথায় থোব পাও ॥
ভাঙ্গা নয় নৌকাখানি, বাধে, পসবি সার।
কত হস্তীঘোড়া করলেবে পার, তোর কি এত ভাব ॥
অর্ধেক গাঙে যায়ে কানাই নৌকায় দিল নাচা,
উড়িল রাধিকার প্রাণ কানাই নাওর ভাঙ্গিল পাছা ॥
বাহ বাহ বাহ, কানাই, বাহে ধঁর কুল।
এ ধন যৌবন দিব, কানাই, গঙ্গায় দিব পুল ॥ —ঐ

৩৯

পার কর পাব কর, কানাই, বেলার দিকে চায়ে।
দধিদুগ্ধ হল নষ্ট, দিবা গেল বয়ে ॥
সকল সখি পার করিতে লব আনা আনা।
রাধিকারে পার কবিতে নিব কানের সোণা ॥ —খুলনা

৪০

কোন বনে লুকাইলে আইজ তুমি রে, ও শ্যাম বন্ধু রে—
ওরে তরল্যা বাঁশের বাঁশী হাইল্যা পড়ে আগা,
রাইত দুপরের কালে বাঁশী বলে রাধা রাধা।
বাজাইয়া বুজাইয়া তুইল্যা থুইলাম চালে,
কোন চুরা বাজাইল বাঁশী রাইত দুপুরের কালে।
বাঁশীর সুর শুইন্যা আমার পরাণ ত না রয় ঘরে।
ও শ্যাম বন্ধু রে, কোন বনে লুকাইলে আজ তুমি রে॥ —ফরিদপুর

এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পুর্ববঙ্গে এই সকল সঙ্গীতের গায়ক শতকরা একশত জনই মুসলমান, ক্বচিৎ এক আধজন নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুও থাকে। সুতরাং গানগুলি মুসলমান কর্তৃক রচিত এবং মুসলমান গায়কের গীত। কিন্তু বিষয়-বস্তু প্রায় সর্বত্র রাধাকৃষ্ণ কিংবা নিমাই।

৪১

পেরভাতে গা তুলিয়া কোথায় গেলিরে নিমাইচাঁদ।
মন্দিরার খোপ র'ল খালি, রলো খালি,
সোনার খাট পালং রলো খালি,
পেরভাতে গা তুলিয়া কোথায় গেলিরে নিমাইচাঁদ।
কোহান ত্যা আইল ঠাহুর বইতি দিলাম পিড়া,
জলপান কইরাতি দিলাম শাইল ধানের চিড়া।
কিবা মনতোর-দিয়া গেল নিমাইচান্দের কানে,
ত্যাখোরে পাড়ার লোক ত্যাখোরে চাইয়া,
নিমাইচাঁদ সন্ন্যাসী চলে, জননীরে ছাইড়া।
আগে যদি জানতাম, নিমাই, যাবারে ছাইড়া,
না খাইতাম তনের দুকদু না লইতাম কোলে।
ওরে বৈরাগী না হইও, নিমাই, সন্ন্যাসী না হইও,
ওরে নগরে নগরে মাঙ্গিয়া দিবো ঘরে বইসা খাইও। —ঐ

সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বন করিয়াও লঘুপ্রকৃতির বহু সারিগান রচিত হয়, কিন্তু এই শ্রেণীর এক বছরের গান অন্য বছর শুনিতে পাওয়া যায় না।

দুই

ছাতপেটার গান

নৌকা বাইচের গানেরই একটি অধঃপতিত রূপ ছাতপেটার গান, নদনদী খালবিল শুকাইয়া যাইবার ফলে এখন নৌকা বাইচের পরিবর্তে ছাত পেটানোর সময় সারিগান গাওয়া হয়—

১

বউছ আমার নাইওর যাইতে চায়,
রঙ্গিলা দিদি গো,
বউছ আমার লাওর যাইতে চায়।
(দিদি গো) ভাত আন্‌তে জানেনা বউ
ভাত যে পাকায়,
আফুটা ভাত খাইয়া গুষ্টির প্যাট বুড বুডায়।
(দিদি গো) আমার বৌয়ের নজর ভালো নয়,
বৌ কি সরমায়,
আলগা মানুষ ছাপলে বৌ যে উঁকি মারা চায়।
(দিদি গো) আর একটা দোষ আছে যে বৌর
ক্যাবল পইডা ঘুমায়।
ঘুম দিয়া বৌ স্বপ্নের পরে নাইওরের গীত গায়।
(দিদি গো) এ বৌ দিয়া কামু চলবেনা কয় মজিদ মিঞায়,
নাক চুল কাট্যা কইর‍্যা দেই বিদায়। —রাজসাহী

২

গেন্দা ফুল তুলতে গেনু সাট ঘডিয়ার জোঙ্গলে,
আড নয়নে দেখলে এসে গয়লাদের ওই দঙ্গলে।
গয়লার বেটা কিষ্টো ছোঁডা মা যশোদার নয়নমণি,
কুলনারীর ধরম গেইল দেইখ্যে তাহার চোখ ঠারানি। —ঐ

একখানা বোন্দাল বাড়ী, যাইতাম ঘুরি,
হারালাম না আর মুই এই খানে।
হারে কাজ খাইলে কিয়া, হারতাম ছাই ,
কত হাতে ধরি, হ্যান্ত করি,
বইচা মাছ দিয়া ভাত খাওয়াই,
এখনে কি করমু, কোথায় যাইমু, চিতাল মিঠাই নাই।
আর বন্ধু, গুণ্ গুণ্ স্বরে গীত গাইয়া যাও,
তখন মুই ঘরের কোণে বইয়ম, বইয়ম,
পরাণ পোড়ে ছাই, ছাই।
এখন কি করমু, কোথায় যাইমু
ঘরে চিতাল মিঠাই নাই। —ঐ

৪

হোক্ সে কালো, আমার বড ভাল লেগেছে,
কাঁঠাল গাছের আঁঠার মত জড়িয়ে ধরেছে।
মুচকি হাসি হেস্তে আবার চাকু মেরেছে,
কাঁঠাল গাছের আঁঠার মত জড়িয়ে ধরেছে॥ —ঐ

রঙিলা ভাসুর গো, তুমি কেন দেওর হইলা না॥
তুমি যদি হইতাবে দেওর খাইতা বাটার পান,
আর রঙ্গরসে কইতাম কথা জুড়াইতাম পরাণ।
হাটে যাও, বাজারে যাও, আমার একটা কথা,
দিদির লাগ্যা পানসুপারি আমার আলা পাতা।
রঙিলা ভাসুর গো, তুমি কেন দেওর হইলা না॥ —ঢাকা

সাধারণতঃ নানা বয়সী মেয়েরা ছাদ পিটায় ও দোহার ধরে এবং একটিমাত্র পুরুষ গায়ক বেহালার সাহায্যে মূল গায়েনের কাজ করে। শ্রমজীবী নারী-পুরুষের মিলিত সঙ্গীত বলিয়া অনেক সময় ইহাদের মধ্যে শ্লীলতার মাত্রা অতিক্রম করিয়া যায়।

তিন

চাষের গান

কৃষি-সংক্রান্ত গানের মধ্যে প্রথমেই ধান রোপণের গান উল্লেখ করা যায়।

আমগাছে জাম ফলে
তেঁতুলগাছে নিম রে,
কলিকালের রং দেখে
ভয়ে হিম সিম রে ॥ —পুরুলিয়া

দিঘির মাঝে কমল ফুটেরে,
আয় সখী, কমল, ফুলে পূজি তাহারে ॥ —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত গানটি ধান কাটার গান—

হারে ও আমার কাতি শাল,
বছর বছর থাকিস্‌রে বহাল।
তুঁই হামাদের মাতাপিতা,
তুঁই হামাদের নাতী ছাওয়াল।
সাত পুরুষের জমিন হামার,
তিন পুরুষের হাল ॥
কাট ফাটা রোদেতে পুরা,
বলদ জোড়া হ'ল আধমরা,
আবার, পানি কাদায় ভিজা সারা,
হনু আমি নাজেহাল,
তোর আশাতে ভাবি বইস্যা কতই রাত সকাল।
থাঁতের পানি টান্যা টান্যা
করনু তোকে কতই সিয়ানা,

আজ, তোর দোয়াতে টিকলী সোনায়

চিক্ মিকাছে বোয়ের কপাল।

হাসে তর্জাগানের আসরে যাই, গায়ে দিয়া শাল।

—মালদহ, দিনাজপুর

৪৭

দোহাই, আল্লা, মাথা খাও,
হামাক ফেল্যা কই বা যাও.
বিশ্বাশ গ্যালে এবার তুমার সঙ্গ ছাড়ুম না ॥
বাপো নাই মোর মাও নাই,
একলা ঘরে কাল কাটাই,
গোঁসা করলে আর তো আমি সালুম রান্ধুম না ॥
নয়া শীতের জাড়াতে
যাইবা যখন ধান দাইতে,
(তুমার) কাছি কেঁথা হুক্কা তামুক সঙ্গে দিমু না।
(খসম) হামি তুমার সঙ্গ ছাড়ুম না।
অঙ্গনেতে আঁটি ধান,
ঝাড়বা যখন দিনমান
(হামি) কুলার বাতাস দিয়া তখন ধান ঝাড়ুম না ॥
কাইয়াতে ধান খাইয়া যাক,
(তুমার) ধানের মড়াই খালি থাক
লক্ষ্মীমায়ের আউরি বাউরি বাঁধা হইব না,
নিদয় হইলে মানুষ পাইবা পীড়িত পাইবা না। —ঐ

ক্ষেত্রে নিড়ান দিবার সময়ের গান—

ওরে হুৎ! ওরে হুৎ! ওরে হুৎ! হুৎ! হুৎ!
বাইরা বল্‌দের ন্যাজ্ দরিয়া ত্যাশো আইছাল বুৎ!

কাটছাল্ জালুন কাট্‌ছাল আমুন মক্স দেওয়ানা।
ও হায়, উচ্চুৎ কইবো গরের মাণিক কর্‌ছ্যাল রে কানা।
ছিন্নিবিন্নি হ্যাতল গ্যাছাল্ রে—ইকি আচাযিয় !—
ওবে হুৎ। হুৎ! হুৎ!
ও হায় নান্‌কুরিয়া বান্‌কুরিয়া ঠাইন্সা মার ছেনী,
ই হাল দিমু বাইর করিয়া পেথুনীর এনী পেনী
আরে হুৎ! হুৎ! হুৎ! —ঢাকা

বলাই বাহুল্য, এই শ্রেণীর কর্মসঙ্গীতেব কোন সাহিত্যিক গুণ নাই। নৌকা বাইচ ও ধান ভানার গান ছাড়া বাংলার লোক-সঙ্গীতে কর্মসঙ্গীত বলিতে প্রকৃতপক্ষে আর কিছু নাই। পশ্চিমবঙ্গে নিম্নশ্রেণীর মেয়েরা যখন সারি বাঁধিয়া ধানের চারা রোপণ করে, তখন যে গান কোন কোন সময় গায়, তাহা ধান রোয়ার কাজের জন্যই যে সুনির্দিষ্ট, তাহা নহে, অন্য সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যে সব গান সাধারণতঃ গাহিযা থাকে, তাহাই গায়। সেইজন্য ইহাদের মধ্যে ধান রোয়ার কথা কিছুই থাকে না, জীবনের অন্যান্য বিষয়ের কথাই সাধারণতঃ থাকে। নৌকা বাইচ এবং ধান ভানার কাজ ছাড়া যে কোন কাজে যে কোন তালযুক্ত গান গাওয়া যাইতে পারে। সেইভাবে ক্ষেতে নিডান দিবার সময় প্রেম-সঙ্গীতেবও কয়েকটি পদ গাহিতে পারে। কর্মের প্রকৃতি এবং গায়কের মেজাজের উপব সকল কিছুই নিভর করে। এমন কি, 'ধান ভান্‌তে শিবের গীত' প্রবাদটির ভিতর দিয়াও বুঝিতে পারা যায় যে, ধান ভানিবার সময়ও যে ঢেঁকি এবং প্রকৃত ধান ভানিবাব প্রসঙ্গ লইয়া কোন গান গাওয়া হইত, তাহাও নহে, যে-কোন বিষয় লইয়া গান হইতে পারিত।

চার

ধান ভানার গান

পূর্বের আলোচনা-অংশে কয়েকটি ধান ভানার গান উদ্ধৃত হইয়াছে, এইবার আরও কয়েকটি উদ্ধৃত করা যায়। বর্তমানে বাংলার গ্রামে গ্রামে ধানভানা কল স্থাপিত হইবার ফলে এই গান বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। কচিৎ দুই একটির এখনও সন্ধান পাওয়া যায়।

ধান বাহানো[১] ধান বাহানো ওরে লাবদ মনি।
বিন্দ্যাবনে ধান বাহানে রাধে গুযালিনী—
এ ধান বাহানো রে, সোনার কামিনী,
এ ধান বাহানো রে॥ ধুয়া
ঢেঁকিতে উঠিয়া বলে—আমি সাড়ে চাইর হাতের কাট্,
সোনার কামিনী ধান বাহানে, ঝাইড্যা মারে লাত্।
এ ধান বাহানো রে, সোনার কামিনী,
এ ধান বাহানো রে॥
পুয়া[২]তে উঠিযা বলে আমরা দোনা ভাই,
সোনার কামিনী ধান বাহানে, আমরা গান গাই।
এ ধান বাহানে রে, সোনার কামিনী,
ধান বাহানো রে॥
আগ্‌শালাইতে[৩] উঠিয্যা বলে, আমি থাকি মধ্যস্থলে,
সোনার কামিনী ধান বাহানে আমার বাহুর বলে।
এ ধান বাহানো রে॥

১। ভানা। ২। যে খুঁটা দুটোর ওপর ঢেঁকির পেছন দিক ভর করিয়া থাকে, তাহাকে 'পুয়া' বলে। ৩। যে কাষ্ঠদণ্ডের সাহায্যে ঢেঁকি 'পুয়া'র ওপর ভর করিয়া থাকে, তাহাকে 'আগ শালাই বলে।

মোহোনাতে[৪] উঠিয়া বলে, ও ভাই আমি সুয়া[৫] হাতের চুড়া,
সোনার কামিনী ধান বাহানে, আমি করি গুঁড়া।
এ ধান বাহানো রে ॥
গড়েতে[৬] উঠিয়া বলে, আমি থাকি মাটির তলে,
সোনার কামিনী ধান বাহানে আমার বুকের বলে।
এ ধান বাহানো রে ॥
কুলাতে উঠিয়া বলে, আমি করি ফাস্‌ফুস্‌,
সোনার কামিনী ধান বাহানে, আমি বাহির করি তুষ।
এ ধান বাহানো রে ॥
বাঢ়ুনে[৭] উঠিয়া বলে, আমি তিন বাঁন্ধনে দঢ়,
সোনার কামিনী ধান বাহানে, আমি করি জড়।
এ ধান বাহানো রে, সোনার কামিনী,
এ ধান বাহানো রে ॥ —রাজসাহী

২

সুন্দরী লো মাই, নাইদারী লো মাই,
আনিয়া দেমো শাড়ী চুড়ি হাটে যদি পাই।
ছিঁড়িয়া যায় চিকণ শাড়ী (ওরে) ভাঙ্গিয়া যায় কাঁচের চুড়ী,
মনের জনের সদায় মনের ঠাই, দূরে কি কাছে কি মন যদি পাই ॥
সুন্দরী লো মাই, নাইদারী লো মাই,
চোখের পানি মুছিয়া হাসেক খানিক দেখি যাই।
বন্ধুরে মোর ধরি বা পলায়
ওরে, দিনে রাইতে মইনো সেই জ্বালায়।
পাঞ্জর কাটি লুকেয়া থুবার চাই।
ভয়োতে ভয়োতে সদায় হাতাশ খাই ॥ —রংপুর

৪। ঢেঁকির সম্মুখভাগে লোহার বলয়-পরানো একখণ্ড গোল মোটাকাঠ যোগ করা থাকে, তাহাকে বলে 'মোহনা'। তারই সাহায্যে ধান ভানা সম্ভব হয়। ৫। সোয়া বা সওয়া। ৬। ঠিক 'মোহনা'র সম্মুখে মাটিতে একটি গর্ত থাকে, একে বলে 'গড়'। গড়ে ধান ঢালিয়া ভানা হয়। ৭। উলু খড়ের ঝাঁটা, সম্মার্জনী।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঘটনামূলক সঙ্গীত

অনেক সময় সমসাময়িক বহু ঘটনা অবলম্বন করিয়া সঙ্গীত রচিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ইহাদের মধ্যে যেমন উচ্চ কাব্যগুণ প্রকাশ পাইতে পারে না, তেমনই সমসাময়িক কালের সীমা অতিক্রম করিয়া ইহারা বেশি দূর অগ্রসর হইতে পারে না। লোক-সঙ্গীতেব যে আর একটি প্রধান বিশেষত্ব, অর্থাৎ ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়া চলা, তাহাও ইহা দ্বারা সম্ভব হয় না। কারণ, প্রত্যক্ষ ঘটনার কোন ক্রমবিকাশ নাই। ঘটনার স্মৃতি লুপ্ত হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের উপর হইতে ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া রচিত সঙ্গীতের প্রভাবও স্বাভাবিকভাবেই লুপ্ত হইয়া যায়।

ঘটনামূলক সঙ্গীতকে প্রধানতঃ চারিটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত ঐতিহাসিক ঘটনামূলক, দ্বিতীযত সামাজিক ঘটনামূলক, তৃতীয়ত ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনামূলক ও নৈসর্গিক ঘটনামূলক। যে সকল বৃহত্তর রাজনৈতিক ঘটনা ইতিহাসের মধ্যে স্থান পাইয়া থাকে, যেমন, পলাশীব যুদ্ধ, সিপাহী যুদ্ধ, ছিয়াত্তরের ও পঞ্চাশের মন্বন্তর, দেশবিভাগ ইত্যাদি বিষয় অবলম্বন করিয়া সমসাময়িককালে বহু লোক-সঙ্গীত বচিত হইয়াছে। অনেক সময় রচয়িতার মুখ হইতেই তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ক্বচিৎ কোন সঙ্গীত যদি কোন বিশেষ কারণে জনপ্রিয়তা অর্জন কবিতে সক্ষম হইয়াছে, তবে তাহা কিছুদিন পর্যন্ত প্রচারিত থাকিবার পর বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তবে একটি কথা এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, আধুনিক যুগের পূর্ব পর্যন্ত বৃহত্তব বাজনৈতিক কোন ঘটনার সঙ্গে সমাজ-মানসের খুব নিবিড় যোগ ছিল না। সেই জন্য বাংলাদেশে রাজা-বাদশাদিগের মধ্যে সিংহাসনের অধিকার লইয়া যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হইয়াছে, তাহার কোন প্রেরণা লোক-মানসে সঞ্চারিত হইতে পারে নাই। সেইজন্যই ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া বিশেষ কোন সঙ্গীত রচিত হয় নাই।

সামাজিক ঘটনার প্রভাব বরং সমাজ-জীবনের উপর এককালে রাজনৈতিক ঘটনা অপেক্ষা অধিক ছিল। সেইজন্য রামমোহনের সতীদাহ প্রথা নিবাবণ

বিষয় কিংবা বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহের বিষয় অবলম্বন করিয়া রচিত সঙ্গীতের সংখ্যা অধিক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তাহা হয় নাই; কারণ, এখানেও একটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। যে সমাজ লোক-সঙ্গীত রচয়িতা কিংবা লোক-সঙ্গীতের পরিপোষক, সেই সমাজের মধ্যে সতীদাহও যেমন নাই, বিধবা-বিবাহেও কোন নূতনত্ব নাই। সেইজন্য এই সকল সামাজিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া রচিত সঙ্গীতেব সংখ্যা যে খুব বেশি, তাহাও নহে।

সমাজেব কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনেব উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা অবলম্বন করিয়া কোন কোন সময যে সঙ্গীত বচিত হইয়া থাকে, তাহাকেই ব্যক্তিগত ঘটনামূলক সঙ্গীত বলিয়া উল্লেখ কবা যায। কিন্তু সেই ব্যক্তির স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া যাইবাব সঙ্গে সঙ্গে সমাজে এই শ্রেণীব সঙ্গীতও লুপ্ত হইয়া যায়। কিছুদিন পূর্বে পূর্ববাংলায় বিশেষতঃ ঢাকাব ভাওয়াল পবগণা ও তাহার নিকটবর্তী অঞ্চল-সমূহে ভাওযাল সন্ন্যাসীব ঘটনা অবলম্বন করিয়া বহু গীত রচিত হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমান তাহা আর শুনিতে পাওয়া যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'নীলদর্পণ' নাটকেব জন্য যে মানহানিব মোকদ্দমায বেভাঃ লঙ্‌ সাহেবেব কারাদণ্ড হইয়াছিল, তাহা অবলম্বন করিয়াও সমসাময়িককালে কিছু সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল। কিন্তু সবক্ষেত্রেই ইহাদেব আবেদন একান্ত সমসাময়িক এবং ইহাদের মধ্যে কোন সাহিত্যিক আবেদন প্রকাশ পায না বলিয়া ইহাবা কোন দিক দিয়াই স্থায়িত্ব লাভ করিতে পাবে না।

প্রাকৃতিক বিপযয, যেমন ভূমিকম্প এবং বন্যা ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া এক শ্রেণীব লোক-সঙ্গীত রচিত হইয়া থাকে। তাহা প্রধানতঃ আঞ্চলিক। কারণ, বন্যাই হোক, কিংবা ভূমিকম্পই হোক, ইহাদের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া বাংলার সর্বত্র এক এবং অভিন্ন নহে। এক অঞ্চল যখন বন্যায় ভাসিয়া যায়, অন্য অঞ্চল তখন অনাবৃষ্টিব জ্বালা ভোগ করিতে পারে। সুতরাং ইহাদের আবেদন কেবল সমসাময়িকই নহে, আঞ্চলিকও বটে, তথাপি বাংলার লোক-সঙ্গীতের নিদর্শনরূপে ইহাদের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যায়।

এক

ঐতিহাসিক

ঐতিহাসিক ঘটনামূলক বাংলার লোক-সঙ্গীতের মধ্যে এক শ্রেণীর সঙ্গীতের **মধ্যে একটু মানবিক** অনুভূতির স্পর্শ অনুভব করা যায়, তাহা নারীহরণের গান **বলিয়া উল্লেখ করা** যায়। মধ্যযুগে আরাকানের জলদস্যুরা নৌকাপথে আসিয়া যে **প্রধানতঃ** নদীতীরবর্তী গ্রামগুলি আক্রমণ ও লুণ্ঠতরাজ করিত এবং যুবতী **নারীদিগকে বলপূর্বক** হরণ করিয়া লইয়া যাইত, বাংলার সমাজের বুকে তাহার **বেদনা একটি** বিলীয়মান স্মৃতিরেখার মত আজও অস্পষ্ট হইয়া আছে। **বাংলার সামাজিক** ও রাজনৈতিক ইতিহাসে ইহার কথা লিখিত আছে। বহু **সম্ভ্রান্ত বংশের** কুলপঞ্জীতে 'মঘেন নীতা দুষ্টা কৃতা' বলিয়া ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকগণও তাঁহাদের ইতিহাসের পাতায় **বাঙ্গালীর এই** বেদনা ও লজ্জার কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বাংলার **লোক-সঙ্গীতের** মধ্যে ইহার প্রতিধ্বনি বাজিয়াছে—

১

আগা নায়ে রিমি ঝিমি,
আমার পাছা নায়ে পানি,
ও—আমি ক্যান্ বা আইলাম নাইতে।
আস্তে আস্তে মা—রো বইঠা,
ওই যে আমার পতির কাঁদন শুনি।
ও—আমি ক্যান্ বা আইলাম নাইতে।
একো ডুবে দু'য়ো ডুবে তিনো ডুবের কালে,
কোনঠিকার এক ময়ফুল রাজা আস্যা তুল্যা লিলো নায়ে।
ও—আমি ক্যান্ বা আইলাম নাইতে।
কান্দো না কান্দো না, পতি, চিত্তে লেও ক্ষেমা,
বাক্সে ভরা রইলো রে গয়না কিয়্যা কইরো শাদি।
ও—আমি ক্যান্ বা আইলাম নাইতে। —রাজসাহী

২

পিঁড়ির উপর বস্যা কি লাল তোতা
শীষের যত্ন করে না রে কে।
শীষের যত্ন কর্যা কি লাল তোতা
যায় যমুনার ঘাটে না রে কে।
মরো মরো মরো কি রাজার ছেলে
গোছল কর্যা উঠি না রে কে।
অমন সুন্দর কন্যা দেখি
শীষ ক্যান খালি না রে কে।
আমার নৌকায় আইলে কন্যা,
শীষেব মানান দিব না রে কে!
ওই না কথা বুল্লে রাজার ছেলে
দ'য়ে ঝাঁপো দিব না রে কে।
জাল্যার জালে ছাঁক্যা কি কন্যা,
হ্যাশে লয়্যা যাব না রে কে।
হ্যাশে লয়্যা গেলে কি রাজাব ছেলে,
বাপ-মা হারা হ'ব না রে কে।
মরো মরো মরো কি রাজাব ছেলে,
গোছল কর্যা উঠি না রে কে।
মরো মরো মরো কি রাজার ছেলে,
কলস ভর্যা উঠি না রে কে। —ঐ

কাঁখে কলস কৈর্যা গো রমণী
যায় যমুনার ঘাটে না রে কে।
যমুনার ঘাটা যায়্যা গো রমণীর
সদাগরের সোঁতে দেখা না রে কে।
সরিয়্যা নোকা বান্ধো গো সদাগোর,
কলসী-ভরিয়্যা উঠি না রে কে।

এত সুন্দরী রমণী গো তুমি,

সিঁথ্যা লাগেরে খালি না রে কে।

একটি জবাব কর গো রমণী,

লেন্দুর পর‍্যাইয়া দিই না রে কে।

আমার সেন্দুর আছে গো সদাগোর,

বাপো-মায়ের ঘরে না রে কে।

সরিয়্যা নোকা বান্ধো গো সদাগোর,

কলশী ভরিয়্যা উঠি না রে কে॥ ঐ

সাহান-বান্ধা ঘাটে বরণী গোস্থল করিতে

ছাড়িয়্যা দিলে কেশের খোঁপা গো,

সোনার বরণী আমার রে! ধুয়া।

কোথা থাইক্যা আইস্যা রাখাল ভাই

ধরিয়্যা লিলে কেশের খোঁপা গো,

সোনার বরণী—আমার রে!

তাড়াতাড়ি যায় বরণী কামার ভায়ার বাড়ি গো,

সোনার বরণী আমার রে!

কিও কাইজ্জো কর, কামার ভাই, লিচেন্দে[1] বসিয়্যা গো,

সোনার বরণী আমার রে!

তাড়াতাড়ি দাও, কামার ভাই, ইসোপাতের ছোরা গো,

সোনার বরণী আমার রে।

সেই ছোরা লিয়্যা বরণী সাঁন্ধায় ভিটার ঘরে[2] গো,

সোনার বরণী আমার রে!

শ্বশুর আইস্যা বলে, বরণী, কিবা ঘটনা ঘট্যাচ্ছে গো,

সোনার বরণী আমার রে!

ভাশুর আইস্যা বলে, বরণী, চিঠি ক্যানে ল্যাখে নি গো,

সোনার বরণী আমার রে!

১। নিশ্চিন্তে ২। প্রধান ঘর ; শয়ন-ঘর

স্বামী আইশ্যা বলে, বরণী, টেলিগ্রাম ক্যানে কর নি গো,
সোনার বরণী আমার রে !
আমার বরণীকে গোসুল করায় চল্লিশ কল্‌সীর পানিতে গো,
সোনার বরণী আমার রে !
আমার বরণীর নামাজ পড়ে ফুল বাগিচ্যার মাঝে গো,
সোনার বরণী আমার রে !
আমার বরণীর গোর হয জালি বাগানেব কান্দায়[১] গো,
সোনার বরণী আমাব রে ! —ঐ

৫

নদীর কূলে বৈসা হে, ডোমন ভাযা, বুনাও টুকি-মুনি হে—
না—বুনাও টুকি-মুনি।
(তোমাব) টুকি-মুনির দামো, হে ডোমন ভায়া, কিবা কিবা হয়ো হে—
না—কিবা হযো শুনি।
(আমার) টুকি-মুনিব দামো, হে লালুচম্পা, তোমার সঙ্গে শাদী হে—
না—তোমাব সঙ্গে শাদী।
দোডাদোড়ি যায্যা হে লালুচম্পা বলে বুঢ়া বাবার আগে হে—
না বুঢ়া বাবাব আগে।
শিগ্‌গির কৈর‍্যা দাও হে বুঢ়া বাবা মুয়া কুড়ি টাকা হে—
না—মুয়া কুড়ি টাকা।
দোড়াদোড়ি কৈব্যা যায হে লালুচম্পা হাইল্যা-ভায়ার[২] বাড়ি হে—
না—হাইল্যা-ভায়ার বাড়ি।
শিগ্‌গির কৈর‍্যা দাও, হে হাইল্যা-ভায়া, লিল্‌ল্যা[৩] জহরের লাড্ডু হে—
না—লিল্‌ল্যা জহরের লাড্ডু।
দোড়াদোড়ি কৈব্যা যায় হে লালুচম্পা কামার-ভায়ার বাড়ি হে—
না—কামার ভায়ার বাড়ি।
শিগ্‌গির কৈর‍্যা দাও, হে কামার-ভায়া, লিল্‌ল্যা পাখালের[৪] ছোরা হে—
না—লিল্‌ল্যা পাখালের ছোরা।

১। কাঁধে, এখানে পার্শ্বে।
২। যে মিষ্টান্ন তৈযাব কবে ৩। খাঁটি, অমিশ্রিত ৪। পাগল

দোড়াদোড়ি কৈর‍্যা যায় হে লালুচম্পা কাহার-ভায়ার[৪] বাড়ি হে—
না—কাহার-ভায়ার বাড়ি।
শিগ্‌গির কৈর‍্যা দাও, হে কাহার-ভায়া, ভেলভেট-বান্ধা ডোলা হে—
না—মখমল বান্ধা ডোলা।
আল্লার নাম লিয়্যা হে লালুচম্পা ডোলাতে উঠিলো হে—
না—ডোলাতে উঠিলো।
আধেক রাস্তা যায়্যা হে লালুচম্পা মুখে দিলো লাড্ডু হে—
না—মুখে দিল লাড্ডু।
আরো রাস্তা যায়্যা হে লালুচম্পা বুকে দিল ছোরা হে—
না—বুকে দিল ছোরা।
চম্পার মা বাহিয়্যা বলে, (আমার) চম্পার ডোলা আইসে হে—
না—চম্পার ডোলা আইসে।
কতুই পানো খায়্যাচ্ছ, হে লালুচম্পা (তুমি), ডোলা বাইয়া পড়ে হে—
না—ডোলা বাইয়া পড়ে।
(চম্পার মা) ডোলার কাপড তুলিয়্যা ভ্যাখে চম্পা মৈরা পৈডা আছে হে—
না—মৈরা পৈডা আছে।
কতুই দুক্‌খে পড়্যাছিলা, চম্পা, তুমি বৈল্যা ক্যানে প্যাঠাওনি হে—
না—বৈলা ক্যানে পাঠাওনি।
(আমার) মরণ ক্যানে আগে হয়নি, আল্লারে, কি দেখিনু রাঙা ডোলাতে-
হায় হায়, কি দেখিনু রাঙা ডোলাতে॥ —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটিতে মগদেশের রাজাকে মাখম রাজা বলিয়া উল্লেখ করা হইতেছে—

৬

গাড়ু গামছা তৈলের বাটি রে খৈলের বাটি রে সাথে।
স্নান করিতে আইলাম একা, পদ্মা নদীর ঘাটে॥
আগে যদি জানিগো আমি, মাখম রাজা গো ঘাটে।
আগে পাছে দাসী লইয়া চল্‌তেম স্নানের ঘাটে।
আমি কি করি ?

৪। পাল্কী বাহক।

এক ডুব দুইয় ডুবরে তিন ডুবের গো কালে।
কোথা থেইকা মাথম রাজা কেশে ধইরা তোলে॥
আমি কি করি?
খাটখুট মাথম রাজা গো মুখে চম্পা গো দাড়ী।
কমলার কেশে ধইরা নদী দিল পাড়ি॥
আমি কি করি?
জাল বাও জালুয়া ভাইরে জালের কোনারে ব্যাকা।
তোমার জালে নি উইঠাছেরে, নারীর হাতের শাঁখা॥
আমি কি করি?
হাল বাও হালুয়া ভাইরে, হাতে সোনার রে লড়ী।
এইপথে নি দেখছ যাইতে আমার কমলা সুন্দরী॥
আমি কি করি॥
আগের নায় ঝামুর ঝুমুর রে পাছের নায় রে বাত্তি।
ধীরে সুস্থে বাইও নৌকা আমি পতির কান্দন শুনি॥
আমি কি করি?
কেইন্দো না কেইন্দো না পতি রে, আমার মায়ারে ছাড়,
বাক্স ভইরা থুইছি টাকা আরেক বিয়া কর॥
আমি কি করি?
আম ধরে থোবা থোবা রে তেতুল রে ব্যাকা।
আপনি পতি বৈদেশ হইল, আর না হইল দেখা॥
আমি কি করি? —ঢাকা

এখানে বামনায় বলিতে বেঁটে আকৃতির মগদস্যুকেই মনে করা হইয়াছে। রামায়ণে বর্ণিত রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের চিত্রটি এখানে স্মৃতিপথে উদয় হইবে—

৭

বামনায় লইয়া যায় বৈদেশী বন্ধুয়ার নায়।
আরে, কইও কইও কইও গো খপর গো শ্বশুরের আগে,—
আমারে যেন তালাস করে গাঙ্গের কুলে কুলে রে।

আরে, কইও কইও কইও গো খপর শাশুড়ীর আগে ;
কোলের ছাওয়াল শুইয়া রইছে মশৈরের তলে রে।
আরে, কইও কইও কইও গো খপর ননদীর আগে,—
অখন যেমুন কাইজা করে জলের কল্‌সীর লগে রে।
আরে, কইও কইও কইও গো খপর সোয়ামীর আগে,
পালের বলদ বেইচা যেন আরেক বিয়া করে রে। —ঢাকা

সর্বক্ষেত্রেই অপহৃতা পত্নীরা তাহাদের পুনরুদ্ধারের সকল আশা বিসর্জন দিয়া স্বামীকে পুনরায বিবাহ করিবার পরামর্শ দিয়া যাইতে দেখা যায়। স্ত্রীচরিত্রের একটি সম্পূর্ণ নূতন দিক ইহাতে প্রকাশ পাইযাছে।

দেশে যখন মগ দস্যুর উৎপাত চলিতেছিল, তখনও নারীরা কেন যে নদীর ঘাটে স্নান করিতে আসিত বুঝা যায় না—

৮

বাড়ীর মধ্যে পুকুর ছিলো চান কবিতাম ভালো,
ও ভালো, গাঙের ঘাটে চান কবিতাম আমায মগে ধবে নিলো।
আমি কেনে বা আইলাম চান কবিতে॥
এক ডুব দুই ডুবু তিনো ডুবুর কালে,
মাছ রাঙা কযো খবর আমায তুল্‌লো নায়ের পরে।
আগা নৌকা ঝামুব ঝুমুব পাছা নৌকা হাসি,
ও আমি কেন বা আইলাম চান করিতে॥
সাক্ষী থাকুক গাড়ু গামছা আরো তেলের বাটি,
প্রাণপতিরে কইও খবর গাঙে দিইলো ভাটি।
আমি কেন বা আইলাম চান কবিতে॥
হালো শশো, হালো ভাইবে, হাতে সোনাব নড়ি,
প্রাণপতিরে কযো খবব ঘাটে রইল চুলের দড়ি।
জালো বাওরা জালো ভাইরা জালে বাঁধা পোনা,
প্রাণপতিরে বিয়ার কথায কেউ করো না মানা।
গরু রাখো বাখাল ভাইবা, হলদি বনের মাঠে,
প্রাণপতিরে কয়ো খবর যেন আরেক বিয়া করে। —খুলনা

৯

এক ডুব দুই ডুব তিন ডুবের কালে,
কোথাকার এক মাথম রাজা পান্‌সী বান্‌ল ঘাটে রে,
আমি কি করি।
এক ডুব দুই ডুব তিন ডুবের কালে,
চুলের মুইঠ্যা ধইরা রাজা উঠায় লৌকার পরে রে,
আ।ম কি করি।
আগা লৌকায় ঝামুর ঝুমুর পাছা লৌকায় ছায়া,
ধীরে সুস্থে বাইও লৌকা আমি পতির ক্রন্দন শুনিরে,
আমি কি করি।
কাইন্দনা কাইন্দনা, পতিরে, না কান্দিও আর,
ঘরে আছে অষ্ট অলঙ্কার তুমি আরেক বিয়া কইর রে,
আমি কি করি। —ফরিদপুর

নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটিতে পলাশীর যুদ্ধের কথা শুনিতে পাওয়া যাইবে। ইহাতে নবাব সিরাজুদ্দৌল্লাকে লম্পট বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

১০

কি হলো রে, জান।
পলাশী ময়দানে নবাব হারাল পরাণ ॥
তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে, গুলি পড়ে র'যে,
একলা মীরমদন বল কত নেবে স'যে।
ছোট ছোট তেলেঙ্গাগুলি, লাল কুর্তি গায়,
হাঁটু গেড়ে মারছে তীর মীরমদনের পায় ॥
কি হলো রে, জান।
পলাশী-ময়দানে নবাব হারাল পরাণ ॥
নবাব কাঁদে, সিপুই কাঁদে, আর কাঁদে হাতী,
কল্‌কাতায় বসে কাঁদে মোহনলালের বেটী ॥
কি হলো রে, জান।
পলাশী ময়দানে উড়ে কোম্পানী-নিশান ॥

মীর্জাফরের দাগাবাজী নবাব বুঝলে মনে,
সৈন্য সমেত মারা গেল পলাশী ময়দানে ॥
নবাব বড় ে'াহদা ছিল, আর লম্পটে,
ইতিমধ্যে গালেব এসে পৌছিল সে ঘাটে ॥
কি হলো রে জান।
পলাশী ময়দানে উড়ে কোম্পানী-নিশান ॥
ফুলবাগে নবাব ম'ল, খোসবাগে মাটি,
চাঁদোয়া টাঙ্গায়ে কাঁদে মোহনলালের বেটি ॥
কি হলো রে জান।
পলাশী ময়দানে উড়ে কোম্পানী-নিশান ॥ —মুর্শিদাবাদ

মহারাজ নন্দকুমার রায়ের ফাঁসির কথা এখানে শুনিতে পাওয়া যাইবে—

১১

নন্দকুমার রায় ছিল বাঙ্গালার অধিকারী।
হেষ্টিংস সাহেব এল জান করিবারে বারি ॥
নন্দকুমারের মা কাঁদে ঐ গাঙ্গের পানে চেয়ে।
আর না আসিবে বাছা জোড়া ডিঙ্গি বেয়ে ॥
খোপেতে কৌতর কাঁদে, কাঁদে ফোয়ারায় হাঁস।
যোড়া বাঙ্গালায় কাঁদে সোনার গুল্‌তি বাঁশ ॥ —ঐ

লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গবিভাগ এবং তৎকালীন বিদেশী বর্জন লইয়া নিম্নোদ্ধৃত গানটি রচিত হইয়াছে—

১২

হুন ছিলিম চাচা, আইজ এ্যাক তুক্কুর হইয়া কৈবার চাই-আই-আই।
হ্যাশে এ্যাক বাও যে আইছে,
যিবা চন্‌কা হিবা বইছে
বিলাইতি আর বোলে কিনন নাহি নাই-আঁই-আহাঁ আই ॥

কংজুনা[১] নাট বাহাদুর দিচ্ছে পরাণা
বেবাক্ পরজা মুনীর কৈল্ল তালকানা
এহন কুম্পুনীর মল্লুক গ্যাল্ কুঠ্ঠাইকাব কুন্ আসামো নিয়া
কববো খাজনা-আয়-আহা-আ ॥

বাংলা মুল্লুক বোর জবর,
এহানো বাপ দাদার হইছে কবর,
খবরাখবর কত বাতশা করছে আজিম্ভি-ই-ই—
এহন কুম্পুনী যাব কাবু অইয়া
খাজনা করবো ছত্রান অইযা[২]
মোহারাণীর আজিম্বে বাই ইকি বিকিত্তি[৩]—ইয়-ইহী-ইঃ ॥

জগন্নাথ্ গুঞ্জ জাহাজ গাট আছে,
হেই জাহাজো যাওন সহবে,—
ছিলট পিচ্ছিল হিলং মিল—-অং-অং
কুন্ঠাই নিবো আমাগরে-এয-এহে-এ।
হে যে সহর অইলে গো জর
প্যাটে অগ্টানা দবে,—এ, এ—
দিক্কে, অইল বালা ও নাজিব বাই, গো—ও—
এ্যাহন নামানী[৪] হাইল্লো ফিলাই লইয়া
আই ওগো গবে—এয়-এহে-এ ॥

য্যাত মুন্সী মৌলায কবছে কুমুটি
হুনাহুন্ হুনলাইম এঠাইতি
আরাম য্যাত নিমক চিনি কাপইব বিলাইতি-ইহী-ঈ।

ধুয়া : তোবা তোবা, ইকি কবছি,
না জাইনা কি জক্মারি এহান কওছেন কি কবি-ই-ই,
কিবিস্তানে জাইত মাইরা স্থায, মবণ নাই, কইলজা হয় বারি
ইয়-ইহী-ঈ ॥

১। বর্জন? অথবা কতজন? ২। ঠাঁই ঠাঁই, বা বিচ্ছিন্নভাবে। ৩। বিকৃতি অথবা বৈচিত্র্য কিংবা বিকীর্তি। ৪। ওলাওঠা।

কেয়ামতে কি দিমু জোবাব,—আহায়—আব,—
ছাশে বোলে কল অইতাছে,
হে হান থনে কাপইর চিনি আইবো হবাকার-আর-আহা-আর ॥
নোয়ার হান্কী মোরা আছে য্যাত,
বাইঙ্গা চুইরা ফালাও পথত,
মাও বহিন বিরাদার সজন
বাৎখাও উইন্টা পাতাতো—ওহো—ও।
আমিরুল্লা চইক্ষু খাইছ তেরশ ও বার সনেতে—বোর ভুক্ষু মোনেতে।
ই সন বোর অইল গো পানি,
গেরাম গেরাম বোরই নামানী—ই—হীঃ।
পানীর তলে উইন্টা গাল গো কুম্পুনীর মুল্লুক—উয়—উহু—উক্।
আমীরুল্লার হোলান ভুক্
দিনে দিনে কি ব্যান্ অইল,
জাইত জমিন জাহান গেল,
এ্যাদ্দিন বুইন্দার আগুন দিয়া নিজে পুড়ছি নিজের মুক্—উক্—উক্—
এ্যাহন ছেত্তুর পুইরা নিমক খাইও, জিন্দিগীৎ না অইব চুক।
—টাঙ্গাইল (মৈমনসিংহ)

ইহা ১৯০৭ সনে (১৩১৩ বঙ্গাব্দে) সংগৃহীত হইয়াছিল (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৩, তৃতীয় সংখ্যা, পৃ. ১৪৩-৪৪)।

আঞ্চলিক সঙ্গীতের মধ্যে যে গম্ভীরা গানের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনার বহু বিবরণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু বিশেষ ঘটনা ব্যতীত সাধারণ কোন ঘটনারই স্মৃতি বেশিদিন রক্ষা

দুই

সামাজিক

দেশের সমসাময়িক অর্থনৈতিক অবস্থা এবং নূতন নূতন সামাজিক আচার-আচরণ অবলম্বন করিয়াও এক শ্রেণীর লোকসঙ্গীত রচিত হইয়া থাকে। কোন বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা ইহাদের সঙ্গে যুক্ত থাকিলেও তাহার প্রত্যক্ষ বর্ণনার পরিবর্তে সমাজের উপর তাহার কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তাহার কথাই ইহার মধ্যে প্রকাশ পায়। কয়েকটির নিদর্শন দেওয়া যায়—

দেশে ধানের কল স্থাপিত হইবার ফলে গ্রামের যে সকল দরিদ্রা নারী পরের ধান ভানিয়া জীবিকা অর্জন করিত, তাহাদের যে দুর্দশা হইয়াছে, তাহার কথা এই গানে শুনিতে পাওয়া যাইবে—

১

দেশের হাইল চাইল কিছু দেখ্যনি ?
গরীবের করবল্লা মইদান ঠয়র পাইওনি।
দেশের মাজে বুড়াটুডা যারা আফিম খায়,
মাজে মাজে মালদারগ্যা কয়,
মোটেও আফিম নাই।
আবার দশ টেঁয়া দি এক তোলা পাই।
এই বিচার কেও করেনি।
(গরীবে) গোলার ধান কলত ডলাই খায়।
বারাবান্দনী মরি যায়,
হিক্যা ফিরি কনে চায়।
এক সের চইল আষ্ট আনা পইসা,
কোন দিন কিন্যনি (গরীবে) ?   —চট্টগ্রাম

সমাজে ধানের কল আসিয়া ঢেঁকির ব্যবহার লুপ্ত করিয়া দিবার জন্য এই গানটিতেও আক্ষেপোক্তি শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। গানটিতে পাকিস্তানের উল্লেখ রহিয়াছে, ইহা আধুনিক সংগ্রহ—

২

বারাবাঁধুনীর কওয়াল খাইয়ে হাটে ঘাটে জিঁও দিঁও,

ধানের কল হইয়ে।

ফারৎ মধ্যে এক গোলা ধান খায়, তার বউএ সারাদিন

পাড়া বেড়াইত্ যায়।

পাড়াত্তুন আসি বউএ হরহরাই চইল উন চড়াই দিয়ে,

কুলাৎ লই চইল ঝারিবার লাই, তুয়্যা তিন্দা পটকাইন্দা মা'রগ্যে

তুস কুরা গিয়ে ধাই।

কুলাৎ করি দিয়রে চইল, মাফিবার লাই কি রইয়ে।

গরম পানি লাইগ্যে চইলের গায়,

কিছু চইল ফেনের হংগে গিয়ে উৎরাইয়ে,

তলের গুণ তো পোড়া লাইগ্যে, মাঝের গুণ কচাল হইয়ে।

কবির কল্পনাতে মোহন বাঁশী কয়,

পাকিস্তানে বারাবাঁধুনীর বংশ থাইকত্য ন,

বউ এর ঝিয়ের সুখের লাই ভাণ্ডারীর দয়া হইয়ে। —চট্টগ্রাম

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে লোকাপসারণ (evacuation)-এর সময় এই গানটি রচিত—

জলপাইগুড়ির শহরত গাড়ত নামিসে,

মাদার পঞ্জের বালুর টি পোত,

যায়রা মাড়েছে তোপ,

শুন নগরবাসী ও।

মহারাজার হুকুম জারী না করেন বেল্‌ক,

চট করিয়া না পালালে করিবে জরিমানা

শুন নগরবাসী ও॥

ঘর বাড়ি গারস্তি সাজ তামানে ছাড়িনু,

সগায় পালাছে হাতাসে মাইয়া ধরিয়া।

শুন নগরবাসী ও॥

পদ্মা নদীর উপর রেলের পুল বাঁধিবার সময় এই গানটি রচিত হইয়াছিল—

৩

পদ্মানদীর পুল বেঁধেছে ভাল
কত ইট পাটখেল খাপরা কুচি পদ্মার কূলে দিল ॥
কত জায়গার মানুষ ঐ ভাঙ্গাতে মল ॥
পুলের থাম্বা ষোল জোড়া, উপরে তার গিল্‌টী করা,
কাঁকড়া কলে মাটী তুলে থাম্বা বসাইল ॥
মেম সাহেবের বুদ্ধি খাসা, পুল বেঁধেছে বড খাসা ,
ষোল জোড়া থাম বসা'তে তিনজন সাহেব ম'ল ।
চোদ্দ শ' কুলির মধ্যে নয় শ' কুলি ম'ল ॥
পুলের খরচ মোটামুটি, টাকার খরচ ষাট কোটী ।
আমার খ্যাপা চাঁদেব কি কারখানা বুঝ্‌তে জনম গেল ॥ —পাবনা

দেশ-বিভাগের সামাজিক প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করিয়া এই গান রচিত হইয়াছে। উদ্বাস্তু হইয়া হিন্দুস্থানে যাইব না, ইহাই এই গানটির বক্তব্য।

৫

আঁর বাড়ীঘর কাবে দিতাম ?
আঁ্যারে ক্যান ভূতে পাইয়ে হিন্দুস্থান যাইতাম ।
অ্যাডে আছে দুযা ধেওন গাই, উগ্যাব দুধে খবচ চলে,
আর উগ্যার দুধ খাই ।
লোকের কথা হুনি হিন্দুস্থান যাই,
হ্যাডে গেলে কি খাইতাম ?
অ্যাডে আছে, খেতে তরকারী,
ফইর ভরা মাছ আছে, ভাই, সুখে খাইত পাবি,
আটা, রুটী, জাউ খেচুবী,
কিই ল্যাই খাই জান হারাইতাম ।
যারা হেন্দুস্থান গিইয়ে,
স্বরাজের আলোনদোলনে, জীয়ন হারাইয়ে ।
লোকের কথার ভাব না বুঝি,
কিই ল্যাই দুখের বারমাইস্যা খাইতাম । —চট্টগ্রাম

তিন

ব্যক্তিগত

ব্যক্তি-বিশেষের কোন আচরণকে অবলম্বন করিয়াও এক শ্রেণীর লোক-সঙ্গীত রচিত হইয়া থাকে, ইহা সম্পূর্ণ ভাবে বিশেষ অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে; ব্যক্তির পরিচয় যতদূর ব্যাপিয়া বিস্তৃত, ততদূরই এই সঙ্গীত প্রচারিত হইয়া থাকে, ব্যক্তির স্মৃতি সমাজ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবার সময় গানের প্রচলনও লুপ্ত হয়।

নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটি মাধবের গান নামে পরিচিত। মাধব নামক ব্যক্তির সর্পদংশনে মৃত্যুর কোন ঘটনা অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত। মনে হয়, বাঁশ কাটিতে গিয়া সর্পদংশনে মাধবের মৃত্যু হইয়াছিল, সমাজের মধ্যে ইহা গভীর বেদনার সঞ্চার করিয়াছিল। নিম্নোদ্ধৃত গানটির শেষ পদে যে মাধবের বাঁচিয়া উঠিবার কথা আছে, তাহা সম্ভবতঃ কল্পনা মাত্র। কারণ, মাধবের মৃত্যু সম্পর্কিত একাধিক সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে।

রে মাধব! গাও গাও তোল।

গাও তোলরে প্রাণের মাধব, জাগ্যা যাওগা বাড়ী,
তোমার দেশের লোকে বল্‌ব পুরুষ বধে নারী॥
কি না বাঁশ কাটিতে গেলা—ববাক বাঁশের গুড়ি,
কি না সাপে মারলো কামড বিষে বদন ছায় ও॥

মাধবেরি মায়ে কান্দে হাতে লইয়া দই,
তোমরা সবে আইছ বাড়ী, মাধব রৈল কই?
মাধবেরি ভায়ে কান্দে হাতে লৈয়া মই,
তোমরা সবে আইছ বাড়ী, ভাইধন রৈল কই?
মাধবেরি স্ত্রী কান্দে হাতে লইয়া শাড়ী;
তোমরা সবে আইলা ঘরে, মোরে করছ রাড়ী!

হাল বাও হালুয়া, ভাইরে, হাতে সোনার লড়ি।
এই পন্থেনি যাইতে পারুম ধনা ওঝার বাড়ী॥

ধনা ওঝা নাইয়ে বাড়ী, আছে তার রে নাতি।
আমায় মাধব জিয়াইতে পারলে দিবাম সোনার ছাতি।
ধনা ওঝা নাইরে বাড়ী, আছে তার রে নাতি।
আমার মাধব জিয়াইতে পারলে দিবনে দুধের গাভী॥
এক বড়ি, দুইও রে বড়ি তিন বড়ি খেলাও।
চারবে বড়ির মাথায় মাইধে চোক তুল্যা চাও॥
এক বড়ি, দুইও বড়ি তিন বড়িরে দিল।
চারও বড়ির মাথায় মাধব উঠ্যা দৌড় দিল রে॥ —ঢাকা

২

হাল বাও হালুয়া বাই রে, হাতে সোনার নড়ি,
মাধবেরে সারাইতে পারলে দিব টাকা কড়ি রে।
প্রাণের মাধব গা তোল। —ঐ

আবদুল জলিল নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ঘাটু সংক্রান্ত এক মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল, তাহার সম্পর্কিত এই গান—

৩

মিঞা আবদুল জলিল গো, থোড়া না দিনের বাবু হইয়া,
মিঞা জেলখানাতে গেল মিঞা আবদুল জলিল গো॥
এজলাসে উঠিয়া গো মিঞা পাছের পানে চায়,
এমন নিদানের ঘাটু কেবা লইয়া যায়,
মিঞা আবদুল জলিল গো॥
আবদুল জলিলের মায় কান্দে মাথায় চাপ্‌পড় দিয়া,
কই রইলা রে, আবদুল জলিল, আমারে ছাড়িয়া;
আবদুল জলিলের বইনে কান্দে হাতে লইয়া খই,
তোমরা যে ঘরে আইলা গো সবে, আমার ভাই রইল্ কই।
মিঞা আবদুল জলিল গো॥
আবদুল জলিলের বৌ-এ কান্দে হাতে লইয়া ঝারি,
তোমরা যে সবাই আইলা গো ভবে আমি ফুল রাড়ী;
মিঞা আবদুল জলিল গো॥ —মৈমনসিংহ

নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটি নন্দপুরের ধুয়া নামে পরিচিত। নন্দপুর স্থানটি টাঙ্গাইল গোপালপুরের সন্নিকট। ইহাতে জমিদার হেমচন্দ্র চৌধুরী ও তাহার মোক্তার রাজচন্দ্র সরকারের একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে—

৪

হুন বাই এ্যাক নতুন দূইয়া কই হবাকারে—এ-এ।
মাঘ মাসে, অবিবারে, হুক্-দশানী[১] মিলন অইয়ে,
তারা এ্যাক মন্ত্রণা করে। এয়-এহে—এ॥
স্থবন খুলির হ্যামবাবু সে পরগণার জমিদার,
আজচন্দ হরকার তার মুক্তাব
নন্দনপুরের হাটো আইসা তালাই[২] কিন্‌লো,
দশ টাহার, আয়—আহা-আর্।
যে আটের ইজাদ্দারে দেহিয়া তালাই—আই—
আমি দুইটী টাহা খাজনা চাই,—
চন্দমনায় হুইনা বলে, এ-এ—
খাজনাত দিমু নারে, বাই—আই-আহা-আই।
আমি কৈলাস কথা বুঝ মাথা, হ্যামবাবুর তালাই—আই—
চল নায়েব মশয় কাছে যাই,
ইজাদ্দারে হুইন্যা বলে, চল আর দেরী মাত্র নাই—আই॥
হে কাচারীর নায়েব-অ মশয়,
তিন জোনের কাছে কয়,
কুঠাইকার[৩] হিমচন্দ্র বাবু, কে চিনে, দেও না পুরিচয়—অয়-অয়—
হুইনা কথা চন্দ্রমশয়, আ গ, কল্লেন ভারি— ই-ই—
অম্‌নি টেলা গেলেন আজবারী।
এমুন আজার মান মাইরা যায়, কে করে এমুন চাহরী-ইয়-ইহী-ইঃ।
হুবন খুলির বড়বাবু হে পরগণের জুমিদার,
হুইনা আটের হোমাচার[৪]—
দশ আনীর সাৎ মিলন অইয়ে, করছে আট বাঙ্গার যোগাড়।

১। শিকি ও দশানী ২। খেল্‌পা বা দর্মা ৩। কোথাকার ৪। সংবাদ

হে কাচারীর আজা বাহাদুর, তার আটটী ছিল সুন্দনপুর।
আটের স্থলে উপজদলে[৫] মাটি কিন্‌লে রুপিন্দ্রবাবুর,
আমিরুল্লা বান্দছে দুইয়া চক্ষে ছ্যাহে না—আয়-আহা-আ—
আমি আন্দাজী কই রচনা—
কিবা অইছে দুইয়ার মিল বাই, আমার ত ভাল বেহে[৬] না ॥

—টাঙ্গাইল (মৈমনসিংহ)

পূব বাংলার সারি গানে অনেক সময ব্যক্তিগত জীবনের কোন কোন ঘটনার উল্লেখ থাকে। কিন্তু এই শ্রেণীর সঙ্গীত নানা কারণেই সমাজে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না।

৫। ঠিক বুঝা যায না, উপস্থিত হইয়া কি উপহাস স্থলে? সম্ভবতঃ শেযেরটী ৬। ঠেকে না লাগে না।

চার

নৈসর্গিক

প্রাকৃতিক বিপর্যয় সংক্রান্ত গানের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে, তবে পূর্বেই বলিয়াছি, ইহারা অল্পায়ু। নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির মধ্যে ভূমিকম্পের কথা শুনিতে পাওয়া যাইবে—

১

আল্লাতাল্লার এ মহিমা কে বুঝিতে পারে,
আচম্বিতে ভুইকুম্ভুর হইল শনিবারে।
সংসার হাইল্যা পড়ে ,
সংসার হাইল্যা পড়ে, ঢইল্যা পড়ে, ভল্‌ক্যা ওঠে জল,
হৈ চৈ কইর্‍যা লোকে করে গণ্ডগোল,
মিছা ভবের আশা—
মিছা ভবের আশা, মৃত্যু দশা ঘটলো শনিবারে,
কোন্‌ কথার কারণে বীর লড়ে বারে বারে।
তেরো শো চাইর সনে—
তেরশো চাইর সনে তিরভুবনে একি ভয়াংকার,
পাহাড় ভাইঙ্গ্যা নদী করল—করল জলাকার।
করে খণ্ড কত—
করে খণ্ড কত, রং ছুরত, ভাংলো মঠের চূড়া,
শত শত দালান কোঠা ভাইঙ্গ্যা কবল গুঁড়া।
গেল মানুষ মারা—
গেল মানুষ মারা, দেবা সুরা, শুন্‌তে লাগে ভয়।
বার জিল্লার মর্মকথা বঙ্গবাসী কয়
লাগে শুন্‌তে দ্বন্দ্ব। — মৈমনসিংহ

অতিবৃষ্টিও অনেক সময় গানের বিষয় হইয়া থাকে—

২

জলে নাইল্যা করল তল,
আধ কাঠা মোর আউসের আলি, উগারেতে রইল,
জলে নাইল্যা করল তল ॥

নাইল্যা করলাম, আউস করলাম আরও করলাম চিনা,
সকলেই খায় ঘরের ভাত গো আম্‌রার লাগছে কিনা ;
জলে নাইল্যা করল তল ॥ —ঐ

কোন কোন সময় পঙ্গপালের উপদ্রবে যে শস্য নষ্ট হয়, তাহার কথাও গানে শুনিতে পাওয়া যায়—

মেঘ তুই আকার, মেঘের আকার, মেঘে অন্ধকার,
বার মাসের তেরো চান্দ, আগুন-রবিবার,
নামে গাছের পাতা,
নামে গাছের পাতা, বাঁশের মুথা, খাইয়া করল চুণ,
আগে খাইল ফুল বাগিচা শেষে তুবরার ফুল।
ফড়িং-এর ভঙ্গী বাঁকা ,
ভঙ্গী বাঁকা, মাথাতে লাল, পৃষ্ঠেতে চক্কর,
এই ফড়িং-এ খাইয়া ফ্যাল্‌ল দক্ষিণের শহর।
গেল উত্তর বানে ,
উত্তর বানে গিয়া ফড়িং-এ বানাইল এক টিলা,
কেবমে কেরমে দখল করল মমিনসিঙ্গের জিলা। —ঐ

দেশের একবার দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল—

পেটের ক্ষিদায় জ্বলে গো মইলাম, উপায় কি করি,
কি দারুণ আকাল পইড়াছে রে, ধান টাকায় হইল দুই পশারি।
কেউ ত কারে টাকা দেয় না ধার বা হাওলাত পাওয়া যায় না,
মহাজনে কোরোক দিছে জমিদার বাড়ী।
চকিদারী টেকস গো নিল থাল লোটা নিলাম করি। —ঐ

১৩৩৭ বঙ্গাব্দে (ইংরেজি ১৯৩১) এই গানটি সংগৃহীত হইয়াছিল। তখন টাকায় দুই পশারী অর্থাৎ প্রায় ষোল সের ধান বিক্রয় হইত, তাহাই দুর্ভি

বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। তখন প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়াছিল।

মশার উপদ্রব সম্পর্কে নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটি রচিত হইয়াছিল, ইহা ১৩৩৩ সালে পাবনা জিলা হইতে সংগৃহীত।

৫

ও মশা রে—
তুমি দিনে থাক বাগবাগিচায় ফের ডালে ডালে।
পঞ্চস্বরে বাদ্য কর‍্যা আস সন্ধ্যাকালে॥
রে মশা তোর জ্বালাতে॥
মশার জ্বালাতে বৌ ঘরে দিল ধুম্যা,
ওরে তউরে আবাগে মশা গালে খাল চুম্যা,
মশার জ্বালাতে বৌ চলল বাপের বাড়ী,
তউ না আবাগে মশা চল্‌ল সারি সারি—
পাগল করিলি বনের মশা রে॥
মশার কামড়ে বৌ জলে দিল ঝাঁপ।
চিত্যাল মাছে ঠোগ্‌ড্যা নিল সুম্‌খির দুট্যা দাঁত॥
পাগল করিলি বনের মশা রে॥
খাট খোট মশা রে লম্বা লম্বা দাড়ি,
কেমুন কর‍্যা চিনলি মশা তেতুল গাছ্যা বাড়ী;
খাটো খোট মশা রে মুখে চাপ দাড়ি।
কেমুন কর‍্যা চিনলি মশা দালান অওলা বাড়ী॥
কলকাতার থ্যা আল রে মশা সোনা বান্ধা ঠোঁট।
যেখানেতে দেয় রে কামড় যেন তরালিরই চোট॥
পাগল করিলি বনের মশা রে॥
আগান্যা বাগান্যা মশা চল্‌ল সারি গোনা।
ওরে সকল খা'য়্যা থুয়্যা মশা ধরল চালের কোনা॥
ডাকাতিয়া আল রে মশা লম্বা লম্বা ঠোঁট।
মশার কামড় না কুড়্যালেরই চোট॥
পাগল করিলি বনের মশা রে॥ —পাবনা

১২৩০ সালে দামোদর নদে যে বন্যা হইয়াছিল, নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে তাহারই বর্ণনা শুনিতে পাওয়া যাইবে—

৬

নদী সে দামোদরে বরাকরে করছে আনা গোনা।
দুধার মিশায়ে ভাঙ্গে শেরগড় পরগণা ॥
এল বান পঞ্চকোটে ;
এল বান পঞ্চকোটে লিলেক লুটে ভাঙ্গলো রাজার গড়,
দুড় দুড় শব্দে ভাঙ্গে পর্বত পাথর ॥
মিশায়ে নালা খোলা—
মিশায়ে নালা খোলা বানের খেলা, নদীর হলো বল।
দামোদরে জড় হলো চৌদ্দ তাল জল ॥
নদীতে আঁট্‌বে কত ;
নদীতে আঁট্‌বে কত শত শত নৌকা ভাসে জলে,
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র উথলে।
ভাঙ্গলো আদগাঁ ভাড়া—
ভাঙ্গলো আদগাঁ ভাড়া গোপের পাড়া, ভাঙ্গলো বাবুই জোড়,
তারপর ভাঙ্গিল যে নপুর বল্লভপুর।
যত সব ডুবলো গোলা—
যত ডুবলো গোলা হাতে খোলা, নিলেক মহাজন,
দামোদরের বল দেখে উঠ্‌লো সিঙ্গেরণ[১]।
চল্‌লো বান যোজন জুড়ে—
চল্‌লো বান যোজন জুড়ে ত্বরা করে যেমন টাঙ্গন ঘোড়া।
আদগাঁ ভুলুই ভাঙ্গে মেজে ময়সাড়া[২]।
করলে ঢিপে পুরি—
করলে ঢিপে পুরি, আহা মরি, কি করলে ঠাকুর,
তারপর, ভাঙ্গল গিয়ে পুবড়া মদনপুর।

১। রাণীগঞ্জের নিকট ক্ষুদ্র নদী ২। বাঁকুড়া জিলার ক্ষুদ্র গ্রামসমূহ

চললো বান পূর্ব মুখে—
চল্‌লো বান পূর্ব মুখে আপন সুখে চল্‌লো দামোদর,
দু ধার মিশায়ে ভাঙ্গে কাঞ্চন নগর।
বাবুদের কাঠগোলাতে—
বাবুদের কাঠগোলাতে নাটশালাতে প্রবেশ কর্‌ল বান্‌,
বাঁকার সনে সালিশ করে ভাঙ্‌লো বর্ধমান।
বাজারে নৌকা চলে—
বাজারে নৌকা চলে কুতূহলে প্রলয় দেখি বান,—
যে যেখানে আছে, পলায় ছাড়ি বর্ধমান।
ভাঙ্গলো রাণীর হাটা—
ভাঙ্গলো রাণীর হাটা, দালান কোঠা, জজসাহেবের কুঠি,
রাজবাড়ী ছাড়ি বান যান গুটি গুটি।
এবারে বান বাহির হলো—
এবারে বান বাহির হলো রাত পোহালো চল্‌ল মাঠে ঘাটে,
গঙ্গায় মিশায় বান অম্বিকার ঘাটে।
বারশ' ত্রিশ সালে—
বারশ ত্রিশ সালে, বরষাকালে ভাঙ্‌লো নফর দাস,
কেউ হলো পাতুড়ে রাজা—কারো সর্বনাশ। —বীরভূম

পল্লী কবি নফর দাস বীরভূম জিলার খয়রাশোল থানার অন্তর্গত বড়রা গ্রামের লোক ছিলেন। তিনি সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বন করিয়া আরও বহু সঙ্গীত ছড়া রচনা করিয়াছেন, লোক মুখে মুখে প্রচার লাভ করিয়া বর্তমানে তাহা প্রায় সবই বিলুপ্ত হইবার পথে।

নিতান্ত সাম্প্রতিক কালে উত্তর বাংলার বেরুবাড়ী পাকিস্তানে হস্তান্তর করিবার কথায় যে রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা লইয়াও সঙ্গীত রচিত হইয়াছে; ইহাকে রাজনৈতিক বিষয়ক সঙ্গীত বলিয়া স্বতন্ত্র একটি বিভাগে উল্লেখ করিতে হয়—

৭

বন্দনা— আসরেতে খাড়্যা হয়্যা বন্দিম এ লোক কাক?
দেশের হলাৎ দেখ্যা হইচুরে অবাক্‌।

মরি হায়রে কলিকাল,
বেরুবাড়ী দিবা নাগে নাগ্যাছে কাচাল।

যুক্তভাবে— বেরুবাড়ী দিম্‌না,
(মুই) বেরুবাড়ী দিম্‌না।

মূল গায়েন— বেরু দিম্ বাড়ী দিম্।
বেরুবাড়ী দিম্‌না।

দোহার— বেরুবাড়ী দিম্‌না,

মূল গায়েন— জান দিম্ পান দিম বেরুবাড়ী দিম্‌না।

গিরি (কৃষক)—খাজালা খাবা চাছিস, গিরথানী, মুই কেমনে পামু গুড়,
বেরুবাড়ি যায় পাকিস্থানৎ মুই কি হছু চুর।

গিরি— পাটানী পিন্ধার চাছিস, গিরথানী, পাটানী পামু কই,
বেরুবাড়ী যায় পাকিস্থানৎ হামি কি চুপ করিয়া রই।

গিরিথানী— যাওরে কুংকিল উড্যা হামার বাবাক্ গিয়া কভা,
তোমার বেটি ছেয়া মরছুরে হায় নদীৎ গিয়া ডুব্যা।
ডাংগর মেইয়্যারে বেহা দিতে বেরুবাড়ী নাগে।

গিরি— হায়রে হায়, হায়রে দারুণ বিধি,
বেরুবাড়িটার কাচাল ছাড়্যাক, বিধিরে,
হামার ঘর না করিস আন্ধা। —জলপাইগুড়ি

সপ্তম অধ্যায়

বিবিধ সঙ্গীত

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে যে সকল সঙ্গীত ও তাহাদের বিশেষত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা গেল, তাহা ছাড়াও বিভিন্ন প্রকৃতির সঙ্গীত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত আছে, তবে ইহাদের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব নাই। অনেক ক্ষেত্রে একই বিষয়ক সঙ্গীত কেবলমাত্র বিভিন্ন নামে প্রচলিত আছে, তবে এ' কথা সত্য, তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু স্থানীয় বিশেষত্বও প্রকাশ পাইয়াছে। বিষয় বস্তুর দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে দেখা যায়, এই বিষয়ে ইহাদের মধ্যে কোন অভিনবত্বও নাই। হরগৌরী, রাধাকৃষ্ণ, রামসীতার প্রসঙ্গ সর্বত্রই ইহাদের প্রায় সকলেরই অবলম্বন। কেবলমাত্র পরিবেষণের প্রণালীর মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে অভিনবত্ব প্রকাশ পায় এই মাত্র। পল্লীসঙ্গীতের যে সকল সুর প্রধান প্রধান গীতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহাদের মধ্যেও প্রধানতঃ তাহাদেরই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহারাও পল্লীসঙ্গীতের উল্লেখযোগ্য মূল ধারাগুলির অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়।

বিবিধ সঙ্গীতের অন্তর্গত অধিকাংশ সঙ্গীতই আঞ্চলিক; স্থানীয় বিশেষত্বের জন্য ইহারা প্রধানতঃ বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবে বিষয়-বস্তুর মধ্যে প্রায়ই সর্বজনীনতা আছে। যেমন উত্তর বাংলার মাহুত বন্ধুর গান উত্তর বাংলারই বিশেষ প্রকৃতির গান হইলেও ইহার বিষয়-বস্তু প্রেম এবং প্রেমে বিচ্ছেদ। সুতরাং এই ক্ষেত্রে ইহা আঞ্চলিক হইয়াও সর্বজনীন। উত্তর ও পূর্ব বাংলার ধামালী গানও রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ লইয়া লিখিত হয়। ইহার পরিবেষণ প্রণালীর বিশেষত্বই ইহাকে অন্যান্য রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীত হইতে একটু স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে। এখানে বিভিন্ন প্রকৃতির সঙ্গীতের কতকগুলি নিদর্শন উল্লেখ করা যাইবে।

এক

পুরাণের গান

হিন্দু পুরাণের বিভিন্ন বিষয় লইয়া বহু সঙ্গীত রচিত হইয়াছে। ইহারা কোন সুনির্দিষ্ট ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত নাই, যে কোন উৎসব উপলক্ষেই গীত হইতে পারে। নিম্নোদ্ধৃত গানটিব বিষয় শিব-বিবাহ, ইহা একজন মুসলমান কবি কর্তৃক রচিত—

নাবদ মুনি বীণা করেতে,
বীণায় হরিগুণ গান করিতে,
উপনীত হয় গিবি পুরেতে,
বলে, ধন্য ধন্য ধন্যা রাণী এক কন্যা ধরেছ গর্ভেতে,
জামাই এনেছি তোমাব সাক্ষাতে।
সে যে দেবেব দেব ভব মৃত্যুঞ্জয,
ইচ্ছা হয কি মনেতে।
শুনে গিবি বাণী মুখে দেয় বসন,
বলহে, ওহে তপোধন,
জামাই এনেছ অতি সুলক্ষণ,
ও তার পাকা দাড়ী চুল নিশাতে আকুল,
ঢুলু ঢুলু করে দুই নয়ন।
চান্ বদনে নৈবা গিছে দশন।
হৈল সতীর ভাগ্যে জামাতা যুগ্য অতি নব্য পঞ্চানন।
তার সর্ব অঙ্গে ছাই মাখিছে
গলেতে দিচ্ছে ফণিহাব।
কটি ভরা ব্যাঘ্র চর্ম মাথায় জটা ভার।
ও তার বয়েস হয়েছে শতেকের উপরে,
ও হেঁটে যেতে ঢুলে পড়ে বৃষোপরে আরোহণ করে।

ও তার হস্তপদ ক্ষীণ শরীর জীর্ণ,
যেন গুলুম হয়েছে উদরে।
জামাই দেখে প্রাণ কান্দে ডরে
যবন আলাম বলে ভাবলে কি হবে,
যার যার কপালে করে। —বরিশাল

ভণিতা হইতে জানিতে পারা যাইতেছে, শিব-বিবাহ বিষয়ক এই গানটি শেখ আলাম নামক একজন মুসলমান গ্রাম্য কবি কর্তৃক রচিত।[১]

নিম্নোদ্ধৃত গান কয়টিতে দক্ষযজ্ঞের উল্লেখ আছে—

২

তাই ভাবি গো মনে, বিনা নিমন্ত্রণে ;
কেমন কইরে যজ্ঞে যাই বল না ?
তোমরা সবে যাবে, সমাদর পাবে,
আমি গেলে পিতা কথা কবে না,
একে আমি নারী হরের ঘরণী
বিধাতা কইরেছে জনম দুখিনী,
শিব অপমানে হ'য়ে অপমানী,
শিব নিন্দা আমার প্রাণে সবে না ॥ —মৈমনসিংহ

৩

যাইও না যাইও না, সতী, বারে বারে করি মানা।
ভাবনা-সাগরে শিবে, তব শিবে ভাসাইও না।
পাঠাইতে দক্ষালয়ে, নাহি লয় এ হৃদয়ে,
ভয়েতে কাঁপিছে অঙ্গ অমঙ্গলের সূচনা।
ভাই বন্ধু পিতামাতা, এ সংসারে আছে কোথা ?
সাধনের ধন সতী তুমি জেনেও কি তা জান না ?
সতী মন্ত্রে ব্রহ্মচারী, সতীরূপ ভুলতে নারি,
সতী ধ্যান সতী জ্ঞান সতী পরম সাধনা,
কি শ্মশানে কি অরণ্যে, কি শয়নে কি স্বপনে
সতীগত প্রাণ শিবের সতী বিনে প্রাণ বাঁচে না। —ঐ

১। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৪ সাল, ২য় সংখ্যা, 'বরিশালের গ্রাম্যগীতি', পৃ. ১২৬

পুরাণের গানে পুরাণকে যে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করা হয়, তাহা নহে, বরং নিরক্ষর বাংলার স্ত্রীসমাজ পুরাণকে নিজের মনের মত করিয়া গঠন করিয়া লয়। এখানে শুনিতে পাওয়া যাইবে কি ভাবে গঙ্গা হিমালয়ের গৃহে জন্মলাভ করিয়া মাতৃশাপে দ্রবময়ী হইয়াছিলেন ; এই কাহিনী কোন পুরাণে নাই।

এগো, গঙ্গা, একালে ছাড়িলে করিলে কি, মা, (ধুয়া)

জন্মেজয় বলে মুনি করি নিবেদন,
দ্রবময়ী আইলা গঙ্গা কিসের কারণ ?
সতীর কারণ স্তব করেন শঙ্কর,
পার্বতী লইলা জন্ম হিমালয়ের ঘর।
হিমালয়ের ঘরে জন্ম লইলা তারিণী,
প্রচ্ছন্ন হইলা জন্ম দেবী-সুরধুনী।
ধ্যানযোগে অন্তরে অন্তরে ইহা জানি,
দু'জনে দেখিতে আইলা নারদ মহামুনি।
পাদ্য অর্ঘ্য দিলা রাজা বসিতে আসন,
কিসের কারণে আইলাইন, ব্রহ্মার নন্দন ?

* * *

নিশাকালে নিদ্রা যায় হিমালয় রাজন্,
শিয়রে বসিয়া মাতা দেখায় স্বপন।
পার্বতীর সাথে সাথে জন্মিয়াছি আমি,
ত্রৈলোক্য করিতে ত্রাণ ত্রৈলোক্যতারিণী।
বিয়ানে উঠিয়া তবে মেনকা গো রাণী,
গঙ্গারে লইয়া কোলে খাওয়ায় সর ননী।
হিমালয় আইস্যা কয়, মেনকা গো রাণী,
গঙ্গারে কোলেতে দেও দর্শন করি আমি।
গঙ্গারে লইয়া কোলে বইস্যাছে রাজন্,
হেনকালে আইলেন স্বর্গের দেবগণ।

হিমালয় বলে মুনি করি নিবেদন,
কিসের কারণে আইলাইন্ স্বর্গের দেবগণ ?
মুনি বুলে, শুন শুন, হিমালয় রাজন্,
গঙ্গারে লইয়া যাইতে দেবের আগমন।
গঙ্গারে লইয়া চলে স্বর্গের দেবগণ,
পথ পানে চাইয়া কান্দে হিমালয় রাজন্।
দেখিতে দেখিতে গঙ্গা অইলা অদর্শন,
সিংহাসন হৈতে পড়ে হিমালয় তখন।
রাজার পুরীতে ছিল পুরবাসীগণ.
রাজারে ধরিয়া তুলে করিয়া যতন।
অন্তঃপুরে ধাইয়া আসে মেনকা গো রাণী,
কোথায় গঙ্গা কোথায় রাজা দেখাও এখনি।
দশ মাস দশ দিন গর্ভেতে ধারণ,
যাইবার কালে কেন্ না গঙ্গা দিল দরশন ?

* * *

মায়ের শাপেতে গঙ্গা অইলা জলৎকার
মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন কর্তে শক্তি আছে কার ? —ঐ

দক্ষযজ্ঞে পতি নিন্দা শুনিয়া সতীর দেহত্যাগের পৌরাণিক বৃত্তান্ত এখানে শুনিতে পাওয়া যাইবে—

দক্ষরাজ, কর তুমি যজ্ঞের আয়োজন,
আমি গিয়া কইর‍্যা আসি দেব নিমন্ত্রণ।
ব্রাহ্মণাদি দিয়া খায় দক্ষ প্রজাপতি,
তার ঘরে জন্ম লইলা আটাইশ রূপসী।
সাতাইশ কন্যা দান করে চন্দ্রের গোচর,
প্রধান কন্যা দান করে মহাদেবের ঘর।
কন্যা দান কইর‍্যা রাজা দেব সভায় গেল,
শ্বশুর জানিয়া শিব পন্নাম না কৈল,

সেই রাগে দক্ষরাজ যজ্ঞ আরম্ভিল,
পান পত্র নিমন্তন্ন দেশে দেশে দিল।
সকলেরে দিল পান মিনতি করিয়া,
শিবেরে না দিল পান কাপালি জানিয়া।
রথ পাঠাইয়া দিল প্রতি ঘরে ঘর,
রথ দেইখ্যা কন্যাগণের হরিষ অন্তর।
স্নান পুজা কইর‍্যা তারা করিল গমন,
পুষ্পের বাগানে গিয়া দিল দরশন।
কোথা হইতে আইছ, রথ, কোথায় গমন ?
বাপ দক্ষ যজ্ঞ করে যাই সে ভবন।
কেবা জ্যেষ্ঠ কেবা কনিষ্ঠ পরিচয় অইল,
কনিষ্ঠ ভগ্নীবা আইস্যা পন্নাম করিল।
পুষ্প তুল্যা সত্যবতী বাড়ীৎ চল্যা যায়,
বাপ দক্ষ যজ্ঞ করে শিবেরে জানায়।
শুন দেব, মহাশয়, কবি নিবেদন,
বাপ দক্ষ যজ্ঞ করে যাই সে ভবন।
লজ্জা নাই নির্লজ্জ, সতী, লজ্জা নাইরে তোর,
গলায় কলসী বাইন্ধ্যা জলে ডুইব্যা মর।
সকলেরে দিল পান মিনতি জানাইয়া,
আমারে না দিল পান কাপালি বলিয়া।
শিবের নিষ্ঠুর বাক্য সইতে না পারিয়া,
পার্বতী ক্রন্দন করে ভূমিতে পড়িয়া।
গৌরীর ক্রন্দন শিব সহিতে না পারে,
নারদরে ডাকিয়া রথ আনাইল সত্বরে।
রথে চড়ি সত্যবতী করিল গমন,
দক্ষের ভবনে গিয়া দিল দরশন।
দূতে গিয়া বার্তা দিল দক্ষ রাজার আগে,
আসিয়াছে সত্যবতী যাও দেখিবারে।

আসিয়াছে সত্যবতী যাইবেন ফিরিয়া,
বিনা নিমন্ত্রণে তিনি আইলেন কি বলিয়া ?
সকলকে দিলাম পান আদর করিয়া,
শিবেরে না দিলাম পান কাপালি জানিয়া।
দেব দেব মহাদেব পরম দেবতা,
তারে মন্দ বল, পিতা, কিসের লাগিয়া ?
দক্ষের নিষ্ঠুর বাক্য সহিতে না পারে,
ঝাঁপ দিয়া পড়ে সতী যজ্ঞের উপরে।
নারদ গিয়া বার্তা দিল শিবের গোচরে,
শিব নিন্দা শুন্যা সতী দেহপাত করে। —ঐ

ভরতের শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তির কথা এই গানে শুনিতে পাওয়া যাইবে। রাম-বিহনে অযোধ্যার রাজপ্রাদের চিত্রটি এখানে বড় করুণ।

৬

ও রাম বনে দিয়ে রাজা দশরথ করলেন স্বর্গেতে গমন,
ঐ শুনে ভরত এলেন ত্বরা অযোধ্যা ভুবন।
ও রাম গেছেন যে পথে ভরত গেলেন সেই পথে,
গিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্ম আনলেন গৃহেতে।
দেখে শত্রুঘ্ন কয়, রাম অনুজের পদ পেলে কার কাছে ?
ভরত বলয়ে সত্য করে রাম বনে কেমন আছে।
গিয়েছিলে বাছাধন, করে এলে অন্বেষণ,
ভাল ত আছে সে লক্ষ্মণ, আছে কুশলে কি মা জানকী বল বিবরণ।
সেই সীতা সতী রঘুপতি সঙ্গেতে বাস করতেছে।
অভাগিনী মায়ের নাম বুঝি ভুলেও গিয়েছে।
বনেতে যখন, ও রাম, করলেন গমন,
ভরত, তোর জননী বলেছিল কুবচন।
সেই নিষ্ঠুর বাক্যে আমাব বক্ষে শেল হেনে যে রয়েছে।
পদ নয় বিভিন্ন এতো সেই শ্রীরামধনের শ্রীপদচিহ্ন।
দেখারে আমায় ভুলে ডাকুক আমায় মা বলে,
বধির দূর হয়ে যাক কর্ণ।

ও রাম পদ যদি আমার মা বলে তোমায় করি আশীর্বাদ,
ঐ শোক নিবারণ হবে রে আমার হবে না প্রমাদ।
রামের পাদুকা ভরত করিয়া সখা রাখে আপন মনে সিংহাসনে
আমার রামের কথা মনে হলে যাবো পদকার কাছে। —নদীয়া

নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটিতে অশোক বনে সীতা-হনুমান সংবাদ শুনিতে পাওয়া যাইবে—

আমি দশরথের পুত্রবধূ আমার নাম সীতা সতী,
ঐ সূর্য বংশের চুড়ামণি নাম যে রঘুনাথ, আমার সে হন প্রাণপতি।
ওহায়, ঐ পিতৃসত্য পালনে রাম হন বনচারী সঙ্গে ছিলেন তার নারী,
মায়া মৃগরূপ হেরে চিত্ত চঞ্চল করে গো গেলেন
আমার বাক্যে মৃগ ধরতে রাম ধনুকধারী।
ও হায়, সেই অবসরে যোগীর বেশে দুষ্ট দশানন,
আমায় আনলে হরে অশোক বনে ভাসতেছি নয়ন জলে।
মরকটের বেশে তুমি এখানে এলে কোন ছলে—
মিটির মিটির চায় আবার লোম ছাটা,
তুমি কও দেখি কার বেটা,
শুনি পশুর মুখে ডাকতেছে ধ্বনি জয় রাম বলে।
এমন মধুমাখা রামের নাম কেমনে পেলে,
ঐ রাম বিহনে মন আগুনে জীবন দগ্ধ হয়।
তুমি কে এমন সময় রামের নাম শুনালে সবিশেষ দাওনা বলে,
ওগো এই অশোক বনে কেন এলে শুনবো পরিচয়।
রাবণ মায়াধারী মায়া করে মন ছলে আমারও হায়
আমার মন ভুলাতে দুষ্ট রাবণ বেড়ায় ছলে কৌশলে।
দুষ্ট রাবণ রাজার চেড়ী,
মরি তার বাক্যেতে দুঃখেতে, ওগো, যন্ত্রণা দেয় ভারী।
কেউ বা ধরে প্রহার করে মারে গো আমায়,
আমি বলবো কি তোমায়,
আমার কাঁদিতে জন্ম গেল হয়ে রাজকুমারী।

তুমি নর কি বানর হও নিশাচর সত্য তাই কও আমার কাছে,
ঐ কত মায়া জানে সেই রাবণ তাই সন্দেহ হতেছে।
ঐ দাঁত খিঁচিরে লেজ গুটিয়ে বেড়াও এখানে,
দেখে সন্দেহ হয় মনে—
আমি জনক-নন্দিনী দয়াল রামের ঘরণী গো—
করলে ছল চাতুরী আমার সনে বাঁচবে না প্রাণে,
আমার জীবন যৌবন সর্বস্ব ধন রাম রঘুমণি,
রামের অদর্শনে অশোক বনে জীবন আমার যায় জ্বলে। —ঐ

নিরক্ষর গায়কের রচনায় রামায়ণের চিত্রগুলি এখানে এলোমেলো হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে—

রামকে মানুষ করেছি এই দুখ পাবার লাগে,
সেই রাম আমার বনে গেল পাঁজরে ঘুন লাগায়ে।
সীতা মলে সীতা পাব, ভাই মলে ভাই কোথায় পাব।
যারে সীতা অশোক বনে, ভাই নিয়ে ভাই বনে যাব।
অশোক বনে পাতার কুড়া সীতা পাতা কাটিছে,
যোগীর বেশে রাবণ এসে সীতা হরে নিয়েছে।
সীতা হরে নিলি রাবণ সীতা রেখো যতনে,
দিবানিশি প্রাণ কাঁদিছে দেবর লক্ষ্মণ বিনে।
রাম নাকি রে যাবি বনে মাকে কেন বল না।
মায়ের মন কি প্রবোধ মানে হে রাম বনে যেও না।
রাম নাকি রে যাবি বনে হাতে লয়ে গণ্ডীবান,
এ গণ্ডীবাণ যে ভাঙ্গিবে তারে করিবে সীতা দান॥ —বাঁকুড়া

মায়ামৃগ বধ এবং সীতা হরণের বৃত্তান্ত এখানে শুনিতে পাওয়া যাইবে—

৯

রামচন্দ্র রাজা হবে শুভ অধিবাস,
কৈকেয়ী বিবাদী অইয়া দিছে বনবাস।

(বনে যাইতে হবে, বনে বাস করিতে)
শ্রীরামচন্দ্র রাজা হবে দিয়া তিলক ফোঁটা,
কৈকেয়ী পাষণ্ড অইয়া পরায় বাকল জটা।
(কৈকেয়ী বাদী অইল)
পতি সঙ্গে বনে সীতা করিছে ভরমন,
সোনার এক মৃগ আইস্যা দিল দরশন।
(মৃগ বধ কইর‍্যা দেও হে আমায়)
চর্মে বইস্যা স্তব কর্ব রং দেখবে তুমি।
ধনু হাতে কইর‍্যা রাম করিলা গমন,
লক্ষ্মণেরে রাখিয়া গেলা সীতার কারণ।
(বনে ভয় যে আছে)
সীতা বলে, শুন, লক্ষ্মণ, আমার বচন,
মৃগ বধিবারে একা গেছেন সনাতন।
(তোমার যাইতে হবে)
লক্ষ্মণ বলে, শুন, সীতা, আমার নিবেদন,
মৃগ বধিবারে গেছেন ব্রহ্ম সনাতন।
(যাইতে পারব নাহে, তোমায় একা রেখে)
সীতা বলে, শুন, লক্ষ্মণ, আমার বচন,
এখন বুঝি পড়িয়াছে আমার দিকে মন।
(যাইতে পারব না হে)
এই কথা শুইন্যা লক্ষ্মণ মনেতে ভাবিয়া,
সীতারে রাখিয়া গেল রামকুণ্ডলী দিয়া।
(সীতা রইল ঘরে)
হেনকালে যোগীর বেশে আসিয়া রাবণ,
জনক নন্দিনী সীতায় বলিছে বচন॥
(আমায় ভিক্ষা দেও গো)
এই কথা লক্ষ্মী সীতা যখন শুনিল,
সোনার এক আনি আইন্যা উড়াইয়া দিল।

(মনে ভয় রাখিয়া)
সুবর্ণের আনি আমি কিছু নাহি চাই,
হাতে হাতে দিলে ভিক্ষা খুসী অইয়া যাই।
(তোমার ভাল হবে)
হস্ত বাড়াইয়া ভিক্ষা রাবণেরে দিতে,
হাতেতে ধরিয়া সীতা তুইল্যা লইল রথে।
(সীতা কাঁদছে বইসে)
সীতা লইয়া যাইতে পথে জটাই পক্ষী বলে,
কার বা মাতা, কার বনিতা, হরিয়াছে ছলে।
(ওরে দুষ্ট রাবণ)
এই কথা শুইন্যা রাবণ ক্রোধ অইল মনে,
যুদ্ধ করিতে গেল জটাই পক্ষীর সনে।
(জটাই যুদ্ধ করে)
যুদ্ধ করি জটাই পক্ষী ভূমেতে পড়িল,
দুই পাখা কাইট্যা পক্ষীর সাগরে ভাসাইল।
(রাবণ কি দুর্মতি)
কইও কইও কইও, পক্ষী, শ্রীরামের স্থানে,
আমারে হরিয়া নিল লঙ্কার রাবণে !
(দুঃখের অন্ত নাই হে) —মৈমনসিংহ

নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটিতে সীতা তাঁহার দুর্ভাগ্যের জন্য বিলাপ করিতেছেন—

১০

কি সুধাও ভগ্নী, সুধাংশুবদনী,
দুঃখের কাহিনী কি বলিব আমি।
যেন আকরিয়া বিষ মিশাইয়া,
সেই দুঃখের মুর্তি গড়াইছে জানকী।
হরধনু-ভঙ্গ জনক প্রতিত,
শ্রীরামচন্দ্র মোরে করেন পরিণয়।

পথে পশুরাম যুদ্ধে কল্লেন জয়,
আমায় নিয়ে যান অযোধ্যা ভবন !
আমায় নিয়ে ঘরে রাম রঘুবরে,
একদিনের তরে না হইলেন সুখী।
আমি অভাগিনী হব রাজরাণী,
রাজমহিষী হৈতে হৈলাম ভিখারিণী।
কপালের লেখা স্বপনে না জানি,
রাজমহিষী হৈতে হৈলাম ভিখারিণী। —ঐ

দুই

ধামালী গান

নৃত্য-সম্বলিত এক শ্রেণীর কাহিনীমূলক সঙ্গীতের নাম ধামালী গান। কাহিনী বলিতে প্রধানতঃ কৃষ্ণ কিংবা চৈতন্যের কাহিনী থাকে বলিয়া ইহা কৃষ্ণ-ধামালী বলিয়াও পরিচিত। ইহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, ইহা প্রধানতঃ স্ত্রীসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দশ পনের কি বিশ-পঁচিশ জন স্ত্রীলোককে মুক্ত প্রাঙ্গণে চক্রাকারে দাঁড়াইয়া তালে তালে করতালি দিয়া নাচিয়া নাচিয়া ধামালী গাইতে হয়।

১

গৌর বরণ রূপের কিরণ লাগ্‌ল নয়নে।
(লাগ্‌ল নয়নে, সজনি, লাগ্‌ল নয়নে) ॥
আমার গৌর অপরূপ, কোটি মন্মথ-স্বরূপ,
সজনী, কখন চক্ষে দেখি না এরূপ,
গোরা আড়-নয়নের চাউনি দিয়ে পরাণ ধরিয়া টানে।
যদি গৌরকুল পাই, আমার এই কুলের কাজ নাই,
সজনী, তিন কড়ার মূল কুলে দিলাম ছাই।
আমি গৌরকুলে কুল মিশায়ে, সজনি, মজে রব তাঁর চরণে।
ভেবে জয়মঙ্গলে কয়, আমার গৌর রসময়,
সজনি, রসে মাখা তনুখানি হয়,
গোরার রসে ডুবুডুবু আঁখি, একদিন চেয়েছিল আমার পানে।

—মৈমনসিংহ

আজ কেন রে যৈবন তুই,
মিছে পাগল করিস রে, হায়!
ধোপ্ কাপড়ে কালির ফোঁটা,
মাধব! যাবে যৈবন, রবে খোঁটা ॥

আড়ায় যেমন ময়না রে পোষে,
ও মাধব, ছুটে গেলি আর না আসে ॥
আড়ায় যে মন ময়না রে পাখী,
ও মাধব, তাই দেখে প্রাণ বেঁধে রাখি ॥ —ফরিদপুর

৩

গৌররূপ লাগিল নয়নে,
আমি কুক্ষণে চাহিয়াছিলাম গো,
গৌরচন্দ্রের পানে।
কলসীতে নাই রে পানি, আমি গিয়েছিলাম সুরধুনী ;
গৌর কে বা না শুনি শ্রবণে।
একদিন জলের ঘাটে দেখে তারে মজেছি পরাণে ॥
গৌর থাকে রাজপথে,—
তোমরা কেউ যাইও না জল আনিতে গো,
দেখলে তারে মরিবে পরাণে ;
শেষে আমার মত ঠেকবি তোরা গোপালচান্দে ভণে ॥

—মৈমনসিংহ

এই গানটি গোপিনীকীর্তন কিংবা গোপিনী খেলা বলিয়াও পরিচিত। ইহাও নৃত্যসম্বলিত নারীনৃত্য। উত্তর এবং পূর্ব বাংলার প্রায় সর্বত্রই নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু সমাজের মধ্যে ধামালী গান প্রচলিত থাকিলেও শ্রীহট্ট ও কাছাড় জিলার সর্বত্র সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী হিন্দু পরিবারের স্ত্রীসমাজেও ধামালী গান প্রচলিত আছে। নবান্ন উৎসবের সময় কিংবা নববধূকে বরণ করিবার সময় বৌ নাচের সময় সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলারাও নৃত্যসহযোগে ধামালী গাহিয়া থাকেন।

তিন

ব্যবসায়ীর গান

বাংলাদেশে এমন কতকগুলি ব্যবসায় আছে, সঙ্গীতের ভিতর দিয়া তাহাদের প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণ সৃষ্টি করা হইয়া থাকে। পটুয়ার গানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিত, তবে তাহা আঞ্চলিক সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে; কারণ, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য তাহাতে প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। বাংলাদেশের সর্বত্রই বেদেনীর গান প্রচলিত আছে। ব্যবসায়ীর গানের মধ্যে ইহাই প্রধান। সাপ দেখাইবার সময় বেদেনীরা এই গান গাহিয়া থাকে। তবে এই গানের প্রধান বিষয় বেহুলার অকাল বৈধব্যের করুণ বৃত্তান্ত।

সাপের ঝুড়ি মাথায় লইয়া যখন বেদেনীরা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায় তখন গায়—

১

সাপে বাঁদরে খেলা করে ওগো নয়া নয়া সাপ।
ঢোঁড়া বোড়া জোড়া জোড়া বিশ হাত লম্বা চন্দ্রবোড়া।
ফোঁস ফোঁস গোখ্‌রো, ফোঁস ফোঁস কেউটে,
দু'মুখো সাপ দেখ্‌নে আও, আউর কেরামতী দাদা॥ —নদীয়া

২

সাপ খেলা দেখবি যদি আয় লো সোনা বউ।
সাপ খেলা দেখবি যদি আয়!
সাপে যখন ফণা ধরে,
আলকাতরার মায় চিক্‌রাইয়া মরে।
মোড়াইতে মোড়াইতে সাপ গর্তে চইলা যায়!
লো সোনা বউ আমরাও যাই চইলা,
মাইয়াদের মনে রাখিস নায়॥

(হা কপাল) —ঢাকা

৩

নদীর কুলে ধুতুরা গাছে ধুতুরা বড় ধরে।
সেই ধুতুরার ফলটা খেলে প্রাণটা কেমন করে॥

প্রাণটা করে আকুলবিকুল্ চক্ষু হইল নাটা !
নাটা চোখে পাগলী নাচে হাতে পানের বাটা ॥ —ঐ

সাপ নাচাইবার সময় গান—

৪

জয় বিষহরী গো, জয় বিষহরী,
চাঁদ বেনে দণ্ড দিল, তোমার কৃপায় তরি গো।
চম্পাই নগরের ধারে, সাঁতালী পাহাড়,
ধন্বন্তরি মন্ত্রে বাঁধা সীমেনা তার।
বিরিখ্যে মোর বৈসে গর্তে গর্তে নেউল্।
বিষবৈদ্য বৈসে সেথায় বাগুলা বাউল গো ॥ —বীরভূম

পিরৃদিমখানা নিবু নিবু মিটমিটিয়া জ্বলে,
বেউলা বাড়ায় সইলতাটিরে কনিষ্ঠ আঙ্গুলে।
সেই যে তৈল মোছে বেউলা সাঁথির উপরে,
কালনাগিনী বলে, এবার দোষ পেয়েছি ওরে।
রে বিধির কি হৈল ॥ —ঐ

অনেক সময় সাধারণ ঘরকন্নার কাহিনীও ইহাদের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়—

মরুচের গাছ কিনা পাগড়া থুগড়ী ফল বিস্তর ধরে।
হাত বাড়াইতে মরুচের গাছ হালিয়া ঢুলিয়া পড়ে ॥
(ভাগিনা, ধান মারিয়া দে)
ভাগিনা গেইসে অনেক দূর খবরে নাই পাই।
আনত পুরস্তির পাত লেখিয়া পেঠাই।
(ভাগিনা ধান মারিয়া দে)
সগর ভাগিনা ধান মারে আথারে পাথারে,
মোর ভাগিনা ধান মারে মোর মন্দির ঘরে ॥ —জলপাইগুড়ি

৭

করলা গাড়িনু সারিগে সারি
সেও করলা মোর নন্দে ছেকে পানি।
করল না মোর কে ॥
শ্বশুরে দিলেক ঝিকোর ঝাটালি
ভাশুরে দিলেক ঝাংগতে গুঠেয়া।
শাশুড়ী তুলে ঢাকিরে চারিক
হামরা তুলি গণ্ডা চারিক ॥
শাশুড়ী আন্ধে মুনেরে তেলে
হামরা ওঠাই ঘিয়েতে ভাজিয়া।
শ্বশুরে খালেক সোয়াদ পালেক
শিরের সোয়ামী খালেক, সোয়াদ না পালেক ॥
করলার পাইলা ডিকিয়া ভাঙ্গিমারে। —ঐ

উত্তর বাংলার এক শ্রেণীর প্রেম-সঙ্গীত বা ভাওয়াইয়া গানের নায়ক মাহুত বা হস্তীর রক্ষক। এই গান ভাওয়াইয়া গানের অন্তর্ভু'ক্ত হইলেও সাধারণভাবে মাহুত বন্ধুর গান নামে পরিচিত। তবে সকল সময়ই যে ইহারা ভাওয়াইয়ার মত প্রেম-সঙ্গীতই হইয়া থাকে, তাহা নহে, কোন কোন সময় হাতীকে পোষ মানাইবার জন্যও মাহুতেরা যে এক শ্রেণীর গান গাহিয়া থাকে, তাহাকেও মাহুতের গান বলা হয়। উত্তর বাংলা ও আসামের গোয়ালপাড়া জিলায় ধুবড়ী মহকুমায় যেখানেই হাতী ধরা এবং নানাভাবে হাতীর ব্যবহার প্রচলিত আছে, সেখানে হাতীর মাহুতের সঙ্গে গ্রাম্য যুবতীর প্রণয়-বর্ণনা করিয়া এক শ্রেণীর গীতিসংলাপযুক্ত সঙ্গীত রচিত হইয়া থাকে।

৮

কইন্যা : হস্তী নড়াং হস্তী চরাং হস্তীর গলায় দড়ি,
সত্য করিয়া কও রে কথা কোন বা দেশে বাড়ী।
তোমরা গেইলে কি আসিবেন, মোর মাহুত বন্ধুরে।
মাহুত : হস্তী নড়াং হস্তী চরাং হস্তীর গলায় দড়ি,
সত্য করিয়া কইলাম কথা গৌরীপুরে বাড়ী।

কইন্যা : খুটো খুটো, মাহুত রে, তোর মুখে চাপা দাড়ি,
সত্য করিয়া কও রে কথা ঘরে কয়জন নারী।
তোমরা গেইলে কি আসিবেন মোর মাহুত বন্ধুরে।

মাহুত : হস্তী নড়াং হস্তী চরাং হস্তীর পায় বেড়ী,
সত্য করিয়া কইলাম কথা বিয়াও না করি। —কোচবিহার

ভিন্ন গ্রামবাসী মাহুতের সঙ্গে গ্রাম্য বালিকার এই ভাবে প্রেমের সঞ্চার হইল। চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত এক শ্রেণীর হাতী খেদার গান প্রচলিত আছে। তাহা প্রকৃতপক্ষে হাতী ধরিবার গান।

উত্তর বাংলার জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুর দুয়ার মহকুমা, কুচবিহার জিলার তুফানগঞ্জ মহকুমা এবং গোয়ালপাড়া জিলার ধুবড়ী মহকুমায় বনভূমির মধ্যে মধ্যে বিস্তীর্ণ সমতল তৃণাঞ্চল আছে, তাহাতে এক শ্রেণীর লোক মহিষ চরাইয়া বেড়ায়। তাহাদিগকে মইষাল বলে। তাহারাও বিভিন্ন গ্রাম হইতে মহিষের দল লইয়া আসিয়া সেই সকল অঞ্চলে বাথান তৈরী করিয়া সেখানেই সাময়িকভাবে বাস করে। তারপর প্রয়োজন মত দেশে ফিরিয়া যায়। এক শ্রেণীর ভাওয়াইয়া গানের নায়ক এই মইষাল বা মহিষ রক্ষক। এই গানেও গীতি-সংলাপের ভিতর দিয়া গ্রাম্য যুবতীর সঙ্গে মহিষালের প্রণয়-নিবেদনের কথা শুনিতে পাওয়া যায়—

৯

কইন্যা : ও কি মইষাল বন্ধু রে,
বকনা মইষের দুধ ধরি
যান মইষাল আমার বাড়ী
খায়া আইসেন নবীন বাটার পান।
খায়া দ্যাহেন, মইষাল, ক্যামন মজা পান।
মইষ চরান, ওরে মইষাল, কোন বা ঝাড়ের মাঝে ?

মইষাল : মইষ চরাই, ওহে কইন্যা, ঘাটের উজানে,
ঘাঁটির ডাঙ্‌ কি নাই শুনেন কানে।
মইষ চরাই, ওহে কন্যা, শান বান্ধা ঘাটে।

কইন্যা : তোর মইষালের এমনই মায়া
বুজাইতে না মানে দেহা।

তোমার মনে মইষাল ক্যাম্‌নে হব দেখা।
মাকালের ফলরে যেমন,
মোর নারীর যৌবন তেমন,
ও কি, মইষাল বন্ধু রে।

নারীর যৌবন মাকাল ফলের মত, উপরের সৌন্দর্য চোখ ভুলাইয়া যায়, কিন্তু ভিতরে বিষ।

এই প্রকার গো-রক্ষকদিগের প্রেম-সঙ্গীতকে রাখালী গান বলা হয়। ইহাদের কাহারও মধ্যে রাধাকৃষ্ণের নাম এবং তাহাদের প্রণয় চিত্র প্রবেশ করিতে পারে নাই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'চণ্ডালিকা' নামক নৃত্যনাট্যে দুইটি ব্যবসায়ীর সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন—একটি দইওয়ালার গীত, আর একটি চুড়িওয়ালার গীত। অবশ্য লোক-ঐতিহ্যের ধারা প্রত্যক্ষভাবে অনুসরণ করিয়া যে তিনি গান দুইটি রচনা করিয়াছেন, তাহা নহে, বরং ইহাদের মধ্যে তাঁহার রোমান্টিক কবি-মানস সক্রিয় হইয়া উঠিয়া বিষয়বস্তু সম্পর্কিত রূঢ় বাস্তব চেতনাকে অনেকখানি মার্জিত করিয়া লইয়াছে। তবে অধিকাংশ ব্যবসায়ীর সঙ্গীতই তাহাই। যে বস্তু লইয়া ব্যবসায়, তাহার বাস্তব রূপটি কদাচ ইহার মধ্যে লক্ষ্য না হইয়া বরং অন্যান্য মানবিক অনুভূতি ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে।

কোন কোন ব্যবসায়ীর সঙ্গীত নৃত্য-সম্বলিত; সেই সূত্রে তাল-প্রধান। কিন্তু সর্বত্র তাহা নহে। এমন কি বেদের গানও যে সর্বদাই নৃত্য সম্বলিত, তাহা নহে, সেইজন্য তাহাতে বেহুলা-লখীন্দরের করুণ কাহিনী গীত হইতে পারে।

চার

কুষাণ গান

জলপাইগুড়ি কুচবিহার অঞ্চলে প্রচলিত রামায়ণ গানকে কুষাণ গান বলা হয়। তবে এই গানেব একটি বিশেষত্ব এই যে, পশ্চিমবঙ্গের রামায়ণ গানের দলে যেমন একজন মূল গায়েন, তুই তিনজন দোহারের সহায়তায় সকল কাহিনী গাহিয়া যায়, এখানে তাহার পরিবর্তে লবকুশকে কেন্দ্র করিয়া সঙ্গীত পরিবেষণ করা হয়। রামচন্দ্রের রাজসভায় এই পদ্ধতিতে রামায়ণ গান পরিবেষণ করা হইয়াছিল বলিয়া ইহাতেও তাহাই অনুসরণ করা হইয়া থাকে। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে তুলনা করিলে এই বিষয়ে ইহার একটু অভিনবত্ব আছে। তবে ইহাতেও একজন মূল গায়েন থাকে, কিন্তু তাহার মুখ্য ভূমিকা থাকে না, লবকুশ চরিত্রেরই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়। ইহার মূল গায়েনের হাতে এক বাদ্যযন্ত্র থাকে, তাহার নাম ব্যানা। ইহা দেশীয় বাদ্যযন্ত্র, বেহালার সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই, তবে বেহালার কাজ ইহা দ্বারা সিদ্ধ হয়। ইহা দেশীয় তারযন্ত্র। ইহারও সঙ্গে দোহার ও অন্যান্য গায়ক থাকে। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া এই গান গাওয়া হয় বলিয়া ইহাকে জাগ গানও বলে।

১

বিশ্বামিত্র মুনিবর গাধীর নন্দন।
অযোধ্যা নগরীতে এসে দিলেন দরশন॥
রাজারে চাহিয়া মুনি লইলেন রাম লক্ষ্মণ।
সন্দেহ উদিল মনে জিজ্ঞাসে যখন॥
কোন পথে যাবে বল দাশরথি শূর।
বিনা বাধায় সাতদিন সহজে বিপদ দূর॥
এতেক শুনিয়া কুমার উত্তরিল যবে।
বিলম্বে কার্য হইলে বিপদে কে পড়ে॥

পাঁচ

অষ্টক গান

নীলপূজার গাজন উপলক্ষে এক শ্রেণীর গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাকে অষ্টক গান বা অষ্টগান বলে। ইহার সুর, পদ-বিন্যাস এবং গান গাহিবার ভঙ্গি গাজনের অন্যান্য গান হইতে একটু স্বতন্ত্র। নীল বা নীলকণ্ঠ শিবের গাজন হইলেও ইহার গানে কৃষ্ণের প্রসঙ্গ শুনিতে পাওয়া যায়। নিমাই সন্ন্যাসের প্রসঙ্গও ইহাতে বর্ণিত হয়। শিবের প্রসঙ্গও যে একেবারে না থাকে, তাহা নহে। তবে অষ্টক গানের বিশেষ সুরে যে সকল গান গীত হয়, তাহা সাধারণতঃ কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যের সন্ন্যাস প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়াই রচিত হয়। সুতরাং নীল বা শিবের গাজন উপলক্ষে রাধাকৃষ্ণ এবং চৈতন্য প্রসঙ্গ সম্পর্কে যাহাই গীত হয়, তাহাই অষ্টক গান বলিয়াই পরিচিত ছিল, ক্রমে দুই একটি শিব-বিষয়ক প্রসঙ্গও আসিয়া ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। তবে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গের মধ্যে প্রেমের বিষয় ইহাতে মুখ্য স্থান অধিকার করে না। অনেক সময় সমাজের সমসাময়িক অবস্থার কথাও ইহাতে উল্লেখ থাকে।

১

ওরে, ঘোর কলিকাল হরি বল।
পাপের হল অধিকার—
দিগ্‌বিদিক পাবে হোল সবই হল একাকার॥
ঘরে সাপ গাছের মাপ গেল
বেশ্মার কচা দর হোইল।
ওরে বউ হইয়াছে রাজরাণী
মা হইয়াছে তার চাকরাণী॥
বধূর কথা মধু লাগে
জয় কবে সেই সুন্দরী॥

—মুর্শিদাবাদ

২

শিব বলে সুন্দরী
তুইতো বড় রূপসী
আমি একটু হইছি বুড়া
তাতে তোর ক্ষতি কি?

আমি দিব সোনার মুকুট তোর মাথায়
সোনা মল গড়ে দিব পায়
দুই হাতে দুই কঙ্কণ দিব যাতে তোর শোভা হয়।
চিরুণে চুড়িয়া চুল,
খোঁপায় দিয়া, হা রে, চম্পা ফুল।
ফুলের গন্ধে কেড়ে নেয় প্রাণের যুবতীর কুল ॥ —ঐ

৩

ও নারদ কৈলাসে ভবানীকে কয় হেসে,
পাগলা মামা ধুতরো খেয়ে
কোচের বাড়ী যায় ঘুরে।
ও মামা হাসে রসে পান চিবায়,
চিচ ঢালে কোঁচানির গায়।
কেউ বা মামার মাথা খায়, কেউ বা মামার জট ঘুরায়,
ওরে চুপ—গাজন তায় আলোয়ে, নাগর দিল ভুলায়ে।

ছয়

ঝান্দুটি গান

নীলের গাজন উপলক্ষে আর এক শ্রেণীর গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাকে কেহ কেহ বান্দুটি গান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার এই নাম কি করিয়া হইল, এই নামেব অর্থই বা কি, তাহা জানিতে পারা যায় না। এই গানের বিশেষত্ব এই যে, ইহা ধীব লয়ের গান। ইহা সমবেত কণ্ঠে গীত হয়। রাধাকৃষ্ণ এবং রামায়ণের প্রসঙ্গ ইহারও বিষয়। সাধারণতঃ ইহাতে করুণভাব শুনিতে পাওয়া যায়—

১

ও ভাই, সত্য বল না করো ন ছলনা,
প্রাণেব ভাই, লক্ষ্মণ, গুণমণিরে।
শূন্য রথ লয়ে আলি বে আলয়ে,
কোন বনে রেখে চন্দ্রমণিবে॥
মম মন্দ মতি পতি হয়ে সতী,
বিনা দোষে দিলাম বনবাস,
না ভাবিলাম ত্রাস, গর্ভ পঞ্চমাস,
করি গর্ভনাশ হৈল সর্বনাশ।
শুনিয়া কুজনার কুবচন, হিতাহিত চিতে না করিলাম মোচনা,
তেজিলাম জনক-নন্দিনীরে॥
সীতা নিরীক্ষণ না করে লক্ষ্মণ, প্রাণ যায় যায় না যায় লক্ষ্মণ,
ইচ্ছা হয় মন গরল ভক্ষণ, করি মরি বিলক্ষণ।
পুনঃ না করিব ঐ মুখ দর্শন, বিনা দোষে করিলাম উপক্ষণ,
বনে দিলাম একাকিনী রে॥ —মুর্শিদাবাদ

রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা, হরগৌরী ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ক গানই এই উপলক্ষে গাওয়া হইতে পারে। কেবলমাত্র স্বরগত বৈশিষ্ট্য দ্বারাই ইহার স্বকীয় পরিচয় প্রকাশ পায়।

সাত

পাঁচালী

কাহিনীমূলক সঙ্গীতকেই পাঁচালী বলিত। প্রাচীন পাঁচালী পরিবেষণের বিশিষ্ট যে একটি পদ্ধতি ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে যুগ প্রভাববশতঃ পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে। প্রথমতঃ একটানা কাহিনীরূপেই ইহা নৃত্য ও সঙ্গীতের সহযোগে পরিবেষণ করা হইত, ক্রমে তাহার মধ্যে সঙ্গীত-সংলাপ আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। সেইজন্য পাঁচালী হইতে যাত্রার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছেন। তবে নানা পৌরাণিক প্রসঙ্গই পাঁচালীর মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইত। লোক-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আসিয়া পাচালী একটি লৌকিক রূপ লাভ করিয়াছিল। নিম্নোদ্ধৃত রচনাটি তাহার একটি প্রমাণ। ইহাতে সঙ্গীতের মধ্য দিয়া একটি সংলাপ ব্যবহৃত হইয়াছে; অবশ্য সর্বত্রই যে এমন হয়, তাহা নহে, ইহার ব্যতিক্রমও কোন কোন ক্ষেত্রে আছে, তবে লৌকিক পাঁচালীর ইহা একটি বিশেষ লক্ষণ।

১

দশরথ। আগে জানিনা, বিধি দিবে এ'সব যাতনা,
শিরে বজ্র খসে পলো গো আর যে বাঁচি না।
আগে যদি জানবো মনে এ প্রতিজ্ঞা করব কেনে,
এত ছিল্ রাণীর মনে গো কুমন্ত্রণা॥

রাম। তোমার সত্য করতে পালন বনবাসে যাব এখন,
চৌদ্দ বৎসর করব ভ্রমণ গো, তুমি ভেবো না।

দশ। জীবনের ধন রাম-নারায়ণ পিতা বলে ডাক্‌রে এখন,
মধুর বাণী শুনি এখন রে শুন্‌তে পাব না।

কৌশল্যা। আমার দেহে থাকতে জীবন, বনে যাবে রাম-নারায়ণ,
দুঃখের আগুন জল্‌ছে দ্বিগুণ সইতে পারব না।

দশ। সময় দোষে সব সইতে হয় বলে কি দিবে পরিচয়,
পড়েছি আজ পুত্রের মায়ায় গো বড় ভাবনায়।

রাম। থাক পিতা ধৈর্য ধরে আবার আমি আস্‌ব ফিরে,
সকল দুঃখ যাবে দূরে গো, এ দিন থাক্‌বে না॥

দশ। রঘুমণি, আয়রে কোলে, পড়েছি বিধির কবলে,
এই আগুনে পুড়ে যাবে রে আমার বুকখানা ॥

রাম। তোমার বাক্য কর্‌তে পালন, আমার যে হয়েছে জনম,
ছিঁড়ে ফেল মায়ার বন্ধন গো কাছে রেখ না।

কৌশল্যা। তুই যে আমার কোলের ছেলে, বনে দিব হাতে তুলে।
কারে নিয়ে থাক্‌ব ভুলে রে যেতে দিব না ॥

রাম। কর্ম্মক্ষেত্রে জন্ম নিলে একভাবে কি সংসার চলে।
আসবো চলে দুদিন গেলে গো তুমি কেঁদ না ॥

দশরথ। ভাঙ্‌বে আমার সোনার স্বপন, জানিনে রাম জীবনের ধন।
অকালেতে যাবে জীবন রে দেখতে পাব না ॥

কৌশল্যা। হাতে তুলে গরল খেলে, মোহিনীর মায়াতে ভুলে।
রাম যে হয় সতীনের ছেলে গো ভাল বাসবে না ॥

দশরথ। এমন হবে জানলে পরে বিষ খেতাম কি হাতে করে।
বিপদ হবে সত্য করে গো আগে জানি না ॥

রাম। পিতা, তোমায় করি মানা বিমাতাকে দোষ দিও না।
ভাগ্যের লেখা ঘুচা যায় না গো, তাও কি জান না ॥

দশরথ। দারুণ কথা মনে হলে, বুকের ভিতর উঠে জ্বলে,
আমার বুক ভেসে যায় চোখের জলে বাছাধন,
কেন আমার হ'ল না মরণ।
শ্মশান হবে রাজ্যভবন রে থাকতে পারবো না ॥

রাম। চৌদ্দ বৎসর গত হ'লে বসব পিতা তোমার কোলে।
বনবাসে না পাঠালে গো রাজ্য থাকবে না ॥

কৌশল্যা। কোথায় ফেলে বসনভূষণ সেজেছ সন্ন্যাসীর মতন।
মা হ'য়ে পাষাণীর মত রে দেখতে পারব না ॥

দশরথ। কত শত যজ্ঞ করে, পেয়েছিলাম রঘুবরে।
বনে পাঠাই ইচ্ছা করে গো, এ কেউ পারবে না ॥

রাম। বেলা হ'ল কথায় কথায় হাসিমুখে দাও গো বিদায়।
একা যেতে হবে আমায় গো কেউ তো যাবে না ॥

লক্ষ্মণ। সঙ্গের সাথী থাকতে আমি, একা যাবেন রঘুমণি।
অনুগত জনে তুমি গো, ফেলে যেও না॥
দশরথ। ওরে লক্ষ্মণ করি মানা, দুঃখের উপর দুখ্ দিওনা,
আমি কার মুখ দেখে জুড়াব এ যাতনা, ওরে বাপ, তুমি যেও না॥
কি কালনিশি পোহাইল গো আমি জানিনা॥
কৌশল্যা। ওরে লক্ষ্মণ, যাস্‌নে ফেলে, তোর মুখ দেখে থাকবো ভুলে।
রামের শোকে জীবন গেলে রে ও কেহ দেখবে না॥
রাম। তুই যদি যাস্ সঙ্গ ধরে, লোকে কি বলিবে মোরে।
কে থাকবে এ রাজসংসারে রে ভেবে দেখলি না॥
লক্ষ্মণ। তোমার সঙ্গ ছাড়া হলে, ঝাঁপ দিব সরযূ জলে।
শান্তি হবে আমি মলে গো এই কি বাসনা॥
দশরথ। বুক ভরা ধন তোবাই দু'জন, রাজ্য ছেড়ে যাবি রে বন,
আমায় হবেরে পাষাণের মত থাকিতে, পারব না ধৈর্য ধরিতে।
চিতার আগুণ জ্বলবে চিতেরে জলে নিভবে না॥
কৌশল্যা। ওরে নয়ন, বলি তোরে, এ বেশ দেখবি কেমন করে।
হৃদয়ের ধন যাবে ছেড়ে রে মায়া করবে না॥
(একসঙ্গে) ভেবে বলে দ্বিজ লক্ষ্মণ, সীতা-রাম আর অনুজ লক্ষ্মণ।
বনবাসে গেল তিনজন গো কেও তো থাকলো না॥
এই পর্যন্ত সাঙ্গ হ'ল জয় সীতারাম সবাই বল।
গুণা দিন-ফুরায়ে গেল গো হরি বল না॥ —মুর্শিদাবাদ

পুরাণের বিভিন্ন বিষয় লইয়াই পাঁচালী রচিত হইয়া থাকে। কাহিনীর পৌরাণিক ধারা ইহাদের মধ্য দিয়া সর্বদাই রক্ষা পায়, তাহা নহে, তবে বিষয় বস্তুর গুরুত্ব কদাচ ক্ষুন্ন হয় না। গুরু বিষয়ক এই শ্রেণীর সঙ্গীতের মধ্যে মধ্যে লঘু অবকাশও রচিত হইবার আবশ্যক হয়। তাহাদের সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনীর কোন সম্পর্ক থাকে না। তাহাদিগকে রঙ্ পাঁচালী বলে।

আট

রঙ্ পাঁচালী

বোলান গান ও পাঁচালী-গাওয়ার পর শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য কতকগুলি লঘুবিষয়ক পাঁচালী গাওয়া হয়। ইহাদের মধ্যে গ্রাম্য সামাজিক জীবনের আচার-ব্যবহার, স্বামি-স্ত্রীর কথোপকথন ও নানাবিধ রসের কথা থাকে। ইহাদিগকেই 'রঙ্ পাঁচালী' বলে। এখানে রঙ্ পাঁচালীর একটিমাত্র নমুনা দিলাম।

স্ত্রী। যদি ভাল না লাগে তবে ভালবেসো না।
ভালবেসোনা, হে বন্ধু, কাছে এসো না॥

পুরুষ। ভাল যে বাসিনা আমি, কি করে তা বুঝলে তুমি
ভালবাসার কিসের কমি, পেলে নিশানা॥

স্ত্রী। সপ্তাহ হইল গত আছি চাতকিনীর মত।
এতদিন করলে নাথ, কার উপাসনা॥

পুরুষ। করতে সাহিত নূতন খাতায় গিয়েছিলাম কলকাতায়,
বিশ্বাস রেখো আমার কথায়, যেন বিশ আনা॥

স্ত্রী। শ্বশুরবাড়ী কলিকাতায়, সাহিত কর নূতন খাতায়,
ব্যবসা এখন চালাও তথায় তাতে নাই মানা॥

পুরুষ। ছাঁদের কথা দিয়ে ছেড়ে, এখন একটু দয়া করে,
চা এক কাপ দাও হে মোরে, চাল ভাজা চানা॥

স্ত্রী। যা হবার তা হয়ে গেছে, আর আলাপে কাজ কি আছে,
মাথা খুঁটলেও আমার কাছে কিছুই মিলবে না॥

পুরুষ। মোহিনী, তোর হাতে ধরি, দোষে ক্ষমা দাও, সুন্দরি,
যাবনা আর শ্বশুর বাড়ী, হ'লেও সিয়ানা॥

স্ত্রী। দূর মিন্‌সে, পোড়ারমুখো, জাত সুধাছিস চাব্‌না চোখে,
থাকবো না তোর এদেশেতে, দেশ ছাড়্‌বি কি না॥

পুরুষ। যে দেশেতে যাবে নিয়ে, সেই দেশেতে যাবো, গিয়ে—
থাক্‌বো সদাই তোমার হয়ে, দেশে আস্‌বো না॥

স্ত্রী। নাক মলা, কান মলা খেয়ে, বলো মোর পা-টি ছুঁয়ে,
ছাড়লাম বিয়ে করা মেয়ে, তোমায় ছাড়বো না ॥
পুরুষ। নাক মলা, কান মলা খেলাম, পা ছুঁয়ে স্বীকার করলাম,
বিয়ে করা বৌ ছাড়িলাম, তোমায় ছাড়বো না ॥
স্ত্রী। ব্রাহ্মণ সভায় চন্দ্র সূর্য সাক্ষী করে করলে কার্য,
সেই স্ত্রীকে করলে তেজ্য, কি বিবেচনা ॥
পুরুষ। বলো এখন কি করিব, কোন্ নৌকাতে দুই পা দিব,
যা বলবে তাই মেনে নিব, দাও হে মন্ত্রণা ॥
স্ত্রী। আমায় যদি বলতে বলো, পরের আশা মুছে ফেল,
মাথার জিনিষ মাথায় তোল, পায়ে ঠেলো না ॥
পুরুষ। শক্তিহীন সতীশের বাণী, ধনীর কথা ধন্য মানি,
বদন ভরে হরির ধ্বনি, দেন গো দশজনা ॥ —মুর্শিদাবাদ

নয়

বালাখি

এক শ্রেণীর লোক-সঙ্গীতের নাম বালাখি, রাধাকৃষ্ণ এবং রামসীতার প্রসঙ্গ লইয়াই ইহা রচিত হইলেও ইহার এই নামের যে বিশেষ কি তাৎপর্য, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তবে ইহাদের গীত-পদ্ধতি বা গাহিবার বিশেষ ভঙ্গি আছে, বোধ হয়, তাহা হইতেই ইহাদের এই নাম হইয়াছে। প্রসঙ্গ বা বিষয়-বস্তুর অভিন্নতা সত্ত্বেও কেবলমাত্র গাহিবার ভঙ্গির মধ্যে যদি বিভিন্নতা থাকে, তবে বিভিন্ন নামে লোক-সঙ্গীতের পরিচয় হইয়া থাকে। এখানে তাহাই হইয়াছে। কেবলমাত্র মুর্শিদাবাদ জিলা হইতেই এই শ্রেণীর গান সংগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং ইহা আঞ্চলিক সঙ্গীতেরও অন্তর্ভুক্ত বিবেচিত হইতে পারে। কয়েকটি নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটিতে শ্রীরাধার বস্ত্রহরণ বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে

১

এই তো সভার মাঝে যত সখীগণ,
শ্রীরাধিকার বসন চুরি শুন দিয়া মন।
ললিতা বিশাখা আরও অন্যদেরে,
ডেকে বলে, ও লো দিদি, কে কে যাবে ঘাটে,
রাই যাবে যমুনার পথে দাঁড়ালে রাজঘাটে
কে কে যাবি জল আনিতে শ্রীরাধিকার সাথে।
নামিল যমুনার জলে বসন রেখে তটে,
হাসি হাসি কালশশী বসন চুরি করে।
বসন নিয়ে উঠ্‌লো কানাই কদম্বের ডালে,
চরণ দুলায়ে বাঁশী রাধা রাধা বলে।
ডালে বসে কহে নাগর সরস ও অন্তর,
মুখেতে মিষ্ট কথা সরল অন্তর।
কক্ষে কুম্ভ নিয়ে সবে যাই সারি সারি,
এইখানেতে ছিল বসন কে করিল চুরি।

গোকুলার মধ্যে বসে তাহে মনো চুল,
করেছে বসন চুরি—আর ওকি নাগর।
বাম হস্ত উদরে দিয়ে ডান হস্তে চায়,
বসনগুলি দাও হে ফেলে, বাঁকা শ্যামরায়।
বসন পরিতে ত্যজে বসন পরেছিলো,
সকলের গুরু বলে তারা প্রণাম করিল।
সব সখী পরিল বসন শুন দিয়া মন,
বসন পরা সাঙ্গ হলো শুন হে এখন।
কক্ষে কুম্ভ নিয়ে সবে যায় সারি সারি,—
রাধাকৃষ্ণর ভক্তগণে বল হরি হরি। —মুর্শিদাবাদ

শক্তিশেল হইতে লক্ষ্মণের পুর্নজীবন লাভের বৃত্তান্ত নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটিতে শুনিতে পাওয়া যাইবে—

২

শুন শুন, সর্বজন, আমার একটি নিবেদন,
সর্বদেবের বন্দিলাম চরণ,
রাবণ ছাড়িল বাণ লক্ষ্মণ হোল অজ্ঞান,
ভায়ের শোকে কাতর শ্রীরাম
প্রাণ রাখিবার কায নয়, ক্ষীরোদ সাগরে যায়,
ভায়ের শোকেতে ত্যজিব জীবন।
কেন বা রাম জীবন ছাড়, বিশল্যকরণী আন,
তবে বাঁচে প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ।
আর কেবা পারে যেতে হনুমানকে আন ডেকে—
যাবে হনু গন্ধর্ব পবতে।
হনুকে ডেকে কয়, শুন, হনু, মহাশয়,
বানরগণে রাখে আমার মান।
আজ্ঞা পেয়ে হনুমান, বাহু নাড়া দিয়ে যান,
লম্ফে চলে দুই মাসের পথ।
হনু যখন চলে গেল রাবণ তা জানতে পেল,
আর কোন বীর নাইকো আমার হাতে।

কালনিমিকে ডেকে কয় শুন, মামা মহাশয়,
হনুমানকে বধ করগা প্রাণে।
পর্বত নিয়ে চলে গেল রামের নিকটে দিল,
এই লেন প্রভু ঔষধ চিনিয়ে।
শুষেন নামে বৈদ্য ছিল ঔষধ চিনিয়া নিল,
খাওয়াইল লক্ষ্মণকে তখন।
লক্ষ্মণ ঔষধ খেল কিছু পরে প্রাণ পেল,
শুন শুন যত সর্বজন।
রামলীলা কত শত আরও গাহিব কত,
বানরগণে দিচ্ছে রামের ধ্বনি।
এই পর্যন্ত এই সব কথা সাঙ্গ হয়ে গেল হেথা,
চাঁদ বদনে শিবদুর্গা বল॥

—ঐ

তবে রাধা কৃষ্ণের প্রণয় প্রসঙ্গই বালাখিগানে প্রাধান্য লাভ করে।

সুবর্ণ মঙ্গল রাধে বিনোদিনী রায়—
আজ বৃন্দাবনে বন্দী হলো ঠাকুর কানাই,
তখন বৃন্দাবনের কালো কানাই বাঁশী দিল শ্যাম,
সব সখী থাকিতে রাধার উঠিল পরাণ,
তখন কলসী কাঁখে সুন্দরী রাধে জল আনিতে যায়,
বৃন্দাবনের চিকনকালা পেছে পেছে ধায়।
পরের রমণী দেখে কানাই কেন ভুলো,
নিজ সম্পত্তি বেচে দিয়ে বিবাহ করব।
বিবাহ তো করিব রাধে লিখেছে বিধাতা,
তোমার মত সুন্দর রাধা পাব কোথা,
আমার মতন সুন্দর রাধে কানাই যদি চাও,
নেও কলসী কুশের দড়ি যমুনায় ঝাঁপ দাও।
কোথায় পাব কলসী, রাধে, কোথায় পাব দড়ি,
তোমার গলার হারগাছটি দাও পিতল বাঁধা দড়ি।

তুমি গঙ্গা, তুমি যমুনা, তুমি বারাণসী,
তুমি হও যমুনার জল তাইতে আমি ভাসি।
আস্থা ঘরে কালো নিমাই কথায় বড়ো আঁট,
বড় হয়ে ছোট নদীতে দিতে চাওরে ঝাঁপ।
কালো কালো কর, রাধে, কালো গোয়ালার ঝি,
বিধাতা করেছে কালো আমি করবো কি ?
কাক কালো কোকিল কালো, কালো চিকুর কেশ,
কালো চুলের খোঁপা বেঁধে ভোলাইলে বেশ।
কালো হাঁড়িতে রান্না করে মুনিজনে খায়,
কালো মেঘে জল হইলে জগৎ জুড়ায়।
কানাইএর হাতের বাঁশী ভাই সর্প হয়ে যায়,
সর্প হয়ে গিয়ে বাঁশী দংশায় রাধার পায়।
ডান পদ বাড়াতে রাধার বাঁ পদে দংশিল,
উহু মরি শব্দ করি বাঁয়ে ঢলে প'লো।
কি সর্পে দংশিল আমার এ সুন্দর গা,
সর্ব অঙ্গ বিষে আমার কালো হয়ে যায়,
আমার অঙ্গের বিষ যে ঝাড়িতে পারে,
এমন রূপ যৌবন আমি দান করিব তারে।
পেছে হেঁকে ছিদাম বলে মহামন্ত্র জানি,
দু'চার বার ঝাড়লে বিষ করতে পার পানি—
এমন সোনার যৌবন তারে করবো দান।
রাধার অঙ্গের বিষ কৃষ্ণ ঝেড়েছিলো,
এইখানে রাধাকৃষ্ণ মিলন হইল।
এই তো মশায় এসব কথা সাঙ্গ হয়ে গেল,
চাঁদ বদনে সকলেতে রাধাকৃষ্ণ বল। —মুর্শিদাবাদ

উদ্ধৃত গানগুলি হইতে বালাখি গানের বিষয়গত বৈশিষ্ট্য যে কি, তাহা বুঝিতে পারা গেল না, সুতরাং কেবলমাত্র গীত-রীতির বৈশিষ্ট্যই যে ইহাকে এই অঞ্চলের অন্যান্য লোক-সঙ্গীত হইতে পৃথক্ করিয়াছে, তাহাই সত্য বলিয়া মনে হইবে।

দশ

পুতুলনাচের গান

পুতুলনাচের প্রকৃতি ও বিষয় অনুযায়ী ইহার পটভূমিকায় নানাপ্রকার সঙ্গীত পরিবেষণ করা হইয়া থাকে। নানাপ্রকাব পুতুল হইলে বিভিন্ন প্রকৃতির খণ্ড খণ্ড গীতি, দীর্ঘ আখ্যায়িকা ভিত্তিক একই প্রকৃতির পুতুল হইলে পাঁচালী ধরণের গীত গাওয়া হয়। নিম্নোদ্ধৃত গানগুলি বিভিন্ন বিষয়ক পুতুলের নাচ উপলক্ষে গাওয়া হয়। পুতুলনাচেব বিস্তৃত আলোচনার জন্য পরবর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

প্রথম গানটি বন্দনারূপে গাওয়া হয়। কিন্তু বিনা পুতুলে বন্দনা হয় না, এখানে একটি কৃষ্ণের পুতুল প্রদর্শিত হয়।

১

আমার এই বাসনা পুরাও, সাঁই,
একবার হয়ে বাঁকা, দাও হে দেখা, গুণধাম,
কোথায় আছ, দয়াময়, তবাও গো আমায়,
জ্ঞান চক্ষে হেরে, আমার পূর্ণ কর মনস্কাম,
আমার এই বাসনা পুরাও, সাঁই।

মনে হইতেছে এখানে একটি বন মানুষের পুতুল নাচিতেছে—

২

আমাদের বুন মানুষের হাড়ে কত গুণ,
জলে লাগায় আগুন।
ডিঙ্গলাকে কাঁচকলা বলে, পটল কা বেগুন,
জলে লাগায় আগুন।
উসতাজের গুণ জাহির করি,
নুনকে করি চুণ, জলে লাগায় আগুন।
আমাদের বুন মানুষের হাড়ে কত গুণ,
জলে লাগায় আগুন।

এইবার একটি পেত্নীর পুতুল—

৩

এবার মোরে হব প্রাণ পিপেশী,
শাওড়া তলায় করব বাসা রাশি রাশি।
কালোরে কাল বরণী, কালো রূপে করব আলোনী,
কালো মেঘের কোলে দেখি, অতি কালো,
ছুলে পরে রঙ্ হবে কালো।

এইবার পুতুলনাচের মধ্য দিয়া দাম্পত্য জীবনের একটি সরস চিত্র দেখা যাইতেছে—

৪

ওলো সুন্দরি! কার কথায় করাছো তুমি মুন ভারি,
আমি যেখানে সেখানে থাকি অনুগত তোমারি,
কার কথায় করাছো তুমি মুন ভারি।
তুমি আমার বালাম চাল, যেমন অড়হরের ডাল,
গোল আলু, চিংড়ি ভাজা, আলু পটল চচ্চড়ি,
কার কথায় করাছো তুমি মুন ভারি।
তুমি আমার রৌদ্রের ছাতা, শীতের কাঁথা, মশার মশারি,
তুমি আমার রসে ভরা রসগোল্লা, তুমি আমার ডালপুরি,
কার কথায় করেছো তুমি মুন ভারি।

এইবার ঝাড়ুদারের পুতুল নাচিতেছে—

৫

ঝাড়ুদারী কর্ম করি, করিব না আর এ চাকুরী,
খিদের জ্বালায় জ্বলে মরি, রাজা হ'ল মোদের বুরী।
ঝাড়ুদারী কর্ম করে, খেতে পায় না পেটটী ভরে,
ক্ষিদের জ্বালায় জ্বলে মরি, করিব না আর এ চাকুরী।

ঝাড়ুদারেরা সাধারণতঃ পশ্চিমদেশীয় লোক সেইজন্য চিত্রটিতে বাস্তব রূপ দিবার জন্য এইবার হিন্দীভাষার ব্যবহার হইতেছে—

৬

ম্যায় তু ঝাড়ু দে, চুকা ফজল মে হো,
কাহে বুলাবে আদমি,
না মিলে ছুটী, গমকা রুটী,
লেড়কা বালা, ভুকমে মারা হো,
কাহে বুলাবে আদমি।

এইবার ফরাসদারের পুতুল—

৭

বারে বারে ফরাসদারে, ডেকোনা হে আর,
যাচ্ছি ফিরে রাজদরবারে, আমি ফরাসদার।
আমি ফরাসদার কি হে, তুমি ফরাসদার,
বারে বারে ফরাসদারে, ডেকোনা হে আর।

এখন ভিস্তিওয়ালার পুতুলের নাচ দেখা যাইবে—

৮

কাহে ভেস্তিবালা, একেলা ভবানীপুর কামেলা,
রাজার হুজুরেতে যায় মোরে পানি দিতে,
আসতে হইল মোর, দু'দণ্ড বেলা, ভবানীপুর কামেলা,
মিঠা পানি আনতে বাবু বলেন আমারে।
মিঠা পানি মিলিন না মোর এ ত্রিসংসারে।
মৌর, দারকা, দামুদর নদী, কানা, কুয়া, গঙ্গা, বাঁকি
লাগাত পদ্মার ধার অবধি,
গেলছিলাম, মোরে মিঠা পানি মিলিল না, মোর এ ত্রিসংসারে।

এইবার বেদের পুতুলের নাচ—

৯

মহারাজের বেদে আমি, আমি বেদে বড় গুণী,
সাপ ধরি গো, জোড়া জোড়া, হলহোলা ঢামনা ঢোঁড়া,
আরো দেখি পানি বুরা, বেছে বেছে ধরি ইনি।
মহারাজের বেদে আমি, আমি বেদে বড় গুণী।

কোন নায়িকার নৃত্য এখানে দেখা যাইবে—

১০

ডুব মারি ভাই, ডুব মারি,
ঝপ্ ঝপাঝপ্ প্রেম-সরোবরে,
আর কিছু নয়, আর কিছু নয়,
দুনিয়া আকুল, যাক তরে যাক তরে।
ফুলের মালোয় আয়, ফুলের মালোয় বয়,
ডাকছে কত রঙ বিলাসে,
আয়, আয়, আয়।
আয় কে নিবি আয়, হৃদয় নিয়ে মাখামাখি,
আয় কে যাবি আয়। —মুর্শিদাবাদ

দীর্ঘকাহিনী বা পালা অবলম্বন করিয়া যে পুতুল নাচ হইয়া থাকে, তাহার পটভূমিকায় সাধারণতঃ পাঁচালী, কীর্তন, মালসী এই সুরে গান হয়, কোন কোন সময় মধ্যে মধ্যে গদ্য সংলাপও থাকে। সাধারণ পাঁচালী কীর্তন; ঝুমুর হইতে সেই সকল গান স্বতন্ত্র নহে।

এগারো

ঝাপান গান

শ্রাবণ মাসে মনসা পূজা উপলক্ষে পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে যে সাপের ওঝাদিগের বাৎসরিক সম্মেলন হয়, তাহাকেই ঝাঁপান বলে। এই উপলক্ষে গুণী বা সাপের অভিজ্ঞ ও প্রবীণ ওঝাদিগকে তাহাদের শিষ্যগণ নানাভাবে সম্বর্ধনা জানায়, তাহারাও প্রকাশ্যে সর্পকে মন্ত্র দ্বারা বশ করিবার নানাপ্রকার কৌশল প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই উপলক্ষে মনসা ও চাঁদসদাগরের কাহিনী মূলক যে সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাকে ঝাঁপান গান বলে। কোন কোন সময় পক্ষ এবং প্রতিপক্ষ রূপে দুইটি দল এই গানে যোগদান করে। ইহা কখনও কতকটা তর্জা গানের রূপও ধারণ করে।

১

বন্দনার গান (দুই পক্ষের প্রথম পক্ষ গাহিতেছেন)—

দোহারের ধুয়া—

বন্দো মা পদ্মাবতী আস্তীক জননী সতী,
নাগ মাতা স্বরূপা নাগিনী গো—

গায়ক গণেশের বন্দনা গাহিতেছেন—

প্রথমে বন্দিলাম আমি গণেশের চরণে,
গৌরীর নন্দন বলে জানে সবজনে।
বিঘ্ন বিনাশিনী তুমি পতিতপাবনী,
আমার আসরে আজি এসো গো জননী।
তারপরে বন্দনা করি দেব নারায়ণ,
ক্ষীরোদ সাগরে বট পত্রেতে শয়ন।
লক্ষ্মীসহ বন্দিলাম আমি অনন্ত শয্যাতে.
হংস পৃষ্ঠে বন্দিলাম আমি দেব প্রজাপতি।
গরুড় বাহনে বন্দি দেব নারায়ণ,
বলিরে ছলিতে প্রভু হইলা বামন।
হরিণ বাহনে বন্দি দেব পবন,
তারপরে বন্দনা করি দেব জনার্দন।

পদ্মপুষ্পে বন্দি, মাগো, দেবী পদ্মাবতী।
আমার আসরে, মা, এস দ্রুতগতি।
এস বীণাপাণি, মাগো, ডাকি বারবার,
অধম সন্তানে আজি করগো উদ্ধার।
এই পর্যন্ত সাঙ্গ করি বন্দনা কাহিনী,
যত আছ মা ভগ্নীরা দাও গো উলুধ্বনি।
চাঁদ বদনে বদন ভরে বলুন হরি হরি,
এই আসরে বন্দনা আজি সাঙ্গ আমি করি।

২য় পক্ষের বন্দনার ধুয়া—

বন্দে মা সরস্বতী আমার এই মিনতি
মিনতি চরণে জানাই গো।

গায়ক সরস্বতী ও অন্যান্য দেবদেবীর বন্দনা গাহিতেছেন—

এস এস বীণাপাণি, মা, ডাকি বারবার,
তুমি বিনা এ আসরে কেহ নাই আমার।
আজিকার আসরে মাগো কণ্ঠে দিও ভর,
অধম সন্তানে এসে তরাও গো সত্বর।
সত্যযুগে বন্দিলাম আমি মৎস অবতার,
কুর্মরূপ হইয়া ধরে পৃথিবীর ভার।
ত্রেতাযুগে বন্দিলাম আমি অযোধ্যা ভবন,
তারই গৃহে জন্ম নিলেন দেব নারায়ণ।
প্রথমে বন্দিলাম আমি শ্রীরামের চরণ,
তারপরে বন্দিলাম আমি অনুজ লক্ষ্মণ।
ধন্য ধন্য দশরথ অযোধ্যা ঈশ্বর,
ডাকে না থাকি হরি আসিলেন সত্বর॥
ধন্য ধন্য কেকয় রাণী ভরতেরি মা,
রামকে দিলেন বনবাস দয়া হল না।
দ্বাপরে বন্দিলাম আমি শ্রীকৃষ্ণের মূরতি,
যখন নন্দালয়ে রাখে পিছনে বাসুকি।

এই পর্যন্ত দিলাম ক্ষান্ত বন্দনা কাহিনী,
মা মনসার নামে এবার দাওগো হরিধ্বনি।
শক্তিরূপা মা জননী তোমরা কেন ভুলো,
বন্দনা মোর সাঙ্গ হলো উলুধ্বনি দিও।

পুনরায় ধুয়া—

আমার নাম শ্রীমনসা। পুরাও হে মনের আশা।
চাঁদ সওদাগর গো।

গায়কের প্রশ্ন—

শোন শোন, চাঁদ বেনে, বলি যে তোমারে গো,
পূজা নিতে এলাম আমি তোমার নিকট গো।
প্রথমে গিয়াছি আমি কৈলাস শিখরে,
পাঠায়ে দিয়েছেন পিতা চম্পাই নগরে।
দেবে কিনা আমায় পূজা, ওরে চাঁদ বেনে,
আমার নাম পদ্মাবতী জানে সব লোকে।
দেবে কিনা আমায় পূজা, শোন সওদাগর,
পূজা নিয়ে যাব আমি কৈলাস শিখর।
এই পর্যন্ত দিলাম মনসার কাহিনী
মা মনসার নামে একবার দাওগো হরিধ্বনি।

১ম পক্ষ ধুয়া দিলেন (দোহারগণ গাহিতেছেন)—

আজ আসরে এসে আমার হল বিষম জ্বালা,
আজ আসরে নিতে হল চন্দ্রধরের পালা।

গায়ক গাহিতেছেন—

শোন শোন, ও মনসা, বলি যে তোমারে,
কোথা হতে এলে তুমি আমার নিকটে।
কি নাম তোমার পিতার গো, কি নাম তোমার,
শিবশম্ভু ছাড়া পুজি না অন্য দেবতার।
দিব না দিব না পূজা ফিরে যাও সত্বর।
চম্পাই নগরে থাকি নামে চাঁদ বেনে,
আমার পরিচয় মনসা দিলাম যে তোমারে।

এই পর্যন্ত দিলাম ক্ষান্ত চাঁদ বেনের কথা,
প্রেমানন্দে হরি বলুন যেবা আছেন যেথা।

দ্বিতীয় পক্ষের (মনসার) ধুয়া—

আমার নাম শ্রীমনসা পুরাও হে মনের আশা,
শোন শোন চাঁদ সওদাগর গো।

গায়ক গাহিতেছেন—

পাতালেতে ছিলাম আমি গো বাসুকির জননী,
সর্বলোকে জানে আমায় শিবের নন্দিনী।
তারপরেতে গেলাম আমি কৈলাস শিখরে,
নারদেরি সঙ্গে দেখা হইল সত্বরে।
দাদা বলে নারদেরে ধরি আমি পায়,
কোথায় গেলে আমার পুজা, ওগো দাদা, পাই।
এত বলি নারদমণি বিধির নন্দন,
কৈলাস শিখরে মোরে পাঠাল তখন।
কৈলাস শিখরে ছিল দেব পঞ্চানন,
পিতা পিতা বলে আমি ডাকিলাম তখন।
ধ্যানভঙ্গ হয়ে শিব বলিল তখন,
কি জন্য এলে মনসা আজ কৈলাস ভবন।
এত বলি আমি পিতায় কহিলাম তখন,
মনসারি পূজা নাই কিসের কারণ।
সব দেবতার পূজা আছে এই ত্রিভুবনে,
হরের কন্যা হয়ে পুজা পাব না আজ কেনে?
তখনি বলিল আমায় দেব মহেশ্বর,
চম্পাই নগরে পুজা পাবে গো সত্বর।
চম্পাই নগরে আছে নামে চাঁদ বেনে,
তোমার পুজার আয়োজন আমি করেছি সেখানে
এই কারণে পূজা নিতে এসেছি এখানে,
দেবে কিনা আমার পুজা, ওরে চাঁদ বেনে।

(মনসা) গায়ক পুন ধুয়া দিলেন—

ও পূজা দেরে ও চাঁদ বেনে,
আমি বলি বারে বারে গো।

প্রশ্ন—আমার পরিচয় চাঁদ দিয়েছি তোমারে,
তোমার পরিচয় দেবে সবার ভিতরে।
কি নাম তোমাব পিতার কোথায় বসতি,
এখন বর্তমানে আছ কার বা তুমি নাতি।
এ সব কথা সভাস্থলে বল দ্রুতগতি,
অল্পেতে ছাড়ব না চাঁদ এই আমাব মিনতি।
এই পর্যন্ত মনসার কথা অল্পে অল্পে সারি,
মা মনসাব নামে একবাব বলুন হরি হরি।

১ম পক্ষ ধুয়া দিলেন—

ও ফিবে যাবে মনসা, তুমি পূজা ত পাবে না গো। (অসম্পূর্ণ)

—নদীয়া

চাঁদ সদাগর ও মনসার বিবাদসূচক অন্যান্য খণ্ডগীতিও ঝাঁপান গানে গীত হয়।

বারো

হোলবোল

নদীয়া ও যশোর জিলায় কৃষকসমাজে এক শ্রেণীর লোক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে, তাহা হোলবোল নামে পরিচিত। ইহাদের সঙ্গে কোন ধর্মীয় আচার-আচরণ সংযুক্ত নয়। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু এবং মুসলমান কৃষক একসঙ্গেই এই গান গাহিয়া অবসর যাপন করে। কৃষিকর্মে যখন অবসর দেখা দেয়, তখনই কৃষকের কণ্ঠে এই গান শুনিতে পাওয়া যায়। তবে পৌষ মাসেই এই গানের প্রকৃত সময় বলিয়া মনে হয়। ইহা পুরুষেরই গান, স্ত্রী-সমাজে ইহার প্রচলন নাই। মূল গায়েন একটি পদ গাহিবার পর অন্যান্য গায়কেরা তাহা পুনরাবৃত্তি করে। রামায়ণের কাহিনী ইহাদের অন্যতম অবলম্বন হইয়া থাকে। দুই একটি নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

১

আহা উজুদার[১] গো দশরথ গো রাজা ছিল বড় পুণ্যবান্।
একই দণ্ডে চারি ভাই গো জন্মেছিলেন রাম।
বড় হইলেন রামচন্দ্র মেজ গো লক্ষ্মণ,
সেজ হলেন ভরত ঠাকুব ছোট শত্রুঘন। —নদীয়া

রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গও লৌকিকরূপে ইহাতে আত্মপ্রকাশ করে—

২

এসো কিষ্ট বসো কাছে কওগো কুলের কথা,
অবতার পঞ্চম কিষ্ট জন্ম হইল কুথা।
জন্ম হৈল মধুপুরে দৈবকীর উদরে,
বসুমাতা রেখে গেল যশোমতীর ঘবে।
নন্দ গেল বাথানেতে যশোদা গেল ঘাটে,
শূন্য ঘর পেয়ে কিষ্ট সকল ননী লোটে।
হাতে ননী হৃদয়ে ননী ধায় গোপালের পিছে,
লম্ফ মেরে উঠ্‌ল কিষ্ট কদম্বের ঐ গাছে।

১ অযোধ্যার

ওখান থেকে নাবরে কিষ্ট পেড়ে দিব ফুল,
ওখান থেকে প'লে পরে মজাইবি কুল।
লালায়ে ভুলায়ে ও মা কিষ্টকে নাবাল,
গাভীছান্দা দড়ি দিয়ে কিষ্টকে ছাঁদিল।
এমন ছাঁদা ছাঁদলে, মাগো, রব না এদেশে,
এদেশে আর রব না, মা, রব মধুপুরে,
পরের মাকে মা বলিয়া ননী চেয়ে খাব,
হাতের অঙ্গুরী বেচে ননীর কড়ি দিব। —নদীয়া (মাজদিয়া)

এই সঙ্গীতটিতে বাৎসল্য রসের অভিব্যক্তি একেবারে ব্যর্থ হয় নাই।

সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বন করিয়াও হোলবোলের গান রচিত হইয়া থাকে, যেমন—

আহা, ফাগুন মাসের পাঁচই তারিখ দৈবী গজব হল,
„ মটর ছোলা সরষে সব ফেলায়ে গেল।
„ কতই ফেল্‌ল ছোলা সরষে, থাল ঘটি বাটি,
„ তাহার চেয়ে অধিক ফেল্‌ল ব্রিটিশ রাজার মাটি।
„ দুই পক্ষ দুই রাজা হয়ে সংসার জলে গেল,
„ এবার বুঝিল ভাত বেঘোরে কোলের ছেলে ম'ল।
মা জননী কেঁদে বলে কি করি উপায়,
গহরমেণ্টের লোক এসে বলে খাল বাঁধিতে চল।
খাল বাঁধিতে না গেলে টাকা দিবে নাকো,
মাটির ঝুড়ি মাথায় নিয়ে ভিরমি লেগে গেল।
এবার বুঝিল মনে হল আমাদের জান গেল।
পাকিস্তানে কাজ নাই মোদের হিন্দুস্তানে চল,
হিন্দুস্তানে গিয়ে মোরা সবাই শান্তি হব। —ঐ

৪

আহা, শোন সবে একই ভাবে শুন দিয়া মন,
মহীনবাবুর দুঃখের কথা মন দিয়া শোন।
মহীনবাবু ছান করে গো, সান বাঁধানো ঘাটে,
গহরমেণ্টের লোক এসে হাতে দিল বেড়ী।
হাতে দিল হাতকড়ি, ভাই, পায়ে দিল বেড়ী,
ধরে নিয়ে গেল তখন তালেকবাবুর বাড়ী।
মহীনবাবু উঠে বলে, তালেকবাবু ভাই,
গাড়ী পুরে আন টাকা খালাস হয়ে যাই।
মহীনবাবুর মা কান্দে গো হাতে লইয়া খই,
তুমরা সবে এলে ফিরে আমার মহীন কই? —ঐ

বেহুলা লখীন্দরের কাহিনী লইয়া যে হোলবোলের গান এই অঞ্চলে রচিত হয়, তাহা মনসা পূজার সময় সারা শ্রাবণ মাস ব্যাপিয়া গীত হয়, অন্য সময় মনসা-সম্পর্কিত গান শুনিতে পাওয়া যায় না।

অষ্টম অধ্যায়

লোক-নৃত্য

লোক-সঙ্গীতের সঙ্গে লোক-নৃত্যের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। অনেক সময় নৃত্যের পদ্ধতি সঙ্গীতের রূপ এবং ভাবকে নিয়ন্ত্রিত করে। বিশেষতঃ একমাত্র ভাটিয়ালী প্রকৃতির সঙ্গীত ব্যতীত আর প্রায় সকল শ্রেণীর লোক-সঙ্গীতের সঙ্গেই কোন না কোন ভাবে নৃত্য জড়িত হইয়া আছে। নৃত্যই সঙ্গীতকে জীবন্ত করিয়া তুলে, সেইজন্য প্রাচীনতর সমাজ-জীবনে সঙ্গীতের সর্বক্ষেত্রেই নৃত্য একটি অত্যন্ত প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং লোক-নৃত্যের আলোচনা ব্যতীত লোক-সঙ্গীতের আলোচনা কিছুতেই সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।

আদিম সমাজে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া ব্যক্তি ও সমাজকে দৈব বিড়ম্বনা হইতে রক্ষা করিবার জন্য নৃত্যের উদ্ভব হইয়াছিল। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আদিম সমাজ হইতে উদ্ভূত এই ক্রিয়া পরিত্যক্ত না হইয়া বরং নানা দিক হইতে শিল্প ও সৌন্দর্যবোধের দ্বারা যুগোচিত পরিমার্জনা করিয়া আধুনিক জীবনে সামাজিকতার প্রয়োজনেও ইহাকে রক্ষা করা হইয়াছে। সুতরাং ইহার ধারা অত্যন্ত প্রাচীন—মানব সভ্যতার ক্রম-বিকাশের ধারার সঙ্গে ইহা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আদিম সমাজের ঐন্দ্রজালিক নৃত্য হইতে আধুনিকতম সুসভ্য জাতির ব্যালে নৃত্য পর্যন্ত যে ধারা অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, লোক-সঙ্গীতও তাহার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। গোষ্ঠীজীবনেই লোক-নৃত্যের উদ্ভব এবং বিকাশ হইয়াছে। গোষ্ঠীজীবনের সঙ্গেই ইহার সম্পর্ক।

একজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, 'Folk dance is communal reaction in movement patterns to life's crucial cycles', সমাজ-জীবনের আনন্দ-বেদনার গোষ্ঠীগত মনোভাবের শারীর অভিব্যক্তিই লোক-নৃত্য। গোষ্ঠীজীবনের প্রয়োজনেই ইহা পুষ্টিলাভ করিয়াছে। ক্রমে ইহা একটি শিল্পরূপ লাভ করিয়া শাস্ত্রীয় (classical) বা প্রাচীন পর্যায়ে উঠিয়া গেলেও গোষ্ঠীজীবনের মধ্য দিয়া ইহার লৌকিক ধারা চিরকাল অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। পরে অনিবার্যভাবেই সঙ্গীত ইহার সঙ্গে আসিয়া যুক্ত হইয়াছে।

এক

প্রাচীন নৃত্য

মধ্য যুগে তুর্কী আক্রমণের বিপর্যয়ের সম্মুখে রাষ্ট্রের সহানুভূতি বঞ্চিত হইয়া বাংলার যে সকল চারুকলা বিলুপ্ত] হইয়া গিয়াছে, বাংলার নৃত্যশিল্প যে তাহাদের অন্যতম, বাংলার প্রাচীন সাহিত্য হইতে এখনও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন নৃত্য কিংবা নৃত্যশিল্প বলিতে আমি ইহাকে লোক-নৃত্য (folk dance) হইতে এখানে পৃথক্ বলিয়া মনে করিতেছি। কারণ, দেখা যায়, তুর্কী আক্রমণ বা মুসলমান বিজয়ের পরও বাংলার কোনও কোনও প্রত্যন্ত অঞ্চলে লোক-নৃত্যের ধারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত কতকটা অব্যাহত চলিতে থাকিলেও শিল্প-সম্মত নৃত্য বা প্রাচীন বা ক্লাসিক্যাল নৃত্যের ধারা যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহা প্রত্যক্ষই দেখিতে পাওয়া যায়।

আজ বাংলা দেশে যে প্রাচীন নৃত্যশিল্পের অভ্যুদয় দেখা যায়, তাহার সঙ্গে বাঙ্গালীর নৃত্যশিল্প সাধনার নিজস্ব ধারার কোন যোগ নাই, ইহার পুনরভ্যুত্থান বা revival বলা যায় না, কারণ, ইহা বাঙ্গালী জাতির বিলুপ্ত একটি শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠা নহে, বরং একদিক হইতে ইহা দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যের অনুকরণ, অন্য দিকে আধুনিক শিল্পবোধ দ্বারা তাহার নব রূপায়ণ। বাংলাদেশে এই বিষয়ে যে একটি নিজস্ব ধারা ছিল, সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া কেহ তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হন নাই। দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলাদেশে ইহার অনুশীলনের অভাবে এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করাও সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। বিশেষতঃ, যে সকল ক্ষেত্র হইতে এই সকল বিষয়ের সাধারণতঃ অনুসন্ধান করা হইয়া থাকে, এ দেশে সে সকল ক্ষেত্রের অভাব আছে। অর্থাৎ সমগ্র দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলিকে আশ্রয় করিয়া নৃত্যশিল্পের যেমন আধুনিক কাল পর্যন্তও বিকাশ হইয়া আসিয়াছে এবং সেখানে কেবল মাত্র মন্দিরগুলির মধ্যে অনুসন্ধান করিলেই যেমন সে দেশের নৃত্যশিল্পের একটি সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায়, বাংলা দেশে তাহা পাওয়া যায় না, কারণ, বাংলা দেশে অনুরূপ মন্দিরেরই অভাব আছে।

বাংলার মুসলমান শাসনের আমলে মন্দিরগুলিই রাষ্ট্রশক্তির আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল এবং নানা ভাবে কেবলমাত্র যে মন্দিরের ইট-পাথরগুলিই বিধ্বস্ত করা হইয়াছে, তাহা নহে, এদেশে মন্দির সম্পর্কিত কোন সংস্কার কিংবা জনশ্রুতিও গড়িয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। দক্ষিণ ভারতের অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সে দেশে দেবমন্দিরগুলিকে কেন্দ্র করিয়া দেশের সংস্কৃতি নানা ভাবে গড়িয়া উঠিবার নিরুপদ্রব অবকাশ লাভ করিয়াছে। এই সকল মন্দিরের মধ্যে কেবল যে নৃত্য-শিল্পের প্রত্যক্ষ অনুশীলন মাত্রই হইয়াছে, তাহা নহে—যুগে যুগে সে দেশের নৃত্য রাষ্ট্রের সহানুভূতি লাভ করিয়া যে ভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহারও সুবিস্তৃত পরিচয় মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ হইয়া আছে। উড়িষ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মধ্যে যে অগণিত হিন্দুমন্দির অক্ষত ভাবে সহস্রাধিক বৎসর যাবৎ বিরাজ করিতেছে, তাহাতে উৎকীর্ণ মূর্তিগুলির নৃত্যভঙ্গি অনুসরণ করিয়া গেলেই দক্ষিণ ভারতের নৃত্যশিল্পের ক্রমবিকাশের ধারা সার্থক ভাবে অনুসরণ করা যায়। তারপর দক্ষিণ ভারতীয়ের জীবনে নৃত্যের সংস্কার আধুনিকতম কাল পর্যন্ত যে ভাবে সক্রিয় রহিয়াছে, তাহার মধ্যেও ইহার বহু দূরাগত একটি ঐতিহ্যের ধারা বর্তমান আছে। কিন্তু বাংলা দেশে ইহাদের কিছুই নাই। এখানে মন্দিরও যেমন নাই, প্রাচীন শিল্পসম্মত নৃত্যের ধারাও বর্তমান নাই। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি বিষয়ক উপকরণের অনুসন্ধানকারিগণ এই দুইটি ক্ষেত্র হইতেই ইহার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের শিক্ষা এবং অভ্যাস এই বিষয়ে এমনি অনমনীয় (rigid) হইয়া রহিয়াছে যে, যেখানে এই উপকরণের অভাব দেখিতে পান, সেখানেই এই বস্তুরই অভাব বলিয়া মনে করিয়া সেদিকে আর দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ পান না। প্রত্যেক দেশেরই ঐতিহাসিক উপাদান যে এক হইতে পারে না, এই কথাটি তাহারা বুঝিতে পারেন না। সেই জন্য বিভিন্ন দেশে নূতন নূতন ক্ষেত্র হইতে মানব ইতিহাসের যে সকল বিচিত্র উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে, সেই বিষয়ে আমাদের দেশের পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ সম্পূর্ণ নির্বিকার।

বাংলার ইতিহাস দক্ষিণ ভারত হইতে স্বতন্ত্র। সুদীর্ঘকাল নিরুপদ্রব সমাজ-জীবন ভোগ করা এই দেশের ভাগ্যে ছিল না। সেই জন্য এই দেশে কোন

স্থায়ী কীর্তি গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। এই সূত্রেই কোনও ঐতিহ্য এ দেশে দীর্ঘকাল ধরিয়া বিকাশ লাভ করিবার পরিবর্তে তাহা বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। ভাস্কর্য কিংবা স্থপতির নশ্বর কীর্তিতে এ' দেশের ঐতিহ্য ধরা দেয় নাই। কিন্তু সেইজন্য এই দেশে যখন আপাত দৃষ্টিতে সভ্যতার কোন উপাদানের অভাব দেখা যায়, তখন এই দেশের তাহা একটি বিশেষ ত্রুটি বলিয়া গণ্য করিবার পূবে আমাদের অভ্যস্ত ক্ষেত্র ব্যতীতও তাহার সম্বন্ধে অন্যত্র হইতেও অনুসন্ধান করা আবশ্যক হয়। ঐতিহাসিকের উপেক্ষিত সেই প্রকার একটি ক্ষেত্র হইতে প্রাচীন বাংলার নৃত্যশিল্পের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের একটি নূতন পরিচয় প্রকাশ করিতে পারে।

বাংলার প্রাচীন স্থপতি ও ভাস্কর কীর্তিতে প্রাচীন বাংলার নৃত্যশিল্পের উল্লেখযোগ্য কোন নিদর্শন না পাওয়া গেলেও, প্রাচীন সাহিত্যে ইহার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা কোন দিক দিয়াই উপেক্ষা করা যাইতে পারে না। মঙ্গলকাব্য বাংলার প্রাচীন সাহিত্য ধারার অন্তর্ভুক্ত, বাংলার জাতীয় সাহিত্য। ইহার মধ্যে সে কালের বাংলার যে সমাজ চিত্র পাওয়া যায়, তাহা কেবল কবির কল্পিত ভাব-স্বপ্ন মাত্র নহে, ইহার মূলে বাস্তব জীবনের প্রেরণা সক্রিয় ছিল। ইহাদের মধ্যে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে এখনও এখান হইতেই বাংলার অতীত সমাজ-জীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বাংলার ইতিহাসে কতকগুলি নূতন অধ্যায় যোজনা করিতে পারে। মনসা-মঙ্গল ইহাদের মধ্যে নানা দিক দিয়া প্রাচীনতম বলিয়া মনে হয়। বাংলার এক অতি প্রাচীন সমাজ-জীবনের সংস্কারের উপর ইহার ভিত্তি। ইহার মধ্যে প্রাচীন বাংলার নৃত্যশিল্পের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, ইহা একদিন বাঙ্গালী জীবনে সাধনার বিষয় ছিল। সে কথাই এখানে উল্লেখ করিতেছি।

এ' কথা সকলেই জানেন, মনসা-মঙ্গলের নায়িকা বেহুলা দেবতাদিগকে নৃত্য প্রদর্শন করাইয়া তাঁহার জীবনের অভীষ্ট পূরণ করিয়াছিলেন। এই কথাটি গভীর তাৎপর্য মূলক। যে সমাজ-জীবন হইতে এই কাহিনী জন্ম লাভ করিয়াছিল এবং যে সমাজ এই কাহিনীকে দীর্ঘকাল যাবৎ পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসিয়াছে, সেই সমাজেরই জাতীয় কাব্যের নায়িকা-চরিত্রের সর্ব প্রধান গুণ

নৃত্যাকুশলতা। ইহা হইতেই নৃত্যশিল্পের প্রতি সমাজের কি মনোভাব ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। মনসা-মঙ্গল কাব্যের মধ্যে এই বিষয়টি যে পূর্বাপর সম্পর্কহীন একটি বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন বিষয়, তাহা নহে। এই কাব্য যাঁহারা গভীর ভাবে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন, প্রাচীন নৃত্যশিল্পকে ইহার মধ্যে পূর্বাপরই একটি বিশেষ স্থান দেওয়া হইয়াছে। মনসা-মঙ্গল কাব্যের প্রথম অংশেই পর পর কয়েকটি শিব-নৃত্যের বর্ণনা আছে। মনসার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন আনন্দের অভিব্যক্তি স্বরূপ শিব একবার নৃত্য করিতেছেন, কবি এই সম্পর্কে লিখিয়াছেন,

পদ্মারে লইয়া কাঁধে নাচে শিব ঘন পাকে,

চক্রাকারে নৃত্য করিবার মধ্য দিয়া প্রাচীন শিবনৃত্যের একটি বিশেষ রীতিরই এখানে বর্ণনা করা হইয়াছে। মনসা-মঙ্গলে শিব-নৃত্যের দ্বিতীয় বর্ণনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেই জন্য তাহা আনুপূর্বিক উদ্ধৃত করিতেছি। মনসা চণ্ডীকে দংশন করিবার ফলে চণ্ডীর মৃত্যু হইয়াছিল, শিবের অনুরোধে মনসা চণ্ডীর দেহে প্রাণ সঞ্চার কবিলেন। চণ্ডী যখন চক্ষু মেলিয়া তাকাইলেন, তখন তিনি পার্বতীকে পার্শ্বে লইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ইহার বর্ণনায় চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবি বিজয় গুপ্ত লিখিয়াছেন,

জগত মোহন শিবের নাচ।
সঙ্গে নাচে শিবের ভূত পিশাচ ॥
রঙ্গে নেহালী গৌরীর মুখ।
নাচে গঙ্গাধর মনের কৌতুক ॥
হাসিতে খেলিতে চলিতে রঙ্গ।
নন্দী মহাকাল বাজায় মৃদঙ্গ ॥
শিবাই নাচেরে মুখেতে গীত গাহে।
হাত তালি দিয়া কিঙ্গরে গীত গাহে ॥
বিকট দশনে ভ্রূকুটি ভাল সাজে।
ডুমু ডুমু বলিয়া ডমরু বাজে ॥
মরিয়াছিল চণ্ডিকা জীল আর বার।
ডাকিনী যোগিনী দিল জয়-জোকার ॥

কার্তিক গণপতি দাঁড়াইয়া কাছে।
গৌরীমুখ নেহালিয়া ত্রিলোচন নাচে ॥
দেখিয়া কৌতুক দেব-সমাজে।
পুষ্প বরিষণ করে ধুমধুমি বাজে ॥
ডাহিনীতে গৌরী বামে পদ্মাবতী।
হাসিয়া চলিল দেব পশুপতি ॥

প্রাচীন রীতি (classical) অনুযায়ী হর-পার্বতী নৃত্যের ইহা একটি সার্থক বর্ণনা—ইহা কেবল মাত্র লোক-নৃত্যের বর্ণনা নহে। বাংলার প্রাচীন কোন মন্দির গাত্রে দক্ষিণ ভারতের অনুযায়ী ।হরপার্বতীর অনুরূপ নৃত্যভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় না সত্য, তবে হরপার্বতীর মিথুন মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু মিথুন মূর্তিগুলির পরিচয় স্বতন্ত্র, ইহাদের মধ্য দিয়া প্রাচীন নৃত্যের কোন পরিচয় উদ্ধার করা যায় না। কিন্তু উদ্ধৃত বর্ণনাটি হইতে বুঝিতে পারা যায়, বাংলা দেশ হইতে নৃত্যপর শিবের কোনও প্রাচীন মূর্তি আবিষ্কৃত না হইলেও এ দেশেও দাক্ষিণাত্যেরই অনুরূপ শিবকে নৃত্যগুণ-সম্পন্ন দেবতা রূপেই কল্পনা করা হইত। অর্থাৎ নটরাজ শিবের পরিকল্পনাটি বাংলা দেশেও বর্তমান ছিল বলিয়া মনে হয় এবং দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে এই বিষয়ে বাংলা দেশের কোন বিষয়েই পার্থক্য ছিল না। উত্তর ভারতের পরিবর্তে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে বাংলা দেশের অনেক বিষয়েই যে সাংস্কৃতিক ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়, নৃত্যশিল্পও তাহাদের অন্যতম। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের নৃত্য-সংস্কার অব্যাহত ভাবে অগ্রসর হইয়া আসিবার ফলে আধুনিক কাল পর্যন্ত ইহার পরিচয় লোকচক্ষুর সম্মুখ হইতে তিরোহিত হয় নাই; কিন্তু বাংলা দেশে তুর্কী আক্রমণের পর যে সামাজিক বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল, তাহার ফলেই ইহা ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইতে না পারিয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

মনসা-মঙ্গলে চাঁদ সদাগরের পুত্রবধূ ও লখীন্দরের পত্নী বেহুলার শৈশবকালীন শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে বলা হইয়াছে,

মা বাপের বাড়িতে বেহুলা নাচে গায়।

নৃত্য এবং সঙ্গীত এ দেশের নারীদের সাধনার বস্তু ছিল; সেইজন্য এই পথেই বেহুলা তাহার জীবনের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

নৃত্যকালীন তালভঙ্গ সে যুগের সমাজে এক কঠিন পাপ বলিয়া গণ্য হইত। এই পাপে অভিশাপগ্রস্ত হইয়া নৃত্যশিল্পীদিগকে স্বর্গভ্রষ্ট হইতে হইত; তার পর মর্ত্যলোকে দুঃসহ দুঃখভোগ করিয়া সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। কিন্তু নট-নটীদিগের নিজেদের দোষে তাল ভঙ্গ হইত না, কোন চক্রান্তকারী দেবদেবী ষড়যন্ত্র করিয়া তালভঙ্গ করিয়া দিতেন। তাহার ফলেই নট-নটীদিগকে অভিশাপগ্রস্ত হইতে হইত। সুতরাং অটুট নিষ্ঠার সঙ্গে যে ইহার সাধনা করা হইত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। মনসা-মঙ্গল হইতে উষা-অনিরুদ্ধের তালভঙ্গের বর্ণনাটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

জয় জয় পরে উষা কাচের বসন।
গঙ্গা যমুনা বন্দে মাথে মোহন বাঁশী নিল হাথে
দাঁড়াইল ইন্দ্রের সভায়॥
কোঙর মৃদঙ্গ নিলা উষা মোহন বাঁশী॥
নৃত্য করিতে নামিলা রামা পরম রূপসী॥
তাথিনী তাথিনী তাল নাচে কন্যা সন্নিধান
ধন্য ধন্য বলে ইন্দ্র রায়।
মনসাকে বলে ধোবিনী শোন গো ব্রহ্মাণি
কেন নৃত্য দেখ বিষহরি।
মা, বিষ-নঞানে চাও তালখানি ভেঙ্গে দাও
পাউক দেখিবারে ইন্দ্র রায়॥
মা বিষ নঞানে চায় তালখানি ভেঙ্গে যায়
দেখিবারে পাইল ইন্দ্র রায়॥
উষা হও লো নাটুয়ার জাতি গরবে না চিন মতি
কি দেখিঞা তোর ভঙ্গ তালে।
নাটুয়া আমার স্থান ছাড়রে জন্ম লওগা চণ্ডালের ঘরে
এ' বার বছরের তরে॥

মনসার চক্রান্তে উষা-অনিরুদ্ধের তাল ভঙ্গ হইবার দোষে তাহাদের দ্বাদশ বৎসরের জন্য স্বর্গ হইতে নির্বাসনের অভিশাপ হইল। সুতরাং নৃত্যকালীন তালভঙ্গ দোষটি সে যুগে যে কত গুরুতর বলিয়া বিবেচিত হইত, ইহা হইতে

তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। যে সমাজ নৃত্যশিল্পকে নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনা করিত, সেই সমাজের নিকটই ইহার কোন প্রকার ত্রুটিবিচ্যুতি এই প্রকার কঠিন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবার কথা। সেই সংস্কার যে আমাদের মধ্য হইতে আজ একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মধ্যেও স্বর্গ-নর্তকী রত্নমালার এই প্রকারে তালভঙ্গ ও সেইজন্য স্বর্গসভা হইতে অভিশপ্ত হইবার বর্ণনা শুনিতে পাওয়া যায়—

ধনির মনোহর লীলা নাচে কন্যা রত্নমালা
নৃত্য দেখেন দেবগণ।
তাতিনি তাতিনি তিনি মৃদঙ্গ মন্দিরা ধ্বনি
ঘন বাজে রতন কঙ্কণ॥
হয়ে অতি সাবহিত নারদ গায়েন গীত
বীণা গুণে তরল অঙ্গুলী।
তুহেঁ ত মধুর গায় ঠমক থমক রায়,
দেবগণ হৈল কৌতূহলী॥
ভুবন মোহন কাচে রঙ্গিণী তাণ্ডব নাচে,
গান মুনি গান্ধার নিষাদ।
মুখর নূপুরশালী দেয় ঘন পদতালি
দেবগণ দেয় সাধুবাদ॥
সুরঙ্গ পাটের জাদে বিচিত্র কবরী বাঁধে
মালতী মল্লিকা চাঁপা গাভা।
কপালে সিন্দূর ফোঁটা প্রভাত ভানুর ছটা,
চৌদিকে চন্দনবিন্দু শোভা॥
পরি দিব্য পাটশাড়ী কনক রচিত চুড়ি,
দুই করে কুলুপিয়া শঙ্খ।
হীরা নীলা মতি পলা কলধৌত কণ্ঠমালা
কলেবর মলয়জ পঙ্ক॥
পীত তড়িৎ বর্ণে হেম মুকুলিকা কর্ণে
কেশ-মেঘে পড়িছে বিজুলী।

রতন পাসলি ছটি পরে দিব্য তুলাকোটি
বাহু বিভুষণ ঝলমলি ॥
দেবীর আদেশে স্মর হাথে লয়ে ধনুঃশর
হানে বীর সম্মোহন বাণ।
অবশ হইল অঙ্গ হৈল তার তাল ভঙ্গ
শ্রীকবি কঙ্কণ রসগান ॥

ভবানী এই দোষে তৎক্ষণাৎ তাহাকে অভিশাপ দিলেন,

তাল ভঙ্গ হৈল রামা লাজে হেটমুখী।
যতেক দেবতা সভে হইলা বিমুখী ॥
তালভঙ্গ দেখি তারে বলেন ভবানী।
যৌবন গরবে নাচ হয়ে অভিমানী ॥
সুধর্ম সভায় নাচ হয়ে খলমতি।
মানব হইয়া ঝাট চল বসুমতী ॥

অনুরূপ বর্ণনা প্রায় সকল মঙ্গলকাব্যেই পাওয়া যায়।

দুই

লোক-নৃত্যের ভূমিকা

প্রথমতঃ তুর্কী আক্রমণ এবং দ্বিতীয়তঃ ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের পর বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবন হইতে ইহার যে সকল জাতীয় উপকরণ বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, নৃত্যশিল্প তাহাদের অন্যতম। বিজেতা তুর্কী কর্তৃক প্রবর্তিত ইসলাম ধর্ম কিংবা ইংরেজ জাতি প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষা উভয়ই বাঙ্গালীর জাতীয় এই রস-সংস্কারের অনুশীলনের বিরোধী ছিল। তাহার ফলেই আজ জাতির রস-চেতনার মধ্য হইতে নৃত্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালীর সৌন্দর্য ও শিল্পবোধ ইহাকে আশ্রয় করিয়াও যে একদিন কি ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা অনুসন্ধানের ফলে আজও আমরা জানিতে পারি।

প্রত্যেক জাতির মধ্যেই নৃত্যশিল্পের দুইটি ধারা আছে, একটি সুনির্দিষ্ট কোন রীতিকে অনুসরণ করিয়া গড়িয়া উঠে। তাহাই ক্রমে প্রাচীন নৃত্যপদ্ধতি বা 'ক্লাসিক্যাল ড্যান্স' বলিয়া পরিচয় লাভ করে। সমগ্রভাবে সমাজের পরিবর্তে সমাজের বিশিষ্ট কোন অংশ কর্তৃক অনুশীলনের ফলে ইহা কালক্রমে একটি বিশিষ্ট বা অনমনীয় আদর্শ গড়িয়া তুলে, বৃহত্তর সমাজ-জীবনের সঙ্গে তাহার কোন যোগ না থাকিলেও সমাজের যে অংশ চিন্তায় কিংবা কর্মে নানা বিষয়েই উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে, তাহার ভিতর হইতেই ইহা বিকাশ লাভ করে। যেমন, দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন নৃত্যপদ্ধতি ভরত-নাট্যম, সে দেশের মন্দির ও দেবারাধনাকে অবলম্বন করিয়া বিকাশ লাভ করিবার ফলে কেবলমাত্র সমাজের উচ্চতর একটি অংশকেই অবলম্বন করিয়া ছিল, ইহা কালক্রমে একটি সুনির্দিষ্ট বিধির অন্তর্ভুক্ত হইবার ফলে ইহার স্বাধীন বিকাশের ধারাটি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং ইহাই প্রাচীন পদ্ধতির নৃত্য বা 'ক্লাসিক্যাল ড্যান্স' বলিয়া গণ্য হইল। কিন্তু সমস্ত দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চল ব্যাপিয়া নিম্নতর সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে লৌকিক উৎসবে পার্বণে যে নৃত্যধারা স্মরণাতীত কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল, তাহার সুনির্দিষ্ট কিংবা অনমনীয় কোন পদ্ধতি কোন কালেই বিধিবদ্ধ হয় নাই বলিয়া ইহা কোন কালেই লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে নাই, সুতরাং ইহা কখনও প্রাচীন বা ক্লাসিক হইয়া উঠিবার

অবকাশ পায় নাই। ইহাই লোক-নৃত্য। লোক-সাহিত্যের যেমন কোন রূপ নাই, লোক-নৃত্যেরও প্রাচীন কোন রূপ নাই; ইহার ধারা প্রবহমান, ইহা লুপ্ত হয়, কিন্তু প্রাচীন হয় না।

লোক-নৃত্যই প্রাচীন পদ্ধতির নৃত্যের বা 'ক্ল্যাসিক্যাল' নৃত্যের ভিত্তি; প্রাচীন পদ্ধতির নৃত্যকে বিশ্লেষণ করিলে ইহার মধ্যে লোক-নৃত্যের উপকরণ পাওয়া যায়। লোক-নৃত্যেরই বিশেষ এক একটি রূপ সুদীর্ঘ কাল অনুশীলনের ফলে সুনির্দিষ্ট একটি রীতি গ্রহণ করে, সুনির্দিষ্ট রীতিগুলির মধ্যে কতকগুলি নূতন নূতন আঙ্গিক গড়িয়া উঠিয়া ইহাকে উচ্চতর নৃত্যশিল্পের রূপদান করে। তাহার ফলেই লোকনৃত্যের বৈশিষ্ট্য হইতে ইহা পৃথক্ হইয়া যায়। মণিপুরের রাস-নৃত্যের কথাই যদি ধরা যায়, তাহা হইলেও দেখা যায়, ইহার একটি প্রাচীনতর লোক-নৃত্যগত পরিচয় ছিল। এখন ইহা উচ্চতর নৃত্যের পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে। ইহার আদর্শটি ক্রমে অনমনীয় বা rigid হইয়া পড়িয়া ইহা একটি প্রাচীন বা 'ক্লাসিক্যাল' নৃত্য পদ্ধতির অঙ্গীভূত হইয়া পড়িবে, ইহার সেই অবস্থা আসন্ন হইয়াছে। যে আঙ্গিকগুলি কালক্রমে মণিপুরী রাসনৃত্যের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়া ইহাকে লোক-নৃত্য হইতে পৃথক্ করিয়াছে, তাহা অতি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। প্রথমত ইহার সুনির্দিষ্ট পোষাক পরিধানের রীতি। লোক-নৃত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যই এই যে, ইহা কোন রীতিকেই সুনির্দিষ্ট ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে না। সেইজন্য লোক-নৃত্যে পোষাক পরিচ্ছেদের কোন বাঁধাধরা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না। জাতির যাহা সর্বজনীন পোষাক, নৃত্যকালীন পোষাকও তাহাই। কারণ, লোক-নৃত্যে নৃত্যের ভাবটি জাতির জীবনে আপনা হইতে বিকাশ লাভ করে, সেখানে জীবনের অন্তর্মুখী আচরণের মধ্যে নৃত্যের অনুভূতি প্রকাশ পায়। কিন্তু মণিপুরী নৃত্যই হউক, কিংবা অন্য কোনও আনুষ্ঠানিক নৃত্যই হউক, তাহা জাতির বহির্মুখী প্রয়োজনের দিক পূর্ণ করে মাত্র। যেমন দেবদাসী কিংবা রাজনর্তকী—ইহারা সামগ্রিক ভাবে জাতীয় আনন্দ প্রেরণা অপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে নৃত্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। মণিপুরী নৃত্যও তাহাই, মণিপুরী জাতির বৃহত্তর সমাজ-জীবন পরিত্যাগ করিয়া ইহা একান্তভাবে রাজা কিংবা পুরোহিতের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছে। সমগ্রভাবে সমাজকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র রাজা কিংবা পুরোহিতের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিবার অর্থ কি, তাহা

সকলেই বুঝিতে পারেন। ইহা দ্বারা একদিকে ব্যক্তিরুচি ও অপরদিকে ধর্মীয় লক্ষ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু লোকসংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যই এই যে, ইহা কদাচ ব্যক্তি-রুচির কিংবা সাম্প্রদায়িক স্বার্থের অনুগামী নহে, বরং ইহা সমাজের সামগ্রিক রস-চেতনার অভিব্যক্তি।

মণিপুরী নৃত্যের পোষাক ব্যবহারের পদ্ধতি যেমন সুনির্দিষ্ট, তেমনই ইহার অঙ্গ-চালনাতেও একটি সুনির্দিষ্ট রীতি অনুসরণ করা হইয়া থাকে। একক বা solo হউক, কিংবা গোষ্ঠীগতভাবেই হউক, নৃত্যের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট অঙ্গ-চালনার রীতি না থাকিলে তাহা বিসদৃশ হয়, এমন মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সুনির্দিষ্টতা যখন অন্ধ আনুগত্য হইয়া উঠে, তখনই তাহার প্রাণশক্তি বা vitality বিনষ্ট হয়। লোক-নৃত্যের তুলনায় প্রাচীন নৃত্যপদ্ধতি দৃশ্যত যত আকর্ষণীয়ই হইয়া উঠুক না কেন, তাহা যে প্রাণহীন, তাহা এই কারণেই হইয়া থাকে। মণিপুরী নৃত্যের বহির্মুখী আঙ্গিক বিষয়ে বর্তমানে যে অন্ধ আনুগত্যের পরিচয় প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহাই ইহাকে প্রাচীন বা 'ক্লাসিক' নৃত্যের পর্যায়ে স্থান দিয়াছে। সহজ স্ফূর্তির মধ্যে লোক-নৃত্যের আনন্দ বিকাশ লাভ করে। আয়াসসাধ্য প্রচেষ্টায় উচ্চতর নৃত্যশিল্পের রূপ প্রকাশ পায়। মণিপুরী রাস-নৃত্য একদিন যত সহজ আনন্দের সরস অভিব্যক্তি রূপেই প্রকাশ পাক না কেন, আজ ইহা যে পর্যায়ে গিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতে ইহা বাহিরের আড়ম্বর দিয়া অন্তরের সুগভীর ভাবটি ঢাকিয়া দিয়াছে।

বাংলাদেশেও প্রাচীন পদ্ধতির নৃত্য একদিন প্রচলিত ছিল, প্রাচীন সাহিত্য ও শিল্পকীর্তিতে তাহার পরিচয় আমরা সর্বদাই পাইয়া থাকি। সে কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে তুলনা করিলে বাংলার প্রাচীন নৃত্যপদ্ধতির মধ্যে লোক-নৃত্যের প্রভাব সর্বাধিক ছিল। বাংলার নিজস্ব পদ্ধতিতে রচিত মন্দিরগুলি যেমন সাধারণ বাঙ্গালীর বাস-গৃহের অনুযায়ী পরিকল্পিত হইয়া থাকে, বাঙ্গালীর প্রাচীন নৃত্যপদ্ধতিও ইহার লোক-নৃত্য হইতে সর্বাধিক উপকরণ সংগ্রহ করিয়া পরিকল্পিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে বাংলাদেশের সঙ্গে উড়িষ্যা এবং আসামেরও কতকটা তুলনা করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার স্বতন্ত্র কোন কারণ নাই। ইহা প্রতিবেশী প্রদেশের উপর স্বাভাবিক প্রভাবের ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে।

লোক-নৃত্যের সঙ্গে আদিবাসী নৃত্যের কি সম্পর্ক, তাহাও এখানে আলোচনা

করিয়া দেখা আবশ্যক। কারণ, বাংলার লোক-নৃত্য যে ইহার প্রতিবেশী আদিবাসী সমাজের নৃত্য দ্বারাও প্রভাবিত হইয়াছে, তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বরং একদিক দিয়া এই কথাও বলা যায় যে, বাংলার লোক-নৃত্য ইহার প্রতিবেশী আদিবাসী সমাজের নৃত্যের ভিত্তির উপরই উদ্ভূত হইয়াছে। সুতরাং আদিবাসী সমাজ এবং লোক-সমাজ উভয়ের পরস্পর সম্পর্কের কথা আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

আদিবাসী সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে বহিরাগত সাংস্কৃতিক উপকরণ গৃহীত ও স্বাঙ্গীকৃত হয় না, কিন্তু লোক-সমাজ বা folk sociatyতে তাহা সর্বদাই হইয়া থাকে। একদিক দিয়া বরং বলা যায় যে, বহিরাগত উপকরণ গ্রহণ ও তাহার স্বাঙ্গীকরণের মধ্য দিয়াই লোক-সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনের পুষ্টি হইয়া থাকে। বাংলার লোক-নৃত্য বহিরাগত বিভিন্ন জাতির সাংস্কৃতিক উপকরণ দ্বারা কেবলমাত্র যে পুষ্টিলাভ করিয়াছে, তাহাই নহে—বরং তাহার মধ্যেই ইহা জন্মলাভ করিয়াছে। বাংলার প্রতিবেশী অঞ্চলের আদিবাসী সমাজ ও বাংলার লোক-সমাজ এক নহে। সুতরাং আদিবাসী সমাজের উপকরণ অপরিবর্তিত রূপে কোথাও বাংলার লোক-সমাজে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। বিভিন্ন রূপান্তরের ভিতর দিয়া বিভিন্ন আদিবাসী সমাজের নৃত্যই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়া প্রবেশ করিলেও ইহাদের মধ্য দিয়া কালক্রমে একটি অখণ্ড ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে। স্বাঙ্গীকরণের ইহাই ধর্ম—মৌলিক উপকরণ অন্যত্র হইতে গ্রহণ করিয়াও নিজস্ব অন্তঃপ্রকৃতি অনুযায়ী আপন বিশিষ্ট রূপ সৃষ্টি করা ইহাতে সম্ভব হইয়া থাকে। জাতির অন্তঃপ্রকৃতির বিশেষত্বই ইহাকে জাতীয় বিশেষত্ব দিয়া থাকে। বাংলার লোক-সমাজের বহু বিচিত্র সাংস্কৃতিক উপকরণের সঙ্গে ইহার আদিবাসী সমাজের সাংস্কৃতিক উপকরণেরও সেই সম্পর্ক বর্তমান।

আদিবাসীর সমাজ অন্ধ আসক্তি বশতঃ নিজের সমাজ-জীবনের উপকরণ-গুলি আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। একদিক দিয়া প্রাচীন পদ্ধতির 'ক্লাসিক্যাল' নৃত্যের মত ইহারও প্রতিটি খুঁটিনাটি রীতির প্রতি অন্ধ আনুগত্যের সৃষ্টি হয় বলিয়া ইহাও কালক্রমে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু লোক-সমাজের অন্যান্য সাংস্কৃতিক উপকরণের মত লোক-নৃত্যও একদিক দিয়া নূতন নূতন প্রেরণা ইহার মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত করিয়া লইয়া ইহার প্রাণশক্তি অব্যাহত রাখিয়া

অগ্রসর হয়। আজ যে ভারতব্যাপী আদিবাসী সমাজের নৃত্য এত বৈচিত্র্যহীন বলিয়া অনুভূত হয়, তাহার প্রধান কারণ, বহুকাল যাবৎ ইহাদের মধ্যে বাহিরের কোন সাংস্কৃতিক উপকরণ যেমন প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই, তেমনই প্রতিবেশী সমাজকেও ইহা আর নূতন নূতন বিষয়ের প্রেরণা দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে নাই। কিন্তু একদিন আদিবাসী সমাজের উপকরণই লোক-সমাজের অবলম্বন ছিল, সেদিন ইহার জীবনীশক্তি ছিল বলিয়াই অন্যকে যেমন ইহা উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, নিজেও নিজের মধ্যে নূতন নূতন বৈচিত্র্যের সন্ধান দিয়াছে।

আদিবাসী সমাজের সান্নিধ্যের জন্যই বাংলার লোক-নৃত্যেও এত বৈচিত্র্য দেখা যায়। বিশেষতঃ বাংলা দেশের প্রতিবেশী রূপে যে সকল আদিবাসী সমাজ বাস করে, তাহাদের আকৃতি ও প্রকৃতিগত অনেক সময়ই ঐক্য নাই। বাংলার পশ্চিম সীমান্তে আদি-অস্ত্রাল (Proto-Australoid) শ্রেণীর আদিবাসীর বাস হইলেও বাংলার উত্তর কিংবা পূর্ব সীমান্তে আর এক স্বতন্ত্র প্রকৃতির আদিবাসীর বাস। ইহাদের একটি প্রধান অংশ বাংলা ভাষা গ্রহণ করিয়া বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আসিয়া বাস করিতে থাকিলেও হিন্দুর ধর্ম ও সমাজ দ্বারা ইহাদের সাংস্কৃতিক জীবনের মৌলিক পরিচয় একেবারে প্রচ্ছন্ন হইয়া যাইতে পারে নাই। ইহারা প্রধানতঃ ইন্দো-মোঙ্গলয়েড্ বা কিরাত বলিয়া পরিচিত। ইহাদের মধ্যেও যে বিভিন্ন শাখা আছে, তাহাও বিভিন্ন দিক হইতে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বাংলার উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের লোক-নৃত্য ইহাদের দ্বারাও প্রভাবিত হইয়াছে বলিয়া অনুভব করা যায়। ইন্দো-মোঙ্গলয়েড্ জাতির যে শাখা বাংলার পুর্ব সীমায় বাস করে, তাহাদের নৃত্য বৈচিত্র্যহীন, সেইজন্য মূলতঃ ইহারই প্রভাবজাত অঞ্চলেও লোক-নৃত্য বৈচিত্র্যহীন ছিল বলিয়াই অনুভূত হয়। কিন্তু কালক্রমে বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলে আরও দুইটি দিক হইতে সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহা একদিকে হিন্দুধর্ম ও আর একদিকে মুসলমানধর্ম। বাংলার পূর্ব সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বৈচিত্র্যহীন লোক-সংস্কৃতির উপর যখন হিন্দু ও মুসলমানধর্মের প্রভাব বিস্তার লাভ করিল এবং তাহা এই অঞ্চলের লোক-সমাজের মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত হইয়া গেল, তখনই ইহাতে বৈচিত্র্যও দেখা দিল। ইন্দো-মোঙ্গলয়েড্ জাতির অংশ এই

অঞ্চলের আদিম অধিবাসী বোড়ো জাতির বৈচিত্র্যহীন নৃত্যধারার উপর একদিক দিয়া হিন্দু সমাজের রাধাকৃষ্ণের কাহিনী, অপর দিক দিয়া মুসলমান সমাজের কারবালা যুদ্ধের বৃত্তান্ত আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার ফলে এই অঞ্চলের লোক-সমাজের নৃত্য নূতন প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। এই ভাবেই একদিকে এই অঞ্চলের গোপিনী খেলা, ঘাটু এবং রাধাকৃষ্ণবিষয়ক অন্যান্য লোক-নৃত্য বিকাশ লাভ করিল এবং অন্যদিকে জারি নৃত্যও এক অভিনব প্রাণশক্তি লাভ করিয়া সমাজের সকল কৌতূহল আকর্ষণ করিতে লাগিল। এই প্রভাব দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুইটি দিক হইতে আসিলেও একই সমাজের মানস-ক্ষেত্রে ইহারা নিজেদের অধিকার স্থাপন করিয়াছে এবং একই জাতীয় সংস্কৃতির মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত হইয়াছে বলিয়া ইহারা একই সূত্র দ্বারা বিধৃত হইয়াছে। এইভাবে বাংলার লোক-সংস্কৃতির মধ্যে ভাগবত পুরাণ ও কারবালার যুদ্ধবৃত্তান্ত একাকার হইয়াছে। আদিম সমাজ-জীবন হইতে বাংলার লোক-সংস্কৃতির মৌলিক উপকরণসমূহ আসিয়া পরবর্তী কালের হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক জীবনের কোন কোন উপাদান ইহার মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত হইয়া বাংলার সংস্কৃতির নূতন রূপ দান করিয়াছে। বাংলার লোক-সমাজের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ প্রবেশ করিবার পূর্বেও কিংবা রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর প্রভাব বহির্ভূত অঞ্চলেও বাংলার লোক-নৃত্য যে বৈচিত্র্যহীন ছিল, তাহা বলিবার উপায় নাই। কারণ, দেখা যায় যে, বাংলার নাথ-ধর্ম সম্পর্কিত সাহিত্যের মধ্যেও নৃত্যের ব্যাপক অনুশীলনের পরিচয় আছে। এই নৃত্য লোক-নৃত্যেরই কোন কোন রূপ, প্রাচীন পদ্ধতির কোন নৃত্য নহে। নাথ-সাহিত্যে পাওয়া যায়, গোরক্ষনাথ নৃত্যদ্বারা যোগভ্রষ্ট মীননাথের চৈতন্যের উদয় করিয়াছিলেন। নাথধর্ম সর্ব-ভারতীয় ধর্ম বলিলেও হয়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রাচীন বাংলা-সাহিত্য ব্যতীত অন্যান্য কোন প্রাদেশিক সাহিত্যে গোরক্ষনাথের মধ্যে এই নৃত্যগুণের অস্তিত্বের কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না। তাহার অর্থ এই যে, বাঙ্গালীর যে মৌলিক জন-গোষ্ঠীর উপর নাথধর্ম নিজের প্রভাব স্থাপন করিয়াছিল, সেই জন-সমাজের মধ্যেই নৃত্যের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। সুতরাং বাংলার লোক-নৃত্যের প্রকৃতি বিচার করিলে দেখা যায়, ইহার মূলে বৈচিত্র্য আছে, তাহা কেবল বিচিত্র প্রকৃতির আদিবাসীর সমাজ-জীবনের প্রভাবের ফল।

প্রত্যেক দেশের সমাজেই আচার-জীবনের অন্তর্ভুক্ত একশ্রেণীর নৃত্য আছে,

তাহাকে ইংরেজিতে 'রিচুয়াল ডান্স' বলে। আদিম সমাজের ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকলাপের উদ্দেশ্য হইতেই ইহাদের উদ্ভব হইয়া থাকে। ইহা সমাজের ওঝা কিংবা পুরোহিতদিগের আদিম ধর্মাচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বাংলা দেশেও এই শ্রেণীর নৃত্যের অস্তিত্ব আছে। ইহা অলোক বা 'মিষ্টিক' ধর্মীয় আচার মাত্র। ইংরেজিতে ইহাকে ম্যাজিক বা 'মিষ্টিক ডান্স'ও বলা হয়। ইহা লোক-নৃত্য নহে, কিন্তু ইহার সঙ্গে লোক-নৃত্যের সম্পর্ক আছে। অনেক সময় ঐন্দ্রজালিক নৃত্যের প্রকৃত তাৎপর্য সমাজ কর্তৃক বিস্মৃত হইয়া যাইবার ফলে, ইহা সাধারণ লোক-নৃত্যের পরিচয় লাভ করে। তখন ইহার আচারগত বা 'রিচুয়াল মূল্য' আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। ধর্ম ও ঐন্দ্রজালিকতা নিরপেক্ষ লোক-মনোরঞ্জনের গুণটিই ইহার মধ্যে প্রকাশ পায়। চৈত্র সংক্রান্তির সময় শিব-দুর্গা সাজিয়া যে গাজন নৃত্য এই দেশের সমাজে এখনও প্রচলিত আছে, তাহার একদিন আচারগত মূল্য ব্যতীত আর কোন মূল্য ছিল না, কিন্তু ইহা এখন অনেক ক্ষেত্রেই আচার-নিরপেক্ষ লৌকিক আনন্দানুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। পূর্বের দিন হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিবার পর একদা সন্ন্যাসী কিংবা ভক্তগণ পরম নিষ্ঠাভরে দেবতার নিকট পূর্ব হইতে মানত করিয়া এই নৃত্যে অংশ গ্রহণ করিত, কোন প্রকার নিয়মভঙ্গ করিত না। কিন্তু বর্তমানে ইহা অনেক ক্ষেত্রেই কৌতুককর ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। ইহারই অবনতির আর একটি সোপান অগ্রসর হইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতায় জেলে পাড়ার সং-এ পর্যবসিত হইয়াছে। কারণ, আচারের বন্ধন অতিক্রম করিয়া একবার বাহির হইলে স্বেচ্ছাচারিতা যে ইহাকে ব্যভিচারের কোন স্তরে লইয়া যায়, তাহা কেহই বলিতে পারে না। আধুনিক যুগের গাজন নৃত্যের তাহাই হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সং গাজন-নৃত্যের অধঃপতনের পথ ধরিয়াই সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায়, আচার নৃত্য লোক-নৃত্যে অবনমিত হইয়া ক্রমে ইহার সকল বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়।

তিন

নৃত্যে পুরুষ ও নারী

একথা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, নৃত্যে পুরুষ অপেক্ষা নারীর স্থানই অধিক , কিন্তু সকল সময় সকল জাতির পক্ষেই একথা সত্য নহে । হিন্দুর উচ্চতর সংস্কারেও নৃত্যের অধিষ্ঠাতা যিনি দেবতা, তিনি নারী নহেন, তিনি পুরুষ , তিনি নটরাজ শিব, তিনিই দক্ষিণ ভারতেব সংস্কারে রঙ্গনাথম্ । পুরুষের তাণ্ডব নৃত্যের স্থান নারীর লাস্য নৃত্যের নিম্নে নহে । কোন কোন আদিবাসী সমাজের মধ্যে পুরুষই নৃত্যে প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। প্রত্যেক জাতিবই সামাজিক জীবনের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই এই বিষয়ক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। তবে প্রধানতঃ দেখা যায়, মৃগয়াজীবী যুদ্ধ-বিগ্রহশীল যাযাবর জাতিব মধ্যে পুরুষই নৃত্যে প্রধান্য লাভ কবে , কিন্তু কৃষিভিত্তিক সমাজের মধ্যে নৃত্যে নারীরই প্রাধান্য প্রকাশ পায় । আসামের এবং হিমালয় অঞ্চলের ইন্দো-মোঙ্গলয়েড্ বা কিবাত জাতি সমূহের মধ্যে পুরুষই নৃত্যে প্রাধান্য লাভ করে। নাগা, মিশমি, আবর ইত্যাদি জাতির যুদ্ধনৃত্য ইহাদেব প্রত্যেকের জাতীয় সংস্কৃতির মধ্যে প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু নাগা জাতিরই অন্যতম যে শাখা মণিপুরী নাম গ্রহণ করিয়া দেশের সমতল অঞ্চলে বসবাস করিয়া কৃষকার্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ কবিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা নারীই নৃত্যে প্রাধান্য লাভ করে। পূর্বোক্ত জাতিদিগের মধ্যে সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে নারী নৃত্যে অংশ গ্রহণ করিলেও তাহাকে সক্রিয় অংশ বলা যায় না , কিন্তু মণিপুরী জাতির মধ্যে নারীর স্থান এই ক্ষেত্রে কেবলমাত্র যে প্রধান, তাহাই নহে, প্রকৃত পক্ষে নারীই এই বিষয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। মধ্যভারত ও উড়িষ্যার নৃত্যগীতকুশল গদ্‌বা, মুরিয়া ও মারিয়া নামক আদিবাসীর মধ্যেও নারীই নৃত্যে প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। ইহারও কারণ, ইহারা সমতল ভূমির অধিবাসী এবং কৃষিজীবী। কিন্তু মধ্য ভারতেরই পার্বত্য অঞ্চলে যে আদিবাসী বাস করিয়া থাকে, তাহারা ভৌগোলিক দিক দিয়া একই অঞ্চলের অধিবাসী হইলেও কেবলমাত্র জীবনাচরণের পার্থক্য হেতু তাহাদের সাংস্কৃতিক জীবনেও পার্থক্য সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইয়াছে। একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। উড়িষ্যা প্রদেশের

দক্ষিণ সীমান্তবর্তী কোরাপুট জিলার মুচুকুন্দ উপত্যকার সীমান্তবর্তী পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী অর্ধনগ্ন বোণ্ডা জাতির মধ্যে নারী নৃত্যে প্রায় কোন অংশই গ্রহণ করে না, একমাত্র পুরুষের অংশই সেখানে সক্রিয়। কিন্তু সেই পর্বতেরই পাদমূলে অবস্থিত গ্রামগুলিতে গদ্‌বা নামক যে এক জাতি বাস করে, তাহাদের নারী নৃত্যকুশলতার জন্য ভারত-বিখ্যাত। কেবলমাত্র জীবনাচরণের পার্থক্যই ইহাদের সংস্কৃতি বিষয়ে এই পার্থক্যের কারণ। বোণ্ডা জাতি প্রায় চারি হাজার ফুট উচ্চ পর্বত শিখরে বাস করিয়া প্রাত্যহিক জীবনে সুকঠিন সংগ্রামে লিপ্ত; কিন্তু সমতল ভূমির অধিবাসী গদ্‌বা জাতি কৃষিকার্যে লিপ্ত থাকিবার ফলে জীবন-সংগ্রাম অনেক পরিমাণে সহজ করিয়া লইয়াছে। সেইজন্যই সেখানে নারীর জীবনে স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা যেমন আছে, অবকাশ এবং অবসরও সেই পরিমাণেই রহিয়াছে। বোণ্ডা জাতির নারী-সমাজের তাহা নাই। সামাজিক কিংবা পারিবারিক জীবনের প্রাত্যহিক কর্মে যেখানে পুরুষ প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে, সেখানে নৃত্যেও পুরুষেরই অধিকার এবং যেখানে নারী সেই প্রাধান্য গ্রহণ করিয়া থাকে, সেখানে সেই কার্যেও নারীরই অধিকার। সুতরাং নারীর আকৃতি এবং প্রকৃতি যে নৃত্যের পক্ষে কোথাও অপরিহার্য মনে করা হইয়া থাকে, তাহা নহে। নৃত্য জাতির একটি সংস্কার, জীবনাচরণের সঙ্গে এই সংস্কারের সম্পর্ক। এমন কি, এই সংস্কার যে সর্বদাই রস-সংস্কার, তাহাও নহে, অনেক সময় ইহা ধর্মীয় সংস্কার, ইহার সঙ্গে আদিম ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ারও সম্পর্ক আছে, সুতরাং ইহা সমাজের কেবলমাত্র একটি অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবার কথা নহে।

বাংলা দেশের সমাজ কৃষি-ভিত্তিক, সেই সূত্রেই ইহার মধ্যে নৃত্যে নারীই প্রধান অংশ গ্রহণ করিবে, ইহাই স্বাভাবিক, প্রকৃত পক্ষে ইহার কিছু মাত্র ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায় না। তথাপি বাংলার প্রাচীন সাহিত্যে নৃত্যের যে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ইহার মধ্যে পুরুষেরও যে একটি প্রধান অংশ আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তাহা লোক-নৃত্যের ক্ষেত্রে নহে, প্রাচীন পদ্ধতির (classical) নৃত্যের ক্ষেত্রেই প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ, মনসা-মঙ্গলে বেহুলার নৃত্যগুণের কথা ব্যাপক-ভাবে উল্লেখিত থাকিলেও শিবনৃত্যের বর্ণনাও রহিয়াছে। 'বৌদ্ধগান ও দোহা'র মধ্যে যেমন ডোম্‌নীর নৃত্য করিবার উল্লেখ আছে, যথা—

একসো পদমা চৌষঠ্ঠি পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী॥

অর্থাৎ এক সেই পদ্ম, তাহার চৌষট্টি পাপড়ি, তাহাতে আরোহণ করিয়া ডোম্বী বা ডোম্‌নী নৃত্য করে, আবার তেমনি বাজিল বা বজ্রাচার্যপাদের নৃত্য করিবারও উল্লেখ দেখা যায়, যেমন—

নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।
বুদ্ধ নাটক বি সমা হোই॥

অর্থাৎ বাজিল বা বজ্রাচার্যপাদ নৃত্যে করেন, দেবী গীত গাহেন, বুদ্ধ নাটক সমাপ্ত হইল।

নাথ-সাহিত্যের মধ্যেও দেখা যায়, গোরক্ষনাথ মীননাথকে উদ্ধার করিতে আসিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে তিনি নর্তকীর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, পুরুষ বেশে নৃত্য করেন নাই।

নাচন্তি যে গোর্খনাথ ঘাগরের রোলে।
কায়া সাধ কায়া সাধ মাদলে হেন বোলে॥

মঙ্গলকাব্যে যে স্বর্গভ্রষ্ট নায়ক-নায়িকা চরিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে একজন স্বর্গের নর্তক, একজন নর্তকী, সুতরাং পুরুষ ও নারী এখানে সমান অংশ গ্রহণ কবিয়াছে। একটু গভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায়, মনসা-মঙ্গল কাব্যেব মধ্যে যে সকল প্রাচীন পদ্ধতির শিবনৃত্যের বর্ণনা আছে, তাহাও শিবেব একক নৃত্যেব বর্ণনা নহে, বরং সর্বত্রই যুগ্ম নৃত্যের বর্ণনা, অর্থাৎ শিব-পাবতী, শিব-মনসা ইঁহাদের যুগ্ম নৃত্য, তথাপি ইহাদের মধ্যে শিবের অংশই যে প্রধান, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

কিন্তু বাংলা দেশের প্রাচীন পদ্ধতির নৃত্য প্রসঙ্গ বাদ দিলে লোক-সমাজে যে নৃত্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাব মধ্যে নারীরই যে প্রাধান্য ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। বাংলায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত ব্রতনৃত্যের (ritual dance) মধ্যে নারীরই প্রধান স্থান। ব্রতনৃত্যের মধ্যে কেবলমাত্র গাজনের নৃত্যে পুরুষ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। ঐন্দ্রজালিক (magic) নৃত্যের মধ্যে পুরুষেরই স্থান, কিন্তু ইহাদের প্রয়োগ বর্তমানে এত হ্রাস পাইয়া গিয়াছে যে, তাহা আর উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত যে সকল

নৃত্য যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, যেমন বীরভূম জেলার ঢালী, রায়বেঁশে কিংবা পশ্চিম বাংলার সীমান্তবর্তী অন্যান্য অঞ্চলের পাইক নৃত্য, কাঠিনৃত্য ইহাদের প্রত্যেকটিই পুরুষের নৃত্য। একথা নিতান্তই স্বাভাবিক, যুদ্ধনৃত্য মাত্রই পুরুষেরই নৃত্য; কোন ভাবেই ইহাদের মধ্যে নারী অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। আসামের ইন্দো-মোঙ্গলয়েড্ জাতির মধ্যে সামাজিক জীবনের অন্যান্য আচরণে নারী প্রাধান্য লাভ করিলেও যুদ্ধনৃত্যে তাহার প্রবেশাধিকার নাই। এমন কি, নরমুণ্ড-শিকারী (head-hunter) নাগা জাতির মধ্যে নারী জাতিও নরমুণ্ডশিকারে অংশ গ্রহণ করা সত্ত্বেও যুদ্ধনৃত্যে কোনদিক দিয়াই তাহারা অংশ গ্রহণ করে না। পশ্চিম বাংলার অন্তর্ভুক্ত রাঢ় অঞ্চলের জাতীয় সাহিত্য ধর্মমঙ্গল কাব্যেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই অঞ্চলের সকল শ্রেণীর নারীই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিত, কিন্তু যুদ্ধ সম্পর্কিত নৃত্য বিষয়ে তাহাদের কিছুমাত্র অধিকার ছিল বলিয়া মনে হয় না। তবে পশ্চিম বাংলার একটি নৃত্যের মধ্যে নারী কোনদিন যুদ্ধনৃত্যে অংশ গ্রহণ করিত বলিয়া ক্ষীণতম একটু আভাস পাওয়া যায়। কারণ, একথা সত্য, যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে পারিলে যুদ্ধনৃত্যে অংশ গ্রহণ করিবার পক্ষে কোন বাধা থাকিতে পারে না। সেইজন্য মনে হইতে পারে যে, সম্ভবতঃ রাঢ় অঞ্চলের নারীর একদিন যুদ্ধনৃত্যেও অংশ গ্রহণ করা অসম্ভব ছিল না।

বীরভূম অঞ্চলে প্রচলিত ভাঁজো নৃত্য তাহার একটি নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইতে পারে। অনেক নৃত্য এবং ক্রীড়া (game) যে প্রাচীনতর সমাজ-জীবন হইতে আগত যুদ্ধকার্যের অবশেষ (remnant), তাহা অনেকেই মনে করিয়া থাকেন। ভাঁজো নৃত্যের মধ্যেও তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে একদল যুবক ও একদল যুবতী সারিবদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়ায়, তারপর এক একটি দল এক একবার করিয়া সম্মুখের দিকে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া অন্য দলকে 'আক্রমণ' করে। আক্রান্ত দল নৃত্য করিতে করিতে পশ্চাদপসরণ করে এবং পুনরায় সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া 'আক্রমণকারী' দলকে 'আক্রমণ' করে। ভাঁজোর বালি আনয়ন উপলক্ষে বালির স্তূপ অধিকার লইয়া এই কপট যুদ্ধ (mock fight) অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কপট যুদ্ধই অনেক সময় নৃত্যের রূপ লাভ করে, এখানেও তাহাই হয়। এই নৃত্য যদি কোন গোষ্ঠী-সংগ্রাম (community fight)-এরই অবশেষ হইয়া থাকে, তবে একথাও মনে করিতে হইবে যে,

প্রাচীনকালে অন্ততঃ রাঢ় অঞ্চলে নারীও যুদ্ধকার্যে যোগদান করিত। পূর্ব বাংলার কৃষিসঙ্গীতে শুনিতে পাওয়া যায় যে, একদিন নারী স্বহস্তে ধনুর্বাণ লইয়া সেই অঞ্চলে শস্যনাশকারী হস্তী ও ব্যাঘ্র শিকারে যোগ করিত। সুতরাং কৃষিজীবী সমাজে নারী যুদ্ধকার্যে যোগদান করিবে, তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছু নাই। কারণ, কৃষিজীবী সমাজে গৃহের কর্ত্রী নারী, বিশেষতঃ সেই সমাজ মাতৃতান্ত্রিক (matriarchal) হইয়া থাকে, সুতরাং পরিবার ও গৃহ-সম্পত্তি রক্ষা করিবার সকল দায়িত্বই নারীর উপর ন্যস্ত থাকে। সেই গৃহ-সম্পত্তির উপর বাহির হইতে যখন কোন আক্রমণ হয়, তখন সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য নারীকেই প্রথম অগ্রসর হইয়া যাইবার প্রয়োজন হয়, সুতরাং যাযাবর সমাজে নারী যেমন পুরুষ কর্তৃক রক্ষিত হয়, কৃষিজীবী সমাজে নারীরই নারীকে রক্ষা করিবার প্রয়োজন হয়। সেইজন্য যুদ্ধকার্যও তাহার সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং যদিও আজ প্রত্যক্ষভাবে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, যাহাতে মনে হইতে পারে যে, বাংলার সমাজেও নারী একদিন যুদ্ধনৃত্যে যোগদান করিত, তথাপি পরোক্ষ প্রমাণ দ্বারা স্বীকৃত হইতে পারে যে, ইহা একেবারে অসম্ভব ছিল না।

বর্তমানে যতদূর দেখিতে পাওয়া যায়, পশ্চিম বাংলার ঢালী, কাঠি, রায়বেঁশে, পাইক প্রভৃতি যুদ্ধনৃত্য ব্যতীত পূর্ব মৈয়মনসিংহ অঞ্চলের জারি নৃত্যে কেবল পুরুষই অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে, ইহাদের মধ্যে নারীর কোন স্থান নাই। কিন্তু পূর্ব ময়মনসিংহের জারিনৃত্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ইহা মূলতঃ নারীরই নৃত্য ছিল, কালক্রমে সেই অঞ্চলে মুসলমান ধর্ম বিস্তার লাভ করিবার পর মুসলমান সমাজে নারীর প্রকাশ্য নৃত্যের অধিকার খর্ব হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা পুরুষ কর্তৃকই গৃহীত হইয়াছে। কারণ, জারি-নৃত্যকালীন পুরুষ অনেকটা নারীর মত অভিনয় করিয়া থাকে। যেমন পায়ে নূপুর পরিয়া, কাঁধের গামছাটি হাতে লইয়া আঁচলের মত করিয়া দুলাইতে থাকে। ইহার কাহিনী কারবালার যুদ্ধের কাহিনী, কিন্তু যুদ্ধের কাহিনী হইলেও ইহা করুণরস প্রধান এবং এই করুণরস স্ত্রীচরিত্রসুলভ। সুতরাং সকল দিক হইতেই মনে হইতে পারে যে, এখানে পুরুষ সামাজিক জীবনের আদর্শের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারীর একটি আচরণ গ্রহণ করিয়াছে। বাংলার লোক-নৃত্যের ইতিহাসে এই প্রকার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তুর্কী আক্রমণের পর হইতেই

বাংলার বৃহত্তর সামাজিক জীবনে যে বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিয়াছিল, তাহা অনুসরণ করিয়াই বাংলার লোক-নৃত্যের ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন হইয়াছিল। নারীর অধিকার ইহার মধ্যে একদিক দিয়া সঙ্কুচিত হইল, কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষ নারীর অনুকরণ করিতে লাগিল, আবার অন্যদিক দিয়া কোন কোন অঞ্চলে ইহা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল। নৃত্য ও সঙ্গীত মুসলমান ধর্মবিরোধী আচরণ, বিশেষতঃ তুর্কী আক্রমণের ফলে বিপর্যস্ত বাঙ্গালী সমাজের অসহায় অবস্থার মধ্যে নানা কারণেই নারীর নৃত্য আর অধিককাল স্থায়ী হইতে পারিল না। কোন কোন প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাগ্রন্থে দেখা যায়, নৃত্য এক শ্রেণীর নারীর ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছিল এবং ব্যবসায়ী নর্তকী বলিয়া একটি সম্প্রদায়ও গড়িয়া উঠিয়াছিল, নূতন সমাজব্যবস্থার সম্মুখীন হইয়া তাহাদেরও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবার উপক্রম করিল; সমগ্র সমাজের সহানুভূতিহীন দৃষ্টির মধ্যেও তাহা যতটুকু বাঁচিয়া রহিল, তাহার মধ্য দিয়া তাহা কোন প্রকার শিল্পসম্মত উচ্চতর রূপ লাভ করিতে পারিল না, ক্রমে ক্রমে তাহা বিনাশের পথই প্রশস্ত করিয়া লইল।

যে সকল অঞ্চলে হিন্দু কিংবা মুসলমান ধর্মের প্রভাব কিংবা দীর্ঘকালব্যাপী পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব তেমন সক্রিয় হইতে পারে নাই, কেবলমাত্র সেই সকল অঞ্চলে বাংলার লোক-নৃত্যের প্রাচীনতম পরিচয় কিছু কিছু রক্ষা পাইয়াছে। অথচ হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায় দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই, এমন অঞ্চল বাংলা দেশে খুব অল্পই আছে। উত্তরবঙ্গের ইন্দো-মোঙ্গলয়েড জাতির শাখাভুক্ত কোচ ও রাজবংশী জাতির কথা এই বিষয়ে উল্লেখ করা যায়। তাহাদের মধ্যেও স্বভাবতঃই দেখা যায়, নারী নৃত্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, পুরুষের স্থান সেখানে নিতান্ত সঙ্কুচিত।

চার

সারি ও একক নৃত্য

লোক-নৃত্যকে সাধারণতঃ দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন সারি নৃত্য ও একক নৃত্য। ইংরেজি 'গ্রুপ ডান্স' (group dance) কথাটিকেই সারি নৃত্য বলিয়া বাংলায় উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার মধ্যে কতকটা অস্পষ্টতা থাকিয়া যায়। সারি নৃত্য বলিলেই হয়ত কেহ সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া বহু সংখ্যক নরনারীর নৃত্য মনে করিতে পারেন, কিন্তু ইংরেজি 'গ্রুপ ডান্স' কথার অর্থ তাহা নহে, ইহাতে সারিবদ্ধ ভাবে না দাঁড়াইয়াও অর্থাৎ এলোমেলো দাঁড়াইয়া ক্ষুদ্র জনতার যে নৃত্য, তাহা বুঝাইতে পারে। বাংলায় এই ভাবটি গোষ্ঠীনৃত্য শব্দ দ্বারাও প্রকাশ করা যাইতে পারে। কিন্তু গোষ্ঠীনৃত্য কথাটি বাংলায় অপরিচিত, বরং সমবেত কণ্ঠে যে লোক-সঙ্গীত গীত হয়, তাহা সারি গান বলিয়া পরিচিত, সুতরাং এই সূত্রে এই অর্থে নৃত্য কথাটি ব্যবহার করা যায়। ইংরেজী 'সোলো ডান্স' (solo dance) শব্দটিকেই একক নৃত্য বলিয়া বাংলায় অভিহিত করা যায়, ইহার অর্থ পরিগ্রহ করিতে কোন বেগ পাইতে হয় না।

গভীরভাবে অনুশীলন করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, গোষ্ঠী বা সারি নৃত্যই সমাজে প্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল, ক্রমে সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির প্রতিভাও যখন সমাজে স্বীকৃতি লাভ করিতে আরম্ভ করিল, তখনই প্রকৃতপক্ষে একক নৃত্যের প্রচলন আরম্ভ হইল। একথা অনেকেই মনে করিয়া থাকেন যে, সাংস্কৃতিক সকল উপকরণ প্রথমতঃ গোষ্ঠীজীবন হইতে সামগ্রিক ভাবেই বিকাশ লাভ করিয়াছে। এইভাবে লোক-সাহিত্যও যেমন গোষ্ঠীরই সৃষ্টি, লোক-নৃত্যও তেমনই গোষ্ঠীগত ভাবেই উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, নৃত্যের সম্পর্কে এ কথা সকল সময় বলা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে আদিম সমাজের পুরোহিত বা ওঝাগণ অনেক সময় যে নৃত্যের অনুষ্ঠান করিত, তাহা অনেক সময়ই একক নৃত্যই ছিল, তাহা সারি নৃত্য ছিল না অথচ ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্যই আদিম সমাজে নৃত্যের প্রথম প্রচলন

হইয়াছিল বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। এই উভয় মতবাদের পক্ষে এবং বিপক্ষে সমান যুক্তি আছে, সুতরাং এ বিষয়ে কোন মতবাদই চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। তবে একথা সত্য, ঐন্দ্রজালিক (magical) ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিবার জন্য যে সকল নৃত্যের আজ পর্যন্তও সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাদের প্রত্যেকটিই যে একক নৃত্য, তাহা নহে। এমন কি, উত্তর বঙ্গ অঞ্চলের কোচ কৃষক রমণীদিগের মধ্যেও অনাবৃষ্টি দূর করিবার উদ্দেশ্যে 'হুদুম দেও' নামক দেবতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য যে নৃত্য প্রচলিত ছিল, তাহা সমবেত অর্থাৎ সারি নৃত্য, ব্যক্তিবিশেষের একক নৃত্য নহে। যশোহরের পল্লী অঞ্চলে প্রচলিত শীতলা কিংবা গুজরাটের গরবা নৃত্যেরও যে ঐন্দ্রজালিক উদ্দেশ্য আছে, তাহা সত্য। ইহাদের প্রত্যেকটিই সমবেত নৃত্য। তবে যে সমাজে ওঝার প্রভাব যত বেশী, সেই সমাজেই একক নৃত্যের প্রভাব তত বেশী। আদিম সমাজেও ওঝার প্রভাব-বহির্ভূত ক্ষেত্রে একক নৃত্য অপেক্ষা সারি নৃত্যের প্রভাবই অধিক অনুভূত হয়।

একক নৃত্য কেবলমাত্র যেমন ওঝা শ্রেণীর পুরুষের হইতে পারে, তেমনই কেবলমাত্র নারীরও হইতে পারে। ইহার কারণ, নারীও ওঝার স্থান গ্রহণ করিতে পারে। উড়িষ্যার কোরাপুট জেলার গুণুপুর তালুকের অধিবাসী আদিম জাতির মধ্যে নারীই ওঝার কাজ গ্রহণ করিয়া একক ঐন্দ্রজালিক (magical) নৃত্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসী গারো ও খাসি জাতির মধ্যেও এই প্রথার অস্তিত্ব আছে। আদিম কৃষিজীবী সমাজে নারীরই কর্তৃত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেই সূত্রে মনে হয়, বাংলাদেশেরও সাংস্কৃতিক জীবনের ভিত্তিমূলে নারীর একটি বিশেষ অধিকার স্বীকৃত হইত, তাহার ফলে নারী ওঝার কিংবা পুরোহিতের স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। সেই সূত্রে নারীর একক ঐন্দ্রজালিক নৃত্যও এদেশে অপ্রচলিত ছিল না। এখন বাংলার সমাজ-জীবনের মধ্যে ইহার পরিচয় নানাভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ওঝা কিংবা আদিম সমাজের পুরোহিতের ঐন্দ্রজালিক নৃত্য ক্রমে ইহার অলৌকিক লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া প্রত্যেক সমাজেই অলৌকিক উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ কেবলমাত্র আনন্দদায়ক (secular) অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। বাংলাদেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

সারি নৃত্যের মধ্যে কেমলমাত্র পুরুষের যেমন সারি নৃত্য হইতে পারে,

তেমনই কেবলমাত্র নারীরও সারি নৃত্য হইতে পারে, পুরুষ ও নারীর সমবেত মিশ্র (mixed) নৃত্যও হইতে পারে।

সারি নৃত্যের মধ্যে মিশ্র সারি নৃত্যই সবপ্রথম উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে , কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়াও কিছুই অসম্ভব নহে। ঐন্দ্রজালিক চেতনা হইতেই যদি নৃত্যের উদ্ভব হইয়া থাকে, তবে সারি নৃত্যও তাহা হইতেই উদ্ভূত বলিয়া মনে হইতে পারে। যদি তাহাই হয়, তবে নৃত্যের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য প্রথম হইতেই রক্ষা হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং পুরুষের সারি নৃত্য এবং নারীর সারি নৃত্য, তাহাও যে পরস্পর স্বাধীনভাবে উদ্ভূত হইয়াছে এবং ক্রমে সমাজ-জীবনের ক্রমবিকাশের ধারায় যখন নারী ও পুরুষের সবক্ষেত্রে সমান অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে, তখনই মিশ্র নৃত্যের প্রচলন হইয়াছে, তাহা মনে হইতে পারে। সর্ববিধ সামাজিক অনুষ্ঠানে নারীর সহজভাবে পুরুষের সঙ্গে যোগদানের নিদর্শন কেবলমাত্র কতকটা অগ্রসর সমাজেই সম্ভব হইয়াছে, আদিতম সমাজে তাহা সম্ভব হয় নাই। সেইজন্য এখন পযন্ত ভারতবর্ষেও যে সকল আদিবাসী সমাজ প্রাচীনতর সমাজ-জীবনের ধারা অনুসরণ করিয়া চলিতেছে, তাহাদের মধ্যে মিশ্র সারি নৃত্যের প্রচলন দেখা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, আসামের আদিম নাগা সমাজে মিশ্র সারি নৃত্য নাই, অথচ মণিপুরী সমাজে তাহা আছে। আদিম নাগাজাতি তাহাদের উপজাতীয় ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে বলিয়াই সেখানে মিশ্র সারি নৃত্যের প্রচলন সম্ভব হয় নাই , কিন্তু মণিপুরী সমাজ আদিম নাগা জাগিতরই একটি শাখা হওয়া সত্ত্বেও ব্রহ্মদেশীয় সাংস্কৃতিক জীবনের প্রভাববশতঃই হউক, কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, দীর্ঘকাল ধরিরাই মিশ্র সারি নৃত্যের অনুষ্ঠান করিতেছে। কিন্তু বর্তমানে ইহার উপর নানাদিক হইতে পাশ্চাত্ত্য ও বৃহত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব স্থাপিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার ফলে দেখা যাইতেছে, তাহাতে পুনরায় মিশ্র সারি নৃত্যের প্রভাব লুপ্ত হইতেছে। এমন কি, সুপ্রসিদ্ধ মণিপুরী রাস নৃত্যের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় বর্তমানে যে নৃত্য করিয়া থাকে, সেও পুরুষবেশী নারীই হইয়া থাকে। ইহা নাগাজাতির আদিম সংস্কারের প্রভাবজাত নহে, বরং স্বতন্ত্র এক সংস্কৃতির প্রভাবের ফল বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। ছোটনাগপুর ও মধ্যভারতের অধিবাসী প্রায়

কোন উপজাতির মধ্যেই মিশ্র সারি নৃত্য আজও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা পাশ্চাত্ত্য কিংবা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব জাত নহে, বরং মৌলিক আদিম সংস্কৃতিরই প্রভাবজাত। কারণ, এখনও এই অঞ্চলে নৃত্যের একটা সামাজিক আচারগত (ritual) মূল্য সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয় না। প্রত্যেক নৃত্যের সঙ্গেই এক একটি আচারগত উদ্দেশ্য জড়িত হইয়া থাকে, কোনদিক দিয়া নূতন কোন উপকরণ কিংবা আঙ্গিক ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে ইহার আচারগত উদ্দেশ্য সার্থক হয় না, এই বিশ্বাস হইতেই আদিবাসীর জীবনে দীর্ঘকাল ধরিয়া নৃত্যের রূপ কিংবা প্রয়োগ-পদ্ধতির শৈথিল্য দেখা দিতে পারে নাই। কেবলমাত্র বর্তমান ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে এই সকল অরণ্যচারী আদিবাসী যখন রাজধানীতে নিমন্ত্রিত হইয়া নৃত্যানুষ্ঠান দেখাইতে বাধ্য হয়, তখন তাহাদের রূপ এবং আঙ্গিকে পরিবর্তন দেখা যায় ; সুতরাং তাহা আদিবাসীর নৃত্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। আদিবাসী কিংবা লোক-নৃত্য মাত্রই সমাজ-জীবনে অন্তর্নিবিষ্ট (integrated) হইয়া থাকে, সেই সমাজ কিংবা তাহার আচারনিরপেক্ষ তাহার কোন মূল্য নাই ; সামগ্রিক ভাবে সমাজ-দেহেই তাহাদের যথার্থ রূপ পরিস্ফুট হয় ; সুতরাং তাহার মধ্যেই ইহাদের মূল্য বিচার করিবার প্রয়োজন হয়।

বাংলার লোক-নৃত্যের মধ্যেও স্ত্রীপুরুষের মিশ্র সারিনৃত্য নাই। ইহা যে সর্বত্রই হিন্দু-মুসলমান কিংবা ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবের ফল, তাহা নহে। অনেক সময়ই ইহা আদিম সমাজ-জীবনের সাংস্কৃতিক প্রভাবেরই ফল। এই উপলক্ষে বাংলার ভাজো নৃত্যের উল্লেখ করা যায়। বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় এই নৃত্য প্রচলিত আছে, তাহার বিশেষত্ব এই যে স্ত্রী পুরুষ মিলিয়া এই নৃত্যের অনুষ্ঠান করিলেও, তাহা মিশ্র সারি নৃত্য বা mixed dance বলিতে যাহা বুঝায়, ইহা তাহা নহে। কারণ, পুরুষ এবং নারী ইহাতে দুইটি স্বতন্ত্র সারিতে বিভক্ত হইয়া পরস্পর মুখোমুখী হইয়া দাঁড়ায়, একদল নৃত্য করিয়া কিছুদূর আগাইয়া যায়, তারপর নৃত্য করিতে করিতে পিছু হটিয়া আসে, তখন আর এক দল অনুরূপ ভাবে নৃত্য করিতে করিতে প্রথমতঃ আগাইয়া যায়, তারপর পিছাইয়া আসে, ইহাতে পুরুষ এবং নারী পরস্পরকে স্পর্শ করে না। ছোট-নাগপুর এবং মধ্য প্রদেশের সমগ্র আদিবাসী অঞ্চলের নৃত্যই প্রায় এই রূপ। তাহাতে প্রায় কোথাও নৃত্যকালীন পুরুষ নারী কিংবা নারী পুরুষকে স্পর্শ

করিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মণিপুরী লোক-নৃত্যের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় যে, পুরুষ এবং নারী পরস্পর হাত ধরিয়া কিংবা হাত দ্বারা কটি বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিয়া থাকে। ইহা আদিম সমাজের প্রভাবের পরিবর্তে কোনও অগ্রসর সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রভাবের ফল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বাংলায় এই শ্রেণীর লোক-নৃত্য নাই বলিলেই চলে।

উচ্চতর সমাজের কিংবা প্রাচীন পদ্ধতির (classical) নৃত্যের মধ্যে নারীর একক নৃত্যের যে পরিমাণ সন্ধান পাওয়া যায়, লোক-নৃত্যের মধ্যে তাহা সেই পরিমাণে সন্ধান লাভ করা যায় না। যে সমাজে নারী পণ্যের সামগ্রী, সেই সমাজেই নারীর একক নৃত্যের প্রাধান্য। কিন্তু লোক-সমাজে নারী পুরুষের কেবলমাত্র বিলাস কিংবা পণ্যের সামগ্রী নহে, সেখানে তাহার বিশেষ একটি সামাজিক অধিকার আছে, সেখানে পুরুষের সঙ্গে সে সমান অধিকার ভোগ করিয়া থাকে, তাহার ব্যক্তিজীবন সামগ্রিক সমাজ-জীবনের অন্তর্নিবিষ্ট। এক কথায় বলিতে গেলে, লোক-সংস্কৃতির সকল উপকরণই যেমন সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি, লোক-নৃত্যও সামগ্রিক অনুষ্ঠান। তবে ওঝা কিংবা প্রাচীন পদ্ধতির পুরোহিত শ্রেণীর লোকের ঐন্দ্রজালিক নৃত্যানুষ্ঠান (magical dance)-কে যদি স্বতন্ত্র ঐন্দ্রজালিক নৃত্য বলিয়া গণ্য না করিয়া লোক-নৃত্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা যায়, তবে তাহাই একমাত্র একক লোক-নৃত্যের নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, সে কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।

তবে বাংলা দেশের কোন কোন অঞ্চলে বালিকাবেশী বালকের যে একক নৃত্যানুষ্ঠান এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নারীর একক নৃত্যানুষ্ঠানের একটি আধুনিক রূপ বলিয়াই মনে হয়। এই সম্পর্কে পূর্ব বাংলার ঘাটু নৃত্যের কথাই সর্বাগ্রে মনে হয়। বর্তমান হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের প্রভাববশতঃ নারীর পরিবর্তে নারীবেশী পুরুষ এই নৃত্যানুষ্ঠান করিলেও এই নৃত্যের বহির্মুখী রূপ ও প্রয়োগ পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা পূর্বে নারীরই নৃত্য ছিল, এখন সামাজিক কারণে নারী প্রকাশ্য নৃত্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া নারীবেশী পুরুষই এই নৃত্য সম্পন্ন করিতেছে। ইহা মূলতঃ যে একক নৃত্যই ছিল, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। ইহা একক নৃত্য হওয়া সত্ত্বেও লোক-নৃত্য। যে সকল গুণে একক সঙ্গীতও লোক-সঙ্গীত হইয়া

থাকে, ইহাও সেই সকল গুণবশতঃই একক নৃত্য হইয়াও লোক-নৃত্য। সমাজের বিশিষ্ট নৃত্যগুণসম্পন্না কোন নারী যদি তাঁহার নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া সামাজিক বিশিষ্ট কোন রস কিংবা অধ্যাত্মচেতনার অভিব্যক্তি করিয়া থাকে, তবে তাহা সেই সমাজের লোক-নৃত্যেরই অন্তর্ভুক্ত হইবে। ঘাটু নৃত্যের এই বিশিষ্ট গুণটি আছে। পরে তাহা আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইবে। একক ঐন্দ্রজালিক নৃত্য (magical dance) হইতেই কালক্রমে একক নারী কিংবা পুরুষের অলৌকিকতা নিরপেক্ষ বা secular নৃত্যের উদ্ভব হইয়াছে, এ কথাই যদি স্বীকার করা যায়, তবে এই একক ঘাটু নৃত্যও যে মূলতঃ কোন ঐন্দ্রজালিক নৃত্য ছিল, তাহাই স্বীকার করিতে হয়।

কাছাড কিংবা শ্রীহট্ট জিলার কোন কোন অংশে এবং বীরভুম জিলার কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে 'বউ নাচ' (bridal dance) নামক নৃত্যের প্রচলন আছে, তাহাও নারীর বা নববিবাহিতা বধূর একক নৃত্য। এ কথা হয়ত অনেকে জানেন যে, কাছাড, শ্রীহট্ট, বীরভূম এবং উডিষ্যার কোন কোন অঞ্চলে 'বউ নাচ' নামক এক নৃত্যানুষ্ঠানের প্রচলন আছে। তাহাতে নববধূ গৃহে আসিলে একদিন গ্রামবাসী আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁহার নৃত্য দর্শন করিয়া থাকে , বধূব আর কোন গুণ পরীক্ষা হয় না, গ্রামবাসীর নিকট কেবলমাত্র তাহার নৃত্যের পরীক্ষা হইয়া থাকে। অবগুণ্ঠণাবৃত মুখে বধূ নৃত্য করিয়া সমবেত গ্রামবাসীকে পবিতুষ্ট করিয়া থাকে। ইহাও নারীর একক নৃত্য। উপরে যে ঘাটুনৃত্যের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহার সঙ্গে ইহার প্রকারগত কিছু পার্থক্য আছে , সুতরাং উভয়েই এক সূত্র হইতে আগত, তাহা বলিতে পারা যায় না। সুতরাং দেখা যায়, লোক-সমাজের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে নৃত্যের একক সাধনাও দেখা যাইত। কন্যাকে নৃত্যগুণ-দ্বারা শ্বশুর গৃহে গিয়া সকলকে তুষ্ট করিতে হইত বলিয়া মাতাপিতা তাহাকে একক ভাবেও নৃত্য শিক্ষা দিতেন। সুতরাং একক নৃত্যেরও সেদিন যে অনুশীলন না হইত, তাহা নহে। অথচ এই সকল একক নৃত্য লোক-নৃত্যের বৈশিষ্ট্য কোন দিন অতিক্রম করিয়া যাইত না , কারণ, একক সাধনার বিষয় হইলেও তাহা গোষ্ঠীর সমর্থনের প্রয়োজন হইত, ইহাই লোক-সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বাউল নৃত্য পুরুষের একক নৃত্য। ইহার সঙ্গে ধর্মীয় সাধন-ভজনের

অলৌকিক সম্পর্ক জড়িত আছে বলিয়া সাধারণভাবে ইহা ঐন্দ্রজালিক নৃত্য (magical dance) হইতেই যে উদ্ভূত, তাহা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। লোক-নৃত্য যেমন বৃহত্তর সামাজিক কিংবা সামগ্রিক কোন উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, বাউল নৃত্য তাহা হয় না। সেইজন্য ইহাকে যথার্থ লোক-নৃত্যের পর্যায়ভুক্ত করা সঙ্গত নহে। এমন কি, ঐন্দ্রজালিক নৃত্য বা (magical dance)-এর একটি বৃহত্তর সামাজিক পটভূমিকা থাকে , কিন্তু বাউল নৃত্য বাউলের ব্যক্তিগত সাধন ভজনের অঙ্গ মাত্র, বৃহত্তর সামাজিক পটভূমিকা ইহার নাই। সমাজের প্রয়োজনে যেমন অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি ইত্যাদি দূর করিবার জন্য ঐন্দ্রজালিক নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়, বাউলের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক কল্যাণে তেমনই বাউলের নৃত্য ও সঙ্গীত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং বাউল গানকে যেমন লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দাবী করা যায় না, তেমনই বাউল নৃত্যও প্রকৃত লোক-নৃত্য নহে। তবে একথা সত্য, বাউল সঙ্গীত, লোক-সঙ্গীত না হইলেও লোক-সঙ্গীত বচনার বহির্মুখী লৌকিক আঙ্গিক যেমন তাহাতে অনুসরণ করা হইয়া থাকে, তেমনই বাউল নৃত্যের মধ্যেও বাংলার লোক-নৃত্যের প্রয়োগ রীতি ব্যবহৃত হয়। সেইজন্য দৃশ্যতঃ ইহার সঙ্গে বাংলার কোন কোন একক লোক-নৃত্যের ঐক্য অনুভব করা যায়। কিন্তু লোক-নৃত্যের যে প্রধান বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ সামগ্রিক ভাবে লোক-মানস হইতে উদ্ভব হইবার আবশ্যকতা, তাহা ইহার নাই।

সংকীর্তন বাংলার সারি বা সমবেত সঙ্গীতেব অন্তর্ভুক্ত হইলেও ইহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নৃত্য সারি নৃত্য নহে, বরং একক নৃত্য। বহু সংখ্যক ব্যক্তি একসঙ্গে নৃত্য করিলেই যে তাহা সারি নৃত্য হয়, তাহা নহে , বাংলার সংকীর্তন নৃত্যই তাহার প্রমাণ। সংকীর্তন নৃত্যে একাধিক অংশ গ্রহণকারী থাকিলেও তাহাতে সারিবদ্ধ ভাবে নৃত্য করা হয় না, যে যাহার ইচ্ছামত নৃত্য করিয়া থাকে। অবশ্য নৃত্যে যে তাল রক্ষা করা হয় না, তাহা নহে, তবে অঙ্গ কিংবা পদ-সঞ্চালনে ইহাতে কোন সুনির্দিষ্ট ধারা নাই, যে যাহার ব্যক্তিগত (individual) তাল-বোধ অনুসারে পদক্ষেপ ও অঙ্গ-সঞ্চালন কবিয়া থাকে। সুতরাং ইহাও একক নৃত্যেরই অন্তর্গত বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়। কোন কোন আদিবাসীর মধ্যে এই শ্রেণীর নৃত্যের আজিও সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, উড়িষ্যার কোরাপুট জিলার গুণুপুর

তালুকের অধিবাসী শবর, শেওরা বা শোরা নামক উপজাতির মধ্যে এই শ্রেণীর নৃত্যের আজিও প্রচলন আছে। প্রধানতঃ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কিংবা গ্রাম্য অন্যান্য কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে ঢাকের তালে তালে গ্রামবাসী গ্রামের পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কিংবা উৎসব ক্ষেত্রে সমবেত হইয়া যে নৃত্য করিয়া থাকে, তাহা অনেকটা বাংলাদেশের সংকীর্তন নৃত্যের অনুরূপ। ইহাতে সমবেত সমগ্র নৃত্যপর জনতা যে যাহার ইচ্ছামত যে শুধু পদক্ষেপ কিংবা অঙ্গ-সঞ্চালনই করিয়া থাকে, তাহা নহে, যে যাহার ইচ্ছামত বেশও ধারণ করিয়া থাকে। এই সকল নৃত্যে ব্যক্তিগত ভাবে কেহ কেহ বিশেষ দক্ষতা দেখাইলেও, তাহা সমগ্র বিশৃঙ্খল জনতার অঙ্গ স্বরূপ হইয়া থাকে বলিয়া বিশেষ দর্শনীয় বলিয়া মনে হইতে পারে না। নৃত্যের ইহাতে কোন শোভা প্রকাশ পায় না, শৃঙ্খলাই সৌন্দর্য, যেখানে শৃঙ্খলার অভাব, সেখানেই কদর্যতা। এই শ্রেণীর নৃত্যের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা নাই। কেহ হাতে টাঙ্গি লইয়া, কেহ বা লাঠি লইয়া, কেহ একটি গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া তাহাই শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করিতে করিতে এই নৃত্য করিয়া থাকে। সংকীর্তন নৃত্যেও কেহ মৃদঙ্গ কাঁধে লইয়া, কেহ মন্দিরা বাজাইয়া, কেহ পতাকা বা ছত্র ধারণ করিয়াও নৃত্য করিয়া থাকে। ঢাকের কিংবা মৃদঙ্গের বাদ্যে তাল রক্ষা পাইলেও প্রত্যেকের বহির্মুখী আচরণ পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র (individual) বলিয়া তাহার ভিতর দিয়া কোন সৌন্দর্যের যথার্থ বিকাশ দেখা যায় না। বাংলা দেশেও সংকীর্তন নৃত্য যে একটি উল্লেখযোগ্য নৃত্য তাহা কেহই স্বীকার করিবেন না। কেবলমাত্র কোন কোন আদিবাসীর জীবনের মধ্যে অনুরূপ অনুষ্ঠানের প্রচলন দেখিতে পাইয়া, ইহা যে প্রকৃতই এক শ্রেণীর নৃত্য, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সংকীর্তন নৃত্য যে এক শ্রেণীর সারি (group) নৃত্য, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পশ্চিম বাংলার যে সকল অঞ্চলে বাংলা ভাষাভাষী কিংবা দোভাষী সাঁওতাল কিংবা অন্যান্য উপজাতির লোক বাস করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে যে ঝুমুর-নৃত্য প্রচলিত আছে, তাহাতে মেয়েরা সমবেত ভাবে সারিবদ্ধ হইয়া নৃত্য করিলেও, মাদল-বাদক একক ভাবে (individually) নৃত্য করিয়া থাকে। আদিবাসীর মধ্যে ইহা একক পুরুষ নৃত্যের একটি সুন্দর নিদর্শন। এই মাদল-বাদককে বাংলায় 'রসিক' বলিয়া উল্লেখ করা হয়। 'রসিকে'র

নৃত্যগুণ বর্ণনা করিয়া নৃত্যকারিণী আদিবাসী যুবতীগণ অনেক সঙ্গীত রচনা করিয়া থাকে। একটি নৃত্যের দলের জন্য একাধিক 'রসিক' থাকিতে পারে ; কিন্তু ইহাদের সংখ্যা একাধিক হইলেও ইহারা একসঙ্গে সমবেত বা সারি নৃত্য করিবে না, প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে (individually) নৃত্য করিবে। প্রত্যেকেরই অঙ্গভঙ্গি ও পদক্ষেপের রীতি স্বতন্ত্র, অথচ মাদলের বাদ্যের সঙ্গে নৃত্যের তাল রক্ষা পাইয়া থাকে। তবে আদিবাসী যুবতীরা যে ভাবে তাল রক্ষা করে, 'রসিকে'রা সেই ভাবে তাল রক্ষা করে না। যুবতীদের নৃত্যের মধ্য দিয়া একটু একঘেয়েমি সৃষ্টি হইলেও, রসিকদিগের একক নৃত্যের মধ্য দিয়া সেই ভাব অনেকটা দূর হইয়া যায়।

'রসিক'দিগকে উদ্দেশ্য করিয়া ধানবাদ জিলার তোপচাঁচি অঞ্চলের বাংলা-ভাষাভাষী সাঁওতাল যুবতীরা এইপ্রকার গান গায়—

সারাদিন সারারাত,
বাজালি, রে রসিক।
এখন বলে যাব যাব,
কোন পথে পালাবি রে, রসিক,
মাঝকুলি আছে জিঞ্জিরি।

অর্থাৎ হে রসিক, সারাদিন সারারাত তুই (মাদল) বাজাইলি, এখন যাব যাব বলিতেছিস্। কোন পথ দিয়া তুই পলাইবি, মাঝপথে শিকল আছে।

এই সঙ্গীতকালীন আদিবাসী যুবতীরা পরস্পর হাত ধরাধরি ও কটি বেষ্টন করিয়া অর্ধ বৃত্তাকারে নাচিতে নাচিতে একবার কয়েক পাদক্ষেপ আগাইয়া আসে এবং আর একবার যখন কয়েক পাদক্ষেপ পিছাইয়া যাইতে থাকে, তখন তাহাদের সম্মুখে নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী সহকারে একক নৃত্য করিয়া 'রসিক' তাহাদের উৎসাহ বর্ধন করিতে থাকে। নৃত্যেব সঙ্গে সঙ্গে রসিক মাদল বাজাইতে থাকে। তাহার নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে যদি কেহ বাঁশী বাজায়, তবে তাহাকে নৃত্য করিতে দেখা যায় না।

পাঁচ

ব্রতনৃত্য

মেয়েলী ব্রত (ritual worship) ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ারই (magic) লৌকিক রূপান্তর মাত্র। ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া আদিম সমাজে প্রধানতঃ একজন ব্যক্তিই অনুষ্ঠান করিত, সে-ই সমাজের পুরোহিত বা ওঝা (exorcist) নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু মেয়েলী ব্রতনৃত্যের মধ্যে গোপনীয়তা (mysticism) কিছুই থাকে না। ইহা প্রকাশ্যে যেমন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তেমনই পরিবারের যে কোন এক বা একাধিক মহিলাই তাহাতে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। ঐন্দ্রজালিক নৃত্য অনেক সময় গোপনে অনুষ্ঠেয় এবং ইহার মধ্য দিয়া একটু রহস্যময়তার ভাব (mysticism) প্রকাশ পায়। ব্রত একটি সামাজিক আচারানুষ্ঠান, সেই সূত্রে ব্রতের সম্পর্কযুক্ত নৃত্যও একটি সামাজিক আচারানুষ্ঠান। যথেচ্ছভাবে ইহার অনুষ্ঠান হয় না, ইহার জন্য যে সময় নির্দিষ্ট থাকে, তাহা ব্যতীত ইহার অনুষ্ঠান হইতে পারে না।

বাংলাদেশে প্রচলিত মেয়েলী ব্রতের মধ্যে তিনটি ভাগ প্রধান :—প্রথমত কুমারী মেয়েদের ব্রত, তাহাতে বিবাহিতা নারীরা অংশ গ্রহণ করিতে পারে না, তারপর বিবাহিতা নারীগণের ব্রত, তাহাতে কুমারী কিংবা বিধবাগণ অংশগ্রহণ করিতে পারে না, এবং তৃতীয়তঃ এক শ্রেণীর ব্রত যাহাতে সকল শ্রেণীর নারীই অংশ গ্রহণ করিতে পারে। এই বিভিন্ন প্রকৃতির ব্রতগুলি গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ইহাদের প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গেই কোন না কোন ভাবে নৃত্যের সম্পর্ক একদিন ছিল। মধ্যযুগের সমাজে অধিকাংশ নৃত্যই ধর্ম এবং আচার জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল, বিশেষতঃ স্ত্রীসমাজের কোন নৃত্যই সামাজিক আচার বহির্ভূত ছিল না। মেয়েলী ব্রতের পুরোহিত মেয়েরা নিজেরাই, পুরুষ পুরোহিতের তাহাতে প্রয়োজন হয় না। নিজেদের মধ্যে মেয়েরা কথা, গীতি এবং নৃত্য দ্বারাই ব্রত উদ্‌যাপন করিত। তাহার কিছু কিছু অবশেষ বাংলার প্রান্তিক অঞ্চলে এখনও সন্ধান পাওয়া যায়। কাছাড়ের বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলের ধামাইল ব্রতনাচ, যশোরের শীতলা ব্রতের নাচ এবং বর্ধমান, বীরভূম পুরুলিয়া অঞ্চলের ভাঁজো ও জাওয়া

ব্রতের নাচ ইহারই নিদর্শন। এতদ্ব্যতীত কোন কোন ব্রতকথার মধ্যেও দেবতার নৃত্যের কথা আছে। নৃত্য দেবতাদিগের নিকটও একান্ত প্রিয় বলিয়া দেবতাদিগের তুষ্টির নিমিত্তই ব্রতিনীরা নৃত্য প্রদর্শন করিতেন। এই বিষয়ে বাংলাদেশের সর্বত্র প্রচলিত মনসা ব্রতের কাহিনীটিই উল্লেখ করিতে পারা যায়। তাহাতে দেখা যায়, মনসা স্বয়ং নৃত্য প্রতিদিন অভ্যাস করিয়া থাকেন এবং তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও সদাগরের ছোট বৌ গোপনে তাঁহার নৃত্য দেখিয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাহাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। সুতরাং যে ব্রতিনীরা মনসার প্রসাদ যাজ্ঞা করিত, তাহারা স্বভাবতঃই তাঁহার প্রসন্নতার জন্য নৃত্যের অনুষ্ঠান করিত। মনসার সেবিকা বেহুলাও নৃত্যবিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন। বর্ধমান জেলার ভাঁজো ব্রতের ছড়ায় মেয়েরা নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে গায়—

ভাঁজো লো কলকলানি, মাটির লো সরা,
ভাঁজোর গলায় দেব আমবা পঞ্চফুলের মালা।
এক কল্‌সি গঙ্গাজল, এক কল্‌সি ঘি,
বছরান্তে একবার ভাঁজো, নাচবো না তো কি ?

এমন কি, ব্রতিনীরা তাহাদের এই পারমার্থিক বাসনা দেবতাদের নিকট নিবেদন করে—

ষোল ষোল বর্তীব হাতে ষোল সরা দিয়া।
মোরা যাই ইন্দ্রপুরীর নাটুয়া হইয়া॥

তাহারা স্বর্গে গিয়া দেবী হইয়া থাকিতে চাহে না, বরং নর্তকী হইয়া ইন্দ্রসভার চিত্তবিনোদন করিতে চাহে। ঐহিক জীবনে নৃত্যের সংস্কার যদি প্রবল না থাকে, তবে পারলৌকিক কামনার মধ্যে তাহা এই ভাবে প্রবেশ করিতে পারে না।

রাজনৈতিক কারণে বাংলার সমাজ-জীবনেব বিপর্যযের ফলে প্রকাশ্যভাবে নৃত্য এই সমাজের মধ্য হইতে অনেক ক্ষেত্রেই লুপ্ত হইয়া গেলেও ব্রত বা আচার (ritual) নৃত্য অবলম্বন করিয়াই ইহা শেষ অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছে। কারণ, পল্লীজীবন নিতান্ত রক্ষণশীল এবং নারীর আচার-জীবন তদপেক্ষা রক্ষণশীল। সুতরাং যাহা আচার-জীবনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে, পুরুষ তাহা বহির্মুখী বিপর্যয়ের মধ্যে অনেক সময় পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেও

নারী তাহা সহজে বিসর্জন দিতে পারে নাই। সেইজন্য বাংলার প্রাচীন নৃত্যপদ্ধতির কিছু কিছু পরিচয় এখনও নারীর আচার-জীবনের মধ্য হইতে সন্ধান পাওয়া যায়। আচার-নৃত্য সহজে পরিবর্তিত হইতে পারে না; কারণ, যে উদ্দেশ্যে আচার পালন করা হয়, আচারগুলি সম্পূর্ণ পালন না করিলে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না বলিয়াই সমাজে আচারের খুঁটিনাটিগুলি পরিত্যক্ত হইতে বিলম্ব হয়। সেইজন্য যে সকল ব্রতনৃত্য এখনও সমাজে অবশিষ্ট আছে, তাহাদের মধ্যে বাংলার লোক-নৃত্যের প্রাচীন উপকরণগুলিই রক্ষা পাইয়াছে। ইহারা বৈচিত্র্যহীন হইতে পারে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনের কিছু কিছু আদিম উপাদান রক্ষা পাইয়াছে বলিয়া সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাদিগকে অত্যন্ত মূল্যবান্ বলিয়াই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

সূর্যব্রত ভারতের সকল শ্রেণীর নারীসমাজের একটি প্রধান ব্রত। সূর্য উর্বরতাশক্তি (fertility)-র আধার, কারণ, সূর্যতেজ দ্বারা কৃষিকার্য নিয়ন্ত্রিত হয়। আদিম সমাজ বিশ্বাস করিয়াছে যে, ভূমির উর্বরতাশক্তি যাহা দ্বারা বৃদ্ধি পায়, নারীর উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধির তাহাই সহায়ক, সূর্যের আশীর্বাদে নারীও সন্তান লাভ করিয়া থাকে এবং সূর্যের অভিশাপেই নারী বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সূর্যকে প্রসন্ন করিতে না পারিলে নারী কদাচ সন্তানের জননী হইতে পারে না। সেইজন্য স্ত্রীসমাজ সূর্যকে নানা ভাবে প্রসন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। মেয়েলী ব্রতগুলি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপ লাভ করিলেও ইহাদের মূল লক্ষ্য প্রায় অভিন্ন। সেইজন্য গুজরাটের বহু-প্রচারিত গরবা নৃত্যও যাহা, কাছাড়ের ধামালী-নৃত্যও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নহে; কারণ, উভয় ক্ষেত্রেই সূর্যকে প্রসন্ন করা উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য পালন করিবার জন্য বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করা হইয়া থাকে মাত্র। কিন্তু এই সকল প্রণালীর মধ্যেও কতকগুলি বিষয়ে ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য বৃত্তাকৃতি এবং আকাশচারী। সেইজন্য বৃত্তাকারে দাঁড়াইয়া কখনও সূর্যের প্রতীক্ প্রদীপ কিংবা অন্য কোন বস্তুকে মস্তকে কিংবা হস্তে ধারণ করিয়া তাঁহার প্রসন্নতা সাধন করিবার প্রয়োজন হয়। সুতরাং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সূর্যব্রত-নৃত্যের মধ্যে এই সকল বিষয়ে মৌলিক ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। গুজরাটের যে গরবা-নৃত্য কেবলমাত্র প্রচারের জন্য সর্ব-ভারতীয় পরিচয় লাভ করিয়াছে, তাহার সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সূর্যব্রত-নৃত্যের মৌলিক সম্পর্ক রহিয়াছে,

বাংলার সূর্যব্রতের নৃত্যের সঙ্গেও তাহার পার্থক্য কেবলমাত্র বহির্মুখী—অন্তর্মুখী নহে। অর্থাৎ বাংলার মেয়েরা সূর্যব্রতে নৃত্যকালীন গুজরাটী নারীদিগের মত রঙ বেরঙের পোশাক-পরিচ্ছদ ধারণ করে না, পারিবারিক জীবনে প্রত্যহ যে বস্ত্রখানি মাত্র পরিধান করে, তাহা দিয়াই তাহাদের নৃত্যাচার পালন করে; অন্যদিকে গুজরাটী নারীর প্রাত্যহিক জীবনের পোশাকও অত্যন্ত বিচিত্র; তাহার গাঢ় রঙ, ঘাগ্‌রা, জামা ও ওড়নার রঙ্-এর বৈচিত্র্য অতি সহজেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু বাঙ্গালী পল্লীনারীর প্রাত্যহিক জীবনে পরিধেয় পোশাক এত বিচিত্র নহে, মাত্র একখানি সাদা শাড়ী তাহার অবলম্বন, সুতরাং তাহা দ্বারা কোন প্রকার দৃশ্যগত আকর্ষণ সৃষ্টি হইতে পারে না। সেইজন্য গরবা-নৃত্যের এত ভারতব্যাপী খ্যাতি, বাংলার সূর্যব্রত-নৃত্যের কেহ সন্ধান জানেন না।

বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ, কৃষিব সমৃদ্ধি কামনা করিয়াই বাংলার ব্রতের উদ্ভব ও বিকাশ। কৃষিকার্যের সঙ্গে প্রথম এবং প্রধান সম্পর্কই সূর্যের; সুতরাং সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া যেমন এদেশের ব্রতগুলি পরিকল্পিত হইয়াছে, তেমনই ব্রতনৃত্যগুলিও প্রধানতঃ সূর্যকে কেন্দ্র করিয়াই গঠিত হইয়াছে। এমন কি, আপাতদৃষ্টিতে সূর্যের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই মনে হইলেও, তাহা যে সূর্যব্রতেরই প্রভাবজাত, তাহা অনুমান করা যায়। কারণ, সূর্যব্রতের অনুকরণেই পরবর্তী কালে অন্যান্য দেবতা বিষয়ক ব্রত এবং নৃত্যগুলি পরিকল্পিত হইয়াছে। এই বিষয়ে যশোর জিলার শীতলা-নৃত্যের কথা উল্লেখ করিতে পারা যায়। শীতলা-নৃত্য বর্তমানে শীতলা পূজা উপলক্ষেই প্রধানতঃ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তথাপি মূলতঃ ইহা সূর্যব্রত উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ব্যাপক একটি নৃত্যাচার ছিল বলিয়া মনে হয়, কারণ, উপরে গরবা নামক যে গুজরাটী সূর্যব্রতের কথা উল্লেখ করিলাম, ইহার সঙ্গে তাহার মৌলিক কোন পার্থক্য নাই। গুজরাটের গরবা-নৃত্যে মেয়েরা হাঁড়ির মধ্যে একটি জ্বলন্ত প্রদীপ রাখিয়া তাহা মাথায় লইয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়, বাড়ীর ভিতর আঙ্গিনায় গিয়া মাথা হইতে তাহা নামাইয়া রাখিয়া তাহা ঘিরিয়া নৃত্য করিয়া থাকে। যশোরের শীতলা-নৃত্যে তাহার সামান্য ব্যতিক্রম মাত্র দেখা যায় এবং তাহাও যে বহির্মুখী মাত্র, মৌলিক কোন বিষয় নহে, তাহাও বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। কারণ, গুজরাটে মেয়েরা জ্বলন্ত প্রদীপকে একটি হাঁড়ির ভিতরে স্থাপন করিয়া মাথায়

ধারণ করে, শীতলা-নৃত্যে তাহার পরিবর্তে একটি কুলার উপর জ্বলন্ত প্রদীপটিকে স্থাপন করিয়া লওয়া হয়। উভয়ক্ষেত্রেই প্রদীপটি ঘিরিয়া বৃত্তাকারে নৃত্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। তবে বাঙ্গালী গ্রাম্য মেয়ের তুলনায় গুজরাটী নারীর পোশাক-পরিচ্ছদের বৈচিত্র্যের জন্য গরবা নৃত্যটি অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠে মাত্র।

গুজরাটের সূর্যব্রত-নৃত্য গরবার সঙ্গে বাংলার শীতলা-নৃত্যের সম্পর্ক নির্দেশ করিবার আরও একটি কারণ আছে, বাংলা শীতলাব্রতের নৃত্য যে সূর্যব্রতেরই নৃত্য, তাহা ইহাতে আরও স্পষ্ট হইবে। শীতলা বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইলেও বসন্তরোগ চর্মরোগ, বাংলার চর্মরোগের দেবতা ধর্মঠাকুর, তিনি কুষ্ঠরোগেরও প্রতিষেধক। ধর্মঠাকুর সূর্য-দেবতা। সেইজন্য মনে হয়, শীতলাদেবীর প্রসন্নার্থে যে নৃত্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহা সূর্যব্রত-নৃত্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

পূর্ব বাংলার মাঘমণ্ডল ব্রতে সূর্যব্রতের রূপটি আরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। মাঘমণ্ডল ব্রতটি আনুপূর্বিক একটি লোকনাট্যানুষ্ঠান। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'বাংলার ব্রত' নামক গ্রন্থে মাঘমণ্ডল ব্রতানুষ্ঠানটিকে একটি লোক-নাট্যের ভিতর দিয়া উপস্থাপিত করা হইয়াছে। ইহার গীতি কিংবা ছড়ার সংলাপ যে নৃত্যেরও সম্পূর্ণ অনুকূল, তাহাও ইহাতে নির্দেশ করা হইয়াছে। এমন কি, ইহাতে নটনটীর চরিত্র এবং তাহাদের নৃত্যগীতও সংযুক্ত রহিয়াছে। অবনীন্দ্রনাথ সংগৃহীত মাঘমণ্ডল ব্রতের ছড়ায় নটনটীর এই নৃত্যগীতের উল্লেখ করা হইয়াছে—

নট ॥ সোনার বাটী ঝুমুর ঝুমুর মিষ্টি বাটির তৈল।
তাই লইয়া সূর্যঠাকুর নাইতে গেলেন কৈ লো।
নাইয়া ধুইয়া বাটি থুইলেন কৈ লো ॥
নটী ॥ বাটি বাটি কুমার আটি সকল পুড়িয়া গেল।
লক্ষ টাকার বাটি আমার হারাইয়া গেল ॥
নট ॥ গেছে গেছে ইহ বাটি আপদ বালাই নিয়া।
আরেক বাটি গড়াম-যে চাক্কা সোনা দিয়া ॥
উভয়ে ॥ সোনার বাটির ঝুমুর ঝুমুর মিষ্টি বাটির তৈল ॥

নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুর করিয়া ছড়া বলিয়া ইহা পরিবেষণ করা হয়।

ব্রতিনীরাই একজন নট এবং একজন নটীর অংশে অভিনয় করে এবং সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিয়া থাকে।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মাঘমণ্ডল ব্রতের অনুষ্ঠানটি আনুপূর্বিক একটি নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান। যে বয়সের কুমারী মেয়েরা মাঘমণ্ডল সূর্যব্রত করিয়া থাকে, সেই বয়সে নৃত্য সম্পর্ক তাহাদের মধ্যে কোন সঙ্কোচের জন্ম হয় না; সুতরাং সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে তাহারা এই লোক-নৃত্যানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করিতে পারে। অনেকে একত্র হইয়া এই ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া থাকে বলিয়া ইহা একক নৃত্য না হইয়া সারি-নৃত্যের রূপ লাভ করে। ব্রতনৃত্য মাত্রই সারি-নৃত্য, ইহাতে একক-নৃত্যের স্থান নাই। কারণ, ব্রত পারিবারিক অনুষ্ঠান, একক অনুষ্ঠান নহে। যৌথ পরিবারভুক্ত সকল কুমারী মেয়েই ইহাতে যোগদান করিয়া থাকে; যাহাদের ব্রত পূর্বেই উদ্‌যাপিত হইয়া গিয়াছে, তাহারাও ব্রতকারিণীদিগকে সাহায্য করিবার সূত্রে নৃত্যে যোগদান করে। কিন্তু ক্রমাগত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবের ফলে কেবল নৃত্যই নহে, তাহার সঙ্গে ব্রতও লুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

পশ্চিম বাংলা বিশেষতঃ বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলের ভাদুব্রতের সঙ্গেও নৃত্য যুক্ত আছে। ইহা প্রধানতঃ গীতি-উৎসব, এই গীতির সঙ্গে নৃত্যও পূর্বে সর্বদাই যুক্ত ছিল, কিন্তু কালক্রমে গ্রামাঞ্চলে স্ত্রীশিক্ষার প্রভাবশতঃ উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে নৃত্যাংশ বর্জিত হইয়া কেবলমাত্র সঙ্গীতাংশের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কিন্তু ভাদুব্রত প্রকৃতপক্ষে সূর্যব্রত নহে। ভাদ্র মাসের ভরা বর্ষা প্রকৃতির নামই ভাদু। বাংলার লৌকিক ব্রত-পার্বণের প্রধানতঃ দুইটি লক্ষ্য; প্রথমতঃ যেমন সূর্য, দ্বিতীয়তঃ তেমনই ধরিত্রী। অধিকাংশ আদিম উৎসবের মধ্যেই সূর্যের সঙ্গে ধরিত্রীর বিবাহের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, বাংলার গাজন উৎসবও তাহাই। ভাদু বর্ষার ভরা প্রকৃতির রূপ, এই সূত্রেই তিনি ধরিত্রীরই প্রতীক্। ধরিত্রীর ব্রতে কুমারী এবং বিবাহিতা নারীরা উভয়েই সমান অংশগ্রহণ করিতে পারে, স্বামী লাভের জন্য কুমারী মেয়েরা এবং সন্তান লাভের জন্য বিবাহিতা মেয়েরা ভাদু রূপিণী ধরিত্রীর পূজা করিয়া থাকে। তাহারই প্রসন্নতা সম্পাদনের জন্য নৃত্যেরও আবশ্যক হয়।

বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী এই ভাদুব্রতের নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্যে ছোট-নাগপুর মালভূমির আদিম জাতির নৃত্য সংস্কারের যে প্রভাব অনুভব করা যায়,

তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভাদুব্রতের সমসাময়িক কালে ছোট-নাগপুরের আদিম জাতির মধ্যে নৃত্যগীত মুখর যে বর্ষা-উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে, তাহা 'করম পরব' বলিয়া পরিচিত। ছোটনাগপুব হইতে আরম্ভ করিয়া গুজরাটের ভীলজাতি অধ্যুষিত আদিম সমাজ পর্যন্ত এই বর্ষা-উৎসবে উন্মত্ত হইয়া উঠে। নৃত্য এই উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ। পশ্চিম বাংলার সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসিগণ স্বভাবতঃই এই উৎসবে সাড়া না দিয়া পারে না। কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রভাববশতঃ তাহারা ইহার যে একটি হিন্দু রূপ দিয়াছে, তাহাই ভাদুব্রত বলিয়া পরিচিত। তাহা সত্ত্বেও কোন পুরাণ কিংবা স্মৃতিশাস্ত্রে ইহার কোন বিধি লিপিবদ্ধ হয় নাই। যদি তাহা হইত তবে তাহার ভিতর হইতে বাঙ্গালী কুমারী হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের ভাবটুকু লুপ্ত হইয়া যাইত।

কিন্তু উক্ত অঞ্চলের ভাদুব্রতের অনুষ্ঠানে হিন্দুপ্রভাব স্পষ্টতর হইলেও আদিবাসী অধ্যুষিত ছোটনাগপুরের যতই নিকটবর্তী হওয়া যায়, ততই সেই অঞ্চলের ব্রতানুষ্ঠানে আদিম সমাজের প্রভাব প্রবলতর ভাবে অনুভূত হয়। তাহাতেই ব্রতের সঙ্গে নৃত্যের সম্পর্কটিও স্পষ্টতর হইয়া উঠিবার সুযোগ পায়। এই সম্পর্কে পুরুলিয়া জিলার জাওয়া ব্রত ও তাহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নৃত্যগীতের কথা উল্লেখ করিতে হয়। ইহাও ভাদুব্রতের মতই ধরিত্রীর ব্রত, তবে ধরিত্রীর রূপটি ইহাতে আরও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবার সুযোগ পায়। ভদ্রগৃহের কুমারী মেয়েরাই এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং ব্রতের সঙ্গে যে নৃত্য-সম্বলিত গীতের অনুষ্ঠান হয়, তাহাতেও তাহারা নিঃসঙ্কোচে অংশ গ্রহণ করে। জীবন্ত বা জীয়াইয়া রাখা অর্থেই জাওয়া শব্দটি ব্যবহৃত হয় বলিয়া মনে হয়। ইহাও বর্ষাকালীন ভাদুব্রতের মত ভাদ্রমাসেরই একটি অনুষ্ঠান। জিতাষ্টমী উপলক্ষে ইহা উদ্‌যাপন করা হইয়া থাকে। ইহার নিম্নলিখিত আচার হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে ইহা শস্যোৎসব, ধরিত্রীর শস্যসম্পদ বৃদ্ধির কামনা করিয়াই এই উৎসব পালন করা হয়। একটি ডালা বালি দিয়ে পূর্ণ করিয়া ইহাতে বিভিন্ন শস্যবীজ বপণ করা হয়। তারপর সেই বালিতে প্রতিদিন জল দিয়া শস্যবীজকে অঙ্কুরিত করিতে হয়। সেই ডালি কুমারী মেয়েরা মাথায় লইয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়। অন্তঃপুরে পৌছিয়া মাথা হইতে শস্যপূর্ণ ডালিটি নামাইয়া রাখিয়া তাহা ঘিরিয়া সকলে নৃত্য করে ও গীত গায়। এই

গীতের মধ্যে কোন মন্ত্রতন্ত্র কিংবা ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার কথা থাকে না; সাধারণ ঘরসংসারের সুখদুঃখের কথাই শুনিতে পাওয়া যায়। যেমন সম্প্রতি পুরুলিয়া হইতে সংগৃহীত এই জাওয়া গীতের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়—

১

এক দিনকার হলুদ বাটা তিন দিনকার বাসি লো।
মা বাপকে বলে দিবি বড় সুখে আছি লো॥

২

বনে ফুটে বনকিয়ারী বনে বনে আলা রে।
বিটিছেলার মিছাই জনম পরের ঘর আলা রে॥

শস্যপূর্ণ ডালাটি ঘিরিয়া ঘিরিয়া নৃত্যের তালে তালে সঙ্গীত চলিতে থাকে; সঙ্গে সঙ্গে ঢাক বাজিতে থাকে। এইভাবে প্রত্যেক বাড়ীর আঙ্গিনায় ডালাটি নামাইয়া নৃত্য ও সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হয়।

বর্ধমান জিলার ভাঁজোব্রতের নৃত্যের কথা পূর্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি; তাহাও জাওয়া ব্রতের আর একটি রূপ মাত্র। জাওয়া নৃত্যে ডালা ভরা যে বালির কথা উল্লেখ করিলাম, সেই বালি ভাঁজো-নৃত্যেও প্রয়োজন হয়; আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রামের মেয়েরা যখন একটি পূর্বনির্দিষ্ট স্থান হইতে বালি আনিতে যায়, তখন একদল যুবক তাহাদিগকে সেই বালি লইতে 'বাধা' দেয়। ব্রতিনীরা প্রতিরোধ করে এবং পরস্পর সম্মুখীন সারিবদ্ধ যুবক ও যুবতীদিগের একটি কপট সংগ্রাম (mock fight) চলে। সারি-নৃত্যের মধ্য দিয়া এই যুদ্ধের ভাবটি প্রকাশ পায়। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতও যুক্ত থাকে। সঙ্গীতের বিষয় যুদ্ধ নিঃসম্পর্কিত এবং নিতান্ত ব্যক্তিগত ও গার্হস্থ্য জীবন বিষয়ক—পূর্বোদ্ধৃত জাওয়া-নৃত্যের সঙ্গীতের সঙ্গে ইহাদের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। যেমন—

১

ভাঁজোর শোলেক বল্‌ব কি, ভাই, জোয়ায় নাক কথা।
কাল গিয়েছে জ্বরের পালা আজ ধরেছে মাথা॥

২

শুষনীর শাক তুলতে গেলাম শাকে ধরেছে পোকা।
খেঁকশেয়ালীর খেঁক শুনে ভাই ফেলে এলাম টোকা॥

ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে ব্রতিনীদিগের নৃত্য চলিতে থাকে ; এক একবার ঢাকের বাদ্য থামিলে সঙ্গীতের এক একটি কলি শুনিতে পাওয়া যায়।

যে সকল ব্রতের সঙ্গে ছড়া ও গীতির সম্পর্ক আছে, কেবলমাত্র তাহাদের মধ্যেই নৃত্যের সম্পর্ক আছে, তাহা ছাড়া যেখানে ছড়া কিংবা গীত নাই, কেবলমাত্র ব্রতকথা আছে, সেখানে নৃত্যের কোন অবকাশ নাই। সমাজ-তত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন, যে সকল ব্রতের সঙ্গে শস্যোৎপাদনের সম্পর্ক আছে, কেবলমাত্র তাহাদের সঙ্গেই নৃত্যের সম্পর্ক আছে, কারণ নৃত্য উৎপাদিকা শক্তিরই (power of procreation) উদ্বোধক বলিয়া বিবেচিত হয়। বাংলার ব্রতনৃত্যগুলি বিশ্লেষণ করিলেও এ কথাই প্রমাণিত হয়।

ছয়

যুদ্ধ-নৃত্য

এ'কথা আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, বাঙ্গালী এক অসামরিক জাতি, সেইজন্য ইহার সাংস্কৃতিক জীবনে নৃত্যগীতের যত উপকরণ আছে যুদ্ধ-বিগ্রহের উপকরণ সেই পরিমাণে নাই। কিন্তু কোন জাতির অপাত কোন পরিচয় হইতে তাহার মৌলিক পরিচয়ের সন্ধান সকল সময়ই পাওয়া যায় না। ওড়িয়া জাতি যে ভারতবর্ষের মধ্যে এককালে শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তির অধিকারী ছিল, তাহা বর্তমান উড়িষ্যার অধিবাসীদিগকে দেখিলে কেহই বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু এ'কথা ঐতিহাসিক সত্য। মধ্যযুগে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র উড়িষ্যা প্রদেশই শেষ পর্যন্ত নিজের স্বাধীনতা রক্ষা কবিতে সমর্থ হইয়াছিল। ওড়িয়ার সামরিক শক্তির নিকট পাঠান মুসলমান সামরিক শক্তি বারবারই একদিন পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। তারপর ঐতিহাসিকদিগের মতে চৈতন্যদেব যখন উড়িষ্যায় গিয়া বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিলেন এবং তাহার ফলে উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা প্রতাপ রুদ্র বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সিংহাসন ত্যাগ করিলেন, সেইদিন হইতেই উড়িষ্যার সামরিক শক্তির পতন হইতে লাগিল এবং তাহার ফলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই উড়িষ্যাব স্বাধীনতা বিলুপ্ত কবিয়া পাঠানগণ সে দেশ অধিকার লইল। বৈষ্ণব ধর্ম ও জীবনাদর্শেব প্রতি ওড়িয়াদিগের ক্রমাগত আসক্তি বৃদ্ধি পাইবার ফলে ইহার সামরিক শক্তির কোনদিন আর পুনরভ্যুত্থান সম্ভব হইল না।

আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে বৈষ্ণব ধর্ম বিস্তারের ফলে উড়িষ্যার সামরিক শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল, বাংলাদেশ সেই বৈষ্ণব ধর্মের জন্মভূমি। সুতরাং বৈষ্ণব ধর্ম ও আদর্শের প্রভাবের ফলে ইহাবও সামরিক শক্তির যে অধঃপতন হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বাঙ্গালীও একদিন এক প্রবল সামরিক শক্তিসম্পন্ন জাতিই ছিল, কিন্তু মধ্যযুগে রাজনৈতিক জীবনে ইহার নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়া যেভাবে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল, তাহার ফলে ইহার জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল ; সেইজন্য সামরিক জীবনেরও একটি সুদৃঢ় পরিচয় ইহার পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। ইহার

বিলুপ্ত সামরিক শক্তির কিছু ইঙ্গিত এই জাতির লোক-সংস্কৃতি হইতে এখনও সন্ধান পাওয়া যায়—বাংলার লোক-নৃত্য এই বিষয়ে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য।

যুদ্ধ-নৃত্য আদিম জাতি মাত্রেরই একটি বিশিষ্ট সামাজিক আচরণ। আদিম সমাজ পুর্বে যখন গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপন করিত, তখন গোষ্ঠী-সংগ্রাম (Community war) ইহার একটি প্রধান আচরণ ছিল। ইহা কেন্দ্র করিয়াই ইহার মৌলিক সাংস্কৃতিক ও সমাজিক জীবন গড়িয়া উঠিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আসামের আদিম নাগাজাতির কথা উল্লেখ করিতে পারা যায়। ইহারা নরমুণ্ড শিকারী (head hunter) বলিয়া পরিচিত। ইহাদের মধ্যে প্রচলিত এই আনুষ্ঠানিক নরহত্যার প্রথা দূর করিবার জন্য ইংরেজ সরকার ইহার সকল সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিয়াও ব্যর্থকাম হইয়াছিল। সেইজন্য বরং ইংরেজের সঙ্গে ইহার শত্রুতা সৃষ্টি হইয়াছিল এবং সেই শত্রুতারই সূত্র ধরিয়া আজ ইহারা স্বাধীন ভারতের সরকারের সঙ্গেও প্রথম হইতেই ইহাদের বিবাদের সূত্রপাত করিয়াছে। যাহা লইয়া সভ্য জাতির সঙ্গে ইহাদের শত্রুতা, সেই নরমুণ্ড শিকার (head hunting) ব্যাপারটি কি, তাহা একটু বুঝাইয়া বলি। পার্বত্য নাগাদের এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী এক একটি পাহাড়ের উচ্চ চূড়া অধিকার করিয়া তাহারই চারিপাশের ঢালু জমিতে নিজেদের বাসস্থান নির্মাণ করিয়া বাস করে এবং ঢালু পাহাড়ের গায়েই পাথর গাঁথিয়া চাষের জমি প্রস্তুত করে। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলে প্রকৃতি অত্যন্ত কৃপণা, শত চেষ্টা করিযাও প্রয়োজন মত শস্যোৎপাদন করিতে পারে না। তাহাদের মধ্যে একটি বিশ্বাস যে-ভাবেই হোক, দৃঢ়মূল হইয়াছে যে, তাহাদের প্রতিবেশী গোষ্ঠী (Communty)-কে অতর্কিতে কোন সময় আক্রমণ করিয়া যদি তাহাদের মধ্য হইতে কয়েকটি নরমুণ্ড স্কন্ধচ্যুত করিয়া লইয়া আসিয়া তাহা ক্ষেতে পুঁতিয়া দিতে পারে, তবে তাহাদের প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইবে। কারণ, তাহাদের বিশ্বাস, মস্তিষ্কের মধ্যেই জীবনশক্তি থাকে, সদ্যছিন্ন মুণ্ডের মধ্য দিয়া ধরিত্রীর মধ্যে তাহা সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারিলে ধরিত্রী শক্তিশালিনী হইয়া প্রচুর শস্যসম্পদ দান করিতে পারিবে; আহারের অভাব হইবে না। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া ইহারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতিবেশীকে অতর্কিতে আক্রমণ করিবার সুযোগ সন্ধান করিতে থাকে। কখন যে কাহার উপর আক্রমণ হইবে, তাহা পুর্ব হইতে কেহই বলিতে পারে না; সেইজন্য সর্বদাই প্রত্যেককে যেমন একদিক দিয়া আক্রমণ করিবার সুযোগ

সন্ধান করিতে হয়, তেমনই আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হয়। গ্রামের উচ্চতম অংশে মঞ্চ নির্মাণ করিয়া গ্রামবাসী প্রতিবেশীদিগের গতিবিধি সর্বদা নিরীক্ষণ করে, আক্রমণের কোন লক্ষণ দেখিতে পাইলেই পূর্ব হইতে সকলকে সতর্ক করিয়া দেয়। তারপর দুই দলের সম্মুখ সংগ্রামে উভয়ই উভয় পক্ষের ছিন্নমুণ্ড অধিকার করিবার প্রয়াস পায়। নারীও এই সংগ্রামে পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে যোগদান করে। সুতরাং নাগা সমাজকে প্রতি মুহূর্তেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। যখন যুদ্ধ হয় না, তখন যুদ্ধের মহড়া চলে। যুদ্ধের মহড়াই এই জাতির সামাজিক জীবনের একমাত্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলিয়া জাতির নৃত্যগীতে যুদ্ধের সংস্কার অতি সহজেই প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এই প্রকার গোষ্ঠী-জীবনেব আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই প্রত্যেক আদিম সমাজেই যুদ্ধ-নৃত্যের প্রথম উদ্ভব হইয়াছিল।

কিন্তু একথাও সত্য যে, সকল আদিম সমাজেই যুদ্ধেব প্রয়োজন সমান ছিল না। সর্বদাই পারিপার্শ্বিক অবস্থাব উপর তাহা নির্ভর করিত। অর্থাৎ আদিম নাগা জাতির জীবনে গোষ্ঠী-সংগ্রাম যে পর্যায়ে গিয়া পৌছিয়াছিল, সমতল ভূমিব অধিবাসী অধিকতর স্বচ্ছন্দ ও সহজ জীবনের অধিকারী আদিবাসীর জীবনে গোষ্ঠী-সংগ্রাম সে পর্যায়ে উঠিতে পারে নাই। ইহা কোন জাতি অপেক্ষা বিশেষ কোন জাতি যে বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বাস করে, তাহার বিশেষত্বের উপরই নির্ভর করে। সেইজন্য পাবত্য অঞ্চলের অধিবাসী নাগা এবং আসামের সমতল ভূমির অধিবাসী মণিপুরী ইহারা উভয়ে মূলতঃ একই জাতির বংশধর হওয়া সত্বেও গোষ্ঠী-সংগ্রাম ইহাদেব মধ্যে সমান পর্যায়ে পৌছিতে পারে নাই, সেই সূত্রে যুদ্ধ-নৃত্যের সংস্কারও ইহাদের উভয়ের মধ্যে সমান নহে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলও যে বিভিন্ন প্রকৃতির আদিবাসীর জীবনের উপকরণ দ্বারা গঠিত হইয়াছে, তাহাতেই ইহার বিভিন্ন অঞ্চলেই যুদ্ধ-নৃত্যেরও যে পরিচয় এখনও সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা অভিন্ন প্রকৃতির হইয়া উঠিতে পারে নাই।

আদিম সমাজের গোষ্ঠী-সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তায় যে যুদ্ধ-নৃত্য একদিন সমাজে রূপলাভ করিয়াছিল, তাহা পরবর্তী জীবনে সামন্ততন্ত্রের যুগে এক সম্পূর্ণ নূতন পরিচয় লাভ করিল। তখন গোষ্ঠীর আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সংগ্রাম হইত না, বরং তাহার পরিবর্তে সামন্তরাজের বেতনভুক্ সৈন্যদের মধ্যে জীবিকার

উপায় রূপে যুদ্ধের বৃত্তি গৃহীত হইত। একদিন যে বৃত্তি সামগ্রিক ভাবে সমাজ-জীবনের আত্মরক্ষার জন্য সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাই পরবর্তী কালে ব্যক্তি-জীবনের জীবিকা উপার্জনের উপায়রূপে পরিগণিত হইয়াছিল। সুতরাং একদিন ইহার মধ্যে যে শক্তির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছিল, পরবর্তী কালে তাহা ইহার মধ্য হইতে দূর হইয়া গেল। আত্মরক্ষার উপায় যখন বিলাসের উপকরণরূপে গণ্য হয়, তখন তাহার মধ্যে যে সেই শক্তি থাকিতে পারে না, তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক। সেইজন্য আদিম সমাজে যুদ্ধ এবং তাহার সম্পর্কিত যুদ্ধ-নৃত্যের যে স্থান, লোক-সমাজে তাহার সেই স্থান নহে। আদিম সমাজে যুদ্ধ-নৃত্য একটি সামাজিক আচার (ritual), ইহা সমগ্র সমাজেরই অবশ্য পালনীয় ধর্ম ; কিন্তু লোক-সমাজে ইহা তাহা নহে, ইহাতে তাহা ব্যক্তির জীবিকা মাত্র। সুতরাং যদিও যুদ্ধ-নৃত্যের মধ্যে একটি আদিম সংস্কার প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, তথাপি লোক-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ইহা সেই রূপ এবং শক্তি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নবতর পরিচয় লাভ করিয়াছে।

মধ্যযুগের বাংলার সামন্তরাজগণ কেবলমাত্র যে বাঙ্গালী দ্বারাই তাহাদের সৈন্যবাহিনী গঠন করিতেন, তাহা নহে—সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বাহির হইতেও অনেক যোদ্ধজাতি ভাগ্যান্বেষণে বাংলাদেশে আসিয়া সৈন্যদলভুক্ত হইত। তাহাদের পরিবার সামন্তরাজ প্রদত্ত ভূসম্পত্তি লাভ করিয়া অবশেষে বাংলাদেশেই স্থায়িভাবে বসবাস করিত। এইভাবে বহু অবাঙ্গালী ভারতীয় বাংলার মাটিতে মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। এইভাবে কত রাজপুত, পাঠান, হিন্দুস্থানী যে বাঙ্গালীর রক্তে মিশিয়া গিয়াছে, তাহা আজ হিসাব করিয়াও বলিতে পারা যাইবে না। বাঙ্গালীর সঙ্গে এইভাবে একাকার হইবার ফলে ইহাদের যোদ্ধচরিত্র পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে যুদ্ধের কোন সংস্কারের আর কোনও পরিচয় অবশিষ্ট নাই। তবে কোন কোন সময় বাংলার সামান্তরাজগণ বাংলাদেশেরই কোন কোন সম্প্রদায়ের লোককে সাধারণভাবে তাঁহাদের সৈন্যদলে স্থায়িভাবে নিযুক্ত করিতেন ; এক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত লোক বলিয়া তাহারা একই স্থানে বাস করিত এবং এই সূত্রেই তাহারা একটি সংহত সমাজ-জীবনও গড়িয়া তুলিবার অবকাশ পাইত। ইহারা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সামন্তরাজের পদাতিক সৈন্যের কাজ করিত বলিয়া

সাধারণভাবে পাইক বা পদাতিক বলিয়া পরিচিত হইত। পাইক পদবী দ্বারা ইহাদের বৃত্তিগত পরিচয় প্রকাশ পাইলেও ইহাদের সম্প্রদায়গত পরিচয়ও ছিল। ইহারাই যুদ্ধকার্যের অবকাশে যে নৃত্যের অনুশীলন করিত, তাহাতেই বাংলার যুদ্ধ-নৃত্যের কিছু নিদর্শন আজও পাওয়া যায়। এই সকল নৃত্য সম্প্রদায়গত-ভাবে গড়িয়া উঠে নাই, বরং বৃত্তিগতভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে; অর্থাৎ ডোম জাতীয় পাইক-সৈন্যের নৃত্য ডোম-নৃত্য বলিয়া পরিচিত না হইয়া সাধারণভাবে পাইক-নৃত্য বা পদাতিক সৈন্যের নৃত্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। এই পাইক-সৈন্যের একটি প্রধান ভাগ পশ্চিম বা লায় এদেশের ডোম জাতির দ্বারা গঠিত হইলেও মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে কোন কোন সময় আদিবাসী দ্বারাও গঠিত হইয়াছে। পুরুলিয়া জিলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজের রাজ্য দ্বারা বিভক্ত ছিল এবং পার্বত্য ও অরণ্য অঞ্চলের সুযোগ লাভ করিয়া ইহারা পরস্পর সর্বদাই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়া থাকিত। সেইজন্য এই অঞ্চলে স্থায়িভাবে সৈন্যদল রক্ষা করিবার দায়িত্ব সবাধিক ছিল। তাহার ফলে এই অঞ্চলের পাইক-নৃত্য বাংলার লোক-নৃত্যের মধ্যে একটি বিশিষ্ট পরিচয় লাভ করিয়াছে। বাঁকুডা জিলার বিষ্ণুপুর এবং বীরভূম জিলার রাজনগরের সামন্তরাজগণ ডোম, বাগ্‌দি এবং মাল সৈন্যদল রক্ষা করিতেন। ইহারা প্রত্যেকেই বাঙ্গালী হইলেও ইহাদের মধ্যে আদিম জীবনের সংস্কার অত্যন্ত প্রবল ছিল। বিশেষতঃ পশ্চিম বাংলার সীমান্ত অঞ্চল রক্ষার দায়িত্ব সবদাই অত্যন্ত কঠিন ছিল, কারণ, এই পথেই বিভিন্ন আক্রমণকারী যেমন পাঠান, মোগল, বর্গী, আদিবাসী প্রভৃতি আসিয়া বারবার বাংলাদেশ আক্রমণ কবিয়াছে। সেইজন্য এই অঞ্চলের সামন্তরাজগণ এক অতি শক্তিশালী স্থায়ী সৈন্যদল সর্বদাই রক্ষা করিতেন। সুতরাং এই অঞ্চল হইতেই বাংলার যুদ্ধ-নৃত্যের বিলীয়মান কতকগুলি নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে পাইক-নৃত্য ব্যতীতও রায়বেঁশে, ঢালী ও কাঠি-নৃত্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পশ্চিম বাংলার ডোমজাতি দৈহিক শক্তি ও বীযের জন্য চিরদিনই খ্যাতি-লাভ করিয়া আসিয়াছে। বাংলার সুপরিচিত এই ছেলেখেলার ছড়াটির মধ্যে একটি ডোম চতুরঙ্গের বর্ণনা শুনিতে পাওয়া যায়।

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে।
ঝাঁঝ কাঁসর মৃদং বাজে॥ ইত্যাদি

ইহার অর্থ : আগডুম অর্থাৎ অগ্রবর্তী ডোমসৈন্যদল, বাগডুম অর্থাৎ বাগ বা পার্শ্বরক্ষী ডোমসৈন্যদল এবং ঘোড়াডুম অর্থাৎ অশ্বারোহী ডোমসৈন্যদল সজ্জিত হইল। পশ্চিম বাংলার সীমান্ত রক্ষার কার্যে ডোমসৈন্যগণই সর্বাপেক্ষা সাহসিকতার পরিচয় দেখাইয়া বাঙ্গালীর ধনমান ও প্রাণ একদিন রক্ষা করিয়াছে। সেইজন্য বাঙ্গালী তাহার কাব্যে ও ছড়ায় ইহাদের বীরত্বের কাহিনী নানাভাবে কীর্তন করিয়াছে। মধ্যযুগে 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' দেখিতে পাওয়া যায়, কেবলমাত্র ডোম পুরুষই নহে, ডোম রমণীগণও যুদ্ধক্ষেত্রে অসীম শৌর্য-বীর্য ও সাহসিকতাব পবিচয় দিয়া শত্রুর কবল হইতে দেশ রক্ষা করিয়াছে। ডোম জাতির একটি সংহত সমাজ-জীবন ছিল এবং বাংলার তথাকথিত নিম্নজাতির মধ্যে ডোমজাতিব একটি সুস্পষ্ট সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ছিল। একটি প্রাচীন ঐতিহ্যের ধাবা অনুসবণ করিয়াই যে ইহার সমাজ-জীবনের বিকাশ হইয়াছিল, তাহা 'বৌদ্ধ গান ও দোহা' পাঠ করিলেও জানিতে পারা যায়। বিশেষতঃ এই বীরজাতির প্রধান বৃত্তিই ছিল যুদ্ধ, সুতরাং সেই সূত্রেই যুদ্ধ নৃত্যও ইহার সাংস্কৃতিক জীবনের স্বাভাবিক অঙ্গস্বরূপ ছিল বলিয়াই মনে হওয়া স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে ছিলও তাহাই। কিন্তু আজ যে তাহার ভিতর হইতে সেই সংস্কারের বিশেষ কিছু অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না, তাহারও কতকগুলি কারণ আছে।

দেশে ইংরেজ অধিকাব স্থাপিত হইবার পর দেশের আভ্যন্তরিক শান্তি রক্ষার ভাব যখন ইংবেজ সরকাব নিজের হাতে গ্রহণ করিলেন, তখন সামন্তরাজ-দিগের পাইক-সৈন্যদল স্বভাবতই ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু যে এক বিপুল জনসংখ্যা দীর্ঘকাল যাবৎ অসি ধাবণ করিয়া কেবলমাত্র বীর্যবত্তা ও সাহসিকতারই অনুশীলন করিয়াছে, তাহা সহসা একদিনে ভাঙ্গিয়া যাইবার পর ইহাদের নূতন অনুরূপ আব কোন বৃত্তির ব্যবস্থা হইল না, ইংরেজ সরকার ইহাদিগকে নিজেদের সৈন্যদলে গ্রহণ করিলেন না। তাহার ফলে ইহারা কর্মহীন হইয়া জীবিকার উপায় হইতে বঞ্চিত হইল। তাহারা যে-হাতে অসি ধারণ করিয়াছিল, সেই হাতে আর লাঙ্গল ধারণ কবিয়া কৃষক সাজিতে পারিল না। নূতন করিয়া জীবনে কেহ কৃষক সাজিতে পারে না। সেইজন্য জীবিকার প্রয়োজনে তাহাদিগকে অসঙ্গত উপায় অবলম্বন করিতে হইল। দেশে ডাকাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। ইংরেজ সরকার মনে করিলেন, ইহারাই এই

সকল কার্যের সঙ্গে লিপ্ত; অচিরেই ইহাদিগকে আইন দ্বারা Criminal Tribe (অপরাধপ্রবণ জাতি) বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন. নানাভাবে তদানীন্তন সরকার ইহাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করিলেন; ক্রমে ইহাদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িতে লাগিল। অগত্যা ইহারা দেশত্যাগ করিয়া পার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহ, যেমন ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, উড়িষ্যার নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য ইহাদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল; তাহাদের সামাজিক সংহতি বিনষ্ট হইল, ক্রমে তাহাদের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক জীবনের সকল পরিচয়ই লুপ্ত হইতে লাগিল। বাংলার প্রায় সকল অঞ্চলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যোদ্ধ-সম্প্রদায় সম্পর্কেই প্রায় অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল; সেইজন্য বাংলার অন্যান্য লোক-নৃত্যের যে পরিচয়ই আজ প্রকাশ পাক না কেন, যুদ্ধ-নৃত্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট পরিচয়ের সন্ধান পাওয়া অনেক সময় কঠিন হইয়া পড়িযাছে।

পশ্চিম বাংলার সকল উৎসব-পার্বণে এখনও ডোমজাতি যে ঢাক বাজাইয়া থাকে, সেই ঢাক যুদ্ধবাদ্যেরই একটি অঙ্গ ছিল। ডোমজাতি ব্যতীত অন্য কোন জাতি এই অঞ্চলে ঢাক বাজাইতে পারে না, সেই শিক্ষা অন্য কাহারও নাই। সুতরাং ডোমজাতির সঙ্গে যুদ্ধকর্ম এবং তাহার সম্পর্কিত সকল আচরণই জড়িত ছিল। এই অঞ্চলে ডোম-নৃত্য বলিয়া কোন বিষয় না থাকিলেও, যে পাইক ও ঢালী-নৃত্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ডোমজাতিই প্রধানতঃ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। ঢালী কোন সম্প্রদায়সূচক শব্দ নহে—যুদ্ধকালীন যে ঢাল (shield) ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা ধারণ করিয়া অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধসজ্জা গ্রহণ করিয়া যে নৃত্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহাকে ঢালী নৃত্য বলে। ঢালী-নৃত্য যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত পদাতিক সৈন্যের নৃত্য, ইহার ঢাক (war drum)-বাদ্যকর ডোম, ইহাতে অংশ গ্রহণকারীও প্রধানতঃ ডোম, তারপর বাগদি ও মাল, তারপর অন্যান্য জাতি। রায়বেঁশে ও কাঠি-নৃত্যও এই যুদ্ধ-নৃত্যেরই পর্যায়ভুক্ত। রায়বেঁশে-নৃত্য প্রকৃত পক্ষে লাঠি-নৃত্য। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'দেবী চৌধুরাণী'তে, যে লাঠির জয়গান করিয়াছেন, ইহা সেই লাঠি। রায়বাঁশ নামক বিশেষ এক শ্রেণীর শক্ত বাঁশ দ্বারা এই লাঠি নির্মিত হইত বলিয়া ইহা হাতে লইয়া যে নৃত্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহাকেই রায়বেঁশে-নৃত্য বলে। কাঠি-নৃত্যও ইহারই অন্তর্ভুক্ত; কারণ,

কাঠি (stick) বা যাহা হাতে লইয়া কাঠি-নৃত্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহাও লাঠিরই একটি অধঃপতিত (degenerated) রূপ।

যুদ্ধ-নৃত্য প্রধানতঃ সমবেত-নৃত্য—একক-নৃত্য নহে ; কারণ, ইহা সৈন্যদলের নৃত্য, ব্যক্তিবিশেষের একক অনুষ্ঠান নহে। পাইক, ঢালী, রায়বেঁশে কিংবা কাঠি-নৃত্য প্রত্যেকটিই সমবেত-নৃত্য, ইহাদের একক কোন পরিচয় নাই। পাইকের একক নৃত্য দেখিতে পাওয়া যায় না, দেখিতে পাওয়া যাইবার কথাও নহে। তবে পূর্ব বাংলায় লাঠিখেলা নামক যে অনুষ্ঠান দেখা যায়, তাহা লাঠি-নৃত্য। লাঠি-নৃত্য যেমন একক-নৃত্য হইতে পারে, তেমনই যুগ্ম-নৃত্যও হইতে পারে। যুদ্ধ-নৃত্যের ক্ষেত্রে ইহারা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বলিয়াই মনে হয়।

যুদ্ধনৃত্য বর্তমান বাংলার লোক-সমাজের মধ্যে নানাভাবে আত্মগোপন করিয়া আছে। ছো-নাচ সম্পর্কিত আলোচনায় পূর্ববর্তী প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, পুরুলিয়ার ছো-নাচ যুদ্ধ-নৃত্যেরই একটি অবশেষ মাত্র—যুদ্ধই প্রধানতঃ ইহার বিষয় এবং পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনীর মধ্যে মধ্যে যে সকল অংশে যুদ্ধের অনুষ্ঠান আছে, তাহাই কেবল ছো-নাচের মধ্য দিয়া রূপায়িত হইয়া থাকে, গীতি-সুলভ কোন বিষয়ই ছো-নাচের মধ্য দিয়া রূপায়িত হয় না। সমাজে প্রকৃত যুদ্ধের কায লুপ্ত হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধের সংস্কার লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে না, সাংস্কৃতিক জীবনের নানারূপের মধ্য দিয়া তাহা বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। ছো-নাচের মধ্য দিয়া তাহারই একটি রূপ প্রকাশ পাইয়াছে।

অনেক সময় ব্রত-নৃত্যের ভিতর দিয়া যুদ্ধ নৃত্যের কোন কোন রূপ আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। এই সম্পর্কে বীরভূম জিলার ভাঁজো-নৃত্য এবং পুরুলিয়া জিলার জাওয়া-নৃত্যের কথা উল্লেখ করিতে হয়। ভাঁজো-নৃত্যে নৃত্যের ভিতর দিয়া একটি কৃত্রিম যুদ্ধের (mockfight) অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। একদল যুবক সারি বাঁধিয়া একদল যুবতীর সম্মুখে দাঁড়ায়। তারপর একটি বালিস্তূপের দিকে একদল নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া যায়, পুনরায় পশ্চাতে ফিরিয়া আসে—এইভাবে একদল নৃত্য করিতে করিতে যখন সম্মুখে অগ্রসর হয়, তখন আর একদল নৃত্য করিতে করিতে পশ্চাৎ অপসরণ করিতে থাকে। ভাঁজোর বালি অধিকার লইয়া এই 'কপট সংগ্রামে'র অভিনয় হয়। পুরুলিয়া জিলায় ইহার রূপটি সামান্য একটু স্বতন্ত্র। সেখানে নৃত্য বা 'সংগ্রামশীল' উভয় দলই যুবতী দ্বারা গঠিত, যুবকেরা দূরে দাঁড়াইয়া তাহা দর্শন

করে মাত্র। অন্যান্য বিষয়ে ইহাদের মধ্যে আর কোনও পার্থক্য নাই। উভয় অনুষ্ঠানই ভাদ্র মাসে পালন করা হইয়া থাকে, উভয়ের সঙ্গেই বর্ষা-প্রকৃতির সম্পর্ক আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যুদ্ধ-নৃত্যেরই একটি বিশিষ্ট রূপ এখানে ব্রত-নৃত্যের রূপ লাভ করিয়াছে। বাংলার বিভিন্ন ব্রত-নৃত্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে তাহাদের মধ্য হইতে এই প্রকার আরও যুদ্ধ-নৃত্যের নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

এখানে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাইতে পারে; তাহা এই যে, যুদ্ধ-নৃত্যে নারীর স্থান কি? একথা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, যুদ্ধ-নৃত্যে সম্ভবতঃ নারীর কোন স্থান নাই; যুদ্ধ-নৃত্য যখন ব্রত-নৃত্যে পর্যবসিত হয়, তখনই নারী ইহাতে অংশ গ্রহণ করে, তৎপুর্বে ইহাতে তাহার কোন স্থান হইতে পারে না। অনেকে মনে করেন, পুরুলিয়ার ছো-নাচে যে নারীর কোন স্থান নাই এবং নারীর মুখোস পরিয়া পুরুষই যে তাহার অংশে অভিনয় করিয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে যুদ্ধ-নৃত্যে সমাজ নারীর কোন অধিকার স্বীকার করে না। কিন্তু আদিম গোষ্ঠী-সংগ্রামে নারীর যে বিশিষ্ট একটি স্থান ছিল, নাগাজাতিই তাহার প্রমাণ। বাংলার মধ্যযুগের সাহিত্যেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, নারীও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিত। ধর্মমঙ্গলে রাজকুমারী কাণড়ার অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিবার বৃত্তান্ত সকলেই অবগত আছেন। ইহার অন্যতম স্ত্রীচরিত্র লখাই ডোমনীর যুদ্ধ করিবার বৃত্তান্তও ধর্মমঙ্গলে পাওয়া যায়। পুর্ব বাংলার পল্লীসঙ্গীতে এখনও শুনিতে পাওয়া যায় যে, সেই অঞ্চলের নারীরাও ধনুর্বাণ হাতে লইয়া যুদ্ধ করিতেন। পূর্ববাংলার কাতিক ব্রতের একটি সঙ্গীতের এই অংশটি এই সম্পর্কে বিশেষভাবে লক্ষণীয়—

সাজিল কামিনী কুল   কানে দুলে কর্ণফুল
মারে তীর হুমকা বাঘের গায়রে,
রেবতী আর চন্দ্রকলা,   এক হাতে ধনুছিলা
আর হাতে বাইছা তুলে বাণরে।

সুতরাং দেখা যায়, নারীও সে যুগে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিত। অতএব যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিলে যুদ্ধনৃত্যেও অংশ গ্রহণ করিত এবং তাহার সঙ্গে সংগীতও নিশ্চয়ই সংযুক্ত ছিল। কারণ, নৃত্য এবং সঙ্গীত নারীরই প্রধান সংস্কার এবং ইহাতে তাহাদেরই অগ্রাধিকার।

সাত

গাজননৃত্য

চৈত্রসংক্রান্তির সময় বাংলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঢাকের বাদ্যে মুখরিত হইয়া উঠে ; এই সময় বাঙ্গালীর জাতীয় নৃত্যোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে বলিয়া অনুভব করা যায়। এই সময়ই পুরুলিয়ার ছো-নাচ, বীরভূম, বাঁকুড়ার ভক্ত্যানাচ, হুগলি-চব্বিশ পরগণার গাজন নাচ, মালদহের গম্ভীরা নাচ, দক্ষিণ বাংলার নীলের নাচ, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের বোলান ও আলকাপ, ঢাকার কালী কাচ, পূর্ব বাংলার অন্যান্য স্থানের ঢাকপাট ইত্যাদি বহুবিধ লোক-নৃত্যেরই অনুষ্ঠান হয়। ইহার একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, উপরে যে সকল নৃত্যগুলির উল্লেখ করিলাম, তাহাদের প্রত্যেকটিই পুরুষের নৃত্য, চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে যে নৃত্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহাতে নারীর কোন স্থান নাই। ইহাতে পুরুষই নারীর বেশ ধারণ করিয়া থাকে ; ইহার আরও একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহা সর্বত্রই একক নৃত্য নহে, ইহাতে সমবেত নৃত্য বা সারী নৃত্যও আছে, শিবগৌরীর যুগ্মনৃত্যও দেখা যায়। এই নৃত্যে যে নারীর অংশ আছে, তাহা সত্য , কিন্তু ব্রতনৃত্য কিংবা কোন কোন কৃষি নৃত্যের মত ইহাতে নারী স্বয়ং অংশ গ্রহণ করে না।

চৈত্র সংক্রান্তি অনুষ্ঠানটি একটি সূর্যোৎসব, ইহাই বাংলার অন্যতম জাতীয় (national) উৎসব , এমন কি, দুর্গোৎসব অপেক্ষাও সাধারণ জীবনের মধ্যে ইহার প্রভাব বেশি। দুর্গোৎসব সমাজের উচ্চ স্তরকে প্রভাবিত করিলেও গাজনোৎসব বাঙ্গালীর সাধারণ জীবনের স্তর ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। বাঙ্গালীর সাধারণ জীবনের স্তরেও যে একটি সংস্কৃতিগত অখণ্ডতা গড়িয়া উঠিবার অবকাশ পাইয়াছিল, বাঙ্গালীর গাজনোৎসবই তাহার প্রমাণ। কিন্তু গাজনোৎসবের লক্ষ্য এক এবং অভিন্ন থাকা সত্বেও, ইহার অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করা হইত ; সেইজন্যই বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়। গাজন উৎসবের মূল লক্ষ্য কৃষিকার্যমূলক, সেই অর্থে ইহাকে বাংলার প্রধানতম কৃষি উৎসব বলিয়া উল্লেখ করা যায়। দুর্গোৎসবের মধ্যে বিভিন্ন উপকরণ. বিভিন্ন দিক হইতে আসিয়া মিশিয়া গেলেও তাহা মূলতঃ কৃষি উৎসব ব্যতীত আর কিছুই নহে। .কৃষিভিত্তিক সমাজে কৃষি উৎসবই

জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব হইবে, ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক। গাজনোৎসব দুর্গোৎসবের মত পণ্ডিতের হাতে পড়িয়া বিধিবদ্ধ (Codified) হয় নাই বলিয়া বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার বিভিন্ন রূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিশেষতঃ কৃষিকার্যও বাংলার সর্বত্র একই অভিন্ন প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হয় না, প্রত্যেক অঞ্চলেরই বৃষ্টিপাত দ্বারা তাহা নিয়ন্ত্রিত হয়। যে অঞ্চলে বৃষ্টির অভাব, সেই অঞ্চলে গাজনোৎসবের আচারগুলি যত জটিল, যে অঞ্চলে বৃষ্টির প্রাচুর্য সে অঞ্চলে স্বভাবতঃই তাহা তত জটিল নহে; সেই অনুযায়ীই ইহার অন্তর্ভুক্ত নৃত্যানুষ্ঠানটিও নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। যে অঞ্চলে গাজনোৎসবের আচারটি নিতান্ত জটিল, অঞ্চলে নৃত্যানুষ্ঠানটিও জটিল পরিচয় লাভ করিয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, পুরুলিয়ার ছো-নাচ যেমন ব্যাপক, তেমনই জটিল, ইহার বিষয় পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ইহার একমাত্র কারণ, বাংলাদেশের মধ্যে পুরুলিয়াতেই কৃষিকার্য সর্বাপেক্ষা কঠিন। সেইজন্য কৃষিকার্য সম্পর্কিত যে কোন অনুষ্ঠানই সেখানে অত্যন্ত জটিল পরিচয় লাভ করিয়াছে। কিন্তু পূর্ব বাংলায় গাজনোৎসবের মধ্যে যেমন কোন দুঃসাধ্য জটিল আচার নাই, তেমনই সেই অঞ্চলের নৃত্যানুষ্ঠানও কোন জটিল পরিচয় লাভ করিতে পারে নাই। কেবলমাত্র ঢাকার কালীকাচের মধ্যে তাহার কতকটা জটিলতা দেখা যায়; কিন্তু তাহার অন্য কারণ আছে, সে কথা পরে বলিব।

গাজনোৎসবের মূল উদ্দেশ্য সূর্যের সঙ্গে ধরিত্রীর বিবাহের অনুষ্ঠান। আদিম সমাজ এ কথা বিশ্বাস করিত যে, সূর্যের সঙ্গে যদি ধরিত্রীর মিলন হয়, তবে ধরিত্রী শস্যপূর্ণা হইয়া উঠিতে পারে। সেইজন্য যখন দ্বাদশ রাশির পথে সূর্যের একবার পরিভ্রমণ শেষ হইয়া যায়, অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির সময় সূর্যের ধরিত্রীর সঙ্গে প্রতি বৎসর নূতন করিয়া বিবাহের অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে। কারণ, আদিম সমাজ বিশ্বাস করিয়াছে, সূর্যই ধরিত্রীর শস্যসম্পদের নিয়ামক, কেন না, সূর্য-তেজ দ্বারা রৌদ্র-বৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত হয়, বন্ধ্যা ধরিত্রী কেবলমাত্র সূর্য-তেজ দ্বারাই শস্যসম্পদে ফলবতী হইয়া উঠে। সেইজন্য পৃথিবীর সকল কৃষিজীবী আদিম সমাজেই সূর্য এবং ধরিত্রীকে অবলম্বন করিয়াই তাহাদের অলৌকিকতা বোধ কিংবা অধ্যাত্মবোধ গড়িয়া উঠিয়াছে। বাংলাদেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

যখন বাংলাদেশে পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের প্রভাব স্থাপিত হইল, তখন এ দেশের

সমাজে শিবই সাধারণ সমাজের প্রধান দেবতা (Supreme God) বলিয়া গণ্য হইলেন ; কিন্তু তাহার পুর্বে সূর্যই যে প্রধান দেবতা ছিলেন, চৈত্র সংক্রান্তির সূর্যোৎসবের ব্যাপকতা দেখিয়া তাহাই মনে হয়। সমাজের উপর শৈবধর্মের প্রাধান্য স্থাপিত হইবার পর হইতেই বাংলার লৌকিক সূর্যোৎসব দুইটি ধারায় বিভক্ত হইয়া যায়, প্রথমতঃ ধর্মের গাজন, দ্বিতীয়তঃ শিবের গাজন। ধর্মের গাজনের মধ্যে লৌকিক সূর্য-পূজার আদিরূপটি এখনও কতকটা প্রকাশ পাইলেও, শিবের গাজনের মধ্যে তাহা অনেকটা প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

শৈব ধর্মের প্রভাব বশতঃ শিবই যখন সাধারণ সমাজে প্রধান দেবতা (Supreme God) বলিয়া গণ্য হইলেন, তখন হইতেই সূর্যোৎসবের নায়ক-নায়িকা হইলেন শিব এবং গৌরী—ইঁহারাই যথাক্রমে সূর্য এবং ধরিত্রীৰ প্রতীক্। লৌকিক নানা অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া শিবগৌরীর নৃত্যই গাজনোৎসবের মূল বিষয় ছিল, এখনও কোন কোন অঞ্চলে তাহাই আছে, কিন্তু তথাপি নানাদিক হইতে তাহা প্রভাবিত হইয়া ইহার মৌলিক পরিচয়ও অনেকাংশে গোপন করিয়া দিয়াছে।

যে সময় বাংলা দেশে গাজনোৎসবের অনুষ্ঠান হয়, সেই সময়ই পশ্চিম বাংলার সীমান্তলগ্ন অঞ্চলে অষ্ট্রিকভাষী সাঁওতাল এবং দ্রাবিড ভাষী ওরাওঁ জাতির মধ্যেও অনুরূপ একটি অনুষ্ঠান দেখা যায়, তাহা 'সহরুল' বলিয়া পরিচিত। ইহাদের উপর হিন্দু পুরাণের কোন প্রভাব নাই বলিয়া ইহাদের মধ্যেই অনুষ্ঠানটির মৌলিক পরিচয়টি স্পষ্টতরভাবে এখনও অনুভব করা যায়। সেখানে শিব নাই, কিন্তু শিবের পরিবর্তে পাহান অর্থাৎ গ্রাম বা গোষ্ঠীর মোড়ল শিবের স্থান অধিকার করিয়া থাকে এবং তাহার সঙ্গেই ধরিত্রীর বিবাহের একটি প্রতীক্ অনুষ্ঠান হয়। বাংলার গাজনোৎসবে শিবের রূপসজ্জায় সূর্য এবং গৌরীর রূপসজ্জায় ধরিত্রী আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে এবং ইহাদের উভয়ের নৃত্যানুষ্ঠানই এই উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। শিবের সঙ্গে তাহার অনুচররূপে ভূতপ্রেতগণ এবং গৌরীর সঙ্গে তাহার অনুচর ডাকিনী-যোগিনীগণ কখনও কখনও সমবেতভাবে কখনও বা এককভাবে নৃত্য করিয়া থাকে। কখনও হরপার্বতীর যুগ্ম নৃত্যও হয়, কখনও তাহাদের একক নৃত্যও হয়। নৃত্যের তালে তালে উচ্চ রবে ঢাক বাজিতে থাকে। ঢাক বাদ্য ইহার একটি প্রধান বিশেষত্ব। চৈত্র সংক্রান্তির ঢাক বাংলা দেশের একটি প্রচলিত কথা হইয়া

দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি. কালক্রমে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার অন্তর্ভুক্ত নৃত্যের প্রকৃতি বাহিরের দিক হইতে বিভিন্ন রূপ লাভ করিয়াছে। এই উপলক্ষে ঢাকা অঞ্চলে যে নৃত্য দেখা যায়, তাহা কালীকাচ বলিয়া পরিচিত। যদিও শিব-গৌরীর যুগ্ম নৃত্যও এই অঞ্চলের কোন কোন অংশে দেখা যায়, তথাপি এই অঞ্চলের চৈত্রসংক্রান্তির নাচের মধ্যে কালীকাচই নানাদিক হইতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অথচ চৈত্রসংক্রান্তির সময় কালী কিংবা কালিকা-দেবীর আবির্ভাবের কোন কারণ নাই। কাচ শব্দের অর্থ অভিনয়ার্থ নটনটীর সজ্জাগ্রহণ ; ইহাতে কালীর সজ্জা গ্রহণ করিয়া নৃত্যের অনুষ্ঠান হয় বলিয়া ইহা কালীকাচ বলিয়া পরিচিত। চৈতন্যদেব চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে যে নৃত্য-নাট্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাকে কাচ নৃত্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কালীকাচ শব্দটিও তাহার মতই প্রাচীন। কালীকাচে কালীই প্রধান নায়িকা। যথারীতি সজ্জা গ্রহণ করিয়া তাহার সঙ্গে শিবও আবির্ভূত হইয়া থাকেন, কিন্তু শিব নৃত্যে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন না, বরং তাহার পরিবর্তে অসুর কালীর সঙ্গে নৃত্যে অংশগ্রহণ করে। ইহা একটি যুদ্ধনৃত্যের রূপ লাভ করে। যুদ্ধ সমাজের একটি অতি আদিম সংস্কার, বাহির হইতে যতই আমরা ইহার অবশ্যম্ভাবিতা কিংবা ভয়াবহতা ভুলিয়া থাকিবার প্রয়াস পাই না কেন, নানভাবে ইহার ভাব আমাদের অন্তরের মধ্যে ক্রিয়া করিয়া থাকে। সেইজন্য লোক-নৃত্যের মধ্য দিয়া যুদ্ধের ভাবটি নানা ক্ষেত্রেই প্রকাশ পায়। পূর্বেই বলিয়াছি, চৈত্রসংক্রান্তির সময় হইতে পুরুলিয়ায় যে ছো-নাচের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহাও যুদ্ধ নৃত্য, কালীকাচও তাহাই। কালীর সঙ্গে অসুরের যুদ্ধই কালীকাচের বিষয় , পৌরাণিক হিন্দুধর্ম এ-দেশের সমাজে প্রচার লাভ করিবার পূর্বে হয়ত ইহাতে অন্য কোন লৌকিক বিষয়ই ছিল। কালীর সঙ্গে শিবের যুদ্ধ করিবার কোন অবকাশ নাই, সেই জন্য শিবকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় রাখিয়া তাহার সম্মুখেই অসুরের সঙ্গে কালীর যুদ্ধনৃত্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কিন্তু শিব ইহাতে নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিলেও তাহা দ্বারাও যে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না, তাহা নহে—কারণ, ইহাতে কোন কোন সময় দেখা যায়, শিব ধূলিতে শয়ন করিয়া থাকেন, তাহার বুকের উপর একটি পাকা কলা আনিয়া স্থাপন করা হয়, তারপর কালী হাতে তরবারি লইয়া নৃত্য করিতে করিতে আসিয়া এক কোপে শিবের বক্ষোপরিস্থিত কলাটি কাটিয়া দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলেন, শিবের বুকে

একটুকু আঁচড় পর্যন্ত লাগিতে দেখা যায় না। কালীকাচের মধ্যে এই প্রকার কৌশল দেখানই প্রাধান্য লাভ করিয়া গিয়াছে। ইহার মূল উদ্দেশ্য নিতান্ত গৌণ হইয়া পড়িয়াছে।

মুর্শিদাবাদ জিলায় কিছুদিন পুর্ব পর্যন্তও চৈত্রসংক্রান্তির শিবের গাজন উপলক্ষে এক বীভৎস নৃত্যের অনুষ্ঠান হইত, তাহা 'মড়া খেলা' বলিয়া পরিচিত, ইহা প্রকৃত মৃতদেহ লইয়া ভক্ত্যা বা গাজুনে সন্ন্যাসীদিগের নাচ। সেই নৃত্যানুষ্ঠানের নির্ধারিত দিনে গাজুনে সন্ন্যাসিগণ শ্মশান হইতে সৎকারের জন্য আনীত শব কাড়িয়া লইয়া আসিয়া তাহা কাঁধে লইয়া ঢাকের তালে তালে নৃত্য করিত। কান্দি প্রভৃতি স্থান হইতে মৃতদেহ গঙ্গাতীরে দাহ করিবার উদ্দেশ্যে শব-যাত্রিগণ যখন দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া চলিতে থাকিত, তখন পথিমধ্যে গাজুনে সন্ন্যাসিগণ অতর্কিতে সেই শবযাত্রিদলকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের হাত হইতে মৃতদেহ ছিনাইয়া লইয়া যাইত। তারপর সেই মৃতদেহ লইযা তাহারা নৃত্য করিত। এই নৃত্য কেবলমাত্র যে একটি উচ্ছৃঙ্খল আচরণ কিংবা মত্ততার পরিচায়ক ছিল, তাহা নহে, ইহা ধর্মীয় আচারের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল বলিয়া ইহার মধ্যেও একটি রীতি অনুসরণ করা হইত। তবে সন্ন্যাসিগণ অনেক সময় মদ্যাদি পান করিয়া এই নৃত্যে অংশ গ্রহণ করিত বলিয়া সর্বদা সমবেত নৃত্যের রূপ ইহা লাভ করিতে পারিত না, তবে ইহার উদ্দেশ্য তাহাই ছিল। বর্তমানে শবদেহ সর্বদা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না বলিয়া সন্ন্যাসিগণ অনেক ক্ষেত্রেই মৃতদেহের একটি নকল রূপ (dummy) তৈরী করিয়া এই কার্যে ব্যবহার করে, সুতরাং ইহার মূল অবলম্বনটি লুপ্ত হইয়া গেলেও আচারটি রক্ষা পাইবার পক্ষে কোন বাধা সৃষ্টি হয় নাই। গাজনোৎসব কালক্রমে দেশীয় নানা ধর্মাচারের সঙ্গে সংমিশ্রণ লাভ করিয়াছে, বাংলার যে অঞ্চলে যে লৌকিক ধর্মের প্রভাব ছিল, সেই লৌকিক ধর্মের আচার দ্বারাই তাহা সেই অঞ্চলে প্রভাবিত হইয়াছে। সেইজন্য মূলতঃ উদ্দেশ্য অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও বাংলার গাজনোৎসব এবং ইহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নৃত্য বহিরঙ্গে নানা বিচিত্র রূপ লাভ করিয়াছে।

এই সম্পর্কে মালদহের গম্ভীরা নৃত্যের কথা উল্লেখ করিতে পারা যায়। গম্ভীরা মালদহের এক জাতীয় উৎসব, গীত এবং নৃত্য এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ। পৌরাণিক প্রভাব বশতঃ ইহাও বহিরঙ্গে শিব ও অন্যান্য দেবদেবীর নাম লইবার

চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা মালদহের কৃষকেরই উৎসব, কৃষিকর্মের বাৎসরিক সাফল্য ও ব্যর্থতার পর্যালোচনাই এখনও ইহার মূল বিষয়। লৌকিক উৎসব মাত্রেরই নৃত্য একটি প্রধান অঙ্গ, সেই সূত্রে ইহাতেও নৃত্যের একটি বিশেষ স্থান রহিয়াছে। গম্ভীরা নৃত্যে দেবদেবীর মুখোস ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এই সম্পর্কে পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ববর্তী একটি বিবরণী এখানে উদ্ধৃতি-যোগ্য। তাহাতে লিখিত হইয়াছে—'কালিকা, চামুণ্ডা, নরসিংহ, বাসুলী, রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান, বুড়াবুড়ী শিব ইত্যাদি বিজ্ঞাপক মুখোস ব্যবহার হইয়া থাকে। ভূত প্রেত কার্তিক ঘোঁড়া ও চালী প্রভৃতির নৃত্যও হয়। মুখা বা মুখোস কাষ্ঠনির্মিত বা মৃত্তিকানির্মিত হইয়া থাকে। পূর্বকালে কাষ্ঠনির্মিত মুখাই ব্যবহৃত হইত। নিম্বকাষ্ঠের মুখা প্রশস্ত। সকল সূত্রধর মুখা খোদিত করিতে পারে না। শাস্ত্রোক্ত প্রমাণানুসারে মুখা নির্মিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে যে দেবদেবীর যে যে প্রকার মূর্তির বর্ণনা আছে, মুখা তদ্রূপ হইয়া থাকে। পটুয়ারা মুখার উপর বর্ণবিন্যাস করিয়া দেয়। কুম্ভকারেরা কালী প্রভৃতির মুখা গড়িয়াও তাহাতে বর্ণ ফলিত করিয়া বিক্রয় করে। মালাকারেরা উক্ত মুখোসের শিরোভূষণ নির্মাণ করিয়া দেয়। নৃত্য করিবার পূর্বে ভক্ত গম্ভীরাগৃহে পূজকের নিকট নূতন কাষ্ঠনির্মিত মুখার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া লয়। যাহাদের মুখা আছে, তাহারা বিজয়া দশমীর দিবস পূজাদি প্রদান করিয়া থাকে। এক্ষণে এই প্রকার পূজা-প্রথা প্রায়ই উঠিয়া গিয়াছে। অনেক প্রাচীন মুখা গম্ভীরাগৃহে লম্বিত থাকিতে দেখা যায়। এ-দেশের সাধারণের বিশ্বাস, কোন কোন মুখা জাগ্রত এবং কোন কোন মুখার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভীষণ ক্রোধপরায়ণা। অনেকে মুখা লইয়া নৃত্য করিতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছে। পূর্বে যাহারা দেবদেবী, বিশেষতঃ কালী, চামুণ্ডা, বাসুলী নরসিংহ প্রভৃতি দেবদেবীর মুখা লইয়া নৃত্য করিত, তাহারা তৈলাদি বর্জন এবং হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া পবিত্র মনে পবিত্র বসন-ভূষণে ভূষিত হইয়া নৃত্য করিত। এক্ষণে সর্বত্র এরূপ প্রথা আর দৃষ্টি হয় না। মুখার ঊর্ধ্বদিকে ও পশ্চাদংশে একটি এবং দুই কর্ণের পশ্চাতে দুইটি ছিদ্র দৃষ্ট হয়, তাহাতে রজ্জু বদ্ধ থাকে। সেই রজ্জু দ্বারা মুখা মুখের উপর বন্ধন করা হয়। মুখার ঘর্ষণ হইতে মুখ রক্ষা করিবার জন্য চাদর বা বস্ত্রখণ্ড দিয়া কর্ণবেষ্টন করিয়া পাগড়ি বাঁধা হয়। ঘোড়ানাচের ঘোড়া বংশনির্মিত এবং কাগজাদি দ্বারা মণ্ডিত। ঘোড়ার পৃষ্ঠদেশে যেখানে জিন দিতে হয়, তথায় ছিদ্র

থাকে, সেই ছিদ্রের মধ্য অশ্বারোহী কটিদেশ পর্যন্ত প্রবেশ করাইয়া অশ্বের উপর পার্শ্বস্থিত রজ্জু স্কন্ধদেশে রক্ষা করিয়া নৃত্য করিতে থাকে। কার্তিকের ময়ূরাদির নৃত্যও ঐ প্রকার। এতদ্ব্যতীত ভালুক নাচও হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে ভালুকের মুখা এবং কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত শন বা পাটের চুল দিয়া সর্বশরীর আবৃত করিয়া মানব ভালুকের মুখা পরিধান করিয়া থাকে এবং অপর একজন সেই ভালুককে নাচায়। দুর্গা প্রতিমার মত তাঁহার ক্ষুদ্র চালচিত্রখানিও সুন্দররূপে সজ্জিত করা হয়। এক ব্যক্তি আপন কটিদেশের সম্মুখে চালী বন্ধন করে এবং ছোট ছোট বালক বালিকাকে তদুপরি বসাইয়া দুই হস্ত দ্বারা পশ্চাৎ হইতে ধরাইয়া করা করায়। কালীমুখার নৃত্যকালে কখন কখন চারিখানি হস্তবিশিষ্ট দেখা যায়, উহার চারিখানি হস্তই কাষ্ঠের। নৃত্যকারী আপন হস্ত পশ্চাতে বন্ধন করিয়া নৃত্য করে। চামুণ্ডামুখা নৃত্যকালে হস্তে খর্পর ও পারাবতাদি ধারণ কবিয়া নাচিতে থাকে। প্রধান ভক্ত হনুমানের মুখা পরিধান করিয়া লঙ্কাদগ্ধ, সাগর পার ইত্যাদি অনুষ্ঠান করে। শিব-পার্বতী শান্তভাবে নৃত্য করিয়া থাকে। পার্বতীর কক্ষে পূর্ণঘট ও আম্রশাখা এবং এক হস্তে প্রস্ফুটিত কমল থাকে। বুঢা বুঢী (বুড়াবুড়ী) নৃত্য কৌতুকপ্রদ।' (হরিদাস পালিত, 'আদ্যের গম্ভীরা', মালদহ, ১৩১৯ পৃঃ ৪৭-৪৯)

পুরুলিয়ার ছো-নৃত্যে রামায়ণ প্রসঙ্গ মুখ্যস্থান অধিকার করে। শিব-প্রসঙ্গ ইহাতে স্থান লাভ করিলেও মহাভাবতের কোন কোন বিষয়ও তাহাতে স্থান লাভ করে, মালদহের গম্ভীরায় শিব-প্রসঙ্গই একমাত্র প্রসঙ্গ। এমন কি, ইহাতে যে নৃসিংহাবতারের নৃত্যের অনুষ্ঠান হইতে দেখা যায়, তাহা মূলতঃ বিষ্ণুর নৃসিংহাবতারের নৃত্য নহে। শিবের পত্নী চণ্ডীর আর এক নাম নারসিংহী, সংস্কৃতে তাঁহার একটি ধ্যানমন্ত্রও রচিত হইয়াছিল, এই নারসিংহীই ক্রমে বৈষ্ণব প্রভাব বশতঃ নৃসিংহাবতারে পরিণত হইয়াছিল, নতুবা চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত নৃত্যের মধ্যে কোথাও কোন বৈষ্ণব প্রসঙ্গ স্থান লাভ করিতে পারে নাই; শিব-প্রসঙ্গ সর্বত্রই হার মুখ্য বিষয়। তথাপি স্বীকার করিতে হয়, ছো-নাচের মুখোসের তুলনায় গম্ভীরা নাচের মুখোস অনেক নিকৃষ্ট। শুধু তাহাই নহে, ইহার মুখোসগুলি নির্মাণের রীতিও স্বতন্ত্র। ইহাদের গঠন কৌশল দেখিলে মনে হয়, এই অঞ্চলে পুরুলিয়ার মত এমন ব্যাপক মুখোসের ব্যবহারের রীতি কোনদিন ছিল না; কালক্রমে বাহির

হইতেই এই রীতি এখানে আসিয়া প্রবেশ করিয়া একটি ধর্মীয় আচারের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা সমাজের গভীরতম প্রদেশে নিজের প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ইহার নৃত্যরূপ অত্যন্ত প্রাচীন; মুখোস ব্যতীতও যে কোন কোন সময় এই নৃত্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহারই ধারাটি মুখোস নৃত্যের পুর্ববর্তীকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

মালদহের গম্ভীরা উৎসবে যে মুখোস নৃত্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহা প্রায়ই একক নৃত্য, কখন হরগৌরীর যুগ্ম নৃত্য; কিন্তু সমবেত নৃত্য নহে। নৃসিংহ নৃত্যে নৃসিংহের মুখোস ও বেশ পরিধান করিয়া একক নৃত্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, ঢাক বাদ্য এই নৃত্যের প্রধান অবলম্বন। দর্শকদিগের বিশ্বাস, নৃত্য-কালীন নৃত্যকারীর উপর বিষ্ণুর নৃসিংহাবতারের আবির্ভাব হয়; সেই জন্য করজোড়ে ভক্তি বিহ্বলচিত্তে গ্রাম্য দর্শকগণ এই নৃত্য দেখিয়া থাকেন। ইহাতে মুখোসধারিণী কালীর নৃত্য হয়; কিন্তু ঢাকাব কালীকাচের মত ইহাতে কালীর সঙ্গে অসুরের যুদ্ধ হয় না, কালীর একক নৃত্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে মাত্র, সুতরাং ইহা আর যাহাই হউক, যুদ্ধনৃত্য নহে। ঢাকার কালীকাচে যুদ্ধের অভিনয় হয় বলিয়া উহা যেমন জীবন্ত বলিয়া অনুভূত হয়, ইহা তেমন হয় না। অল্পক্ষণ পরই ইহা বৈচিত্র্যহীন ও একঘেয়ে হইয়া উঠে। কিন্তু ইহাতেও নৃত্যকারীর মধ্যে স্বয়ং কালীর আবির্ভাব হইয়া থাকে বিশ্বাস করা হয় বলিয়া ইহার বৈচিত্র্যহীনতা সাধারণ দর্শকদিগের মধ্যে বিরক্তি উৎপাদন করিতে পারে না, ধর্মের ভাবই শিল্পের অভাব পুর্ণ করিয়া দেয়। কিন্তু ছো-নাচই হউক, কিংবা কালীকাচই হউক, ইহাদের মধ্য হইতে ধর্মের ভাব সম্পূর্ণ দূর হইয়া গিয়াছে, সুতরাং ইহাদের শিল্পগুণ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিয়াছে। যেখানে ধর্মের বেড়াজাল, সেখানে বুদ্ধির মুক্তির অবকাশ নাই। সেইজন্যই তাহা অচিরেই জীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া ধূলিসাৎ হইয়া যায়। মালদহের গম্ভীরায় মুখোস নৃত্যেরও তাহাই হইয়াছে।

শিব বা ধর্মের গাজন উপলক্ষে ভক্ত্যানাচ পশ্চিম বাংলার একটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান। ভক্ত্যানাচ ঢাকের তালে ভক্ত্যা, বালা বা সন্ন্যাসীদিগের সমবেত নৃত্য। নিয়ম পালন করিয়া এই নৃত্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়; সুতরাং যে-কেহ এই নৃত্যের. অধিকারী হইতে পারে না। এই নৃত্যে ভক্ত্যাগণ বিশেষ কোন দেবদেবীর বেশ ধারণ করে না, কেবলমাত্র তাহাদের ভক্ত্যাবেশ অর্থাৎ গলায়

উপবীত ধারণ ও হাতে একখণ্ড বেত লইয়া সমবেতভাবে নৃত্য করিয়া থাকে। একটি প্রাচীন ধর্মমঙ্গল কাব্যের বর্ণনায় পাওয়া যায়,—'বেত হাতে নাচে গায় উভয় হাত তুলি।' শিব কিংবা ধর্মঠাকুরের বিস্তৃত মন্দির প্রাঙ্গণই এই নৃত্যের স্থান। কোন নারী ইহাতে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না, এমন কি, নারী যদি নিয়ম পালন করিয়া সন্ন্যাসিনীও হয়, তথাপি তাহার পক্ষে পুরুষের সঙ্গে নৃত্যে অংশ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। তবে একান্ত ধর্মীয় আচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলিয়া এই নৃত্যও যথার্থ রসস্ফূর্তি লাভ করিতে পারে নাই। কারণ, নৃত্যকারী ভক্ত্যাগণ এখানে উপবাস করিয়া কিংবা হবিষ্যান্ন আহার করিয়া তৈল বিনা স্নান করিয়া এই নৃত্যে অংশগ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাদের মানসিক পূর্ণ করাই ইহার উদ্দেশ্য। সুতরাং নৃত্যের যে শিল্পগুণ আছে, তাহা ইহার মধ্য দিয়া বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই এবং আচার নৃত্যের (ritual dance) যাহা বিশেষত্ব, অর্থাৎ বিশেষ আচাব লুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নৃত্যানুষ্ঠানেরও যে অবলুপ্তি হয়, তাহাই ইহার পক্ষেও অপরিহায হইয়াছে। আচার নিরপেক্ষ স্বাধীন কোন ক্ষেত্র লাভ করিতে না পারিলে কোন শিল্পবস্তুই স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না, এইভাবে যাহা আচারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিতে পারে নাই, আচার বিলুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারও বিনাশ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। গাজনের ভক্ত্যা নাচও আজ স্বাধীন নৃত্যরূপে বিকাশ লাভ করিতে না পারিবার জন্যই অনিবার্য ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছে।

আট

মুখোস নৃত্য

প্রত্যেক লোক-সমাজেই সংস্কৃতির বিভিন্ন উপকরণ প্রধানতঃ দুইটি দিক হইতে আসিয়া ইহার জীবনকে আশ্রয় করে। প্রথমতঃ উচ্চতর সমাজ হইতে আগত সংস্কৃতির কোন কোন উপকরণ লোক-সমাজ স্বাঙ্গীকৃত করিয়া লয়, আবার আর একদিক হইতে আদিবাসীর সমাজ-জীবন হইতে আগত কোন কোন উপকরণও ইহার মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। উচ্চতর সমাজে অনুশীলিত কোন সংস্কৃতি-রূপ যখন ইহার উচ্চ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া সাধাবণ জন-সমাজের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন প্রথমতঃ ইহার একটি অধঃপতিত (degenarated) পরিচয় প্রকাশ পায়, তারপর ইহা যখন লোক-সমাজের জীবনে স্বাঙ্গীকৃত হইয়া যায়, তখনই ইহা পুনরায় নূতন প্রাণে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। তেমনই নিম্নতম সমাজ-জীবন হইতেও সাংস্কৃতিক উপকরণ উচ্চতরসমাজ-জীবনেব মধ্যে প্রবেশ করে, তবে ইহাও ক্রমে স্বাঙ্গীকরণের পথই অনুসরণ করিযা থাকে। বাংলা দেশের লোক-সমাজ এই দুই দিক হইতেই প্রভাবিত হইয়াছে, সে কথা পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু এখানে কেবলমাত্র বাহির হইতে প্রভাবিত হইয়াছে, এ কথা বলিলেই যথেষ্ট হয় না, বাংলার কোন কোন অঞ্চলের জন-সমাজ যে আদিম জাতিব সমাজের উপর ভিত্তি করিয়াই গঠিত হইয়াছে, তাহাও প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হইয়া থাকে। বিশেষত বাংলা দেশের প্রান্তবর্তী অঞ্চল সমূহের লোক-সগাজ যে প্রধানত আদিম জাতি দ্বারাই মূলত গঠিত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, সেইজন্য এই সকল অঞ্চলের লোক-নৃত্যে আদিম জাতির সমাজের নৃত্যরূপ অনেক সময় প্রত্যক্ষ হয়।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে সকল নিম্নশ্রেণীর লোক বাস কবে, তাহাদেরও একটি প্রধান অংশ আদিম জাতি সম্ভূত। কিন্তু তাহাদের মধ্যে বিশিষ্ট কোন নৃত্যরূপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রচলিত নাই। ইহার কারণ কি? এ কথা সত্য, ক্রমে ক্রমে এই সকল জাতি বৃহত্তর বাঙ্গালী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলার লোক-জীবনের প্রবল প্রভাবের সম্মুখীন হইয়া তাহাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আর অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইতেছে না। এমন কি, যখন কোন

আদিম জাতি ইহার নিজস্ব সমাজ-জীবনের সংহতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তখন ইহার মধ্যে যে হীনমন্যতার (inferiority complex) সৃষ্টি হয়, তাহার ফলে ইহা তাহার নিজস্ব মৌলিক বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলে। প্রথমতঃ ইহা প্রতিবেশী উচ্চতর জাতির অনুকরণ আরম্ভ করে এবং অবশেষে এই অনুকরণের মধ্য দিয়াই ইহার আত্মবিলোপ ঘটে সকলের সঙ্গে তখন ইহা এককার ইহয়া বাস করিতে চাহে। যে সকল আদিম জাতি মুখ্যত বাংলার নিম্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাহাদের নিজস্ব যে সাংস্কৃতিক কোনও পরিচয় প্রকাশ পায় না, ইহাই তাহার কারণ। ইহারা সর্বক্ষেত্রেই উচ্চতর জাতিকে অনুকরণ করিতে থাকে এবং এই ভাবেই ক্রমে সকলের সঙ্গে একাকার হইয়া যায়।

নৃত্য আদিবাসীর সমাজ-জীবনের একটি প্রধান সংস্কার। ইহা প্রায় প্রত্যেক আদিবাসীর সমাজ-জীবনেই অন্তর্নিবিষ্ট। তবে আদিবাসীর জীবন-যাত্রার প্রণালীর উপর ইহার শক্তি নির্ভর করিয়া থাকে। যেমন কৃষিজীবী আদিবাসীর জীবনে ইহার শক্তি সর্বাপেক্ষা প্রবল, কিন্তু মৃগয়াজীবী বা যাযাবর আদিবাসীর জীবনে তাহা অপেক্ষাকৃত শক্তিহীন। বাংলা দেশের মধ্যবর্তী কিংবা ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যে সকল আদিবাসী বাস করে, তাহারা প্রধানতঃ কৃষিজীবী—মৃগয়াজীবী আদিবাসী এই অঞ্চলে প্রায় নাই বলিলেই চলে। সুতরাং কৃষিজীবী আদিবাসীর জীবনের দিক হইতে বাংলার লোক-সমাজের উপর যে প্রভাব অনুভব করা যায়, তাহা নানা কারণেই অত্যন্ত শক্তিশালী বলিয়া মনে হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে তাহাই হইয়াছে। বাংলার লোক-নৃত্যের মধ্যে যে বৈচিত্র্য দেখা যায়, তাহার ইহাই কারণ। সেই বিষয়টিই এখানে একটু বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ মুখোস নৃত্যের কথাই ধরা যাউক। আদিবাসী অঞ্চলে ইহার ব্যাপক প্রচলন হইতে ক্রমে ইহা নিম্নতর হিন্দু সমাজেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, সুর এবং তালের সহযোগে সমগ্র দেহের ভিতর দিয়া বিশেষ একটি ভাবের অভিব্যক্তিই নৃত্য। উচ্চাঙ্গের শিল্পী সমগ্র দেহটির ভিতর দিয়া তাহার উদ্দিষ্ট ভাবটি ফুটাইয়া তুলিয়া থাকেন, এই কার্যে তাহার পদযুগল যেমন সাহায্য করে, দুইখানি হাতও তেমনি সাহায্য করে; তারপর

দুইখানি চক্ষু এবং সমগ্র মুখাবয়ব পদ ও হস্ত সঞ্চালনের সঙ্গে সমভাবে সহায়ক থাকে। মানবদেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মিলিয়া একটি সামগ্রিক আবেদন সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রত্যেক সমাজেই প্রধানতঃ লোক-নৃত্যের ক্ষেত্রেই মুখোস পরিয়া নৃত্য করিবারও একটি ধারা প্রচলিত আছে। ইহাতে নৃত্যকারীর মুখাবয়ব তাহার পরিহিত বিশেষ একটি মুখোস (mask) দ্বারা আবৃত থাকে এবং এই ভাবেই নৃত্যকার্য চলিয়া থাকে। ইহার একটি প্রধান ত্রুটি এই যে, একটি মাত্র ভঙ্গি বা ভাব মুখোসের আকৃতিতে স্থির (rigid) লইয়া থাকে— নৃত্যকালীন ইহার কোন পরিবর্তন সম্ভব হয় না। কেবলমাত্র হস্ত ও পদ সঞ্চালনের দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা জীবিত মানুষেরই নৃত্য , নতুবা ইহাকে পুতুলের নৃত্য বলিয়া ভ্রম হইতে পারিত। সুতরাং মুখোস উচ্চাঙ্গের শিল্পসম্মত নৃত্যের মধ্যে স্থান পাইতে পারে নাই, এখনও লোক নৃত্যের স্তরেই রহিয়া গিয়াছে।

এ কথা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, মুখোস লোক-নৃত্যেই হউক, কিংবা উচ্চাঙ্গ নৃত্যেই হউক, স্থান পাইবার যোগ্য নহে , কারণ, ইহার দ্বারা নৃত্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীবন্ত না হইয়া উঠিয়া নিষ্প্রাণ হইয়া উঠে। সেইজন্য মুখোস নৃত্যের ক্ষেত্রও আজ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষেরও বিভিন্ন অঞ্চলের লোক-নৃত্যের মধ্যে বিশেষত দক্ষিণ ভারতের কথাকলি নৃত্যে একদিন মুখোস ব্যবহারেরই রীতি ছিল, আজ তাহার পরিবর্তে মুখটি বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত করিয়া এবং সুবৃহৎ শিরোভূষণ প্রভৃতি ধারণ করিয়া মুখোসের স্থান পূর্ণ করা হইতেছে। কিন্তু ইহাতেও মুখ যে ভাবে চিত্রিত করা হইয়া থাকে, তাহার ফলে তাহার উপর ভাবের সূক্ষ্ম অভিব্যক্তিগুলি প্রকাশ পাইতে পারে না। সুতরাং মুখোস পরার সঙ্গে ইহার কোন পার্থক্য সৃষ্টি হইতে পারে নাই।

ভারতবর্ষের কেবল আদিবাসী এবং আদিবাসী প্রভাবিত অঞ্চল ব্যতীত অন্য অঞ্চলে মুখোস পরিয়া নৃত্য করিবার রীতি এখন প্রায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছে।

ভারতীয় আদিবাসী জাতি ভূত-প্রেত বিশ্বাসী , মুখোসের ভিতর দিয়া তাহাদের এই রূপটিই প্রকাশ করিয়া তাহারা ঐন্দ্রজালিক (magic) ক্রিয়া সম্পন্ন করিত এবং বীভৎস রসের সৃষ্টি করিত। সুতরাং নৃত্যের যাহা প্রধান লক্ষ্য আনন্দসৃষ্টি, তাহা আদিবাসী-পরিকল্পিত মুখোস কিংবা তৎপরিহিত নৃত্য দ্বারা কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। সেই জন্য আদিবাসী সমাজে

শিক্ষা বিস্তারের ফলে কুসংস্কার দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের মধ্যেও মুখোস নৃত্য আজ আর বড় দেখিতে পাওয়া যায় না।

মুখোস নৃত্য একমাত্র আদিবাসী অঞ্চল ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলে খুব প্রাচীনকাল হইতেই যে প্রচলিত ছিল, তাহা নহে; কারণ, বুঝিতে পারা যায় যে, মুখোস পরিয়া নৃত্যই হউক, কিংবা পুতুল নাচই হউক, ইহাদের কোনটিই নৃত্যশিল্পের উৎকর্ষের পরিচায়ক নহে, বরং সমাজে লোক-নৃত্যের যখন অধঃপতন (decadence) দেখা যায়, তখনই ইহার মধ্যে প্রকৃত নরনারীর নৃত্যের পরিবর্তে মুখোস পরিয়া নরনারীরূপ পুরুষের নৃত্য এবং নিষ্প্রাণ পুতুলনৃত্যের প্রচলন হইয়া থাকে। যেখানে নারীর অভাবে পুরুষকে নৃত্য করিতে হয় এবং নারীর নৃত্য পুরুষ অনুকরণ করিবার সূচনা করে, সেখানেই লোক-নৃত্যে মুখোস ব্যবহৃত হইতে থাকে। যে সমাজে মুখোস নৃত্যের প্রচলন আছে, সেই সমাজে সাধারণতঃ পুরুষের সঙ্গে নারী নৃত্যে যোগদান করে না। সামাজিক কারণে নারীর যখন চিরাচরিত নৃত্য পরিত্যাগ করিতে হয়, অথচ জাতির একটি সুদৃঢ় ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করাও কঠিন বলিয়া বোধ হয়, তখনই পুরুষকে নারীর মুখোস পরিয়া লোক-নৃত্যের ধারাটি সমাজের ভিতর দিয়া অব্যাহত রাখিয়া অগ্রসর হইতে হয়। নতুবা যে লোক-সমাজে স্ত্রীপুরুষের সমান মর্যাদা রক্ষা পায়, সেই সমাজে পুরুষের পার্শ্বে প্রকৃত নারীকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার মুখোস পরিয়া পুরুষকে নৃত্য করিবার প্রয়োজন হয় না।

মুখোস নৃত্য দুই প্রকার—এক প্রকার নৃত্যকে ইংরেজিতে magic dance বলা হয়। ঐন্দ্রিজালিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিবার জন্য ওঝা অনেক সময় মুখোস ধারণ করিয়া নৃত্য করে; ইহার উদ্দেশ্য আনন্দ দান নহে; কোন ঐন্দ্রজালিক পদ্ধতিতে সমাজের মঙ্গলবিধান মাত্র। বাংলা দেশের কোন কোন অঞ্চলে গাজনের সময় সন্ন্যাসী এবং ভক্তেরা এই নৃত্য করিয়া থাকে। দার্জিলিঙের পার্বত্য অধিবাসীদিগের মধ্যেও ইহার প্রচলন আছে। লোক-নৃত্য বলিতে যাহা বুঝায়, ইহা তাহা নহে। বাংলার লোক-নৃত্যের মধ্যে ব্যাপকভাবে যাহাতে এখন মুখোস ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার নাম ছো-নৃত্য। সং কথাটি হইতে ছো কথাটি আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহা বাংলা দেশের একটি মাত্র অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বর্তমান সময়ে পুরুলিয়া ও তাহার সংলগ্ন সেরাইকেলা অঞ্চলেই ইহার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ববর্তী কালে বিস্তৃততর অঞ্চল ব্যাপিয়া ইহার প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয়। যদিও বর্তমান কালে সেরাইকেলাই এই নৃত্যচর্চার কেন্দ্রভূমি, তথাপি পশ্চিম বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ইহার বিশেষ প্রভাব অনুভূত হয়।

বাংলার পল্লীজীবনে যে সকল লৌকিক (popular) উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহাদের মধ্যে চৈত্র সংক্রান্তির গাজনোৎসব সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। প্রকৃত পক্ষে ইহাকে বাংলার এক জাতীয় উৎসব বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায়। সর্বক্ষেত্রেই বাংলার সামন্ত রাজগণ দুর্গোৎসবের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই নিজেরাই দুর্গোৎসবের আয়োজন করিতেন। কিন্তু গাজনোৎসব বাংলার পল্লীসমাজের লোকমানস হইতে উদ্ভূত এবং এখনও তাহাই হইয়া থাকে। 'ছো-নাচ' পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের গাজনোৎসবেরই একটি অংশ। পূর্বে অপরিহার্য অঙ্গ ছিল; এখন গাজনের অনুষ্ঠান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া প্রায় একটি স্বাধীন আনন্দানুষ্ঠানে (secular function) পরিণত হইয়াছে। কিন্তু স্বাধীন আনন্দানুষ্ঠানে পরিণত হইলেও ইহা একদিক দিয়া ধর্মকেন্দ্রিক। নৃত্যের ভিতর দিয়া ইহাতে যে বিষয়গুলি অভিনীত হয়, তাহা সর্বদাই হিন্দু পৌরাণিক, নিজের স্বাধীন এবং স্বেচ্ছাচারী কল্পনার ফল নহে, তবে একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বিষয়গুলি একান্ত পুরাণানুসারী নহে, পুরাণ হইতে কতকগুলি সুপরিচিত চরিত্র গ্রহণ করিয়া পুরাণেরই কতকগুলি স্থূল ঘটনা নৃত্যের ভিতর দিয়া অভিনয় করিবার সূত্রে নূতন নূতন বিবরণও ইহার মধ্যে গৃহীত হয়; কিন্তু পুরাণ বহির্ভূত কোন চরিত্র কিংবা তাহার আচরণ প্রধানতঃ ইহার মধ্যে স্থান পায় না। যে সমাজে এই নৃত্য প্রচলিত আছে, অর্থাৎ যাহারা নৃত্যকারী কিংবা ইহার দর্শক, তাহারা প্রায় প্রত্যেকেই নিরক্ষর; সুতরাং পুরাণ সম্পর্কে তাহাদের জ্ঞান পুঁথিগত নহে, বরং লোকশ্রুতিগত; সেইজন্য সর্বত্রই যে ইহাতে সংস্কৃত পুরাণের নির্ভুল অনুকরণই সম্ভব হয়, তাহা নহে; কিন্তু তথাপি পৌরাণিক কাহিনীর কোথাও অমর্যাদা প্রকাশ পায় না। পুরাণের প্রধান বিষয় ভক্তি; কাহিনী যে ভাবেই পরিবেশন করা হোক না কেন, ইহার ভিতর দিয়া ভক্তির ভাবটি বিসর্জিত হয় না। এই গুণেই 'ছো-নাচ' আজও সমাজে আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া আছে, নতুবা ইহা যদি কেবল আনন্দ ও কৌতুকের বিষয় হইত, তাহা হইলে ইহা বহুদিন পূর্বেই লুপ্ত হইয়া যাইত।

'ছো-নাচ' উপলক্ষে যে মুখোসগুলি পরিয়া নৃত্য করা হয়, তাহা যাহাতে নৃত্যকারী দীর্ঘকাল মুখে রক্ষা করিয়া নৃত্যকালীন অত্যন্ত ক্ষিপ্র অঙ্গ সঞ্চালন করিতে পারে, তাহার জন্য ইহাদিগকে নিতান্ত হাল্কা করিয়া নির্মিত হয়। বর্তমান কালে কাগজের মণ্ডা ছাঁচে ঢালাই করিয়া ইহারা নির্মিত হয়, তাহার উপর তুলি দিয়া রং করা হয়। ইহা ওজনে অত্যন্ত হাল্কা এবং দীর্ঘকাল মুখে ধারণ করিয়াও নৃত্যকারী কোন অসুবিধা অনুভব করে না। পূর্বে লাউয়ের (gourd) শুক্না খোলের উপর নরনারীর মুখ চিত্রিত করিয়া দিবার রীতি ছিল, কিন্তু কাগজের মণ্ডা ইহা অপেক্ষা হালকা এবং এই কার্যে বিশেষ সহায়ক, সুতরাং বর্তমানে এই প্রণালীই ছো-নাচের মুখোস নির্মাণে সর্বত্র গৃহীত হইয়া থাকে।

এই ভাবে শিব, দুর্গা, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, রাম, লক্ষ্মণ, গুহক চণ্ডাল, পরশুরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, রাধা. সখীগণ ইত্যাদির বিভিন্ন মুখোস নির্মাণ করা হয়। পুরুলিয়া জিলার পশ্চিম ও দক্ষিণাংশে প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ছো-নাচের দল আছে। ইহারা সমগ্র চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস গ্রামে গ্রামান্তরে নৃত্য দেখাইয়া বেড়ায়। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, লোক-নৃত্যের অধঃপতিত কিংবা বিলীয়মান (decaying) যুগেই মুখোস নৃত্যের উদ্ভব হয়। কারণ, যখন সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে নৃত্যে নারীর অধিকার লুপ্ত হইল, অথচ নৃত্যের প্রেরণা সমাজ হইতে লুপ্ত হইল না, তখন নারীর স্থান পুরুষ পূর্ণ করিতে আসিল, তখনই তাহাকে নারীর মুখোস পরিতে হইল। দেহে নারীর আবরণ ও আভরণ ধারণ করা পুরুষ নৃত্যাভিনেতার পক্ষে অসম্ভব এবং অশোভন কিছুই নহে, কিন্তু পুরুষের 'মুখ' লইয়া নারীর অভিনয় করা চলে না, গোঁফ দাড়ি তাহার প্রধান বাধা। শহরে যত লোক সহজে স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করিবার জন্য গোঁফ দাড়ি বিসর্জন দিতে পারে, গ্রাম্য লোক তাহা তত সহজে পারে না। বিশেষতঃ পুরুষের গোঁফ দাড়ি গ্রাম্য জীবনের ধর্মীয় আচার পালনের সহায়ক হইয়া থাকে, সেই জন্য নারীর মুখোস পরিয়া পুরুষ তাহার গোঁফ দাড়ি আচ্ছন্ন করিয়া লইয়া নৃত্যে নারীর অভিনয় করিয়া থাকে। যাত্রাগানে আমরা গোঁফ দাড়ি চাঁচাছোলা অবস্থায় পুরুষকে যেমন স্ত্রীর অভিনয়ে অবতীর্ণ হইতে দেখি, ছো-নাচের স্ত্রী-চরিত্রের পুরুষ অভিনেতা গোঁফ দাড়ি না চাঁচিয়া সেখানে নারীর মুখোস পরিধান করে মাত্র। বলা বাহুল্য,

যাত্রাগানে এই শ্রেণীর অভিনয় যেমন নির্জীব, মুখোস নৃত্যেও এই শ্রেণীর নারীবেশী পুরুষের নৃত্য প্রাণহীন। নারীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতার অভাব এখানে দুই স্থানে দুই ভাবে পুর্ণ করিয়া লওয়া হইয়াছে মাত্র; কিন্তু নারী স্বয়ং তাহার প্রত্যক্ষ রূপ ও যৌবন লইয়া উভয় ক্ষেত্রেই অবতীর্ণ হইলে, ইহার যে আবেদন সৃষ্টি হইত, ইহাদের দ্বারা তাহা কদাচ সম্ভব হইতে পারে না; ইহা নিয়ম রক্ষা মাত্র। সেই জন্যই বলিতেছিলাম, ইহা বাঙ্গালীর লোক-নৃত্যের অধঃপতিত যুগের পরিচায়ক—গৌরবোজ্জ্বল যুগের পরিচায়ক নহে। এই প্রকার রূপ-পরিবর্তন ও ক্রমাবনতির ভিতর দিয়াই জাতির সাংস্কৃতিক উপকরণগুলি বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

নয়

ছো-নাচের পটভূমি

ছো-নাচের মত একটি সুপরিণত নৃত্যরূপ যে দেশের সমাজে প্রচলিত আছে, সে দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে নৃত্যের সংস্কার অত্যন্ত প্রবল থাকাই স্বাভাবিক বলিয়া সকলেই মনে করিতে পারেন। পুরুলিয়ার লোক-জীবনের সঙ্গে যাহার বিন্দুমাত্রও পরিচয় আছে, তিনিই স্বীকার করিবেন যে, বাংলা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে তুলনা করিলে সেখানকার লোক-নৃত্যের সংস্কার এখন পর্যন্ত প্রবলতম। তাহার কারণ পূর্বেও একবার উল্লেখ করিয়াছি যে, যে-অঞ্চলে আদিবাসী সংস্কারের সঙ্গে হিন্দু-সংস্কৃতির সংমিশ্রণ হইয়াছে, সেই অঞ্চলেই কেবলমাত্র নৃত্য নহে, লোক-সংস্কৃতির যে কোন উপকরণই অতি সহজে পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে। এই সূত্রেই পশ্চিম বঙ্গে বীরভূম এবং পূর্ববঙ্গের মৈমনসিংহে সমৃদ্ধতম লোক-সংস্কৃতির উপকরণের সন্ধান লাভ করিতে পারা গিয়াছে। পুরুলিয়ায় এই অবস্থা একদিন যে অতীতে সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা নহে, এখনও তাহার ধারা ইহার প্রত্যক্ষ সমাজ-জীবনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, এখনও সে অঞ্চলে আদিবাসী সমাজ-জীবনের সঙ্গে বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন উপকরণের সংমিশ্রণের কাজ চলিতেছে, সে কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, সুতরাং এই সূত্রেই এই অঞ্চলের লোক-সংস্কৃতির ধারা প্রবলতম হইবে ইহাই নিতান্ত স্বাভাবিক।

ছো-নাচ পুরুলিয়ার আদিবাসী, বাঙ্গালী হিন্দু, অর্ধ-হিন্দু (semi-Hindu) অর্ধ-আদিবাসী (semi-aboriginal) ইহাদের প্রত্যেকের সমাজ-জীবনের উপকরণ দ্বারা গঠিত; এই দিক দিয়া ইহার সঙ্গে আসামের অন্তর্গত মণিপুরী নৃত্যের তুলনা করা যাইতে পারে। কিন্তু মণিপুরী নৃত্য ও ছো-নৃত্যের বহিরঙ্গে পার্থক্য আছে, তথাপি ইহাদের উভয়ের মৌলিক ধর্ম অভিন্ন। মণিপুর অঞ্চলে ইন্দো-মোঙ্গলয়েড জাতিভুক্ত নাগাজাতিরই এক শাখা মণিপুরীর সঙ্গে বাঙ্গালী সংস্কৃতির সংমিশ্রণ হইয়াছিল। পুরুলিয়াতেও বাঙ্গালী সংস্কৃতির সঙ্গেই আদি-অস্ত্রাল (Proto-Australoid) জাতির বিভিন্ন শাখার সাংস্কৃতিক জীবনের সংমিশ্রণ হইয়াছে। তাহার ফলে বাংলার এক প্রান্তে যেমন মণিপুরী রাসনৃত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনই আর এক প্রান্তে ছো-নৃত্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

মণিপুরবাসীর সুন্দর গৌরবর্ণ দেহাকৃতির জন্য তাহাদের নৃত্যকালীন রাধা-কৃষ্ণের মুখোস ব্যবহারের রীতি প্রচলিত হয় নাই এ কথা সত্য; কিন্তু কৃষ্ণকায় এবং অপেক্ষাকৃত কুৎসিৎ দেহাকৃতির জন্য পৌরাণিক অভিজাত চরিত্রের নৃত্যাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করিবার কালে পুরুলিয়ার সাধারণ জনসমাজ স্বভাবতই মুখোসের ব্যবহার প্রচলিত করিয়াছে। সেই জন্য ছো-নাচের মধ্যেও যাহাতে অনভিজাত কিংবা আঞ্চলিক কোন বিষয় নৃত্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ করা হইয়া থাকে, তাহাতে মুখোস ব্যবহৃত হয় না।

ছো-নাচে পৌরাণিক প্রসঙ্গের মধ্যে মধ্যে এই প্রকার আঞ্চলিক বিষয়ও নৃত্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করা হইয়া থাকে, যেমন শিকার-নৃত্য। শিকার আদিবাসী কিংবা হিন্দু-ভাবাপন্ন আদিবাসী জীবনের একটি আচার; সুতরাং নৃত্যের মধ্য দিয়া যখন তাহা প্রকাশ করা হয়, তখন শিকারীর বেশ ধারণ করা হইলেও, কোনও মুখোস পরা হয় না। এক দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, ছো-নৃত্য যত উচ্চাঙ্গ লোক-শিল্প সম্মত অনুষ্ঠানই হোক না কেন, মুখোস ব্যবহারের জন্য তাহাতে কতকটা প্রাণহীনতা কিংবা কৃত্রিমতার ভাব আসিয়া যাইতে বাধ্য হয়। মুখোসের শিল্পোৎকর্ষ দ্বারা নৃত্যের নিষ্প্রাণতার ভাব কিছুতেই দূর করা যায় না। সেইজন্য দুই একটি মুখোসহীন ছো-নৃত্যও যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার আনন্দ এবং রস অধিকতর সহজস্ফূর্ত বলিয়া অনুভূত হয়।

মণিপুরী রাসনৃত্যেও মুখোস ব্যবহৃত হয় না; কিন্তু ইহা মণিপুরবাসীর সাধারণ জন-জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যখন কেবলমাত্র রাজানুগ্রহ দ্বারা পুষ্ট হইতে লাগিল, তখন হইতেই ইহার মধ্যে পোশাক ও সাজসজ্জার যে আড়ম্বর দেখা দিল, তাহাতেই ইহা অনেকটা নিষ্প্রাণ (rigid) হইয়া উঠিল। এক দিক দিয়া মুখোসের ব্যবহারের ফলে নৃত্যের সহজ রূপটি যেমন অনেকটা আচ্ছন্ন হইয়া গেল, আর এক দিক দিয়া পোষাকের আড়ম্বরতা ও বিধিবদ্ধতা (formality) ইহাকে কতকটা নিষ্প্রাণ করিয়া তুলিল। সুতরাং দেখা যায়, সমাজ-জীবনের ক্রমবিবর্তনের একই ধারা অনুসরণ করিয়া যেমন ছো-নৃত্য এবং রাস-নৃত্যের জন্ম হইয়াছে, তেমনই একই ধারা অনুসরণ করিবার ফলে উভয়েই একই অনিবার্য পরিণতির সম্মুখীন হইয়াছে। মণিপুরের সমাজে বিভিন্ন লোক-নৃত্য প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও তাহাতে রাস-নৃত্যই যেমন

সর্বোত্তম (*par excellence*) বলিয়া গৃহীত হয়, পুরুলিয়ার জন-সমাজেও বিভিন্ন লোক-নৃত্য এবং আদিবাসী নৃত্য প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও, ছো-নৃত্যকেই সে দেশের সমাজে সর্বোত্তম (*par excellence*) বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে।

লোক-সমাজের সর্বোত্তম কোন সাংস্কৃতিক রূপ স্বতন্ত্র কিংবা বিচ্ছিন্ন ভাবে দেশান্তর হইতে অনুকরণের ফলে সৃষ্টি হইতে পারে না, তাহা সমাজের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক রূপ হইতেই উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বিকাশ লাভ করে। জাতির লোক-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ উপাদান বলিয়া যাহা স্বীকৃতি লাভ করে, জাতির রস-চেতনার নিভৃততম ক্ষেত্রেও তাহার শিকড় গিয়া প্রবেশ করে। পুরুলিয়ার জন-জীবনের সঙ্গে ছো-নাচের কি সম্পর্ক, এই বিষয়ে যাঁহারা প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র হইতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহারা এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ইহার সঙ্গে এই সমাজের সম্পর্ক প্রাণের (vital) সম্পর্ক। প্রাণ যেমন স্নায়ু ও শিরা উপশিরার সূত্রে সমগ্র দেহের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সংযুক্ত, সাংস্কৃতিক জীবনেরও বিশিষ্ট একটি রূপ ইহার সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যান্য উপকরণের সঙ্গেও তেমনই ভাবে যুক্ত হইয়া থাকে। পুরুলিয়া অঞ্চলে এখনও যে সকল বিভিন্ন প্রকৃতির লোকনৃত্য প্রচলিত আছে, তাহাদের প্রকৃতি ও প্রসার অনুসরণ করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবনের পক্ষেই ছো-নাচের মত একটি বিশিষ্ট নৃত্যরূপ প্রচলিত থাকা সম্ভব। বাংলার অন্যান্য যে সকল অঞ্চলের নৃত্য-সংস্কার এত প্রবল নহে, সে অঞ্চলে এই শ্রেণীর পরিণত একটি নৃত্যরূপ প্রচলিত থাকিতে পারে, এমন আশা করা যায় না। সে জন্য ছো-নাচের পটভূমিকায় পুরুলিয়ায় এখন পর্যন্ত আর কোন্ কোন্ লোক-নৃত্য বিশেষ প্রচলিত আছে, তাহার উল্লেখ করিতে পারা যায়।

পুরুলিয়ার সাধারণ জন-গোষ্ঠী প্রধানতঃ মাহাতো বা কুর্মি সম্প্রদায় দ্বারা গঠিত হইয়াছে, ইহার সঙ্গে ভূমিজ, আহিরা ইত্যাদির অস্তিত্ব থাকিলেও যে সম্প্রদায় প্রধানতঃ পুরুলিয়ার সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে, তাহা প্রধানতঃ কুর্মি বা মাহাতো সম্প্রদায়। এমন কি, এই সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক জীবন দ্বারা উচ্চতর হিন্দু সমাজও অনেক দিক দিয়া প্রভাবিত হইয়াছে। উচ্চতর হিন্দু সমাজ প্রভাবিত হইবার একটি প্রধান কারণ, বাংলার পশ্চিম সীমান্তের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বিভিন্ন কালে উচ্চতর হিন্দু বসতি ইহার মধ্যে

বিস্তার লাভ করিবার ফলে ইহাতে সামাজিক জীবনের সুদৃঢ় সংহতি গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। উচ্চতর হিন্দুর সামাজিক জীবনের শৈথিল্যের জন্যই ইহা অতি সহজেই আঞ্চলিক প্রবলতম যে সংস্কৃতি, তাহা দ্বারা কোন কোন বিষয়ে প্রভাবিত হইয়াছে। কিন্তু উচ্চতর হিন্দু সমাজ বাংলা দেশের সমাজ-জীবনের সঙ্গে ক্রমাগত যোগ রক্ষা করিয়া চলিবার জন্য ইহার উপর আঞ্চলিক প্রভাব সর্বগ্রাসী হইয়া উঠিতে পারে নাই, কেবল কোন কোন ক্ষেত্রে এবং পল্লীঅঞ্চলে তাহা কতকটা সম্ভব হইয়াছে। সেইজন্য এমন কি, ছো-নাচের সঙ্গে কুমি, মাহাতো কিংবা ভূমিজ, আহিরারও যে সম্পর্ক, উচ্চতর হিন্দু সমাজের সেই সম্পর্ক নাই। তাহারা ইহার কৌতূহলী দ্রষ্টা মাত্র, এমন কি, পৃষ্ঠপোষকও যে, তাহাও বলিতে পারা যায় না। সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা ত দূরের কথা। দেশের সাধারণ সম্প্রদায়, প্রধানতঃ কুর্মি-মাহাতোগণই ইহার উদ্ভাবক, ইহার প্রতিপালক এবং ইহার পৃষ্ঠপোষক। সেইজন্য ইহার লৌকিক চরিত্র (folk-character) অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। মণিপুরী রাস-নৃত্য যেমন রাজানুগ্রহে পুষ্টিলাভ করিয়াছে, পুরুলিয়ার ছো-নাচ সেই সুযোগ অল্পই লাভ করিয়াছে। কেবলমাত্র পুরুলিয়ার পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ইহা যখন সেরাইকেলার তদানীন্তন ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন সেখানে ইহা রাজানুগ্রহ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু পুরুলিয়ায় ইহার ধারা কেবলমাত্র জনসাধরণ এবং বিশেষতঃ মাহাতো সম্প্রদায়ই রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। এই মাহাতো এবং তাহাদেরই সমধর্মী অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল লোক-নৃত্যের এখনও কিছু কিছু পরিচয় অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহাদের কথাই এখানে উল্লেখ করা যাইবে। কারণ, ইহাদের প্রত্যেকেরই রূপ, রস এবং আঙ্গিক দ্বারা এই অঞ্চলের ছো নাচ পুষ্টিলাভ করিয়াছে।

ছো-নাচ বাদ দিলে পুরুলিয়ার যে লোক-নৃত্যের কথা প্রথমই উল্লেখ করিতে হয়, তাহার নাম নাটুয়া-নাচ। পুরুলিয়ার ছো-নাচ ব্যতীত আর কোন লোক-নৃত্যেই মুখোস ব্যবহৃত হয় না। তাহার প্রধান কারণ, ছো-নাচ ব্যতীত আর কোন নৃত্যেই পৌরাণিক প্রসঙ্গ কিংবা অভিজাত কোন বিষয় অবলম্বন করা হয় না। নাটুয়া-নাচের মধ্য দিয়াও কোন পৌরাণিক কিংবা অভিজাত কোন বিষয় পরিবেশন করা হয় না। এই নৃত্য কর্মসঙ্গীতের সহচর, সুতরাং তাল-প্রধান। কর্মসঙ্গীতের সঙ্গে সংযুক্ত বলিয়াই ইহার সঙ্গে দৈহিক

অঙ্গ সঞ্চালন প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। অঙ্গ সঞ্চালনের প্রাধান্য মুখোস নৃত্যেরও একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। সুতরাং ছো-নাচের অঙ্গ সঞ্চালনের দিকটি যে নাটুয়া-নাচ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। নাটুয়া-নৃত্য যেমন একক নৃত্য, তেমনই সারি (group) নৃত্যও হইতে পারে। কিন্তু সাধারণত বাংলার অন্যত্র প্রচলিত একক নৃত্যে অঙ্গ সঞ্চালন প্রাধান্য লাভ না করিলেও নাটুয়া নাচ ইহার ব্যতিক্রম। আদিবাসী পুরুষ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত নৃত্য মাত্রেরই অঙ্গ সঞ্চালনেব প্রবলতা একটি বিশেষ লক্ষণ। সুতরাং পুরুলিয়ার লোক-নৃত্যে অঙ্গ সঞ্চালনের যে প্রাবল্য দেখা যায়, তাহা কেবল-মাত্র ইহার মুখোসের জন্যই আসে নাই, কিংবা কেবলমাত্র নাটুয়া নাচ হইতেও আসে নাই, আদিবাসী নৃত্যের প্রভাবেরও যে কতকটা ফল ইহার উপর রহিয়াছে, তাহা সহজেই অনুভব করিতে পারা যায়। নাটুয়া-নাচে মুখোসের ব্যবহার না থাকিলেও তাহাতে নানা রঙেব কাপডের টুকরা গায় বাঁধিয়া গায়ে মুখে রঙ মাখিয়া সঙ সাজিয়া নৃত্য করা হয়, অথচ ইহা সঙের কিংবা ভাঁড়ের নৃত্য নহে। ইহার মধ্যে লঘু কৌতুক সৃষ্টি করিবার পরিবর্তে প্রধানতঃ বীররসের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। এই নৃত্যের সঙ্গে বাংলার বিশিষ্ট আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র ঢোল (ঢোলক নহে ও ধাম্‌সা বাজিয়া থাকে। ইহা যুদ্ধ-নৃত্যেরই অবশেষ (remnant) বলিয়া মনে হয়, বর্তমানে ইহা ধনী লোকেব বরানুগমন কালেই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গ্রামেব বিবাহোপলক্ষেও ইহার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। যুদ্ধ-নৃত্যগুলি অধঃপতিত (degenarated) হইয়া বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এখন বিভিন্ন রূপ লাভ করিয়াছে, ইহাও তাহাদের অন্যতম বলিয়া মনে হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, এই নৃত্যের বলিষ্ঠ অঙ্গসঞ্চালনের রূপটি দ্বারা পুরুলিয়ার ছো-নৃত্য প্রভাবিত হইয়াছে।

ছো এবং নাটুয়া-নাচের পর পুরুলিয়ার লোক-নৃত্যের মধ্যে পুরুষের নাচ সম্পর্কে উল্লেখ কবিতে হইলেই ভূয়াঙ-নাচের কথা উল্লেখ করিতে হয়। কারণ, ছো-নাচ পুরুষের নাচ, নারী চরিত্র ইহার মধ্যে থাকিলেও পুরুষই কেবলমাত্র যে নারীর মুখোস পরিয়াই নৃত্য করিয়া থাকে, তাহা নহে—ছো-নাচের মধ্য দিয়া নৃত্যকারীর যে আচরণ প্রকাশ পায়, তাহাতে প্রধানতঃ মেয়েলী ভাব কিছুই থাকে না, সব কিছুর মধ্যেই একটা পৌরুষের ভাবই প্রকাশ পাইয়া থাকে। ছো-নাচে দুর্গার প্রায়ই আবির্ভাব হইয়া থাকে, তবে সর্বদাই তিনি যোদ্ধবেশিনী

রূপেই আবির্ভূত হইয়া থাকেন, তাঁহার অঙ্গচালনার সঙ্গে মহিষাসুরের অঙ্গ আস্ফালনের বিশেষ কিছুই পার্থক্য থাকে না। এইভাবে নারীর লাস্য-নৃত্য ছো-নাচে দেখা যায় না, নারী চরিত্রের নৃত্য হওয়া সত্ত্বেও তাণ্ডবই তাহার মধ্য দিয়া প্রধানত প্রকাশ পায়। সুতরাং পুরুষের নৃত্যোপকরণ দ্বারা ছো-নাচ যতখানি প্রভাবিত হইয়াছে, নারীর নৃত্যোপকরণ দ্বারা ততখানি প্রভাবিত হইতে পারে নাই। অতএব ছো-নাচের মধ্যে আঞ্চলিক পুরুষের নৃত্যের উপরকরণগুলি অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন যত বেশি, অন্য নৃত্যরূপের উপকরণ সন্ধান করিবার প্রয়োজনীয়তা তত বেশি নহে। সেইজন্য পুরুলিয়ার নাটুয়া-নাচের পরই ইহার ভুয়াঙ-নাচের কথা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হয়।

ভূয়াঙ-নাচ দো-ভাষী (সাঁওতাল ও বাংলাভাষী) সাঁওতাল জাতির মধ্যে প্রধানতঃ প্রচলিত দেখিয়া কেহ কেহ মনে ক'রতে পারেন যে, ইহা বুঝি আদিবাসী সাঁওতাল-নৃত্যের একটি বিশিষ্ট রূপ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা তাহা নহে। যদি ইহা আদিবাসী সাঁওতাল-নৃত্যেরই একটি বিশিষ্ট নৃত্যরূপ হইত, তাহা হইলে ইহা ছোট নাগপুর, সাঁওতাল পরগণা ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য যে সকল অঞ্চলেই সাঁওতাল জাতি বাস করে, সেখানেই প্রচলিত থাকিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা পুরুলিয়া এবং ইহার নিতান্ত সন্নিকটবর্তী অঞ্চল ব্যতীত আর কোথাও প্রচলিত নাই। সুতরাং ইহা পুরুলিয়ারই একটি বিশিষ্ট নৃত্যরূপ। ইহা এই অঞ্চলের শিকার-নৃত্য ও বলা যায় যুদ্ধ-নৃত্যের প্রভাব ইহার মধ্যে যে নাই, তাহাও নহে। কারণ, যুদ্ধ ও শিকার উভয়ের মধ্যেই সাহসিকতা এবং গোষ্ঠীবদ্ধ আচরণের প্রয়োজন হয়। সুতরাং অনেক সময় যুদ্ধ-নৃত্যে ও শিকার-নৃত্যে কোন পার্থক্য থাকে না। ইহা সমবেত নৃত্য, একক নৃত্য নহে। ছো-নাচে একক নৃত্যের প্রাধান্য থাকিলেও, সমবেত বা সারি-নৃত্যও আছে। ভূয়াঙ-নৃত্যের এই প্রকার নাম হইবার কারণ—হাতে ধনু লইয়া ধনুর ছিলায় গায়ের জোরে এক একবার টান দিয়া 'ভূয়াঙ, ভুয়াঙ' শব্দ করিয়া এই নৃত্য করিতে হয়, সেইজন্য ইহার নাম ভূয়াঙ-নৃত্য। ইহা সম্প্রদায়গত নাম, যেমন মাঝি-নাচ কিংবা সাঁওতাল-নাচ তেমন নহে। সুতরাং যদিও ইহা বর্তমানে আদিবাসী শিকারী সাঁওতাল জাতির মধ্যে অনেকটা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি ইহা মূলতঃ যে বিশেষ সম্প্রদায়ের নিজস্ব কোন বিষয় ছিল না, তাহা বুঝিতে পারা যায়। মুখোস পরিহিত ছো-নৃত্যের মধ্যে মধ্যে কোন কোন

সময় যে সমবেত ভাবে শিকারী-নৃত্যের অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ধনু ব্যবহৃত না হইলেও বাদ্যের ভিতর দিয়া অনেকটা এই প্রকার শব্দ করা হয়, সুতরাং তাহা ভূয়াঙ নৃত্যের প্রভাবের যে প্রত্যক্ষ ফল, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

পুরুলিয়ার অন্যান্য পুরুষ নৃত্যের মধ্যে পাইক-নৃত্য উল্লেখযোগ্য। পাইক নৃত্য যুদ্ধ-নৃত্য, ইহার উপাদান যে ছো-নাচের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কারণ, ছো-নৃত্যের মধ্যে যুদ্ধের অভিনয়ই প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। যে সকল পৌরাণিক বিষয়ের মধ্যে যুদ্ধের অবকাশ আছে, প্রধানত তাহাই ছো-নাচের মধ্য দিয়া রূপায়িত করা হয়। এই সকল নৃত্য ব্যতীত পুরুলিয়ার আর সকল নৃত্যই মেয়েলী নৃত্য, পুরুষাভাবাপন্ন ছো-নৃত্যের মধ্যে মেয়েলী নৃত্যের বিশেষ কোন প্রভাব অনুভব করা যায় না।

দশ

পুতুল নাচ

পুতুল নাচ প্রকৃত লোক-নৃত্য কি না, এই বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিতে পারেন, বিশেষতঃ বাংলাদেশের প্রধানতঃ পশ্চিম বঙ্গের ভাগীরথীর দুই তীরে যে পুতুল নাচ সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে পুতুল থাকিলেও নৃত্য নাই, বরং পুতুলের অভিনয় আছে। কিন্তু ছোটনাগপুরের আদিবাসী অঞ্চলে শীতকালীন মেলাগুলিতে যে এক শ্রেণীর পুতুল নাচ দেখা যায়, তাহাতে যেমন পুতুল আছে, তেমনই তাহাদের নৃত্যও আছে ; সেইজন্য পুতুল নাচ বলিতে প্রকৃত তাহাই বুঝায়। বাংলাদেশের পুতুল নাচের মধ্যে নাচ প্রাধান্য লাভ করে না, বরং কতকগুলি পুতুলের সহায়তায় একটি যাত্রার অভিনয় হইয়া থাকে মাত্র। যাত্রার মধ্যে নৃত্যের যতটুকু স্থান, ইহাদের মধ্যেও নৃত্যের ততটুকু স্থান, ইহাদের মধ্যে নৃত্যের তাহার বেশি স্থান নাই।

প্রাচীন বাংলার সমাজে পুতুল নাচের কি স্থান ছিল, তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। কারণ, মধ্যযুগের সাহিত্যে ইহার উল্লেখ নাই, বরং নাটগীত, কৃষ্ণযাত্রার উল্লেখ আছে। চৈতন্য-জীবনী সাহিত্যে এই বিষয় একটি মাত্র উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন, 'কাষ্ঠের পুত্তলি যেন কুহকে নাচায়।' ইহাও রূপকাশ্রিত বর্ণনা, প্রত্যক্ষ বিষয়ের বর্ণনা নহে। অথচ উনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতা এবং তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পুতুল নাচ বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। কলিকাতা নগরী প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহা ভারতের অন্য কোন অঞ্চল হইতে কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া বাংলাদেশের আরও কোন স্থানে বিস্তার লাভ করিয়াছে কি না, তাহাও অনুসন্ধানের বিষয়। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, পূর্ব বাংলা কিংবা বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল ইহাদের মধ্যে কোথাও পুতুল নাচের প্রচলন নাই। কেবলমাত্র কলিকাতা নগরী কেন্দ্র করিয়া ইহার চতুষ্পার্শ্ববতী অঞ্চলেই ইহা প্রচার লাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে যে একটা শিল্পোৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাও নহে। তবে ইহার পূর্বে তাহা নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর অঞ্চলেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু রাজধানী-কেন্দ্রিক সংস্কৃতি অনেক সময় বহিরাগত হইয়া থাকে। দীর্ঘকাল ধরিয়া এই জাতি যদি ইহার অনুশীলন করিত, তবে

ইহা সমগ্র বাংলাদেশে যেমন একদিক দিয়া প্রচার লাভ করিত, তেমনই অন্যদিক দিয়া ইহার মধ্য দিয়া একটি শক্তিশালী জাতীয় ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিবার অবকাশ পাইত। কিন্তু ইহার ক্ষেত্রে তাহাদের কিছুই হয় নাই। বাংলার লোক-জীবনের সঙ্গে যে ইহা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারিয়াছে, তাহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। সুতরাং জাতির লোক-নৃত্য বলিতে যাহা বুঝায়, ইহা তাহা নহে। মনে হয়, ইহা নাগরিক জীবনকে কেন্দ্র করিয়া নাগরিক রস ও রুচির অনুগামী হইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল, তারপর নাগরিক জীবন আশ্রয় করিয়া তাহা কিছুকাল বাঁচিয়াছিল, বর্তমানে ইহা বিলুপ্তির পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে ; ইহার পুনরুদ্ধারের আর কোন প্রয়াস দেখা যায় না।

পশ্চিম বাংলার পুতুল নাচের সঙ্গে লোক-জীবনের যে একেবারেই কোন সম্পর্ক নাই, তাহাও নহে। কারণ, এই কৃত্রিম নৃত্য এবং অভিনয়ানুষ্ঠানের ভিতর দিয়া যে কাহিনীগুলি রূপায়িত করা হইয়া থাকে, তাহাদের প্রত্যেকটিই লৌকিক রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ এবং অন্যান্য ঐতিহ্য অবলম্বন করিয়াই রচিত হয়। বাংলাদেশে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের যে সকল কাহিনী বাঙ্গালীর জীবন এবং বাংলার জলবায়ুর মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাঙ্গীকৃত হইয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র তাহাই পুতুল নাচের বিষয়। বাংলার জীবন-বহির্ভূত, কাল্পনিক কিংবা রোমান্টিক কোন বিষয় ইহার উপজীব্য নহে। ছোটনাগপুরের শীতকালীন মেলাগুলিতে অনুষ্ঠিত যে একশ্রেণীর পুতুল নাচের প্রচলন আছে, তাহাতে বাদ্য থাকিলেও সঙ্গীত কিংবা কোন সংলাপ নাই। অবশ্য ইহাদের বাদ্যও একটি প্রধান আকর্ষণ ; সঙ্গীত কিংবা সংলাপের তুলনায় উহার বাদ্যের আকর্ষণীয় গুণ যে কিছু কম, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। ধাম্‌সা এবং সানাই ইহার বাদ্য রূপে ব্যবহৃত হয় এবং এই বাদ্যের সহযোগে নৃত্যের যখন অনুষ্ঠান হয়, তখনই ইহার মধ্যে যে, সংলাপ, সঙ্গীত কিংবা নাটকীয় ক্রিয়ার কোন অভাব আছে, তাহা মনে হয় না। বাংলার পুতুল নাচ এই বৈশিষ্ট্য বর্জিত। ইহাতে সঙ্গীত এবং গদ্য পদ্য সংলাপ ব্যবহৃত হইলেও ছোটনাগপুরের সেই আকর্ষণীয় ধাম্‌সা (drum) কিংবা সানাইয়ের বাদ্য নাই। ধাম্‌সা এবং সানাই দুইই দেশীয় বাদ্যযন্ত্র, কিন্তু বাংলার পুতুল নাচে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বিদেশীয় বাদ্যযন্ত্র, যেমন হারমোনিয়াম, বেহালা, ক্লেরিওনেট ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। সুতরাং লোক-জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক বিচার করিলে যদিও ছোটনাগপুরের পুতুল নাচের মত বাংলার পুতুল

নাচের লোক-জীবনের সঙ্গে তত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই, তথাপি বিষয়বস্তুর দিক দিয়া বিচার করিলে ইহার সঙ্গে কতকটা সম্পর্ক অনুভব করা যাইবে।

পুর্বেই বলিয়াছি, বাংলার পুতুল নাচ প্রকৃতপক্ষে নৃত্য নহে, অভিনয় মাত্র ; ইহাকে লোকনাট্য বলা যত সঙ্গত, লোক-নৃত্য বলা তত সঙ্গত হয় না। তবে বাংলাদেশে নাট্যের সঙ্গে নৃত্য বহু কাল যাবৎ সম্পর্কযুক্ত হইয়া আছে। সেই সূত্রেই যতখানি নৃত্য পুতুলনাচের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে, কেবলমাত্র ততখানি নৃত্যই ইহাতে আছে, তদতিরিক্ত কিছুই নাই।

নৃত্যের প্রধান গুণ সমগ্র দেহের ভিতর দিয়া সূক্ষ্ম ভাবের অভিব্যক্তি, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এই ভাব-প্রকাশের সহায়তা করিয়া থাকে, নৃত্যের তালে ছন্দিত এবং তরঙ্গায়িত দেহে দৃশ্যত একটি অপরূপ রসপরিমণ্ডল সৃষ্টি করে, প্রাণের ভিতর হইতে যে আনন্দ এবং উল্লাস বিচ্ছুরিত হয়, তরঙ্গিত দেহের ভিতর দিয়া তাহা ধরা দেয়। কিন্তু পুতুলগুলি প্রাণহীন, ইহাদের অঙ্গগুলি যন্ত্রের নিয়মে সূত্র দ্বারা চালিত হয় , সুতরাং ইহা নৃত্যেব কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করিতে পারে না। নৃত্যের মধ্যে আত্মা এবং দেহ, ভাব এবং রূপ উভয়ের খেলা , পুতুলের মধ্যে আত্মা নাই , সুতরাং তাহা ভাবলেশহীন। পুতুলের অঙ্গগুলি কৃত্রিম , সুতরাং দেহ যে ভাবে ছন্দিত কিংবা তরঙ্গায়িত হইবার সুযোগ পায়, ইহাতে তাহা পাইতে পাবে না। বিশেষত ইহার সঙ্গে সংযুক্ত বাদ্য নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন, ভাষা এবং উচ্চারণের দিক দিয়া সংলাপ সম্পূর্ণ গ্রাম্যতা দোষযুক্ত। ইহার একটি মাত্র বিশেষ আবেদন, তাহা সঙ্গীত ; কিন্তু যেখানে নৃত্যসম্বলিত সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়, সেখানে সঙ্গীতেব আবেদনও সার্থক হইতে পারে না , নৃত্যের কৃত্রিমতা সঙ্গীতকেও প্রাণহীন করিয়া তুলে। কেবলমাত্র যেখানে নেপথ্য হইতে কোন কোন সময় একক কণ্ঠ সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে কোন কোন সময় আবেদন সৃষ্টি হয় , কিন্তু তাহা নৃত্যের আবেদন নহে, কেবলমাত্র সঙ্গীতেরই আবেদন। সুতরাং ইহা পুতুল নাচের একটি যে গুণ, তাহা বলিতে পারা যায় না। পুতুল নাচ যে বাংলাদেশে বিকাশ এবং প্রচার লাভ করিতে পারিল না, তাহা প্রধানতঃ এই সকল কারণেই। অথচ পুতুল নাচ কোন কোন জাতির লোক-সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। এমন কি, ছোট নাগপুরের কথা উপরে যাহা বলিলাম, সেখানেও পুতুল নাচ আদিবাসীর জাতীয় সংস্কৃতির একটি অঙ্গরূপেই গণ্য হইবার যোগ্য। সেখানে ক্রমাগতই ইহার

জনপ্রিয়তা বরং বাড়িয়াই চলিয়াছে, বাংলাদেশের মত ইহা সেখানে অধঃপতিত হইয়া বিনাশের সম্মুখীন হয় নাই।

বাংলার পুতুল নাচ বাংলার জাতীয় জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করিতে পারে নাই বলিয়াই ইহা যেমন বিকাশও লাভ করিতে পারে নাই, তেমনই আত্মরক্ষা করিয়াও টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। বিশেষতঃ দেখা যায়, উনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতার নাগরিক জীবনে যে সকল সাংস্কৃতিক উপকরণ জন্মলাভ করিয়াছিল, তাহা সমসাময়িক নাগরিক জীবনের প্রয়োজনেই বিকাশ লাভ করিয়া সেই যুগাবসানের সঙ্গেই সমাধিস্থ হইয়াছে। বাংলার কবিওয়ালার গান, 'নূতন' যাত্রা ইত্যাদি লক্ষ্য করিলেও এই বিষয়টি আমরা বুঝিতে পারি। বিশেষতঃ ধর্মীয় বিষয়বস্তু যখন ধর্মনিরপেক্ষ আনন্দোৎসবের উপলক্ষ হয়, তখন ইহার বিনাশ অনিবার্য হইয়া উঠে। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ যে এতকাল ভাবতবর্ষের মাটিতে বাঁচিয়া আছে, তাহা কেবলমাত্র ইহাদের কবিত্বের গুণেই নহে, বরং ইহাদিগকে ভারতবাসী যে নিজস্ব ধর্মীয় চেতনার অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে, প্রধানত তাহারও জন্য। গ্রীক্ জাতির নিকট হোমারের কাব্যের যে স্থান, ভারতবাসীর নিকট বাল্মীকি বেদব্যাসের কাব্যের স্থান তাহার বহু উর্ধ্বে, ইহার কারণ, হোমারের রচনা গ্রীক্ জাতি তাহার ধর্মীয় চেতনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে পারে নাই, কিন্তু ভারতবাসী তাহা পারিয়াছে। পুতুল নাচের মধ্য দিয়া ধর্মীয় ভাব যদি যথাযথই বিকাশ লাভ করিত, তবে ইহার শিল্পগুণ যাহাই থাকুক না কেন, তাহা কদাচ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইতে পারিত না, কোন না কোন ভাবে তাহা রক্ষা পাইত। রামায়ণ-মহাভাবতের কাহিনী ইহাদের অবলম্বন হইলেও ইহাদের রচনা এবং পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ধর্মভাবনিরপেক্ষ (secular) ছিল বলিয়াই তাহা পরিবর্ত্যমান নাগরিক রুচির সম্মুখে আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। যে পথে কবিওয়ালার গান, গীতাভিনয়, পাঁচালী, আখড়াই, হাফ আখড়াই ইত্যাদি লুপ্ত হইয়াছে, ইহাও সেই পথেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহারা সমসাময়িক কালেই যুগোপযোগী রূপ লাভ করিয়া অবির্ভূত হইয়াছিল, যুগাবসানেই ইহাদের বিলুপ্তি ঘটিয়াছে।

অনেক জাতির মধ্যে পুতুল নাচ লোক-নৃত্যেরই কোন অধঃপতিত (decadent) রূপ হইয়া থাকে। কিন্তু বাংলাদেশেও তাহা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না; কারণ, পূর্বের আলোচনা হইতে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে,

ঐতিহ্যের ধারা হইতে বিচ্যুত হইয়া নিতান্ত নাগরিক জীবনের সাময়িক প্রয়োজনে এ দেশে পুতুল নাচের সৃষ্টি হইয়াছিল, এ দেশের লোক-নৃত্যের ধারা স্বতন্ত্র প্রবাহে অগ্রসর হইয়া গিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কারণে লুপ্ত হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, লোক-নৃত্যের ধারাব সঙ্গে পুতুল নাচের কোন যোগ নাই। তবে এ কথা সত্য, লোক-নৃত্যের কিছু কিছু বহির্মুখী উপকরণ ইহাতে ব্যবহৃত হইয়াছিল। বাহিরের উপকরণ যতক্ষণ পযন্ত অন্তরের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিতে না পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইহাদের স্থায়িত্বের আশা নাই। কিন্তু লোক-নৃত্যের বহির্মুখী কোন উপকরণই পুতুল নাচের অন্তরঙ্গের সঙ্গে যোগস্থাপন করিতে পাবে নাই। সেইজন্য ইহাব মধ্যে যথার্থ কোন শক্তি সঞ্চারিত হইতে পারে নাই। এখন বাংলার পুতুল নাচ বিষয়টি কি, তাহা একটু বুঝাইয়া বলি।

যাত্রা, পাঁচালী, কবির দলের মত পুতুল নাচেরও ব্যবসায়ী দল আছে, কখন কখন সৌখীন দলও গড়িয়া উঠিতে পারে। পুতুল নাচের দলের প্রধান উপকরণ কাষ্ঠনির্মিত কতকগুলি প্রমাণ আকৃতি নরনারীর পুতুল। পুতুলের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি শিথিল ভাবে দেহের কাঠামোটির সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া থাকে, নীচে হইতে দড়ি টানিয়া ইহাদিগকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যায়। ইহাদের এই নিয়ন্ত্রণের ভিতর দিয়া নরনারীর বাস্তব রূপ যে প্রকাশ পায়, তাহা নহে, বরং তাহা নিতান্ত প্রাণহীন এবং কৃত্রিম বলিয়া বোধ হয়। পুতুল নাচের জন্য যে বিশেষ একটি মঞ্চ নির্মিত হয়, তাহা শহুরে রঙ্গমঞ্চেরই একটি হাস্যকর অনুকরণ মাত্র। রঙ্গমঞ্চের নিম্নভাগ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে এবং তাহারই অন্তরালে থাকিয়া বিভিন্ন পুতুলের প্রতিনিধিস্বরূপ বিভিন্ন 'অভিনেতা' উচ্চকণ্ঠে সংলাপ এবং সঙ্গীত প্রচার করিতে থাকে। স্ত্রী-চরিত্রের অংশে পুরুষেরই কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া যায়। সংলাপ এবং সঙ্গীত পরিবেশনের ভঙ্গির মধ্যে যাত্রার সঙ্গে ইহার কোন পার্থক্য নাই। তবে যাত্রায় প্রত্যক্ষ ভাবে সংলাপ ও সঙ্গীতগুলি শুনিতে পাওয়া যায় বলিয়া ইহাদের মধ্য দিয়া যে আবেদন প্রকাশ পায়, ইহার সংলাপ এবং সঙ্গীতকারী অন্তরালে থাকে বলিয়া কেবলমাত্র প্রাণহীন পুতুলগুলির মধ্য দিয়া সেই আবেদন প্রকাশ পাইতে পারে না। সেই জন্য কলিকাতায় পাশ্চাত্ত্য ধরনের রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে নূতন যাত্রা এবং পুতুল নাচ উভয়েরই উদ্ভব হইয়াছিল; তথাপি এ কথা সত্য, যাত্রা

লোক-সমাজের যে সমাদর লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, পুতুল নাচ তাহার একাংশ সমাদরও লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই।

পুতুল নাচ যাত্রাভিনয়েরই একটি সুলভ সংস্করণ মাত্র। যাত্রার দল গঠন করিতে হইলে বিচিত্র আকৃতি ও প্রকৃতির বহু সংখ্যক লোকের প্রয়োজন হয়, তাহা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। যাত্রার দল রক্ষা করা যেমন ব্যয়সাধ্য, ইহার অভিনয়ের অনুষ্ঠান করাও সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু পুতুল নাচ তেমন নহে। কেবলমাত্র তিন চারি জন সুদক্ষ অভিনেতা থাকিলেই কতকগুলি কাষ্ঠনির্মিত পুতুলের সাহায্যেই পুতুল নাচে একটি সুদীর্ঘ পালার অভিনয় করা যাইতে পারে। ইহা যেমন অল্প আয়াসসাধ্য, তেমনই অল্প ব্যয়সাধ্য অনুষ্ঠান। সাধারণ পল্লীবাসী গৃহস্থ ইহার ভিতর দিয়া যাত্রাভিনয়ের আস্বাদ লাভ করিতে পারে। লোক-সমাজের মধ্যে জনপ্রিয়তার ইহার এই একটি পরম সুযোগ ছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখিতে পাওয়া গেল, যাত্রার জনপ্রিয়তা ইহা দ্বারা বিন্দুমাত্রও ক্ষুন্ন হইতে পারিল না। কারণ, যাত্রার যে আবেদন, পুতুল নাচে তাহা প্রকাশ পাইতে পারিল না। যাত্রার মধ্যে কৃত্রিমতা থাকিলেও পুতুল নাচের কৃত্রিমতা যাত্রার আচরণকেও ছাড়াইয়া গেল।

পুতুল নাচে যে মাত্র তিন চারিটি চরিত্র অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহারা নানা ভাবে কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রিত করিয়া বিভিন্ন চরিত্রকে বাস্তব রূপ দিবার প্রয়াস পায়। ইহাতে এই অনুষ্ঠানের কৃত্রিমতা আরও বৃদ্ধি পায়, অনেক সময় বিষয়বস্তুর গুরুত্ব রক্ষার পরিবর্তে তাহা হাস্যকর হইয়া উঠে। যাত্রাভিনয়ের মধ্যে তাহা হইবার উপায় নাই, কারণ, ইহাতে প্রত্যেকটি চরিত্রের প্রত্যক্ষ ভাবে আসিয়া দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত হইবার আবশ্যক হয় এবং প্রত্যক্ষ আচরণের গুণেই ইহার আবেদন সার্থক হইয়া উঠে।

পুতুল নাচে যে কাঠের পুতুলগুলি সাধারণতঃ নির্মিত হইয়া থাকে, তাহা উচ্চাঙ্গ শিল্পসম্মত বলিয়া মনে করা যায় না। কাঠের উপর সূক্ষ্ম কাজ করিবার নিদর্শন বাংলা দেশে বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না, বিভিন্ন স্থানে এখনও ইহার যে নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা শিল্পের দিক দিয়া উৎকর্ষের পরিচায়ক নহে। সাধারণতঃ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে যে প্রকার করিয়া বৃষকাষ্ঠগুলি খোদাই করা হয়, পুতুলনাচের পুতুলগুলিও সেই শ্রেণীরই হইয়া থাকে। পটুয়া বা পটচিত্র-শিল্প যেমন একটি জাতিগত ব্যবসায়, পুতুল নাচের পুতুল নির্মাণ একটি

জাতিগত ব্যবসায় হিসাবেও গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। সাধারণ স্থতোর মিস্ত্রীরাই ইহা নির্মাণ করিয়া থাকে। যে সকল সাধারণ অস্ত্র দ্বারা বাঙ্গালী স্থতোর মিস্ত্রীরা অন্যান্য কাষ্ঠ সরঞ্জাম তৈরি করিয়া থাকে, ইহাদের নির্মাণকার্যেও তাহাই ব্যবহৃত হয়। স্থতরাং দেখা যায়, পটশিল্প, শঙ্খশিল্প, মৃৎশিল্পের মত তক্ষণ অর্থাৎ কাট-খোদাই একটি শিল্পকর্মরূপে এদেশের সমাজে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। সেইজন্যই পুতুল নাচের পুতুল নির্মাণ কোন প্রকার উৎকর্ষের পরিচায়ক হয় নাই। স্থতরাং সাধারণ স্থতোর মিস্ত্রীর হাতে যে সকল কাষ্ঠমূর্তি নির্মিত হয়, তাহা কোন দিক দিয়াই প্রশংসা অর্জন করিতে পারে নাই।

কোন কোন ক্ষেত্রে কাঠের পুতুলগুলি প্রায় প্রমাণ আকৃতি, অর্থাৎ এক একটি পূর্ণবয়স্ক নরনারীর আকৃতি বিশিষ্ট হইয়া থাকে, কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা অপেক্ষা কিছু ছোটও হইতে পারে। কাঠেব পুতুলগুলিকে চরিত্রানুযায়ী সাজসজ্জা, অলঙ্কার, মাথার চুল ইত্যাদি পরিধান কবানো হইয়া থাকে এবং বিভিন্ন প্রকার সাজসজ্জা পরাইয়া বিভিন্ন চরিত্রেব রূপ দেওয়া হয়। এইভাবে কয়েকটি মাত্র পুতুল দিয়াই একটি পূর্ণাঙ্গ পালা অভিনীত হইতে পারে। কাঠের পুতুলকে সাজ পরাইলে ইহার কৃত্রিমতা আরও বাড়িয়া যায়। পুতুলগুলি অভিনয়কালীন কেবলমাত্র ঘাডটি নাড়িয়া নাড়িয়া ইহাদের বাহকদিগের স্কন্ধে চডিয়া মঞ্চের এই দিক হইতে সেই দিকে ঘুবিতে থাকে। সাধাবণত পদযুগল দেহের নিম্নভাগে অবস্থিত এবং তাহা বাহকের স্কন্ধের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে বলিয়া তাহা নাডিতে চাডিতে দেখা যায় না, অথচ ইহাকেই 'নাচ' বলিয়া উল্লেখ করা হয়। কোন কোন সময় নেপথ্যে নৃত্যেব তালে তালে ঘুঙুবের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, এ কথা সত্য, কিন্তু তথাপি পুতুলের পদদ্বয় নড়িতে দেখা যায় না, ইহা দ্বারা সমগ্র চিত্রটিই কৃত্রিম এবং অনেক সময় বিরক্তিকব হইয়া উঠে।

বটতলায় প্রকাশিত বিভিন্ন যাত্রাভিনয়ের বই পুতুল নাচের অভিনয়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহাদের জন্য স্বতন্ত্র কোন বচনা লিখিত কিংবা প্রকাশিত হয় না। পুতুল নাচের পালার মধ্যে বেহুলার পালাটি বিশেষ জনপ্রিয়, ইহার জন্যও যে সকল ভাসান যাত্রার বই বাজারে প্রচলিত আছে, তাহাই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নেপথ্য সঙ্গীতে এবং বিদেশীয় বাদ্যযন্ত্র দ্বারা গঠিত ঐকতান ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে। এই সকল কারণ হইতে সাধারণত

বুঝিতে পারা যায়, ইহা জাতির কোন সুদীর্ঘ ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া বিকাশ লাভ করে নাই। সেইজন্য পূর্বে বলিয়াছি যে, ইহা উনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতার নাগরিক জীবনের সৃষ্টি, জাতীয় জীবনের সুদীর্ঘ সাধনার ফলে জাত নহে।

কোন কোন জাতির মধ্যে পুতুল নাচ জাতীয় জীবনের ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়াই যে বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়; কোন কোন জাতির মধ্যে তাহা যে নিতান্ত অনুকরণের ফল, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে কলিকাতার নাগরিক জীবন কেন্দ্র করিয়া কেবলমাত্র বাঙ্গালীরই যে একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিচয় বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহা নহে—দেশের বিভিন্ন অংশ হইতে এখানে সে সময় যে সকল বিভিন্ন জাতি আসিয়া বাস করিতে থাকে, তাহাদের সাংস্কৃতিক উপকরণও এই শহরের অধিবাসীর জীবনে নানা দিক হইতে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। যাত্রা, কবি, আখড়াই, পাঁচালী ও বিভিন্ন গীত-রীতির প্রচলন তাহারই প্রভাবের ফল। পুতুল নাচও সেই সূত্রেই কোন দিক দিয়া সেই যুগেই কলিকাতার সৌখীন সমাজে প্রচলন লাভ করিয়াছিল বলিয়া জাতীয় জীবনে ইহা গভীর ভাবে প্রবেশ করিতে পারে নাই। এই বিষয়ে উড়িষ্যা কিংবা ছোটনাগপুরের আদিবাসী সমাজের নিকট বাঙ্গালীর যে কোন ঋণ আছে, তাহা নহে। কারণ, উড়িষ্যা এবং ছোটনাগপুরের পুতুল নাচ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির। বিহারে উল্লেখযোগ্য পুতুল নাচ নাই; সুতরাং বিহারের নিকট এই বিষয়ে বাঙ্গালীর কোন ঋণের কথাও স্বীকার করা যায় না। ছোটনাগপুরের পুতুল নাচের প্রকৃতি এতই স্বতন্ত্র যে, বাংলার সঙ্গে ইহার সুদূর কোন সম্পর্কও কল্পনা করা যায় না। ছোটনাগপুরের পুতুলগুলি এক ফুটের বেশী উঁচু নহে এবং ইহা কাষ্ঠদ্বারাও নির্মিত হয় না। সাধারণত নেকড়া দ্বারাই ছোট ছোট পুতুলের আকৃতি করিয়া তাহা নির্মিত হয়, ইহাদের সর্বাঙ্গই নমনীয় (elastic), কাঠের পুতুলের মত অনমীয় (rigid) নহে। ইহাদের নৃত্যের পটভূমিকায় কোন কণ্ঠসঙ্গীত কিংবা সংলাপ পরিবেশন করা হয় না। তিন চারিটি পুতুলের নৃত্যের ভিতর দিয়া এক একটি ক্ষুদ্র কাহিনী প্রকাশ করা হয় মাত্র। ইহাদের উপরও হিন্দু সভ্যতার প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়; কারণ, পুতুলগুলি হিন্দু রাজারাণীর বেশে সজ্জিত থাকে, আদিবাসী সমাজের চরিত্রানুযায়ী অঙ্গসজ্জা গ্রহণ করে না। ইহাতেও ক্ষুদ্র একটি মঞ্চ নির্মিত হয়, এবং মঞ্চের দুই পার্শ্বে অলক্ষিতে বসিয়া দুই ব্যক্তি

কেবলমাত্র সূত্র চালনা করিয়া ইহাদের নৃত্যের অভিনয় দেখাইয়া থাকে। নৃত্যের তালে তালে ধাম্‌সা এবং সানাই উচ্চ স্বরে বাজিতে থাকে। ক্ষুদ্র পুতুলের নৃত্যের তুলনায় ঢাকের বাদ্য অতিরিক্ত আড়ম্বরপুর্ণ বলিয়া মনে হয়। পুতুল নির্মাণের এবং নৃত্যের পরিকল্পনা অনেক ক্ষেত্রেই ইহারা প্রধানত হিন্দু প্রতিবেশীদিগের মধ্য হইতে গ্রহণ করিলেও বাদ্যের সংস্কারটি ইহাদের নিজস্ব। আধুনিক বাংলার পুতুল নাচের মত বিদেশী বাদ্য তাহারা গ্রহণ করে নাই। বিদেশের অনুকরণে পশুপক্ষীর পুতুলও তাহারা নির্মাণ করে নাই। বিশেষত ইহাই প্রকৃতপক্ষে পুতুল নাচ; বাংলার পুতুল নাচে পুতুলও নাই, নাচও নাই। কারণ, পুতুল বলিতে আমরা প্রকৃত যাহা বুঝি, তাহা পূর্ণাবয়ব কাষ্ঠমূর্তি নহে, পুতুলের সঙ্গে শিশুর খেলেনার ভাবটি জড়িত হইয়া আছে। বাংলাদেশে যে বৃহদাকৃতি মূর্তিগুলি নির্মিত হয়, তাহাদের সঙ্গে খেলেনার ভাবটি কিছুতেই যুক্ত হইতে পারে না; আর নৃত্য যে বাংলার পুতুল নাচে মুখ্য স্থান গ্রহণ করে না, তাহা পুর্বে বলিয়াছি। ছোটনাগপুরের পুতুল নাচের পুতুলগুলি শিশুর খেলেনারই মত, নরম তুলতুলে, নেকড়া দিয়া তৈরী; সুতরাং ইহারা প্রকৃতই পুতুল এবং ইহাদের আচরণের মধ্য দিয়া যে রূপটি প্রকাশ পায়, তাহা প্রকৃতই নৃত্য, আনুপূর্বিক নৃত্যগুণের ভিতর দিয়াই এক একটি ক্ষুদ্র কাহিনী ইহাদের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হয়। সুতরাং ইহাই প্রকৃত পুতুল নাচ। ইহার সঙ্গে তুলনা করিলে বাংলার পুতুল নাচকে এই সংজ্ঞা দ্বারা অভিহিত করা যায় না।

তবে এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। নদীয়া জিলার প্রধানতঃ কৃষ্ণনগর অঞ্চলে যে পুতুল নাচ প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যেও পুতুলের অভিনয়ই মুখ্য স্থান অধিকার করিলেও ইহাতে যে পুতুলগুলি নির্মিত হয়, তাহা চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণ অঞ্চলের পুতুলগুলির মত যেমন বৃহদাকৃতি নহে, তেমনই কাষ্ঠখণ্ড দিয়াও তৈরী হয় না। তাহাদের আকৃতি ছোটনাগপুরের পুতুলগুলির মতই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং নেকড়া দিয়া তৈরী। তবে ইহাদের মধ্যেও পুতুলের নাচ অপেক্ষা অভিনয় অংশই প্রাধান্য লাভ করে। গদ্য সংলাপের সঙ্গে সঙ্গে ইহার পটভূমিকায় যে সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়, তাহা এক বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করে। ইহারও যাত্রার মত পালার আকারে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী অবলম্বন হইয়া থাকে। কণ্ঠসঙ্গীত ইহাতে প্রাধান্য লাভ করে। তবে অধিকাংশ সঙ্গীতই ভাঙ্গা কীর্তনের সুরে বাঁধা বলিয়া অনেক সময় ইহাতে বৈচিত্র্যের

অভাব দেখা দেয়। কিন্তু এ'কথা সত্য, এখানকার পুতুল যথার্থই পুতুল, কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল নির্মাণের আদর্শ ইহাদের উপরও আরোপ করা হয় বলিয়া পুতুলগুলি অনেক সময় বাস্তব রূপ লাভ করে। পুতুলগুলির অঙ্গসজ্জায় যে সৌন্দর্য বোধ এবং রুচির পরিচয় প্রকাশ পায়, তাহা বাঙ্গালীর জাতীয় সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষায় সার্থক।

পাশ্চাত্ত্য পুতুল নাচে পশুপক্ষী ও দৈত্য-দানবের অলৌকিক চরিত্র একটি প্রধান অংশ অধিকার করিয়া থাকে। কিন্তু বাংলা পুতুল নাচে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের কাহিনীই মুখ্য হইয়া থাকে বলিয়া পশুপক্ষীর চরিত্রের হাস্যকৌতুক অভিনয় বিশেষ স্থান লাভ করিতে পারে না। তবে মধ্যে মধ্যে লঘু অবকাশ সৃষ্টি করিবার জন্য কোন কোন লৌকিক চরিত্র, যেমন ভূত প্রেত, ঝাড়ুদার ইত্যাদির কল্পনা করিয়া পটভূমিকায় সঙ্গীত সহ ইহাদের নৃত্য পরিবেশন করা হয়। সেই উপলক্ষে যে সঙ্গীতগুলি রচিত হয়, তাহাদের সঙ্গে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীর সম্পর্ক নাই। কিংবা এই শ্রেণীর লোক-সঙ্গীতের কোন উচ্চ কাব্যগুণও প্রকাশ পায় না।

পুতুল নাচ এক অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান। সংস্কৃত নাটকের মধ্যে সূত্রধার কথাটি দেখিতে পাইয়া অনেকে মনে করিয়াছেন যে, পুতুল নাচ হইতেই সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব হইয়াছে। কেহ কেহ এমনও মনে করিয়া থাকেন যে, সংস্কৃত নাটক পুতুল নাচ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সেই পুতুল নাচের ধারা ভারতের প্রায় সর্বত্রই আজ পযন্ত অব্যাহত চলিয়া আসিতেছে। একটি বিষয় হইতে আর একটি বিষয় বিকাশ লাভ করিলে মূল বিষয়ের ধারাটি যে লুপ্ত হইয়া যায়, তাহা নহে, সেই ধারাটি ক্ষীণ হইয়া গেলেও কোন না কোন ভাবে তাহা সমাজের মধ্যে রক্ষা পায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে পুতুল নাচের অস্তিত্ব থাকিলেও এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যাইতে পারে যে, বাংলার নিজস্ব কোন পুতুল নাচ একদিন বিকাশ লাভ করিয়াছিল। বাংলার প্রাচীন সাহিত্য কিংবা শিল্পকীর্তিতে ইহার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা অপ্রচুর হইলেও ইহার যে সকল নিদর্শন এখনও উদ্ধার করা যায়, তাহা হইতে ইহা প্রমাণিত হয়।

এগার

বিবিধ নৃত্য

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরও বিভিন্ন প্রকৃতির যে সকল নৃত্য প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে বাংলার পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই প্রান্তবর্তী অঞ্চলের বউ নাচ প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। পূর্ব বাংলার শ্রীহট্ট জিলায় প্রায় সকল শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যেই এক শ্রেণীর নৃত্য প্রচলিত আছে, তাহা বউ নাচ বলিয়া পরিচিত। শ্রীহট্ট জিলার পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল আসাম প্রদেশের কাছাড জিলার বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলেও ইহার প্রচলন দেখা যায়। বর্তমানে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইহা লুপ্ত হইবার উপক্রম হইলেও পল্লী অঞ্চলে ইহার প্রভাব কোন কোন ক্ষেত্রে এখনও সক্রিয় আছে।

বউ নাচ নানাভাবে পূর্ব বাংলা বিশেষত শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও মৈমনসিংহ জিলায় নারী সমাজে দীর্ঘকাল যাবৎই প্রচলিত ছিল। ইহার যে সকল লক্ষণ এখনও বর্তমান আছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, নববধূ বিবাহকালীন যখন বরকে বরণ করিত, এই নৃত্যের অনুষ্ঠান দ্বারাই তাহাকে বিবাহ-সভায় বরণ করিয়া লইত। ক্রমে সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত হইবার ফলে বালিকা বধূকে যখন পাটে তুলিয়া বরের চারিদিকে সাত পাক ঘুরান হইত, তখন স্বভাবতই পদক্ষেপ দ্বারা তাহার নৃত্যভঙ্গি প্রকাশ করা অসম্ভব হইত, সেইজন্য তখন হইতে কেবলমাত্র হাতের মুদ্রা দ্বারা বরকে বরণ করিয়া লইয়া নৃত্যের সংস্কারটি তাহাতে রক্ষা করা হইত। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও উক্ত অঞ্চলের বিবাহানুষ্ঠান যাঁহারা লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, বিবাহ-সভায় বধূ সাত পাক ঘুরিবার সময় এক একবার যখন বরের ঠিক মুখামুখী হইত, তখন বিচিত্র মুদ্রাভঙ্গি সহকারে বরকে এক একবার বরণ করিত। অঙ্গুলির এই মুদ্রাভঙ্গি পূর্ণাঙ্গ নৃত্যভঙ্গির অঙ্গ ছিল, বর্তমানে পদক্ষেপের (Foot step) মধ্য হইতে তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়া কেবলমাত্র অঙ্গুলির মুদ্রাভঙ্গির মধ্যেই রক্ষা পাইয়াছে।

শ্রীহট্ট ও কাছাড় জিলার বাঙ্গালী সমাজে ইহার পূর্ণতর রূপটি এখনও রক্ষা পাইয়াছে। তবে তাহাও বিলুপ্ত হইবার পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রামের কোন পরিবারের মধ্যে বিবাহ হইলে কিছুদিনের মধ্যেই গ্রামের মহিলারা নূতন

বধূর নাচ দেখিবার জন্য সেই গৃহে সমবেত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ লাভ করিতেন। বধূ মুখে ঘোমটা টানিয়া দুইখানি হাতে মুদ্রাভঙ্গি করিয়া এবং ধীর লয়ে পদক্ষেপ সহকারে সমবেত নিমন্ত্রিত নারীদিগের সম্মুখে তাহার নৃত্যকৌশল দেখাইত। কিছুদিন পূর্বে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ শিলচরের এক অনুষ্ঠানে যে একটি বউ নাচ দেখিয়াছিলেন, তাহাব তিনি এই বর্ণনা দিয়াছেন,—'গ্রাম্য ঢাকের ছন্দে ও তালে প্রথমে ঢিমা লয়ে গানের সঙ্গে নাচটি স্থরু হলো। বধূসাজে মেয়েটিও পা দুটি কাছাকাছি সমানভাবে রেখে, অল্প একটু হাঁটু মুড়ে, সাম্‌নে ঝুঁকে কেবল দুই হাতের পাতা নানাভঙ্গীতে দোলাতে লাগ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে এও লক্ষ্য করলাম যে, মেয়েটি হাটু মুড়ে থাক্‌লেও গানের ছন্দে ছন্দে ঈষৎ ওঠা-নামার একটা দোলা সর্বদাই রেখে চল্‌ছে তাহার দেহে। মেয়েটির পা দুটি কখনোও মাটি ছেড়ে উঠ্‌ছে না। আগাগোডাই মাটিতে পা ঘসে ঘসে, তার ডান দিক লক্ষ্য রেখেই চক্রাকারে ছন্দে ছন্দে সরে সরে যাচ্ছে। এই নাচে পদ-চাল্‌নার বৈচিত্র্য অল্প। মাত্র তিনটি ভঙ্গী। হাতের ভঙ্গীর বৈচিত্র্য পায়ের চেয়ে কিছু বেশী, কিন্তু খুব সহজ। এত সহজ হয়েও গানের রসে, বাজনার ছন্দে ও বালিকার বধূজনোচিত ভয় ও সলজ্জভাবের মিশ্রণে নাচটি অত্যন্ত মধুর লেগেছিল।' ('গ্রামীণ নৃত্য ও নাট্য' ১৩৬৬, পৃ. ৬৫)

অনভ্যাসের ফলে হাত ও পায়ের ভঙ্গি এখানে বৈচিত্র্যহীন হইয়া আসিলেও একদিন যখন ইহার যথার্থ চর্চা ছিল, তখন যে ইহা নিতান্ত সহজ এবং বৈচিত্র্যহীন ছিল না, তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। এমন কি, এই সকল অঞ্চলে বিবাহ-সভায় কন্যা বরণ-নৃত্যের সময় যে মুদ্রাভঙ্গি প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা এখনও অত্যন্ত জটিল এবং দুঃসাধ্য। বিবাহের পূর্বে পরিবারের বয়স্কা মহিলারা এই বিষয়ে বধূদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই সকল মুদ্রাভঙ্গি যে পূর্বে পূর্ণাঙ্গ নৃত্যের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত ছিল, তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।

বাংলাদেশের পশ্চিম প্রান্তবর্তী অঞ্চলের হিন্দু সমাজের একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে বউ নাচ আর একটি স্বতন্ত্র রীতিতে প্রচলিত আছে। ইহাদের উভয়ের মধ্যে যে কোন সম্পর্ক আছে, আপাত দৃষ্টিতে তাহা এখন আর মনে হইতে পারে না। বর্ধমান জিলার বন-নব-গ্রাম নিবাসী শ্রীনকুলচন্দ্র দত্ত এই বিষয়ে যে একটি বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আনুপূর্বিক এখানে উদ্ধৃতি যোগ্য।

'স্থান কাল ভেদে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচিত্র রকমের এক একটি আচার অনুষ্ঠান পালিত হয়। বীরভূম জেলায় স্বুবর্ণ বণিক সমাজের মধ্যে প্রচলিত বৌ-নাচ এইরূপ একটি অনুষ্ঠান। বৌ-নাচ একটি বিচিত্র নৃত্য। লোক-নৃত্যের মধ্যে ইহা পরে কিনা জানি না, হয়ত ইহা লোক-নৃত্য। আজিকার স্বুবর্ণ বণিক সমাজে যে রূপে এই আচার অনুষ্ঠানটি আসিয়া পালিত হইতেছে, তাহা হইতে ইহার পূর্বরূপ কি রকমেব ছিল, তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। প্রায় পঁচিশ ত্রিশ বৎসব পুর্বে ইহা যে ভাবে পালিত হইত তাহার বর্ণনা এখানে দেওয়া হইতেছে।

'বরবধূ বিবাহান্তে বরের বাড়ীতে আসিলে বৌভাতেব দিন হইতে অষ্টমঙ্গলা দিনের মধ্যে, বিশেষ বৌভাতের পরের দিনে বরেব আত্মীয় স্বজন ও কুটুম্বগণ নববধূকে এক একবার কোলে লইয়া সোহাগভরে নৃত্য কবেন। অবশ্য ইহাকে ঠিক নৃত্য বলা চলে না, ইহাতে নৃত্যের ভঙ্গিমায় অঙ্গসঞ্চালন ও পদক্ষেপ রীতি প্রকাশ পায়, ইহাকে নৃত্যের ভঙ্গিমা মাত্র বলা চলে। এই সময়ে হোলির দিনে রং খেলার মত আত্মীয় স্বজনরা বধূকে রং দেন এবং নিজেদের মধ্যে রং লইয়া মাতামাতি করেন। পশ্চিমাদের মত ও আধুনিক কালের সহুবে অর্বাচীনদের মত কাদা গোলা জল, নর্দমার জল, ভাতের ফেন লইয়াও এই খেলাব মাতন চলে। কখনও কখনও উত্তেজনা হইতে অধিকতর উত্তেজনাব মধ্যে ইহা কদর্যতায় পরিণত হয়, এমন কি, বিপদ ঘটিবাবও সম্ভাবনা দেখা দেয়। আমি একবাব রং-এর বিকল্প হিসাবে ভাতের ফেন ব্যবহাব করিতে দেখিয়াছিলাম; কিন্তু তাহা যে উত্তপ্ত ছিল, আনন্দের আতিশয্যে তাহা লক্ষ্য না কবায় ব্যবহারকারী অপরকে পুড়াইয়া মাবিবার উপক্রম করিয়াছিল।

'এই বৌ- নাচটি সম্ভবত অতীতে যখন শিশু-বধূরা ঘরে আসিত, তখনকার এক স্মৃতি বহন করিতেছে। তখন সেই শিশুবধূকে লইয়া শ্বশুর শাশুড়ী ও আত্মীয়-স্বজনেরা কোলে করিতেন, শিশুদের মত সোহাগ করিতেন এবং পিতা মাতা যেমন পুত্রকন্যাকে কোলে লইয়া নৃত্যভঙ্গিমায় আদর করেন, সেইরূপ শ্বশুর বাড়ীর আত্মীয় স্বজন ও কুটুম্ব জনেরা সেই শিশু-বধূকে কোলে লইয়া নৃত্যভঙ্গিমায় আদর করিতেন। শিশুবধূ যেন নৃতন পরিবেশে আনন্দ পায়, যেন শ্বশুর বাড়ীকে আপন করিয়া লইতে পারে, পিতামাতার বিচ্ছেদ যেন সে অনুভব করিতে না পারে, বৌ-নাচের মধ্যে তাহার প্রচেষ্টাই ছিল।

সম্ভবতঃ "বৌ নাচের" পশ্চাতে এই জন্ম-ইতিহাসটুকু লুক্কায়িত আছে (শারদীয় বর্ধমান, ১৩৭২)

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। বাল্যবিবাহ প্রবর্তিত হইবার পর হইতে শিশুবধূকে কোলে লইয়া বয়স্কা মহিলাগণ নৃত্য করিয়া একটি প্রাচীন প্রথার মুখ রক্ষা করিলেও, ইহাতে পুর্বে যে পুর্ণ যৌবন-প্রাপ্তা বধূগণ নিজেরাই স্বাধীনভাবে তাহাদের নৃত্য-কৌশল দেখাইতেন, শ্রীহট্ট কাছাড়ে প্রচলিত রীতিটি তাহার আজিও প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়। পুর্বেই বলিয়াছি, নৃত্যগুণ বাঙ্গালী বধূর একদিন সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া গণ্য হইত; বিবাহের সময় বধূর আর কোন গুণেরই বিচার হইত না, কেবল মাত্র নৃত্যগুণেরই বিচার হইত। চাঁদ সদাগরের পুত্রবধূ নির্বাচন প্রসঙ্গে সে কথা পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি। তুর্কী আক্রমণের পর হইতে বিপর্যস্ত বাংলার সমাজ হইতে ইহার সংস্কার দূর হইয়া যাইতে আরম্ভ করিলেও বাংলার সমাজের কোন কোন দূরবর্তী অঞ্চলে তাহা বিচ্ছিন্নভাবে কোন উপায়ে আত্মরক্ষা করিয়া আছে। বাংলার উভয় প্রান্তের বউ নাচ তাহার নিদর্শন।

শ্রীহট্ট, কাছাড় ও ত্রিপুরা জিলার আর এক শ্রেণীর মেয়েলী নৃত্যে নাম ধামাইল বা ধামালী। এই নৃত্যের সঙ্গে যে গান গাওয়া হয়, তাহা ধামাইল বা ধামালী গান বলিয়া পরিচিত। তাহার কিছু নিদর্শন পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি। সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিবাহিতা এবং বয়স্ক মহিলারাই প্রধানতঃ এই নৃত্যে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষেই এই নৃত্য হইতে পারে। গৃহের আঙ্গিনার মধ্যে একটি বৃত্তের আকারে এই নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়। নবান্ন উৎসবের সময় নূতন ধানকে কেন্দ্র করিয়া আঙ্গিনার মধ্যে একটি বৃত্তের আকারে মহিলারা এই নৃত্য করেন, সূর্য ব্রত উপলক্ষে সূর্যের প্রতীক্ স্বরূপ একটি প্রদীপকে কেন্দ্র করিয়া এই বৃত্ত রচিত হয়, বিবাহ উপলক্ষে বর কিংবা কন্যাকে স্নান করাইবার সময় কিংবা অন্য কোনও উপলক্ষেও তাহাকে কেন্দ্র করিয়া মহিলাদের মধ্যে নৃত্যের উদ্দেশ্যে এই বৃত্ত রচিত হইতে পারে। উপরে যে বউ নাচের কথা উল্লেখ করিলাম, সেই উপলক্ষেও ধামাইল নাচের অনুষ্ঠান হয়। ইহা বৃত্তাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য; হাতে তালি দিয়া নৃত্যের তাল রক্ষা করা হয়, ধীর লয়ে পদক্ষেপ হইয়া থাকে, তাহাতে কোন বলিষ্ঠতা অনুভব করা যায় না। একদিন হয়ত তাহা ছিল; কারণ, নৃত্যের প্রকৃতি হইতে তাহা এখনও বুঝিতে

পারা যায়। পাদক্ষেপে বলিষ্ঠতা না থাকিলেও বৈচিত্র্য আছে। একবার পাদক্ষেপ করিবার সময়ের মধ্যেই ইহাতে সাতবার পর্যন্ত করতালি দেওয়া হইতে পারে, তাহাতে নৃত্যটি একটু জীবন্ত হইয়া উঠে। নাচিবার সময় দেহ সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়া নৃত্যকারিণীরা অভিবাদনের ভঙ্গি করিয়া থাকে। করতালি দেওয়া ব্যতীত হাতের নানারকম ভঙ্গি করা হয়। কখনও এক হাতে কটি স্পর্শ করিয়া এক হাতের তালু দিয়া ভঙ্গি করে, কখনও এক হাতে অঞ্চল ধরিয়া আর এক হাতে কিছু ছড়াইবার ভঙ্গি করে, এক একবার অঙ্গুলির দ্বারা সামান্য মুদ্রা প্রকাশ করিতেও দেখা যায়। বৃত্তাকারে একজনের পিছনে আর একজন ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্যটি শেষ হয়। সঙ্গে গীত ও বাদ্য চলিতে থাকে। ধামাইল বা ধামালী গান পূর্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজে প্রচলিত এক শ্রেণীর নৃত্যের নাম মাদার নৃত্য। ইহার সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য।

'বাঙ্গালী মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে দুইটি সরল বাঁশ লইয়া যে নাচ দেখানো হয়, তাহাই পল্লী বাংলায় মাদার নাচ নামে খ্যাত। ঢোল ও কাঁসি সহযোগে মুসলমান সম্প্রদায়ের দুইজন দুইটি সরল সম্পূর্ণ বাঁশ লইয়া পল্লীতে নৃত্য করিয়া বেড়ায়। কখনও চিবুকের উপর, কখনও কপালের উপর, হাতের তালুর উপর, বুকের উপর, কখনও কখনও এক একটি আঙ্গুলের প্রান্ত সীমার উপর লইয়া, কখনও শুইয়া, কখন দাঁড়াইয়া ব্যালেন্স রাখিয়া এক একজন নৃত্য করে। বাঁশ দুইটির শেষ প্রান্তে রঙ্গিন বস্ত্রখণ্ড পতাকার মত জড়াইয়া দেওয়া হয়। শুধু মুসলমান পল্লীতে নহে, হিন্দু পল্লীতেও এই মাদার নাচ দেখান হইয়া থাকে।

'মাদার নাচ অবশ্য মুসলমানদের ধর্মের অঙ্গ নহে, ইহা মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ হইতে জাত কোন আখ্যান ভিত্তিক নহে। বরং ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা মাদার লইয়া এইভাবে মাতামাতিকে অনেকটা কুনজরেই দেখিয়া থাকেন। যাহা হোক্, মাদার নাচের পশ্চাতে যে ক্ষুদ্র লৌকিক অখ্যান পাওয়া যায়, তাহা নিম্নরূপ।

'দুই সহোদর; দুই জনেই মাদার নামে খ্যাত। একজন দম মাদার ও অন্য জন পাগলা মাদার। উভয়েই আধ্যাত্মিক শক্তি-সম্পন্ন; কিন্তু সাংসারিক দৃষ্টিতে পাগলা ছাড়া কিছুই নহে।

'দম মাদারের বিবাহ; নির্ধারিত দিনে বর ও বরযাত্রিগণ বিবাহ উপলক্ষে

যাত্রা করিয়াছেন। বাড়ীতে মা একলা আছেন। কিছু দূর যাওয়ার পর মনে পড়িয়া যায় যে, মাথার পাগড়ী বাড়ীতে ভুলিয়া আসা হইয়াছে। তাহা লইবার জন্য পাগলা মাদার বাড়ী ফিরিয়া আসেন। আসিয়া দেখেন যে, মা দুই পা ছড়াইয়া দুই হাতে ভাত তুলিয়া অতীব ব্যগ্রতার সহিত আহার করিতেছেন। মাতার এই অদ্ভুত ব্যবহারে মাদার পাগলা অবাক হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। মা উত্তরে বলিলেন, "বাবা, তোমার দাদা বিয়ে কর্‌তে যাচ্ছে, বউ এলে আর ভাত খেতে পারি কি না ঠিক নাই, তাই আশা মিটিয়ে ভাত খেয়ে নিচ্ছি।" এই কথায় মাদারের মনে বড় আঘাত লাগে এবং তিনি ফিরিয়া গিয়া দম মাদারকে সমস্ত কথা জানান। এই কথায় মাতৃভক্ত মাদার ভ্রাতৃদ্বয় বিবাহ যাত্রা স্থগিত রাখেন এবং বিবাহ দল ত্যাগ করিয়া পাগলের মত নাচিতে নাচিতে পার্শ্বস্থ জঙ্গলে প্রবেশ করেন এবং আশ্চর্যজনকভাবে অদৃশ্য হন।

'কিছুদিন পরে সেই বনে দুইটি লম্বা সরল বাঁশ গজাইয়া উঠে। দৈর্ঘে দুইটির মধ্যে ঈষৎ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তখন মাদার ভ্রাতৃদ্বয়ের গুণ-গ্রাহিগণ সেই বাঁশ মাদার ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতীক্‌রূপে গ্রহণ করিয়া কথিতভাবে নাচিয়া বেড়ায়। মাদার নাচের জন্ম ইতিহাসের পশ্চাতে মুসলমান সমাজে এই গল্প প্রচলিত আছে।

'এখনও এক শ্রেণীর মুসলমানদের বিশ্বাস, এক বিশেষ বাঁশে নাকি ঈষৎ ছোটবড় আকৃতির দুইটি সরল বাঁশ পাশাপাশি জন্মাইতে দেখা যায়। সেই দুইটি বাঁশকেই মাদার ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতীক্ রূপে লওয়া হয়।

'মুসলমানদের শাস্ত্রভিত্তিক আচার ব্যবহারের সহিত ইহা সম্পর্কহীন। মুসলমানদের মধ্যে ধারণা, সম্ভবতঃ হিন্দুসমাজের কোন লৌকিক আচারের প্রভাবে ইহা তথাকথিত অশিক্ষিত মুসলমান সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। বর্তমানে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সামাজিক অথবা ধর্মীয় আচার আচরণ হইতে ইহা দ্রুত অপসারিত হইতেছে।' (শ্রীনকুলচন্দ্র দত্ত, প্রাগুক্ত)

সঙ-এর নৃত্য নামক বাংলা দেশে এক শ্রেণীর নৃত্য প্রচলিত আছে। পুর্বে ঢাকার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রায় সঙের নৃত্য একটি দর্শনীয় বিষয় ছিল। তাহাতে কোন বিষয় কিংবা ঘটনাকে ব্যঙ্গ করিয়া যে নৃত্য হইত, তাহা নহে, বরং তাহার পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক নানা গুরুত্বপূর্ণ

অনুষ্ঠান নৃত্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করা হইত। যেমন শ্রীকৃষ্ণের জন্মোপলক্ষে নন্দালয়ে গোপগণের আনন্দ প্রকাশ বিষয়ক সঙের নৃত্যে গোপের বেশ ধরিয়া অন্ততঃ ২৫।৩০ জন পুরুষ সারিবদ্ধভাবে নাচিতে নাচিতে শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইয়া যাইত। নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ বাদ্যসহ সঙ্গীত হইত। পুরুষের নৃত্য এবং উল্লাসের অভিব্যক্তি ইহার অভিপ্রায় থাকিত বলিয়া তাহা অনেক সময় উদ্দাম হইয়া উঠিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এই প্রকার বহু নৃত্যের দল সৃষ্টি হইত এবং তাহা বিরাট শোভাযাত্রার অন্তর্নিবিষ্ট হইত। ক্রমে সঙের নৃত্য গুরুত্বপুর্ণ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া লঘু ব্যঙ্গাত্মক বিষয় অবলম্বন করিল। কলিকাতার জেলে-পাড়ার সঙ ও তাহার নৃত্য তাহার নিদর্শন। তখনই ইহার বিনাশ অনিবার্য হইয়া উঠিল। কিন্তু ঢাকার জন্মাষ্টমী শোভাযাত্রার সঙ্ শেষ পযন্তও কোনও লঘু ব্যঙ্গাত্মক বিষয়কে নৃত্যের মধ্যে স্থান দেয় নাই।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সকল বিভিন্ন আদিবাসী বহুদিন যাবৎই বাস করিতেছে, তাহাদের মধ্যে অনেকের নৃত্যরূপই বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত হইতে পারে নাই। এই সকল আদিবাসী ভৌগোলিক দিক দিয়া পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব বাংলার সীমান্তের মধ্যে বাস করিলেও সাংস্কৃতিক দিক দিয়া বৃহত্তর আদিবাসী সমাজের সঙ্গেই সাংস্কৃতিক যোগ রক্ষা করিয়াছে, ক্বচিৎ ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। স্নতবাং বাংলাব লোক-নৃত্যের আলোচনায় তাহাদের উল্লেখ করা অপ্রয়োজনীয়। তাহা স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়।

বাংলাদেশের উত্তর অংশ বিশেষতঃ দার্জিলিঙ জিলায় তিব্বতীয় সংস্কৃতির প্রভাব কিছু কাযকর হইয়াছিল। সেইজন্য সেই অঞ্চলে তিব্বতীয ঐন্দ্রজালিক নৃত্যের প্রচলন আছে। তাহাও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে স্বাঙ্গীকৃত হইতে পারে নাই বলিয়া বর্তমান আলোচনা হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কোন কোন ক্ষেত্রে পশুপক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া মানুষের নৃত্যও বাংলাদেশের লৌকিক আনন্দানুষ্ঠানের অন্যতম বিষয বলিয়া গণ্য হইতে পারে। নিম্নে বর্ধমান জিলার ভৈটাগ্রাম হইতে প্রায় চল্লিশ বৎসর পুর্বে সংগৃহীত একটি বাঘ নাচের বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করিতে পারি। গ্রাম্য জীবনে এই শ্রেণীর উৎসব ইতিমধ্যেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

শারদীয়া দুর্গাপুজার নবমীর রাত্রিতে অনুষ্ঠিত এই নৃত্যাভিনয়ের কুশীলব এই প্রকার—

(১) বেদে—ব্যাঘ্রশিকারী ও যে বাঘ নাচায়

(২) মোড়ল

(৩) ওঝা গ্রাম্য কবিরাজ ও মন্ত্র-তন্ত্রের অধিকারী

(৪) চৌকীদার

(৫) বেদের স্ত্রী (ওরফে হিমির মা)

(৬) 'ব্যাঘ্র'দ্বয়।

ইহা ব্যতীত ঢাকী ঢুলী প্রভৃতি বাজন্‌দার থাকে।

(বাঘ দুইটি লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া প্রথমেই গোটা দুই হুঙ্কার ছাড়িল। বাঘের পিছু পিছু বাজনার তালে তালে নাচিতে নাচিতে ব্যাধ আসিল—হস্তে ধনুক-তীর। সে পুজার দালানের সম্মুখে বাঘ নাচাইতে আরম্ভ করিল)।

চৌকীদার—মোড়ল মশাই! ও মোড়ল মশাই!

মোড়ল মশাই—কে রে এত রাত্রে?

চৌকীদার—আজ্ঞে গো, বিপিন চৌকীদার। একবার বেইরে এসো না আপনি!

মোড়ল—(বহির্গত হইয়া) কেন রে, কি হয়েছে?

চৌকীদার—আজ্ঞে, এই কোথা হতে একটা বেদে না কে এসেছে গো, মোড়ল মশাই; সে এসে এক দালান লোকের ছামুতে দুটো বাবা নাচাচ্ছে গো! তুমি গিয়ে মানা করবে চলুন, ছেলেমেয়েগুলোকে নইলে বাঘায় খেয়ে ফেলবে।

মোড়ল—চল্ চল্।

(ব্যাঘ্রদ্বয় বিকট চীৎকারে মোড়ল মহাশয়ের কাছে লাফাইয়া পড়িবে)

মোড়ল—ছেই ছেই—ওরে বাবা! আমাকেই খেয়ে ফেল্লে রে! ওরে ও ছোঁড়া, বলি তোর বাড়ী কোথা?

বেদে—বাড়ী, আজ্ঞে অনেক দূর!

মোড়ল—অনেক দূর, সে কোথা?

বেদে—এই আজ্ঞে ঝাঝরা—ঝুঝরো গো,-গাঁ গলসী, তিলে বেদের উপর—ডি, কেঁথা-ছেড়া বলরামপুর।

মোড়ল—বেশ বেশ, সে বড় মন্দ নয়। তা এ কি করছিস্? পুজোর বাজার, ছেলেপিলে ধরে নেবে, বাঘ দুটোকে মেরে ফ্যাল্।

বেদে—'বাবা' মারলে আমার চলবে না গো, ও হচ্ছে আমার ভাত-ভিক্ষে—বাঘ মারলে খাবো কি ?

মোড়ল—খাবি ভাত, মুড়ি! বাঘ মারলে বাবুরা এমন ইনেম দেবে যে, তোকে আর নাচিয়ে খেতে হবে না।

বেদে—কি ইনেম দেবে ?

মোড়ল—টাকা ভাঙিয়ে সিকে দেবে।

মাঝে ছেঁড়া মুড়ো দেবে।

নাকে একটি মল দেবে।

পায়ে একটি নথ দেবে।

কাঁকালে একটা গাভীর হাল দেবে।

আর দেরী করিস্ নে, শীগ্রি মেরে ফ্যাল্।

বেদে—তবে আপনি দাঁড়াও, একবার সঙ্গে যে আছে, তাকে ডাকি।

মোড়ল—তোর আবার সঙ্গে কে আছে ?

বেদে—আছে গো ; সেই যে।

মোড়াল—সে কে রে ?

বেদে—সেই-য সে গো! সে ত তোমাদের্ও আছে, সেই যে ভাত বেড়ে দেয়।

মোড়ল—ওঃ বুঝেছি—তা নে, তাকে ডাক।

বেদে—এই ত গেরো! তাই ত এতক্ষণ বলি নাই! আবার আপনি তাকে নেবে না ত ?

মোড়ল—যাঃ বেটা পাজী! তুই ডাক্ ডাক্—বাব মারতেই হবে।

বেদে—ও—হিমির মা! হিমির মা রে! ওরে হিমির মা—!

(হিমির মা উপস্থিত)

হিমির মা—কেন রে—'র বেটা!

বেদে—ইদিকে আয়, ইদিকে আয়!

হিমির মা—তবে কি বল ?

বেদে—বাবুরা বল্‌ছে যে বাঘ মারতে হবে।

হিমির মা—সেই কালেই তো বলেছিলুম, বাবা নিয়ে আসিস না!

বেদে—তা বাবুরা বলছে যে, আর আমাদের বাঘ নাচিয়ে খেতে হবে না; এমন ইনেম দেবে যে ব'সে খাবো!

হিমির মা—কি ইনেম দেবে?

(পুনর্বার পুরস্কার-তালিকা আবৃত্তি)

হিমির মা—তবে যা হয় কর্।

(প্রস্থানোদ্যতা)

বেদে—ও হিমির মা রে! তবে আশীর্বাদ করে যা রে!

হিমির মা—বাঁ পায়ে গোল্লায় যা।

বেদে—এইবার বাঘ মারি?

(ব্যাঘ্র মারিতে গিয়া বেদে নিজেই নিহত হইল)

হিমির মা—ওরে····· রে। সেই কালেই বলেছিলুম যে, বাবা নিয়ে আসিস্ না রে, বাবা! আমার এক হাঁড়ি পুঁইশাক কে খাবে রে! তোকে যে কত নিজের হাতে খাইয়ে মানুষ করলুম রে।

মোড়ল—কি, হল কি? কাঁদিস্ কেনে।

মোড়ল—তা বেশই তো হয়েছে; যেমন কর্ম তেমনই ফল। তা ওকে কি চৌকিদার ডেকে বাঁকার ধারে ফেলে দেবো?

হিমির মা—ওগো, আমার মোড়ল মশাই গো! একটা রোঝা ডেকে দাও গো! আমি তোমার পাঁচিশ পাঁচিশ জুতো দেবো গো।

মোড়ল—দূর বেটী, পাগল কোথাকার! তা তুই দাঁড়া, দেখি।

(ওঝার দ্বারে গিয়া)

মোড়ল—কবরেজ মশাই গো! বাড়ীতে আছেন কি?

ওঝা—এত রাত্রে কে ডাকে রে, বাপু? এই নাকে কানে পায়ে হাতে তেল দিয়ে শুচ্ছি!

মোড়ল—আমি গ্রামের মোড়ল; একবার বেরিয়ে আসুন ত; একটা বেদে ছোঁড়া এসেছিল বাঘ নাচাতে, তাকে বাঘে খেয়েছে, সেটা ত মরে গেছে। আপনি একবার বাগিয়ে দেখুন, যদি বাঁচে।

ওঝা—আপনি ত এসেছেন, যেতে ত পারি, কিন্তু কি পাওয়া যাবে?

মোড়ল—এখন আসুন তো, তাদের কি আছে দেখি গে, দেখে ব্যবস্থা হবে।

(উভয়ে হিমির মা'র নিকট আসিয়া)

মোড়ল—ওরে 'রোঝা' ত এই এসেছে, তা কি দিতে পারিস, বল?

হিমির মা- ওগো রোজা, মশাই গো! আমার হাতে পায়ে ধরে যাতে না ভাল হয়, তাই করে দাও গো। ভাল করে দিলে পঁচিশ পঁচিশ জুতো দেবো গো!

ওঝা—(সরোষে) মোড়ল মশাই, বলে কি দেখুন দেখি?

মোড়ল—আহা, দেখছেন না, ওর কি হয়েছে? ওর কি মাথার ঠিক আছে?

ওঝা—আচ্ছা রোগীটাকে দেখি একবার!

(গোড়ালীটা বাঁ হাতের দু আঙ্গুলে নাড়ী দেখার ভঙ্গীতে ধরিয়া)

ও মোড়ল মশাই, এত ভাল হবার নয়।

হিমির মা—যাতে না ভাল হয়, তাই করে দে রে বাবা!

মোড়ল—তুই চুপ কর (বোঝার প্রতি), দেখুন দেখুন, আপনি না পারলে আর পারবে কে?

ওঝা—আচ্ছা তবে দেখি।

(বেদেকে ছুঁইতে যাইবার সময় বাঘ দুইটি ওঝার দিকে লাফাইয়া পড়িবে)

ওরে বাবা! মোড়ল মশাই, আগে বাঘগুলোকে মন্ত্র দিয়ে বাঁধি, তা নয়ত আমাকেই খেয়ে ফেল্‌বে এখুনি।

(অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া মন্ত্র আবৃত্তি)

এই আঁচির বন্ধন পাঁচির বন্ধন বাঘের পা—আর শালার বাঘ চল্‌তে পারবে না!

এই আঁচির বন্ধন পাঁচির বন্ধন বন্ধন বাঘের চোখ—এইবার বেটা অন্ধ হোক।

এই হুঁকোর জল, কেঁচোর মাটী
লাগ্‌ রে বাঘার দাঁত কপাটি!
ছাঁচি কুম্‌ড়ো বেড়াল পোড়া,
ভাঙ রে বাঘের দাঁতের গোড়া
যদি রে বাঘ নড়িস্‌ চড়িস,
খ্যাক্‌শেয়ালীর দিব্যি তোকে।

এই ত মোড়ল মশাই, বাঘ ত বেঁধে দিইছি, দেখুন একবার মন্ত্রের জোর, এবার রোগীটাকে দেখি।

হিমির মা—ওগো কবরেজ মশাই, অমনি করে আমার রান্নাঘরের দোয়ারটাও বন্ধ করে দাও না গো! আমি যে শেকলটা খুলে রেখেই চলে এসেছি গো! আমার একটি হাঁড়ি পুইশাক রাঁধা আছে যে গো!

ওঝা— আচির পাঁচির ছাঁচির ঘর
মড়কোচা দিয়ে দুয়ার কর!

এনার কাঠি বেনার বোঝা।
(এবার সুর করিয়া রোগী ঝাড়া)

(১) ঝাড়লাম ঝুড়লাম খেয়ে একটি আতা,
নেড়ে-চেড়ে দেখ্ রে ছোঁড়ার খেয়ে ফেলেছে মাথা!

(২) ঝাড়লাম ঝুড়লাম খেয়ে একটি পান,
নেড়ে-চেড়ে দেখ রে ছোঁড়ার খেয়ে ফেলেছে কান!

(৩) ঝাড়লাম ঝুড়লাম খেয়ে একটি মুড়ি,
নেড়ে-চেড়ে দেখ রে ছোঁড়ার খেয়ে ফেলেছে ভুঁড়ি।

(৪) ঝাড়লাম ঝুড়লাম খেয়ে একটি কুঁকড়ো,
নেড়ে-চেড়ে দেখ রে ছোঁড়ার খেয়ে ফেলেছে বুকড়ো!

(৫) ঝাড়লাম ঝুড়লাম না পারলাম রাখতে,
কল্‌সী কোদাল যোগাড় কর, যম এসেছে নিতে!

(৬) ঝাড়লাম ঝুড়লাম শোয়ালাম খাটে,
রাত পোয়ালে দেখি ছোঁড়াকে নিমতলার ঘাটে!
ওহে বাবু, এ একেবারে মৌয়ো দাঁড়িয়েছে; দেখি মৌয়ো ঝাড়ি!

ওঝা— আল গুড়াগুড় যায় রে মৌয়ো শামুক-খুলি খায়,
আধেক পথে গিয়ে মৌয়োর গায়ে এলো জ্বর,
এক লাফে যায় মৌয়ো যম-রাজার ঘর!
(রোগীর গোড়ালী ধরে পরীক্ষা করে)
মোড়ল মশাই, দেখুন এবার মৌয়াটা কেটেছে!

ওঝা—

এ পুকুরের পানা রে, ভাই, ও পুকুরের পানা,
ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল ছোঁড়ার গায়ের টেনা।

আধ বাড়ীতে পড়লো গোবর !
গোবর করে চবর চবর !
ওর মা দেয় এক সের চার, আমি খাই কড়মড়িয়ে !
ছোঁড়া ওঠে ধড়ফরিয়ে !

এইখানে বেদে হঠাৎ উঠিয়া চম্পট দিবে ও মহা কোলাহলের মধ্যে 'বাঘ-নাচ' সমাপ্ত হইবে।—রামেন্দ্র দত্ত, বসুমতী, ১৩৩৮)

পশুপক্ষীর নৃত্যের মধ্যে আর এক শ্রেণীর নৃত্যের উল্লেখ করা যায়, তাহাকে ঘোড়া নাচ বলা যায়। এক ব্যক্তি কৃত্রিম ঘোড়ার উপর 'আরোহণ' করিয়া মঞ্চে আবির্ভূত হয়। কৃত্রিম ঘোড়াটি কখনও একজন ঘোড়ার মুখোস পরা পুরুষের সহায়তায়, কিংবা কাঠের তৈরী ঘোড়ার কেবলমাত্র ঘাড় ও মুখটি দ্বারাই নির্মিত হয়। অশ্বে 'আরূঢ়' ব্যক্তিটি এমন ভাবে তাহার কোমর হইতে পা পর্যন্ত আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে যে, সে যে আর একজন পুরুষের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া ঘোড়ায় চড়ার অভিনয় করিতেছে, তাহা দর্শকের দৃষ্টিগোচর হইবে না। যদি মনুষ্যবাহক এই ক্ষেত্রে না থাকে, তবে একটি কাঠের ঘোড়ার ঘাড় ও মুখ এমনভাবে তাহার কোমরে আঁটিয়া দিয়া তাহার নিম্নভাগ কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখা হয় যে, সেই ব্যক্তি হাঁটিয়া গেলেও বুঝিতে পারা যাইবে যে, সে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছে। সেই অবস্থায় নিজের পায়েই সে নাচিতে থাকিলেও মনে হইবে যে ঘোড়াটিই নাচিতেছে, সে তাহার পিঠের উপর বসিয়াছে, ঘোড়ার নাচের তালে তালে নাচিতেছে। ইহাই ঘোড়া নাচ।

বাংলাদেশে এই শ্রেণীর নৃত্য যে এক কালে বহুল প্রচলিত ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কারণ, ঐন্দ্রজালিক নৃত্য হইতেই এই শ্রেণীর নৃত্যের উদ্ভব হইয়াছে। একদিন যখন ঐন্দ্রজালিক উপায়ে ব্যাঘ্রের শক্তিকে পরাভূত করিবার কল্পনা করা হইত, তখনই ব্যাঘ্রনৃত্যের সমাজে উদ্ভব হইয়াছিল। একজন পুরুষ ব্যাঘ্র সাজিয়া ব্যাঘ্রের অভিনয় করিয়া ওঝার মন্ত্র দ্বারা 'নিহত' হইত। তারপর ইহা ক্রমে কৌতুকের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

এ'কথা সত্য পশুপক্ষীর নৃত্য পাশ্চাত্ত্য মহাদেশে যত প্রধান স্থান অধিকার করিয়া থাকে, বাংলাদেশে তত করে না। কারণ, পৌত্তলিকতার দেশ ভারতবর্ষে অতি সহজেই পশুপক্ষী নরনারীর রূপ (anthropomorphic) ধারণ করে, পশুপক্ষীর রূপ বেশি দিন রক্ষা করিতে পারে না। সেইজন্য হস্তী

সহজেই গণেশে পরিণত হইয়াছে, সর্প ও মনসায় রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও দেখা যায় যে, প্রাচীন ভারতে গণেশের নৃত্যেরও পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, নৃত্যপর গণেশের বহু মূর্তির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তেমনই মনসার ব্রতকথাতেও দেখা যায়, মনসারও একটি গুণ তাহার নৃত্যগুণ। গণেশ কিংবা মনসার নৃত্যগুণের অর্থ আর কিছুই নহে তাহা হস্তী ও সর্পের নৃত্য, তাহাই নরনারীর মাধ্যমে প্রকাশ করা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত বাংলাদেশে আরও বহু প্রকৃতির নৃত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, যেমন মালদহের মাছ ধরার নাচ, বিষ্ণুপুরের রাবণ কাটা নাচ, পুরুলিয়ার কুর্মি মাহাতোদিগের পাতা নাচ, উত্তর বাংলার মেচেনী নাচ ইত্যাদি। অনাবৃষ্টির কালে উত্তর বাংলায় মেয়েরা বৃষ্টির আহ্বান করিয়া যে নৃত্য করিয়া থাকে, তাহাকে হুদুমদেও নৃত্য বলে। ব্যবসায়ী নর্তকীদের নৃত্যের নাম খেম্‌টা নৃত্য। ইহার সঙ্গে খেম্‌টা তালে গান হয় বলিয়া ইহার গানকে যেমন খেম্‌টা গান বলে, নৃত্যকেও খেম্‌টা নৃত্য বলে। ধর্মীয় নৃত্যের মধ্যে বাউল নৃত্যেরও একটি বিশেষত্ব আছে। শিবের গীত গাহিয়া যাহারা একদিন এদেশে ভিক্ষা করিত, তাহারাও গীতের সঙ্গে নৃত্য করিত। 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে।

স্বর্গত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় বাংলার লোক-নৃত্যের পুনরুদ্ধারের কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহারই প্রচেষ্টায় একদিন এই বিষয়ে আধুনিক শিক্ষিত সমাজ সচেতন হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার পরলোক গমনের পর তাঁহার সাধনার ধারাটি সক্রিয়ভাবে আর কেহ অনুসরণ করিয়া না চলিবার জন্য এই বিষয়ে উৎসাহ স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে।

*

শব্দসূচী

শব্দসূচী

[প্রান্তলিখিত সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠাঙ্কের সূচক]

ভ

ম

*